বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

মযহারুল ইসলাম

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব / ডঃ মযহারুল ইসলাম

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তর
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণ
ইন্সটিটিউট অব গ্রাফিক আর্টস
সাত মসজিদ রোড, ঢাকা-৭

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

পরম শ্রদ্ধেয়া
বেগম ফজিলাতুন্নেছাকে
যাঁর ত্যাগ, প্রেরণা ও সাহচর্য
বঙ্গবন্ধুর সকল কর্মের
উৎস হয়ে বাংলার
মানুষের স্বাধীনতার
সংগ্রামকে চিরদুর্বার
করেছে

ভূমিকা

আমি যখন বর্তমান গ্রন্থটি লিখছি, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই দেশের সর্বজন বরেণ্য, শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী। জনগণ তাঁকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান আসনে বসিয়েছেন। যে গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন, সেই আদর্শের মাধ্যমেই তিনি জনগণের পক্ষ থেকে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। এদিক থেকে তাঁর জীবনেতিহাস রচনায় ও ব্যক্তি-চরিত্রের মূল্যায়নে কোন বাধা থাকতে পারে না, কেননা তিনি জনগণেরই একজন। আমি তাই জনগণের সামগ্রিক সংগ্রামকে সামনে রেখে সংগ্রামের অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনকে ও তাঁর কালের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য ঘটনাবলীকে তথ্যের সাহায্যে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

এদেশের কিছুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে এমন ধারণা ও প্রবণতা বিদ্যমান যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অথবা সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস-বিশ্রুত ব্যক্তিদের তথ্যমূলক জীবনকাহিনী লিখবার সময় এখনো আসে নি। আমি ইতিহাসবেত্তা নই এবং ইতিহাসবিদের স্পর্ধাও আমার নেই। কিন্তু আমি মনে করি যে, এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। উন্নত দেশগুলোতে, বিশেষ ক'রে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সমসাময়িক ঘটনা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে অজস্র গ্রন্থ লিখিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

ইতিহাস কোন ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা-বিলাসের অভিব্যক্তি হতে পারে না। ইতিহাস অগ্রসর হয় তথ্যের হাত ধরে। তথ্যের সাহায্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে বলেই ইতিহাস একটি বিজ্ঞান। তথ্য বিশ্লেষণে একজন

আরেকজনের থেকে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন—বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ভিন্নতর হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসে নিজস্ব মনগড়া কথা বলবার কোনরূপ অবকাশ নেই।

এ-কারণেই সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস লিখবার মত তথ্য যদি হাতে থাকে, তবে সেই তথ্যের সাহায্যে ইতিহাস রচনায় কোন বাধা থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। ইতিহাস রচনায় কিংবা ঐতিহাসিক গবেষণায় শেষ কথা বলে কিছু নেই। ইতিহাস লেখার পদ্ধতি একটি গতিশীল পদ্ধতি। সাম্প্রতিক কালের ঘটনাপঞ্জী নিয়ে ইতিহাস হতে পারে, যদি তা' তথ্যনির্ভর হয়। কিন্তু ইতিহাসের বক্তব্য কখনই চূড়ান্ত নয়। পরবর্তী ঐতিহাসিক আরো নতুন কথা বলবেন, নতুন তথ্য সন্নিবেশিত করবেন—সে সম্ভাবনা সব সময়ই ঐতিহাসিক গবেষণায় বিদ্যমান। সুতরাং, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখবার সময় এখনো আসে নি, শেখ মুজিবের জীবনী এখন লেখা ঠিক হবে না,—এইসব প্রতিক্রিয়াশীল বিরূপ মনোভাব যাঁরা পোষণ করেন বা প্রচার করেন আমি তাঁদের সাথে একমত নই। ইতিহাস যদি একটি তথ্যনির্ভর বিজ্ঞান হয়, তবে সেই বিজ্ঞানের অভিব্যক্তির জন্য সময় দিয়ে কোন প্রাচীর গড়া যায় না। কালের অমোঘ নিয়মে ঘটনা যখন ঘটে তখনই তা' ইতিহাস হয়, তার বর্ণনার জন্য সময়ের পরীক্ষার হয়তো কিছুটা প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তা' অপরিহার্য নয়; ইতিহাসের পথ প্রশস্ত এবং উন্মুক্ত।

ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। এক সময় রাজ-রাজড়াদের কাহিনী বর্ণনাই ছিল ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু বর্তমানে ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্য একটি গোটা জাতি, একটি গোটা সমাজ, একটি সমগ্র দেশ। এর সাথে মিলিত হয় অপর জাতি, সমাজ বা দেশের আপেক্ষিক ও তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ। একই পরিস্থিতিতে অপর দেশে যা ঘটেছে, তার দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখে বর্ণনীয় কাহিনীর মূল্যায়ন ইতিহাসের একটি মৌল লক্ষ্য। কেননা, ইতিহাস ঘটনার চলমান জীবন্ত ছবি এবং তা' অত্যন্ত সবাক। একই পরিস্থিতিতে ও ঘটনাবর্তে এক দেশে যা ঘটে, অন্য দেশেও অনুরূপ পরিস্থিতি ও ঘটনাবর্তে তা' ঘটতে পারে এবং কখনো কখনো ঘটে থাকে। আবার ব্যতিক্রমও যে না

ঘটে, তা' নয়। তবে যা ঘটে তার বিবরণ, তার তথ্যনিষ্ঠ ও কালানুক্রমিক বর্ণনা, এবং তার যুক্তিনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই ইতিহাস। এছাড়া মনে রাখতে হবে, ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি-পিপাসা—আর সেই পিপাসা থেকে উদ্ভূত শ্রেণী-সংগ্রামের এক অমোঘ প্রবাহ। এক শ্রেণীর লোক সুখ ও আনন্দের লোভে, ক্ষমতার মোহে, অর্থের ও ভোগের লালসায় অপর শ্রেণীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধতে চায়; অপর শ্রেণী চায় বলদৃপ্ত পেশীগত শক্তি নিয়ে সেই শৃঙ্খল ছিঁড়ে মুক্তি পেতে। বিশ্বের সর্বত্র ইতিহাস তাই একদিকে এই শৃঙ্খলে বাঁধনের করুণ ও বীভৎস কাহিনীর, আর অন্যদিকে শৃঙ্খল মোচনের যে প্রত্যয়সিক্ত সংগ্রাম দেশে দেশে যুগের পর যুগ অব্যাহত গতিতে চলে আসছে তার, বিশ্বস্ত বর্ণনায় তৎপর—তথ্যনিষ্ঠ ও কালানুক্রমিক বিবরণের মাধ্যমে এবং বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী বিচার-বিশ্লেষনের আলোকে ইতিহাস এই বন্ধন ও বন্ধন-মুক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে।

যা হোক, ইতিহাসের মূল লক্ষ্য একটি সমাজ ও জাতি—কিন্তু কোন সমাজে বা জাতিতে এমন এক একজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যাঁর কার্য-কলাপ সেই সমাজ বা জাতিকে এক নতুন মাহাত্ম্যে অভিষিক্ত করে—নতুনভাবে আলোড়িত করে—একটি দেশ, সমাজ বা জাতিকে নবজন্ম দান করে। শেখ মুজিব এমনি একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি।

ইতিহাসের মূল লক্ষ্য যদিও সমাজ—তথাপি এমন ব্যক্তিত্বকে ইতিহাস উপেক্ষা করতে পারে না, কেননা সমাজ এমন ব্যক্তিত্বের মধ্যে আপন চলার শক্তি খুঁজে পায়। সমাজের ব্যথাবেদনা-দীর্ঘশ্বাস, সমাজের আনন্দ, আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না তাঁর ব্যক্তিত্বে লালিত হয়—তিনি সমাজের পুঞ্জীভূত শক্তির প্রতীক। একটি সমাজকে তুলে ধরতে হলে এমন ব্যক্তি সামনে আসেন, আবার এমন ব্যক্তিকে তুলে ধরতে গেলে সমাজ সামনে আসে। সমাজ এবং এমন ব্যক্তিত্ব পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক। শেখ মুজিব এমনি একটি ব্যক্তিত্ব। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে, এই দেশের সমাজের উত্থান-পতন, নবজাগরণ ও স্বাধীনতা ইত্যাদির ইতিবৃত্ত লিখতে হ'লে, শেখ মুজিবকে সর্বাগ্রে ও সর্বত্র স্মরণ করতে হয়। আবার শেখ মুজিব সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে কিংবা

তাঁর জীবনেতিহাস বর্ণনা করতে হ'লে, তাঁর জননী জন্মভূমি বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ, প্রতিবেশ, সমাজ, ঐতিহ্য সবই সামনে ও পেছনে এসে ভিড় করে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্তমান গ্রন্থে আমি আমার বক্তব্য পেশ করবার চেষ্টা করেছি। আমার গ্রন্থের সর্বত্র সেই প্রয়াস ছড়িয়ে রয়েছে। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে আমি তথ্যকেই বড় ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেছি, কল্পনা বা ভাবাবেগকে নয়। আর সেই তথ্য যেমন বঙ্গ-বন্ধুর জীবনকে প্রতিফলিত করেছে সত্যালোকে, তেমনি সেই তথ্যের ঔজ্জ্বল্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। বাংলাদেশের ইতিহাস ও শেখ মুজিব দুটো অবিচ্ছিন্ন সত্তা। একটিকে ছাড়া অপরটি অসম্পূর্ণ।

এমন একটি গ্রন্থ রচনার কাজ যে সহজসাধ্য নয়, তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।

স্বাধীনতার পর বাংলা একাডেমী ও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, এই দুটো অসম প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয় ক'রে বাংলা একাডেমী নামে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার ও সেই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলবার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হয়। ফলে আমাকে কঠোর পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠানটির গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। সেই কাজের ফাঁকে সবটুকু সময় আমি এই গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে ব্যয় করেছি। আমি যখন পশ্চিম বাংলার জলংগীতে সীমান্ত-যুদ্ধ-শিবিরে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংগঠনিক কর্মে লিপ্ত ছিলাম, তখনই এই গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে বহুবিধ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমি যে এমন একটি গ্রন্থ লিখবার দুরূহ কর্ম সম্পাদন করতে সমর্থ হয়েছি এবং সেই গ্রন্থ যে আজ পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি, সেজন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে এযাবত বেশ কিছু-সংখ্যক গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। কিন্তু সব গ্রন্থ নির্ভরশীল, একথা বলতে পারি না। আমি মূলতঃ পত্র-পত্রিকা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত কিছু গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এছাড়া, বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার সুদীর্ঘ

ব্যক্তিগত পরিচয় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। কঠোর ব্যস্ততার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু আমাকে যে কয়েকটি অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার দান করেছেন তার মূল্য এই গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কোন কোন বিশিষ্ট অনুরাগী আমাকে সাক্ষাৎকার দান ক'রে বাধিত করেছেন।

আমি গ্রন্থটিকে তথ্যনিষ্ঠ ও গবেষণামূলক ক'রে তুলবার চেষ্টা করেছি। বঙ্গবন্ধুর জীবন ঘটনাবহুল। আমি সেই ঘটনাগুলোকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছি এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা ক'রে ঘটনাপঞ্জী সাজানোর দিকে দৃষ্টি রেখেছি। যেখানেই প্রয়োজন, আমি ঘটনার মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করেছি—তথ্যনিষ্ঠ বলেই এই মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ সত্যসন্ধ বলে আমি দাবী করতে পারি। সবাই আমার সাথে একমত হবেন, এমন আশা করি না—তবে আমি নিজে যে সত্যানুসন্ধানে আন্তরিক হতে চেষ্টা করেছি, সেই আত্মবিশ্বাসই আমার একমাত্র শক্তি। কি তথ্য পরিবেশনায়, কি মূল্যায়নে, সর্বত্রই আমি ইতিহাস-বিজ্ঞানের বস্তুগত ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণে যত্নবান হবার চেষ্টা ক'রেছি। কতটা সফল হয়েছি, সে বিচার পাঠকের হাতে। তবে একথা সবিনয়ে বলতে পারি, বঙ্গবন্ধু অথবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে এযাবতকাল প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আমার এই গ্রন্থ নির্ভরযোগ্যতায়, ব্যাপক তথ্য পরিবেশনায় এবং অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণে বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে।

আমার আশঙ্কা হয়, আমার কোন কোন বন্ধু বইটির মলাট দেখেই অথবা নাম শুনেই মন্তব্য করতে পারেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মনোরঞ্জনের জন্যই আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি। তাঁদেরকে একবার গ্রন্থটি অভিনিবেশসহকারে পড়তে অনুরোধ করবো। তারপরও যদি নিজের নির্মল বিবেককে সাক্ষী রেখে তাঁরা এমন মন্তব্য করেন, তবে আমার বলবার কিছু থাকবে না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কখনই স্বার্থের দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। আসলে বঙ্গবন্ধুর একটি তথ্যনিষ্ঠ জীবনী রচনার গুরুদায়িত্বকে আমি পবিত্র জাতীয়-কর্তব্য বলে মনে করেই এই কাজে ব্রতী হয়েছিলাম। আমার এই দায়িত্ব পালনে আমি কতটা আন্তরিক ও পরিশ্রমী এবং কতটা নিষ্ঠাসম্পন্ন ও তথ্য-জিজ্ঞাসু হতে পেরেছি, তার মূল্যায়ন নিরপেক্ষ সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই হবে বলে আমি আশা রাখি।

বঙ্গবন্ধুর জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র, তাঁর সংগ্রামী জীবনের সামগ্রিক আলেখ্য, ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং জীবন-দর্শনের মৌলিকতা সবই আমি যথাযথ তথ্যের সাহায্যে এই গ্রন্থে তুলে ধরতে যত্নবান হয়েছি। অভ্রান্ত ও সঠিক তথ্য পরিবেশনাই আমার আন্তরিক লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য অর্জনে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। প্রায় তিনটি দশক যাবত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কিত সামগ্রিক ঘটনাবলীতে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এতই প্রবল ও ব্যাপক যে, তাঁর সমগ্র জীবনালেখ্য বর্ণনায়, তথ্যগত ত্রুটি কিংবা কোন কোন তথ্যের বিচ্যুতি, আমার আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও, হয়তো বা কোথাও ঘটে থাকতে পারে—সেটা অস্বাভাবিক নয়। তেমন ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা অনুল্লেখন, যদিও বা কোথাও আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে হয়ে থাকে, সুধী পাঠক তা' ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আমি আশা করি। কোন সহৃদয় তথ্য-সচেতন ব্যক্তি এ-ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করলে আমি বাধিত হব।

আমার এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অনুলিপিতে সাহায্য করেছে আমার কয়েকজন স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র। তাদের মধ্যে জিল্লুর রহমান, মঞ্জুর মুর্শেদ, মোশাররফ হোসেন, জাকিউল হক এবং সুকুমার বিশ্বাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমার প্রাক্তন ছাত্র আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থটির নির্ঘণ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে সাহায্য ক'রে আমার পরিশ্রম লাঘব করেছে। এদের সবার ঋণ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১৭ই মার্চ, ১৯৭১

মযহারুল ইসলাম

সূচীপত্র

মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা ১৪৫-১৪৬ পুনরায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন ১৪৬ শেখ মুজিবের মুক্তি ১৪৬-১৪৭ কেন পূর্ববঙ্গের অটোনমি চাই ১৪৭-১৪৯ কেন্দ্রীয় সরকারের সিনিয়র গেজেটেড পোস্ট ১৪৯-১৫০ শিক্ষাক্ষেত্রে এবং মেডিকেল গঠনেও পূর্ববঙ্গের অবস্থা একই রকম শোচনীয় ১৫০ আঞ্চলিক বৈষম্য ১৫১-১৫৪ কেন্দ্রে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ১৫৪-১৫৬ মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভা বাতিল ১৫৬ প্রেস বিজ্ঞপ্তি ১৫৬ গুণময় মন্ত্রিসভা : সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ১৫৬-১৫৮ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র ১৫৮-১৬০ শেরে বাংলা পূর্ব বাংলার গভর্নর ১৬০-১৬১ চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রিত্ব ১৬১-১৬২ পূর্ব বাংলায় খাদ্য-ঘাটতি ও শেখ মুজিব ১৬২ ভুখা মিছিল ১৬৩-১৬৪ আইন সভার অধিবেশন ১৬৪-১৬৫ আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন ১৬৫-১৬৬ আবু হোসেন সরকারের পদত্যাগ : আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা গঠন ১৬৬-১৬৭ শোক মিছিল ১৬৭ আতাউর রহমান খানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ ও নয়া মন্ত্রিসভা গঠন ১৬৮ শেখ মুজিবের পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ১৬৮ মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিব ১৬৮-১৬৯ শেখ মুজিবের চীন ও রাশিয়া সফর ১৬৯ সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রিত্ব ১৭০ পল্টন ময়দানে জনসভা ১৭০ সোহরাওয়ার্দী-ভাসানীর বিরোধ ১৭০-১৭২ মওলানা ভাসানীর হুমকি ১৭২-১৭৩ কাগমারীর সম্মেলন ১৭৩-১৭৫ কাগমারী সম্মেলনের পর ১৭৫-১৭৭ ভাসানীর পদত্যাগ ও নয়া দল গঠন ১৭৮-১৮০ সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগ ১৮০ আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা বাতিল ও আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন ১৮০-১৮১ শেরে বাংলা অপসারিত ও আবু হোসেন সরকারের বিদায় ১৮১ পুনরায় আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা গঠন ১৮১ আতাউর রহমান খানের পতন ও আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন ১৮১ আবু হোসেন সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন ও তাঁর পতন ১৮২ পূর্ব বাংলায় প্রেসিডেন্ট শাসন জারী ১৮২ আতাউর রহমান খানের পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন ১৮২-১৮৩ আইন সভার অধিবেশন ১৮৩-১৮৫ আইন সভায় বিশৃঙ্খলা ১৮৫-১৮৭ ডেপুটি-স্পীকারের মৃত্যু ১৮৭-১৮৯।

সংগ্রামী জীবনের তৃতীয় অধ্যায় (১৯৫৮-১৯৬৫) ১৯০—২৬১

নুন-মন্ত্রিসভা গঠনে সংকট ১৯০-১৯১ মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে শেখ মুজিব ১৯১-১৯২ আইয়ুব খানের আবির্ভাব ১৯২-১৯৩ সামরিক আইন জারী ১৯৩ মীর্জার ভাগ্যবিপর্যয় ও আইয়ুবের ক্ষমতা দখল ১৯৪-১৯৭ শেখ মুজিবসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার ১৯৭-১৯৮ ইস্কান্দার মীর্জার মন্ত্রিসভা গঠন ১৯৮ ইস্কান্দার মীর্জার ভাগ্যবিপর্যয় ১৯৯ আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ১৯৯-২০০ মৌলিক গণতন্ত্র ২০০-২০২ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রহসন ২০২ আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ২০৩-২০৪ শেখ মুজিবের মুক্তি ২০৪-২০৫ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা ২০৫

তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে ৯১৩-৯১৫ মুজিবকে মুক্তি দাও ৯১৫-৯১৬ ক্ষমা কর এবং ভুলে যাও ৯১৬-৯১৭ একটি পাকিস্তানী আইনসম্মত মতবাদ ৯১৭-৯১৮ সাধারণ ক্ষমা নির্বাচিত নেতাদের জন্য নয় ৯১৮-৯১৯ শেখ মুজিবের সময়োচিত মুক্তি ৯১৯ পরিণাম সম্পর্কে ইয়াহিয়া খানের অজ্ঞতা ৯১৯-৯২০ মুজিব পাকিস্তানী দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জনমনের প্রতীক স্বরূপ ৯২০-৯২১।

বাংলাদেশের গণহত্যা ৯২২-৯৪৯।

মানব ইতিহাসে বাংলাদেশে গণহত্যার স্থান ৯২৫-৯২৮ জগন্নাথ হল ৯২৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যাযজ্ঞ ৯২৮-৯৩০ বাড়ডা গ্রাম ৯৩১ সুপরিকল্পিত গণহত্যার দ্বিতীয় পর্যায় ৯৩২ হত্যার বিচিত্র পদ্ধতি ৯৩২ বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণ ৯৩৩-৯৩৪ নিয়ন্ত্রিত অভিযানে বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা ৯৩৪-৯৩৫ জীবন্ত কবর ৯৩৫-৯৩৬ বাঘের খাঁচায় বাঙালী ৯৩৬ শরীর থেকে রক্ত শোষণ ক'রে হত্যা ৯৩৬ মৃত ও জীবিতদের জড়ো ক'রে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে হত্যা ৯৩৭ শরীর থেকে চামড়া তুলে এবং পুড়িয়ে হত্যা ৯৩৭ শ্বাসনালী কেটে হত্যা ৯৩৭-৯৩৮ বাঙালী মুক্তিপাগল সৈন্যদের ওপর নির্যাতন ৯৩৮-৯৩৯ গেস্টাপো পদ্ধতিতে হত্যা ৯৩৯-৯৪০ রাজাকার ৯৪০ আলবদর ও আল-শাম্‌স্‌ ৯৪০ লুন্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ ৯৪০ হিন্দু হত্যা ও বিতাড়নের লক্ষ্য ৯৪০-৯৪২ বৌদ্ধ দমন ও হত্যা ৯৪২ নির্মম পদ্ধতিতে শিশুদের নির্যাতন ও হত্যা ৯৪৩ নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা ৯৪৩-৯৪৪ পুত্রের সম্মুখে মায়ের উপর, পিতার সম্মুখে কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার ৯৪৪ গর্ভবতী মহিলার উপর নৃশংস অত্যাচার ৯৪৬ নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক পদ্ধতিতে নারী নির্যাতন ৯৪৬ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৯৪৬-৯৪৭ বুদ্ধিজীবী হত্যা ৯৪৮-৯৪৯।

রাত্রি : রক্ত : সূর্য : সম্ভাবনা

॥ এক ॥

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে রাত্রি এলো। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের সূর্য ক্রন্দনের হাহাকার ছড়িয়ে পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হ'ল। আকাশের গায়ে রক্তের দাগ। এই রক্ত আকাশ থেকে নেমে এলো বাংলার নরম মাটিতে। মাটি থেকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। সে ইতিহাস যেমন করুণ তেমনি প্রতিশ্রুতির ও প্রত্যয়ের সম্ভাবনায় ভাস্বর। রক্তস্নাত ২৫শে মার্চের রাত্রির মাধ্যমেই বাঙালীর হাজার বছরের মুক্তি-স্বপ্ন বাস্তব রূপ ধারণ করেছে---জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পশ্চিমাকাশের গায়ে লাল লাল রক্তের চিহ্ন দেখতে দেখতেই আমি সোবহানবাগ থেকে পদব্রজে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়ীতে এসে দাঁড়ালাম। তখন কয়েকজন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা গেটের সামনে একটি জীপে আসন গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আমাকে দেখেই তাদের একজন নেমে এসে চুপে চুপে বললো---'স্যার, খবর তো শুনেছেন। এবার রক্তের পিচ্ছিল পথেই আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল।' আমি তার কাঁধে হাত রেখে বললাম ---"সংগ্রামের পথ কোনদিন সহজ হতে পারে না। আর এই পিচ্ছিল পথেই আসছে মুক্তি।" তিন মাস পর এই ছাত্রনেতাদের সাথে আবার সাক্ষাৎ হয়েছিল সীমান্তের রণাঙ্গনে। আমরা সবাই তখন সৈনিক।

ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম সবাই ম্লান---সবার মুখেই হতাশার সুস্পষ্ট চিহ্ন। একমাত্র বঙ্গবন্ধুই মুখে সেনাপতির সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে

সবার সাথে আলাপ করছেন একসঙ্গে তিন চারজনকে নিয়ে ঘরের কোণায় বা পর্দার অন্তরালে চলে যাচ্ছেন এবং চুপি চুপি নির্দেশ দিচ্ছেন —'এক্ষণি চলে যাও, ঢাকা ছেড়ে নিজের এলাকায় চলে যাও—তারপর গড়ে তোল প্রতিরোধ—বাংলার মাটিকে স্বাধীন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ কর।'

সময় গড়িয়ে চলেছে। একে একে সবাই চলে যাচ্ছেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান! রাত তখন প্রায় ন'টা। তখনো ঘরে ছিলেন ফরিদপুরের ওবায়দুর রহমান, যশোরের কামরুজ্জামান, ময়মনসিংহের আবদুল মোমেন, খন্দকার মহম্মদ ইলিয়াস প্রভৃতি। আমি এবং ইলিয়াস ভাই একটি সোফায় বসে। ইলিয়াস ভাই তাঁর স্বভাব-সুলভ ভঙ্গীতে বলছেন, "ইয়াহিয়ার চেহারায় আছে নিরোর চেহারার সাক্ষাৎ প্রতিচ্ছবি। সে একটি রক্ত-পিপাসু জানোয়ার।" কথাগুলো আমি শুনেছিলাম, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করার মত মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। তাছাড়া আমার দৃষ্টি ছিল তখন শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর ওপর—আমি সর্বক্ষণ তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। তার নির্দেশে ওবায়দুর রহমান, যশোরের কামরুজ্জামান এঁরা চলে গেলেন—কিছুক্ষণ পর ইলিয়াস ভাইও বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি তখন ঘরে একা। বঙ্গবন্ধু আমার পাশে এসে বসলেন। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে ন'টা। তাঁকে তখন বেশ পরিশ্রান্ত অথচ প্রশান্ত দেখাচ্ছে। আমি সবিনয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, "সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে সংগ্রামের নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছেন"—

বঙ্গবন্ধু আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। তিনি একটু মৃদু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, সবাইকে পাঠিয়ে দিলাম, এবার আপনার পালা। এক্ষণি চলে যান—আজ রাত্রেই রাস্তা পার হতে না পারলে আর পারবেন না—রাজশাহী, পাবনা, সমগ্র উত্তর বাংলায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলুন; সংগ্রাম করুন, দেশকে জানোয়ারদের হাত থেকে মুক্ত করুন।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি, কিন্তু আপনাকে এমন নিশ্চিত বিপদের সামনে রেখে আমরা সবাই চলে যাব?"

বঙ্গবন্ধু আবেগে আমার হাত চেপে ধরলেন। বললেন, আমার জন্য ভাবতে হবে না বন্ধু! আপনি তো জানেন জীবনে কোনদিন কোনরকম

পরিস্থিতি থেকে আমি পলায়ন করি নি—পলায়ন কারে বলে আমি তা জানি না।"

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম, 'এতো ঠিক পলায়ন নয়, আত্মরক্ষা। আর আত্মরক্ষাও নয়—আপনি আমাদের প্রধান নির্দেশদাতা—আপনার নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন সফল হয়েছে—এবার শুরু হবে সংগ্রাম।"

—সে সংগ্রামের নির্দেশ আমি দিয়েছি—আমি না থাকলেও আমার নির্দেশ থাকবে, সংগ্রাম চলবে আর সে সংগ্রাম সফল হবে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—কিন্তু আপনাকে তো আমরা হারাতে পারি না।

—আমি কি এতই স্বার্থপর যে সাড়ে সাতকোটি মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে আমি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাব? তাদেরকে আগুনের মুখে রেখে আমি চলে যেতে পারি না, আমি তা পারি না।

—আপনার জীবনের মূল্য অনেক বেশী—বাঙালীর কাছে তার মূল্য অপরিসীম।

—না, তা নয়। সংগ্রাম শুরু হ'লে দেখবেন রণাঙ্গনে হাজার হাজার মুজিব তৈরী হ'য়ে গেছে। তা'ছাড়া আমি যদি এই বাড়ী থেকে সরে যাই তা'হলে ওরা যে সমগ্র ঢাকাকে ভস্মে রূপান্তরিত করবে।

—সে কথা হয়তো কিছুটা সত্য। কিন্তু আপনি বাইরে না থাকলে অন্যান্য রাষ্ট্র, বিশেষ করে ভারত আমাদের সংগ্রামে সাহায্য করবে কেন—কেন আমাদের তাঁরা অস্ত্র দেবেন, আশ্রয় দেবেন?

—আপনারা আশ্রয় পাবেন, অস্ত্রও পাবেন। সে ব্যবস্থা আমি সম্পন্ন করে রেখেছি। কিন্তু আমি নিজে যদি চলে যাই, কাল দেশ স্বাধীন হলে পর যখন বাংলার মাটিতে ফিরে আসব, আমার হাজার হাজার মা-বোন-ভাইয়েরা এসে যখন বলবে 'মুজিব, তুমি তো নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে সংগ্রাম করে জীবন রক্ষা করেছ—কিন্তু আমার স্বামী, আমার পিতামাতা, আমার ভাই, আমার বোন, এদের তুমি কি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলে, ফিরিয়ে দাও, তাদেরকে তুমি ফিরিয়ে দাও—তখন আমি তাদের কি জবাব দেব বলুন। না না, আমি পারি না। আমি যেতে পারি না। মরতে হয় মরবো। মৃত্যুকে তো কোনদিন আমি ভয় করিনি। কিন্তু I must

share the sufferings of my people along with them. I must share. I cannot leave them on the face of fire. I can not. আমি পারি না।

আবেগে বঙ্গবন্ধু শেষের কথাগুলো ইংরেজীতেই বললেন। এরপর কিছুক্ষণ আমরা আর কোন কথা বলতে পারি নি। নীরবতা ভেঙে বঙ্গবন্ধু এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনি তা'হলে আসুন। যদি বেঁচে থাকি তবে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে আবার দেখা হবে।

দু'জন হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় নিলাম। আমার দুই গণ্ডে উত্তপ্ত অশ্রুর স্পর্শ। মনে হ'ল যদি চিৎকার করে কাঁদতে পারতাম।

ঘরের বাইরে এসে দেখি করিডোরে উদাস নেত্রে স্থির গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বন্ধু আবদুল মোমেন। আমি তাঁকে বললাম, "বঙ্গবন্ধু কিছুতেই নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে রাজী নন। আমি ব্যর্থ হয়েছি, আপনি শেষ চেষ্টা করে দেখবেন।"

বন্ধু মোমেন আশ্বাস দিলেন। আর বন্ধুবৎসল কণ্ঠেই আমাকে সাবধানে থাকতে বললেন। কিন্তু রাত্রি চারটার দিকে জানতে পেলাম যে, কারো অনুরোধেই বঙ্গবন্ধু বাড়ী ছাড়েন নি। আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর কাছাকাছি সোবহানবাগের একটি ছোট টিনের ঘরে আত্মগোপন করেছিলাম। রাত্রি বারোটা থেকে শুরু হ'ল সেই ভয়াল ধ্বংসযজ্ঞ। সমগ্র ঢাকা জ্বলছে। চারপাশে শুধু হাহাকার আর আর্তনাদ! কয়েকজন বুলেটাহত লোক রক্তাক্ত দেহে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। শেষ রাত্রে একজন প্রৌঢ়া ঝি'র মুখে শুনলাম যে বঙ্গবন্ধুকে রাত্রি একটার দিকে বর্বর পাক সেনারা নিয়ে গেছে। স্ত্রীলোকটি আশেপাশের কোন বাড়ীতে কাজ করত. বহুকষ্টে সে সেখান থেকে পালিয়েছে—কিন্তু সে দূরে পালিয়ে থেকেই লক্ষ্য করেছে যে একটি মিলিটারী গাড়ী বঙ্গবন্ধুকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

হতাশার মধ্যেও বেদনায় মনটি সম্পূর্ণ ভেঙে যেন চুরমার হয়ে গেল। চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনেই বলে উঠলাম, 'বঙ্গবন্ধু সত্যিই তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মৃত্যুর মুখে রেখে তিনি নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারলেন না। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাগ্যে যা আছে সেই ভাগ্যকেই তিনি

বরণ করে নিলেন। তিনি জনতার নেতা, তিনি মানুষের নেতা, তিনি আপামর বাঙালীর বঙ্গবন্ধু। আগুনের মধ্যে বসেও তিনি ফুলের হাসি হাসতে জানেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সেই মৃত্যুকে তিনি অস্বীকার করতে জানেন। বাংলার ইতিহাসে তাই তিনি অমর মহানায়ক।

ভয় যাঁর ললাটে কোনদিন লিখে নাই কোন লিখন—শত ভয়াবহতার মধ্যেও যিনি দুর্জয় এবং অটল—বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী সেই অজেয় শক্তির অধিকারী বীরপুরুষের গলায়ই জয়মাল্য অর্পণ করেছেন—তাঁর হাত দিয়েই বঙ্গজননীর হাজার হাজার বছরের অভিশাপ দূরীভূত হয়েছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালীর মর্যাদা এই কারণেই তাঁর প্রাপ্য।

।। দুই ।।

না, না, এ হতে পারে না। একি শুনছি আজ এই রাষ্ট্রনায়কের মুখে? তিনি বলছেন উর্দুই হবে সমগ্র পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা! তিনি না জাতির জনক? তিনি না এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা? কি করে তিনি এমন সাংঘাতিক বাক্য উচ্চারণ করতে পারলেন? না, না, এ আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। প্রতিবাদ জানাতে হবে—প্রতিবাদ জানাবো আমরা—তিনি যিনিই হোন, তাঁর এই উক্তি নির্বিচারে আমরা মেনে নেব না—নিতে পারি না। উপস্থিত সকলের মনেই এই একই কথা। কথা মন থেকে মুখে এসে বারবার প্রকাশের দুর্বারতা খুঁজছে। সভার প্রান্তে প্রান্তে কথা গুঞ্জনের প্রবাহ সৃষ্টি করছে।

না, না, এ হতে পারে না—আমরা মানবো না—বাংলা আমাদের চাই। বিশাল জনসমুদ্রে যেন আপত্তি ও প্রতিবাদের একটি চাপা গুঞ্জন উঠলো। সমবেত কিছু কিছু চাপা প্রতিধ্বনি যেন বুদ্‌বুদের মত বাতাসে আঘাত করে বাতাসেই মিলিয়ে গেল। সে কণ্ঠস্বর নতুন প্রতিজ্ঞার সূর্যালোকে ভাস্বর।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনতা আপত্তির ঝড় না তুললেও সহসা যেন চমকে উঠলো, হতচকিত হয়ে গেল। বক্তা নিজে চমকে উঠেছিলেন কিনা জানি না—তবে তাঁর বিবেক নিশ্চয়ই চমকে উঠে থাকবে। অবশ্য যদি বিবেক বলে তাঁর কিছু থাকে।

এদিকে সভার এক প্রান্তে কিছু যুবক নিজেদের রক্তিম চোখ তুলে একে অপরের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো। তাদের দৃষ্টিতে যে বাক্য লেখা ছিল তা যেমন কঠিন তেমনি দুরন্ত। অনেকেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখছেন কারা এই অসম সাহসী যুবক? কাদের বুকে এমন হিম্মত, চোখেমুখে এমন দুর্জয় প্রতিশ্রুতি। কেউ চিনলো, কেউ চিনলো না। সহসা বিক্ষুব্ধ এই ছোট্ট অথচ প্রত্যয়ী ছাত্রদলের যিনি নেতৃত্ব দান করছিলেন অনেকেরই দৃষ্টি তাঁর দিকে। সকলের মুখে একটি উদ্বিগ্নতার ছায়া। বক্তার চোখেমুখেও কিনা তা কেউ বুঝতে পারে নি। বক্তা অর্ধ-অসুস্থ, দেহে এবং মনে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে সভার মেজাজ দেখে এবং বিশেষ করে তরুণদের চোখেমুখের হাবভাব দেখে তিনি উপলব্ধি করলেন যে সভায় অনেকেই উর্দুর ঘোষণা শুনে তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

বক্তা স্বয়ং পাকিস্তানের জাঁদরেল গভর্নর জেনারেল—বক্ষরোগের শিকার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। সেকালের কায়েদে আযম।

লক্ষ জনতা শুধু আজ তাঁকে এক নজর দেখবার জন্য দূর পথ অতিক্রম করে এখানে সমবেত। কিন্তু এ কোন্ সুরে কথা বলছেন তিনি? ইনিই কিনা জাতির জনক? এই ব্যক্তির পশ্চাতেই কি এতদিন মুক্তির অন্বেষণে কয়েক কোটি বাঙালী বজ্রমুষ্টি নিয়ে সমবেত হয়েছিল? বাংলা ভাষাকে তিনি অস্বীকার করছেন? বাঙালী জাতিকেও তিনি অস্বীকার করছেন? সবার মনেই এই প্রশ্ন। প্রশ্ন নয়, অগ্নিশিখা।

তারিখটি ছিল ১৯৪৮ সালের একুশে মার্চ! সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটা। তারিখটি পাকিস্তানের ইতিহাসে বিশ্বাসভঙ্গের সূচনার দিন। এই দিন থেকেই পূর্ব বাংলার মানুষের চিন্তা প্রবাহ নতুন পথে মোড় নিতে শুরু করলো। বাংলার সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য—এসব বিসর্জন দিলে কি নিয়ে বাঁচবো আমরা? শুরু হ'ল নতুন চেতনার।

চেতনা থেকে জন্ম নিলো নতুন পথযাত্রা। সেই যাত্রাপথ যেখানে নিয়ে এলো তার নাম বাংলাদেশ। যে দেশে দাঁড়িয়ে শুধু গাইতে ইচ্ছে করে—'আমার সোনার বাংলা—আমি তোমায় ভালবাসি।'

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্সের সভার মেজাজকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করলেন পরদিন ২৪শে মার্চ পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে। কার্জন হলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এবার তিনি দ্বিগুণ জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'

ছাত্র-সমাজ এই ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রস্তুত ছিলেন অন্যান্য-দের মধ্যে আরো একজন। ভবিষ্যতে আর একটি রাষ্ট্রে জাতির জনক হবার গৌরব তাঁর ললাটে লিখিত। তিনি তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। রেসকোর্স ময়দানে যাঁরা রক্ত চক্ষুতে দৃষ্টি বিনিময় করে মুষ্টি-বদ্ধ হাতে দাঁতে দাঁত চেপেছিলেন তিনি তাঁদেরই একজন।

কার্জন হলে প্রবেশাধিকার তাঁর ছিল না। তিনি ডিগ্রি গ্রহণকারী ছাত্রদের একজন ছিলেন না। তবু হলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে পূর্বেই কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সিদ্ধান্ত তিনি দান করেছেন। নিজে কিছুসংখ্যক ছাত্র নিয়ে বাইরে প্রতীক্ষা করছিলেন। প্রতীক্ষা কর-ছিলেন কখন ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে সমগ্র কার্জন হল হট্টগোলে ফেটে পড়বে। সত্যি সত্যি সেই স্বর্ণ মুহূর্ত এলো। যেমন ব্যবস্থা ঠিক তেমনি কাজ হয়েছে। জিন্নাহর ঘোষণার সাথে সাথে No No ধ্বনিতে প্রতিবাদ জানিয়ে উঠলেন একদল ছাত্র। এঁদের মধ্যে, কেউ কেউ বলেন, ছাত্রনেতা মতিন এবং এ. কে. এম. আহসান ছিলেন অন্যতম। সমগ্র ব্যবস্থাপনায় যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন শেখ মুজিব।

জিন্নাহ সম্বিত ফিরে পেলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর নমনীয় হয়ে এলো।

এই প্রথম স্বাধীনতার পর বাঙালীর প্রতিবাদ-চেতনা সোচ্চার ধ্বনিতে আত্মপ্রকাশ করলো। ধীরে ধীরে এই ধ্বনি রূপান্তরিত হয়েছে আন্দো-লনে, আন্দোলন সংগ্রামে, সংগ্রাম স্বাধীনতায়। আর ধাপে ধাপে সমগ্র জাতিকে জিজ্ঞাসা থেকে প্রস্তুত-পর্বে এবং প্রস্তুতি-পর্ব থেকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নিয়ে আসার পথে যিনি নেতৃত্বদান করেছিলেন তিনি শেখ

মুজিব। বাংলার প্রিয়নেতা বঙ্গবন্ধু। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মহানায়ক। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরেই বাঙালী জাতীয় চেতনাকে উজ্জীবিত করবার জন্য এবং বাঙালীর সার্বিক মুক্তির জন্য শেখ মুজিবকে দিনের পর দিন নিরলস আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছে। আর তার ফলে শাসকগোষ্ঠী বরাবর তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবেই অভিযুক্ত করে এসেছে।

আসলে এক হিসাবে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহীই ছিলেন। যে রাষ্ট্র মানুষের সকল মর্যাদাকে পদদলিত ক'রে স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনে যত্নবান, যে রাষ্ট্র জন্ম-লগ্ন থেকে একই দেশের এক অংশকে অপর অংশের দ্বারা শোষণের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল, যে রাষ্ট্রে সত্যভাষণের অধিকার পদে পদে বিঘ্নিত, তিনি সেই রাষ্ট্রের প্রশাসন-ব্যবস্থাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। আর পারছিলেন না বলেই তিনি বারবার সেই রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদে ফেটে পড়ছিলেন।

যে দেশের লোকের মুখের ভাষাকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল, যে দেশের মানুষ শাসকদের নির্যাতনে ও শোষণে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল, যে দেশের সম্পদ দেশবাসীর ভোগে না লেগে মুষ্টিমেয় মানুষের আরাম-আয়েসের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল, সেই দেশে জন্মে সে দেশের মানুষের আর্ত চীৎকারে যাঁদের প্রাণ বিগলিত হোত, তিনি আসলে তাঁদেরই একজন। দেশবাসীর নাঙ্গা ও ভুখা মূর্তি তাঁর নিকট বয়ে আনতো অসহ্য বেদনার আর্তনাদ। লাখ লাখ মানুষের এই আর্তনাদ মুখ বুঁজে সহ্য করতে না পেরেই তিনি বারবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতেন। দেশবাসীর প্রতি অসীম দয়া, স্নেহ, মায়া, মমতাই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। আর এই সম্বল নিয়েই তিনি শোষকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশবাসীর দুঃখ লাঘবের সাধনায়, তাদের স্বাধিকার অর্জনের জন্যই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে অপরিমেয় লাঞ্ছনা ও নির্যাতন।

দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে তিনি একই কথা শত সহস্রবার উচ্চারণ করে বলেছেন—'আমরা আমাদের অধিকার চাই—রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি এবং অর্থনৈতিক সমতা। আমরা

সুজলা সুফলা সোনার বাংলাকে শোষণমুক্ত করতে চাই। মায়ের মতই প্রিয় আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ. আর বাংলাভাষা মায়ের মুখের ভাষা। এ ভাষায় কথা বলবার অধিকার চাই। এ ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা চাই।'

অধিকার তিনি আদায় করে ছেড়েছেন। শুধু মুখের ভাষা প্রকাশের অধিকারই নয়—একটা গোটা জাতিকে তিনি মুক্ত করেছেন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের নাগপাশ থেকে। বিশ্বের মানচিত্রে এক পুরানো ভূখণ্ডকে নতুন রঙ-এ রঞ্জিত করেছেন তিনি। চিরবঞ্চিত ভূখণ্ড বাংলাদেশ আজ স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। বাঙালীর হাজার বছরের সাধনা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে, লক্ষ মানুষের সুদীর্ঘকালের চেতনা একটি মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এসে আত্মস্থ হয়েছে. আর সেই আত্মস্থ সাধনা ও রক্তিম ত্যাগের ফসল হ'ল বাংলাদেশ। এ যেন এক মহাকবির রক্তাক্ষরে লিখিত একটি জীবন্ত মহাকাব্য।

শেখ মুজিবের বিদ্রোহী সত্তার উন্মেষ কোন আকস্মিক ঘটনার ফলশ্রুতি নয়। তিনি জাত-বিদ্রোহী। যেদিন প্রথম এই মাটিতে তাঁর আগমন ঘটে, সেদিন বাংলার আকাশে-বাতাসে অসন্তোষের বীজ উপ্ত হয়েছিল। বাংলার মানুষের চোখেমুখে বিদ্রোহের অগ্নি সংগুপ্ত ছিল। দেশের একটা দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে এই প্রধূমায়িত বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি। বিদ্রোহী চেতনা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁর ভেতরে প্রকাশমান। তাঁর এই বিদ্রোহী সত্তার একটি স্বতন্ত্র রূপ ছিল, ছিল স্বতন্ত্র নির্যাস। তাঁর বিদ্রোহের মধ্যে হঠকারিতা নেই, নেই ধ্বংসাত্মক মনোভাবের কোন প্রতিফলন। বুদ্ধদেব, গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে বিদ্রোহ করে গিয়েছিলেন সেই ঐতিহ্যই শেখ মুজিবের বিদ্রোহী সত্তায় লালিত।

অসহযোগ আন্দোলনই হচ্ছে শেখ মুজিবের বিদ্রোহী সত্তার প্রধান অস্ত্র। তিনি সকল সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন। বস্তুত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের তিনি এক সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। বাংলাদেশের মাটি থেকে ধর্মান্ধতার বিষ অপসারিত করে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তিনি এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব।

একদা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের শাসননীতির যাঁতাকলে বাংলা-

দেশের মানুষ নিষ্পেষিত হয়েছিল। নির্যাতন আর অত্যাচার ছিল জনগণের দোসর। একদিন এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলায় সোনার ফসল ফলতো। কবির উক্তি 'গোয়ালভরা গরু আর গোলাভরা ধান' নিছক কল্পনা নয়। তখন গৃহস্থের ঘরে ঘরে বসত আনন্দ উৎসবের মেলা। পায়েস, পুলি, পিঠা আর নবান্নের সপ্ত ব্যঞ্জনে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতো। সেই বাংলাদেশ আর বাঙালী জাতি শোষণ ও নির্যাতনে আজ নিঃস্ব। বাংলার আনাচে-কানাচে অভাব-অভিযোগ, অনশন, মৃত্যু ও হাহাকারের ছায়া।

ব্রিটিশ সরকারের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি "পাকিস্তান" নামে একটি দেশের জন্ম হ'ল. আর এই জন্মলগ্ন থেকেই বাঙালী জাতির ভাগ্যে নেমে এলো অমানিশার খড়্গ-কৃপাণ। জঙ্গীশাহী পশ্চিমাগোষ্ঠীর শোষণে পূর্ব বাংলা অন্তঃসার-শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বাঙালী তার নিত্যনৈমিত্তিক অর্ধাহার, অনশনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে লাগলো। এদেশের সঞ্চিত সম্পদ চ'লে যেতে শুরু করলো পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে বাঙালীর কণ্ঠস্বর চিরতরে রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র চললো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা এদেশ গড়েছিলো তারা হ'ল বঞ্চিত। রোগে, শোকে, বন্যায়, অনাহারে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। স্বাধীন পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার চারিদিকে শুরু হ'ল আবার হাহাকার, ক্রন্দন ও হা-হুতাশ। এই অবস্থা থেকে বাঙালী জাতিকে উদ্ধার করবার জন্য সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে নিরলসভাবে সংগ্রাম করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর এই সুদীর্ঘ সংগ্রামের ভেতর হিংসা নয়, অহিংসার জ্যোতিই আমরা বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি তাঁর এই সংগ্রাম শোষণের বিরুদ্ধে, জালিমের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে। মোট কথা জাতিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁর এই সংগ্রাম। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে সর্বপ্রকার শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন ছিল তাঁর আশৈশব। যেদিন থেকে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন

থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে একটি অশুভ লগ্নে এদেশের জন্ম, আর এর পরিণাম হিসাবে একদিন বাঙালী জাতির ওপর নেমে আসবে এক বিপর্যয়। সেদিন বাঙালী জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করাই হবে দুরূহ। পাকিস্তান সৃষ্টির পশ্চাতে তাঁর বলিষ্ঠ সমর্থন ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় আমরা পাই তাঁর ছাত্রজীবন থেকে। ইংরেজদের শাসন ও শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর কৈশোরোত্তীর্ণ জীবনের এক মহান প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু এর চাইতেও একটা বিরাট পরিকল্পনা সেদিন থেকেই তাঁর অন্তরে লুকিয়ে ছিল। সে হ'ল বাংলাদেশকে শোষণমুক্ত করা। সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে নিজের ভেতরে তিনি এই পরিকল্পনা লালন করেছেন এবং তার বাস্তবায়নে তিনি তাঁর জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনকে নিত্য সঙ্গী হিসাবেই গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু কোনদিন তিনি সংগ্রাম ও সংগ্রামী-চেতনা থেকে দূরে থাকতে পারেননি। শেখ মুজিবের জীবন-কাহিনী সংগ্রামময় ইতিহাসে সমৃদ্ধ। সেই ইতিহাসকে আবার কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সামগ্রিক জীবন বিশ্লেষণ করে আমি তাঁর সংগ্রামী জীবনের পর্যায়কে মোটামুটি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায় (১৯২০—১৯৪৭) ঃ জন্ম থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় (১৯৪৮—১৯৫৮) ঃ পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে প্রথম সামরিক শাসন জারীর পূর্বকাল পর্যন্ত।

তৃতীয় অধ্যায় (১৯৫৮—১৯৬৫) ঃ প্রথম সামরিক শাসন জারীর পর থেকে পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত।

চতুর্থ অধ্যায় (১৯৬৫—১৯৬৯) ঃ পাক-ভারত যুদ্ধের পরবর্তীকাল, ছয়দফা, ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা ও গণ-অভ্যুত্থান, দ্বিতীয় সামরিক শাসন।

পঞ্চম অধ্যায় (১৯৬৯—১৯৭১) ঃ ইয়াহিয়ার শাসনামল ঃ নির্বাচনের প্রস্তুতি, প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়, নির্বাচন, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণহত্যা, বিশ্ববিবেক ও শেখ মুজিব, স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন।

সংগ্রামী জীবনের প্রথম অধ্যায়

(১৯২০-১৯৪৭)

তখন ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বেশ দানা বেধে উঠেছে। এদেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কোন না কোন ভাবে সে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। বাঙালী সমাজও সেদিক থেকে পশ্চাতে ছিল না। বরং সমগ্র বৃটিশ-ভারতে বাঙালীর ভূমিকা ছিল স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অগ্রণী। দেশের এই সংক্ষুব্ধ পরিবেশে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মার্চ ঢাকা শহর থেকে মাত্র ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বেগম সাহেরা খাতুনের গর্ভে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জন্ম

তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান সিভিল কোর্টের একজন সেরেস্তাদার। তাঁর অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। জোত সম্পত্তি ভালই ছিল। নিজস্ব বাড়ীতে গোলাঘরে যে ধান উঠতো তা দিয়ে সারা বছর বেশ স্বচ্ছন্দেই কেটে যেত। তিনি অসাধারণ কোন পরিবারের সন্তান নন—আবার সে পরিবারকে একেবারেই সাধারণ দীনহীন কোন পরিবারও বলা যায় না। তাঁর জন্ম-সময়ে তাঁদের পরিবারের যে অবস্থা ছিল বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এই ধরনের পরিবারের সংখ্যা কম ছিল না। আজো নেই।

পারিবারিক পরিচয়

শেখ মুজিব পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। দুটো কন্যা সন্তানের পর শেখ মুজিবকে পুত্ররূপে পাওয়ায় স্বভাবতঃই তার প্রতি বাবা-মা'র আদর ও স্নেহের মাত্রা একটু বেশী হয়ে যায়। মুজিবকে ঘিরেই তাঁদের স্বপ্ন-কুসুম রচিত হচ্ছিল। পিতা চাইলেন শেখ মুজিবকে আইনজীবী রূপে গড়ে তুলতে। তিনি নিজে সরকারী চাকুরে ছিলেন। বিদেশী সরকারের অধীনে চাকুরী করতে গিয়ে গোলামী জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণায় তিনি দগ্ধীভূত হচ্ছিলেন। বিবেকের দংশন তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না বলেই পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে এই নতুন বাসনায় উদ্বুদ্ধ তিনি। অবশ্য আর দশজন পেশাদার আইনজীবীর মত মুজিবকে তিনি দেখতে চান নি! যে গোলামীর শৃঙ্খল তাঁর জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তিনি তার আবেষ্টনী থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। সে মুক্তি শুধু নিজের জন্যই নয়, সারা ভারতবর্ষের মানুষ যাতে তার আস্বাদ অনুভব করতে পারে সে আকাঙ্ক্ষাও তিনি মনে মনে পোষণ করতেন।

সেজন্যই তিনি চাইলেন মুজিব যেন আইনজীবীর মত একটা স্বাধীন ব্যবসায় নিয়োজিত থেকেই দেশ ও দশের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন। নিজে যা পারেন নি—যা পারা সম্ভব হয়নি মুজিবকে দিয়ে তিনি তা' চরিতার্থ করতে চান।

পিতার আকাঙ্ক্ষা

পিতার এই মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় পুত্রের প্রতি তাঁর অবাধ স্বাধীনতা প্রদানের অভিপ্রায় থেকেই। শৈশবেই মুজিব ছিলেন যেমন দুর্বার, তেমনি ছিলেন দুর্ধর্ষ। তাঁর হৃদয়ে সব সময় একটা বিক্ষোভ দানা বেঁধে থাকতো। স্কুল জীবনেই এক দুঃসাহসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর সে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৯৩৯ সাল। তিনি তখন গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। সে সময় শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেব স্কুল পরিদর্শনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। নেতাকে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা জানাতে হবে। প্রথমদিকে কংগ্রেসের সমর্থকগণ এতে সম্মত হন। কিন্তু পরে তাঁরা বেঁকে বসলেন এবং ঐ সম্বর্ধনা প্রদান থেকে তাঁরা বিরত থাকেন ও বাধার সৃষ্টি করেন। যাহোক, নেতাকে যথারীতি সম্বর্ধনা জানানো হ'ল। হক সাহেব চলে

কৈশোর জীবনের দুঃসাহসিকতা



মা ও আব্বার সাথে বঙ্গবন্ধু

যাবার পর এই ব্যাপারে মন কষাকষি, বচসা ও কথা কাটাকাটি চলতে থাকে এবং একটি ছোটখাট গোলমাল বেঁধে যায়। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সম্বর্ধনা প্রদানের স্বপক্ষে। তিনি তাঁর প্রচেষ্টা ও যত্ন দ্বারা কংগ্রেস ও ফজলুল হক সমর্থকদের মধ্যে একটা সমঝোতার চেষ্টা করেন। কেননা তিনি শৈশব থেকেই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন আদর্শবাদী যুবক।

তাঁর চেষ্টা সফল হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই এক চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে পুলিশ কর্তৃক সাত দিনের জন্য কারাগারে আবদ্ধ হন। এই প্রথম তিনি সাম্রাজ্যবাদ শক্তির শিকারে পরিণত হন। এই হ'ল তাঁর কারাগার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। এই প্রথম জেলের স্বাদ পেলেন মুজিব। পেলেন এক নতুন জীবনের ইঙ্গিত। স্পন্দিত হ'ল তাঁর সারা অন্তর। শুরু হ'ল সংগ্রামী জীবনের প্রথম অধ্যায়। পিতা এতে ক্ষুব্ধ হন নি। বরং ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাম করার জন্য তিনি সব সময়ই উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। কেননা, তিনি জানতেন দেশকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হ'লে রাজনীতিকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে। আর পরাধীন দেশে রাজনীতি করতে গেলে জেলখানাকে দ্বিতীয় বাড়ী বলে মনে করতে হবে। ব্রিটিশ-ভারতে এছাড়া উপায় ছিল না।

প্রথম কারাবরণ

শেখ মুজিব প্রথম রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট থেকে। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মুজিবের সাক্ষাৎকারও তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ফলশ্রুতি। তখন তিনি মিশন স্কুলেরই ছাত্র। শেরে বাংলা ফজলুল হক তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তিনি এবং তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম সহকর্মী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একবার গোপালগঞ্জের সেই মিশন স্কুলটি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন অগ্রতোরণ পার হয়ে স্কুলের দিকে পা বাড়িয়েছেন ঠিক সে সময় একটা লিকলিকে ছেলে এসে অকস্মাৎ তাঁদের গতিপথে বাধা দিয়ে বললো: 'আপনারা স্কুলে যেতে পারবেন না'। সবাই অবাক হ'ল। স্কুল কর্তৃপক্ষ ছেলেটিকে ভাল করেই চিনতেন। স্কুলের হেড-মাস্টার তাড়াতাড়ি এসে তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করতেই মন্ত্রীদ্বয় হাত দিয়ে

রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ

তাঁকে থামিয়ে ছেলেটিকে তার বক্তব্য বলার জন্য সুযোগ দিতে বল্লেন। ছেলেটি একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। সে তার পরিচয় দিয়ে দৃপ্ত-ভঙ্গিতে বল্লোঃ 'স্যার, আমাদের স্কুলের বোর্ডিং নষ্ট হয়ে গেছে। বৃষ্টি হলেই ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। ওটা আমরা ঠিক করে নিতে চাই।' ছেলেটির বলার ভঙ্গিতে যে ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছিল মন্ত্রীদ্বয় তা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেনঃ "আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার দাবী পূরণ করা হবে।"

শহীদ সাহেব এই দৃপ্ত কিশোরের ছবিখানা ভুলতে পারেননি। তিনি তাকে নিভৃতে ডেকে তাঁর সঙ্গে ডাক-বাংলায় দেখা করার জন্য বল্লেন।

হক-সোহরাওয়ার্দীর সাথে পরিচয়

নির্দিষ্ট সময়ে ছেলেটি শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলো। দীক্ষা নিল এক নতুন জীবনের। সে জীবনের নাম সংগ্রাম। বলা বাহুল্য, সংগ্রামী জীবনের নব-দীক্ষিত সেই কিশোর ছেলেটিই শেখ মুজিব। সোহ্‌রাওয়ার্দী তাই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষাগুরু।

তখন ভারতবর্ষের দেশীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরোধ চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। ইংরেজরা তাঁদের উদ্দেশ্য সফলে উৎফুল্ল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর বৃটিশ সরকার স্বভাবতঃই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হলে তাঁরা কিছুটা আশার আলো দেখতে পান। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের জনগণের মধ্যে সাম্প্র-

মুসলিম লীগের জন্ম

দায়িক বিভেদ বাঁচিয়ে রেখে শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা। কংগ্রেসকে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্থা আখ্যা দিয়ে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুরের নেতৃত্বে মুসলমান-দের স্বার্থ রক্ষার জন্য আলাদা রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। তবু ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই দুই দলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির অবকাশ তেমন গুরুতরভাবে দেখা যায়নি। বরং ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের দিকে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে মুসলিম সমাজ ও কংগ্রেস উভয় দলই সম্প্রীতি বজায় রেখেই কাজ করে চলছিল। এমনকি মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী এই দুই ভাই সেনাবাহিনীকে রাজ-নৈতিক অনুপ্রেরণা দান করতে গিয়ে ছয় বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯২১ সালে 'স্বরাজ' কথাটিকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র অর্থে ব্যবহারের জন্য খেলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দাবী জানালেন এবং এর ফলে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন্দল শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধী এই দাবী মানতে রাজী হন নি। পরে চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দু নেতাও সেই একই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে যান।

১৯২৫ সালের দিকে মুসলিম বিরোধিতা চরমে ওঠে। এ সময় লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে শুধুমাত্র মুসলমানদের বিরোধিতা করবার জন্যই হিন্দু মহাসভা গঠিত হয়। ইংরেজ সরকার এই বিরোধ জিইয়ে রাখার জন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নানাভাবে প্ররোচিত করেছেন। অবশ্য ১৯২৮ সালে এক সর্বদলীয় সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে এক করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সে প্রয়াস সফলকাম হয় নি।

হিন্দু মহাসভা

এই বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ প্রাদেশিক বিধান সভাগুলোতে মন্ত্রিসভা গঠনে ও আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে একটি বোঝাপড়ায় আসতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন জানান—কংগ্রেস তা' সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন। এ সময় অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের জানুয়ারীতে জিন্নাহ্‌র নিকট এক পত্রে শ্রীযুক্ত জওয়াহেরলাল নেহেরু লিখেছিলেন ঃ "বর্তমান পরিস্থিতি পর্যন্ত বিশেষভাবে পর্যালোচনা ক'রে দেখা যায় যে, আজ ভারতবর্ষে কেবল দু'টো শক্তিই আছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং কংগ্রেস—যে দল কিনা সারা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করছে...মুসলিম লীগ কেবলমাত্র একদল মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সবাই গণ্যমান্য লোক। কিন্তু তাঁদের কার্যক্ষেত্র উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তাঁদের সঙ্গে মুসলমান জনসাধারণের কোন যোগাযোগ নেই এবং নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ খুবই সীমিত।"

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কোন্দল

[আমি মুজিব বলছি ঃ কৃত্তিবাস ওঝা, পৃঃ ১৪২]

শ্রী নেহেরুর চিঠির শেষোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের কার্যক্ষেত্র শুধুমাত্র উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ নেই। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের শ্রেণী-চরিত্র এবং উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলেই এ সত্য ধরা পড়ে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিজয়ের বহু পূর্বে থেকেই এদেশে মুসলমান সম্প্রদায় প্রধানতঃ দু'টো শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—কৃষক ও অভিজাত। অভিজাত

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের শ্রেণী-চরিত্র

শ্রেণীর লোকেরাই দেশের শাসন-ব্যবস্থার যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত মুসলমান কর্মচারীদেরকে সরিয়ে নিজ দেশীয় লোকদের বহাল করতে থাকে। এর অন্যতম কারণ ছিল এই যে, মুসলমান শাসনকর্তার কাছ থেকে অবৈধভাবে ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য ইংরেজরা তাদেরকে প্রথম থেকেই অবিশ্বাসের চোখে দেখতে থাকেন। এই সুযোগে হিন্দুরা আস্তে আস্তে ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন এবং চাকুরী ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা অর্জন করতে থাকেন।

ব্রিটিশ বণিকেরা এ দেশ থেকে অতিরিক্ত উৎপাদন দ্রব্য চুষে নেবার সহজ পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য কলকারখানা বসাতে থাকে। এর ফলে ধীরে ধীরে গ্রাম্যশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে গড়ে উঠতে থাকে বড় বড় শহর। হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজদের সেই উৎপাদনের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে এবং নিজেরাও প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হতে থাকেন। কালক্রমে এঁরাই ধীরে ধীরে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে রূপান্তর লাভ করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই কালক্রমে সৃষ্টি হয় জমিদার, মহাজন ও ধনিক শ্রেণীর। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে অনেক মুসলমান জমিদার উক্ত আইনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারায় জমিদারী হারান। ইংরেজের বিশ্বস্ত অনেক অর্থশালী হিন্দু ঐ সকল জমিদারী হস্তগত করেন।

এমনিতেই এই সমস্ত কারণে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় ইংরেজদের সম্পর্কে খুবই বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন—তদুপরি ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক শিক্ষা ও সরকারী কাজকর্মের মাধ্যম হিসেবে ফার্সীর বদলে ইংরেজী ভাষা চালু করায় তাঁরা আরো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁরা সর্বক্ষেত্রেই ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকেন। এর ফল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য কোনক্রমেই শুভ হয় নি। হিন্দুরা এটাকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ ফার্সী এবং ইংরেজী উভয় ভাষাই তাঁদের কাছে ছিল বিদেশী। ফার্সীকে তাঁরা উচ্চমধ্যবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাষা বলে মনে করতেন। পক্ষান্তরে, ইংরেজী ভাষা প্রচলনের ফলে তাঁদের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলেই সেটাকে তাঁরা স্বাগত জানাতে থাকেন।

উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অপরিণামদর্শিতার দরুন সাধারণ মুসলমানদের দুর্দশার কথা চিন্তা ক'রে স্যার সৈয়দ আহমদ সর্বপ্রথম তাঁদের ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে প্রচার অভিযান শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে আলীগড় মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন, যা পরবর্তী-কালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, যাতে করে তাঁরাও দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তাঁর আরো উদ্দেশ্য ছিল— মুসলমানদেরকে যেন হিন্দুদের কর্তৃত্বের অধীন হয়ে না থাকতে হয় তার জন্য নিজেদেরকে প্রভাবশালীরূপে গড়ে তোলা।

স্যার সৈয়দ আহমদ

কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি। কারণ তাঁর মৃত্যুর পর উচ্চমধ্যবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে নিজেদেরকে এক করে দেখতে পারেন নি। এঁরা সাধারণ মুসলমানদেরকে হিন্দুদের পর্যায়ে ফেলে তাঁদেরকে বাংলাভাষা শিক্ষার উপদেশ দেন এবং উর্দুকে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন।

পক্ষান্তরে ইংরেজদের সংস্পর্শে যাওয়ার দরুন যে হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, তাঁরা বিভিন্ন শ্রেণীর সংমিশ্রণজাত বিধায় তাঁদের মধ্যে তেমন কোন বৈষম্য ছিল না। অবশ্য উচ্চমধ্যবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক মনোভাব থাকলেও একটা বিষয়ে তাঁরা সব সময়ই

সজাগ ছিলেন—তা হ'ল হিন্দু আধিপত্য যেন তাঁদেরকে স্বীকার না করতে হয়। আর এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তাঁরা প্রথমতঃ মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করতে প্রয়াস পান। এর অস্ত্র হিসেবে তাঁরা ধর্মকে বিশেষভাবে ব্যবহার করেন। ঠিক এই একই উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মুসলিম লীগ মূলতঃ কংগ্রেসের বিরোধী দল হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথমদিকে কংগ্রেস হিন্দু সম্প্রদায়ের একক প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীর কিছু অংশ স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে এই দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এটি একটি উদারনীতিভিত্তিক রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। মুসলমান উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল পুরোপুরি রক্ষণশীল। এই শ্রেণীর লোকেরা কংগ্রেসের উদারনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রথমদিকে গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত তা' সহ্য করতে পারেন নি। মুসলিম সম্প্রদায় ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে কংগ্রেস প্রায় হিন্দু সম্প্রদায়ের একক দল হিসেবে পরিচিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসে যোগ দিলে তাঁর নেতৃত্বে এই দল একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা দেয়। তিনি প্রচার করেন যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক, কেবল পথ ভিন্ন। তা'ছাড়া তুরস্কের খেলাফত আন্দোলনকে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন জানালে অনেক মুসলমান বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অনেক মুসলমান নেতৃবৃন্দ গান্ধীজি কর্তৃক আহূত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস

কিন্তু খেলাফত আন্দোলন নানা কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে ভারতীয় মুসলমানেরা এক গভীর হতাশার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিও তাঁদের আকর্ষণ ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকে। ফলে কংগ্রেস আবার হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিভাত হতে শুরু করে। বিত্তবান মুসলিম সম্প্রদায়েরা এবার মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করার কাজে উঠে পড়ে লাগেন এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকেন। এর আগে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে মুসলমান সম্প্রদায় তাঁদের

জন্য আলাদা নির্বাচনী এলাকা ও প্রার্থী পদের স্বীকৃতি লাভ করেন।

এখানে স্মর্তব্য যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার এক বৎসর আগে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে হিন্দু ও মুসলিম প্রধান অঞ্চল বৈশিষ্ট্যে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য, এর পেছনে কার্জন সরকারের যে উদ্দেশ্য কার্যকরী ছিল তা' হ'ল এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরশত্রুতা জাগ্রত রেখে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী করা। স্বাভাবিকভাবেই বিত্তবান মুসলমান সম্প্রদায় এই উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের এই উদ্দেশ্য বেশীদিন স্থায়িত্ব লাভ করে নি। প্রবল আন্দোলনের জোয়ারে উভয় বাংলার মাঝখানের বাঁধ আবার ধ্বসে গিয়ে একাকার হয়ে যায়।

বঙ্গ ভঙ্গ

পরবর্তীকালে নির্বাচন উপলক্ষে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য প্রচার অভিযান শুরু করেন। এই প্রচার অভিযানে তাঁরা ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। এই সঙ্গে আরও একটা বিষয়ে তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়কে উপলব্ধি করাতে সমর্থ হন যে, মুসলিম লীগ সকল শ্রেণীর মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করবেন। শতাব্দী ধরে বাঙালী মুসলমানগণ হিন্দু জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন—তা'ছাড়া চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা থেকেও তাঁরা বহুলাংশে বঞ্চিত ছিলেন। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ বাঙালী মুসলমানদের এই দুর্বলতাকেও তাঁদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে তৎপর হন। কিন্তু কোন কোন বাঙালী মুসলমানের নিকট মুসলিম লীগের প্রকৃত উদ্দেশ্য অজ্ঞাত ছিল না। তাঁরা স্পষ্টতঃ জানতেন, মুসলিম লীগ ক্ষমতায় গেলে বাংলার কৃষক বা মেহনতী শ্রেণীর কোন স্বার্থসিদ্ধি হবে না। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যাবলীর প্রতিও অনেক হিন্দু নেতা আস্থা রাখতে পারেন নি। তাই কেউ কেউ দল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এঁদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ বোস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মুসলমান নেতাদের মধ্যে শেরে বাংলা ফজলুল হকই প্রথম বাঙালী যিনি স্পষ্টভাবে কৃষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তিনি 'কৃষক প্রজা পার্টি' নামে আলাদা একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা ক'রে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে বাংলাদেশের

কৃষক প্রজাদেরকে বৃহৎ জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন।

এই আন্দোলনের পটভূমিকায় ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি ও তাঁর দল অংশ গ্রহণ করেন। এই নির্বাচনে কোন দলই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে নি। তবু মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষরফা করে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভার মধ্যে মুসলিম লীগের সদস্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও ছিলেন।

১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা

বলা বাহুল্য, সোহরাওয়ার্দীর কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর শেখ মুজিবও স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগের অন্যতম কর্মী হিসেবে আস্তে আস্তে নিজেকে নিয়োজিত করতে থাকেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা উচিত যে, মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে শহীদ সোহরাওয়ার্দীই একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক হয়েও সাধারণ বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পেরেছিলেন। এই জন্যই বাঙালী সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। তা'ছাড়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে তাঁর বিশ্বাস মোটেই ছিল না। সোহরাওয়ার্দী শ্রেণী-মর্যাদা ভুলে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছিলেন বলে মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁকে কোনদিনই সুনজরে দেখেন নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সোহরাওয়ার্দীর প্রতি তাঁদের বিরূপ আচরণই তা' প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে। পাকিস্তানের প্রাথমিক পর্বে সোহরাওয়ার্দীর কোন স্থানই হ'ল না এবং তাঁকে দীর্ঘদিন ভারতেই থেকে যেতে হয়েছিল।

ছাত্রাবস্থাতেই যে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় তা' আগেই বলেছি। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি শিক্ষা-জীবন শুরু করেন গোপালগঞ্জের পাবলিক স্কুলে। পরে মিশন স্কুলে ভর্তি হন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই পড়াশুনো করেন। মাঝখানে, ১৯৩৪ সালে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালীন মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে বেরীবেরী জাতীয় এক আকস্মিক ব্যাধির ফলে তাঁর চোখ অপারেশন করতে হয়—যার দরুন তিন বছর স্কুলে না গিয়ে তিনি বাড়ীতে বসে পড়াশুনো করেন।

শেখ মুজিবের স্কুল-জীবন

তিন বছর পর ১৭ বছর বয়সে তিনি আবার সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৪২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইতিমধ্যে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় তাঁর আত্মীয়া ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর স্ত্রীর বয়স তখন মাত্র তিন বছর। শেখ মুজিবের অধিকাংশ জীবনীকার তাঁর বিয়ের সময় সম্পর্কে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এক সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন যে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় তিনি বিয়ে করেন।

বিবাহ

সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের পর শেখ মুজিব প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি অল্ ইণ্ডিয়া মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন ও বাংলা মুসলিম লীগের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। তা'ছাড়া এ সময়ই তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারীও নির্বাচিত হন। স্পষ্টবাদী, সাহসী ও উদ্যমী কর্মী হিসেবে শেখ মুজিব সে সময় থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন।

প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ

১৯৪০ সাল ভারত উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ কাল। এতদিন ধরে যে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য আলাদা প্রদেশ গঠনের দাবীর পাঁয়তারা করে আসছিল, ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চে লাহোর অধিবেশনে তা' সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই অধিবেশনে পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করা হয়—যার অন্তর্ভুক্ত হবে মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলো। সভায় পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অধিবেশনে পরিশেষে প্রস্তাবটি পাশ হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, ভৌগোলিক সংলগ্ন প্রদেশগুলোকে আবশ্যক মত পুনর্গঠন করা হোক এবং যে সকল অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাধিক্য সেই সকল অঞ্চলকে—যথা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ ও পূর্বাঞ্চল একত্র ক'রে মুসলিম জাতির আবাস-ভূমির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করা হোক, এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলো স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র হিসাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে।

লাহোর অধিবেশন

পাকিস্তান ও ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে উভয় দেশের শাসনতন্ত্রে উপযুক্ত কার্যকরী ও বাধ্যতামূলক রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই লাহোর প্রস্তাব মূলতঃ মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। মিঃ জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্ব ব্যাখ্যাকে সামনে রেখেই এই প্রস্তাবটি করা হয়েছিল। এখানে বলে রাখা ভাল যে, মুসলিম লীগের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বহুদিন আগে থেকেই মুসলমানদেরকে একটি আলাদা জাতি হিসাবে ঘোষণা করে আসছিলেন। তিনি তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ "হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ দুই স্বতন্ত্র ধর্ম, দর্শন, সামাজিক সংস্কার ও সাহিত্য থেকে উদ্ভূত।—এমনকি হিন্দু ও মুসলমানগণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইতিহাসের ধারা থেকে তাঁদের অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকেন।"

লাহোর অধিবেশনে তাঁর এই ব্যাখ্যা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়। শুধু তাই নয়, এ সময় মিঃ জিন্নাহ্ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। এর ফলাফল অবশ্যই সুখকর হয় নি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিরোধ এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে, বিভিন্ন প্রদেশে পর পর কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও সংঘটিত হ'ল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। গোটা ভারতবর্ষও আস্তে আস্তে সেই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজ সরকার তাঁদেরকে অর্থাৎ মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে ভারতবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু কোন দল থেকেই স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কোন প্রকার সাহায্য প্রদানে স্বীকৃতি জানানো হয় নি।

যুদ্ধের এই সংক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ক্রীপ্‌স নামক একজন মন্ত্রীকে ভারতবর্ষে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধে যাতে ভারতীয়রা ইংরেজদের সহযোগিতা ও সাহায্য দেন তার প্রচেষ্টা চালানো। আর এর বিনিময়ে তাঁরা ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরেরও প্রস্তাব দেন। এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ঐ সালেই ক্রীপ্‌স্ কর্তৃক যে প্রস্তাবগুলো পেশ করা হয়েছিল তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

(ক) একটি নতুন ভারতীয় ইউনিয়ন ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করা হবে।

(খ) যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্র ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করা হবে এবং ব্রিটিশের নিকট থেকে ভারতীয়-দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে গণপরিষদ ও ব্রিটিশ রাজের সাথে সন্ধি স্বাক্ষরিত হবে।

(গ) যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে যদি ভারতীয় নেতাগণ নিজেদের মধ্যে কোন প্রকার সমঝোতায় পোঁছতে না পারেন, তা'হলে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন-কারী সংস্থা নিম্নরূপে গঠিত হবে : যুদ্ধ অবসানের পরে যে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তার ফল ঘোষণার পরক্ষণেই সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রাদেশিক আইন সভার নিম্ন নির্বাচক পরিষদের সদস্যগণ শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী একটি গণ-পরিষদের সদস্য সংখ্যা দলের এক-দশমাংশ হবে। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহকে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

(ঘ) সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর সমবায়ে অবিলম্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে হবে। কিন্তু দেশরক্ষা বিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের হাতেই থাকবে।

(ঙ) ইহা প্রস্তাবিত ভারত ইউনিয়ন থেকে বাইরে থাকবার অধিকার প্রদেশকে প্রদান করে এবং যে সকল প্রদেশ ইউনিয়নের বাইরে থাকবার সিদ্ধান্ত করবে, সে সকল প্রদেশ ব্রিটিশ সরকারের সাথে পৃথকভাবে সন্ধিস্থাপন করবার অধিকার ও সুযোগ লাভ করবে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক ক্রীপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই এই প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাখ্যান করেন। কংগ্রেস মনে করলেন যে এর ফলে ভারতের মুক্তি বিলম্বিত হবে। অপরপক্ষে মুসলিম লীগ দেখলেন যে যদিও পাকিস্তানের মূলনীতিকে পরোক্ষভাবে এতে স্বীকার ক'রে নেয়া হয়েছিল, তথাপি এই প্রস্তাবসমূহের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল একটি সর্বভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করা। ফলে উভয় দলের প্রত্যাখ্যানের দরুন ক্রীপ্‌স মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এই সময় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। ১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে কৃষক প্রজা পার্টি সুভাষপন্থী কংগ্রেস ও হিন্দুসভাকে নিয়ে হক সাহেব প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের চক্রান্তের ফলে ১৯৪৩ সালের ২৯শে মার্চ তাঁর মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

শেরে বাংলার মন্ত্রিসভা গঠন ও পদত্যাগ

এর একমাস পরে মুসলিম লীগ দল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মুখ্যমন্ত্রী হন স্যার নাজিমুদ্দিন। তিনি ছিলেন স্বার্থবাদী মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণীর ধ্বজাধারী। ফলে তাঁর সময় থেকে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। এই নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভার কার্যকালেই বাংলাদেশে কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তর (বাংলা সন ১৩৫০) দেখা দেয়। যে মন্বন্তরের ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ বাঙালী নিঃশেষ হয়ে যায়।

নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভা ও পঞ্চাশের মন্বন্তর

১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেলে মিত্রপক্ষের জয়লাভ হলেও ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় নেতারা ব্রিটিশদের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে কসুর করলেন না। বিশেষ করে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পূর্বের চাইতেও জোরালোভাবে স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হলেন।

যুদ্ধোত্তর পরিবেশ ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেবের কাছে স্বাধীনতার স্বীকৃতি অর্থহীন, যদি না মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র স্বীকার করে নেয়া হয়। আর এর জন্য তিনি অখণ্ড ভারতের অভিলাষী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একরূপ জেহাদ ঘোষণা করলেন।

১৯৪৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুসলিম লীগের দাবী ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে জিন্নাহ্ স্বাধীনতা অর্জনের পথ নির্দেশ করলেন ঃ

মিঃ জিন্নাহর প্রস্তাব

"আজ ভারতের রাজনীতিতে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটি মূলতঃ ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যকার ব্যাপার নয়। এই ঘটনার মূলে রয়েছে হিন্দু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দ্বন্দ্ব। কোন কিছুই সমাধান হ'তে পারে না, বা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাকিস্তানের দাবী মেনে নেয়া হচ্ছে।"

[আমি মুজিব বলছি ঃ কৃত্তিবাস ওঝা, পৃঃ ১৫৯]

তিনি আরো বললেন ঃ "একটি নয়, এখানে সংবিধান তৈরীর জন্য দু'টি আলাদা দল করতে হবে। যার একদল হিন্দুস্থানের সংবিধান রচনা করবে এবং অন্যটি করবে পাকিস্তানের জন্য।

আমরা দশ মিনিটে ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারি। মিঃ গান্ধী বলেন আমি পাকিস্তানকে স্বীকার করে নিচ্ছি। আমি স্বীকার করছি যে, ভারতবর্ষের এক-চতুর্থাংশ অধিবাসী যে ছ'টি প্রদেশে থাকে— সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলাদেশ ও আসাম —বর্তানে যে সীমারেখা আছে সেই রকম অবস্থাতেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এটা খুব সম্ভব যে, দুই দেশের অধিবাসীদের স্থানান্তর করা হবে, যদি কিনা সেটা ইচ্ছাপূর্ণ হয়। সীমানা-রেখা নির্ধারণের ব্যাপারটিও ঠিক করতে হবে। যদি এগুলো সবই হয় তবে বর্তমান প্রাদেশিক সীমারেখাকে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সীমারেখা হিসাবে মেনে নিতে হবে, আমাদের পাকিস্তানের রাষ্ট্র-কাঠামো হবে ফেডারেল ধরনের যার মধ্যে প্রতিটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন অধিকার থাকবে।"

[ঐ, পৃঃ ১৫৯—১৬০]

এর আগেই অর্থাৎ ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শেখ মুজিব উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি ইসলামিয়া কলেজে ইণ্টার-মিডিয়েট কলা বিভাগের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। তখন তিনি ধর্মতলা স্ট্রীটে বেকার হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করতে থাকেন। এই সময় কলকাতায় শুধুমাত্র কারমাইকেল এবং বেকার হোস্টেলই মুসলমানদের জন্য আবাসিক হোস্টেল ছিল। এই হোস্টেল দু'টো ছিল তৎকালীন ছাত্র রাজনীতির আখড়া—যা' সারা বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বাভাবিক-ভাবে শেখ মুজিবও এখানে এসে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। এখানে এসেই তিনি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন।

কলকাতায় শেখ মুজিবের ছাত্র-জীবন

বাঙালী যুবকের নিকট নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ এক মহান প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল।

যুদ্ধের সময় নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ক'রে জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ-ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে আক্রমণ চালানোর জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বাধীনতার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েই দেশনিবেদিতপ্রাণ এই মহান নেতা স্বয়ংক্রিয় সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শার্দুলকে যুদ্ধের সময়ের বিপর্যস্ত অবস্থায় আঘাত না হানলে দেশের স্বাধীনতা সুদীর্ঘ বিলম্বিত হবে এই ধারণার ফলেই নেতাজী অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মিত্রশক্তির জয়লাভের পর এই আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং নেতাজীর মৃত্যু ঘটে। তাঁর অনুসারীবৃন্দ ধৃত অবস্থায় দিল্লীর লালকেল্লায় আনীত হন। বিচারে তাঁদের অনেকেই মুক্তি লাভ করেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তিদের কেউ কংগ্রেসে, কেউ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। জেনারেল শাহনওয়াজ কংগ্রেসে যোগ দেন। এদিকে এই সংগ্রামের সাথেই যুক্ত নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন রশীদ আলীকে তখনো মুক্তি দেওয়া হয় নি। রশীদ আলীর মুক্তির দাবীতে কলকাতায় মিছিল হয় এবং ওয়েলিংটন স্কয়ারে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। দিনটিকে 'রশীদ আলী দিবস' বলা হয়। শেখ মুজিব উক্ত সভায় তরুণ ছাত্রনেতা হিসেবে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন অনেকের নিকটই তা' একটি উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে। শেখ মুজিবের সংগ্রামী জীবনের এই হ'ল আর একটি উদাহরণ।

সিরাজুদ্দৌলার স্মৃতির প্রতি কলঙ্ক আরোপ করে কলকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম জোরদার হবার সাথে সাথে এই মনুমেন্টটি ভেঙে ফেলার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। নেতৃত্ব দান করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ছাত্রনেতাদের মধ্যে শেখ মুজিবও এই সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু নানা কারণে সেদিন এই পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে নি। যদিও নেতাজীর সাথে শেখ সাহেবের সাক্ষাৎ ঘটে নি, কিন্তু সুভাষ বসুর দেশপ্রেম বঙ্গবন্ধুকে এক পবিত্র প্রেরণা দান করেছিল। একথা বঙ্গবন্ধু এখনো শ্রদ্ধার সাথেই স্বীকার করেন।

হলওয়েল মনুমেন্ট ভেঙে দেবার আন্দোলনেও শেখ মুজিব

ইংরেজ আমলেও শেখ মুজিবের মধ্যে জাতীয়তাবোধ প্রচণ্ড ভাবে প্রবহমান ছিল। বিদেশীর প্রতি ঘৃণা নয়, তাঁদের নীতির প্রতিই ছিল তাঁর বিতৃষ্ণা। তাঁর দেশপ্রেম ও নীতিবোধ এতো প্রবল ছিল যে, দেশ ও জাতির শত্রুকে তিনি কোন দিন ক্ষমা করতে পারেন নি—পারবেনও না। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকরা বাংলা-ভারতের ওপর যে নির্যাতন, শোষণ ও অত্যাচার অব্যাহত রেখেছিল শেখ মুজিব সে সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ-শক্তির প্রতি বিরূপ মনোভাব তাঁর আশৈশব। এ পটভূমিকায় অমিতাভবাবু তাঁর "গতিবেগ চঞ্চল বাঙলাদেশ ঃ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব" শীর্ষক পুস্তকে একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন ঃ

"১৯৪৪ সালে কলকাতায় ফরিদপুরবাসীদের একটা সংস্থা "ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাসোসিয়েশন"-এর সেক্রেটারী ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান।

শেখ মুজিবের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ

প্রেসিডেন্ট ছিলেন কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট নবাবজাদা লতিফুর রহমান। সে সময় অবিভক্ত বাংলার গভর্নর স্যার জন হারবার্টের মৃত্যুর পর নতুন গভর্নর হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার আর. জি. কেসি। একদিন নবাবজাদা শেখ মুজিবকে ডেকে বললেন—"আমাদের এ্যাসো-সিয়েশনের তরফ থেকে নয়া গভর্নরকে একদিন সম্বর্ধনা জানানো উচিত। তোমরা ব্যবস্থা করো।"

"কিন্তু সেক্রেটারী মুজিব তৎক্ষণাৎ প্রেসিডেন্ট লতিফুর সাহেবের কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, একজন বিদেশী গভর্নরকে এত খাতির করার কোন প্রয়োজন আছে কি? এরপর শেখ মুজিব নিজে ফরিদপুর এ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির প্রতি সদস্যের বাড়ী গিয়ে বললেন, "নবাবজাদা গভর্নরকে সম্বর্ধনা জানাতে চান, আমার নিজের এতে একে-বারেই মত নেই, কিন্তু উনি আমার বাবার বয়সী—ওঁর মুখের উপর কোন কথা বলা আমার শোভা পায় না। তবে আপনারা যদি নবাব-জাদার প্রস্তাবকে সমর্থন করেন তো করুন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাকে সেক্রেটারী পদ থেকে অব্যাহতি দিন।"

"এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য যথাসময়ে "ম্যানেজিং কমিটির" বৈঠক বসল। কিন্তু দেখা গেল সেক্রেটারী শেখ মুজিব আসেন নি।

প্রেসিডেন্ট লতিফুর সাহেব বললেন, সেক্রেটারীর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। কিন্তু সেক্রেটারী শেখ মুজিব এলেন না। তখন কার্যকরী সমিতির একজন সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে মুজিব তাঁদেরকে এ ব্যাপারে কি বলেছিলেন সব জানালেন। তখন নবাবজাদাও বলতে বাধ্য হলেন, সেক্রেটারীর যদি আপত্তি থাকে তবে এ ব্যাপারে আর এগিয়ে কাজ নেই। পরদিন শেখ মুজিবকে ডেকে বললেন, আমি তোমার দেশপ্রেম ও নীতি-বোধের তারিফ করি।" [গতিবেগ চঞ্চল বাঙলাদেশ ঃ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব, অমিতাভ গুপ্ত, পৃঃ ৩৮-৩৯]

১৯৪৬ সালে সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে সারা দেশে নির্বাচন উপলক্ষে জনমনে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'তে থাকে। বহুদিন থেকে বিভিন্ন ভাবে এ দেশের মুসলিম সম্প্রদায় শোষিত ও নির্যাতিত হয়ে আসছিলেন। তাই শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবার আশায় তাঁরা এই নির্বাচনের মাধ্যমে একটা নতুন কিছু আশা করেছিলেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে অংশ গ্রহণ করে। আর স্বভাবতঃই মুসলিম লীগ এবারেও ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করে। মুসলিম জনমনে ধর্মীয় ভাব জাগরিত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার একটা স্পষ্ট ভাবধারা এখানে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু বাংলার সাধারণ মুসলমান মুসলিম লীগকে ব্যাপক সমর্থন জানান এই জন্য নয় যে তাঁরা শুধু ধর্মীয় নিরাপত্তা চান—বরঞ্চ ধর্মীয় নিরা-পত্তার চেয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করাই ছিল মুসলিম লীগকে সমর্থনের পশ্চাতে তাঁদের সবচেয়ে বড় কারণ।

এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। মুসলিম লীগ ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলেও জনগণের নিকট অর্থনীতিই বড় ছিল। অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ একেবারে পশ্চাদপদ হয়ে পড়েছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী ও জমির মালিকানা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দুদের হাতে চলে যায়। যাঁরা ছিলেন একদিন ভূমির মালিক তাঁদের অনেকেই হয়ে পড়লেন ভূমিহীন। একদিকে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে হিন্দু সমাজ চাকুরীর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকলেন। আর মুসলিম সমাজ ডুবে থাকলেন ধর্মীয় কুসংস্কার

ও অশিক্ষার অন্ধকারে। হিন্দু জমিদার, চাকুরীজীবিদের সাথে সাথে সৃষ্টি হ'ল মহাজন শ্রেণী। মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের শোষণে কঙ্কালসার মুসলিম সমাজ জর্জরিত হয়ে পড়লেন। কি চাকুরী, কি বাণিজ্য, কি শিক্ষা, কি রাজনীতি কোন দিকেই তাঁদের সুযোগ-সুবিধা মিললো না। ইংরেজী ভাষাকে উপেক্ষা করায় এই মুসলিম সমাজ হিন্দুদের তুলনায় প্রায় একশত বছর পেছনে পড়ে রইলেন। ফলে চাকুরীর ক্ষেত্রে হিন্দুরা পর্যাপ্ত পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে লাগলেন আর মুসলমানেরা ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে গ্রাম্য জীবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে রইলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের অধিক পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা দিতে শুরু করলেন। সমাজে আর্থিক বৈষম্য দেখা দিল নিদারুণভাবে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টিতে ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। সুতরাং বাংলার মুসলিম সমাজ পাকিস্তান আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন আর্থিক ও সামাজিক মুক্তির তাড়নায়। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ-এর বিজয় এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলার শোষিত, নির্যাতিত, উৎপীড়িত মুসলমান পাকিস্তান বলতে এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে শুধু ধর্মীয় নিরাপত্তাই থাকবে না, থাকবে আর্থিক মুক্তির ও শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থার এক নতুন সম্ভাবনা। সুতরাং পাকিস্তান একমাত্র ধর্মীয় কারণে সৃষ্টি হয়েছিল, একথা সত্য নয়। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের পাকিস্তানের আন্দোলনে ঝুঁকে পড়ার পেছনে কতকগুলো যুক্তিসংগত কারণ ছিল। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৎকালীন মোগল সম্রাটের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন। তারপর ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী এক ঘোষণায় জানালেন যে, প্রজাদের উপর করের বোঝা চাপানো তাঁদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এসে দেখা গেল কোম্পানীর এই প্রতিশ্রুতি লংঘিত হয়েছে এবং প্রজাদের ওপর জোর-জুলুম ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।.......

......কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন ঃ

'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী
দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।'

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাথমিক পর্যায়ে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ভিন্নতর। যেন-তেন প্রকারেন এ দেশের সম্পদ শোষণ ক'রে, লুণ্ঠন ক'রে এ দেশের মানুষকে রিক্ত, নিঃস্ব ক'রে সাম্রাজ্য বিস্তার করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এক-দিকে কোম্পানী অন্য দিকে কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশের সম্পদ শোষণ ক'রে বাংলার মানুষকে এক মহা দুর্যোগের সম্মুখীন ক'রে তুলেছিল। এর ফলেই বাংলার মানুষের ভাগ্যে নেমে এসেছিল দুর্যোগের ঘনঘটা—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সত্যি কথা বলতে কি, এই দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির তেমন কোন কারণই বিদ্যমান ছিল না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কৃত্রিম, এর জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অব্যবস্থা ও অসদুদ্দেশ্যই মূলতঃ দায়ী ছিল। এ প্রসংগে সুপ্রকাশ রায়ের একটি ইংরেজী গ্রন্থ থেকে অনূদিত গ্রন্থ 'ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩—১৪) থেকে সংশ্লিষ্ট উক্তি স্মরণ করা যায়ঃ

"তাহাদের মুনাফা শিকারের পরবর্তী উপায় হইল চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা। তাহারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই দ্রব্যটির জন্য তাহারা যে মূল্যই চাহিবে তাহাই পাইবে। চাষীরা তাহাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের ফসল অপরের গুদামে মজুদ হইতে দেখিয়া চাষবাস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িল। ইহার ফলে দেখা দিল খাদ্যাভাব। দেশে যাহা কিছু খাদ্য ছিল তাহা ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া দখলে চলিয়া গেল।.....খাদ্যের পরিমাণ যত কমিতে লাগিল ততই দাম বাড়িতে লাগিল, শ্রমজীবী দরিদ্র জন-গণের চির দুঃখময় জীবনের উপর পতিত হইল এই পুঞ্জীভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু ইহা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র।

"এই হতভাগা দেশে দুর্ভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নহে। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তাহা এমন কি ভারতবাসীরাও আর কখনও চোখে দেখে নাই বা শুনে নাই।

চরম খাদ্যাভাবের এক বিভীষিকাময় ইংগিত লইয়া দেখা দিল ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ; সংগে সংগে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক তাহাদের সকল আমলা, গোমস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সে সেইখানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। এই জঘন্যতম ব্যবসায় মুনাফা হইল এত শীঘ্র ও এরূপ বিপুল পরিমাণে যে, মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূন্য ভদ্রলোক এই ব্যবসা করিয়া দুর্ভিক্ষ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ৬০ হাজার পাউণ্ড (দেড় লক্ষাধিক টাকা) য়ুরোপে পাঠাইয়া দিলেন।"

জনাব বদরুদ্দীন উমর তাঁর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক' গ্রন্থের ৫ম পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "দুর্ভিক্ষের পূর্বে বাংলাদেশের রাজস্ব ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে ছিল ১,৫২,০৪,৮৫৬ টাকা কিন্তু দুর্ভিক্ষের পর ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পরও মোট রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১,৫৭,২৬,৫৭৬ টাকায়।"

দেশের মানুষকে শোষণ ক'রে বছরে বছরে যে রাজস্ব আদায় করা হ'ত, তার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী পরিমাণ অর্থ বিলাতে পার হয়ে যেত। এই অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিক্রিয়া হিন্দু সমাজের চেয়ে মুসলিম সমাজেই অধিক প্রতিফলিত হয়েছিল। সেদিনের বাংলাদেশে অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান যে ছিল না তা' নয়—কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। কৃষক ও শ্রমজীবী—এই দুই ধরনের মেহনতী মানুষ নিয়েই গড়ে উঠেছিল বৃহৎ মুসলিম সামাজিক কাঠামো। এ সম্পর্কে ডঃ আনিসুজ্জামান একটি চমৎকার উক্তি করেছেন:

"মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশের কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের যে প্রাধান্য ছিল, এখন অনুমান করা চলে। অতএব ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ প্রজাদের যে দুর্দশার কথা আমরা বলেছি, ঘটনাক্রমে তাদের অধিকাংশই ছিলেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী।"

[ডঃ আনিসুজ্জামান: মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৯]

এখন দেখা যাক, কৃষক ও শ্রমজীবী কিভাবে ইংরেজ কর্তৃক শোষিত হয়েছিল। উইলিয়ম বোল্টস্ নামক জনৈক ইংরেজ বণিক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়:

"তাঁতিদের সাধ্যাতীত পরিমাণ কাপড় বয়ন করে দেবার চুক্তি করতে বাধ্য করা হ'ত। যারা কাঁচা রেশম বয়ন করত, তাদের উপর অত্যাচার এতো বেশী হয়ে গিয়েছিল যে, অনেক সময় এই অবাধ্য দাবী এড়াবার জন্য তারা নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে ফেলত। ....সাধারণতঃ রায়তেরাই হ'ত একাধারে চাষী ও কারিগর; খাজনা মেটাবার জন্যে গোমস্তাদের অত্যাচারের ফলে তাদেরকে দেশ ছেড়ে পালাতে হ'ত কিংবা ছেলেমেয়ে বিক্রি করতে হ'ত।

ইংরেজ বেনিয়া-দের অত্যাচার

"তাছাড়া কোম্পানীর এজেন্টদের নির্দিষ্ট মূল্যে মাল বিক্রি না করলে তাঁতিদের কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে অবরুদ্ধ ক'রে রাখা হ'ত, এমনকি এই রকমের অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে বন্দী তাঁতিদের মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হ'ত।"

[Ramesh Datta : *The Economic History of India under Early British Rule*, 3rd Ed. 1908, P. 2527]

এ ধরনের নির্যাতন চালিয়েই যে কোম্পানী সরকার ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা' নয়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে এক নতুন প্রস্তাব পেশ করেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে সুপরিচিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বণিক শাসকগোষ্ঠী সৃষ্টি করলেন একটি নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণী, যাদের নাম জমিদার। এরা প্রতি বৎসর একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক কোম্পানীকে দিতে বাধ্য থাকবে এবং কোম্পানীর ঘরে ঐ পরিমাণ অঙ্ক পৌঁছিলেই জমিদারগণ বংশপরম্পরায় উক্ত জমিদারীর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকবে। এমন কি, জমির মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিতে কোম্পানীর বন্দোবস্তের কোন হেরফের হবে না। এই ব্যবস্থায় সুচতুর শাসকগোষ্ঠীর ভাণ্ডারে বিনা আয়াসে রাজস্ব জমা হতে থাকল। অন্য দিকে সৃষ্টি হ'ল একটি সামন্ত শ্রেণী, যারা কোম্পানীর তাবেদার এবং বশংবদ সেজে দশকে শোষণ করতে লাগলো। এই সমস্ত শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই ছিল অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায়ের। এরা জমিদারী লাভ করবার পর রাজস্ব আদায়ের জন্য

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

যে সমস্ত লোক নিযুক্ত করা হ'ল তারাও হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এই ভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদার, ইজারাদার, তহসীলদার ইত্যাদি শ্রেণীর লোকদের আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেল এবং তার পরিণামে সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য দিনের পর দিন প্রকট হয়ে দেখা দিল। আর এই সামন্ত শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনসাধারণের উপর করের ও খাজনার বোঝা চাপিয়ে দিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ ও অন্যান্য উপায়ে দেয় টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দিল। শোষণের যাঁতাকলে বাংলার সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে উঠল। নরহরি কবিরাজ যথার্থই লিখেছেন: "কৃষকদের উপর তাদের অত্যাচার এত চরমে উঠল যে ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে রংপুর ও দিনাজপুরে শেষ পর্যন্ত কৃষকেরা মরিয়া হয়ে ইজারাদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।" তিনি ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার সংকীর্ণ ভূমিকার চিত্রটি তুলে ধরে কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে আরো লিখেছেন: "মুঘল যুগে জমির উপর মালিকানা না থাকলেও দখলিস্বত্ব ছিল কৃষকদের। রাষ্ট্র জমির মালিক ছিল না। জমির উপর প্রধান অধিকার ছিল তার যে জমি কর্ষণ করত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এইদিকে অগ্রগামী পরিবর্তনের সূচনা না ক'রে পশ্চাদগামী পরিবর্তনের সূচনা করল। কৃষকদের যে অধিকার ছিল তা' সর্বাংশে কেড়ে নিয়ে জমিদারদের মালিকানাস্বত্ব দেওয়ার ফলে কৃষকেরা শক্তিশালী জমিদারের অর্ধদাসে পরিণত হল।"

[স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, পৃঃ ৩০]

সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মুঘল আমলের জমিদার শ্রেণীর ধ্বংস সাধন ক'রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন করে। মুঘল আমলীয় জমিদারদের প্রায় সবাই ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা কোম্পানীর প্রভুত্ব স্বীকার করলেও ভেতরে ভেতরে তাঁদের মনে অসন্তোষ ছিল। এঁদের সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস্ বলে-ছিলেন, "বড় বড় জমিদারেরা তাঁদের প্রচণ্ড প্রভাব ব্যবহার করে থাকেন সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেই জন্যই তাঁদের প্রভাবনষ্ট করা বাঞ্ছনীয়।"

[Introduction to the fifth Report, নরহরি কবিরাজ উদ্ধৃত, পৃঃ ৩২]

লর্ড কর্নওয়ালিস উপলব্ধি করেছিলেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে টিকে থাকতে হলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন অবশ্যম্ভাবী কারণ এই প্রথার ভেতর দিয়ে কতকগুলো জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হবে যারা কোন মতেই কোম্পানীর স্বার্থের প্রতিকূলে যাবে না। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছিলেনঃ "আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই (এদেশের) ভূ-স্বামিগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভূ-সম্পত্তি নিশ্চিত মনে ও সুখে-শান্তিতে ভোগ করিতে পারে, তাহার মনে উহার কোন পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগিতেই পারে না।"

[সুপ্রকাশ রায়ঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ১৩]

গ্রাম বাংলার কৃষক বিদ্রোহের মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এক সরকারী ভাষণে বলেছিলেনঃ

"আমি এটা বলতে বাধ্য যে ব্যাপক গণবিক্ষোভ অথবা গণবিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে, এমন কি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হলেও, এর ফলে এমন এক বিপুল সংখ্যক ধনী ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে যারা বৃটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখতে বিশেষভাবে আগ্রহশীল এবং জনগণের উপর যাদের অখণ্ড প্রভুত্ব বজায় আছে।"

[Lord William Bentinck : *Speech-Quoted in R. P. Dutt, India To-day*, P. 218]

কোম্পানী-পুষ্ট নতুন ভূস্বামী সম্প্রদায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অথবা প্রায় সামগ্রিকভাবেই হিন্দু পরিবার থেকে উদ্ভূত, একথা ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে আমি আবার নরহরি কবিরাজ মহাশয়কে স্মরণ করিঃ

"প্রথমেই কাসিম বাজারের রাজপরিবারের উৎপত্তির কথা ধরা যাক। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। হেস্টিংসের কৃপায় নাটোরের রাজার জমিদারির কিছুটা

আত্মসাৎ ক'রে তিনি বিরাট জমিদারির মালিক হন। হেস্টিংসের অনুগ্রহে তাঁর মুন্সী নবকিষণ কলকাতার সবচেয়ে বড় জমিদার রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইনিই শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

"ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন হুগলী থেকে কলকাতা, সুতানটী, গোবিন্দপুরে এসে বসতি স্থাপন করল, তখন তাদের সঙ্গে হুগলীর একদল সুবর্ণ বণিক এল কলকাতায়। এই সুবর্ণ বণিক সমাজের একজন প্রধান লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকু ধর কোম্পানীকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করেন। ইনিই আবার প্রথম মারাঠা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্যে ইংরেজকে নয় লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। কোম্পানী তাঁর পৌত্রকে 'মহারাজা' উপাধিতে সম্মানিত করেন। এই লক্ষ্মীকান্তের বংশধরেরাই কলকাতার প্রসিদ্ধ পোস্তার রাজপরিবার। .... এইভাবে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার, বড় বাজারের মল্লিক বংশ, সিমলার ছাতু বাবুর বংশ, হাটখোলার দত্ত পরিবার—এই সব বংশের সম্পত্তি ও সমৃদ্ধি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহে।"

[স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, পৃঃ ৩৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর পক্ষপাতমূলক আচরণে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একটি নতুন অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী হিন্দু জমিদার ও জমিদার-সংলগ্ন শ্রেণী গড়ে উঠে এবং যে মুষ্টিমেয় মুসলিম বিত্তশালী শ্রেণী বাংলার মাটিতে সুদীর্ঘকাল শিকড় গেড়ে বিরাজমান ছিলেন, তাঁদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলোপ হয়ে যায়। নতুন যে আর্থিক চক্র জমিদারদের কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠে এবং যে আর্থিক লেনদেনের বৃত্ত (circle of monetary circulation) সৃষ্টি হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় এবং নিম্নবিত্ত তফসিলী সম্প্রদায় তা' থেকে দূরে সরে পড়ে। দিনে দিনে এদেশে যে হ্যাভনটদের বা বঞ্চিতদের সমাজ গড়ে উঠে তারা মুসলিম এবং মুষ্টিমেয় অস্পৃশ্য হিন্দু। অর্থনৈতিক অবস্থার সাথেই নিবিড় সম্পর্কে বাঁধা সমাজের রাজনৈতিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক শোষণের সাথে সাথে তার ফলশ্রুতি তাঁদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও জাজ্বল্যমান

হয়ে উঠল। সমাজ জীবনের যে নতুন নাটকের অভিনয় শুরু হ'ল ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজ তার পশ্চাদ পটভূমিকায় পর্দার অন্তরালে গিয়ে দাঁড়ালেন, আর সম্মুখ মঞ্চে মুখর হয়ে এগিয়ে এলেন নবজাগ্রত সামন্ত হিন্দু সম্প্রদায় এবং তাঁদের অনুগ্রহ-পুষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। তফসিলী সম্প্রদায় এবং নিম্নবিত্তভোগী হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থাও মুসলমানদের সমপর্যায়েই বিচার্য। তবে তুলনামূলকভাবে তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং সমাজের উঠানামায় তাদের অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না।

এই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর একটি অত্যাচার, যার প্রতিক্রিয়া সমগ্র কৃষি-নির্ভর সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইতিহাসে এর নাম নীলকর অত্যাচার। বাংলার হতভাগ্য কৃষক সমাজের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সেদিনের সভ্যতাকে ম্লান করে দিয়েছিল। এ সম্পর্কে তৎকালীন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ

নীলকরদের অত্যাচার

"নীলকরদিগের কার্যের বিবরণ করিতে হইলে কেবল প্রজা পীড়নেরই বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। তাহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাহারদের নীল ক্রয় করেন, এবং আপনারা ভূমি কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন। সরল-স্বভাব সাধু ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন, ইহাতে দোষ কি? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশাভঙ্গ, কতদিন অনশন, কত যন্ত্রণা যে এই উভয়ের অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই উভয়ই প্রজানাশের দুই অমোঘ উপায়! নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে; নীলকর তাহারদিগের বল দ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন, ও নীলবীজ বপনার্থে তাহারদিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিৎ পণ প্রদান করা তাঁহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প অনুচিত মূল্য ধার্য্য করেন। নীলকর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতি স্বরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ করিতে পারেন, তবু অনুগ্রহ ভাবিয়া দাদন স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের দস্তুরি ও হিসাবাদি উপলক্ষে তাহারও কোন না অর্দ্ধাংশ কর্ত্তণ যায়? এ কারণ প্রজারা

যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শষ্য বপন করিলে অনায়াসে সম্বৎসর পরিবার প্রতিপালন করিয়া কালযাপন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে লাভ ভাব দূরে থাকুক, তাহারদিগের দুশ্ছেদ্য ঋণ জালে বদ্ধ হইতে হয়।"
[বিনয় ঘোষ সম্পাদিত সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৬]

নীলকরদের প্রতি দেশবাসীর ঘৃণা ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে দেখা দেয়, শুধু পত্র-পত্রিকায় নয়, সেকালের নাটকে, অভিনয়ে, গানে তাদের প্রতি ঘৃণা বাণীরূপ লাভ করে। এ জাতীয় রচনার বিশিষ্টতম নিদর্শন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। তৎকালীন লোকসাহিত্যেও এই অত্যাচারের প্রচণ্ডতা প্রতিবিম্বিত হয়েছে; একটি তৎকালীন জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের অংশবিশেষ স্মরণ করি:

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
কর্লে এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ মোল
লংয়ের হল কারাগার
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার.........

নীলকর সাহেবেরা কৃষকদের নীল উৎপাদনের জন্য অগ্রিম টাকা দিত। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি পর্যাপ্ত নীল উৎপন্ন না হ'ত তথাপি কৃষককে এই অগ্রিম পরিশোধ করতেই হ'ত। এছাড়া নীল চাষের জন্য নিযুক্ত যাবতীয় কর্মচারীর বেতনও বহন করতে হ'ত কৃষকদের। নীলকরগণ বেতনভুক পুলিশ ও লাঠিয়াল পুষতেন। টাকা যথাসময়ে না দিলে লাঠিয়াল লাগিয়ে কৃষকদের মালামাল নিয়ে আসা হ'ত। বিচার প্রার্থনা করেও ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট বিচার পাওয়া যেত না। সমস্ত দক্ষিণ বাংলা, পশ্চিম বাংলা ও উত্তর বাংলার অংশ বিশেষ এই অত্যাচারে রিক্ত, নিঃস্ব ও জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি দুটো উক্তি এখানে স্মরণ করা যায়:

In a good year a ryot could produce enough indigo to repay his advance and collect a small profit ; in a bad year his expenses exceeded his advance. One fault of the indigo

system of lower Bengal was that the risk of crop failure fell directly upon the ryot.

[Blair B. King : *The Blue Mutiny*, University of Pensylvania Press, Philadelphia, 1966, P. 25]

The meager salaries of these employees were **augmented** by unauthorised Commissions exacted from the cultivators.

[*Report of the Indigo Commission,* 1860, A, 2092]

The police or military division of the staff consisted of lathiyals, **bands** of professional warriors armed with lathis or sticks. The majority were natives of Faridpur and Pabna where entire villagers hired out as lathiyals.

[W.S. Seton-kar : *Indigo in Lower Bengal, Calcutta Review,* VII (Jan-June 1847), 186-219, and Lal Behari Day, *Bengal Peasant Life* (London, 1909), P. 327]

এইসব অত্যাচারের সমগ্র প্রতিক্রিয়া পড়তো বাংলাদেশের কৃষক শ্রেণীর উপর যাদের প্রায় শতকরা ষাট-সত্তর জন ছিলেন মুসলমান। একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ও ইংরেজী ভাষার প্রতি অনীহা থাকায় তাঁরা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছিলেন অন্যদিকে নীল-করদের অত্যাচার, কোর্ট-কাছারীতে বিচারের নামে প্রহসন সবকিছু মিলিয়ে মুসলিম সমাজে বিতৃষ্ণার ধোঁয়া ঘনীভূত হতে থাকে। মুসলিম কৃষক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী ক্রমেই সমাজ-জীবনের তলদেশে তলিয়ে যেতে শুরু করলেন। জমিদার, মহাজন, শাসক সবাই এই সমাজের মাথার উপর চেপে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথ নির্মাণ করল। এর পরিণাম ব্রিটিশ শাসনের জন্য যেমন ভয়াবহ হতে থাকল, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়ে উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই তার পরিণামও চূড়ান্ত অকল্যাণের দিকেই যাত্রা করল। একটি শ্রেণীকে বঞ্চিত করে আর একটি শ্রেণী চিরকাল বড় হতে পারে না। ব্রিটিশের সঙ্গে আঁতাত সৃষ্টি করে মুসলিম সমাজকে বঞ্চনার পথে ঠেলে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়েরও যে কল্যাণ হয় নি, পরবর্তী ইতিহাসই তা' প্রমাণ করেছে।

যাহোক, বৃহত্তর মেহনতী মুসলিম সমাজের যখন এইরূপ অর্থনৈতিক দুরবস্থা, তখন মুষ্টিমেয় উচ্চ মুসলিম সমাজের অবস্থাও যে খুব সন্তোষ-

জনক ছিল এমন নয়। এ সম্পর্কে হান্টার সাহেব বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে ঃ

উচ্চবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা

"মুসলমান উচ্চবিত্তের উপরে প্রথম আঘাত আসে নবাবের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্কোচনের ফলে। নবাবের আশ্রিত মুসলমান কর্মচারী, সভাসদ, জায়গীরদার ও অনুগ্রহিতেরা সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন। ইংরেজ আধিপত্যের সূচনায় অনেকে বাংলাদেশ ত্যাগ ক'রে অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে চলে যান, এমন কথাও শোনা যায়।"

[W. W. Hunter ঃ *The Statistical Account of Bennal*, Vol. IX, London, 1876. 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯]

হান্টার সাহেব আরো মত প্রকাশ করেছেন ঃ "নবাবী আমলে অভিজাত মুসলমানদের অর্থাগমের তিনটি প্রশস্ত পথ ছিল—সামরিক পদ লাভ, রাজস্ব ভোগ আর বিচার ও রাজনৈতিক নিয়োগ। কোম্পানী আমলে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন ও ছাঁটাইয়ের ফলে অনেকে চাকুরী হারালেন। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত রাজস্ব বিভাগে মুসলমান কর্মচারীদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয় নি। কিন্তু নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায়, বিশেষতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ ক্যালেক্টরদের নিয়োগ হতে থাকায়, এদের স্থান সংকুচিত হয়।"

[W. W. Hunter ঃ *The Indian Musalmans*, 3rd Ed., London, 1876, P. 159]

অবশ্য মুসলমান সম্প্রদায় এতদিন যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে এসেছেন তার সবই যে ন্যায়সঙ্গত একথা বলব না। য়ুরোপীয় মানবতাবাদে বিশ্বাসী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এদেশে যে মানবতাবাদী আইন ও শিক্ষা প্রবর্তন করেন, মুসলিম সম্প্রদায় অকারণে তার প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করতে থাকেন। এতে এই সমাজের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ হয়েছে অনেক বেশী। একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করি। থম্পসন ও ক্যারেট বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"কর্নওয়ালিসের আরেকটি সংস্কার শিক্ষিত মুসলমানকে অন্ততঃ

বড় রকম মানসিক আঘাত দিয়েছিল। নবাবী আমলে 'কাফের'দের সাক্ষ্যে কোন মুসলমানের প্রাণদণ্ডাদেশ হতে পারত না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না বলে ১৭৯২-তে গভর্নর জেনারেল এই নিয়ম রহিত করেন।"

[*Rise and Fulfilment of British Rule in India*, 2nd Ed., London, 1935, P. 194]

মুসলমানদের এই মানসিক আঘাত যে অমানবিক সেকথা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। অনুরূপভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রেও ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে মুসলিম সম্প্রদায় সুদীর্ঘকাল ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন। যাহোক, মানবিকতা ও শিক্ষার প্রসঙ্গ ছেড়ে আমাদের প্রাক্তন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

একথা প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে যে, বাংলার মুসলমান সমাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; এছাড়া কোম্পানী-প্রবর্তিত লাখেরাজ-সম্পত্তি আইনের আওতায় অনেক মুসলমান পরিবার যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে শ্রী বিমান বিহারী মজুমদার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা' প্রণিধানযোগ্য ঃ

লাখেরাজ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

"১৭৯৩ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত লাখেরাজ-সম্পত্তি সম্পর্কে অনেকগুলো আইন তৈরী হয়। এই সব আইন-কানুন লোকসাধারণের গোচরীভূত করার কোন ব্যবস্থা হয় নি। ফলে, অনেকের সম্পত্তি তাদের অগোচরেই নতুন আইন অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদন করেও সাধারণতঃ কোন ফল হ'ত না।

লাখেরাজ-সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলমান উচ্চবিত্তের পতন হয়, এই মত লোকপ্রিয়। এই ব্যবস্থায় মুসলমানদের ক্ষতি হ'ল ঠিকই, কিন্তু এ ক্ষতি কেবল তাদেরই হ'ল না। দেবোত্তর সম্পত্তির বাজেয়াপ্তিতে হিন্দুর ক্ষতিও কম হয় নি। কিন্তু হিন্দু সমাজ অন্য ভাবে (যেমন, নতুন জমিদারী লাভ ক'রে বা কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণ ক'রে বা ইংরেজ বণিকদের সহকারী হয়ে) নিজেদেরকে পুনর্গঠন করতে পেরেছিলেন, মুসলমানেরা সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি।'

[*History of Political Thought*, Calcutta, 1934, Vol.I, PP. 390—91]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা আমদানী করেছিল। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে দেশীয়দের কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে—এ বিষয়ে তাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। মেকলে সেই মতভেদের অবসান ঘটিয়ে যা বলেছিলেন সেই বহু-ব্যবহৃত উক্তিটি আমিও এখানে স্মরণ করি ঃ

ব্রিটিশদের শিক্ষা-নীতি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মনোভাব

"আমাদের এখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করতে—যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান-কারী। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয় আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।"

[মেকলে মিনিট, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫—নরহরি কবিরাজ উদ্ধৃত, পৃঃ ৯২]

নবাবী আমলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্যই শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফার্সী। ফার্সী ভাষার প্রতি মুসলমানদের যে একটি দুর্বলতা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইংরেজী ভাষা প্রবর্তনের পর সে কারণে হিন্দু সম্প্রদায় এ ভাষাকে যত সহজে গ্রহণ করতে পারলেন, মুসলমান সম্প্রদায় তা' পারলেন না। এর ওপর যুক্ত হ'ল গোঁড়া ধর্মীয় সংস্কার। ফার্সীর সাথে আরবীর সাদৃশ্য আছে—আরবী কোরআনের ভাষা—আল্লাহ পাকের জবান। সুতরাং ফার্সীকে বর্জন করলে ধর্ম বিপন্ন হবে, ইংরেজী শিখলে সবাই ধর্মবিমুখ হবে এই ভয়টি মোল্লাদের মূর্খতার ফলেই হোক, অথবা অন্যান্য কারণেই হোক, মুসলিম সমাজে প্রচার লাভ করল। ইংরেজ-প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মুখ ফিরিয়ে রাখবার ফলে মুসলিম সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক পশ্চাৎ-গামী যাত্রী হিসেবে পরিগণিত হলেন।

ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়াও অর্থনৈতিক কারণেও কৃষি-নির্ভর মুসলিম সমাজের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল; কেননা ইংরেজী শিক্ষা ছিল তৎকালীন অর্থনৈতিক কাঠামোতে খরচ-সাপেক্ষ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুসলমান সম্প্রদায় দিনে দিনে আর্থিক সচ্ছলতা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং ইংরেজী শিক্ষা যখন প্রবর্তিত হ'ল, খুব কম

ক'জন অভিভাবকেরই তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে ইংরেজী স্কুল বা কলেজে পাঠানোর মত আর্থিক সঙ্গতি ছিল। এর ওপর তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর সক্রিয় নিস্পৃহতাও মুসলমানদের শিক্ষার আগ্রহ ও সামর্থ্যকে স্তিমিত রাখতে সাহায্য করেছে। কলকাতা মাদ্রাসায় প্রথম দিকে ইংরেজী শিক্ষার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। যদিও ১৮২৯-এর দিকে ইংরেজী ক্লাস চালু হয়, তথাপি সরকারী তত্ত্বাবধানের অদূরদর্শিতায় নানা অভাব-অভিযোগের সৃষ্টি হ'ল। এ সম্পর্কে ডক্টর মল্লিকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

"The obvious conclusion that suggests itself in respect of education under state patronage upto 1835 is that the Muslims who cared for education were not in any way prejudiced against receiving English or western education, but they had very limited opportunities of acquiring this education. The system and course of studies offered to them was defective and their only Institution was very badly managed and inefficiently run. Again, the early efforts of the company to educate the people were made in the city of Calcutta where the Hindus predominated. The overwhelming Muslim majority district of East and North Bengal did not receive the much needed attention to the Government till very late. Another factor was the known poverty of the Muslims which made it impossible for them to educate themselves without adequate help from the Government. Without ascribing any motive whatsover, it can also be said that the policy of ruling authorities was often fattering and in most cases, though well-intentioned, it served to benefit the Hindus rather than Muslims."

[Dr. A. R. Mallick: *The British Policy and the Muslims of Bengal,* Dacca, 1961, P. 193]

ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনীহা ও পশ্চাদপদতার কারণ সম্পর্কে আরো একটি তথ্য এখানে উদ্ঘাটন করা যায় ঃ

"এরপর শিক্ষা বিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট সকল অর্থ যখন সরকার

কেবল ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করার সঙ্কল্প করলেন এবং গরীব ছাত্রদেরকে স্টাইপেণ্ড দেবার নিয়ম রহিত করে কেবল মেধার ভিত্তিতে স্কলারশীপ দানের ব্যবস্থা করা হ'ল, তখন মুসলমান সমাজ প্রমাদ গুণলেন। এই দু'টি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলকাতার সকল সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও মৌলভীসহ আট হাজার ব্যক্তি্র স্বাক্ষরিত একটি আবেদন-পত্র সরকারের কাছে প্রেরিত হয়। নীতিগতভাবে সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ক'রে এতে বলা হয় যে, হিন্দু ও মুসলমানের শাস্ত্রালোচনার পথ বন্ধ করে সরকার যেভাবে শুধু ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাইছেন, তার ফলে, প্রজাদের মনে এমন সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, সরকারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা।"

[*A History of English Education in India* (1781-1893) Aligarh, 1895 PP. 52-53; Sixth Report of the Select Committee of the House of Commons on Indian Territories, 12 A বর্ণিত H. H. Wilson-এর সাক্ষ্য থেকে উদ্ধৃত]

খ্রীস্টান মিশনারীরা খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ দেশবাসীর মনে যে সন্দেহের ও বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছিল, সে সব কথাও এই ঘটনার সঙ্গে স্মরণ করা সমীচীন।

ইংরেজী শিক্ষা বা ইউরোপীয় নব মানবধর্মে প্রণোদিত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেও প্রথমদিকে শাসকগোষ্ঠীর মনে দ্বিধা সংকোচ ছিল। এদেশের মানুষ, বিশেষ করে প্রাক্তন শাসক সম্প্রদায় মুসলমানগণ যেন ইউরোপীয় বৈপ্লবিক চেতনার অধিকারী না হতে পারে, এ সম্পর্কে কোম্পানী সরকার যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। লর্ড এলেনবরার (ডেসপ্যাচ, ১৮৫৮) বরাত দিয়ে নরহরি কবিরাজ বলেছেন ঃ

"ছকে বাঁধা সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হলেও নবপ্রবর্তিত বিদ্যালয়গুলিতে যাঁরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পেলেন তাঁরা ইংলণ্ডের বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতি ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কোম্পানীর বড় কর্তারা কেউ কেউ আশঙ্কা করতে থাকেন—ইউরোপের এই বিপ্লবী ভাবধারা ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীর মনে বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা

জাগরিত করবে। ১৮৫৮ সালে লর্ড এলেনবরা অভিযোগ করেন, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহটি ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে উৎসাহ পেয়েছে এবং তিনি সুপারিশ করেন ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ডেসপ্যাচটি এই কারণে প্রত্যাহার করা উচিত।"

[স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, পৃঃ ৯৩]

মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাজাত্যবোধের পশ্চাতেও আত্মরক্ষার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে এবং শিক্ষার আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁরা নিজেদের ঐতিহ্য, ধর্মীয় অতীত ইত্যাদির মধ্যে অবগাহন করে তৃপ্তির ও যুক্তির সন্ধান করতে লাগলেন। আমি এই মানসিকতাকে পলায়নী মনোবৃত্তি বলে উল্লেখ করতে চাই। এ সম্পর্কে জনাব বদরুদ্দীন উমর একটি চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন ঃ

"ইংরেজরা এদেশ দখল করার পর উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা স্বাভাবিক ভাবেই অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে শ্রেণীগতভাবে বঞ্চিত হ'ল। দফতর, আদালতে, বিশেষতঃ ফৌজী ব্যবস্থায় তাদের পূর্ব কর্তৃত্বের অবসান ঘটল। তাদের মাথার উপর বসল ইংরেজ এবং পাশে দাঁড়ালো হিন্দু, শিখ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয়। অবস্থার এই পরিবর্তনকে তারা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলো না...... রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন আন্দোলন অথবা অভ্যুত্থানের দ্বারা এ অবস্থার অবসান ঘটাতেও তারা সমর্থ হলো না। সুতরাং তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হলো সাংস্কৃতিক জীবন ক্ষেত্রে। নিজেদের গৌরববোধ, স্বাজাত্য এবং সামন্ততান্ত্রিক অভিমানকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেদের চারিদিকে সৃষ্টি করলো নানান বাধার দেওয়াল, সৃষ্টি করলো এক সাংস্কৃতিক অচলায়তন, যে অচলায়তনের নাম মুসলিম সংস্কৃতি দিয়ে তারা উদ্যত হলো তার পরিচর্যা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে।"

[সংস্কৃতির সংকট, পৃঃ ৪২-৪৩]

মুসলিম সংস্কৃতি নামক এই সাংস্কৃতিক অচলায়তনের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় যত বেশী প্রাচীর নির্মাণ করতে লাগলেন, আত্মরক্ষার কবচ যতই তাঁদের মধ্যে সুদৃঢ় হতে থাকল ততই পার্শ্বস্থিত সম্প্রদায়ের অগ্রগতি

লক্ষ্য করে হিংসার ও বিদ্বেষের বহ্নি তাঁদের মনে সঞ্চারিত হতে শুরু করল। এতোদিন যে প্রতিবেশী হিন্দু ভাইকে 'দাদা' অথবা ভাই বলে মনে

সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উৎস ও বিকাশ

হ'ত, এ চেতনা জাগ্রত হবার ফলে ধীরে ধীরে তাকে 'কাফের', 'মশরেক' বা শত্রু বলে মনে হতে থাকল। হিন্দু দাদাও তার নতুন অর্থনৈতিক সংগতির দৌরাত্ম্যে পাশের মুসলমান ভাইকে শুধু শত্রু ভেবেই ক্ষান্ত হলেন না—তাকে ম্লেচ্ছ এবং অস্পৃশ্য মানুষ বলে বিবেচনা করতে থাকলেন। তৎকালীন সমাজের সর্বত্র এবং সর্বস্তরেই আমার এই বক্তব্য অভ্রান্তভাবে সত্য ছিল—একথা বলবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে, সাম্প্রদায়িকতার যে বিদ্বেষ-বহ্নি বাংলার মাটিতে ধীরে ধীরে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, আমার উক্ত বক্তব্যে তার একটি মূল কারণ নিঃসন্দেহে সন্ধান করা যায়। এই ক্রমবর্ধমান হিংসা ও বিদ্বেষের মূলে ব্রিটিশ শক্তি যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-ভাবে ইন্ধন যুগিয়েছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শাসক-গোষ্ঠীর ভেদ-বুদ্ধির ফলশ্রুতি পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলিম হানাহানি ও দাঙ্গার রূপ নিয়েছিল।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করবার মধ্যেই ইংরেজদের ভেদ-বুদ্ধি নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে হিন্দু ও মুসলিম প্রধান অঞ্চল বৈশিষ্ট্যে দুই ভাগে ভাগ করে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতাকে একটি নতুন রূপ দান করেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে নির্বাচনে মুসলমান সম্প্রদায় তাঁদের জন্য আলাদা নির্বাচনী এলাকা ও পৃথক প্রার্থীদের স্বীকৃতি লাভ করে আত্মতৃপ্তি অর্জন করেছিলেন—কিন্তু এর পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ হতে পারে সে দূরদর্শিতা তখন তাঁদের ছিল না। কেননা তখন তাঁরা সাংস্কৃতিক অচলায়তনের অধি-বাসী। পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন সম্পর্কে জনাব বদরুদ্দীন উমর যথার্থই বলেছেন:

"সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য মিলিত রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেকখানি নিশ্চিহ্ন হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল পৃথক নির্বাচন তাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত করলো।

ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হলো সংকীর্ণ শাসনতান্ত্রিক পথে এবং পৃথক নির্বাচনের মহিমায় হিন্দু-মুসলমানের এক পথ ধরে চলার পথ হলো বন্ধ।"

[সাম্প্রদায়িকতা ঃ পৃঃ ১৫—১৬]

মুসলিম লীগের জন্ম ও উদ্দেশ্য

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকে অবশ্য শুধু সাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে বিচার করা যায় না। ধর্মীয় নিরাপত্তার চেয়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাই এইরূপ একটি রাজনৈতিক দল গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মুসলমানদের পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে ঠেলে দিয়েছিল শাসকগোষ্ঠীর বিভেদ নীতি এবং মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সমাজের বৈরী মনোভাব। নবজাগ্রত হিন্দু সমাজ মুসলমানকে অপাংক্তেয় ভেবে দূরে সরিয়ে রেখে ইংরেজ প্রভুদের নিকট থেকে সমগ্র সুযোগ-সুবিধা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু নিজেরাই ভোগ করবার ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং মুসলিম সমাজ সাংস্কৃতিক অচলায়তন সৃষ্টি করে আত্মপরায়ণ হওয়ার চেষ্টা করে-ছিলেন, এই বলে শুধু তাদেরকে একাই দোষী করা যায় না। এই প্রক্রিয়ায় হিন্দু সমাজের অবদান কম নয়। বিদেশী প্রভু আসলে যে এদেশের মানুষের শত্রু, সে মানুষ হিন্দু হোক, অথবা মুসলমান হোক, এ কথাটি ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ প্রথমদিকে একে-বারেই উপলব্ধি করেন নি, পরের দিকে উপলব্ধি করলেও মুসলমান সমাজ তার মধ্যে আন্তরিকতার সন্ধান খুব কমই পেয়েছে। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ক্ষমতা হস্তগত করে রাজত্বের স্বপ্নে হিন্দু মহাসভা এবং আর দু'একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন বিভোর হয়ে পড়েছিল। এমন কি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের একটি শক্তিশালী অংশ পর্যন্ত এই সব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাদেরকে ইন্ধন যোগাতেন। এসব কারণেই ব্রিটিশ ভারতে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন যথার্থই একটি ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ধীরে ধীরে সমগ্র আন্দোলন-বিকৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং সাম্প্রদায়িকতা সব কিছু ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে এ

এক দুর্ভাগ্যের ইতিহাস, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দুর্ভাগ্যের মাধ্যমেই ইতিহাসের ক্রমপরিণতি হিসেবে বাঙালীর জীবনে দেখা দিয়েছে সৌভাগ্যের প্রভাত-সূর্য, তার নাম বাংলাদেশ। পাকিস্তান এই পথ-পরিক্রমায় একটি সিঁড়ি মাত্র।

এতক্ষণ যে সব ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং পরিবেশন করা হয়েছে যে সব তথ্য, তার সাহায্যে বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে একটি পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম আবাসভূমির জন্য যে কেন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা' অনুধাবন করা সহজ হবে বলে মনে করি। এই প্রশ্নের উত্তরে আমার ব্যাখ্যা আশা করি, সুস্পষ্টই হয়েছে যে আপাতদৃষ্টিতে ধর্মীয় নিরাপত্তা সামনে থাকলেও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও আথিক মুক্তির বাসনাই ছিল বাঙালী মুসলিম সমাজের নিকট প্রধানতম প্রেরণা। এই আন্দোলনে মুসলিম লীগ যে নেতৃত্ব দিয়েছিল—বাঙালী মুসলমান সেই নেতৃত্বকে প্রথম দিকে অর্থাৎ পাকিস্তান অর্জন পর্যন্ত অর্থনৈতিক মুক্তির কারণেই বিশ্বস্তভাবে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই মুসলিম লীগের বুর্জোয়া শ্রেণী-চরিত্র এবং সাম্প্রদায়িক চারিত্র্য উন্মোচনে বাঙালী মুসলিম সমাজের বিলম্ব ঘটে নি। ১৯৪৭ সাল থেকে পরবর্তী ঘটনাবহুল আন্দোলনসমূহ সে কথার প্রমাণ করে। আর এই আন্দোলনে শেখ মুজিবের ভূমিকা যেমন সুদূর প্রসারিত তেমনি দুর্বার।

দুর্ভাগ্যের বিষয় পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলাদেশ যখন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, পাকিস্তানের অন্য অংশ যথা—পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তখন এই আন্দোলনে দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা নিয়ে যোগ দিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোটে নির্ধারণ করতে হয়েছে যে এখানকার জনগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যোগ দিবেন কিনা—তাঁদের মনে সুদীর্ঘকাল দ্বিধা-সংকোচ বিদ্যমান ছিল। পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর মানসিকতাও খুব সুস্পষ্ট ছিল না। অথচ যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, প্রথম থেকেই সেই বাংলাদেশকেই ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এমন কি পাকিস্তান

পাকিস্তান আন্দোলনে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকা

প্রতিষ্ঠার পূর্বে থেকেই এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। বন্ধু গাজীউল হক একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

The Pakistan resolution adopted by the Annual Convention of All India Muslim League in Lahore in 1940, it is useful to remember, was moved by the undisputed Muslim Leader of Bengal, Sher-e-Bangla A. K. Fazlul Haq. Prior to the final transfer of power Lord Mountbatten proposed an interim government of India in which he invited both the Indian Congress and Muslim League to participate. Jinnah decided to join the interim government on the 15th October, 1946. The panel of Ministers to represent the Muslim League included Nawabzada Liaquat Ali Khan, I. I. Chundrigar, Sardar Abdur Rob Nishtar, Raja Gaznafar Ali Khan and Jogendra Nath Mondal. It looks significant in retrospect that stalwarts amongst the leaders of Muslim Bengal like A. K. Fazlul Haq, H. S. Shuhrawardy, Abul Hashem, or even 'very loyal' Khawja Nazimuddin were carefully avoided. ·····This evasion is all the more ironic since only a few months back in a referendum on the partition issue ninety eight per cent of the Bengali Muslims had cast their votes in favour of the creation of Pakistan as against forty nine per cent of the Punjabi Muslims. The unequivocal Bengali mandate was used as the basis in the burgain for power but claims of the Bengali leadership was by-passed in a very undemocratic manner. Subsequent history of Pakistan is the history of systematic elimination of Bengali leadership from positions of influence and power in Pakistan through a series of evasion, prevarication, deceit and undemocratic surres-ptitious manoeuvres.

[*Bangladesh Unchained*, Calcutta, 1971, P. 30]

ভারতীয় হিন্দুদের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা দেয়া হলে সেই দেশে বসবাস-কারী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হতে পারে—১৮৮৮

সালে ভারতের প্রখ্যাত মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ এই ধারণা প্রদান করেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ যে সাম্প্রদায়িক চিন্তা থেকে এ কথা বলেছিলেন তা' সত্য নয়। পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করবার জন্য তাঁর যে উৎকণ্ঠা ছিল সেই উদ্বেগ থেকেই তিনি এমন কথা বলেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর উক্তিটি উল্লেখযোগ্য ঃ

"Is it possible that under these circumstances two nations—The Mohammadan and Hindu—could sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and the inconceivable."

[Cited in Richard Symonds : *The Making of Pakistan*, London, P. 31]

স্যার সৈয়দ আহমদ "পাকিস্তান" সৃষ্টির কথা বলেন নি। তবে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের একত্রে বসবাস যে অসম্ভব তার ইংগিত তিনি দিয়েছিলেন। এর জন্য ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই তিনি ভারতীয় মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। জাতি শিক্ষিত হয়ে না উঠলে নিজের অধিকার আদায় করতে অসমর্থ হবে। সত্যি কথা বলতে কি, স্যার সৈয়দ আহমদ পরোক্ষ-ভাবে মুসলিম গণমনে জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ইংরেজদের বিরোধিতা করেন নি, তবে মুসলিম জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় রত ছিলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে বাংলার মুসলমান ইংরেজ ও হিন্দু জমিদার, তহসিলদার, মহাজন কর্তৃক নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছিল—সে ইতিহাস আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অধিকাংশ মুসলমানই জমিদার শ্রেণী থেকে উদ্ভূত। সেখানে জমিদারদের নির্যাতন গণমনে বিশেষ কোন বিক্ষোভের সৃষ্টি করে নি। তবে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্যাতন যে কমবেশী বিদ্যমান ছিল একথা অস্বীকার করি না। ১৯০৫ সালে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা যখন বঙ্গভঙ্গ রোধ করার জন্য

ঐক্যজোট বেঁধেছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন তখনও পশ্চিম-ভারতে বিশেষতঃ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের জনগণ রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিলেন নিদারুণভাবে পশ্চাদপদ। এসব প্রদেশের অধিকাংশ মুসলিম বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন এবং মুসলিম লীগের সাথে সহযোগিতা করেন নি। এ সম্পর্কে কে. কে. আজিজ সাহেবের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য ঃ

"It was an interesting feature of Muslim politics in India that the demand for Pakistan received greatly support in the Hindu-majority province than in the Muslim-majority province.

The Punjab was predominately Unionist till the end of 1945, Sindh did not take kindly to the Muslim League till 1946 and the Frontier Province maintained its Red Shirts in power till the Independence day."

[K.K. Aziz : *The Making of Pakistan*,1967, London, P. 205]

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। নবাব সলিমুল্লাহ্ এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন ঃ

(ক) "ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের রাজভক্তি বৃদ্ধি করা এবং সরকারী কার্যক্রমের ব্যাপারে তাদের মধ্যেকার ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটান ;

(খ) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও অধিকার আদায় এবং সংরক্ষণ করা ; এবং যথাযোগ্য পদ্ধতিতে তাদের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় সরকারের ওয়াকিফহাল করা ; এবং

(গ) অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যাতে কোন বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য, লীগের অপরাপর নীতি ব্যাহত না করে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।"

[আকবর উদ্দীন ঃ কায়েদে আযম, পৃঃ ৭৩]

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। বাংলার জনগণ কেন পাকিস্তান সৃষ্টির বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছিল এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশ্চিম পাকিস্তানে জনগণের মনে এই

আন্দোলনের তরঙ্গ তেমনভাবে নাড়া দিতে পারে নি। তাদের মনের ওপর দিনের পর দিন ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে হয়েছিল এবং প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পরিকল্পনা তাদের মনে তেমন কোন আবেদন সৃষ্টি করে নি। বিশেষতঃ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের জনগণ ও নেতৃবৃন্দকে মুসলিম লীগের ছায়াতলে একত্রিত করতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়েছিল। জিন্নাহ্‌র জীবনী লেখক বলেছেন ঃ

পাকিস্তান আন্দোলন ও পাঞ্জাব

"১৯৩৭-এর নির্বাচনে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ প্রার্থীগণ মোটেই সুবিধা করতে পারেন নাই। স্যার ফজলী হোসেন-প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নিস্ট পার্টি জয়ী হয়। .. ১৯৩৭ সালে লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সিকান্দার হায়াত দলীয় মুসলিম সদস্যদের নিয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। বাংলার মতো পাঞ্জাবের দুর্ভাগ্য ছিল যে, উক্ত প্রদেশেও শিখ ও হিন্দুরা ছিল সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মালিক ও অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য সিকান্দার হায়াতকে শিখ ও হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সিকান্দার হায়াত প্রকৃতপক্ষে ভারত বিভাগ প্রস্তাবের আন্তরিক সমর্থক ছিলেন না। ... কায়েদে আযম তাঁর মনোভাব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ কিছু করারও পক্ষপাতী ছিলেন না। যতদিন পাঞ্জাবে মুসলিম জনগণের মত লীগের পক্ষে সুসংবদ্ধ না হয়, ততদিন তিনি সিকান্দার হায়াতকে প্রকাশ্য বিরোধিতা করার সুযোগ দিতে চান নাই। ১৯৪২ সালের শেষ দিকে সিকান্দার হায়াতের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবের বৃহত্তম জমিদার খিজির হায়াত খান তিওয়ানা ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতা ও প্রাদেশিক উজীরে আলা নির্বাচিত হন। খিজির হায়াত সিকান্দার হায়াতের দু'মুখী নীতি অনুসরণ করতে থাকেন।

... পাঞ্জাবের গভর্নর ও ব্রিটিশ শাসকবর্গ এবং ভারত সরকার তাঁকে লীগের আওতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। ... কায়েদে আযম প্রথম দিকে খিজির হায়াতের দু'মুখী নীতি সত্ত্বেও কোন প্রকার গুরুতর ব্যবস্থা অবলম্বন না করে পাঞ্জাবের মুসলমানদের লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করতে থাকেন—যাতে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে ইউনিয়নিস্ট পার্টির ক্ষমতা ধ্বংস করা সম্ভব হয়। ১৯৪৪ সালের মার্চ

ও এপ্রিল মাসে কায়েদে আযম লাহোরে গিয়ে খিজির হায়াত ও ইউনিয়নিস্ট দলীয় অন্য মুসলিম সদস্যদের 'ইউনিয়নিস্ট পার্টি' মন্ত্রিসভা'র পরিবর্তে 'মুসলিম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা' নামকরণের প্রস্তাব করেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং হিন্দু ও শিখ সদস্যদের তীব্র বিরোধিতার দরুন কায়েদে আযমের আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।"

[আকবর উদ্দীন : কায়েদে আযম, পৃঃ ৬৩০—৬৩১]

পাঞ্জাবের অবস্থা সম্বন্ধে আরো বলা যায় :

"In the Punjab Assembly elected in 1937, only two members were returned on the League ticket. One of them, Raja Ghazanfar Ali Khan, joined the Unionist Party, which secured 96 seats out of 175. The Chief Minister, Sikander Hayat Khan, joined the Muslim League at the Lucknow session of the League held in October, 1937. However, he remained the 'coalitionist first and Leaguer second', and maintained the seperate existence of the Unionist Party. In spite of Sikander Hayat Khan's reconciliatory attitude towards the Hindus and Shikhs, there were frequent 'Scenes' in the legislature on communal issues. After Sikander Hayat Khan's death in 1942, Khizr Hayat Khan, the Minister for local-self government formed a ministry and included Sikander's son, Saukat Hayat Khan, as minister for public works, who was later dismissed in 1945 on charges of corruption and maladministration. Khizr Hayat Khan was less willing to co-operate with the Muslim League. In the elections of 1946, the Muslim League own 79 out of 86 Muslim seats but with the support of the provincial governor and Congress blessing Khizr Hayat again formed a ministry. The Muslim League launched civil disobedience movement against the ministry and in March 1947 The Khizr Ministry resigned."

[Talukder Moniruzzaman : *The Politics of Development : The Case of Pakistan 1947-1958*, PP. 34—35].

সিন্ধুর অবস্থা আরো শোচনীয় ছিল।

১৯৩৫ সালের এ্যাক্‌ট অনুসারে বোম্বাই প্রদেশ থেকে সিন্ধু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সিন্ধুতে মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে যে দৈন্য ও অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল তা' সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে আর কোথাও ছিল না। ৬০টি আসনের মধ্যে মুসলিম সদস্যরা ৩৪টি আসন দখল করলেও এঁরা সবাই ছিলেন বিরাট ভূস্বামী—মুসলমানদের দল নানা বিবদমান দলে বিভক্ত ছিল। পর পর স্বল্পস্থায়ী মন্ত্রিত্ব গঠন করেন জি. এইচ. হেদায়েতুল্লাহ্, আল্লাহ্ বখ্‌শ, বন্দে আলী খান এবং পুনরায় আল্লাহ্ বখ্‌শ। ১৯৪২ সালের অক্‌-টোবর মাসে গভর্নর কর্তৃক আল্লাহ্ বখ্‌শের অপসারণের পর গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ্ মন্ত্রিত্ব গঠন করেন এবং মুসলিম লীগে যোগ দেন। কিন্তু জি. এম. সাঈদের সাথে হেদায়েতুল্লাহ্‌র বিরোধের ফলে পরিস্থিতি অস্থিতিশীলই রয়ে গেল। এমন কি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে যদিও মুসলিম লীগ ২৯টি মুসলিম আসন দখল করল, তখনও অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি এবং অচলাবস্থা এমন একটি পর্যায়ে মোড় নিল যাকে উপমহাদেশের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ইতিহাসে একক বলে উল্লেখ করা চলে। ১৯৪৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনবার জন্য পরিষদের বৈঠক বসে। দলগুলোর মধ্যে সমান সমান ভোট হওয়ায় স্পীকার পদত্যাগ ক'রে সরকার পক্ষে ভোট দেন এবং ডেপুটি স্পীকার পদত্যাগ ক'রে ভোট দেন বিরোধী পক্ষে—পরিষদ-সভাপতির আসন শূন্য থাকে। এই অবস্থায় গভর্নর ফ্রান্সিস মুডী গভর্নর জেনারেলকে ভারত সচিবের সাথে আলোচনাক্রমে পরিষদ ভেঙে দেবার পরামর্শ দেন এবং অবশেষে তাই করা হয়।

পাকিস্তান আন্দোলন ও সিন্ধু

[Kith Callard, *Pakistan : A Political Study*, London, George Allen & Unwin Ltd., 1957, P. 29]

এরপর নতুন নির্বাচন হয় এবং এতে মুসলিম লীগ ৩৪টি মুসলিম আসনই লাভ করে। কিন্তু তথাপি গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ্ ও এম. এ. খুরো এই দুই জনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে বিরোধ বাধে এবং পাকিস্তান অর্জিত হবার পরেও এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে।

বেলুচিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে সাইমন কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঃ

In the large tract of Beluchistan, consisting of the British administered territorry and the states of Kalat, Makran, Las Bella and Karan, no reforms were introduced. British Beluchistan was ruled with the help of Tribal Jirga system. Similarly, the states of Khairpur, Bahawalpur and the states of N.W. F.P. Like Chitral, Chamb, Dir, and Swat, which joined Pakistan were under princely rule and did not have any experience in responsible govt."

[Simon Report, Vol. I, PP.325—328. আরও দ্রষ্টব্য ঃ W. A. Welcox, *Pakistan, the Consolidation of a Nation,* New York. Col, Un. Press, 2nd Printing, 1964]

সীমান্ত প্রদেশের অবস্থাও একইরূপ। সেখানেও মুসলিম লীগকে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জনগণকে লীগের ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসতে হয়েছিল। এ সম্পর্কে একটি উক্তি স্মরণ করি ঃ

"In the 1937 elections Congress had a commanding position, because though it won only 19 out of 50 seats, the other Muslim members were far from united. At first, Sir Abdul Qayyum Khan formed a minority ministry. After his death, a Congress Ministry was formed by Dr. Khan Shahib. After the resignation of Dr. Khan Shahib in 1939 under the direction of the Congress 'High Command', Governor's rule was imposed. In May 1944 when eight Congress members were in the jail, Aurangazeb Khan succeeded in forming a ministry with Sardar Abdur Rab Nistar as his Finance Minister. In March 1945, after the release of the Congress members, Dr. Khan Shahib retained a dominant position and formed a ministry again. He continued in office until after the referendum in which the N.W.F.P. voted overwhelmingly for Pakistan. After the referendum Dr. Khan's Cabinet was

dismissed by the Governor under the instruction of Jinnah, the new Governor General.

[তালুকদার মনিরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬]

এদেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পত্তন করছিলেন ব্রিটিশ সরকার। এ সম্পর্কে জনৈক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক যা' বলেছেন তা' থেকে আমরা আলোকপ্রাপ্ত হতে পারি ঃ

The British approach to political development in British India differed from the Colonial model because of the absence of a participant citizen body. Since 1920, an attempt was made to create a participant type of electorate and give some Indians training as Ministers and Legislators. Under the 1919 Reforms four provincial elections were held with about 3 per cent of the people forming the electorate. Under the 1935 Act, two provincial elections were held with about 14 per cent of the people enfranchised. But before 1914 there was no mass-based Muslim political parties. So the elections in Muslim Provinces were contested on personal and communal issues rather than on political programmes. The elections of 1945---46, of course, created great enthusiasm among the Muslim masses. But the elections this time were fought, as Jinnah put it on numerous occassions, 'on the single issue of Pakistan', and even the illiterate voters with their 'united frame of reference' could understand the simple issue of Pakistan. It is, therefore, difficulte to conclude that the successive elections held under British auspices did in part adequate understanding of the process of the parliamentary system of Government to the Muslim masses. Similiarly, the number of Muslim Politicians who got experience as legislators and Ministers was small and the study of the operation of the parliamentary system in the Muslim Provinces during the years 1936-47 shows that, because of various reasons—lack of disciplined parties in the Assemblies

of the Muslim-Majority Provinces, less than proportionate Muslim representation in some of the Assemblies, the Muslim Leaders, preoccupation with the achievements of Pakistan rather than learning the art of governing—the Muslim politicians could not accure much skill in administering the country and the parliamentary rule".

[তালুকদার মনিরুজ্জামান প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬-৩৭]

পাকিস্তান আন্দোলন কেন হয়েছিল এবং কেনই বা বাঙালী মুসলমান সমগ্র বৃটিশ ভারতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন একথা বিশদ-ভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। নির্যাতিত মানুষ, শোষিত মানুষ মুক্তির জন্যই এই আন্দোলনকে গণ-আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করে ব্যাপক সমর্থন দান করেছিল। একথা স্বীকার করি যে মুসলিম লীগ একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং একথাও স্বীকার করতে হয় যে মুসলিম লীগ ধর্মকে সামনে রেখে জনগণের সস্তা সেন্টিমেন্টকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবার কাজে ব্রতী ছিল—কিন্তু একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে মুসলিম লীগ যে ভাবে এবং যে উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলনে নেতৃত্বদানে অগ্রসর হোক না কেন, জনগণ মূলতঃ অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে এবং গৌণতঃ ধর্মীয় নিরাপত্তার কারণে এই আন্দোলনে শরীক হয়েছিল। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাকিস্তানের জন্ম

পাকিস্তান আন্দোলনের সঠিক সাফল্য নির্ভরশীল ছিল ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ওপর। উক্ত নির্বাচনকে, পাকিস্তান আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ যেভাবে সর্বত্র ঘোষণা করেছিলেন, ব্রিটিশ ভারতের মুসলমান পাকিস্তান চাহেন অথবা চাহেন না, এই প্রশ্ন মীমাংসার প্রধানতম উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির কামনায় সেদিন প্রায় সবাই এই নির্বাচনকে অনুরূপ দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন। এই নির্বাচনে শেখ মুজিব তাঁর তরুণ নেতৃত্বের প্রায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

১৯৪৩ সাল থেকে শেখ মুজিব বাংলাদেশের মুসলিম লীগের কাউ-ন্সিলার ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী ও মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ যুবক শেখ মুজিবের অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও জন-সংযোগ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ফলে ছাত্রাবস্থায় অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফরিদপুর জেলায় মুসলিম লীগের নির্বাচনী কাজ চালানোর পুরো দায়িত্ব শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন। এই সময়ই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন শেখ মুজিব। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি বাস্তবকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল। তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘূর্ণির ন্যায় ছুটে বেড়াতেন জনতার সাথে মিশে—কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনতে তাঁর ভাল লাগতো। এই দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। এই ভাবেই ক্ষুদে রাজনীতিবিদ তিল তিল করে বাংলার মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তাঁর নির্বাচনী প্রচার-ক্ষেত্র শুধু ফরিদপুরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি যশোহর, খুলনা, বরিশাল জেলাতেও নির্বাচনী প্রচারের তদারকী করতে যেতেন। বিশাল জনসমুদ্রে তিনি দিনের পর দিন ভাষণ দিতেন।

১৯৪৬ সনের নির্বাচন ও শেখ মুজিব

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যুগ যুগ ধরে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছে আর এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছে সমাজের শোষিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষ। শাসকের অত্যাচারের মাত্রা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে, তখনই তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। স্বৈরাচারী শাসকের আচরণে জনমনে তিল তিল করে দিনের পর দিন যে বিক্ষোভ জমে উঠে, একদিন তা' বীভৎসভাবে ফেটে পড়ে। আর ইতিহাস এসব কাহিনী তার পাতায় বহন করে ভাবী বংশধরদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। ভাবী বংশধরগণ পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে শিক্ষা লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার প্রেরণা বাংলার পূর্বপুরুষদের, বিশেষতঃ কৃষক, শ্রমিকদের কাছ থেকেই পেয়েছেন। কোন দেশ ও জাতি যখনই অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ওঠে, সেই বিপর্যয়ের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্য মানুষের মধ্যে থেকেই আবির্ভূত হন এক একজন মহান নেতা, যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস একথা প্রমাণ করেছে। শেখ মুজিবও এমনি একজন মহান নেতা। সাধারণ মানুষের শ্রেণী থেকেই তাঁর উদ্ভব। দু'শো বছর ব্রিটিশ শোষণ ও শাসন এবং পরবর্তী ২৪ বছর পাকিস্তানী বর্বরতা এমন এক নেতৃত্বকে জন্মদান করেছে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই শেখ মুজিবের ন্যায় এমন একজন মহান নেতার নেতৃত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য, হতাশা, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ যুগে যুগে যে প্রতিবাদ জানিয়েছে, গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ অথবা ফেটে পড়েছে বিদ্রোহের প্রচণ্ডতায়, শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ের কৃষক-বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ এবং এ জাতীয় বিদ্রোহের অন্তরালে যে মুক্তির আলোক এদেশের মানুষ যুগে যুগে সন্ধান করে এসেছে—শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বে তারই এক মূর্ত প্রতীক আমরা দেখতে পাই। বাংলাদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করাই ছিল তাঁর প্রধানতম সাধনা।

শেখ মুজিবের সংগ্রামী চেতনার উৎস

ব্রিটিশ আমলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের মুক্তি সাধনের জন্য যে সংগ্রাম, তা' কোম্পানীর শাসনামল থেকেই শুরু হয়েছিল। এ সম্পর্কে 'স্বাধীনতা সংগ্রামের বাঙলা' গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি কবিরাজ লিখেছেন ঃ

"বাংলার জনগণের কাছে সেদিন কোম্পানীর শাসন বিদেশীর শোষণ বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। সিরাজদ্দৌলা ছিলেন দেশের শেষ স্বাধীন নবাব, তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করেন। বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের মুক্তি সাধনের জন্য প্রথম সংগ্রাম ঘোষণা করেন মীর কাসিম। কাজেই তাঁর এই সংগ্রাম তদানীন্তন ঐতিহাসিক পর্বে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত

প্রকৃতপক্ষে, মীর কাসিমের সময় থেকেই বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত।"

[পৃষ্ঠা ৫২]

ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করার জন্য ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে কোম্পানী ভারতে জায়গা-জমি কিনতে ও ক্ষেত-খামার গড়তে শুরু করে। কোম্পানী এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েই নীলচাষে উৎসাহ প্রদান করে। ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নীলচাষের ব্যাপক প্রচলন হয় এবং ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে ভারত থেকে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে নীল একটি প্রধান দ্রব্য হয়ে ওঠে। নীলকুঠির মালিক ছিল ইংরেজ। এরা নিরীহ কৃষকদের জমিতে নীলচাষ করত। তা' ছাড়া বিভিন্নভাবে উৎপীড়ন করে বাংলার কৃষকদেরকে নীলচাষে বাধ্য করেছিল। ফলে, ইংরেজদের এই লাভজনক ব্যবসার ক্ষেত্রে বহু বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। নীলচাষীরা ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করে। ইংরেজ কুঠিওয়ালা নিরীহ জনগণের ওপর কি ব্যবহার করত পূর্বে তা' উল্লেখ করেছি। Blair B. Kling-এর The Blue Mutiny গ্রন্থ থেকে উদাহরণ দেয়া যায়:

"The most active and numorous group of peasant leaders were village headmen and substantial ryots. As spokesmen for the villagers they were approached by the planters to contract on behalf of the cultivators to supply indigo. If they refused they were taken hostage by the planters and confined in factory godowns."..

[পৃষ্ঠা ৮৫]

কিন্তু বাংলার মানুষ নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করে নি। ইংরেজ কুঠি-ওয়ালা নিরীহ জনগণের ওপর কি ব্যবহার করত পূর্বে তা' উল্লেখ করেছি। Blair B. Kling-এর The Blue Mutiny গ্রন্থ থেকে আরো উদাহরণ দেয়া যায়:

"Bengal might well be proud of its peasantry. ···Wanting power, wealth, political knowledge and even leadership, the peasantry of Bengal have brought about a revolution inferior in magnitude and importance to none that has happened in the social history of any other country. ...With the Government

against them, the law against them, the Tribunals against them, the press against them, they have achieved a success of which the benefits will reach all orders and the most distant generations of our countrymen. And all this they have done by sheer force of virtue, by patience, perseverance and fortitude, without committing a single crime—almost a single act of violence."

[পৃঃ ১২০]

শুধু নীল-বিদ্রোহ নয়, বাংলার মানুষ সব সময় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলন গড়ে তুলেছে। তিতুমীরের বিদ্রোহ, সিপাহী-বিদ্রোহ, কৃষক-বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, ফকির-বিদ্রোহ দৃষ্টান্ত হিসেবে এগুলোকে উল্লেখ করা যায়।

বিভিন্ন সময়ে বাংলার কৃষক-বিদ্রোহকে বাঙালীর জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত বলা যায়। এমন কি, পাকিস্তানী আমলেও যে সমস্ত কৃষক-অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল, সেগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করা দরকার।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় যে সব কৃষক-বিদ্রোহ ও সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়—এসব চেতনার মধ্যে দিয়ে দিনের পর দিন ১৯৭১ সালের মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকা ত্বরান্বিত হয়েছে।

কৃষক-বিদ্রোহ

ময়মনসিংহের নেত্রকোণার হাজং এলাকার কৃষক সমাজ দীর্ঘ দিন ধরে জমিদার, জোতদার, মহাজনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করে, এখানে তা' বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন মনি সিংহ এবং নগেন সরকার। হাজং এলাকার কৃষকদের সংগ্রাম অন্য এলাকার জনগণের ওপর এবং বিশেষভাবে কৃষক সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ সময় সিলেট, রাজশাহী, যশোর প্রভৃতি জেলায় কৃষক-অসন্তোষ প্রবলভাবে দেখা দেয় এবং ছোটখাট সংঘর্ষ সংঘটিত হয়।

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার এলাকায় কৃষকদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে—এই সংঘর্ষের উল্লেখ করে জনাব বদরুদ্দীন উমর তাঁর 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থে লিখেছেন :

"এই সংঘর্ষের সময় কৃষকরা লাঠি, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে পুলিশের গুলির সামনে এগিয়ে যান। পুলিশ এই কৃষকদের উপর ৪২ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে এবং তার ফলে ৬ জন কৃষক নিহত হন এবং ৩ জন মহিলাসহ ৬০ জনকে গ্রেফতার করা হয়।"

[পৃঃ ৩৩০]

রাজশাহী জেলার নাচোল অঞ্চলে যে কৃষক-বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তা' সত্যই হৃদয়বিদারক। স্থানীয় জোতদাররা সাঁওতাল কৃষকদেরকে ঠকিয়ে নিজেদের উদরপূর্তির চেষ্টায় থাকতেন। শোষণ, লাঞ্ছনা, ও নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে সাঁওতালগণ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এই অঞ্চলের সাঁওতাল ও কৃষক শ্রেণীকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও প্রেরণা দান করেন ইলা মিত্র, অনিমেষ লাহিড়ী, আজহার হোসেন এবং ইলা মিত্রের স্বামী হাবোল মিত্র।

নাচোল কৃষক বিদ্রোহ ও ইলা মিত্র

নাচোল বিদ্রোহের ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৫০-এর প্রথম দিকে। এই ঘটনার উল্লেখ করে জনাব উমর লিখেছেন ঃ

"সমবেত সাঁওতাল জনতা পুলিশের উপস্থিতিতে উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং তারা কৃষকদেরকে কিছুটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সেই উত্তেজনা ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত এই উত্তেজনা এত বেড়ে উঠে যে কারো পক্ষেই জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না এবং পুলিশ তাদের উপর গুলিবর্ষণ করে একজন সাঁওতালকে হত্যা করে। এরপর সাঁওতালরা এ. এস. আই. সহ অন্য তিনজন কনস্টেবলকে বন্দী করে তাদের রাইফেল কেড়ে নেন এবং পরে তাদেরকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলেন।

থানার দারোগা এবং কনস্টেবলদের নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর পেয়ে রাজশাহী জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার একদল সশস্ত্র পুলিশসহ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং স্থানীয় সাঁওতাল ও কৃষকদের উপর নির্মম নির্যাতন শুরু করেন। মৃত চারজন পুলিশের লাশ তাঁরা স্থানীয় কিছু লোকের সহায়তায় মাটি খুঁড়ে বের করেন এবং রাজশাহী সদরে পাঠিয়ে দেন এবং তারপরই শুরু হয় তাঁদের আসল অত্যাচার।

পুলিশ সমস্ত এলাকায় প্রতিটি কৃষক-বাড়ীর মধ্যে ঢুকে নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নির্মমভাবে তাদের মারপিট শুরু করে। বহু নারীকে তারা ধর্ষণ করতে পর্যন্ত দ্বিধা করে না। পুলিশ হত্যার 'উপযুক্ত' প্রতি-শোধ নেওয়ার জন্য তারা শুধু এখানেই ক্ষান্ত হয় নি। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের খোঁজ-খবরের জন্যে তারা আরও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কায়েম করে একটা ত্রাসের রাজত্ব।"—

[পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ঃ পৃঃ ৩৩২—৩৩৩]

তদানীন্তন সরকার ইলা মিত্রকে গ্রেফতার ক'রে তাঁর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল তা' তাঁর জবানবন্দীর মধ্যে পাওয়া যাবে। জনাব বদরুদ্দীন উমর তাঁর গ্রন্থে এই অত্যাচার ও লাঞ্ছনার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"ইলা মিত্রকেও এই সময় মাঝে মাঝে জেল গেটে নিয়ে গিয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় হাজির করা হ'ত এবং কয়েদীদেরকে দেখিয়ে তারা বলতো, 'তোমরা রাণীমাকে দেখো। ইনি আবার রাণী হয়েছিলেন।"

[ঐ, পৃঃ ৩৩৭]

কৃষক-বিদ্রোহের দু' একটি চিত্র এখানে তুলে ধরা হ'ল। এসব ঘটনা থেকে শেখ মুজিব নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। শেখ মুজিব বাংলার বেদনার্ত মানুষের মুক্তির জন্যই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। সেই প্রস্তুতি সংগ্রামে রূপ পরিগ্রহ করে। আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় যুগ যুগ ধরে বাংলার মানুষ যা কামনা করেছে সেই দুর্লভ এবং প্রিয় স্বাধীনতা। শেখ মুজিব এই স্বাধীনতার মহানায়ক।

যাহোক, এবার আমরা আগের কথায় ফিরে আসি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলার মুসলমান সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন মুসলিম লীগকে আরও শক্তিশালী করে তুলল। এই নির্বাচনে শেখ মুজিবও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। যদিও এই সময় তিনি ছাত্র, তথাপি অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের বলে তিনি নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে প্রভাব বিস্তার করে-ছিলেন অনেক বড় বড় নেতাও তাতে বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। এই নির্বাচন উপলক্ষেই শেখ মুজিব তমিজ উদ্দীন খাঁ, লালমিয়া, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ নেতাদের সাথে পরিচিত হন।

এ সময় ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কথাবার্তা বলে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য ভারত-বর্ষে আসেন। ব্রিটেন-এ তখন শ্রমিক দল মন্ত্রিসভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রমিক মন্ত্রিসভা তাঁদের তিনজন প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠান।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের ভারত আগমন

কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরস্পর-বিরোধী দাবীর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন নি। তখন মন্ত্রী-মিশন ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠন সম্পর্কে এক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনা 'ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান' বলে পরিচিত। তাঁদের পরিকল্পনায় যেসব প্রস্তাব ছিল তা হ'ল ঃ

ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান

(১) ব্রিটিশ-ভারত এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর সমবায়ে একটি ভারত ইউনিয়ন গঠিত হবে। ইউনিয়ন সরকারের উপর বৈদেশিক, দেশরক্ষা ও যানবাহন এই তিনটি বিষয়ের ভার দেয়া হবে। এ ছাড়া ইউনিয়ন সরকারের কাজ পরিচালনার জন্য আবশ্য-কীয় অর্থ আদায়ের ক্ষমতাও তাকে গ্রহণ করতে হবে। এগুলো ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হবে।

(২) কোন প্রধান সাম্প্রদায়িক বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে হলে আইন সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আবশ্যক।

(৩) প্রদেশগুলোকে তিনটি দলে (group) ভাগ করা হয় এবং তাদেরকে দলীয় সরকার বা গ্রুপ সরকার গঠনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তিনটি গ্রুপ যথা—গ্রুপ 'এ' প্রদেশগুলোতে থাকবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। গ্রুপ 'বি'-তে থাকবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান—যেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। গ্রুপ 'সি'-তে থাকবে বাংলা ও আসাম যেখানে মুসলমানগণ অল্প কিছু-সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, ক্যাবিনেট মিশনের এই প্রস্তাব মূলতঃ মনীষী ও কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদের পরিকল্পনার উপর ভিত্তি ক'রে তৈরী করা হয়েছিল। মওলানা আজাদ এর আগে উক্ত মিশনের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনার পর ১৯৪৬ সালের ১৫ই এপ্রিল এক ঘোষণায় এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লিখলেন ঃ

মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও তাঁর প্রস্তাবাবলী

"আমি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীটিকে সর্বতোভাবে বিবেচনা ক'রে দেখলাম। একজন ভারতবাসী হিসাবে ভবিষ্যতে এটি ভারতবর্ষের পক্ষে কতটা উপযোগী সেটিও বিবেচনা করে দেখেছি। একজন মুসলমান হিসাবেও এটি আমি বিচার ক'রে দেখেছি যে, ভবিষ্যতে এটি মুসলমানদের ভাগ্যকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই পরিকল্পনাটিকে সর্বতোভাবে বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তেই পেঁৗচেছি যে এটি শুধুমাত্র ভারতবর্ষেরই ক্ষতি করবে তা' নয়, এই পরিকল্পনা ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষেও ক্ষতিকর। সত্যি কথা বলতে কি, এই পরিকল্পনা সমস্যাগুলোর সমাধান করার চাইতে সমস্যাগুলোকে আরো বাড়িয়ে দেবে।

এখানে আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে পাকিস্তান কথাটাই আমার অভিরুচির বিরুদ্ধে। এই নামের দ্বারা এটাই বোঝায় যে পৃথিবীর কিছুটা জায়গা শুধু পবিত্র অন্য সব জায়গা অপবিত্র। এইভাবে পবিত্র ও অপবিত্র তরিকায় দেশ ভাগ ইসলাম বিরোধী এবং ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচ্যুত। ইসলাম এই ধরনের কোন ভাগাভাগি স্বীকার করে না। আল্লাহ্‌র দূত বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ সমস্ত পৃথিবীটাকেই আমার মসজিদ হিসাবে গড়েছেন।' এ ছাড়া আমাদের মনে হয় যে, পাকিস্তানের পরিকল্পনা পরাজিত মনোভাবের প্রতীক এবং এটি ইহুদীদের মাতৃভূমির দাবীর মতই দাবী। এ কথা অতি পরিষ্কারভাবেই স্বীকার করতে হয় যে, যেহেতু ভারতের মুসলমানগণ সারা ভারতকে নিজেদের শাসনে রাখতে পারবেন না, সেইজন্য তাঁরা ভারতবর্ষের একটি কোণকে বেছে নিয়েছেন, যেখানে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। যে কেউই যুক্তি দিয়ে ইহুদীদের একটি নির্দিষ্ট মাতৃভূমির দাবীকে

মেনে নিতে পারেন। কারণ তাঁরা পৃথিবীময় বিচ্ছিন্নভাবে বাস করছেন। এবং কোন দেশের ব্যাপারেই তাঁরা কোন বক্তব্য রাখতে পারেন না। ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সারা ভারতবর্ষের নয় কোটির উপর মুসলমান জনগণ সংখ্যার দিক থেকে ও গুণের দিক থেকে ভারতবর্ষের জনজীবনের ও শাসনঘটিত সমস্ত ব্যাপারেই যথেষ্ট প্রভাবশালী। এতদুপরি প্রকৃতি তাঁদেরকে সাহায্য করছে কয়েকটি বিশেষ জায়গায় তাঁদের একত্রিত ক'রে।

এই বাস্তব অবস্থায় পাকিস্তানের দাবীর কোন মূল্যই থাকতে পারে না। একজন মুসলমান হিসাবে আমি তো কিছুতেই সমস্ত ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব থেকে আমাদের সরিয়ে নেবার কথা ভাবতেও পারি না। আমি মনে করি যে, যেটি আমার প্রাপ্য ও যেটিতে আমার অধিকার আছে সেটি থেকে সরে যাওয়া ভীরুতারই নামান্তর।"

[আমি মুজিব বলছি : কৃত্তিবাস ওঝা, পৃঃ ১৬২—১৬৩]

মওলানা আজাদ সাহেব স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করেছিলেন যে মুসলমানরা দেশ বিভক্তির দাবীতে সোচ্চার হচ্ছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে মুসলমানদের একটাই মাত্র ভয় ছিল অবিভক্ত ভারতে স্বাধীনতার সম্বন্ধে, তাঁরা মনে করতেন, ভারত বিভাগ না হয়ে স্বাধীন হলে কেন্দ্রে যে সরকার স্থাপিত হবে তাতে হিন্দুরাই আধিপত্য করবে এবং মুসলমানদের উগর করবে নির্যাতন। এই সমস্যার সমাধানের জন্য মওলানা আজাদ সাহেব এক পরিকল্পনা দিয়ে বললেন যে মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশগুলো যে যার নিজের প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাবে। এই একই সঙ্গে বৃহত্তর স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেবার অধিকারও তাদের থাকবে।

এই প্রস্তাব ছাড়াও বৃহত্তরভাবে তিনি যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেটি নিম্নরূপ :

The situation of India is such that all attempts to establish a centralised and unitary Government are bound to fail, equally doomed to failure is the attempt to divide India into two states. After considering all aspects of the questions, I have come to the conclusion that the only solution can be on

the lines embodied in the Congress formula which allows room for development to both the Provinces and to India as a whole. ....I am one of those who consider the present chapter of communal bitterness and differences as transient phase of India. I am reminded of a saying of Gladstone that the lest cure for a man's fear of water is to throw him into it. Similarly, India must assume responsibility and administer her own affairs before fears and suspicion can be fully allowed. When India attains her destiny, she will forget the present chapter of communal suspicion and conflict and face the problems of modern life from the modern point of view. Difference will no doubt persist but they will be of economic, not communal. Opposition among political parties will continue, but they will be based not on religion but on economic and political issues. Class and not the community will be the basis of future alignment and policies will be shaped accordingly."

[আমি মুজিব বলছি ঃ কৃত্তিবাস ওঝা, পৃঃ ১৬৪—৬৫]

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ

আজাদের এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি ক'রে ক্যাবিনেট মিশনের উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ উভয়েই সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। মিঃ জিন্নাহ্ এই প্রস্তাবকে পাকিস্তান দাবীর কাছাকাছি বলে মন্তব্য করলেন। গান্ধীজি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের প্রশংসা করলেন কিন্তু ঐ বছরেই কংগ্রেস সভাপতি বদলে যাওয়ায় পরিকল্পনাটি বানচাল হয়ে যায়। নব নির্বাচিত সভাপতি মিঃ জওয়াহেরলাল নেহেরু এ বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন ঃ

"Completely unfiltered by agreements and free to meet all situation as they arise."

[আমি মুজিব বলছি ঃ কৃত্তিবাস ওঝা, পৃঃ ১৬৭]

নেহেরুর এই উক্তির তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে। মিঃ জিন্নাহ্ এটিকে 'কংগ্রেসের বদ মতলব' বলে সমালোচনা করতে লাগলেন।

২৭শে জুলাই (১৯৪৬) মুসলিম লীগের এক সভা ডেকে উক্ত সভায় ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে বাতিল ক'রে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ডাইরেক্‌ট এ্যাকশন

আরেক প্রস্তাবে ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬) পাকিস্তানের দাবীতে 'ডাইরেক্‌ট এ্যাকশন ডে' পালন করার আহ্বান জানানো হ'ল। সেদিন জিন্নাহ্ ঘোষণা করেছিলেন, "আমাদের সামনে দু'টি পথ, হয় বিভক্ত ভারত, তা' নাহলে চূর্ণবিচূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারত।"

[আমি মুজিব বলছি ঃ কৃত্তিবাস ওঝা, পৃঃ ১৬৮]

মিঃ জিন্নাহ্ ডাইরেক্‌ট এ্যাকশন ডে'র কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী ঘোষণা করলেন না, বরং তিনি ঘোষণা করলেন, "আজ হইতে মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ত্যাগ করিল।"

[আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ঃ আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ২৫৩]

এই সময় সাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেছিলেন যে—আমাদের সংগ্রাম ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নয়—হিন্দুদের বিরুদ্ধে। বাংলার প্রধানমন্ত্রী তখন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তিনি ডাইরেক্‌ট এ্যাকশন ডে'র বিষয়টি পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারলেন। প্রদেশের জনগণের নিরাপত্তার খাতিরে তিনি ১৬ই আগস্ট ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করলেন। পরিশেষে শহীদ সাহেবের ধারণাই ঠিক হ'ল—বেধে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (পৃঃ ২৫১—২৫২) গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ও পরবর্তী কয়েক দিন কলিকাতায় যে হৃদয়বিদারক, অচিন্তনীয় ও কল্পনাতীত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছিল,

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া এ সব নৃশংসতা আর কোথাও দেখা যায়না। কলিকাতা দু'টি মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। দুর্ভাগ্যবতঃ দুইটার সময়ই আমি কলিকাতায় উপস্থিত ছিলাম। একটা ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে, অপরটা ১৯৪৬ সালের আগস্টে। গভীরতা, ব্যাপকতা ও নিষ্ঠুরতা সকল দিক

হইতে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা ১৯২৬ সালের দাঙ্গার চেয়ে অনেক বড় ছিল। চল্লিশ বছরের আগের ঘটনা বলিয়া ছাব্বিশ সালের দাঙ্গার নৃশংসতার খুঁটিনাটি মনে নাই। কিন্তু মাত্র বিশ বছরের আগের ঘটনা বলিয়া ছয়চল্লিশ সালের চোখের দেখা অমানুষিক নৃশংসতা আজও ঝলমলা মনে আছে। মনে হইলেই সজিব চিত্রের মতই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। গা কাঁটা দিয়া উঠে। স্বাভাবিক হৃদয়বান ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিবার কথা। ঘটিয়াছিল অন্ততঃ একজনের। আমার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আলীপুর কোর্টের এক ব্রাহ্মণ তরুণ মুন্সেফ সত্য সত্যই কিছুকালের জন্য মনোবিকার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রিটায়ার্ড জজ ও বয়স্ক উকিল-ব্যারিস্টারের মত উচ্চশিক্ষিত কৃষ্টিবান ভদ্রলোক-দিগকে খড়্গ রামদা দিয়া তাঁদের মহল্লার বস্তির মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করিতে দেখিয়াই ঐ তরুণ হাকিমের ভাবালু মনে অমন ধাক্কা লাগিয়াছিল। তিনি ছুটি লইয়া বেশ কিছুদিন সেন্ট্রাল হাসপাতালে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমার অবস্থাও প্রায় ঐরূপ হইয়াছিল। আমার মহল্লায় হয়তো একজন মুচি ফুটপাতে বসিয়া মুসলমানদেরই জুতা মেরামত করিতেছে। হয়তো একজন হিন্দু নাপিত ফুটপাতে বসিয়া ক্ষৌরকাজ করিতেছে। হঠাৎ কয়েকজন মুসলমান আততায়ী ধারাল রড বা বল্লম তার মাথায়, গলায় বা পেটে এপার ওপার ঢুকাইয়া দিল। মুহূর্তের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া লোকটি সেখানেই মরিয়া পড়িয়া রহিল। বীরেরা জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিলেন অন্য শিকারের তালাশে। এমন নৃশংসতা দেখিলে কার না মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিবে? অথচ এটাই হইয়া উঠিয়াছিল স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। বিপরীতটাই ছিল যেন অস্বাভাবিক। হৃদয়বান মানব-প্রেমিক বলিয়া পরিচিত আমার জানা এক বন্ধু এই সময় একদিন আমাকে কৈফিয়ৎ তলবের ভাষায় বলিয়াছিলেন, "কয়টা হিন্দু মারিয়াছেন আপনি? শুধু মুখে মুখেই মুসলিম প্রীতি।"

এই দাঙ্গার মুখ্য উদ্দেশ্য যে হিন্দু-মুসলমানদের আলাদা অস্তিত্ব নিরূপণ করা তা' বলাই বাহুল্য। মানবতাবিরোধী নৃশংস কার্যকলাপ চালিয়ে জাতির আলাদা অস্তিত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের স্থান ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট জায়গা জুড়ে থাকবে। পরবর্তীকালে পাকিস্তান

সৃষ্টির পরও মুসলিম লীগ সরকার দেশ থেকে বিধর্মীদের উচ্ছেদকালে পর পর কয়েকবার এখানে নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিল।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করলেন যে, দেশবিভাগ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। যে নেহেরু এতদিন পর্যন্ত অবিভক্ত ভারতের জন্য লড়াই করেছেন এবং জিন্নাহ্‌কে বিভেদপন্থী বলে উপহাস করেছেন, তিনিও শেষাবধি মুসলিম লীগের কারসাজির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

১৯৪৭ সালের মার্চে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে নতুন 'ভাইসরয়' হয়ে আসেন। তিনি সার্বিক পরিস্থিতি উপলব্ধি ক'রে পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে একটি নতুন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং তাতে কংগ্রেসের স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হন। মাউন্ট ব্যাটেনের এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে "ভারত-স্বাধীনতা আইন" নামে একটি আইন পাশ করেন। এই আইন ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সমাপ্তি ঘটায়। নিম্নে এই স্বাধীনতার প্রধান প্রধান ধারাগুলো দেয়া গেলো ঃ

ভারত-স্বাধীনতা আইন

(১) এই আইন ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দু'টো নতুন ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করবে।

(২) ইহা ভারতবর্ষের উপর থেকে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাবে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ভারতের উপর ব্রিটিশ সরকারের এবং পার্লামেন্টের সমগ্র ক্ষমতা ভারত ইউনিয়নে ও পাকি-স্তানে হস্তান্তরিত হবে।

(৩) দুই দেশের ইচ্ছেমতো স্ব-স্ব শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়, এবং প্রতিটি গণপরিষদ স্ব-স্ব দেশের ক্ষমতাশীল আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে নতুন শাসনতন্ত্র রচিত ও প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেশের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হিসেবে কাজ করে যাবে।

(৪) ডোমিনিয়নদ্বয় ব্রিটিশ রাষ্ট্রপুঞ্জের বা কমনওয়েলথের মধ্যে থাকবে কিনা, পাকিস্তান ও ভারতের গঠনতন্ত্র রচনার সময় সেই সিদ্ধান্ত করবার পূর্ণ অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়।

(৫) নতুন শাসনতন্ত্র রচিত ও প্রবর্তিত হবার পূর্ব পর্যন্ত নিম্ন-লিখিত শর্তাধীনে বা পরিবর্তন স্বীকারান্তে ভারত ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট মোটামুটিভাবে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন অনুসারে পরিচালিত হবে। তবে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইনে ১৯৩৫ সালের আইনের নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়ঃ

(ক) গভর্নর জেনারেলের এবং প্রাদেশিক গভর্নরদের 'ঐচ্ছিক' এবং বিচারবুদ্ধি (Discretionary powers and powers of individual judgment) অনুসারে কাজ করার ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। সুতরাং তাঁরা সকল সময়, সর্ব অবস্থায় এবং সকল বিষয়ে তাঁদের মন্ত্রিমন্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবেন।

(খ) ১৫ই আগস্টের পর পাকিস্তান ও ভারতের মন্ত্রিসভা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের শাসনতান্ত্রিক প্রথানুসারে স্ব-স্ব দেশের গভর্নর জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ করবার অধিকার পাবে।

(গ) ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট হতে দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর থেকে সম্রাটের সার্বভৌম-ক্ষমতা (Paramounty of the Crown) বিলুপ্ত হবে এবং তাদেরকে দুই ডোমিনিয়নের যে-কোন একটিতে যোগদান করবার অথবা স্বাধীনতা ঘোষণা করবার অধিকার দেয়া হয়।

এই আইন ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টে কার্যকরী করা হয় এবং এই উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান দু'টো স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা

উভয় দেশের স্বাধীনতা দিবস একই দিনে পড়ে যায় বলে পাকিস্তান ১৪ই আগস্টে (১৯৪৭) স্বাধীনতা দিবস বলে ঘোষণা করে।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের মধ্যরাতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারত-বিভাগের মাধ্যমে মুসলিম-প্রধান অঞ্চলগুলোকে নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির দাবীকে মেনে নেয়া হলেও আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার পাকিস্তানভুক্তির প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে যায়। এর দরুন পরবর্তী সময়ে তার জন্য সিলেটে রেফারেন্ডাম বা গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব সেই রেফা-

সিলেট রেফারেণ্ডাম ও শেখ মুজিব

রেন্ডামে ৫০০ কর্মীর নেতা হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ক্লান্তিবিহীন কর্মতৎপরতা চালিয়ে যান। অথচ সে সময় তিনি মাত্র বি. এ. ক্লাশের ছাত্র।

ইসলামিয়া কলেজে ছাত্র থাকাকালীন ছাত্রসমাজে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৪৩ সালের উক্ত কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে তিনি তাঁর সমর্থক প্রার্থীকে নিজের প্রভাববলে বিজয়ীর গৌরব দান করেছিলেন। ত'ছাড়া ১৯৪৬ সালে উক্ত ছাত্র নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ছাত্র রাজনীতি ও শেখ মুজিব

রাজনীতিকে জীবনের মুখ্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেও লেখাপড়ার প্রতি তিনি কোনদিন অবহেলা প্রদর্শন করেন নি। কেননা তিনি জানতেন, আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষালাভের দরকার। আর সে শিক্ষাকে তিনি কেবলমাত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে গ্রহণ করেন নি। একদিকে ইতিহাস ও সাহিত্য, অপরদিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনদর্শনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেন কলেজ-ছাত্রাবস্থা থেকেই। এই সময়ই তিনি কার্ল মার্কস্, বার্নার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ মনীষীর ভক্ত হয়ে পড়েন।

এর সাথে সাথে পরীক্ষার বৈতরণীও তিনি অনায়াসে পার হয়েছেন। ১৯৪৭ সালে উক্ত ইসলামিয়া কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। বি.এ.-তে তাঁর পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

বি. এ. ডিগ্রী অর্জন

যে রাজনীতিকে শেখ মুজিব জীবনের মুখ্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা' যশ, প্রতিপত্তি বা ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়—দুঃখ-দারিদ্র্য প্রপীড়িত অসহায় মানবাত্মা তাঁর চিত্তের বীণায় যে কান্নার সুর তুলেছিল তারই তাড়নায় তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে বেড়িয়েছেন। সেই সব মানুষের ন্যায্য অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই দেখা যায়, ছাত্রজীবন থেকেই সেই সংগ্রামের জন্য তিনি কিভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সে সময়ের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনৈক গ্রন্থকার শেখ মজিবের সমসাময়িক বন্ধুদের বক্তব্যের কথা তুলে ধরেনঃ

রাজনীতির উদ্দেশ্য

"একদিন উত্তর কলকাতায় শ্যামবাজার অঞ্চলের একটি সিনেমা হলে বাংলা ছবি দেখতে গিয়েছিলেন শেখ মুজিব ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু। যেমন—আফসার উদ্দীন, কাজী আহমদ কামাল (কামাল সাহেব বর্তমানে ঢাকা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার)। কিন্তু ছবি দেখার দিকে শেখ মুজিবের মন ছিল না। তিনি হলের মধ্যেই বন্ধুদের বললেন, এসো আমরা একটা নতুন রাজনৈতিক দল গড়ি। তারপর কামাল সাহেবকে বললেন—তুমি এ ব্যাপারে যা লেখাপড়া, খসড়া ইত্যাদি করা দরকার তা' করবে। আফসার উদ্দীনকে বললেন—তুমি যা টাকার দরকার দেবে। আর আমি নিজে মানুষের সামনে যাব, আমাদের দলের কথা, আমাদের কর্মসূচীর কথা বলব। এর কিছুদিন আগেই আফসার উদ্দীনের বাবা (যিনি ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) ছেলের জন্যে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা রেখে হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবের এই পরিকল্পনা সফল হয় নি। কারণ আফসার উদ্দীনের পক্ষে টাকা দেওয়া সম্ভব হ'ল না।"

[গতিবেগ চঞ্চল বাঙলাদেশঃ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব, অমিতাভ গুপ্ত, পৃঃ ৩৭—৩৮]

সংগ্রামী জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়

(১৯৪৮-১৯৫৮)

১৯৪৭ সালের আগস্টের মাঝামাঝি দেশ বিভাগের পর স্বাভাবিক-ভাবেই পাকিস্তানের শাসনভার মুসলিম লীগের উপর ন্যস্ত হয়। আমি আগেই বলেছি যে, মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের সবাই উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রবাহ থেকে আগত, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন নওয়াব, জোত্‌দার এবং বোম্বাই লাক্ষ্ণৌ গুজরাটির পুঁজিপতি।

ক্ষমতা হাতে পেয়েই মিঃ জিন্নাহ্ লিয়াকত আলী খানকে প্রধান মন্ত্রিত্ব দিয়ে নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। তাঁর বর্তমানে কোন বিষয়ে অন্য কেউ কর্তৃত্ব করুক এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই একনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জিন্নাহ্ ইচ্ছামত শাসন কাজ পরিচালনা করতে লাগলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর

কিন্তু দৈনন্দিন শাসনকার্য সম্পর্কে মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের কোন প্রকার জ্ঞানই ছিল না। ফলে সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে পড়ে আমলাদের হাতে।

এই মুসলিম আমলারাও পাকিস্তান সৃষ্টিতে সমর্থন জানিয়েছিলেন। অন্যদের মত তাঁরাও আশা করেছিলেন যে, পাকিস্তান থেকে হিন্দু আমলারা অপসারিত হলে তাঁদের দ্রুত পদোন্নতি হবে। তাঁদের এ আশা সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল।

দেশ বিভাগের পর রাজনৈতিক ক্ষমতা আমলাতন্ত্র কর্তৃক প্রভাবিত

হওয়ায় পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিবর্তনও তাঁদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। পাকিস্তানের ভূস্বামী এবং পুঁজিপতিদের সাথে তাঁদের এমন একটা সখ্যতা ও আঁতাত গড়ে ওঠে, যা পূর্ব বাংলার পক্ষে চরম সর্বনাশের সূচনা করে। দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর কিছু সংখ্যক মুসলমান পুঁজিপতি প্রচুর অর্থ নিয়ে ভারত থেকে চলে আসেন এবং এখানে কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক-বীমা প্রতিষ্ঠা ক'রে এ দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকেন। আগেই বলা হয়েছে, পূর্ব বাংলায় যে সব জমিদার ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। এঁদের অনেকেই আবার প্রাণে বাঁচার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই দেশ ত্যাগ ক'রে বসবাসের জন্য ভারতে চলে যান। ১৯৫০ সালে ভূমি সংস্কার নীতি প্রবর্তন ক'রে হিন্দু জমিদারদের সম্পত্তিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হয় এবং পূর্ব বাংলায় জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হয়। ফলে পূর্ব বাংলায় সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামীদের প্রতি কোনরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। পাঞ্জাবের শতকরা ৬০ ভাগ জমির মালিক ছিলেন জমিদার শ্রেণী। সিন্ধুতে সম্পূর্ণ জমির মালিকানাই ছিল মাত্র শ'খানেক ভূস্বামীর হাতে। এঁদের প্রতি কোনরূপ ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণ হ'ল এঁরা সবাই ছিলেন প্রতিপত্তিশালী মুসলিম। বলা বাহুল্য, এই সব ভূস্বামী শ্রেণীই ছিলেন মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ, যাঁদের অধিকাংশই ধীরে ধীরে স্বল্পকালের মধ্যেই পাকিস্তানের হর্তাকর্তা বিধাতা সেজে বসেন। অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির যে আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, দেশ বিভাগের পর পরই তাঁরা নিজেদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারলেন। কিছু সংখ্যক দূরদর্শী অবশ্য অনেক আগেই মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাংলাদেশের সীমানা নিয়ে বেশ দরকষাকষি চলল। বাংলার বর্ণহিন্দুরা বাংলা ভাগ করার জন্য উঠেপড়ে লাগল—সোহরা-ওয়ার্দী চাইলেন বাংলা ও আসাম মিলিয়ে বৃহত্তর বাংলা প্রদেশ গঠন করা হোক। কিন্তু কংগ্রেস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

শুধু তাই নয়, বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতাও শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া হয়ে যায়। সোহরাওয়ার্দী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তা' রক্ষার জন্য, কিন্তু মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের ধৃষ্টতার জন্যই তা' রাখা সম্ভব হয় নি।

এর আগে আগস্টের ৫ তারিখে শহীদ সাহেবকে পরাজিত ক'রে খাজা নাজিমুদ্দিন ব্রিটিশ বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের নেতৃত্ব পান। নাজিমুদ্দিন ও তাঁর অনুসারীদের ধারণা ছিল যে, কলকাতা পূর্ব বাংলার ভাগে পড়লে পূর্ব বাংলার রাজধানী কলকাতাতেই স্থানান্তরিত হবে। যদিও ১৯৪৭ সালের ৩রা জুনের ভারত স্বাধীনতা আইনে বলা হয়েছিল যে, ঢাকাকেই (সোহরাওয়ার্দী তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী) পূর্ব বাংলার রাজধানী করা হবে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 'কলকাতা রাখ' আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে, যদিও এ আন্দোলন যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নাজিমুদ্দিন সরকার 'কলকাতা রাখ' আন্দোলনের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করলেন। ফলে দলে দলে মুসলমানগণ কলকাতা ছেড়ে পূর্ব বাংলায় চলে আসতে শুরু করেন।

'কলকাতা রাখ' আন্দোলন ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

এ সময় ভারতে অবস্থানকারী মুসলমানেরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েন। স্বভাবতঃই হিন্দু মুসলমান একে অপরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতে থাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়। পাকিস্তান হাসেল হওয়ার পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে শহীদ সাহেবকে যখন তাঁর দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানালেন, ভারতীয় মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করেই উত্তরে তিনি লিখলেন, 'আপনার সুদক্ষ পরিচালনায় পাকিস্তানের হেফাজত করিবার যোগ্য লোকের অভাব নাই। কারণ মুসলিম লীগের প্রায় সব নেতাই পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পিছনে-ফেলিয়া-যাওয়া বেচারা ভারতীয় মুসলমানদের হেফাজত করিবার কেউ নাই। আমাকে এদের সেবা করিতে দিন।'

সাম্প্রদায়িক দাংগা ও সোহরাওয়ার্দী

[আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ঃ আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ২৬৮]

সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব নিজের জীবন বিপন্ন করে দাঙ্গা রোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের কথা, অনেক গ্রন্থকার এ বিষয়ে তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক

লেপন করে বলেন যে, তিনিই নাকি সে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছিলেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তাঁর বিরুদ্ধ-দল উগ্রপন্থী মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দই এ ধরনের অপপ্রচার চালিয়েছিলেন, যাতে সোহ্‌রাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।

ভারতীয় হিন্দু নাগরিকদের কিছু কিছু লোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছিলেন এবং শহীদ সাহেব ছিলেন যেহেতু মুসলমান, সেহেতু তাঁরাও শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে কসুর করেন নি। পরবর্তীকালে সে দৃষ্টিভঙ্গিই অনেককে বিভ্রান্ত করেছে।

যাহোক, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী অনশনব্রত পালন করায় দাঙ্গা প্রশমিত হয়। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর হাতে কমলার রস খেয়ে গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করেন।

দেশ বিভাগের পর বেশ কিছুদিন শেখ মুজিবও ভারতেই ছিলেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন ক'রে যুবনেতৃত্ব দান করেছিলেন সত্য, কিন্তু মুসলিম লীগের বুর্জোয়া চরিত্রকে বিশেষভাবে তিনি অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা বাঙালীর ওপর নতুন ধরনের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবে, যদি না মুসলিম লীগের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জনগণের হাতে দেওয়া হয়। তাই ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ব্রিটিশ সরকার ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দানের কথা ঘোষণা করার পর পরই তিনি ইসলামিয়া কলেজের 'সিরাজদ্দৌলা হলে' ছাত্র ও যুব-নেতাদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে মিলিত হয়েছিলেন এবং পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ বিরোধী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, যুবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সভায়ই তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন যে, মুসলিম লীগ ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলেও জনগণ চায় অর্থনৈতিক মুক্তি। সেই মুক্তি অবশ্যই আনতে হবে। তাঁর এই বিশ্লেষণ তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এক অমর সাক্ষী।

সিরাজদ্দৌলা হলে শেখ মুজিবের ঘোষণা

উক্ত সভায় তিনি আরও বলেন: "স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে যেতে হবে, কেননা, আমার আশংকা হচ্ছে, এ স্বাধীনতা সত্যিকার স্বাধীনতা নয়। হয়তো বাংলার মাটিতে নতুন

ক'রে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে—মুসলিম লীগের বুর্জোয়া মনোবৃত্তি ও পশ্চিমা প্রাধান্য থেকে আমার এই আশংকা হচ্ছে।" উক্ত সভায় উপস্থিত অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন কে. জি. মোস্তফা (লেখকের সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ কথা শেখ মুজিব বলেন।)

যতীন্দ্র ভাটনগর তাঁর The Architect of Bangladesh গ্রন্থে যা বলেছেন এই প্রসঙ্গে তা' স্মরণ করা যায়ঃ

"As Pakistan emerged on the horizon on August 14,1947, there was Jubilation in Muslim regions but not so much in Bengal and politically conscious Bengali Muslim homes. It became evident right from the first days that political and administrative power, that is the real power, was surely gravitating towards West Pakistan. East Pakistan was looked down upon more or less as a colony and Bengalis as second class citizens. This was a terrible shock for the intellectuals of Bengal."

("১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের মধ্যে মহা ধুমধামের সাথে আনন্দ উৎসব পালিত হয়। কিন্তু রাজনীতিতে প্রজ্ঞাসম্পন্ন বাংলাদেশের বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঐ দিনটি তেমনভাবে পালিত হয় নি। ইহা অবধারিত সত্য যে, পাকিস্তান জন্মের প্রথম দিন থেকে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক শক্তি পশ্চিমাগোষ্ঠীর কুক্ষিগত হ'তে চলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানকে একটা উপনিবেশ এবং বাঙালীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে তারা মনে করত। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিগণ ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন।")

যতীন্দ্র ভাটনগর মহাশয় যা বলেছেন তার মধ্যে সত্যতা যে একেবারেই নেই, একথা বলা যায় না। এ দেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবীর একটি বিরাট অংশ মুসলিম লীগের শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান যে ধর্মের নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনীতে রূপান্তরিত করবে এ সম্পর্কে তাঁরা প্রথম থেকেই আশংকাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় এ দেশের

পাকিস্তান ও মুসলিম বুদ্ধিজীবী

বুদ্ধিজীবী সমাজ আনন্দিত হন নি। হোক পাকিস্তান, তবু একথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সাম্রাজ্যবাদ শক্তির হাত থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম। এই মুক্তি শুধু ধর্মীয় নয়—আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক। কিন্তু আনন্দিত হলেও অনেকের মনেই যে আশংকা ও সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শেখ মুজিব ছিলেন এঁদেরই একজন। ইতিহাসের ঘটনাচক্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাকিস্তান ছিল বাংলাদেশ অর্জনের প্রথম সিঁড়ি। পাকিস্তান সৃষ্টি না হলে বাংলাদেশের সৃষ্টি অসম্ভব ছিল। যাহোক, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ঢাকায় এসে শেখ মুজিব অল্পদিনের মধ্যেই কতিপয় স্বাধীনচেতা ও উন্নতমনা যুবকদের নিয়ে গঠন করেন 'পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক লীগ'। টাঙ্গাইলের জনাব শামসুল হকও ডেমোক্র্যাটিক লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এ সময় শেখ মুজিব মুসলিম ছাত্র লীগের গোড়াপত্তন করেন। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র। আশৈশব তাঁর আকাঙ্ক্ষা যে, তিনি একজন আইনজীবী হবেন। তাই তিনি আইন বিভাগেই ভর্তি হয়েছিলেন।

শেখ মুজিবের ঢাকায় আগমন

ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মুখোশ উন্মোচন হতে শুরু করেছে। পূর্ব বাংলার অধিবাসী এক শোষণ থেকে আরেক শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হবার আশংকায় হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁরা চোখের সামনে দেখতে পেলেন যে, পশ্চিমারা তাঁদের মুখের ভাষাকে পর্যন্ত কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। ঢাকার যুব-সমাজ তাই আগে থেকেই সচেতন হয়ে উঠলেন।

ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত আকস্মিকভাবে ঘটে নি। আধুনিক কালের অন্যান্য সক্রিয় আন্দোলনের মত এরও একটি পশ্চাদভূমি ও মানসিক প্রস্তুতির পটভূমিকা ছিল। যদিও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন সক্রিয়ভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে, তথাপি দেশ বিভাগের পূর্বেই বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়ে সচেতন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

প্রকাশিত পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক পত্র-পত্রিকা এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রচারপত্রসমূহ বাঙালী মুসলিম লেখক সমাজের এক সচেতন প্রয়াসের স্বাক্ষর বহন করে চলেছিল।

লাহোর প্রস্তাবের পর পাকিস্তান সৃষ্টিই এই উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের আন্দোলনের একমাত্র বিষয় ছিল। ধর্মীয় উন্মাদনা পাকিস্তান প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান ও ভাষাগত পার্থক্যকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল। অবশ্য শিক্ষিত সমাজ যে এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না তা' নয়, স্বাধীনতা আস্বাদনের সম্ভাবনা নিশ্চিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা নীরব ছিলেন মাত্র।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত ও বাঙালী লেখক সমাজের প্রতিবাদ

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পর ভাবী পাকিস্তানের নানাবিধ সমস্যার সাথে সাথে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আলোচনা কতকটা উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। কারণ শতকরা ৫৬ জন লোকের মুখের ভাষা বাংলাকে অস্বীকার ক'রে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চক্রান্তের কথা ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। বাঙালী লেখকবৃন্দ এ বিষয়ে নীরব থাকতে পারেন নি। তাঁরা এ অশুভ প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বিরোধিতাপূর্ণ যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকেন। বাংলার স্বপক্ষে তাঁরা দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় জোরালো প্রবন্ধ লিখে প্রচার কার্য চালিয়ে যান। 'দৈনিক ইত্তেহাদ' ও 'দৈনিক আজাদ' এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পেছনে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তিই ছিল না। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সে ভাষার স্থান আঞ্চলিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলা বা ইংরেজীর মত তা' আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয় নি। তা' ছাড়া উর্দুভাষী লোকের সংখ্যাও ছিল অতি নগণ্য।

পক্ষান্তরে বাংলাভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনের অধিকারী। কবিগুরুর মাধ্যমে এ ভাষার সাহিত্য বিশ্ব-দরবারে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া বাংলা ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা পরিকল্পিত ভাবী পাকিস্তানের সমগ্র লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী।

তথাপি উর্দু-সমর্থকরা বাংলার প্রতি এতটুকুও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁরা বাংলাকে হিন্দু-সংস্কৃতি ও পৌত্তলিকতার ভাষা বলে মনে করতেন। মুসলমানদের দেশ পাকিস্তানে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাওয়ার অযোগ্য।

উর্দু-সমর্থকদের এই বক্তব্যের ও যুক্তির পেছনে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান ঃ

১। বাংলাভাষা চর্চায় হিন্দুদের প্রায় একাধিপত্য ছিল।

২। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ কতিপয় হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলমানদের চরিত্রের প্রতি কলঙ্ক লেপন ক'রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

৩। রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ববরেণ্য কবির রচনাতেও মুসলিম চরিত্র প্রায় অনুপস্থিত।

৪। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান কোনক্রমেই অস্বীকার করবার নয়; অথচ হিন্দু সমালোচকরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের কথা এড়িয়ে গেছেন।

৫। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য হিন্দু ভাবধারার পরিচয় বহন করে।

মোট কথা, একটি নিছক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এই অভিযোগগুলো তুলে ধরা হয়েছিল। আসলে এসব অভিযোগ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস মাত্র। এটা যে ঔপনিবেশিক শাসনের মাধ্যমে বাঙালীকে দাবিয়ে রাখবার কৌশল মাত্র বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা তা' স্পষ্টতঃ অনুধাবন করেছিলেন।

উর্দু রাষ্ট্রভাষা হ'লে বাঙালী মুসলমানদের ভাগ্যে কি পরিণতি ঘটতে পারে সে বিষয়ে বাঙালী শিক্ষিত সমাজ অতীত অভিজ্ঞতার আলোকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বাঙালী মুসলমানগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তা' হ'লে সরকারী চাকরী, ব্যবসা ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে উর্দুভাষীরা অগ্রাধিকার পাবে এবং আস্তে আস্তে বাঙালীদেরকে গ্রাস করে নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবে। এর অর্থই হ'ল বাঙালী সত্তার সমাধি, অন্য কথায় পূর্ব পাকিস্তানবাসী-দেরকে পুনরায় পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধকরণ। তাঁদের এই আশঙ্কা

যে অমূলক ছিল না, পরবর্তীকালে রক্তাক্ত আন্দোলনের ফলে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী রাজত্বই তার প্রমাণ দিয়েছে।

সেদিন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বাঙালীরা ভাষার প্রশ্নে যে স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সেটাই বাঙালী জাতীয়তাবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকাই জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রথম সোপান হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

ভাষা-চেতনার মাধ্যমে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

আগেই বলা হয়েছে যে, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের চক্রান্তের প্রতিবাদে বাঙালী লেখক সমাজই প্রথমে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক বাঙালী নেতারা পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত তেমন সক্রিয়তার পরিচয় দেন নি। ফলে ভাষা আন্দোলনের প্রথম স্তর প্রধানতঃ লেখার মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। অবশ্য বাঙালী লেখক সমাজের সবাই যে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রচলনের স্বপক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন, তা' নয়। অনেক বাঙালী লেখক উর্দুর মধ্যে ইসলামের গন্ধ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাতে ভাবী পাকিস্তানের ইসলামী সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য তাঁরাও যে বাংলাকে একেবারে বাদ দিতে বলেছিলেন, এমন নয়। সরকার পরিচালনা ও আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসেবে তাঁরা উর্দুকে প্রাধান্য দিয়ে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে সুপারিশ করেছেন। কিন্তু তাঁদের কণ্ঠ তেমন সোচ্চার ছিল না। উর্দুর পক্ষে যুক্তির অসারতাই তার কারণ।

কেউ কেউ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষারই নাম প্রস্তাব করেন। আবার কেউ কেউ লাহোর প্রস্তাবের মূল নীতিকে সামনে রেখে পূর্ব ও পশ্চিম—এই দু'টো পৃথক পৃথক অঞ্চলের জন্য যথাক্রমে বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা প্রচলনের জন্যও সুপারিশ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, লাহোর প্রস্তাবে প্রদেশসমূহকে পূর্ণাংগ স্বায়ত্তশাসনের সুপারিশ করা হয়েছিল এবং আশা করা গিয়েছিল 'আজাদী হাসেল' হলে লাহোর প্রস্তাবের মূল নীতি সম্পূর্ণ কার্যকরী হবে।

রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নের সঠিক মীমাংসায় বাঙালী লেখকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তাঁরা সবাই একটি বিষয়ে একমত ছিলেন যে, বাংলাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র উর্দুকে ভাবী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। যদি জোর করে তা' বাঙালীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়, তা' হ'লে তার পরিণতি যে শুভ হবে না, সে সম্পর্কেও তাঁরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। দৈনিক ইত্তেহাদের সাহিত্য বিভাগে ১৯৪৭ সালের ২২শে জুন ও ২৯শে জুন তারিখে মোহাম্মদ আবদুল হকের 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দু' দফায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটিতে লেখক বাঙালীর ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের স্বপক্ষে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। এই সঙ্গে বাঙালী জাতির হীনমন্যতার পরিচয়ও তাতে বিধৃত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় দফায় লেখক বলেছেন ঃ

"প্রায় বাঙালী এটা মনেপ্রাণে জানেন যে, হিন্দী উর্দু ভাষীর সঙ্গে কথা বলতে হ'লে তাঁকে হিন্দী উর্দু বলতে হবে। কেননা অপর পক্ষ বাংলা জানেন না। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হলেও এটা একটা বাধ্যবাধকতা ; এরূপ বাংলা জানা এবং বলার বাধ্যবাধকতা ও গরজ এখন পর্যন্ত অবাঙালীর নেই।" এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি উক্ত প্রবন্ধেই বলেছেন ঃ

"বাঙালীর জাতীয়তাবোধ এখনো পরিপূর্ণভাবে স্ফুরিত হয় নি। তার জাতীয় মর্যাদাবোধ এখনো অত্যন্ত কাঁচা, তার পূর্ণ জাতীয় ব্যক্তিত্ববোধ এখনো অপ্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই বাঙালীরা সাধারণতঃ বুঝতে পারেন না যে, নিজ বাসভূমেও ইংরেজ তথা অবাঙালীদের সঙ্গে তাদেরই ভাষায় কথা বললে জাতীয় বোধের দিক থেকে নিজেকে ছোট করা হয়, নিজের অমর্যাদা করা হয়, নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া হয়।......... আমার মনে একটা প্রশ্ন সব সময়েই উদ্যত থাকে ঃ আমরা কেন আমাদের দেশে ইংরেজী উর্দু হিন্দী বলতে বাধ্য থাকব? আমাদের দেশে যারা বাস করে সেইসব ইংরেজ বা উর্দু হিন্দী ভাষীরা কেন বাংলা লিখতে বাধ্য হবে না?"

প্রশ্নটিতে এই ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যবোধের বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবন্ধ প্রকাশের দু'দিন আগে অর্থাৎ ২৭শে জুন (১৯৪৭) 'সাপ্তাহিক মিল্লাত'

পত্রিকায় উর্দু'কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করলে তার পরিণাম কি হতে পারে সে সম্পর্কে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। উক্ত পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিলঃ

"একটা দেশকে পুরোপুরি দাসত্বে রূপান্তরিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীর যত রকম অস্ত্র আছে, তার মধ্যে সব চাইতে ঘৃণ্য ও মারাত্মক অস্ত্র হইতেছে সেই দেশের মাতৃভাষার পরিবর্তে একটি বিদেশীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু থাকিতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে এই ঘৃণ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিতে যদি কেউ বাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সেই উদ্ভট বাসনা বাঙালীর প্রবল জনমতে ঝড়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবে।"

৩০শে জুন (১৯৪৭) 'দৈনিক আজাদ'-এর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ভাষার প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে তা' প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুস্পষ্ট দাবী জানানো হয়। এতে বলা হয়েছিলঃ "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা' এখন স্থির করার সময় এসেছে। যে ভাষাকেই আমরা রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করি, তার আগে আমাদের বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে, কোন্ ভাষায় পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশী লোক কথা বলে। পাকিস্তানের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভাষা কোন্‌টি, কোন্ ভাষায় সব থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং কোন্ ভাষা ভাব প্রকাশের পক্ষে সব থেকে বেশী উপযোগী।......যেদিক থেকেই বিবেচনা করা যাক না কেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবীই সবচেয়ে বেশী।......এর মধ্যে দ্ব্যর্থক যদিও কিছু নেই তবু এখানে স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন মনে করছি যে, কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জন্যই নয়, পশ্চিম পাকিস্তান সহ সমগ্র পাকিস্তানেরই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবী এবং যোগ্যতা সবচেয়ে বেশী বাংলা ভাষার।"

প্রবন্ধটিতে উর্দু এবং বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয় এবং উর্দু'কে রাষ্ট্রভাষা করা হ'লে পূর্ব বাংলার ৫ কোটি বাঙালীর পক্ষে তার ফলাফল কি হতে পারে,

সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে আশঙ্কা-স্বরূপ দেখানো হয়েছে যে, এর ফলে শিক্ষা, চাকরি প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাঙালীরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে উর্দু-ভাষীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অধিকতর সমৃদ্ধির সুযোগ লাভ করবে। উক্ত প্রবন্ধে আরো আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, উর্দুকে রাষ্ট্র-ভাষা রূপে গ্রহণ করলে আমদের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, যে ইংরেজী সাহিত্য বাংলা অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত এবং যার প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছিল, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হ'লে অনিবার্যভাবেই বাংলা ভাষা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। আর "যে সাহিত্য শ্রেষ্ঠতর নয়, তার প্রভাব পড়বে শ্রেষ্ঠতর সাহিত্যের উপর, এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্য লাভবান না হয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

তাছাড়া যে-ইংরেজীকে বাঙালীরা এতকাল বিদেশী ভাষা বলে নিজেদের ভাষার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবার সযত্ন প্রয়াস চালিয়ে এসেছেন, উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হ'লে পাকিস্তানী বাঙালীরা হয়তো আর তা' রক্ষা করতে পারবে না। তাই উক্ত সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "এতে এমন সম্ভাবনাও আছে যে, আমরা সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বর্জন ক'রে সম্পূর্ণভাবে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যকে গ্রহণ করবো; বাংলা সাহিত্যের আসর থেকে আমরা চির বিদায় নেব......যার অর্থ হবে আমাদের মৃত্যু।"

ঠিক এ ধরনেরই আশঙ্কার প্রতিধ্বনি করেছিলেন ঢাকার নারায়ণ-গঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'কৃষ্টি' নামক একটি সংকলনে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক। ১৩৫৪ সনের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি উর্দুকে ইংরেজীর মত 'অপরিচিত বিদেশী ভাষা' হিসেবে অভিহিত করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এর স্বীকৃতির বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, যদি এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় তা' হ'লে, "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে। ...উর্দু বহিয়া আনিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি

সর্ব বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দু-ওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজী রাষ্ট্রভাষার সূত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র।"

[কৃষ্টি, কার্তিক, ১৩৫৪, পৃঃ ৩০]

উক্ত প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন ঃ "উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকার করিয়া লইলে বাংলা ভাষার সমাধি রচনা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরও জাতি হিসাবে 'গোর' দেওয়ার আয়োজন করিতে হইবে।"

বাঙালী জাতির এই সম্ভাব্য অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ডঃ এনামুল হক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য যথাক্রমে বাংলা ও উর্দু উভয়কেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব করেন। এক রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা অচল বলে যাঁরা মত প্রকাশ করেন সে সম্পর্কে তিনি বলেন, "এই শ্রেণীর ধারণা সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক।"

[ঐ, পৃঃ ৩২]

লক্ষণীয়, ডঃ এনামুল হক উভয় ভাষাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু কোন একটি বিশেষ ভাষার দাবীকে এককভাবে অগ্রাধিকার দেন নি।

এ বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায় ২০শে জুলাই তারিখের 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় মাহবুব জামাল জাহেদীর লেখা একটি প্রবন্ধে। 'রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' নামে লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি বাংলা ও উর্দু উভয়কেই যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব দেন। ডঃ এনামুল হকের ন্যায় তিনিও উর্দুকে বিদেশী ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য প্রদেশদ্বয়ের জন্য রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব দেয়া হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করতে পারেন নি।

কবি ফররুখ আহমদ সম্পূর্ণ অন্য কারণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁর এই সমর্থনের মধ্যে বাঙালী জাতীয়তাবোধ বলে কিছু ছিল না। তিনি যতটা ছিলেন বাঙালী, তার চেয়েও ঢের বেশী ছিলেন পাকিস্তানী। পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি শুধু সচেতনই ছিলেন না, তা' বাস্তবায়নের জন্যও তিনি ছিলেন

সচেষ্ট। বলা বাহুল্য, ইসলামী সংস্কৃতি প্রকাশের সুবিধার্থেই তিনি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যেই এ সত্য ধরা পড়ে। আশ্বিন সংখ্যা (১৩৫৪) 'সওগাত'-এ 'পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে এই দেশে ইসলামী সংস্কৃতিকে হত্যা করা হবে।"

ফররুখ আহমদ এবং তাঁর ন্যায় উগ্র ইসলামপন্থীরা বাংলাকে সমর্থন করেছিলেন এই কারণে যে, বাংলাদেশে যদি ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করতে হয়, তবে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই তা' করতে হবে। বাংলা ভাষাকে বর্জন করে তা' বাস্তবায়ন করা দুরূহ কার্য হবে। তথাপি যে কারণেই তাঁরা সমর্থন করুন, এই সমর্থন নিঃসন্দেহে প্রগতিবাদী সমাজকে সাহায্য করেছে। এ দিক থেকেই ফররুখের একটি উক্তি সেদিন অভিনন্দিত হয়েছিল:

"গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যাঁরা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপায়িত করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর সাথে আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

[সওগাত, আশ্বিন, ১৩৫৪]

আগেই বলা হয়েছে যে, উর্দু ভাষার দাবীদাররা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে গিয়ে বাংলাকে 'হিন্দুর ভাষা' এবং 'হিন্দু-সংস্কৃতি ও পৌত্তলিকতার ভাষা' বলে অভিহিত করেছেন। উর্দুভাষীদের এই অপ-প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে ২৭শে জুলাই (১৯৪৭) তারিখের 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় মোহাম্মদ আবদুল হক 'উর্দু রাষ্ট্রভাযা হলে' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন: "পাকিস্তানে এই মানসিকতার প্রসার ঘটার সম্ভাবনা আছে, এবং প্রসার ঘটলে বাঙালী মুসলমান হয়তো একদিন বাংলাকে বর্জন করে উর্দুকেই মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করে বসতে পারে। কিন্তু বাংলা ভাষা হিন্দুর ভাষা নয়, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভাষা এবং হিন্দুর চেয়ে বাঙালী মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। এককালে এ ভাষার প্রতি

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদ্বেষ ছিল, মুসলিম রাজশক্তিই একে লালন করে সম্মানের আসন দিয়েছে। পৌত্তলিকতা কোনো ভাষার স্থায়ী লক্ষণ বা একমাত্র লক্ষণ নয়, কোন্ ধর্মাবলম্বী লেখক, কোন্ ভাষায় কি পরিমাণে লিখেছেন, তার উপরই নির্ভর করে সে ভাষায় কোনো বিশেষ ধর্মের প্রভাব কতখানি। অন্যথায় কোনো ভাষাই, কোনো ভাষা থেকে পবিত্রতর বা অপবিত্রতর নয়।"

১৩৫৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মাসিক সওগাত'-এ 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কাজী মোতাহার হোসেন উভয় প্রদেশের জন্য পৃথক পৃথক রাষ্ট্রভাষা না করে বরং সমগ্র পাকিস্তানের জন্যই উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রচলন করার প্রস্তাব দেন। নতুবা, "বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তা' হ'লে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশংকা আছে।"

কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন কোন মুসলমান লেখক উর্দুর পক্ষে ওকালতি করেছেন। এ বিষয়ে 'সওগাতের' ভূমিকা ছিলো দুঃখজনক। যদিও এই পত্রিকায় কতিপয় লেখক বাংলা ভাষার পক্ষে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তথাপি সওগাতের সম্পাদকীয় নীতি ছিল উর্দুর সপক্ষে। সওগাত প্রথম থেকে শেষাবধি এই নীতিই অনুসরণ করে এসেছে। অবশ্য সওগাতগোষ্ঠী বাংলাকে একেবারে অস্বীকার করেন নি, তবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার স্বাভাবিক বাহন হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের পক্ষে তাঁরা মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী ভাষা ও আন্তঃ-প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর প্রস্তাব করেছেন। সওগাতের পৌষ (১৩৫৪) সংখ্যায় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'শিক্ষার কথা' প্রবন্ধে এই বক্তব্যের সোচ্চার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সে সময় সওগাতের সম্পাদকীয় লিখতেন উক্ত প্রবন্ধেরই লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। শুধু সে সময়ই নয়, পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলন যখন কতকটা সক্রিয় আকার ধারণ করতে চলেছিল, তখনও এই পত্রিকা দুঃখজনকভাবে উর্দুর সপক্ষে প্রচার চালিয়ে-

ছিলেন। ১৩৫৪ সনের চৈত্র সংখ্যায় সওগাত সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন ঃ

"উর্দুকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও আন্তঃপ্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হইতেছে এবং সমগ্র পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক করা সঙ্গত হইবে। ইংরেজীর স্থলে উর্দুই অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা। (Lingua franca) হইবে এবং হওয়া উচিতও।"

[পৃঃ ২৩১]

বলা বাহুল্য, সওগাতের এই উর্দুপ্রীতির পেছনে যে কারণ বর্তমান ছিল, তা' হ'ল ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের অস্বাভাবিক দুর্বলতা। তাঁদের ধারণা ছিল যে, উর্দু ইসলামী চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ এবং এটি একটি অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাষা। এ ভাষার সম্মান তাঁদের কাছে কতকটা আরবীর মতই। তাই ইসলামী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা এমন প্রচারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এদিকে ঢাকাতেও রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত আলোচনা ধীরে ধীরে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ঢাকার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সমাজ উর্দুকে চাপিয়ে দেবার মাধ্যমে একটি অকল্যাণের পূর্বাভাস সতর্কতার সংগে লক্ষ্য করতে থাকেন।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের রোয়েদাদ ঘোষণার পর মুসলিম লীগের বামপন্থী কর্মীদের উদ্যোগে ঢাকায় জুলাই মাসে 'গণ-আজাদী লীগ' নামে একটি ক্ষুদ্র সংগঠন গঠন করা হয়। ঢাকাস্থ মুসলিম লীগের নেতা কমরুদ্দিন আহমদ কর্তৃক 'গণ-আজাদী লীগে'র আশুদাবী কর্মসূচী শীর্ষক ম্যানিফেস্টোতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় ঃ

"রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্যই নাই, যদি সেই স্বাধীনতা জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন না করে, কারণ অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা স্থির করিয়াছি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকিব।"

গণ-আজাদী লীগ

[আশুদাবী কর্মসূচী, পৃঃ ১]

আরো বলা হয়ঃ

"বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পুর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"

গণ-আজাদী লীগের সাথে জনাব তাজউদ্দিন আহ্‌মদ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে শেখ মুজিব কলকাতা থেকে এসে প্রত্যক্ষভাবে এই জাতীয় আন্দোলনে সমর্থন জানাতে থাকেন। 'গণ-আজাদী লীগ' একটি দল হিসেবে মূলতঃ নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়েই কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ১৯৫০ সালে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় 'সিভিল লিবার্টিজ লীগ'। কিন্তু নানা কারণে এই দল একটি শক্তিশালী দল হিসেবে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়।

ওদিকে আবার ঠিক এই মুহূর্তেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহ্‌মদ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ডক্টর জিয়াউদ্দিন এই বিতর্কের সূত্রপাত করেন ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে। তাঁর এই অভিমত প্রকাশিত হবার পর পরই ১৩৫৪ সনের ১২ই শ্রাবণ সংখ্যায় দৈনিক আজাদে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'পাকিস্তান রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে তিনি বলেনঃ

ভাষার প্রশ্নে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অভিমত

"বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হইলে, ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে।"

["আমাদের ভাষা সমস্যা", রেনেসাস পাবলিকেশন, পৃঃ ৩৪—৩৫]

অবশ্য একজন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শুধুমাত্র বাংলার দাবীই তুলেছিলেন

তাই নয়, ভাষা হিসেবে উর্দু যে রাষ্ট্রভাষা অর্জন করতে পারে না এ কথাও যুক্তিসহ প্রমাণ করেছিলেন। উর্দু একটি ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে শুধু জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, জাতীয় শিক্ষা বা রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত হতে পারে না।

ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে বাংলা সমস্ত পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষ হবার দাবীদার এবং পূর্ব বাংলার সমগ্র কাজে এই ভাষা ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু তাই নয়, বাংলার সাথে সাথে বৈকল্পিক ভাষা হিসেবে আরবী ও ইংরেজী গ্রহণের পক্ষেও তিনি মত দেন।

ডক্টর শহীদুল্লাহ্ আরবীর পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন বলে তাঁকে ভুল বুঝবার অবকাশ আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সবার উর্ধ্বে তিনি বাংলাকেই স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু যদি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয় তবে শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই আরবীর পক্ষে তিনি ওকালতি করেছিলেন। আর তিনি এই যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন উর্দুকে প্রতিরোধ করার জন্য। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে ভারতাগত পশ্চিমা এবং পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যাবে—উর্দু এঁদের অনেকেরই মাতৃভাষা এবং পশ্চিম পাকের লোকের পক্ষে উর্দু শেখা সহজ। অন্যপক্ষে আরবী রাষ্ট্রভাষা হ'লে বাঙালী ও পশ্চিম পাকিস্তানী উভয়ের জন্যই তা' হবে একটি বিদেশী ভাষা—কারো বিশেষ সুবিধা ভোগের প্রশ্ন উঠবে না।

এ ছাড়া ডক্টর শহীদুল্লাহ্ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, আরবী বেহেস্তের রাষ্ট্রভাষাও বটে। মৃত্যুর পরেও এ ভাষার আবেদন চিরন্তন। অন্যপক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলো দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হ'লে উর্দুর চেয়ে আরবীর প্রয়োজন অনেক বেশী। মোটামুটি এই সব যুক্তিই ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র চেতনাকে পরিচালনা করেছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বাংলাকে তিনি সবার ওপরে স্থান দিয়েছিলেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য তিনি সেদিন সমগ্র বাংলা ভাষার ছাত্রদের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর ন্যায় অনমনীয় ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব বাংলা ভাষার আন্দোলনকে বহুলাংশে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কোন প্রলোভন বা ভয় তাঁকে এই সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে উগ্র ইসলামপন্থীদের অনেকেই নানাবিধ কারণে বাংলা ভাষার সপক্ষে জোরালোভাবে কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে তমদ্দুন মজলিশের কর্মকর্তা ও কর্মীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেখ মুজিব এই মজলিশকে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বহু কাজে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র এবং অধ্যাপকের উদ্যোগে নিজেদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকায় তমদ্দুন মজলিশ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠিত হয়। এই মজলিশ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা না উর্দু'—এই শীর্ষক একটি পুস্তিকায় কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ এবং আবুল কাশেম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের জন্য জোরালো ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন এবং প্রয়োজনবোধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। উক্ত পুস্তিকার প্রবন্ধগুলোতে নানা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে, বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত। পুস্তিকাটির মুখবন্ধে তমদ্দুন মজলিশের একটি প্রস্তাব সন্নিবেশিত হয়। প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছিল ঃ

তমদ্দুন মজলিশ

তমদ্দুন মজলিশের প্রস্তাব

১। বাংলা ভাষাই হবে—

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ;

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা ;

(গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা দু'টি—বাংলা ও উর্দু।

৩। বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা।

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা একশ' জনই এ ভাষা শিক্ষা করবেন।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরী ইত্যাদি কাজে যাঁরা নিযুক্ত হবেন শুধু তাঁরাই এ ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫ হতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে।

মাধ্যমিক স্কুলে উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

(গ) ইংরেজী হবে পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরী করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন, তাঁরাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাঁদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের হাজারকরা ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না।

ঠিক এই নীতি হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে (স্থানীয় ভাষার দাবী না উঠলে) উর্দু প্রথম ভাষা, বাংলা দ্বিতীয় ভাষা আর ইংরেজী তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

৪। শাসন কার্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাততঃ কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে। দেশের শক্তির যাতে অপচয় না হয় এবং যে ভাষাতে দেশের জনগণ সহজে ও অল্প সময়ে লিখতে, শিখতে ও বলতে পারে সে ভাষাই হবে রাষ্ট্রভাষা। এই অকাট্য যুক্তিই উপরোক্ত প্রস্তাবের প্রধান ভিত্তি।

[পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা না উর্দু', পৃঃ ৩-৪]

পরবর্তীকালে এই তমদ্দুন মজলিশ যদিও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল তবু ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে এর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। মুসলিম সংস্কৃতি বলতে যে আরবীয় সংস্কৃতির চিন্তা এঁদের মনে ছিল বাংলা জাতীয়তাবাদ চেতনা প্রকট হবার সাথে সাথে তার সাথে তাঁদের গরমিল দেখা দিল। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে এঁরা আর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারলেন না। যাহোক, ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ফজলুল হক হলে ভাষার প্রশ্ন আলোচনার জন্য এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ্ বাহার চৌধুরী। সভায় যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি জসীম উদ্দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কাশেম এবং কয়েকজন মন্ত্রী।

এ সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান করাচীতে বসে বাংলা ভাষা সম্পর্কে কয়েকটি আপত্তিকর মন্তব্য করেন। এতে বাংলা ভাষা-ভাষীদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ফলে মজলিশের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালীরা একাত্মতাবোধ করে। তারা আস্তে আস্তে ইউনিভার্সিটির নিকটস্থ মজলিশের অফিসে আসতে শুরু করে। "এই অফিসেই মজলিশ কর্মীদের এক বৈঠকে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। তদানীন্তন মজলিশ কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁঞা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম কনভেনর নির্বাচিত হন।"

প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

[সৈনিক, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩, শহীদ সংখ্যা, পৃঃ ৫-৬]

এই সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা প্রথমে ফজলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এক তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মন্ত্রী কর্মীদের সঙ্গে কতকটা অসম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করেন।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত সংগ্রাম পরিষদ বাংলা ভাষার দাবী জ্ঞাপক একটি স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করে এবং কয়েক হাজার স্বাক্ষরসহ সেটি সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। এ ব্যাপারে অন্যান্যদের মধ্যে শেখ মুজিবও অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্রতী হন।

অতঃপর সংগ্রাম পরিষদের এই আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। সরকারের এই হীন প্রচেষ্টার বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৯৫৩ সালের শহীদ সংখ্যা (২১শে ফেব্রুয়ারী) 'সৈনিক' লিখেছেন ঃ

ভাষা আন্দোলন দাবিয়ে রাখতে সরকারী অপচেষ্টা

"আন্দোলন এইভাবে দানা বাঁধিয়া গড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে মূলেই পঙ্গু করিয়া দিয়া ইহার মধ্য দিয়া স্বার্থোদ্ধারের জন্য জোর চেষ্টা হইতে থাকে। সরকারী এজেন্ট বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল এমন কয়েকজন লোক বড় বড় সংগ্রামী কথা বলিয়া সংগ্রাম পরিষদে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে থাকে—তাহারা নানা রকম অবাস্তব কথা তুলিয়া ছাত্র ও কর্মীদের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। অন্যদিকে কয়েকজন এম. এল. এ. এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া মন্ত্রিত্ব পাইবার জন্য মাতিয়া উঠেন। ইহাদের অনুসারী বহু ছাত্রও

এই কার্যে নিযুক্ত হইয়া ভাষা আন্দোলনকে তলাইয়া দিয়া ইহাকে মন্ত্রিত্ব সঙ্কট আন্দোলনে পরিণত করার জন্য ইহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। বলা বাহুল্য, কিছুদিন আগেও ইহারা ভাষা আন্দোলনকে অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে করিতেন। এই সময় বড় বড় বক্তৃতা দিয়া মোহাম্মদ আলী সাহেব, তোফাজ্জল আলী সাহেব ও নসরুল্লাহ্ সাহেব প্রভৃতি এম. এল. এ. বাংলাভক্ত হইয়া ছাত্রদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠেন।

তৃতীয় আর একদল এই আন্দোলনকে স্যাবোটাজ করার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, ইহারা কমবেশী ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য ছিল। এতদিন ইহারা কোন কাজেই আগাইয়া আসে নাই। অথচ আন্দোলন যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে তখন ইহারা গোপনে পাকিস্তান বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কয়েকটি হ্যাণ্ডবিল ও পোস্টার দিয়া জনগণকে আন্দোলন বিরোধী করিয়া তোলে। জনসাধারণ তখন সন্দেহ করিতে আরম্ভ করে যে, এই আন্দোলন নিশ্চয়ই ভারতের প্ররোচিত। এমনও হইয়াছে যে, কয়েকজন ছাত্র ফেডারেশন কর্মীকে উত্তরবঙ্গে প্রচারের জন্য যাতায়াত খরচ দিয়া পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু ঐ কর্মীরা ভাষা আন্দোলনের জন্য তো কোন কাজই করে নাই, বরং সেই টাকার কোন হিসাবও দিতে পারে নাই।

অপূর্ব মিলন ঃ

এইভাবে সরকারী গুপ্তচর, মন্ত্রিত্বলোভীরা এবং তথাকথিত প্রগতিশীলরা এক জোট বাঁধিয়া ভাষা আন্দোলনকে স্যাবোটাজ করার কাজে লাগিয়া যায়। এবং নানারূপ অবান্তর প্রচার করিয়া জনমত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। অনেক এম. এল. এ. বড় বড় কথা বলিয়া নেতা হইয়াছেন এবং তাঁহারা আন্দোলনের সুযোগে রাষ্ট্রদূতের পদ বা মন্ত্রিত্ব লাভ করেন (জনাব মোহাম্মদ আলী ও জনাব তোফাজ্জল আলী সাহেব)। ইহারাই মন্ত্রিত্ব পাইয়া প্রকাশ্যভাবে বাংলার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও লজ্জাবোধ করেন নাই।"

[সৈনিক, শহীদ সংখ্যা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩, পৃঃ ৫-৬]

এদিকে প্রগতিবাদী ও বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী যুবকগণ কিন্তু ধীরে ধীরে নিজেদের সংঘবদ্ধ করতে থাকেন। সেদিন গণতান্ত্রিক

যুবলীগ এবং মুসলিম ছাত্রলীগ এই দুই যুব প্রতিষ্ঠান গঠন ও যুব সমাজে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে পূর্ব বাংলার অধিকার অর্জনের প্রয়াসে অন্যান্যদের মধ্যে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন আহমদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেখ মুজিব ছিলেন মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রতিষ্ঠার স্বল্পকালের মধ্যেই ছাত্রলীগ দুটো দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শাহ আজিজুর রহমান এই দলটিকে মুসলিম লীগের লেজুড় হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এবং এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। সারা জীবন অসাম্প্রদায়িক নীতির উপাসক শেখ মুজিব এতে বাধা প্রদান করেন এবং পরিণামে এই দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব, আজিজ আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ ব্যক্তির নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' বলে একটি নতুন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এর আহবায়ক নির্বাচিত হন মিঃ নঈমুদ্দিন। ভাষা আন্দোলনে এই দল একটি বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। তমদ্দুন মজলিশের সাথে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ও এই আন্দোলনকে একটি সার্বিক ছাত্র ও গণ-আন্দোলনে উন্নীত করতে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। প্রথমদিকে কতকগুলো রাজনৈতিক কারণে ছাত্রলীগের নামের পূর্বে 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করলেও এই ছাত্র প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঘোরতর বিরোধী ছিল। পরবর্তীকালে সুযোগ বুঝে শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই এই 'মুসলিম' শব্দটি তুলে দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' নামে দলটির নামকরণ করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমে এই ছাত্রদলের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল।

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা

যেমন দেশে একটি সুষ্ঠু যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে, তেমনি বাংলা ভাষাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে শেখ মুজিবের অক্লান্ত নেতৃত্ব বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকারী বাসভবন তৎকালীন বর্ধমান হাউসে এবং বর্তমান বাংলা একাডেমীতে বঙ্গীয়

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির একটি বৈঠক বসে— প্রধানতঃ ভাষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণই এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল। বৈঠক চলাকালে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের একটি মিছিল সেখানে বাংলা ভাষার দাবী জানিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। অন্যান্যদের মধ্যে শেখ মুজিবও এই মিছিলের নেতৃত্ব দান করেন।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ও সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট মুসলিম লীগের কর্তৃত্বকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে বামপন্থী কর্মীরা ঢাকা শহরে একটি কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন। ওয়ার্কার্স ক্যাম্প নামে এই সম্মেলন মুসলিম লীগের সাবেক অফিস ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব এই সম্মেলনে নেতৃত্ব দান করেন এবং বাংলা দেশের মানুষের সার্বিক স্বার্থে দেশের যুবশক্তি ও বামপন্থীদের সংঘবদ্ধ করতে কতকগুলো বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ বছর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ইংরেজী ও উর্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেন শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর এই প্রস্তাবের সমর্থনে কয়েকজন সদস্যও বক্তৃতা দেন। কিন্তু এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র ক'রে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং লিয়াকত আলী খান পর্যন্ত ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবের কঠোর বিরোধিতা করেন এবং বাংলা ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধিতে তিনি তাঁর ভাষণে হিন্দু প্রাধান্যের সূত্র সন্ধান করেন। তিনি বলেন ঃ

প্রথম গণপরিষদ অধিবেশন

"প্রথমে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নির্দোষ বলিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমানে মনে হয় পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা হইতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।"

বাংলাভাষার প্রশ্নে লিয়াকত আলীর মন্তব্য

[নওবেলাল, ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮]

বলা বাহুল্য, লিয়াকত আলী খানের বক্তৃতায় হিন্দু সদস্যদের প্রতি সুস্পষ্ট কটাক্ষপাত বিদ্যমান।

ঐ অধিবেশনে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুর সপক্ষে একটি উদ্ভট রায় প্রকাশ করেন। তিনি বলেনঃ "পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

খাজা নাজিমুদ্দিন মন্তব্য

[নওবেলাল, ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮]

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ তারিখে অনুষ্ঠিত গণপরিষদে প্রদত্ত খাজা নাজিমুদ্দিনের এই বক্তৃতার ফলে পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রদেশের নেতৃস্থানীয় পত্রিকা 'দৈনিক আজাদ' ২৭শে ফেব্রুয়ারী 'বাংলা ভাষা ও পাকিস্তান' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেনঃ

"খাজা সাহেব কবে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের গণভোট গ্রহণ করিলেন, তাহা আমরা জানি না। আমাদের মতে, তাঁর উপরোক্ত উক্তি মোটেই সত্য নয়। আমরা বিশ্বাস করি, গণভোট গ্রহণ করিলে বাংলা ভাষার পক্ষে শতকরা ৯৯ ভোটের বড় কম হইবে না। এ অবস্থায় এমন গুরুতর ব্যাপারে তিনি (খাজা নাজিমুদ্দিন) এইরূপ একটি দায়িত্বহীন উক্তি করিয়া শুধু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থেরই ক্ষতি করেন নাই, এদেশবাসীর পক্ষে আপন প্রতিনিধিত্বের অধিকারের মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থকে এভাবে খিকাইয়া দেওয়া কি এতই সহজ?"

সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া

মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা নয়, এমনকি গণপরিষদের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবী পর্যন্ত অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ ঢাকায় প্রকাশিত হওয়া মাত্র প্রগতিবাদী ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল তীব্র অসন্তোষে ফেটে পড়তে থাকে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় এক ধর্মঘট পালন করা হয়। ধর্মঘট চলাকালীন ঢাকার ছাত্রসমাজ বাংলা ভাষার সমর্থনে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে শহর প্রদক্ষিণ করে। পরে বিকেলের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আবুল কাশেম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই মিছিলের সমগ্র ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় শেখ মুজিব বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করেন।

জনগণের প্রতিক্রিয়া

শেখ মুজিবসহ সকল প্রগতিবাদী ছাত্রনেতাই বাংলা ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রদেশের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা ২রা মার্চ ফজলুল হক মুসলিম হলে এক সভায় মিলিত হন। কমরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা, আবুল কাশেম, রণেশ দাশগুপ্ত, অজিত গুহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সভায় গণপরিষদ সিদ্ধান্ত ও মুসলিম লীগের বাংলা ভাষা-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এতে গণ-আজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ, ছাত্রাবাসগুলোর সংসদ প্রভৃতি ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠান দু'জন করে প্রতিনিধি দান করেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। এই সংগ্রাম পরিষদ গঠনে শেখ মুজিব বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁর ভূমিকা ছিল যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি সুদূরপ্রসারী।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

সংগ্রাম পরিষদ ১১ই মার্চে সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐদিন সারা পূর্ব বাংলায় এক প্রবল গণ-বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গে সরকারের ভিত্তি কেঁপে ওঠে। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের—তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি নব অধ্যায়ের সূচনা করে।

ঐতিহাসিক ১১ই মার্চ

এই দিনের ঘটনা যে ভাষা আন্দোলনে কতখানি গুরুত্ব সৃষ্টি করেছিল, জনাব কে. জি. মুস্তাফা তাঁর একটি প্রবন্ধে তা' তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকাও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

'১৯৫২ সালের মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস মূলতঃ প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারার দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর এ দ্বন্দ্ব সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। তৎকালীন মুসলিম লীগের প্রাচীন-

পন্থীদের নিকট লাহোর প্রস্তাবের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র সমবায়' (sovereign and independent states) গঠনের প্রতিশ্রুতি ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের তরুণ বুদ্ধিজীবী সমাজকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। তারা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেছিল, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা তাদের আত্মবিকাশের দ্বার উন্মুক্ত করবে। বিভিন্ন সংস্কৃতির স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, গণমুক্তির প্রথম স্তররূপে জাতীয় মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে। তাদের একান্ত প্রত্যয় ছিল, বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় সত্তারূপে পাকিস্তান গড়ে তুলতে জাতীয় সার্বভৌমত্বের যে স্বীকৃতি অপরিহার্য, লাহোর প্রস্তাব তা' সুনিশ্চিত করেছে। এবং পাকিস্তানকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী করার মূলমন্ত্রও ঐ স্বীকৃতিতে নিহিত।

প্রাচীনপন্থীরা নব্যশক্তির মোকাবিলায় ইতিহাসকে বিকৃত করার মহাজনী পন্থা অবলম্বন করলেন—কালক্ষেপ না ক'রে তাঁরা ঘোষণা করলেন—এক আল্লাহ, এক কোরান, এক রসুলের অনুসারী মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তান হবে এক রাষ্ট্র, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির দেশ। লাহোর প্রস্তাবের states শব্দের 's' কে তাঁরা আখ্যা দিলেন টাইপের ভুল।

লাহোর প্রস্তাবের এই বিকৃত ব্যাখ্যার প্রবক্তারা ভারতের সদ্য বিকাশোন্মুখ মুসলিম অর্থনৈতিক স্বার্থের সক্রিয় সহযোগিতায় বলীয়ান। সুতরাং অধিকতর বেপরোয়া। এবং এই বেপরোয়া মনোবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ ঘটলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই প্রথমে রেসকোর্স ময়দানে এবং পরে কার্জন হলের সুধী সমাবেশে.. ......১৯৪২ সালের ইতিহাসের বিকৃতি পর্যায় থেকে ব্রিটিশ সরকারের ৩রা জুনের (১৯৪৭) ঘোষণা পূর্বকাল পাকিস্তান আন্দোলনের অন্তর্নিহিত নব্যশক্তির প্রস্তুতি-পর্ব। কলকাতা সিটি মুসলিম ছাত্রলীগ 'শহীদ হালিম' গ্রুপের উদারপন্থী মুসলিম মহল এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুসলিম তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একাংশ সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেন আসন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার জন্য। পূর্ব পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক যুবসংস্থা ও একটি প্রগতিশীল ছাত্রসংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা

গৃহীত হ'ল। পরবর্তীকালে জন্ম নিল পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব-লীগ (শামসুল হক ও আতাউর রহমানের নেতৃত্বে) এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কমিটি (শেখ মুজিবুর ও নঈমুদ্দিনের নেতৃত্বে)।

প্রবীণ চিন্তাধারা ১৫ই আগস্টের পর যেমন পেলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক শক্তির উৎসাহ, নবীন চিন্তাধারা পেলো সাংগঠনিক শক্তির হাতিয়ার ও উচ্চতর আদর্শের ধর্ম। ফলে উভয় চিন্তাধারার স্বাধীনতাপূর্ব কালের সুপ্ত দ্বন্দ্ব স্বাধীনতা উত্তরকালে সুস্পষ্ট সংকটে রূপান্তরিত হ'ল। এবং সে সংকটের গভীরতার অভিব্যক্তি ঘটলো কার্জন হলে সেই সুধী সমাবেশে—একমাত্র উর্দুর আস্ফালন স্তব্ধ হয়ে গেল বজ্রকণ্ঠের 'না' ধ্বনির তরঙ্গাঘাতে।

২১শে ফেব্রুয়ারী (৫২) আন্দোলনের পথিকৃত ১১ই মার্চের (৪৮) আন্দোলন ছিল এই ঐতিহাসিক 'না' ধ্বনির উত্তাল তরঙ্গ। ঢেউ লাগলো সারা প্রদেশে। স্বাধীনতাকামী জনসমষ্টির যেন নব যাত্রা শুরু হ'ল। তরুণ সমাজ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। পুলিশের মুখোমুখি। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে। এরা পাকিস্তানের নব্যশক্তি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এরা উপরতলার চক্রান্ত উপেক্ষা ক'রে কলকাতার দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় শান্তি মিছিলে সামিল হয়েছে। বৃটিশ-বিরোধী শ্লোগানে কলকাতার রাজপথ কাঁপিয়ে তুলেছে। ১৯শে জুলাইয়ের (১৯৪৬) সর্বাত্মক হরতাল সফল করেছে, 'রশিদ আলী দিবসে'র যৌথ নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের গতি নির্ণয় করেছে এরা বালুঘাট উপনির্বাচনে, ৪৫ ও ৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে।

১১ই মার্চ এঁদের ত্যাগের পরীক্ষা, ঈমানের পরীক্ষা, নবলব্ধ চেতনার অগ্নিপরীক্ষা। এরা জয়ী হ'ল। চারদিন সংগ্রামের পর।"

['একুশে ফেব্রুয়ারী', হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃঃ ২০৯—২১১]

১১ই মার্চের ধর্মঘট পালনের কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আগের দিন অর্থাৎ ১০ই মার্চ ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাপকভাবে পিকেটিং

করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নির্দিষ্ট দিনে ছাত্ররা পিকেটিং শুরু করে। তারা ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করতে থাকলে সরকারের নির্দেশে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ধর্মঘটের জন্য পিকেটিং-এর সময় যেসব ছাত্রনেতা বন্দী হন, শেখ মুজিব ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁকে প্রথমে কোতোয়ালী থানায় ও পরে ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১১ই মার্চের ঘটনাবলী সম্পর্কে সেদিন পূর্ব পাকিস্তান সরকার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়ঃ

কারাগারে শেখ মুজিব

"বাংলাকে কেন্দ্রের সরকারী ভাষা না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ আহূত সাধারণ ধর্মঘটকে কার্যকর করার জন্যে আজ ঢাকাতে কিছু সংখ্যক অন্তর্ঘাতক এবং একদল ছাত্র ধর্মঘট করার চেষ্টা করে। শহরের সমস্ত মুসলিম এলাকা এবং অধিকাংশ অমুসলিম এলাকাগুলি ধর্মঘট পালন করতে অসম্মত হয়। শুধু মাত্র কিছু কিছু হিন্দু দোকানপাট বন্ধ থাকে। শহরের এবং আদালতের কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। রমনা এলাকায় অবশ্য ধর্মঘটকারীরা কিছু কিছু অফিসের লোকদের কাজে যোগদানে বাধা দেয়। পিকেটিং করার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি দল সেক্রেটারিয়েট, হাই কোর্ট এবং অন্য কতকগুলি অফিসের সম্মুখে সমবেত হয়। এদের মধ্যে অনেককে শান্তভাবে স্থান ত্যাগ করতে সম্মত করা গেলেও অন্যান্যেরা আক্রমণোদ্যত হয়ে সেখানে অবস্থিত পুলিশ ও অফিসে যোগদানে ইচ্ছুক কিছু সংখ্যক লোকজনের উপর ইট-পাটকেল ছোড়ে এবং অন্যান্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। এর ফলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় এবং ৬৫ জনকে গ্রেফতার করে। এক সময় দু'বার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ পর্যন্ত করতে হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পুলিশ তৎপরতার ফলে মোট চৌদ্দ ব্যক্তি আহত হন এবং তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এঁদের মধ্যে কেউই গুরুতরভাবে অথবা গুলির আঘাতে আহত হন নি। খানাতল্লাসীর ফলে যে সমস্ত প্রমাণাদি এখন সরকারের হস্তগত হয়েছে, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে

সরকারী প্রেসনোট

বিভেদ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে হতবুদ্ধিতা সৃষ্টি ক'রে পাকি-স্তানকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে একটি গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।"

[প্রেসনোট, ১২-৩-৪৮]

সরকারী প্রেসনোটেই ১১ই মার্চের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে—যদিও সরকার সমস্ত দোষ কিছু সংখ্যক অন্তর্ঘাতক এবং একদল ছাত্রের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, প্রেসনোটটিতে সরকারের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

পরদিন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমদ সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে ১১ই মার্চের নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন।

সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদ

বিবৃতিতে তিনি ঐ দিনের ঘটনাবলীতে আহত ও পুলিশ কর্তৃক ধৃত ছাত্রদের একটি হিসেবও দেন। তাঁর মতে, সর্বমোট আহতের সংখ্যা ২০০, গুরুতররূপে আহত ১৮, ধৃত ৯০০ এবং জেলবন্দী ৬৯। ধৃত কর্মীদের মধ্যে অনেককে পরে ছেড়ে দেয়া হয়।

১২ই মার্চে জগন্নাথ কলেজে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ছাত্রেরা মিছিল বের করে। পুলিশী জুলুম ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ঢাকার সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

১১ই মার্চের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ই মার্চে পুনরায় ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এবং তা' ১৫ই মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৪ই মার্চে ঢাকাসহ প্রদেশের সকল জেলাতেও পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়।

১৫ই মার্চ তারিখের ধর্মঘটে পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বস্তরের জনগণ অংশ গ্রহণ করেন। সেক্রেটারীয়েটের কর্মচারী, অন্যান্য অফিসের বাঙালী কর্মচারী, এমন কি শেষ পর্যন্ত রেলকর্মচারীরাও তাঁদের কাজ ফেলে রেখে ধর্মঘটে যোগ দেন। পুলিশও পাইকারী হারে গ্রেফতার করতে থাকে। মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল হাস-পাতালের গেটের সামনে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাসও নিক্ষেপ করে।

ইতিমধ্যে খবর আসে যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় আসছেন।

আরো শোনা যায় যে, তিনি নাকি মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে ভাষার গণ্ডগোল মিটমাট করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

নাজিমুদ্দিনের কাছ থেকে সংগ্রাম পরিষদ এই মর্মে একটি অনুরোধ-পত্রও পান। তাতে লেখা হয়েছিল যে, সরকার তাঁদের দাবী মেনে নিতে রাজী আছেন এবং এর জন্য সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে নাজিমুদ্দিনের আলোচনার প্রয়োজন। সংগ্রাম পরিষদ প্রথমে তাঁর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও দাবী মেনে নেয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় বসতে সম্মত হন।

সংগ্রাম পরিষদ নাজিমুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে ঐদিন অর্থাৎ ১৫ই মার্চে পর পর দুটো বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে যাঁরা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আবুল কাশেম, কমরুদ্দিন আহ্মদ, মহম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

নাজিমুদ্দিনের সাথে ছাত্রনেতাদের তুমুল বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। অনেক হুমকি সহ্য করেও ছাত্রনেতৃবৃন্দ সরকারকে কতকগুলো শর্ত পালনের জন্য চাপ দিতে থাকেন। নাজিমুদ্দিন সবগুলো মেনে নিতে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। প্রথম দফা বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর পুনরায় বৈঠক বসে। অবশেষে সংগ্রাম পরিষদের নিকট সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হন।

ছাত্রদের নিম্নলিখিত ৮ দফা দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে নাজিমুদ্দিন এবং সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

"॥ এক ॥ ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করা হইবে।

॥ দুই ॥ পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

॥ তিন ॥ ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্য যেদিন নির্ধারিত হইয়াছে, সেইদিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার

এবং তাহাকে পাকিস্তান গণ-পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

॥ চার ॥ এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজি উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

॥ পাঁচ ॥ আন্দোলনে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

॥ ছয় ॥ সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

॥ সাত ॥ ২৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে পূর্ব বাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে, সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

॥ আট ॥ সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই (এই দফাটি নাজিমুদ্দিন নিজের হাতে লেখেন)।"

[পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ঃ বদরুদ্দিন উমর, পৃঃ ৮১]

এই চুক্তিতে সরকারের পক্ষে সই করেছিলেন নাজিমুদ্দিন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কমরুদ্দিন আহমদ।

১৯৪৮ সালের এই ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পর্কে খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা বলেছেন ঃ

"একদিকে মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন, অন্যদিকে সংগ্রাম পরিষদ। ১৫ই মার্চ চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। নাজিমুদ্দিন সরকার অংগীকার করলেন যে, বাংলাকে প্রদেশের সরকারী ভাষা করা হবে এবং দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সরকার সুপারিশ করবেন কেন্দ্রের নিকট।" [একুশে ফেব্রুয়ারী, হাঃ হাঃ রঃ সম্পাদিত, পৃঃ ২৯১]

এই চুক্তির পর, ছাত্রসমাজ কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সরকার পক্ষের ইচ্ছা ছিল একেবারে বিপরীত। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতারা বলতে শুরু করলেন যে, নাজিমুদ্দিনকে ভয় দেখিয়ে উক্ত চুক্তিতে সই দিতে বাধ্য করা হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে বলা হ'ল যে, ভারতীয় এবং কম্যুনিস্ট এজেন্টদের সাথে ষড়যন্ত্র ক'রে কিছু লোক নিয়ে এই আন্দোলন করা হয়েছে। সুতরাং তা' কোন-রূপেই জাতীয় আন্দোলন হতে পারে না—এর কোন মূল্য নেই। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কথা ভেবে সেদিন নাজিমুদ্দিন চুক্তিতে সই করেছিলেন। সেই চুক্তি কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না।

জনাব খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা মুসলিম লীগ সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

মুসলিম লীগ সরকারের বিশ্বাস-ঘাতকতা

..."এ যেন মধ্যপ্রাচ্যের নৃপতিদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের চুক্তি। লংঘন করার জন্যই চুক্তি সম্পাদন। শুধু প্রাদেশিক সরকার কেন? নবাবজাদা লিয়াকত আলীর কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার উর্দুর প্রভুত্ব বিধিসিদ্ধ করার জন্য শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ করলেন—

—উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা (১৯৫০)।

নাজিমুদ্দিনের চুক্তিকে কেন্দ্রীয় কর্তাব্যক্তিরা দুর্বলতার নামান্তর, ভারতীয় ও কম্যুনিস্ট এজেন্টদের কাছে আত্মসমর্পণের সামিল বলে অভিহিত করলেন।"

[প্রাগুক্ত, ১৯৬৫, পৃঃ ২১১]

১৫ই মার্চ পূর্ব বাংলার অ্যাসেম্বলীর বৈঠক বসবার কথা। ঐদিনই মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের বাসভবন—বর্তমান বাংলা একাডেমীতে মুসলিম লীগ পার্লিয়ামেন্টারী পার্টির বৈঠক চলাকালীন ধৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে একটি বিরাট মিছিল রাত্রি ন'টা পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভের ফলে সরকার শেখ মুজিবসহ আরো কয়েকজন ছাত্র-নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

১৬ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সংগ্রাম পরিষদের সভা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিব। তিনি সর্বসম্মতিক্রমেই সভাপতি

নির্বাচিত হয়েছিলেন। উক্ত সভায় পূর্ব-অনুষ্ঠিত ফজলুল হক হলের বৈঠকে গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় এবং গৃহীত প্রস্তাবগুলো নাজিমুদ্দিনের নিকট পৌঁছে দেবার জন্য অলি আহাদের হাতে দেয়া হয়। অতঃপর বক্তৃতাপর্ব শেষ হ'লে একটি মিছিল অ্যাসেম্বলী ভবনের দিকে যাত্রা করে।

১৬ই মার্চ-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই সভা সম্পর্কে জনাব বদরুদ্দিন উমর তাঁর "পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় যে সব কথা বলেছেন সে সব সম্পর্কে এখানে আলোচনার প্রয়োজন। তিনি বলেছেন ঃ

"বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই বেলা দেড়টার সময় শেখ মুজিবুর রহমান কালো শেরওয়ানী এবং জিন্না টুপী পরিহিত হয়ে একটি হাতলবিহীন চেয়ারে সভাপতির আসন অধিকার করে বসেন (তোয়াহা ও তাজউদ্দিন আহমদের তথ্য থেকে)। সেই সভায় তাঁর সভাপতিত্ব করার কোন কথা ছিল না কারণ ঢাকার তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে তাঁর ভূমিকা ছিলো নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি নিজেই সেই সভায় সভাপতিত্ব করার সিদ্ধান্ত নেন। এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সভাপতির চেয়ার দখল করেন (তোয়াহা ও তাজউদ্দিন আহমদের তথ্য থেকে)। সভার প্রথম দিকেই সকালে ফজলুল হক হলের বৈঠকে নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় ঃ

১। ঢাকা এবং অন্যান্য জেলায় পুলিশী বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তদন্তের জন্য সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত এবং সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।

২। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য পূর্ব বাংলা পরিষদের অধিবেশন চলাকালে একটি বিশেষ দিন নির্ধারিত করিতে হইবে।

৩। সংবিধান সভা কর্তৃক তাঁহারা উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি

অনুমোদন করাইতে অসমর্থ হইলে সংবিধান সভার এবং পূর্ব বাংলা মন্ত্রিসভার সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওয়ার পর অলি আহাদের মাধ্যমে সেটি প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় (তাজউদ্দিনের ডায়েরী ১৬-৩-১৯৪৮)। প্রস্তাব গ্রহণের পর মুজিবুর রহমান অন্য কাউকে বক্তৃতার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বক্তৃতা শুরু করেন। সেই এলোপাথাড়ী বক্তৃতার সারমর্ম কিছুই ছিল না (তোয়াহা ও তাজউদ্দিন আহমদের তথ্য থেকে)। অল্পক্ষণ এইভাবে বক্তৃতার পর তিনি অন্য কাউকে বক্তৃতার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ 'চলো চলো অ্যাসেম্বলী চলো' বলে শ্লোগান দিয়ে সকলকে মিছিল সহকারে পরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান (তোয়াহা ও তাজউদ্দিন আহমদের তথ্য থেকে)। সেদিনকার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী মিছিলের কোন কথা ছিল না। কিন্তু এই হঠাৎ-উদ্ভূত পরিস্থিতির পর মিছিলকে বন্ধ করা কারো পক্ষে সম্ভব হ'ল না। কাজেই ছাত্রেরা সরকার-বিরোধী এবং বাংলা ভাষার সমর্থনে নানাপ্রকার ধ্বনি দিতে দিতে পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হ'ল।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ এবং পরিষদ ভবনের নিকটবর্তী চৌমাথার কাছে মিছিলটি পেঁছালে পুলিশ তাঁদেরকে বাধা দান করে। এরপর ছাত্রেরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তারের বেড়া পার হয়ে কলেজ এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেখানেই অবস্থান করে। নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিত্বের পদত্যাগ দাবী এবং পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে থাকে।"

জনাব উমর ১৬ই মার্চ-এর সভা সম্পর্কে যে সব বর্ণনা দিয়েছেন তার সব তথ্যই সরবরাহ করেছেন জনাব তোয়াহা ও তাজউদ্দিন আহমদ। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ উক্ত তারিখে যে ডায়েরী লিখে-ছিলেন, তার চিত্রানুলিপি জনাব উমরের গ্রন্থেই আছে। পাঠকের অবগতির জন্য সেই ডায়েরীর নকল এখানে প্রদত্ত হ'ল ঃ

16.3.48 Rise 7 A.m. Study No.

To F. H. Hall at 8 A.m.—Some amendments were taken about the terms made yesterday with the premier in the

Committee meeting. At 1-30 P.m. meeting began in the University premises—Mujibur Rahman presided—amendments were adopted and sent to the premier by Wali Ahad—though there was no programme made by Committee of Action, a demonstration went to the Assembly House—they stayed there up to evening cursing the Govt. Party M.L.As—inspite of request students did not disperse—we, the members of the Committee of Action met in the room of ASE Main Hostel—remained there upto 5 P.m. When we heard of the attempts of the students to catch their MLAs—at this many MLAs of the Govt. party could not get out. Just at 7 P.m. a band of police under M. Gafur and Dist. magistrate Rahmatulla arrived and took to lathi charge, teargass and blank fire—they opened fire and teargassed in the Medical College Hospital compound too—from lathi charge 19 persons were wounded seriously—Saokat was one of them—Shamsuddin and I inform this to the opposition MLAs were at a meeting in Baliadi House.

At about 11-30 P.m. meeting of the Committee of Action sat at about 12 A'.m in the Hall (N)—continued up to 2 A.m. Decided to hold protest strike in Institutions only and hold meeting but not demonstration on 17th March. Back at 2-30 A.m. Bed at 3A.m.

Weather : Normal—excessive cold owing to rain former day."

[পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ৮০-৮১ পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী একটি চিত্রানুলিপি]

জনাব তাজউদ্দিনের এই ডায়েরীতে এমন তথ্য কোথাও নেই যে শেখ মুজিবুর রহমান জোরপূর্বক চেয়ার টেনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জনাব তোয়াহার দোহাই টিকতে পারে না। কেননা, তাঁর বক্তব্যের কোন প্রমাণই জনাব বদরুদ্দিন উমর তাঁর গ্রন্থে উপস্থিত করেন নি। সুতরাং জনাব উমর ১৬ই মার্চে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার বিবরণে শেখ মুজিবের যে চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন, তা' সমর্থন করা যায়' না। উক্ত সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে জনাব আবদুল মোমেন (বর্তমানে ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রতিমন্ত্রী), জনাব

কে. জি. মোস্তফা এবং জনাব বাহাউদ্দিনের সাথে আমি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। সেদিনের ভাষা আন্দোলনের সাথে এই তিন ব্যক্তি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, জনাব উমর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা' সত্য নয়। উক্ত সভায় শেখ মুজিবের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয়েছিল এবং তিনি যথা-নিয়মে সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। সভায় কোনরূপ হট্টগোল হয় নি। এ ছাড়া অ্যাসেম্বলী ভবনে মিছিল নিয়ে যাবার ব্যাপারে যদিও কমিটি অব অ্যাকশনের কোন পূর্বসিদ্ধান্ত ছিল না তথাপি সভায় উপস্থিত সকল বক্তা ও শ্রোতার বিশেষ আগ্রহ বারবার ব্যক্ত হয়েছিল বলেই সভাপতি অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। শেখ মুজিবের সংগ্রামী ও অকুতোভয় চারিত্র্যের একটি নিদর্শনও এ থেকে উপলব্ধি করা যায়। তিনি শুধু গরম বক্তৃতা দিয়ে বা সবাইকে মিছিলে উদ্বুদ্ধ করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি—মিছিলের পুরোভাগে থেকে সমগ্র মিছিল তিনি পরিচালনা করেছিলেন। জনাব উমর কৌশলে একথাটি উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন।

জনাব উমর আরো একটি কথা বলেছেন, "ঢাকার তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল নিতান্ত নগণ্য।" অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই; উমরের নিজস্ব বর্ণনা থেকেই প্রমাণ দেওয়া যায় যে, শেখ মুজিব সম্পর্কে জনাব বদরুদ্দিন উমরের এই উক্তি সত্যকে বিকৃত করেছে। এখানে আমি জনাব উমরের "পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" গ্রন্থ থেকেই প্রমাণ দেব:

"১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর কলকাতার সিরাজুদ্দৌলা হোস্টেলে কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রেরা পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের পরবর্তী কর্তব্য এবং কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান (রাজশাহী), কাজী মহম্মদ ইদরিস, শহীদুল্লাহ কায়সার, আখলাকুর রহমান প্রভৃতি। এ ব্যাপারে তাঁরা অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথেও আলাপ-আলোচনা করেন। এই সব আলোচনার পর স্থির হয় যে, স্বাধীনতাউত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার উপযুক্ত সংগঠন গঠন করা প্রয়োজন।

এর পর উপরোক্ত রাজনৈতিক কর্মীরা ঢাকায় এসে কমরুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, শামসুদ্দিন আহমদ, তসদ্দুক আহমদ, মহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, নুরুদ্দিন আহমদ, আবদুল ওদুদ, হাজেরা মাহমুদ প্রমুখের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। নতুন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য একটি সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁরা সকলেই একমত হন এবং এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন।"

[ঐ, পৃঃ ৬]

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর কলকাতার সিরাজুদ্দৌলা হোস্টেলে অসাম্প্রদায়িক দল গঠনের যে প্রয়াসের কথা জনাব উমর উল্লেখ করেছেন সেখানে কৌশলে তিনি শেখ মুজিবের নাম বর্জন করেছেন। অথচ শেখ মুজিব ও অপর কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে একথা আমি জানতে পেরেছি যে, উক্ত আলোচনা সভায় শেখ মুজিব নিজেও উপস্থিত ছিলেন। শুধু তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন এমন নয়, রাজশাহীর আতাউর রহমান ও শেখ মুজিবের উদ্যোগেই এই আলোচনা সভার ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল। পরে তিনি ঢাকায় এসেও এই আলোচনা ও কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিলেন এবং ইতিহাস প্রমাণ দেবে যে, এই অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত জনসমর্থন লাভ ক'রে জয়যুক্ত হয়েছিল। বাংলাদেশ এই-জাতীয় আন্দোলনের একটি বাস্তব ফসল।

আমরা একথা জানি যে, শেখ মুজিব নিজেও কলকাতা থেকে পাকিস্তানে এসে এমনি একটি রাজনৈতিক ছাত্রদলের সন্ধান করছিলেন। তা' ছাড়া মুসলিম লীগের শ্রেণী-চরিত্র সম্পর্কেও তিনি ধীরে ধীরে বিতৃষ্ণা পোষণ করতে থাকেন। পুরাতন ছাত্রলীগের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার জন্যই শাহ আজিজুর রহমানের সঙ্গে তাঁর সাংঘাতিক মতবিরোধ ঘটেছিল। জনাব উমরের উক্ত গ্রন্থে তার প্রমাণ আছে।

[ঐ, পৃষ্ঠা ৮]

১৯৪৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর বেলা ৩-৩০ মিনিটে 'বলিয়াদী হাউসে' পার্লামেন্টারী উপদলের বৈঠক বসে। এখানে শেখ মুজিব বামপন্থীদের

নেতৃত্ব দান করেন এবং নাজিম মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের প্রস্তাব করেন। পরের দিনও রাত্রি আটটা পর্যন্ত বৈঠক চলে। বৈঠক শেষে কয়েকজন ছাত্রনেতা 'ইত্তেহাদ' পত্রিকাটি বিভিন্ন ছাত্রাবাসে বিতরণের জন্য বেরিয়ে পড়েন। শেখ মুজিব এঁদের নেতৃত্ব দান করেন। "তখন ইত্তেহাদকে সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সে সময় লোক মারফৎ বড় বড় প্যাকেটে নিয়মিতভাবে ইত্তেহাদ ঢাকাতে আসতো এবং ছাত্ররা তা' মাঝে মাঝে বিতরণ করতেন।"

(ঐ, পৃঃ ৯৯)

"বামপন্থী মুসলিম লীগ কর্মীরা যাতে নতুন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারেন তার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে শামসুল হক, কমরুদ্দিন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, মুশতাক আহমদ প্রভৃতি যৌথভাবে ১৯৪৮-এর জানুয়ারীতে ঢাকা শহরে পুরাতন মুসলিম লীগের একটি সম্মেলন আহবান করেন। 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প, নামে অভিহিত এই সম্মেলন মুসলিম লীগের সাবেক অফিস ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম লীগের বামপন্থীদের পক্ষে সাংগঠনিক কার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।'

(ঐ, পৃঃ ৩৮)

ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সাফল্য দেখে মুসলিম লীগের আকরম খাঁ. নাজিমুদ্দিন, নূরুল আমীন প্রভৃতি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। অন্যান্যদের সাথে শেখ মুজিব আকরম খাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলিম লীগের বুর্জোয়া চরিত্র ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। আকরম খাঁ "ক্যাম্পের কর্মীদেরকে মুসলিম লীগ কর্মী হিসাবে বিবেচনা করতেই অস্বীকার করেন।"

(ঐ, পৃঃ ৩৯)

ভাষা আন্দোলনে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সকালে সেক্রেটারীয়েট গেটে পিকেটিং করে যাঁরা পুলিশ কর্তৃক বন্দী হয়ে জেলে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিব ছিলেন একজন

(ঐ, পৃঃ ৬৯-৭০)

ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম পরিষদ ১৫ই মার্চ-এ যে চুক্তিপত্র প্রণয়ন করেন তা' অনুমোদনের জন্য জেল-এ নিয়ে যেতে হয় এবং অন্যান্যদের মধ্যে শেখ মুজিবের অনুমোদন বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। (ঐ, পৃঃ ৮১-৮২)

১৫ই মার্চ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব ও শওকত আলী ফজলুল হক হল থেকে ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে গিয়ে সেখানেই রাত্রি যাপন করেন। পরদিন খুব সকালে তাঁরা আবার ফজলুল হক হলে ফেরত গিয়ে ছাত্রদেরকে একটি প্রতিবাদ সভার জন্য একত্রিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। (ঐ, পৃঃ ৮৮-৮৯)

অতঃপর ১৬ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিব। সভাশেষে তিনি অ্যাসেম্বলীর দিকে মিছিল পরিচালনা করেন। (ঐ, পৃঃ ৯০)

বামপন্থী রাজনীতি গড়ে তুলতে যাঁরা অক্লান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন শেখ মুজিব ছিলেন তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। ১৯৪৮ সালের ১৭ই নভেম্বর রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের যে বৈঠক বসে সেখানে শেখ মুজিব উপস্থিত ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর নিকট এ সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি প্রদানের জন্য তিনি জোরালো চাপ সৃষ্টি করেন। "সেই স্মারকলিপিটির খসড়া তৈরীর ভার অর্পিত হয় কমরুদ্দিন আহমদের উপর।" (ঐ, পৃঃ ১৬৭)

১৯৪৮-এর প্রথম দিকেই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নামে একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দান করেন শেখ মুজিব। "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ-এর অস্থায়ী অর্গানাইজিং কমিটির" যে ক'জন সদস্য নির্বাচিত হন তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (ঐ, পৃঃ ১৮৯)

রাজনৈতিক কারণে মুসলিম নামটি সংযুক্ত থাকলেও প্রতিষ্ঠানটি ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। এই ছাত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৪৯ সালের ৮ই জানুয়ারী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালন করা হয়।

"ঢাকা কলেজে আংশিক ধর্মঘট হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেদিন পূর্ণ ধর্মঘট হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে

বেলা দু'টার সময় মুসলিম ছাত্রলীগের আহবায়ক নঈমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান, দবিরুল ইসলাম প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। ছাত্রদের দাবীসমূহ বিবেচনা করে সেগুলিকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য সরকারকে এক মাসের সময় দেওয়া হয়।" (ঐ, পৃঃ ১৯২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন কর্মচারীদের ধর্মঘটে সহানুভূতি জানিয়ে যাঁরা নেতৃত্ব দান করেন শেখ মুজিব ছিলেন তাঁদেরই একজন। এর ফলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। একথা জনাব উমরও স্বীকার করেছেন।

(ঐ, পৃঃ ১৯৪---২২১)

জনাব উমর আরও স্বীকার করেছেন, "যে সমস্ত কর্মীরা পূর্ব বাংলায় নতুন রাজনীতি গঠন চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শামসুল হক, কমরুদ্দিন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শককত আলী, তাজউদ্দিন আহমদ, আতাউর রহমান, শামসুজ্জোহা, মহম্মদ আলমাস, মহম্মদ আওয়াল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য কয়েকজনও কলকাতা থেকে আসার পর সেই রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন।" (ঐ, পৃঃ ২২১)

আশা করি এতক্ষণ জনাব বদরুদ্দিন উমরের নিজের তথ্য থেকেই তাঁর এই উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়েছি যে, 'ঢাকায় তৎ-কালীন ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল নিতান্ত নগণ্য।' বস্তুত ১৯৪৭ থেকে এদেশে একটি অসাম্প্রদায়িক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে শেখ মুজিব যে ভূমিকা পালন করেছেন, তারই ফলশ্রুতি হিসেবেই তিনি এ দেশের অবিসম্বাদিত নেতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। অসীম ত্যাগ, অনেক সাধনা, সুচতুর কর্মপন্থা প্রভৃতি তাঁকে সাফল্যের স্বর্ণসিংহদ্বারে নিয়ে এসেছে। এ কারণেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে যে নতুন রাজনৈতিক দলের গোড়াপত্তন হয়েছিল শেখ মুজিবের নাম সেখানে, সহ-সম্পাদক হিসেবে প্রস্তাবিত ও "সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।"
(ঐ, পৃঃ ২৪৯)

মনে রাখা দরকার যে, শেখ মুজিব ছিলেন কারাগারে এবং তাঁর অনুপস্থিতেতেই তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়। একথা সত্য যে, শেখ মুজিবের একক নেতৃত্বের নিদর্শন ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত সমগ্র আন্দোলনে অনুপস্থিত। সে রকম আশা করাও দুরাশা, কেননা এই সময়টি ছিল তাঁর নেতৃত্বের প্রস্তুতি-পর্ব। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সর্বপ্রকার আন্দোলনেই তিনি যথাসাধ্য অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন এবং কখনো প্রত্যক্ষ কখনো বা পরোক্ষভাবে তাঁর সম্ভাবনা-সূচিত প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। আর এভাবেই ভবিষ্যতের একজন বলিষ্ঠ নেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবার প্রস্তুতি-পর্ব তিনি অতিক্রম করেছেন। প্রথম থেখেই দুর্জয় সাহসিকতা, অসীম সহন-শীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগের জন্য সাবিক মানসিক প্রস্তুতি, নিষ্ঠা ও সাধনা তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং দিনের পর দিন এই সমস্ত গুণ তাঁর ব্যক্তি-চরিত্রের ভূষণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

যাহোক, এবার আবার মূল বক্তব্যে ফিরে আসা যাক। আমরা ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করছিলাম। ১৬ই মার্চে যে মিছিলটি অ্যাসেম্বলী ভবনে গিয়ে অবস্থান করছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে, সন্ধ্যার দিকে এই মিছিলের উপর লাঠিচার্জ করা হয়, এবং এতে ১৯ জন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। রাত্রে সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে ফজলুল হক মুসলিম হলে। ১৭ই তারিখে প্রদেশব্যাপী শিক্ষায়-তনে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ঐ দিনের ধর্মঘট অভূত-পূর্ব সাফল্য অর্জন করে। শেখ মুজিব একজন বলিষ্ঠ প্রত্যয়সম্পন্ন এবং অসমসাহসী যুবনেতা হিসেবে ছাত্র-সমাজে এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। শেখ মুজিব, তাজ-উদ্দিন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দিন আহমদ, শওকত আলী, আবদুল মতিন, শামসুল হক প্রমুখ যুবনেতার কঠোর সাধনার ফলে বাংলা ভাষার আন্দোলন সমগ্র পূর্ব বাংলায় একটি 'গণ-আন্দোলন হিসেবে ছড়িয়ে পড়ল। জনসভা,

আবার সংগ্রাম

মিছিল আর শ্লোগানে সমগ্র বাংলাদেশ যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। রাস্তায় দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার—'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই'। দাবী আদায়ের জন্য ভাষা সংগ্রাম কমিটি অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতে লাগলো। এই ভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে ওতপ্রোত সম্পর্কে যাঁরা নিরলস কাজ করেছেন সেইসব ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে শেখ মুজিব ছিলেন অন্যতম। শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেবার বেলায় অন্যান্য-দের মধ্যে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়—এমনকি তাঁরই প্রেরণায়ই ৭৬ বছরের বৃদ্ধ শেরে বাংলা ফজলুল হক পর্যন্ত এই আন্দো-লনে প্রত্যক্ষ অংশ নিলেন। সরকারী পুলিশ বাধা দিতে চেষ্টা করলো। ছাত্রদের ওপর হামলা চালালো। এমন কি, তারা শেরে বাংলাকেও আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করল না। এই আঘাত হানার ব্যাপারে একজন পুলিশ অফিসার জাকির হোসেন এবং একজন সামরিক কর্মকর্তা আইয়ুব খানের ভূমিকা ছিল যেমন জঘন্য, তেমনি বর্বরোচিত।

আগেই বলা হয়েছে, আইয়ুব খান তখন পূর্ব বাংলার সামরিক কর্ম-কর্তা ছিলেন। যাহোক, ঠিক এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশের মধ্যেই জিন্নাহ্ ঢাকায় এলেন। ১৯শে মার্চ বিকেলে তেজগাঁ বিমান বন্দরে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। মনে রাখতে হবে যে তিনি প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অবিসম্বাদিত গণনেতা, জাতির জনক এবং পাকিস্তানের গভর্নর জেনা-রেল। জিন্নাহ্‌র ধারণা ছিল যে, তাঁর মুখের ওপর কথা বলবে, এরকম সাহস পাকিস্তানের কারো নেই। তাই প্রথমে তিনি ২১শে মার্চে অনুষ্ঠিত রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করলেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। তাঁর এই বক্তব্য সবাই নির্বিচারে গ্রহণ করেন নি—সভার একপ্রান্তে প্রতিবাদের ধ্বনি উত্থিত হয় এবং যাঁরা এই ধ্বনি তুলেছিলেন তাঁদের নেতৃত্ব দান করেন শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন আহমদ ও আবদুল মতিন। যদিও এই প্রতিবাদের সুর খুব প্রচণ্ড ছিল না, তবু জাতির জনক এই প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় একটি অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খেলেন। তাঁর জেদ বেড়ে গেল। অপমান তিনি হজম করতে অপারগ। তিনদিন পরে ঢাকার কার্জন হলে

জিন্নাহর ঢাকা আগমন ও ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দানকালে আবার সেই একই কথা তিনি জোর দিয়ে ঘোষণা করলেন।—

—এবার শুধু মুজিব নয় এবং আবদুল মতিনও নয়, হলের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত শুধু গর গর গর ধ্বনিতে জিন্নাহ্ সাহেবের কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর আবার তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করলেন। কিন্তু এবার তাঁর সুর অপেক্ষাকৃত নরম। "রেসকোর্সের বক্তৃতা এবং এই একই সমাবর্তন সভার বক্তৃতায় যখনই তিনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবার প্রস্তাব করেছেন তখন সে প্রস্তাবকে তিনি প্রকাশ করেছেন একটি বলিষ্ঠ ঘোষণার ন্যায়। কিন্তু ছাত্রদের দ্বারা বাধা পেয়ে এবং সভার বিক্ষুব্ধ পরিবেশ লক্ষ্য করে তিনি তাঁর প্রাক্তন শক্তি আর ফিরে পেলেন না; তাই অপেক্ষাকৃত মৃদু ভাষা প্রয়োগ করে বললেন, 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি একত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষার এবং আমার মতে একমাত্র উর্দুই হতে পারে সেই ভাষা।"

[বঃ উমর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০-১১১]

কিন্তু এবারেও মৃদু প্রতিবাদ এবং বিক্ষুব্ধ গুঞ্জন সভার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে উত্থিত হ'ল। আর এই সমগ্র পরিস্থিতি সুপরিকল্পিতভাবে সংগঠন করেছিলেন শেখ মুজিব।

জিন্নাহ্ ঢাকা অবস্থানকালে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে ভাষা ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে একাধিকবার আলোচনায় বসেন। কিন্তু কয়েকবার আলোচনার পর একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জিন্নাহ্ ছাত্র রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতাকে আবার জাগ্রত করতে সংকল্পবদ্ধ এবং ভাষার প্রশ্নে তিনি কোন আপোষ করতে প্রস্তুত নন। আলোচনার মাধ্যমে অন্য কোন লক্ষ্য অর্জিত না হলেও শেখ মুজিব ও তাঁর বন্ধুদের সাথে শাহ আজিজুর রহমানের পার্থক্য আরো তীব্র হয়ে ওঠে এবং শাহ আজিজ অসাম্প্রদায়িক ছাত্র শক্তিকে আঘাত হানবার জন্যে সরকারী সমর্থন সামগ্রিকভাবেই অর্জন করেন। অন্যপক্ষে শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন, তোয়াহা, শামসুল হক, নঈমুদ্দিন, কমরুদ্দিন প্রমুখ মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে

ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে জিন্নাহ্‌র আলোচনা ও তার ফলশ্রুতি

বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন যুবশক্তি ও জনশক্তি গঠনের জন্য নতুনভাবে যাত্রার জন্য সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা লাভ করেন।

কিন্তু সরকারী দমননীতিও এই সময় থেকেই প্রচণ্ড হতে থাকে। বিচ্ছিন্ন যুবশক্তিকে সংঘবদ্ধ করতে এবং ভাষা আন্দোলনকে একটি গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে শেখ মুজিব যতই নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে শুরু করলেন, ততই দ্রুত তিনি সরকারের কোপানলে পতিত হতে লাগলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে অসাম্প্রদায়িক যুবনেতৃত্ব এবং ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা, এই দুটো কারণেই তাঁকে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ সরকার পুনরায় কারারুদ্ধ করে। শেখ অম্লানবদনে এই নিয়তিকে স্বীকার করেন।

১৯৪৯ সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর পরই শেখ মুজিব রাষ্ট্র-ভাষার প্রশ্নে প্রতিবাদস্বরূপ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য তাজ-উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আবুল কাশেম, জনাব অলি আহাদ, তোয়াহা প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ভাষা আন্দো-লনকে আরও জোরদার করে তোলেন।

শেখ মুজিবের মুক্তিলাভ

১৯৪৯ সালেই পূর্ব বাংলার খাদ্য-ঘাটতির ফলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। সরকার খাদ্য সংকট সমাধানে উদাসীনতার পরিচয় দেন। ফলে বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবকে তার জন্য আন্দোলন শুরু করতে হয়। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তিনি একটি 'ভুখা মিছিলে'র নেতৃত্ব দেন। এতে খাপ্পা হয়ে সরকার উভয় নেতাকেই কারারুদ্ধ করেন। পাকিস্তান অর্জনের মাত্র দুই বছরের মধ্যেই এইভাবে ন্যায়ের পথে সংগ্রাম ক'রে বিপ্লবী যুবনেতা শেখ মুজিব কয়েকবার কারাবরণ করেন। কিন্তু কোন নির্যাতনের মাধ্যমেই ন্যায়ের ও সত্যের পথ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা যায় নি।

দুর্ভিক্ষ : শেখ মুজিব ও মওলানা ভাসানীর গ্রেফতার

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে শেখ মুজিবকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। অবশ্য বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে পুনরায় পড়াশুনোর সুযোগ দিতে রাজী ছিলেন, যদি তিনি ভবিষ্যতে ভালো হয়ে চলবার 'বণ্ড সই' করে দিতেন। মুজিব এতে রাজী হন নি। সে সময়

শেখ মুজিবকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার

তিনি বলেছিলেন, "শেখ মুজিব আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়েই আসবে তবে ছাত্র হিসাবে নয়, একজন দেশকর্মী হিসাবে।" শেখ মুজিব তাঁর ওয়াদা পালন করেছিলেন। আড়াই বছর পর আবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর রেস্তোরাঁয় ফিরে এসেছিলেন। তবে ছাত্র হিসেবে নয়—একজন দেশকর্মী হিসেবেই। তিনি তখন আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা।

এদিকে যুব আন্দোলন এবং অন্যদিকে মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী শাসন ইত্যাদি কারণে নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি আসন্ন হয়ে পড়েছিল।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন ও শেখ মুজিব সহ-সম্পাদক নির্বাচিত

এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালের ৩রা জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। তখন এই দলের নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। বলা বাহুল্য, এই দলের উদ্যোক্তারা অনেকেই ছিলেন মুসলিম লীগের বামপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী। মুসলিম লীগের পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক পূর্ব বাংলাকে শাসনের মাধ্যমে শোষিত হতে দেখে এ-দেশের কতিপয় দেশপ্রেমিক মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু ঢাকার নবাব খাজা নাজিমুদ্দিন, নূরুল আমীন, মওলানা আকরম খাঁ, ফজলুর রহমান প্রমুখ কয়েকজন মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিবিদ ক্ষমতার লোভে পশ্চিমাদের সহায়তা করে যাচ্ছিলেন।

মুসলিম লীগের বিরোধী দল মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে যে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন শেখ মুজিব তার সহ-সম্পাদক

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

নির্বাচিত হন। তখন তিনি জেলে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর বিগত দু' বছরের বিপ্লবী নেতৃত্ব ও মহান ত্যাগের কথা বিবেচনা ক'রে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে এই নবগঠিত দলের সহ-সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এই দলের অন্যান্যদের মধ্যে আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান ও আবুল মনসুর আহমদ সহ-সভাপতি, টাঙ্গাইলের শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবসহ রফিকুল হোসেন ও খন্দকার মোশতাক আহমদ সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ধরতে গেলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। দেশ বিভাগকে কেন্দ্র ক'রে মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শহীদ সাহেবের

বনিবনা হয় নি। তাই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পরও ভারতে অবস্থানরত মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য তিনি কলকাতায় থেকে যান। ১৯৪৮ সালে তিনি প্রথম ঢাকায় আসার চেষ্টা করেন, কিন্তু তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন নারায়ণগঞ্জে স্টীমার থেকে নামতে না দিয়ে তাঁকে পুনরায় কলকাতায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। এর প্রধান কারণ হ'ল, একে তো মুসলিম লীগের নেতারা শহীদ সাহেবকে ভয় করতেন, উপরন্তু খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন। পরে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৯ সালে কলকাতা থেকে করাচীতে তাঁর শ্বশুর স্যার আবদুর রহীম-এর বাসভবনে আসেন।

তাঁর করাচীতে পৌঁছানোর ব্যাপারে তদানীন্তন ফ্যাসিস্ট মুসলিম লীগ সরকার খুশী হতে পারে নি। সরকার কর্তৃক শহীদ সাহেবের গণপরিষদ সদস্য পদটি বাতিল ক'রে দেওয়া হয়। তারপর থেকে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের মাধ্যমে সরকার-বিরোধী দলের নেতৃত্ব দিতে থাকেন।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে সোহরাওয়ার্দী সাহেব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। এর সভাপতি শহীদ সাহেব স্বয়ং এবং সম্পাদক হন পশ্চিম পাকিস্তানের মাহমুদুল হক ওসমানী। ভাষা আন্দোলন তখন আস্তে আস্তে চরম পর্যায়ে উন্নীত হতে শুরু করে দিয়েছে। ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ গণ-আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। দেশের পরিস্থিতি উপলব্ধি করে পূর্ব বাংলার তৎকালীন নুরুল আমীন সরকার দমননীতির মাধ্যমে আন্দোলনের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা চালালেন। ১১ই মার্চের সংগ্রাম দিবসের কর্মসূচীর প্রধান উদ্যোক্তা শেখ মুজিবকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়।

শেখ মুজিব গ্রেফতার

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী হয়ে ঢাকা সফরকালে নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে আবার দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন—'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ভুলে গেলেন তিনি তাঁর চুক্তির কথা। বিশ্বাসঘাতকতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন তিনি। খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা লিখেছেন: "১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। আর ১৯৫২ সালের

নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা ও পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়া

২৬শে জানুয়ারী। মাঝখানে কয়েকটি বিশ্বাসঘাতক বৎসর আর খাজা নাজিমুদ্দিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের সংগ্রামের কথা স্মরণ করলো। আর স্মরণ করলো ১৫ই মার্চের চুক্তিপত্র লঙ্ঘন। পাঁচটি বৎসর যেনো বৃথা চলে গেছে। এত প্রতিবাদ, এমন দাবী, কোনও ফল নেই? প্রত্যয় দৃঢ়তর হয় ছাত্র-সমাজের। আবার আন্দোলন। অধিকার হরণকারীর বিরুদ্ধে মরণপণ প্রতিরোধ।"

[একুশে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫, পৃঃ ২১৩]

এবার সমগ্র পূর্ব বাংলার ছাত্র-সমাজ ফেটে পড়লো। শুরু হ'ল মহাসংগ্রামের আয়োজন।

১৯৫২-এর ২৭শে জানুয়ারী ডাকসুর ছাত্রনেতারা মধুর ক্যান্টিনে জমায়েত হ'ল। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ফজলুল হক হল। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচিহ্ন বুকে ধারণ করলো মধুর ক্যান্টিন। মধুর ক্যান্টিনে সভা শুরু হ'ল। গাজীউল হক একরাশ বেদনা ও ঘৃণা নিয়ে ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে উঠলেন। তাঁর বক্তৃতার অংশ এখানে তুলে দেয়া হ'ল ঃ

"ভাইসব, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নাজিমুদ্দিন কাল বলেছেন, 'উর্দু ই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। বেঈমান! বেঈমানের দল বারবার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, চুক্তি করেছে—বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। বারবার সে চুক্তি ভেঙ্গেছে। আজ ওদের কথার জবাব দেবার সময় এসেছে।

ওরা আমাদের প্রাণের ভাষা, বাপ-দাদার মুখের বুলি কেড়ে নিতে চায়। এ দেশের মাঝি আর মনের আনন্দে ভাটিয়ালী গান গাইতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মাইকেল-সুকান্ত আমাদের কাছে হয়ে যাবে ইতিহাসের বস্তু, মায়ের কাছে চিঠি লিখব—উর্দুতে ঠিকানা লিখতে হবে। উর্দু না জানার অপরাধে সরকারী চাকরি-বাকরি থেকে বঞ্চিত থাকবে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে উর্দুভাষীরা ছেয়ে ফেলবে বাংলাদেশ। আমাদের বুকের উপর

দাঁড়িয়ে আমাদেরই খবরদারী করবে তারা। সোনার বাংলাকে দেউলে করবে। শুষে নেবে সমস্ত সম্পদ। বাঙালীকে ভিখিরীর জাত বানিয়ে ওরা আমাদের তাদের তাবেদার বানাবে।......একটা জাতিকে ধ্বংস করার প্রধান উপায় হলো তার ভাষা কেড়ে নেওয়া। ভাষা কেড়ে নিয়ে ওরা আমাদের তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিতে চায়। বজ্র-কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করার সময় এসেছে। পূর্ব বাংলার সাড়ে চার কোটি লোক আজ ছাত্র-সমাজের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে রয়েছে। মায়ের সম্মান রাখতে এগিয়ে আসুক ছাত্র-সমাজ। ঝাঁপিয়ে পড়ুক মহাসংগ্রামে। লীগ-সরকার দেখুক, বাংলার ছাত্রজনতা তথা সাড়ে চার কোটি বাঙালীর অমিত শক্তি। আমরা যদি সকলে মিলিত আওয়াজ তুলি—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার নিপাত যাক—তা' হ'লে শুধু সেই প্রচণ্ড গর্জনের তোড়েই লীগ সরকার ভেসে যাবে।"

[জয়বাংলা মুক্তিফৌজ ও শেখ মুজিব ঃ কলহন, পৃঃ ৬২-৬৩]

উক্ত সভায় ধর্মঘট পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০শে জানুয়ারী স্কুল-কলেজের ছেলেরা ধর্মঘট করে। কচি কচি ছেলেমেয়ে এই ধর্মঘটে শরিক হয়। তারা সমস্বরে আওয়াজ তুলে ঃ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। 'আমাদের দাবী মানতে হবে, নইলে গদী ছাড়তে হবে'। মিছিলের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের চোখেমুখে এক বজ্রকঠিন শপথের ইঙ্গিত রয়েছে। তারা সকলে সামনের দিকে নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে চলেছে—জয়ের মুকুট আজ তাদেরকে কেড়ে নিতেই হবে। ছাত্রনেতারা কথার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে বলে চলেছে ঃ 'বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা—সেই ভাষাকে জালিম দস্যুর দল পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীরা কেড়ে নিতে চায়। আসুন—আমরা সবাই মিলে বজ্রকঠিন শপথ গ্রহণ করি। আমরা প্রাণ দেব, তবু মাতৃভাষার অপমান সহ্য করবো না। আমরা রক্তবীজের দল—হাসিমুখে যেমন রক্ত দিতে জানি, তেমনি ফ্যাসিস্ট সরকারের টিয়ার গ্যাস আর রাইফেলকেও উপেক্ষা করতে পারি। বাংলা হিন্দুর ভাষা নয়—বাংলা মুসলমানের ভাষা নয়—বাংলা বাঙালীর ভাষা। আমরা বাঙালী। বাংলামায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমরা প্রাণ বিসর্জন দিতে কার্পণ্য করব না।'

সেদিন বাংলার রাজনৈতিক গগনে যে কালবৈশাখীর তাণ্ডব নৃত্যের শুরু হয়েছিল, যে ঝড়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তাতে কোন বাঙালী ভীত হয় নি। বাংলামায়ের দামাল ছেলেদের পাশে দামাল মেয়েরাও এসে উপস্থিত হয়েছিল। সেদিন নারায়ণগঞ্জের মরগ্যানের ছাত্রীরা ঘরে বসে থাকতে পারে নি। তারা নেমে এসেছিল রাজপথে। মেয়েদের যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি অসাধারণ নন—তিনি আমাদের সাধারণ ঘরের একজন কন্যা বা বধূ। এক ডাকে তাঁকে সকলেই চিনবে। তিনি সকলের মমতাজ আপা। সেদিন এই অগ্নিকন্যা অসংখ্য ছাত্রী সমাবেশে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রীদের নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নারায়ণগঞ্জে এসময় তরুণ কিশোর নেতা মোস্তফা সরওয়ার বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে এগিয়ে আসেন। কলহন বলেছেন: "দিনের পর দিন মমতাজ আপা ও মোস্তফা সরওয়ারের জ্বালা ধরানো বক্তৃতায় নারায়ণগঞ্জ শহরটা জেগে ওঠা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মত গর্জন করতে থাকলো।" (জয়বাংলা মুক্তিফৌজ ও শেখ মুজিব, কলহন, পৃঃ ৬৭) প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার সব শহরের অবস্থাই ছিল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মতই বিক্ষুব্ধ।

বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে, মহকুমায়, গ্রামে চলছিল আন্দোলন, সভা ও মিছিল। ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারীতে ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বার-লাইব্রেরী হলে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে এত লোক হয়েছিল যে তিল ধারণের জায়গা ছিল না।

এই আন্দোলনের মধ্যে বাঙালী মানসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা' প্রমাণ করে যে, সামগ্রিক মুক্তিই তাঁদের একমাত্র কাম্য। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য শুধু বাংলা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছিল না; সমগ্র আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ন্যায্য অধিকারে বাধা সৃষ্টি থেকে। এই অধিকার যেমন ভাষার ক্ষেত্রে তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে এবং সমগ্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাঙালী দিনের পর দিন ছিল বঞ্চিত, অবহেলিত এবং শোষিত। সুতরাং ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র

করে বাঙালী তার সামগ্রিক মুক্তির সন্ধান করছিল। আর এ কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারীর রক্তস্নাত দিন থেকে আমাদের নতুন দিগন্তের পানে যাত্রা শুরু হ'ল—যে দিগন্ত স্বাধীনতার প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রসারিত।

ভাষা আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তুলবার জন্য ৩০শে জানুয়ারী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সংগ্রাম কমিটিতে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, খিলাফতে রাব্বানী পার্টি, ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে দু'জন দু'জন করে প্রতিনিধি নেওয়া হয়। কমিটির আহবায়ক ছিলেন গোলাম মাহবুব। কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন---আবুল হাশেম, আতাউর রহমান খান, কমরুদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ, মহম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, খালেক নওয়াজ খান, শামসুল হক প্রমুখ। বলা বাহুল্য, এ সময় শেখ মুজিব জেলে ছিলেন।

সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি

সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির ডাকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করলো। তাদের শ্লোগানে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ছাত্র-জনতার হাতে এক একটি করে প্ল্যাকার্ড শোভা পাচ্ছিল। প্ল্যাকার্ড-গুলোতে লেখা ছিলঃ 'ভাষার উপর হামলা চলবে না', 'ফ্যাসিস্ট নুরুল আমীন নিপাত যাও', 'নাজিম চক্রান্ত ব্যর্থ করুন', 'বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ' ইত্যাদি।

সেদিন বিকেলে সংগ্রাম কমিটির তরফ থেকে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁদের জ্বালাময়ী ভাষণে সরকারকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে তুলেছিল। উক্ত সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয়---(ক) বাংলা ভাষার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হবে; (খ) একুশে ফেব্রুয়ারী 'ভাষা দিবস' হিসাবে পালন করা হবে; (গ) ঐদিন বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে প্রদেশব্যাপী ডাক দেওয়া হবে সর্বাত্মক হরতালের।

সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়ায় ১১ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারীকে 'পতাকা দিবস' বলে ঘোষণা করা হয়। সেদিন হাজার হাজার ছেলেমেয়ে কৌটা হাতে নিয়ে

পথে পথে বেরিয়ে পড়ে। পথচারীদের বুকে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' লেখা কাগজের ব্যাজ এঁটে দেয়। জনতাও খুশীমনে নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী টাকা-পয়সা কৌটার ভেতরে ফেলে দিয়ে মনে করে---আমি বা আমরা বাংলা ভাষা আন্দোলনের এক একজন অংশীদার।

সে সময় ভাষা আন্দোলনের প্রচারের বাহন ছিল 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকা। সারা বাংলাদেশে বাঙালীর ঘরে ঘরে ভাষা আন্দোলনের সংবাদ বহন করতো উক্ত পত্রিকা। কিন্তু ১৩ই ফেব্রুয়ারী নিষেধাজ্ঞা জারী করে সরকার উক্ত পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাম সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সারা বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের সংবাদ পৌঁছে দেবার তীব্র সঙ্কট দেখা দেয়। তবে উল্লেখযোগ্য যে, এর পূর্বেই '২১-এর ডাক'---বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিল। তা' ছাড়া, 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' তখন এই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়।

ভাষা আন্দোলন ও পাকিস্তান অবজারভার

১৯৫২-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী। তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন তখন করাচীতে। পূর্ব বাংলার ছাত্রদের ভাষা আন্দোলনে তিনি উদ্বিগ্ন। তিনি তাঁর শয়নকক্ষে গালিচার উপর অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। একটু আগে নুরুল আমীনের সাথে টেলিফোনে আলাপ করছিলেন। পায়চারি করতে করতে আবার তিনি রিসিভার তুলে পূর্ব বাংলার চীফ সেক্রেটারীকে ফোনে ১৪৪ ধারা জারীর আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি ঢাকা সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'লেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার ঢাকা বেতার থেকে ১৪৪ ধারা জারীর সংবাদ প্রচার করা হ'ল।

খবরটি প্রচারের পর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ সমবেত হ'লেন একটি জরুরী সভায়। সদস্যদের কেউ কেউ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৪৪ ধারা যাতে ভাঙ্গা না হয় এই সিদ্ধান্তেই অধিকাংশ সদস্য রায় দেন। তবে সাধারণ ছাত্র, যারা ছাত্র সমাজের বৃহত্তর অংশ, সংগ্রাম পরিষদের এই সিদ্ধান্তকে প্রতিক্রিয়াশীল ও সরকারী নীতির পরিপোষক বলে ধিক্কার জানালেন।

১৪৪ ধারা ভেঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বৃহত্তর ছাত্র সমাজ যে বদ্ধপরিকর একথা পরদিন ভোরেই স্পষ্টতর হয়ে উঠলো।

১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারী। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল খুবই কম। যে দু'একটি দোকান খোলা হয়েছিল তা' ছাত্রদের সনির্বন্ধ অনুরোধে বন্ধ হয়ে গেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রাজপথে বেশ কিছু সংখ্যক পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুলিশদের অনেকের কোমরে টিয়ার গ্যাসের বাক্স। কারো হাতে লাঠি, কারো বা বেয়নেট লাগানো রাইফেল।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী

বেলা দশটা থেকে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে শুরু করেছে। বেলা বারোটায় সভা শুরু হ'ল। বটতলায় দাঁড়িয়ে ছাত্রনেতারা বক্তৃতা দিচ্ছে। প্রতিটি ছাত্রের চোখে-মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন দাঁড়িয়ে লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ভাষায় বিষোদ্গার করতে শুরু করলেন। ছাত্র সমাজকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "মায়ের অপমান সহ্য করা যায় না। মা তাঁর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ডাক দিয়েছেন। বলুন, আপনারা সে ডাকে সাড়া দিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবেন, না ঘরে ফিরে যাবেন ?"

সহস্র সহস্র কণ্ঠে নাগ-নাগিণীরা গর্জে উঠলো ঃ "১৪৪ ধারা মানব না, মানব না।'

সর্বদলীয় কর্ম পরিষদের শামসুল হক ছেলেদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি তাদের বললেন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা ঠিক হবে না।

ছাত্রদের তরফ থেকে বিদ্রুপাত্মক উক্তি ভেসে এল। শামসুল হক বসে পড়লেন। ছাত্রনেতা আবদুস সাত্তার পরামর্শ দিলেন---দশ দশ জন করে বেরুলে আইন অমান্য করা হবে না।

এ প্রস্তাব সকলে মেনে নিল। দশ দশজন ছাত্র নিয়ে এক-একটি দল তৈরী হ'ল তারা সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো ঃ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। '১৪৪ ধারা মানি না'। 'নাজিম-নূরুল নিপাত যাক'। 'চলো চলো অ্যাসেম্বলী চলো'। প্রথম দলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের দিকে এগিয়ে যেতেই জনৈক পুলিশ অফিসার সাবধানী বাণী উচ্চারণ করে বললেন ঃ "আপনারা বেরুবেন না। বেরুলেই গ্রেফতার করবো।"

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ধ্বনি দিতে দিতে প্রথম দশজনী দলটি গেটের বাইরে আসামাত্র একঝাঁক পুলিশ হুমড়ি দিয়ে তাদের উপর এসে পড়লো এবং টেনে হিঁচড়ে তাদেরকে ট্রাকের উপর তুললো। ট্রাকের উপর থেকে ওরা আওয়াজ দিলোঃ "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।"

এবার দ্বিতীয় দশজনী দলটি বের হওয়া মাত্র তাদেরকে গ্রেফতার করা হ'ল। মেয়েদের একটি দলও 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'—শ্লোগান দিতে দিতে পথে বের হ'ল।

মেয়েদের দলটি পরে শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে আর একদল দশজনী মিছিল ক'রে বেরিয়ে এল। এমন সময় এক পুলিশ অফিসার বিনা দোষে লাথি মেরে একটি ছেলেকে ফেলে দেয়। ছেলেটি উঠে অফি-সারটির মুখে থু-থু দিয়ে দেয়। এ হেন অবস্থায় একঝাঁক পুলিশ লাঠি হাতে ছেলেটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ দৃশ্য দেখে ছেলেরা ক্ষেপে যায়। ঝাঁকে ঝাঁকে ছুড়তে থাকে ঢিল। পুলিশ বাহিনীর টিয়ার গ্যাসের একটি শেল এসে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে। শুরু হয় ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ।

ছেলেরা একে একে মেডিক্যাল হোস্টেলে সমবেত হয়েছে। পুলিশ সেখানেও ঢুকতে চেষ্টা করেছে। অবশেষে টিয়ার গ্যাসও ছুঁড়ছে। ছেলেরা বিন্দুমাত্র দমে না গিয়ে চীৎকার করে উঠলোঃ "পুলিশী জুলুম চলবে না, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।"

পুলিশ অনবরত টিয়ার গ্যাস ছেড়ে চলেছে। সারা মেডিক্যাল কলেজ ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে। রোগীরা কাশছে আর কম্বল দিয়ে নিজেদের চোখ ঢেকে নিয়েছে। ইমারজেন্সীতে কতকগুলো ছেলেমেয়ে গ্যাসের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাদের কাতর ডাক ভেসে আসছে। মেডিক্যাল কলেজের দু'জন ছাত্রী ড্রপারে করে লিকুইড প্যারাফিন ঢেলে দিচ্ছে। ছেলেরা আবার ছুটছে গেটের দিকে। এভাবে বেলা দুটো পর্যন্ত ছাত্র-পুলিশের সংঘর্ষ চললো।

তিনটা বাজে। অধিবেশন বসার সময় হয়ে এল। ছাত্ররা এম, এল, এ-দের নিয়ে একটি জীপ ছুটে যাচ্ছে দেখে চীৎকার করে উঠলোঃ "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।"

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররাও কলেজ গেট থেকে আওয়াজ দিচ্ছে ঃ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

ছাত্রদের শ্লোগানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা পরিবেশ গম্ গম্ করতে লাগল একজন পুলিশ অফিসার ছাত্রদেরকে উদ্দেশ করে বললেন, আপনারা দু'জন প্রতিনিধি অ্যাসেম্বলীতে পাঠিয়ে আপনাদের দাবী পেশ করে আসুন।

ছাত্ররা এই ধোঁকায় পড়তে রাজী নয়। তারা সমস্বরে চীৎকার করে উঠল ঃ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। ঠিক এমন সময় একটা টিয়ার গ্যাসের শেল ছাত্রদের সামনে এসে ফাটল। ছাত্ররা চোখে রুমাল দিয়ে বসে পড়ল। পর মুহূর্তে 'গুড়ুম' ক'রে শব্দ হ'ল। একটি বাচ্চা ছেলেকে কয়েকজন ধরাধরি ক'রে ইমারজেন্সী রুমের দিকে নিয়ে চলছে। ছেলেটির সার্ট রক্তে ভিজে গেছে।

আবার গুলীর আওয়াজ পাওয়া গেল। ছেলেদের মধ্যে হৈ চৈ, দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেল। অনেকের হাত-পা কেটে গেছে। সকলে এসে ভীড় করেছে ইমারজেন্সী রুমে। ছেলেটির মাথার খুলি থেকে তাজা রক্ত ঝরে পড়ছে। সকলেই এই দৃশ্য দেখে বিচলিত। সকলের চোখ সিক্ত। একটা আক্রোশ তাদেরকে উন্মত্ত করে তুলেছে।

ছেলেটির নাম জব্বার। সে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সারা দেহ নিথর হয়ে গেল।

আর একটি গুলীবিদ্ধ ছেলেকে কয়েকজনে ধরাধরি করে নিয়ে এলো। তারও মাথায় গুলী লেগেছে। সেখান থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন, তার দেহে আর প্রাণ নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। মার কোল শূন্য করে পরপারে যাত্রা করেছে। ভাষা আন্দোলনে এই বীর শহীদের নাম রফিক।

পুলিশী নির্যাতন তখনও সমভাবেই চলেছে। টিয়ার গ্যাস আর গুলীর শব্দে সারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ভীত ও সন্ত্রস্ত। ছাত্র-ছাত্রীরাও ভেজা রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে আর আওয়াজ তুলছে ঃ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী গুলীবিদ্ধ অবস্থায় ইমারজেন্সীতে আশ্রয় পেয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার-নার্স আর ছাত্ররা যান্ত্রিক-ভাবে কাজ করে চলেছে।

ছাত্র হত্যার কথা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। জনতা ১৪৪ ধারার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে দলে দলে মেডিক্যাল কলেজে এসে ভীড় জমাচ্ছে। তখন আর পুলিশ গুলী চালায় নি।

কিছুক্ষণ পর আবার গুলীর শব্দ। মেডিক্যাল কলেজের সামনে গাছগুলোর ওপর অনেক কাক বসে ছিল। গুলীর শব্দ পেয়ে তারাও কা-কা রবে বিপদের আশঙ্কা ঘোষণা করে চলেছে।

হঠাৎ একটা গুলী এসে একটি ছেলের উরুতে লাগে। ছেলেটি মেডিক্যাল হোস্টেলের শেডের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ থুবড়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। চাপ-চাপ রক্তে ঐ জায়গাটি লালে লাল হয়ে উঠেছে। কয়েকজন ছাত্র ধরাধরি ক'রে তাকে ইমারজেন্সীতে নিয়ে গেল। তখনও অনবরত রক্ত ঝরছে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছেলেটির সারা মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। পাশের ছেলেটিকে ডেকে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো ঃ আমাদের বাড়ীতে একটু খবর পাঠাবেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ভবন......পল্টন লাইন। একটু পরে সে পানি খেতে চাইলো। মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্রী দৌড়ে গিয়ে এক গ্লাস পানি এনে খাওয়ালো।

ছেলেটির নাম বরকত। স্নাতকোত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। মুর্শিদাবাদে তার বাড়ী। বাড়ীতে রয়েছে তার মা।

বরকত এই বাংলার মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। বরকত, জব্বার, রফিক নিজের রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলার ছাত্র-জনতাকে পথ দেখিয়ে গেল।

বরকতের মৃত্যুর খবর শুনে মেহনতী মানুষ রাস্তায় নেমে পড়লো। ছাত্র-জনতা সাগরের গর্জনের মত গর্জিয়ে উঠলো ঃ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'কসাই মুসলিম লীগ সরকার ধ্বংস হউক।'

ওদিকে পরিষদ কক্ষে অধিবেশন চলছে। পুলিশের গুলীতে ছাত্র হত্যার সংবাদ পরিষদ ভবনেও পৌঁছেছে। মনোরঞ্জন ধর ও গোবিন্দ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়—এই দু'জনেই উক্ত সংবাদ বহন করে পরিষদ কক্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিরোধী দলের সদস্যরা এই মর্মান্তিক সংবাদে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা নূরুল আমীনের নিকট এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের জবাব দাবী করেন।

নূরুল আমীন প্রথমে এই সংবাদ বিশ্বাস করতেই চান নি। তিনি বলেছিলেন, "ইটস্ এ ফ্যানটাসটিক স্টোরী।" বিরোধী দলের যুক্তির মুখে তিনি আর বিষয়টাকে চাপা দিতে সমর্থ হলেন না। তিনি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি না করেই উত্তেজিত হয়ে বললেন: "পুলিশ ঠিকই করেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা দমানোর জন্যই তো পুলিশ। এর পেছনে কম্যুনিস্টদের উস্কানি আছে। আমরা তাদের নির্মূল করবই।"

নূরুল আমীনের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিকে বিরোধী পক্ষ ও সরকার পক্ষের বেশ কয়েকজন সদস্য নিন্দা করলেন। সরকারী পক্ষের মধ্যে ছিলেন---মওলানা তর্কবাগীশ এবং আবুল কালাম শামসুদ্দিন। পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে মুসলিম লীগের পার্টি থেকে তাঁরা পদত্যাগ করলেন। মওলানা তর্কবাগীশ পরিষদ কক্ষে বললেন: 'আমাদের ছাত্ররা যখন শাহাদত বরণ করছেন, আমরা তখন আরামে পাখার হাওয়া খেতে থাকব, এ বরদাশত করা যায় না। চলুন, মেডিক্যাল কলেজে চলুন। মেডিক্যাল কলেজ আজ পাঁচ কোটি জনতার তীর্থস্থান। শহীদের রক্তে পবিত্র হয়েছে সেখানকার মাটি।' তারপর তাঁরা সদলবলে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েন।

মেডিক্যাল কলেজে তখন হাজার হাজার জনতা। ভাষা আন্দোলনের বীর সেনানীদের শেষ দেখা দেখবার জন্য এই সমাবেশ।

মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল ভবনে তোলা হয়েছে শহীদের রক্তে ছাপানো পতাকা। ছেলেরা মাইকে পুলিশী হত্যা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনবরত বলে চলেছে। থেকে থেকে সমুদ্রের কল্লোল গর্জনে গর্জে উঠছে: 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'লীগ সরকার নিপাত যাক'।

পরের দিন পুলিশী নির্যাতনের সংবাদ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল।

সংগ্রাম পরিষদ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল—২২শে ফেব্রুয়ারী শহীদদের লাশ দাফন করা হবে এবং মেডিক্যাল কলেজে গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে মেডিক্যাল কলেজের দিকে। জনতার সীমাহীন কাফেলা চলেছে সেই তীর্থস্থানে—যেখানে বরকত, জব্বার

ও রফিক মায়ের ভাষা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের রক্ত দিয়েছে। জানাজার সময় জানা গেল সরকার শহীদদের লাশ দেবেন না। অনেক চেষ্টা করেও লাশ পাওয়া গেল না। লাশ ছাড়াই গায়েবী জানাজা শুরু হ'ল। পরে অবশ্য এদের কবর চিহ্নিত হয়েছে।

ইমাম সাহেব দু'হাত তুলে মোনাজাত করলেনঃ

'আল্লাহ, জালিমের গুলীতে কচি কচি ছেলেরা মারা গিয়েছে। ওদের খুনে রাঙা হয়েছে ধুলো আর ঘাস। তুমি তো জান আল্লাহ, ওরা নিরপরাধ। ওরা শুধু বলেছিল—বাপ-দাদার মুখের ভাষা ওরা কেড়ে নিতে দেবে না। কিন্তু গুলী ক'রে জালিমরা খালি ক'রে দিল কতো মায়ের বুক। তুমি ওদের ক্ষমা ক'রো না। তোমার রোষের আগুনে জালিমদের নিশ্চিহ্ন করো দুনিয়ার বুক থেকে।'

জানাজার পর এক শোক-মিছিল বের করা হয়েছিল। ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল এগিয়ে চললো নবাবপুর রোডের দিকে। দোকান-পাট, যানবাহন সব বন্ধ। হঠাৎ এই মিছিলের উপর চললো অতর্কিত আক্রমণ। পুলিশের লাঠির ঘায়ে অনেকের মাথা ফাটলো। পুলিশের লাঠির আঘাতে ফজলুল হক সাহেবও আহত হয়েছিলেন। লাঠি-চার্জ করার পরই গুলীর শব্দ শোনা গেল। হাইকোর্টের সামনে গুলীবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল একটা ছেলে—নাম তার শফিকুর রহমান। সে ল' ক্লাশের ছাত্র। এই মিছিলে আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম।

বিক্ষুব্ধ জনতা এই সংবাদ পেয়ে রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। তখন বেলা তিনটা। পরিষদ কক্ষে অধিবেশন চলছে। জনতাও সেখানে গিয়ে অ্যাসেম্বলী ঘিরে ফেলেছে। বিরোধী দল থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেয়া হ'ল। সরকার পক্ষের কিছু সদস্য তা' সমর্থন করলেন। এদিকে চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের সাথে নূরুল আমীনের মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় প্রস্তাবটি কার্যকরী হতে বিলম্ব হ'ল। অবশেষে লীগ সরকার বাংলাকে প্রদেশের সরকারী ভাষা করতে রাজী হ'ল এবং বাংলা রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণ-পরিষদের কাছে সুপারিশ করে প্রস্তাব পাঠানো হ'ল।

নিরস্ত্র জনতার ওপর পুলিশী নির্যাতন ও হত্যাকে এবং শহীদদের লাশগুলো গায়েব করার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র ক'রে 'দৈনিক মিল্লাত' ২৩শে

ফেব্রুয়ারী সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখলেনঃ "ইসলামী বিধান অনুসারে লাশ খুবই পবিত্র। অত্যন্ত তাজিমের সঙ্গে সে লাশ দাফন করা বিধেয়। কিন্তু গত দুই দিনে পুলিশের গুলীতে শাহাদতপ্রাপ্ত লাশগুলো তাদের অভিভাবকের হাতে দেওয়া হয় নি। জানি না, শরিয়ত মোতাবেক শেষকৃত্য হয়েছে কি-না। এ যে কতো বড় মর্মান্তিক, অনৈসলামিক এবং গুণার বিষয় তা' বলে বোঝানো যায় না। সরকার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করছেন, পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র। এই কি ইসলামিক রাষ্ট্রের পরিচয়?"

বরকত-জব্বার-রফিক-শফিকদের রক্তের ঋণ এই দেশবাসী শোধ করতে পারবে না। শহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য শহীদ মিনারের পরিকল্পনা নেওয়া হ'ল। মেডিক্যাল কলেজের সামনের জায়গাটিতে 'শহীদ-মিনার' তৈয়ার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল। ছাত্ররা নিজেরাই ইট, সিমেন্ট নিয়ে লেগে গেল মিনার তৈরীর কাজে। হৃদয় নিঙড়ানো ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়ে গেঁথে তুললো শহীদ-মিনার। শহীদ শফিকুরের বাবাকে দিয়ে উন্মোচন করানো হ'ল এই শহীদ-মিনারটি।

একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে ও ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সরকার তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এ কারণেই ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বে অনেকবার তিনি কারাবরণ করেন। আবার ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রাক্‌কালে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ঢাকা জেল থেকেই তিনি গোপনে তাঁর বন্ধু ও অনুরাগীদের সংগ্রামের নির্দেশ দিতে থাকেন। তিনি জেলে অবস্থান-কালে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র সবাইকে মানিক (জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর)-এর সাহায্যে খবর দেন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষার প্রশ্নে মিছিল করে অ্যাসেম্বলীতে যাবার নির্দেশ দান করেন। তারপর ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ভাষার প্রশ্নে তিনি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে অনশনে যোগ দেন ছাত্রকর্মী মহিউদ্দীন। তিনিও তখন শেখ মুজিবের সঙ্গে জেলে ছিলেন। অনশনের ফলে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে, তখন তাঁকে ঢাকা জেল থেকে প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

কিন্তু ছাত্র-সমাজে তাঁর অপরিসীম প্রভাব লক্ষ্য ক'রে সরকার তাঁকে ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁকে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তিনি চালাকি ক'রে সময় হরণ করার চেষ্টা করেন। ইচ্ছা করেই নারায়ণগঞ্জ স্টীমার ফেল করেন। অনশনরত ছাত্র-নেতাকে ছাত্রজনতা দেখতে এলে নারায়ণগঞ্জের স্টীমার ঘাটে সমবেত জনতার উদ্দেশে বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম গড়ে তুলবার আহ্বান জানিয়ে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তাঁকে ফরিদপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি তখনও অনশন ভাঙেন নি। ২১শে ফেব্রুয়ারী তিনি ফরিদপুর জেলে কড়া পাহারায় অবস্থান করেন। তখন তাঁর শরীর সাংঘাতিকভাবে ভেঙে পড়েছে। অবশেষে তাঁর শারীরিক অবস্থার অস্বাভাবিক অবনতি ঘটলে তাঁকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির সময় তাঁকে স্ট্রেচারে ক'রে জেল গেটে নিয়ে এসে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে যান। সেখানে প্রায় একমাস চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ঢাকায় ফিরে এসে আবার যুব-নেতৃত্ব দান করতে থাকেন।

শেখ মুজিবের মুক্তি

পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে এখানকার রাজনীতির গতিধারা বড় বিচিত্র আকার ধারণ করে। একদিকে পূর্ব বাংলায় যেখানে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আগুন জ্বলছে, অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্রমাগত ক্ষমতার হাত বদল করছে।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়ে মিঃ জিন্নাহ্ লিয়াকত আলী খানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন—কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে মনোনীত ক'রে গেলেও লিয়াকত আলী খান ষড়যন্ত্র ক'রে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে করলেন গভর্নর জেনারেল। লিয়াকত আলী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিনের মতই চরম সাম্প্রদায়িক। তা' ছাড়া নাজিমুদ্দিন ছিলেন লিয়াকত আলীর খুবই অনুগত। আর সে জন্যই তাঁর ভাগ্যে বড়লাটের পদগৌরব সম্ভব হয়েছিল।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানে এসে করাচীতে অবস্থানকালে জিন্নাহ্ আওয়ামী লীগ গঠন করেন। মিস ফাতেমা জিন্নাহ্ তাতে সমর্থন দেন।

জিন্নাহ্ আওয়ামী লীগ গঠন

এতে স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, শেষের দিকে কায়েদে আযমের সঙ্গে লিয়াকত আলীদের সম্পর্কের চীড় ধরেছিল। কিন্তু লিয়াকত আলীও তাঁর একনায়কতন্ত্র বেশী দিন প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেন নি।

তাঁর বিরুদ্ধেও পশ্চিমের একটি চক্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এবং তাদেরই হাতে শেষ পর্যন্ত তিনি নিহত হন। তারিখটা ছিল ১৬ই অক্টোবর, ১৯৫১ সাল।

লিয়াকত আলীর মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং গভর্নর জেনারেল হলেন পাঞ্জাবের গোলাম মোহাম্মদ।

অবশেষে নাজিমুদ্দিনকেও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হ'ল। গোলাম মোহাম্মদ অকস্মাৎ বে-আইনীভাবে তাঁকে বরখাস্ত ক'রে ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে এনে তাঁর জায়গায় প্রধানমন্ত্রিত্বে বসিয়ে দিলেন।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে রাখা ভাল। এসময় তৎকালীন স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইয়ুব খাঁ এবং মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা আমেরিকায় গিয়েছিলেন সামরিক বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্য। পরে গোলাম মোহাম্মদও চিকিৎসার ভান ক'রে প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ারের সেক্রেটারী জেনারেল অব স্টেটস্ মিঃ ডালেসের সঙ্গে গোপনীয় কথাবার্তা চালান। পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রমাণ করে যে সে সময় তাঁরা আমেরিকার কাছে পাকিস্তানকে এক রকম বিক্রিই ক'রে দিয়ে এসেছিলেন।

যা হোক, ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব মুক্তিলাভের কিছু দিন পরেই প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

শেখ মুজিব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

দলের কল্যাণমুখী আন্দোলনকে অধিকতর দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য ক'রে তোলার জন্য তৎকালীন প্রাদেশিক সম্পাদক জনাব শামসুল হকের অসুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী মুসলিম্ লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ সাহেবকে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শেখ সাহেব

যোগ্যতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন ক'রে যেতে লাগলেন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের আন্দোলন একটি গণমুখী আন্দোলনের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসে। ফলে নির্বাচন-বিমুখ মুসলিম লীগ সরকার শেষ পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলেন।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পূর্ব বাংলা-ব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি পাকিস্তান সৃষ্টির অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৩ সালে তিনি যখন পূর্ব পাকিস্তানের এ্যাড-ভোকেট জেনারেল সে সময় বরিশালের এক জনসভায় তাঁর সেই লুপ্ত K. S. P. বা কৃষক শ্রমিক পার্টিকে তিনি পুনরুজ্জীবিত বলে ঘোষণা করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় ১৯৫৪ সালে যখন প্রদেশ-ব্যাপী সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছিল শেরে বাংলা আওয়ামী লীগের প্রতি তখন নির্বাচনী ঐক্যের আহ্বান জানান। এই বৃদ্ধ জননেতার বিপুল জনপ্রিয়তার দরুনই আওয়ামী লীগ তাতে সমর্থন জানান। উক্ত নির্বাচনী ঐক্যে বিরোধী দল হিসেবে অন্যান্য দলের মধ্যে নেজামে ইসলাম পার্টিও অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচন অভিযান পরিচালনার জন্য মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা ও শেখ মুজিব অক্লান্তভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান।

কৃষক-শ্রমিক পার্টির পুনর্জীবন

নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী সাহেব যে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন তা' অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়। তিনি বলেছিলেন, মুসলিম লীগ সরকার মাত্র নয়টি আসন লাভ করতে সক্ষম হবে। তাঁর এই ভবিষ্যৎ-বাণী তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় বহন করে। নির্বাচনে শেখ মুজিবকে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্রে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। শেখ মুজিব তেরো হাজার ভোটের ব্যবধানে কোটিপতি ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত করলেন। শুধু তাই নয়, তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন সাহেব তাঁর নিজের কেন্দ্রে

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী খালেক নওয়াজ নামে ২৫ বৎসরের এক যুবক ছাত্রের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। মুসলিম লীগের স্বপ্নসৌধ চুরমার হ'ল। ২৩৭টি আসনের মধ্যে তাঁরা পেলেন মাত্র ৯টি আসন। যুক্তফ্রন্টের এই ঐতিহাসিক বিজয়ের পেছনে ছিল তাঁদের একুশ দফা কর্মসূচী।

এই ২১-দফা কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল ঃ

১। বাংলা ভাষা হবে পাকিস্তানের অন্যতম একটি রাষ্ট্রভাষা।

২। ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে যে কোন প্রকারের জমিদারি বিলুপ্তিকরণ এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন। করের পরিমাণ হ্রাস।

৩। পাটশিল্পকে জাতীয়করণ, পাট উৎপাদকদের জন্য উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ। মুসলিম লীগ আমলের পাটশিল্পের দালালদের অনুসন্ধান ক'রে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

৪। সমবায় শিল্পপ্রথা প্রতিষ্ঠা দ্বারা কুটিরশিল্প ও শ্রমশিল্পের উন্নতি।

৫। লবণশিল্পে পূর্ব পাকিস্তানের স্বনির্ভরতার জন্য এই শিল্পের পত্তন এবং পাট-দালালদের মত লবণশিল্পের দালালদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। সর্বপ্রকার উদ্বাস্তু—বিশেষতঃ কারিগর ও শিল্প-শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সেচ-পরিকল্পনা।

৮। পূর্ববঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিল্প-শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান।

৯। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতা ব্যবস্থা।

১০। সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থা বিলোপের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কালাকানুন বাতিল ক'রে তাদের স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরকরণ।

১২। প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন, উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতনে সমতা আনয়ন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা ১,০০০ টাকার বেশী বেতন গ্রহণ করবেন না।

১৩। সর্বপ্রকার দুর্নীতি, আত্মীয় পোষণ, উৎকোচের অবসান এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালের পরের সময়ের প্রত্যেক সরকারী অফিসার ও বাণিজ্যপতিদের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ।

১৪। বিভিন্ন জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স কর্তৃক ধৃত সকল বন্দীদের মুক্তি এবং সভা-সমিতি, প্রেস ও বাক স্বাধীনতা দান।

১৫। বিচার-ব্যবস্থা ও প্রশাসন-ব্যবস্থা পৃথকীকরণ।

১৬। বর্ধমান ভবনকে প্রথমে ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগারে পরিণতকরণ।

১৭। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতে একটি শহীদ-স্তম্ভ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ।

১৮। ২১শে ফেব্রুয়ারী 'শহীদ দিবস' এবং ছুটির দিন ঘোষণা।

১৯। ঐতিহাসিক লাহোর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং মুদ্রাব্যবস্থা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। প্রতিরক্ষা বিষয়েও কেন্দ্রে যেমন থাকবে 'নেভি হেড কোয়ার্টার্স' এবং পূর্ববঙ্গকে অস্ত্র ব্যাপারে স্বনির্ভর করার জন্য তেমনি পূর্ববঙ্গে হবে 'অস্ত্রকারখানা' প্রতিষ্ঠা। আনসারদের পুরোপুরি সৈনিকরূপে স্বীকৃতি।

২০। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোন কারণেই আইনসভা বা মন্ত্রিসভার কার্যকাল বৃদ্ধি করবেন না এবং যাতে নির্বাচনী কমিশনারের মাধ্যমে স্বাধীন পক্ষপাতহীন নির্বাচন হতে পারে তার জন্য তাঁরা নির্বাচনের দু'মাস পূর্বে পদত্যাগ করবেন।

২১। প্রত্যেকটি আইনসভা সদস্যদের শূন্যপদ শূন্য হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দ্বারা পূর্ণ করা হবে এবং যদি যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী পর পর তিনটি উপনির্বাচনে পরাজিত হয় তবে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, ১৯৫৩ সালের ১৫ই নভেম্বর নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যে ৪২ দফা কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট

নেতা ও সাহিত্যিক জনাব আবুল মনসুর আহমদ উক্ত ২১ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ জয়লাভের পর K. S. P.-এর প্রধান শেরে বাংলাকে পার্টির নেতা মনোনীত ক'রে তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠন করার সুযোগ দেওয়া হয়। যদিও যুক্তফ্রন্টের বিজয়ী ২২৮টি আসনের মধ্যে ১৪৩টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগই সদস্যসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তথাপি শেরে বাংলার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং বয়সের কথা বিবেচনা ক'রে তাঁকেই পার্টি-প্রধান মনোনীত করা হয়। শেরে বাংলা হন প্রধানমন্ত্রী।

শেরে বাংলা : পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী

শেখ মুজিব প্রথমে পার্টির সংগঠনের গুরুদায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে মন্ত্রিসভায় যোগদান থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু পরে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশক্রমে মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এবং সমবায়, কৃষি ও বনবিভাগের মন্ত্রীরূপে কাজ করতে থাকেন। এই সময়েই বাংলা ভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি জানানো হয়। অপর রাষ্ট্রভাষা উর্দু। যে ভাষা-আন্দোলন বাংলা জাতীয়তাবাদের চেতনায় এদেশের মানুষকে বিপ্লবমুখী ক'রে তুলেছিল তার একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের আরো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল—সে হ'ল এদেশের মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি। যা হোক, বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে কেন্দ্রীয় তথা পশ্চিম পাকিস্তানী ফ্যাসিস্ট সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রথমে এই সমস্ত নেতৃবর্গ যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠনকে বানচাল করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা অন্য পথের ফিকির খুঁজতে লাগলেন। আবার পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনে এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের খেলা শুরু হ'ল। কতিপয় পুঁজিবাদী নেতা, আমলা, সৈনিক এই ষড়যন্ত্রের নায়ক হিসেবে দেখা দিলেন। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল তখন গোলাম মোহাম্মদ। তিনি ইতিহাসের একজন কলঙ্কিত চরিত্র। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দেবার জন্য তাঁরই গোপন হাতের কারসাজিতে

শেখ মুজিবের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

পশ্চিম পাকের চক্রান্ত

নারায়ণগঞ্জে আদমজী জুট মিলে বাঙালী ও অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে এক ভয়াবহ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। দাঙ্গায় হাজার হাজার বাঙালী শ্রমিক নিহত হয়। এই মিলে বাঙালী শ্রমিকদের যে ইউনিয়ন ছিল, তার সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী। স্বভাবতঃই এই সব বাঙালী শ্রমিকেরা যুক্তফ্রন্টে ভোট দেয়। ফলে, মিলের অবাঙালী মালিক এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই মুসলিম লীগের কারসাজিতে বাঙালী-দের শিক্ষা দেবার জন্য মিল কর্তৃপক্ষ নৃশংসভাবে অবাঙালী শ্রমিকদের দ্বারা হামলা বাধিয়ে দেয়। এই দাঙ্গাকে কেন্দ্র ক'রে প্রদেশে অশান্তি বিরাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে দায়ী করেন। শেরে বাংলাকে জরুরী সংবাদ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে আরও একটি ঘটনা ষড়যন্ত্রকারীদের সুযোগ ক'রে দিয়েছিল।

বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা

সুদীর্ঘ ১১ বছর পর শেরে বাংলা আবার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেই বিভক্ত পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রিত্বের আসনে উপবেশন করেছিলেন। তাঁর এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা স্মরণ করেই এপার-ওপার উভয় বাংলার হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হওয়ার সাতাশ দিন পরে তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন। তাঁর এই সফর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়। যখন পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন পুরোদমে চলছিল, ঠিক সে সময় এক শোভাযাত্রায় তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং পুলিশবাহিনীর নির্দয় লাঠিচালনায় তিনি পায়ে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। সেই আঘাতে তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁকে ইনভ্যালিড চেয়ারে চলাফেরা করতে হ'ত। সুতরাং পায়ের চিকিৎসার জন্যই তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর যৌবন-সহচর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দিয়ে তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন এবং ফেলে আসা পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আবার দেখা সাক্ষাৎ করবেন।

১৯৫৪ সালের ৩০শে এপ্রিল। বেলা সাড়ে তিনটা। ওরিয়েন্ট এয়ার-ওয়েজে শেরে বাংলা ফজলুল হক তাঁর লোকজনসহ দমদম বিমান

ঘাঁটিতে অবতরণ করেন। সঙ্গে তাঁর পত্নী ও দশ বছর বয়স্ক পুত্রও ছিলেন।

শেরে বাংলার কলকাতা গমন ও প্রাণঢালা সম্বর্ধনা লাভ

বিমান বন্দরে ফজলুল হক সাহেবকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিপুল জনতার সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি সেখানে অনেক পরিচিত মুখ দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ "এখানে আমি পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। এই কলকাতা শহরে ৬০ বছরেরও বেশী আমি আমার জীবনের সেরা আনন্দময় দিনগুলো কাটিয়েছি। সে সব দিনগুলোর কথা আজ বড় মনে হচ্ছে। সে সব পুরোনো স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে এবং সম্ভব হ'লে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করতে আমি কলকাতায় এসেছি। ভবিষ্যতেও আবার আসবো।"

পরদিন সকালে হক সাহেব রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ডাঃ বিধান রায়ের সাথে দেখা করেন। সেখানে অনেক পুরোনো বন্ধু থেকে শুরু করে অফিসের কর্মচারীবৃন্দ তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানালেন। ডাঃ রায় যথারীতি তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন। সেখানে হক সাহেবের বিশিষ্ট চিকিৎসক সার্জেন রায় বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ রায় এবং হক সাহেবের মধ্যে প্রাণখোলা আলোচনা হয়েছিল।

হক-রায় আলোচনা

দুই বাংলার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁরা সরাসরি আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের আলোচনার বিষয়-গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

(ক) দু' বাংলার মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা প্রথার বিলোপ সাধন।

(খ) উভয় বাংলার মধ্যে বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(গ) জনসাধারণের ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা ও যাত্রীদের কষ্ট লাঘবের জন্য থ্রু টিকেট দেয়ার ব্যবস্থা।

(ঘ) সীমান্ত সংক্রান্ত বিধি নিষেধ শিথিলকরণ।

(ঙ) বাস্তুহারাদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

এই সমস্ত বিষয় আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ডাঃ রায়ের নিকট বিদায় নিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে হক সাহেবকে

সম্বর্ধনা জানানো হয়। খিদিরপুরে হিন্দু-মুসলমান মিলিত এক সম্বর্ধনার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ঃ "বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দু' ভাগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে উভয় বঙ্গের কোন ফরাক নেই। রাজনীতিকরা দেশটাকে দু' ভাগ ক'রে এই সাংস্কৃতিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেন নি, ভবিষ্যতেও কোনদিন পারবেন না।"

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বহু মানপত্র পেয়েছিলেন। ৬ই মে বৃহস্পতিবার হক সাহেব দ্বিতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সাথে দেখা ক'রে প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী বিভিন্ন বিষয় আলোচনা ক'রে সময় কাটান। তারপর আ-যৌবন সহচরের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। জীবনে আর ডাঃ রায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি।

কলকাতা ত্যাগ করার পূর্বে এক বিদায়বাণীতে তিনি বলেছিলেন ঃ "বিষাদ ভারাক্রান্ত অন্তরে কলকাতার আমার অগণিত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীকে আমি বিদায় জানাচ্ছি। আমি বহুবার বলেছি যে, ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমি প্রথম কলকাতায় আসি এবং আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই মহানগরীতেই অতিবাহিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের ঐতিহ্য, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও যোগসূত্র এতই গভীর ও দৃঢ় যে, রাজনৈতিক বিভাগ তা' বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কলকাতায় আমার বন্ধু ও সহকর্মী-দের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে আমি খোলাখুলি মন নিয়েই আমার অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছি।

আমি অবশ্য এই কথা শুনে বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হই নি যে ঢাকায় একদল লোক, বিশেষ করে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আমার কথার কদর্থ করে নানারূপ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আমি তাঁদের কোন সমালোচনার কোন জবাব দিতে চাই না, শুধু বলব, আমার দলের কাছে নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে তাঁদের পক্ষে জনসাধারণের প্রতিনিধি সেজে কথা বলা সাজে না।

......আমি অবশ্যই একজন পাকিস্তানী, এবং আমি নিঃসন্দেহে মুসলিম লীগ পন্থী থেকে উৎকৃষ্ট পাকিস্তানী। কিন্তু আমি একজন পাকিস্তানী

হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে যেন কোন রাজনৈতিক বিচ্ছেদ হয় নি এমন ভেবে তাঁদের সম্পর্ক উন্নত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ করার চেষ্টায় কোন দোষ দেখতে পাই না।

আমার এই বিবৃতি শেষ করার আগে আমি পুনরায় কলকাতার অধিবাসীদের তাঁদের সাদর ও আন্তরিক অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা রাখি ও বিশ্বাস করি যে, দুই বাংলা মিলেমিশে কাজ করে তাঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধি ও সুখের পথে উত্তরোত্তর এগিয়ে যাবে।"

জনাব ফজলুল হকের কলকাতা ভ্রমণ ও সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁর ভাষণদান কুচক্রী মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু করলো। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বেতার ভাষণে হক সাহেবকে "পাকিস্তানের শত্রু" এবং "বিশ্বাসঘাতক" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করলেন। এভাবে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যুক্তফ্রন্টকে বানচাল করার চেষ্টা চালিয়েছিল।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন নিছক ক্ষমতার পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার নির্বাচন নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সুদীর্ঘ সাত বছর ধরে পশ্চিমা শক্তি পূর্ব বাংলায় চালিয়েছিল নির্মম শাসন ও শোষণ। পূর্ব বাংলার নিরীহ মানুষ এই নির্বাচনের মাধ্যমে পশ্চিমাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

করাচী-লাহোরের শাসকগোষ্ঠী নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিল যে যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রিত্ব গঠনের সুযোগ দিলেই এঁরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। কিন্তু বহু ষড়যন্ত্র এঁটেও তারা লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে নি।

অবশেষে জনাব ফজলুল হক কলকাতা থেকে ঢাকা ফিরে আসার পর তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদ এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী তাঁকে করাচীতে ডেকে পাঠালেন। হক সাহেব ২১শে মে শুক্রবার করাচীতে পৌঁছলেন। সেখানে গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সাতদিনব্যাপী বাক্‌বিতণ্ডা চলেছিল। হক সাহেব পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। ভারতের সাথে হক সাহেবের একটা যোগসাজস রয়েছে একথা বলে পশ্চিমা শাসকরা সেদিন হক সাহেবকে

দোষারোপ করেছিল। শুধু তাই নয়, শেরে বাংলা মিঃ কালহান নামক জনৈক মার্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নাকি অনেক দেশদ্রোহী কথাবার্তা বলেছিলেন বলে মিঃ কালহান অপপ্রচার চালাতে থাকেন। শেরে বাংলাকে কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে শাসকবর্গ মনের ঝাল মিটিয়েছিলেন। তাঁর দেশদ্রোহিতামূলক মনো-ভাবের সাক্ষী হিসেবে মিঃ কালহানকে পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত করা হয়।

শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রধানমন্ত্রী জনগণের উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে সাড়ম্বরে প্রচার করলেন যে, যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলাকে ভারতের সাথে যুক্ত করার ষড়-যন্ত্র এঁটেছিল। পাকিস্তানকে ধ্বংস করাই যুক্তফ্রন্টের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই অন্তর্ঘাতীদের হাত থেকে পাকিস্তানকে বাঁচাবার জন্য ৯২(ক) ধারা প্রবর্তন ক'রে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দেয়া হ'ল।

জনাব ফজলুল হক করাচী থেকে ঢাকা ফেরার পথে কলকাতায় দমদম বিমানঘাঁটিতে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর সাথে ছিলেন মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য—জনাব আজিজুল হক, জনাব আতাউর রহমান খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান।

সেদিন কলকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিকরা হক সাহেবকে নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। বাস্তবিক হক সাহেব খুব পরিশ্রান্ত ছিলেন। তিনি শুধু বললেন, "আমার কাছে এসে আর লাভ নেই। আমি কিছু বলতে পারব না। আমার মুখ বন্ধ।"

কলকাতার সাংবাদিকরা এক ঘোলাটে আবহাওয়ার কথা পূর্বেই অনুমান করেছিলেন। হক সাহেবকে আর বিরক্ত না করে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁরা বিদায় জানালেন।

শেরে বাংলা ঢাকার মাটিতে পা দেয়ার সাথে সাথে তাঁকে গৃহাভ্যন্তরে অন্তরীণ ক'রে রাখা হ'ল আর তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হক-সোহরাওয়ার্দীর উত্তরাধিকার শেখ মুজিবুর রহমানকেও গ্রেফতার করা হ'ল। পাকিস্তান সরকার তাঁকে জেলের বাইরে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। কারণ শেখ মুজিবের অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁরা বেশ ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। তাই কিছুদিনের জন্য

শেরে বাংলার অন্তরীণ ও শেখ মুজিবের গ্রেফতার

হলেও তাঁকে জেলে রাখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ঈদের আগের দিন তিনি গ্রেফতার হন। তাঁকে ঈদের নামাজ পর্যন্ত পড়তে দেয়া হয় নি। শেরে বাংলার ভাগ্যেও একই অবস্থা ঘটেছিল। তাঁকেও আপন ঘরের বাইরে নামাজ পড়তে দেয়া হয় নি।

এর আগেই ১৯৫৪ সালের ৩১শে মে রোববার গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা প্রবর্তন ক'রে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন এবং তদানীন্তন গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে সরিয়ে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা-সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে গভর্নর হিসেবে পাঠালেন পূর্ব বাংলাকে ঠাণ্ডা করার জন্য। গদিতে বসেই ইস্কান্দার মীর্জা লম্বা-লম্বা বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তিনি পূর্ব বাংলার বাঙালীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বললেন: "৯২(ক) ধারা প্রয়োগের বিরুদ্ধে কেউ 'টু' শব্দটি করলে তা' সহ্য করা হবে না, দরকার হলে আমি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জেলায় সৈন্যবাহিনী পাঠাবো। মোদ্দা কথা, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবো। এর জন্য যদি দশ হাজার বাঙালীকে খুন করতে হয়, তা'ও করতে রাজী। তবুও আমি এ কাজে পেছপা হব না।"

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা

তিনি পূর্ব বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নকে কম্যুনিস্ট ও ভারতের এজেন্ট বলে দোষারোপ ক'রে বললেন: "এরা পূর্ব বাংলাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ঘোরতর ষড়যন্ত্র করছে। তারা পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করছে এবং সেই চুক্তির বিরোধী দিবস পালন করেছে গত ১৬ই এপ্রিল তারিখে।" তিনি ভাসানীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ক'রে বললেন: "ভাসানীকে আমি গুলি ক'রে হত্যা করবো।" সৌভাগ্য যে ভাসানী সাহেব মীর্জা সাহেবের পিস্তলের নলের সামনে ছিলেন না, তখন তিনি বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য সুইডেনের রাজধানী স্টকহমে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে লণ্ডনে গিয়ে অবস্থান করছিলেন।

কিছুদিন পর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সবাইকে চমকিয়ে দিয়ে গোটা বাংলা সম্পর্কে এক বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন যে, "হক

সাহেব দেশদ্রোহী নন। বরং তাঁকে বন্ধু বলেই তিনি মনে করেন।" ফলে বৃদ্ধ বয়সেও হক সাহেবের মনে আবার নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হ'ল। এর আগে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন; কিন্তু গোলাম মোহাম্মদ পরে যখন ঢাকায় এলেন তখন তাঁর চালবাজীকে সরল মনে গ্রহণ ক'রে কৃতজ্ঞতাবশতঃ হক সাহেব গভর্নর জেনারেলের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা আতাউর রহমান খানও। এমনকি কার্জন হলে গোলাম মোহাম্মদকে অভিনন্দনও জানান হ'ল।

এই অভিনন্দনের ফল একদিকে শুভই হয়েছিল বলতে হবে। কারণ ১৯৫৫ সালের ৩রা জুন করাচী থেকে ফরমান জারী করে পূর্ব বাংলার বুক থেকে গভর্নরের শাসন তুলে নেয়া হ'ল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকারী ছিলেন।

পুনরায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন

পার্টি'র লীডার ফজলুল হককে সে অধিকার দান করা হয়। কিন্তু হক সাহেব নিজে মন্ত্রিসভা গঠন না ক'রে কৃষক-শ্রমিক পার্টি'রই সদস্য আবু হোসেন সরকারের ওপর সে দায়িত্ব অর্পণ করেন। আবু হোসেন সরকার আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নেজামে ইসলাম পার্টি'র সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেন।

ইতিমধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় শেখ মুজিব মুক্তি পেয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। এই নির্বাচনেও শেখ মুজিব সদস্য নির্বাচিত হন। কেন্দ্রে যে মন্ত্রিসভা গঠন করা হ'ল তাতে ঠাঁই পেলেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও মুসলিম

শেখ মুজিবের মুক্তি

লীগ। শেরে বাংলা ফজলুল হকও উক্ত মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেলেন। আগেই বলা হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগের সদস্যসংখ্যা ছিল সর্বাধিক; তথাপি তাঁদেরকে বাদ দিয়েই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করায় ফ্রন্টের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হ'ল।

আসলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলের এই ভাঙ্গনের জন্যই গোলাম মোহাম্মদ চালাকি ক'রে ফজলুল হককে নিজের কাছে টেনে নিলেন। বাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগকে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার জন্য ভাসানী ও শহীদ সাহেবকে রাজী করালেন। পরিশেষে যুক্ত-ফ্রন্টের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী ওয়াদা পালনের জন্য শেখ সাহেব একটা পূর্ণ আন্দোলনের নেতৃত্বে দিতে থাকেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জনসমর্থন লাভের মূলে ছিল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার ও পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী। পূর্ব বঙ্গের ওপরে জাতীয় ঐক্যের নামে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান—এই ধ্বনি মূর্ত হয়েছিল নির্বাচনী রায়ের মাধ্যমে।

পশ্চিম পাকিস্তানের এই উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের মাধ্যমে শুরু করলেন ব্যাপক গণ আন্দোলন। 'কেন পূর্ব বঙ্গের অটোনমি চাই'—সে বিষয়ে জনমতকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করলো। এর খসড়া তৈরী করেছিলেন শেখ মুজিব স্বয়ং। এই পুস্তিকায় বলা হয়েছিল ঃ

কেন পূর্ব বঙ্গের অটোনমি চাই

"পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মৌলিক প্যাটার্নের পটভূমিতে ভূগোলের দিক দিয়ে পূর্ব বঙ্গের অটোনমির দাবীকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। পাকিস্তান একটি অখন্ড ভৌগোলিক অঞ্চল নয়। এই রাষ্ট্রের দু'টি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল বিমানপথে এক হাজার মাইল এবং জলপথে তিন হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। ক্যানাডা ও ব্রিটেনের মধ্যে যে ব্যবধান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবধান তার চেয়েও বেশী।

বাস্তব ক্ষেত্রে করাচী সরকারের কাছে পূর্ব বঙ্গের কণ্ঠস্বর পৌঁছে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অঞ্চলের বক্তব্যেরও কোন গুরুত্ব নেই। এক হাজার মাইল দূরে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সিদ্ধান্তে পূর্ব বঙ্গের ক্ষেত্রে তাই অবিচার হতে বাধ্য। পূর্ব বঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং তার ফলে দুই ভূখণ্ডের জনসাধারণের পক্ষে পরস্পরকে জানা এবং পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।

অর্থনীতির দিক দিয়েও পূর্ব বঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবী অতি যুক্তিসঙ্গত। কারণ পরস্পরের মধ্যে পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের অর্থনীতির

ভিত্তি সম্পূর্ণ পৃথক, যোগাযোগের অভাব। উৎপাদনের ব্যবহার ভিন্ন-প্রকৃতির এবং মূল্যমানের বিরাট পার্থক্যের ফলে এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের পারম্পর্য রক্ষা করাও সম্ভব নয়।

পাকিস্তানের ফেডারেল রাজধানী ও পূর্ব বঙ্গের মধ্যে চৌদ্দশ' মাইলের ভারতীয় ভূখণ্ড অবস্থিত। স্থলপথে এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। বিমান বা স্থলপথে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য। খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক নিত্যব্যবহার্য জিনিস-পত্রের দাম পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব বঙ্গের তুলনায় অনেক কম। প্রায় সমস্ত জিনিসই প্রথমে করাচীতে আমদানী করা হয় এবং তারপরে আবার রফতানী করা হয় পূর্ব বঙ্গে। তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের রফতানী-কারীরা যে শুধু অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে তাই নয়, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাল রফতানী করার জন্যও অতিরিক্ত দাম ধার্য করে। সে জন্য বৈদেশিক জিনিসপত্র যে পূর্ব বঙ্গের চাহিদার তুলনায় অনেক কম পাওয়া যায় তাই নয়, পূর্ব বঙ্গের বাজারে অত্যন্ত চড়া দামেও বিক্রি হয়।

রাজনীতির দিক দিয়েও পূর্ব বঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবী অনস্বীকার্য। বর্তমান যুগে সবদেশেই সরকারী কাজকর্ম জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখে পরিচালিত করা হয়। তিন হাজার মাইল দূর থেকে পূর্ব বঙ্গের জনসাধারণের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সামান্য যোগাযোগ রাখাও সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে অধিকতর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ ক'রে তাই রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরে এই রাষ্ট্রের সমস্ত কাজকর্ম ইউনিটারী বা ঐকিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কতখানি ঐক্য স্থাপন করা হয়েছে? জোর জুলুম ক'রে অথবা পিস্তল দেখিয়ে কোন দেশে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব নয়।

পূর্ব বঙ্গের ইতিহাস এক শোষণের ইতিহাস। এই অঞ্চলের জন-সাধারণের আয় থেকে এবং বৈদেশিক সাহায্য থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কাজে। এই অর্থ থেকে পূর্ব বঙ্গের ভাগ্যে সামান্য অংশও জোটে নি। পাকিস্তান গঠনের পরে রাষ্ট্রের সমস্ত সামরিক সংগঠন স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমাঞ্চলে।

মিলিটারী কলেজ, প্রি-ক্যাডেট স্কুল এবং অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীর সবই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে ও করাচীতে। এরূপ কাজে অথবা এরূপ সংগঠন তৈরীর ব্যাপারে পূর্ব বঙ্গ কোনো অংশই পায় নি। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার ৬০-৭০ কোটি টাকা পূর্ব বঙ্গ থেকে সংগ্রহ করে কিন্তু তার প্রায় সবই ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এরূপ এবং অন্যান্য শোষণের ফলে পূর্ব বঙ্গের সর্ব শ্রেণীর জনজীবন আজ এক শোচনীয় দারিদ্র্যের সম্মুখীন। পূর্ব ও পশ্চিম পাক ভূখণ্ড দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভূখণ্ড হওয়ায় এবং একটি অর্থনৈতিক সংগঠন বা অঞ্চল না হওয়ায় পূর্ব বঙ্গের পুঁজি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়ে এই পূর্ব ভূখণ্ডের অর্থনীতিকে আজ এক চরম দুর্বিপাকের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমদানীর ক্ষেত্রে এমন পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে যে, তার ফলে পূর্ব বঙ্গের জনজীবন গুরুতর-ভাবে বিপন্ন হচ্ছে। পূর্ব বাংলা বহুবার এই অভিযোগ করেছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইসেন্স এবং বৈদেশিক আমদানীর সুযোগ পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের এমন পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে যে, তার ফলে আমদানীর প্রায় অধিকাংশই যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে। এরূপ পক্ষ-পাতিত্বের জন্য পূর্ব বঙ্গের বাজারে জিনিসপত্র শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, অগ্নিমূল্যও বটে। বর্তমানে পূর্ব বঙ্গকে সমস্ত বৈদেশিক জিনিসপত্র আমদানী করতে হয় করাচী থেকে এবং তার ফলে প্রত্যেক জিনিসের জন্য পূর্ব বঙ্গকে পঞ্চাশ শতাংশ বেশী দিতে হয়। এইভাবেও পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বঙ্গের পুঁজি নিয়মিতভাবে শোষণ ক'রে নিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মে কি ভাবে পূর্ব বঙ্গকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কি ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কুক্ষিগত, কেন্দ্রীয় সরকারে নিযুক্ত কর্মচারীদের আঞ্চলিক বণ্টনের তথ্যে তা' অতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সিনিয়র গেজেটেড পোস্ট

ডিপার্টমেন্ট	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব বঙ্গ
কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট	৬৯২	৪২
শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	১৬২	৩

ডিপার্টমেন্ট	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব বঙ্গ
রেডিও	৯৮	১৪
সাপ্লাই ও ডেভেলপমেন্ট	১৬৪	১৫
রেলওয়ে	১৫৮	১৪
পোস্ট ও টেলিগ্রাফ	২৭৯	৫০
কৃষি অর্থনীতি কর্পোরেশন	৩৮	১০
সার্ভে	৬৪	২
বিমান বাহিনী	১,০২৫	৭৫

শিক্ষাক্ষেত্রে এবং মেডিকেল গঠনেও পূর্ব বঙ্গের অবস্থা একই রকম শোচনীয়। যথা ঃ

বিষয়	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব বঙ্গ
নতুন কলেজ	১	০
মেডিকেল কলেজ	৬	১
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৩	১
ইউনিভার্সিটি	৪	২
কলেজ	৭৬	৫৬
প্রাইমারী স্কুল	৬,২৪৬	২,২১৭
হাসপাতালে বেড সংখ্যা	১৭,৬১৪	৫,৫৮৯
ডাক্তার	৮,৫০০	৩,৩৯৩
মেটারনিটি হাসপাতাল	১১৮	২২

উক্ত পুস্তিকার উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই কি ভাবে শোষণ করেছে।

আসলে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ চেয়েছিল পূর্ব বাংলাকে শোষণ ক'রে নিজেদেরকে একটি উন্নত ধনিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত করতে। কিন্তু নবাবজাদাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল সৈনিক ও আমলাদের হাতে। তবে আশার কথা এই যে, আমলারাও তাঁদের স্বার্থেই সব সময় নিয়োজিত থেকেছেন। অর্থাৎ চাকা একইভাবে ঘুরতে লাগল—পূর্ব বাংলাকে শোষণ কর।

এই উদাহরণের স্বপক্ষে 'কেন অটোনমি চাই' পুস্তিকাই যথেষ্ট নয়।

পূর্ব বাংলাকে যে সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উপনিবেশে পরিণত করা হয়েছিল ইতিহাস তার যথেষ্ট প্রমাণ দেবে।

১৯৪৬ সালের ১৫ই অক্টোবরে জিন্নাহ্ সাহেব যখন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করেছিলেন তাতে রাজনৈতিক দাবার গুটি হিসেবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের নাম ছাড়া পূর্ব বাংলা থেকে আর কারো নাম ঘোষণা করা হয় নি। এতে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন লিয়াকত আলী খান, আই. আই. চুন্দ্রীগড়, সর্দার আবদুর রব নিশতার ও গজনফর আলী খান।

আঞ্চলিক বৈষম্য

অথচ পাকিস্তানের দাবীতে মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বাংলার মুসলমানেরা শতকরা ছিয়ানব্বইটি ভোট দিয়েছিলেন আর পাঞ্জাবের মুসলমানেরা দিয়েছিলেন শতকরা উনপঞ্চাশটি ভোট। ক্ষমতা অর্জনের সোপান তৈরীতে ব্যবহৃত হ'ল বাংলার শক্তি। অথচ ক্ষমতা গ্রহণ কালে বঞ্চিত হ'ল বাংলার যথার্থ অধিকার।

পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলাকে যে কিভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে, তা' আগেই কিছু কিছু বলা হয়েছে। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক আর রাজনৈতিক বাস্তবতার পটভূমিকায় এদেশের জন্য প্রয়োজন ছিল ফেডারেল কাঠামোর। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে একটা চরম একনায়কত্ববাদী আর সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীভূত সরকারই সর্বক্ষণের জন্য ছিল বিরাজমান। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠান, এমন কি, সামরিক বিভাগের সব সদর দফতরই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল পূর্ব বাংলা থেকে হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে। আবার ১৯৫৫ সালের পশ্চিমাঞ্চলের সবগুলো প্রদেশকেও একত্র ক'রে গড়া হয়েছিল একটি মাত্র রাজনৈতিক ইউনিট।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক ক্ষমতার পদ্ধতিই ছিল এই রকম যে, দেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু বাঙালীদের কিংবা ছোট ছোট অঞ্চলের যেমন পাঠান, সিন্ধী, বালুচীদের কারোরই কোন সক্রিয় প্রতিনিধিত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কোন কর্তৃপক্ষ কখনই যথাযোগ্য স্থান পায় নি। শুধুমাত্র পাঞ্জাবীরা আর অবিভক্ত ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে হিজরত করা উদ্বাস্তু অফিসাররাই

একচেটিয়াভাবে আঁকড়ে থেকেছে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এবং প্রশাসনিক শক্তিকে। ১৯৫৫ সালেই কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস আর প্রতিরক্ষা বাহিনীর উর্ধ্বতন পদে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য ; বলা চলে প্রায় চোখে না পড়ারই মত। তারপর থেকে এই অবস্থার আর কখনো হেরফের হয় নি। এমন কি পূর্ব বাংলার উর্ধ্বতন প্রশাসনিক পদেও নিয়োগ করা হ'ল অবাঙালী অফিসারদের। তাঁদের মনোভাব ছিল একেবারেই উপনিবেশবাদী। বাঙালীদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন কিছুর প্রতিই তাঁদের ছিল একটা ঘৃণ্য আর বিদ্বেষের মনোভাব।

সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালেই পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে কি পরিমাণ বৈষম্য বিদ্যমান ছিল তার একটা নজীর পাওয়া যায় ১৯৫৬ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত করাচীর 'ডন' কাগজের পৃষ্ঠায়। এতে যে তুলনামূলক চিত্রটি দেওয়া হয় তা' নিম্নরূপ ঃ

সামরিক ক্ষেত্রে

	পূর্ব বঙ্গ	পশ্চিম পাকিস্তান
জেনারেল	×	৩ (?)
মেজর জেনারেল	×	২০
ব্রিগেডিয়ার	×	৩৪
কর্নেল	১	৪৯
লেফটেন্যান্ট কর্নেল	২	১৯৮
মেজর	১০	৫৯০
নৌবাহিনী অফিসার	৭	৫৯৩
বিমান বাহিনী অফিসার	৪০	৬৪০

বেসামরিক ক্ষেত্রে ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে চাকুরীর বৈষম্য

কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট	বাঙালী	পশ্চিম পাকিস্তানী
সেক্রেটারী	×	৪২
জয়েন্ট সেক্রেটারী	৮	২২
ডেপুটি সেক্রেটারী	২৩	৫৯
সেকশন অফিসার	[illegible]	৩২৫
প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার	৮১৩	[illegible]

শুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বঞ্চনাই নয়—এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রেও চরম প্রবঞ্চনা করেছে তারা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর-পরই এদেশের অর্থ ও অর্থনৈতিক সম্পদ কি ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হয়েছে পর্যালোচনা করলেই তা' স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ত্রিশ কোটি টাকা ক'রে মোট ১৮০ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গেছে। ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সাল—এ দু'বছরে প্রাদেশিক সরকারের উন্নয়ন খাতে সরকার-প্রদত্ত ঋণের ২৪ কোটি টাকার মধ্যে একা পাঞ্জাব পেলো ১০ কোটি টাকা আর পূর্ব বঙ্গ পেলো মাত্র ৮ কোটি টাকা। ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্যে ৩৫ কোটি ১৬ লাখ টাকা এবং ১৯৫০-৫১ সালে ৪৬ কোটি ৫৮ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু এই টাকার ৯০ ভাগ খরচ হ'ল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য।

১৯৫১ সালে পাকিস্তানে যে ৫২ হাজার টন লোহা আমদানী করা হয় তার সবটাই ব্যয় হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশের শিক্ষাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৭০ লক্ষ টাকা সাহায্য দেয়া হয় ১৯৫০ সালে; কিন্তু ঐ বছরেই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দেয়া হয় ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ১৯৫০ সালে করাচী, লাহোর এবং পেশোয়ার এই তিনটি বেতার কেন্দ্রের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল ৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। পক্ষান্তরে ঢাকা বেতারের জন্য মাত্র ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ব্যয় করা হ'ল। ঐ বছরে দেশরক্ষা খাতে মোট ব্যয় ৮০ কোটি টাকা তার মধ্যে ৭৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছিল, তার সবটাই খরচ হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে।

ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর হামলার কথা আগেই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কিভাবে বাঙালীদের তাজা লাল খুনে বাংলা ভাষার দাবীতে বাংলার মাটিকে রঞ্জিত করা হয়েছে। ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি হামলার পেছনেও শাসকগোষ্ঠীর শোষণমূলক মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিল। যেমন, তাঁরা

জানতেন কোন জাতিকে শোষণ করতে হ'লে সে জাতির তিনটি বিষয়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে হয়। তা' হ'ল 'রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক'। এর একটির ব্যতিরেকে অপরটিতে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের সাথে সাথে বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিকেও পদদলিত করতে চাইলেন তাঁরা। সেই কারণেই একটি অত্যন্ত সংখ্যালঘু মানুষের ভাষাকে সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের ওপর চাপিয়ে দেবার হীন ষড়যন্ত্র অব্যাহত ভাবে চলেছে দীর্ঘদিন। এখানে বলা আবশ্যক যে, পাকিস্তানের শতকরা ৫৪.৬ ভাগ জনগণ বাংলা ভাষায় কথা বলে। পক্ষান্তরে উর্দু ভাযাভাষীদের সংখ্যা শতকরা ৭.২ ভাগ। আরো বিস্ময়ের বিষয় এই যে, উর্দুর চেয়ে পাঞ্জাবী এবং পশতু ভাষাভাষীদের সংখ্যাই বরং অধিক—যথাক্রমে ২৮.৪ ভাগ এবং ৭.১ ভাগ।

শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনাই নয়, 'পাকিস্তান' নামের মধ্যেই পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। কেম্ব্রিজের পাঞ্জাবী ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী এই 'পাকিস্তান' শব্দটির উদ্ভাবক। এই শব্দটি কয়েকটি প্রদেশের আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত। যেমন P-Punjab, A-Afganistan, K-Kashmir, S-Sind, Tan-Beluchistan. এখানে স্পষ্ট যে, পাকিস্তান শব্দটির মধ্যে পূর্ব বাংলা প্রদেশের কোন অস্তিত্ব নেই।

যাহোক, এতক্ষণ যে শাসন ব্যবস্থায় বৈষম্যের কথা বলা হ'ল সেই শাসন ও শোষণের প্রক্রিয়া চালাতে গিয়ে তাঁরা বারবার ক্ষমতার হাতবদল করেছেন কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাঁরা উদার থেকেছেন। সে হ'ল পাঞ্জাবের স্বার্থের প্রশ্ন। এই প্রশ্নে তাঁরা সর্বদা সচেতন থেকেছেন। পশ্চিমাগোষ্ঠীর তাঁবেদার বগুড়ার মোহাম্মদ আলীরাও এই উদারতাকে উপেক্ষা করতে পারেন নি।

আগেই বলা হয়েছে যে, নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে ওয়াশিংটন থেকে ধরে এনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসিয়েছিলেন। মোহাম্মদ আলী সে সময় প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খানকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন ওয়াশিংটনে। ইস্কান্দার মীর্জা গিয়েছিলেন লণ্ডনে। করাচীতে তখন চলছিল বড় রকমের ষড়যন্ত্র।

কেন্দ্রে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র

এই ষড়যন্ত্রের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় Eclips of East Pakistan নামক নিবন্ধে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

Mr. Ghulam Mohammed sent spies to watch what was happening at Karachi, when he was convalescing at Abbottabad. Many of the spies were holding key posts in the administration. From them, he obtained a clear picture of the conspiracy against him, hatched and executed by the Constituent Assembly as a whole and by Prime Minister Mohammed Ali. He was furious over the ammendment of the Govt. of India Act. He came down to Karachi immediately but Mr. Mohammed Ali had already left for the United States.

While enjoying American hospitality during his stay in the United States Mr. Mohammed Ali got a jolt. He got summons from the Governor General of his country to return at once. Mr. Ali cancelled his scheduled visit to Ottowa within few hours of his receiving the summons. Mr. Ali was flying over the Atlantic on his way back to Karachi. At London Air Port Mr. Ali and General Ayub Khan were joined by General Iskander Mirza and Mr. M. A. H. Ispahani, Pakistani High Commissioner in the U. K. They all flew to Karachi together. The Mouripur Air Port was heavily guarded by troops when they landed there at midnight on 23 October.

Emissaries of the Governor General surrounded Mr. Mohammed Ali as soon as he came down the runway of the aircraft. Mr. Ali asked his Begum Saheba who also accompanied him to go home. Like a prisoner Mr. Ali was escorted to the car and driven to the residence of the Governor General.

What pained between Mr. Ghulam Mohammed and Mr. Mohammed Ali came to be known to the public through whisp from men who were eye witness to their meeting. Pressmen had been to the Governor General's residence. They saw how Mr. Mohammed Ali went in and how he came out at 2 in the morning. They saw him weeping when he came out. Mr.

Ghulam Mohammed gave him an ultimatum : "Do as I order or go to prison."

Reports appeared in foreign press of Mr. Mohammed Ali's surrender to Mr. Ghulam Mohammed in prefernce to detention in jail as a prisoner within a few hours of his surrender, early on the morning of 24 October." [Eclips of East pakistan : জ্যোতি সেনগুপ্ত : উদ্ধৃত, কৃত্তিবাস ওঝা : আমি মুজিব বলছি, পৃঃ ২৫৯-২৬১]

১৯৫৪ সালের ২৪শে অক্টোবর আকস্মিকভাবে গোলাম মোহাম্মদ জনাব মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন। সেদিন সকাল বেলায় এক জরুরী প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রচার করা হ'ল : "বর্তমান মন্ত্রিসভা ও আইনসভাকে ভেঙে দেওয়া হ'ল। দেশের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাই হ'ল সকলের বড় কথা। জাতীয় স্বার্থের কাছে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রাদেশিক স্বার্থকে বলী দেয়া যায় না। আর তা' যেতে দেয়া হবে না। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের কথা মনে ক'রে গভর্নর জেনারেল অতি দুঃখের সংগে এই সিদ্ধান্ত নেন।"

মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভা বাতিল

ঐ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হ'ল, "বর্তমান আইনসভা জনগণের বিশ্বাস হারিয়েছে। তাঁদের পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব রয়েছে জনসাধারণের হাতে। জনগণ তাঁদের নবনির্বাচিত সদস্যদের দিয়ে নতুন আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠন ক'রে দেশের বহুবিধ সমস্যা সমাধান করতে যত্নশীল হবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যে পর্যন্ত না নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সে পর্যন্ত পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভা দেশের শাসন কাজ চালিয়ে যাবেন। দেশকে স্থায়ী ও শক্তিশালী শাসন উপহার দেবার জন্যে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর মন্ত্রিসভার সংস্কারের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীও সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।" ঐ দিনই বিকেল বেলায় মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে রেখে মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন করা হ'ল। এই পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভার নাম দেয়া হ'ল : "Ministry of talents" বা 'গুণময় মন্ত্রিসভা'। এই গুণময় মন্ত্রিসভায় বিশিষ্টদের মধ্যে স্থান পেলেন আইয়ুব খান, ইস্কান্দার মীর্জা, চৌধুরী রহমত আলী, ডাঃ খান সাহেব, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ। আইয়ুব খান, ইস্কান্দার

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গুণময় মন্ত্রিসভা : সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

মীর্জা ও চৌধুরী রহমত আলী পেলেন যথাক্রমে প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও অর্থ দফতর। শহীদ সাহেবকে দেয়া হ'ল আইন বিভাগের ভার।

শহীদ সাহেব যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য জুরিখে। সেখান থেকে গোলাম মোহাম্মদ তাঁকে ডেকে আনান। ১৯৫৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর তিনি করাচীতে ফিরে এলেন।

তাঁকে ডেকে আনা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রিত্ব দেয়ার জন্য—কিন্তু শেষে তাঁকে অন্য পদে বসানো হ'ল। তবে প্রতিশ্রুতি দেয়া হ'ল, কিছুদিন পরে তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী করা হবে।

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের এই মন্ত্রিত্ব গ্রহণকে আওয়ামী লীগ অনুমোদন দিতে পারেন নি। পার্টির নেতার কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি নেয়ার জন্য শহীদ সাহেব লণ্ডনে অবস্থানকারী ভাসানী সাহেবের সংগে দেখা করেছিলেন। এর আগে ঐ একই ব্যাপারে আতাউর রহমান খানও গিয়ে ব্যর্থ হয়ে এসেছিলেন। শহীদ সাহেবকে ভাসানী অনুমতি না দিয়ে বলেছিলেন যে, যেহেতু মোহাম্মদ আলী একদা অবিভক্ত বাংলায় নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পি. এ. ছিলেন এবং উক্ত মন্ত্রিসভায় সোহরাওয়ার্দী একজন মন্ত্রী ছিলেন—সেহেতু মোহাম্মদ আলীর অধীনে মন্ত্রিসভায় যোগদান করা সোহরাওয়ার্দীর উচিৎ নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দিক চিন্তা ক'রে তিনি 'গুণময় মন্ত্রিসভা'য় যোগ দিলেন।

শহীদ সাহেবের এই সিদ্ধান্তে শেখ মুজিব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু নেতার প্রতি তাঁর ছিল অসীম বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা, তাই প্রকাশ্যে তাঁর কোন সমালোচনা তিনি করলেন না।

দেশের শাসনতন্ত্র রচনার ভার আইনমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীকে দেয়া হ'লেও তিনি তা' সম্পন্ন করতে গিয়ে পদে পদে নানা বাধার সম্মুখীন হলেন। একবার মোহাম্মদ আলীকে সরিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীও হবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জাতীয় পরিষদে অমুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি তাতে সফলকাম হতে পারেন নি। এর পরিণতিতে, মাত্র ৯ মাস মন্ত্রিত্ব করার পর ১৯৫৫ সালের আগস্টে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

গুণময় মন্ত্রী পরিষদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী বিরোধী দলের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন।

১৯৫৬ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারীতে পাকিস্তান আইনসভার অধিবেশন বসল। উদ্দেশ্য, এই অধিবেশনে উক্ত সালেরই জানুয়ারীতে রচিত খসড়া শাসনতন্ত্রটি পাশ করা।

১৯৫৬ সালের এই শাসনতন্ত্রের কতকগুলো মারাত্মক ধরনের ধারা ছিল। যেমন—(১) পাকিস্তান হবে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান' নামে পরিচিত। (২) রাষ্ট্রপ্রধানের পদে কোন হিন্দু স্থান পাবে না। (৩) পাকিস্তানের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হবে কেন্দ্রে।

জাতীয় পরিষদে বিরোধী দল এই নতুন শাসনতন্ত্রকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেন। তাঁরা বললেন, "রাষ্ট্রের সংগে ধর্মকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, পাক-নেতারা মধ্যযুগের অন্ধকারে এবং গোঁড়ামির রাজত্বে বাস করছেন। আর সেই কারণে তাঁরা অগণতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রপ্রধানের পদ কেবল মাত্র মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছেন। তার ওপর পাকিস্তানের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা হয়েছে কেন্দ্রে। এ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র। এর দ্বারা প্রকারান্তরে স্বৈরতন্ত্রেরই জন্ম দেয়া হচ্ছে।

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র

এই নয়া শাসনতন্ত্রের খসড়াকে কেন্দ্র ক'রে ঐদিনই অর্থাৎ ৭ই ফেব্রুয়ারী আইন-সভায় দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। এক সময় বিরোধী দলের সদস্যরা সভাকক্ষ ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেলে সেই সুযোগে শাসকগোষ্ঠী শাসনতন্ত্রের ৫০টি ধারা পাশ করিয়ে নেন।

সেদিনের মত আইন-সভার অধিবেশন শেষ হলে দীর্ঘ বিরতির পর ২৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৬) পুনরায় অধিবেশন বসলে সেদিনও বিরোধী দলকে বাদ দিয়েই সমস্ত খসড়া শাসনতন্ত্রটি গৃহীত হয়।

শুধু তাই নয়, পূর্ব বাংলার বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাকিস্তানের গৃহীত প্রথম সংবিধানে পূর্ব বঙ্গের অটোনমির দাবী প্রত্যাখ্যাত হ'ল। এমন কি পূর্ব বাংলা নামটি পর্যন্ত মুছে দিয়ে তা' 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে রূপান্তরিত করা হ'ল।

'পূর্ব বাংলা' নামের এই বিলুপ্তির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিষদে ১৯৫৫ সালের আগস্টে শেখ মুজিব তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে জোরালো ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ

"Sir, you will see that they want to place the words 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should make it Bengal (Pakistan). The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it, then we will have to go back to Bengal and ask them whether they accept it.

So for as the question of One Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want to take it up just now, what about the state language, Bengali ? What about joint electorate ? What about autonomy ? The peoples of East Bengal will be prepared to consider One Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of a referendum or in the form of a plebiscite. Let the people of the frontier say that they want One Unit. At the moment, they say that they are against it. But Dr. Khan Shahib said the other day that people were in favour of One Unit but his brother Khan Abdul Gaffer Khan and Pir Shahib of Manki Sharif said that they were against it. Now who will judge it? Who should be the judge? If the people of the Frontier say that they are in favour of One Unit we have no objection to that. Similarly in Sind, Mr. Khuro says that they are in favour of it, while Mr. G. M. Syed and others say that people are against One Unit. All right, if they are in favour let a referendum be held and let the people decide themselves and we will accept it."

[*Political Ideas of Sheik Mujib 1955-71*, Pakistan Desk, Deptt. of Political Science, Gandhian Institute of Studies, Rajghat, Varnasi, India, Special Number, Vol. No. 2]

পরিষদে একদিন মোহাম্মদ আলী পূর্ব বাংলার প্রশ্নে শেখ মুজিবকে কটাক্ষ করেছিলেন। মুজিব তার জবাবে বলেছিলেন ঃ "পূর্ব বাংলার জন্য কথা বলবার অধিকার আপনার আছে না আমার আছে তার প্রমাণ দিতে হলে পূর্ব বাংলায় এসে আমার সাথে আপনার জনপ্রিয়তা যাচাই করুন। পূর্ব বাংলার যে কোন অঞ্চল থেকে, এমন কি আপনার বগুড়া থেকে আমার সাথে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। যদি আপনাকে না হারাতে পারি, আমি জীবনে আর কোন দিন রাজনীতি করবো না। আশা করি প্রধানমন্ত্রী আমার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন।" মোহাম্মদ আলী এই অমিত সাহসী বক্তব্যের জবাব দিতে পারেন নি। গণ-সমর্থন শূণ্য এই ভুঁইফোড় নেতার সে সাহসও ছিল না, তিনি ছিলেন কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের খেলার পুতুল।

কেউ কেউ মনে করেন, 'পূর্ব বঙ্গ' নামের পরিবর্তনের পেছনে শেরে বাংলা ফজলুল হকেরও সক্রিয়তা ছিল। অবশ্য এ ধারণার পিছনে কোন প্রমাণ নেই। আর আজীবন যিনি বাংলার হয়ে কাজ করেছেন তিনি এমন সিদ্ধান্তে সক্রিয় অংশ নেবেন একথা ভাবা যায় না।

'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান'-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন মেজর-জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা। মীর্জা সাহেব এর আগে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের পদে বহাল ছিলেন। গোলাম মোহাম্মদ গুরুতর অসুস্থতার দরুন চিকিৎসার্থ ইউরোপে গেলে তাঁর অবর্তমানে মীর্জা সাহেব অস্থায়ী গভর্নর জেনারেলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর গোলাম মোহাম্মদ আর তাঁর পদ ফিরে পেলেন না। এমনকি তাঁকে চিরদিনের জন্যই রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে হ'ল।

১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ থেকে নব প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রটি চালু হ'ল। ঐদিন সারাদেশে 'পাকিস্তান দিবস' হিসেবে মহাসাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হ'ল।

ইতিমধ্যে শেরে বাংলা পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চে 'পাকিস্তান দিবসে' নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে তিনি আবার আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রী পরিষদকে শপথ গ্রহণ করালেন এবং নিজে শপথ পরিচালনা করলেন। পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করায় সংখ্যালঘু

শেরে বাংলা পূর্ব বাংলার গভর্নর

সম্প্রদায় যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসেন। ফলে আবু হোসেন সরকারের যুক্তফ্রন্ট গঠনের আর কোন যৌক্তিকতাই থাকলো না। আওয়ামী লীগ আইন-সভার অধিবেশন আহ্বান ক'রে ক্ষমতাসীন দলের সংখ্যাধিক্য প্রমাণের জন্য বার বার চাপ দিতে থাকলেও সরকার তা' প্রতি বারই এড়িয়ে যেতে লাগলেন।

ইতিপূর্বে শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' কথাটি বাদ দিয়ে শুধু 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ করেন। ১৯৫৫ সালে অক্টোবর মাসে এ বিষয়ে তিনি একটি প্রস্তাব আনলে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তা' গৃহীত হয়। কিছু সংখ্যক সদস্য এর প্রতিবাদ করলেও 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' শ্লোগানে তাঁদের সে ক্ষীণ প্রতিবাদ চাপা পড়ে গিয়েছিল।

ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রিত্বে নিয়োগ করলেন। এখানে বলে রাখা উচিৎ যে, গোলাম মোহাম্মদ-এর আমলেই তাঁর কৃপায় চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদে আসীন হয়েছিলেন।

পরে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি পূর্ব বাংলায় এলেন, অথচ আগে তিনি একবারও এ পথে পা বাড়ান নি। আসলে সাহসই পান নি, কেননা শেখ মুজিব ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থাকা-কালীন পূর্ব বাংলাকে যে কিভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল, তার নজীর তুলে ধরে শেখ মুজিব ১৯৫৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ঢাকার বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেছিলেনঃ "এই সেই ব্যক্তি, যে নাকি পূর্ব বাংলাকে বিকল করে তাকে চিরকালের দাস ক'রে রাখতে চায়। এই সেই শক্তি, যে নাকি পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী থাকাকালে পূর্ব বাংলার জন্যে অর্থ বরাদ্দ করতে গিয়ে চরম অবিচার করেছিল। সুতরাং অর্থনীতির দিক দিয়ে পূর্ব বাংলাকে ধ্বংস করার মূল পাণ্ডা হিসেবে আমরা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে চিরকাল স্মরণ করবো।"

চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর প্রধান-মন্ত্রিত্ব

কিন্তু নয়া শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি আর না এসে পারলেন না। এলেন। বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করতে গেলেন; ঠাঁই পেলেন না কোথাও।

কুমিল্লায় এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন তিনি। উর্দুতে বক্তৃতা দিতে উঠলে জনতার মধ্য থেকে 'বাংলায় বলুন', 'বাংলায় বলুন' চিৎকার ধ্বনি উঠলো। পরিস্থিতি অনুকূল নয় দেখে ভয় পেয়ে চৌধুরী সাহেব ঐ যে পালিয়ে গেলেন আর বাংলাদেশমুখো হন নি। প্রদেশে তখন আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিত্ব চলছে। কিন্তু সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার দরুন প্রদেশে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। আবু হোসেনের মন্ত্রিসভা এই খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হন। বুভুক্ষু জনতা 'এ জালিম সরকার জাহান্নামে যাক', 'গরীব মারা এ শাসন বরবাদ হোক'—ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে সরকারের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সরকার সেনাবাহিনীর দ্বারস্থ হলেন।

পূর্ব বাংলায় খাদ্য ঘাটতি ও শেখ মুজিব

খবরটা জানতে পেরেই আওয়ামী লীগ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো হ'ল। ১৯৫৬ সালের ১লা জুলাইয়ে এক সভায় মিলিত হয়ে প্রশাসন ব্যবস্থায় সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতির বিরোধিতা ক'রে শেখ মুজিব কর্তৃক উত্থাপিত এক প্রস্তাব পাশ করা হ'ল। প্রস্তাবে বলা হ'লঃ "মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার ও তাঁর মন্ত্রিসভা, গভর্নর ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির কোন তোয়াক্কা না করে, সামরিক বাহিনীর হাতে খাদ্য ও পরিবহন দফতরের ভার তুলে দিয়েছেন, এমনকি তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও। অতএব, আমরা দাবী জানাচ্ছি, এই অযোগ্য মন্ত্রিসভা অবিলম্বে পদত্যাগ করুক। জনসাধারণ ও আইন-সভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনপুষ্ট কোন নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করা হোক।"

কিন্তু এতদসত্ত্বেও গভর্নর ফজলুল হক সাহেব আবু হোসেন সরকারকে বরখাস্ত তো করলেনই না, বরং ১১ই জুলাই (১৯৫৬) খাদ্য দফতরের সম্পূর্ণ ভার সেনাবাহিনীর হাতেই দেয়া হ'ল।

আওয়ামী লীগ খাদ্যের দাবীতে গণ-আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। গ্রামের ক্ষুধার্ত নিরন্নক্লিষ্ট মানুষ খাদ্যের দাবীতে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য দলে দলে শহরে এসে জমায়েত হয়। শেখ মুজিব এদেরকে নিয়ে বের করলেন এক বিরাট মিছিল। সেদিন ছিল ৪ঠা আগস্ট, ১৯৫৬ সাল। ঢাকার আশেপাশের গ্রাম থেকে নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ সবাই ছুটে ঢাকা শহরে এসেছে। সরকার তাদেরকে শহরের বুকে আসতে অনেক বাধা দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষুধার্ত নিপীড়িত জনগণ শেখ মুজিবের আহ্বানে বাঁধভাঙা বন্যার জলের মত সব বাধাকে তুচ্ছ ক'রে ভুখা মিছিলে সামিল হয়েছে। এরপর সরকার ১৪৪ ধারা জারী ক'রে ৫ জনের বেশী মানুষের একত্রে সমাবেশ নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। তা' সত্ত্বেও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মিছিলকারীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে খাদ্যের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে এগিয়ে চলে। চকবাজারে পুলিশ তাদেরকে বাধা দিল। কিন্তু বন্যার স্রোত কি বাধা মানে? অশান্ত জনতার ওপর পুলিশ ক্রুদ্ধ হয়ে লাঠি চার্জ করলো ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলো। তাতেও জনতার গতিরোধ করা সম্ভব হ'ল না—এবারে পুলিশ কয়েক রাউণ্ড গুলী ছুঁড়তে বাধ্য হ'ল। তিনজন বুভুক্ষু গ্রামবাসীর দেহ পড়লো লুটিয়ে। প্রাণ হারালো তারা।

ভুখা মিছিল

শেখ মুজিব এগিয়ে এসে একজনের মৃতদেহ কোলে তুলে নিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করতে থাকেন। শহীদের রক্তে তাঁর জামাকাপড় ভিজে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল।

সেদিন নেতার দু'চোখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা লাল জিহ্বা বের ক'রে গ্রাস করার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি নিজেকে সংযত রেখে বদ্ধমুষ্টি উত্তোলন ক'রে বজ্রকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন ঃ "যে সরকার নিরন্ন দেশবাসীর ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন করে, তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। সে আর বেশীদিন রাজত্ব করতে পারবে না।"

এই নির্যাতন ও হত্যার প্রতিবাদে সারা প্রদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। শেখ মুজিব দাবী জানালেন ঃ "অবিলম্বে আইন-সভার অধিবেশন ডেকে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হোক।"

সরকার বাধ্য হয়ে আইন-সভার অধিবেশন ডাকলেন। এতোদিন পর্যন্ত বিষয়টি বারবার এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু বাজেট পাশ না করিয়ে নিলে আর সরকার চালানো সম্ভব নয়।

ফজলুল হক সাহেব প্রাদেশিক গভর্নর, আইনতঃ তিনি কোন রাজনৈতিক দলের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেন না। কিন্তু তাঁর নিজের পার্টি K. S. P. অর্থাৎ প্রদেশের যুক্তফ্রন্টের সরকারের স্বার্থকে না দেখে থাকেন কি করে। আর সে জন্যই যখন তিনি দেখলেন যে অধিবেশন আইনসঙ্গতভাবে চললে তাঁর দলের সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠতার দরুন বাতিল হয়ে যেতে পারে, তখন তিনি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আইন-সভার স্পীকারকে ডেকে নির্দেশ দিলেনঃ "আপনি আইনসম্মত ছোটখাটো এক বৈঠকের আয়োজন করুন। সে বৈঠকে কোন ভোটাভুটি চলবে না। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কোন বক্তৃতাও করা চলবে না। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কোনরূপ অনাস্থা প্রস্তাব আনা যাবে না। শুধু মাত্র বাজেট পাশ করিয়ে নেয়া হবে।"

আইন-সভার অধিবেশন

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে ২২শে মে আইন-সভার অধিবেশন বসলে গভর্নরের নির্দেশ মোতাবেক স্পীকার জনাব আবদুল হাকিম কোন বিরোধী দলের সদস্যকে মুখ খুলতে দেন নি। সেদিন অধিবেশন মুলতবী রাখার পর ১৩ই আগস্ট ('৫৬) আবার সে অধিবেশন ডাকা হ'ল।

সদস্যরা হলের ভিতরে গিয়ে দেখলেন যে ট্রেজারী বেঞ্চ বা মন্ত্রীদের আসনগুলো শূন্য। অধিবেশনের শুরুতেই স্পীকার সাহেব গভর্নরের একটি নয়া আদেশ পড়ে শোনালেন। "পুনরায় আদেশ না দেয়া পর্যন্ত আইন-সভার অধিবেশন বন্ধ রাখা হ'ল।" স্পীকারের বক্তব্য শেষ হতে না হতেই শেখ মুজিব উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেনঃ "আমরা বিরোধী দলের সদস্যরা এই অপদার্থ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনছি।"

বিরোধী দলের সকল সদস্যই একযোগে হাত তুলে তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলেন—মন্ত্রীদের অনুপস্থিতিতেই মোট ২৯৭ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ২০০ জন সদস্যের সমর্থনে উক্ত প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়।

কংগ্রেসী সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন ধর (বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের আইনমন্ত্রী) মন্ত্রীদের শূন্য আসনগুলো দেখে ব্যথিত হয়ে অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেনঃ "এই সকল আসনের মালিকেরা আজ অধিবেশনে অনুপস্থিত থেকে আপনার ও মাননীয় সদস্যদের অপমান করেছেন।"

শ্রী মনোরঞ্জন ধর গভর্নরের কাজের সমালোচনা ক'রে বললেন, "গভর্নরের এই আদেশ শুধু গণতন্ত্রকে প্রতারিতই করে নি, পাকিস্তানের গণতন্ত্রকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।" শ্রী ধরের এই কথা শুনে জনৈক সরকারী গুণ্ডা সদস্য বদ্ধমুষ্টি উত্তোলন ক'রে তাঁকে আক্রমণ করলেন। ফলে অধিবেশন কক্ষেই হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল।

স্পীকার অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। পরে বিরোধী দলের সদস্যরা অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার কাছে একটি প্রস্তাব পাঠালেন। তাতে বলা হ'লঃ "পূর্ব বাংলার ২৯৭ জনবিশিষ্ট আইন-সভার আমরা ২০০ জন সদস্য ঘোষণা করি যে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার উপর আমাদের কোন আস্থা নেই। এই মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করা হোক।" অন্য একটি প্রস্তাবে গভর্নরকে বরখাস্তের দাবী জানিয়ে প্রেসিডেন্টের নিকট তার পাঠানো হ'ল। তাতে বলা হ'লঃ "আমরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে দাবী জানাচ্ছি যে, তিনি যেন অবিলম্বে পক্ষপাত-দুষ্ট পূর্ব বাংলার গভর্নর ফজলুল হককে বরখাস্ত করেন। তিনি এখনও একটি রাজনৈতিক দলের নেতা এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি শাসনতন্ত্র অমান্য ক'রে আইন-সভার অধিবেশন স্থগিত রাখার যে আদেশ দিয়েছেন তা' সম্পূর্ণ বে-আইনী। তিনি তাঁর নিজের দলকে ক্ষমতায় রাখতে গিয়ে অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে কর্তব্যের অবহেলা করেছেন।"

আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন

এ সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় ছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালের ১৭ই আগস্ট এ বিষয়ে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। তাতে তিনি বলেনঃ "আবু হোসেন মন্ত্রিসভার সুনিশ্চিত পতন রোধ করার জন্য এবং আওয়ামী লীগ যাতে ক্ষমতায় না বসতে পারে সে

উদ্দেশ্যেই গভর্নর প্রাদেশিক আইন-সভা বসবার কয়েক ঘন্টা আগে অধিবেশন স্থগিত রাখার আদেশ জারী করেছিলেন।"

তিনি বিবৃতিতে আরো বললেনঃ "আজকের দিনে কি কেন্দ্রে, কি প্রদেশে কোন আইন-সভা ভেঙে দেবার অর্থ হ'ল—শাসনতন্ত্রের মূল নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা। নিজেদের ক্ষমতার আসনে চড়িয়ে রাখবার জন্যে এটা হ'ল ডিক্‌টেটর, স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষের কাজ। পাকিস্তানের জন্যে এদেশের মানুষ যত ত্যাগই স্বীকার করুক না কেন, এ দেশের মানুষ যত দুর্বল, যত সহজই হোক না কেন, গণতন্ত্র ও শাসনতন্ত্রের এ অবমাননা চিরকাল তারা সহ্য করবে না। ইতিহাসে এর বহু নজীর রয়েছে। শাসকবর্গ যদি অনিয়মতান্ত্রিক কাজ করে, তা' হ'লে জনতাও অনিয়মতান্ত্রিক পথে চলতে বাধ্য হয় এবং সে পথেই তারা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে চেষ্টা করে। শাসকবর্গ যদি স্বেচ্ছাতন্ত্রকে প্রশ্রয় দেন, তা' হ'লে জনসাধারণও প্রশ্রয় দেবে আইন অমান্যের মত স্বেচ্ছামূলক বেপরোয়া কাজকে। এই রকম অবস্থা যদি চলে তা' হ'লে পাকিস্তানের অস্তিত্বই শেষকালে বিপন্ন হয়ে পড়বে। অতএব, পাকিস্তানকে বাঁচাতে হলে এই দুই সর্বনাশা পথকে পরিহার ক'রে চলতে হবে।" শহীদ সাহেবের বিবৃতি শুনে প্রেসিডেন্ট মীর্জার টনক নড়লো। তিনি গভর্নর ফজলুল হক গংসহ আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে করাচীতে ডেকে পাঠালেন। প্রেসিডেন্ট যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভাকে আদেশ দিলেন ১৯৫৬ সালের ৩০শে আগস্ট তারিখে আইন-সভার অধিবেশন ডেকে মন্ত্রিসভাকে বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাবের মোকাবিলা করতে। গভর্নর ফজলুল হক অবশ্য বিষয়টি ধামাচাপা দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফলকাম হতে পারেন নি।

আবু হোসেন সরকারের পদত্যাগঃ আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা গঠন

ব্যাপার সুবিধাজনক নয় দেখে যুক্তফ্রন্টের অনেক সদস্য আওয়ামী লীগে যোগ দিতে লাগলেন। ফলে বাধ্য হয়ে আবু হোসেন সরকার ১৯৫৫ সালের ৩০শে অক্‌টোবরে গভর্নরের কাছে তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। ফজলুল হক পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর ('৫৬) 'আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক নেতা জনাব আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি দিলেন।

আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব শুনে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তাঁদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগলেন। নানান কুৎসা রটিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা চালালেন। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অন্যতম নেতা পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর পত্রিকা 'পাকিস্তান অবজারভার' এ কুৎসা প্রচারের বাহন হ'ল। তাতে অভিযোগ করা হ'ল ঃ "পাকিস্তান থেকে ভারতে অর্থ ও অস্থাবর সম্পত্তি যথেচ্ছ ও অব্যাহতভাবে পাচার করার অধিকারের ভিত্তিতেই পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছেন।"

এখানে উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগকে সমর্থন ক'রে যাচ্ছিলেন প্রাদেশিক আইন-সভার কংগ্রেসের ২৯ জন, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্লামেন্টারী পার্টি'র ৭ জন, রসরাজ মণ্ডল ও গৌরচন্দ্র বালার তফসিলী ফেডারেশনের ১২ জন সদস্য। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই সমর্থনের দরুনই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ঐরূপ উদ্ভট অভিযোগ আনা হয়েছিল। কিন্তু বাংলার বুদ্ধিজীবী ও জনগণ তাঁদের সে প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয় নি।

আতাউর রহমান খানের কাছে যেদিন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণলিপি পাঠানো হ'ল, সেদিন ঘটল এক দুঃখজনক ঘটনা। খাদ্যের দাবীতে মিছিল আর বিক্ষোভ ক্রমাগত চলে আসছিল। ঢাকার জেলা প্রশাসক ১৪৪ ধারা জারী করলেন তার প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। কিন্তু অনমনীয় বুভুক্ষুরা তা' মানলো না। ফলে তাদের উপর চালানো হ'ল লাঠি, নিক্ষেপ করা হ'ল কাঁদুনে গ্যাস। শেষ পর্যন্ত চালানো হ'ল গুলী। ৪জন প্রাণ হারালো, শত শত আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হ'ল। বিপদ দেখে ফজলুল হক সাহেব প্রেসিডেন্টের নিকট তারবার্তা পাঠালেন। পরে ১৪৪ ধারা তুলে নেয়া হ'লে অবস্থা কিছুটা শান্ত হয়।

পরদিন ঢাকায় মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এক বিরাট শোক মিছিল বেরুলো। ঐ সময় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব আবদুল লতিফকে রাস্তার মধ্যে পেয়ে উত্তেজিত জনতা তাঁকে মোটর গাড়ী থেকে টেনে বের করে মুখে গোবর মাখিয়ে দিল।

শোক মিছিল

যথাবিধি ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জনাব আতাউর রহমান খান

পূর্ব বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গভর্নর জনাব ফজলুল হকের কাছে শপথ গ্রহণ করেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা উচিত যে, দলের অভ্যন্তরে শেখ মুজিবের প্রভাব সবচেয়ে বেশী থাকলেও প্রবীণ রাজনীতিবিদ হিসেবে জনাব আতাউর রহমান খানের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী মনোনীত ক'রে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে। অবশ্য এতে মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হিসেবে শেখ মুজিবকেও শিল্প-বাণিজ্য-শ্রম-দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তাঁর সাথে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ, মাহমুদ আলী ও কফিল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের শেষে সিলেটের প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা শ্রীবসন্তকুমার দাস সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, আজকের দিনটি পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। কেননা, এই প্রথম একটি প্রকৃত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল ক্ষমতা গ্রহণ করলো।

আতাউর রহমান খানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ ও নয়া মন্ত্রিসভা গঠন

শেখ মুজিবের পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

শেখ মুজিব মন্ত্রিত্ব পেয়ে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি দক্ষতার সাথে তাঁর কর্তব্য পালন ক'রে যেতে থাকেন। এতদিন ধরে পূর্ব বাংলার ওপর যে অসমতাপূর্ণ ব্যবহার করা হয়ে আসছিল, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হলেন। পূর্ব পাকিস্তানী আমদানী ও রফতানীকারীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানে রিজিওন্যাল কন্ট্রোলার অব এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের দফতর স্থাপন ক'রে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে তিনি আন্তরিকতার সাথে অগ্রসর হন।

মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিব

শাসন-ব্যবস্থার অরাজকতার সুযোগ নিয়ে সমগ্র দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছিল। দুর্নীতি দমন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হয়েই শেখ মুজিব দেশকে দুর্নীতির কবল থেকে মুক্ত করার জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা প্রাদেশিক পরিষদেও গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকার তা' অনুমোদন করেন নি। তবুও এতে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হলেন না শেখ মুজিব। তিনি দুর্নীতি দমন বিভাগ খুলে সরকারী ও বেসর-

কারী সদস্যগণের সমন্বয়ে দুর্নীতি দমন সংস্থার মাধ্যমে তাঁর কার্যক্রম নির্দেশ করেন। কিন্তু এই কার্যক্রমও সফল হতে পারলো না। কারণ দেশ তখন আমলাতান্ত্রিক নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী। আমলারা নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী এ ধরনের পরিকল্পনাকে সবদিক থেকে বানচাল করবার ষড়যন্ত্রে সাফল্য অর্জন করলেন। কারা নির্যাতনের অভিজ্ঞতা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যেরই ছিল। তাই বন্দীজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকার প্রদেশের সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দেন। শুধু তাই নয়, মন্ত্রীরা রাজবন্দীদের স্বয়ং অভ্যর্থনা জানান। পার্টি'র সম্পাদক ও মন্ত্রিসভার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে শেখ মুজিবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল দ্ব্যর্থহীন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন-পূর্ববর্তীকাল পাকিস্তান বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একদেশদর্শী ছিল। বিশেষ করে চীন ও রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সম্পর্কে পাকিস্তান বৈরীমূলক মনোভাব পোষণ করতো। ১৯৪৮-৪৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়া তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খানকে তাঁদের দেশ সফরে আমন্ত্রণ জানালেও খান সাহেব সেখানে না গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সফর ক'রে পশ্চিমা চক্রের সঙ্গে পাকিস্তানের ভাগ্যকে একসূত্রে গ্রথিত করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবার পর ১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসে এগারজন প্রতিনিধি নিয়ে শেখ মুজিব নয়াচীনে গেলেন এক শুভেচ্ছা সফরে। পাকিস্তানের সাথে মহাচীনের বন্ধুত্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবের হাতেই।

শেখ মুজিবের চীন ও রাশিয়া সফর

পরে শেখ মুজিব আবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে চীন ভ্রমণ করেন এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাইকে দাওয়াত করে পাকিস্তানে এনে উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের পথ পরিষ্কার করতে প্রয়াস পান। এর কিছুদিন পর ১৯৫৭ সালে প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিশেষ দূত হিসেবে শেখ মুজিব রাশিয়াসহ কয়েকটি দেশে শুভেচ্ছা সফরে যান। আওয়ামী লীগ যখন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন তখন ইস্কান্দার মীর্জা ঢাকায়

ছিলেন। এ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করায় তাঁর পদ-গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। ইস্কান্দার মীর্জা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সঙ্গে নিয়ে করাচীতে উড়ে গেলেন এবং শহীদ সাহেব বহু প্রতীক্ষার পর ১৯৫৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে তাঁর ঈপ্সিত পদে আসীন হলেন।

সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রিত্ব

প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসে সোহরাওয়ার্দী সাহেব তার দু'দিন পর অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বরে ঢাকায় এলেন। সেই দিনই ঢাকার পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে এক জনসভা হ'ল এবং প্রধান বক্তা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।

পল্টন ময়দানে জনসভা

সভাপতির ভাষণে মওলানা ভাসানী সাহেব সরকারকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি পনেরো দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলায় প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য না পাঠান, তা' হ'লে কেন্দ্রে ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে হবে। তিনি আরও বললেন ঃ "মন্ত্রিত্বের লোভে আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয়া চলবে না। আওয়ামী লীগ মন্ত্রীরা যেন ভুলে না যান যে, দেশে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন, পূর্ব বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, পশ্চিমী যুদ্ধজোট বর্জন প্রভৃতি ব্যাপারে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আওয়ামী লীগকে এ প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে।"

শহীদ সাহেব ভাসানীর এমনতর বক্তৃতায় বেশ কিছুটা বিরক্তই হয়েছিলেন। কিন্তু সব বিরক্তি দমন ক'রে ধীরস্থির কণ্ঠে তিনি বললেন ঃ "মওলানা সাহেবের কথায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। প্রধানমন্ত্রী হয়ে আমি তো আর বসে নেই। রাতদিন কাজ করে চলেছি। পূর্ব বাংলার জন্য খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি। এমন কি ত্রিশ হাজার টন চাল সাহায্যের জন্য শ্রী নেহেরুকেও লিখেছি। মওলানা ভাসানী পদত্যাগের কথা বলেছেন। আমিও চাই না যে, কাজ না করে কেবল গদি আঁকড়ে থাকি। আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—১৫ দিনের মধ্যে যদি ১৭ হাজার মণ চাল পূর্ব বাংলায় পাঠাতে না পারি, তা' হ'লে নিশ্চয়ই আমি পদত্যাগ করবো।"

সোহরাওয়ার্দী-ভাসানীর বিরোধ

সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আওয়ামী লীগ দলের মধ্যে

অন্তর্বিরোধ দেখা দিল। মওলানা ভাসানী বিভিন্ন সভা-সমিতিতে শহীদ সাহেবের কঠোর সমালোচনা করতে লাগলেন। বিশেষতঃ পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে তাঁদের এ বিরোধ বেধে যায়। ভাসানী পাক-মার্কিন যুদ্ধজোটের বিরোধী। তাই আমেরিকার আওতা থেকে পাকিস্তানকে সরিয়ে আনার জন্য তিনি সোহরাওয়ার্দীকে বারবার চাপ দিতে থাকলেও দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে শহীদ সাহেব এ ব্যাপারে সহসা এমন কোন সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত ছিলেন না, যা বৈদেশিক নীতিতে হঠাৎ শূন্যতা সৃষ্টি করতে পারে। বরং ১৯৫৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর ঢাকায় এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এ সম্পর্কে শহীদ সাহেব বললেনঃ "সামরিক চুক্তির যারা বিরোধিতা করছে তারা যে শত্রু পক্ষের এজেন্ট তা' প্রমাণ করবার মত কাগজপত্র আমার রয়েছে।"

একথা শুনে ভাসানী তাঁর চিরাচরিত স্বভাবেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি শহীদ সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করলেনঃ "জনাব সোহরাওয়ার্দী আপনার গোপন কাগজপত্র আপনি জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করুন। আমরা শত্রু পক্ষের পয়সায় কেনা এজেন্ট বলে যদি প্রমাণ করতে পারেন তা' হ'লে প্রকাশ্য আদালতে আমাদের বিচার করুন।"

ঠিক এ সময় পূর্ব বাংলা থেকে একদল বাণিজ্য প্রতিনিধি গেলেন ভারতে। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর আহমদ।

আবুল মনসুর আহমদ প্রথমে প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী হলেও পরে সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁকে কেন্দ্রে টেনে নেন। কেন্দ্রে তিনি শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন।

প্রতিনিধিরা ভারতে গিয়েছিলেন উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য। প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য আবুল মনসুর আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জওয়াহেরলাল নেহেরুকে প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এক বোতল সুন্দরবনের মধু উপহার দিলেন। এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মুসলিম লীগের নেতারা মওকা পেয়ে গেল। তারা হৈ-চৈ শুরু ক'রে দিল। তাদের মুখপত্র করাচীর 'ডন' পত্রিকায়

ভারতের সাথে মধুর মাধ্যমে মধুর সম্পর্ক স্থাপনের নিন্দা ক'রে প্রতিনিধিদের কঠোর শাস্তির দাবী জানাল।

মওলানা ভাসানী চারিত্রিক দিক থেকে যে একজন মওলানা, সে কথা বারবার তাঁর উক্তি প্রত্যুক্তিতে প্রতিপন্ন হয়েছে। জনগণকে উত্তেজিত করবার সুযোগ তিনি কোন দিনই ব্যর্থ হতে দেন নি। সুতরাং সময় বুঝে মওলানা ভাসানী দেশের মধ্যে বেশ গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে এই সুযোগে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে শুরু করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন জনসভায় বলতে লাগলেন, "হয় একুশ-দফা পালন কর, নয়তো গদি ছেড়ে দাও।'

মওলানা ভাসানীর হুমকি

শহীদ সাহেব এতে বিরক্ত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্ষীয়ান এই গণনেতার জনপ্রিয়তাকে তিনি একেবারে উপেক্ষা করতে পারলেন না। দিনের পর দিন মওলানা সাহেবও শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগলেন। তিনি ১৯৫৭ সালের ৩রা জানুয়ারী এক বিবৃতিতে বললেন ঃ "আমি আওয়ামী লীগ সরকারের বৈদেশিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বহু লোকের কাছ থেকে রোজই চিঠিপত্র পাচ্ছি। এ ছাড়াও যে সব প্রশ্ন দলের সভাপতি হিসেবে আমার কাছে পূর্ব বঙ্গের অসংখ্য মানুষ তুলছেন, তা' হ'ল ঃ

(ক) আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

(খ) পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীতে প্রতি একশ' জনের মধ্যে মাত্র চারজন বাঙালী কেন?

(গ) পাকিস্তানের ফরেন সার্ভিসে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীদেরই নিযুক্ত করা হচ্ছে কেন?

(ঘ) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের, তাঁরা বাঙালীই হোন আর পশ্চিম পাকিস্তানীই হোন, প্রাইভেট সেক্রেটারীরা সবাই অবাঙালী কেন? এ ব্যবস্থা কি বাঙালী মন্ত্রীদের কার্যকলাপের উপর নজর রাখার জন্য?"

ভাসানী শেষবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের কাগমারীতে এক সম্মেলন আহবান করলেন। ১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী

সন্তোষের মহারাজার প্রাচীন রাজপ্রাসাদের নাটমন্দিরে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সদস্যদের বৈঠক বসলো।

৮৯৬ জন কাউন্সিল সদস্য সেদিন উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। উক্ত সভায় মওলানা ভাসানী শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। সেদিন ভাসানী সাহেব যুদ্ধজোটের বিরোধিতা ক'রে বলেছিলেনঃ "আমি আমার জান দিয়ে যুদ্ধজোটের বিরোধিতা করবো। কেউ যদি আমাকে দিয়ে জোর ক'রে এই চুক্তি মানিয়ে নিতে চান, তবে আমি কবর থেকেও চেঁচিয়ে বলে উঠবো, না-না-না— ওই সর্বনেশে যুদ্ধজোটের পথে আমি নেই।"

কাগমারীর সম্মেলন

কাগমারী সম্মেলনের মত এরূপ ঐতিহাসিক সম্মেলন আর হয় নি। টাঙ্গাইল থেকে কাগমারী পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাস্তায় তৈরী করা হয়েছিল অনেকগুলো তোরণ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকদের নামানুসারে উক্ত তোরণগুলোর নাম রাখা হয়েছিল। লেনিন, শেক্সপিয়র, আব্রাহাম লিঙ্কন, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। কাগমারী সম্মেলনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী উপস্থিত ছিলেন এবং কৌশলে নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী তাঁর ভাষণ দান কালে আওয়ামী লীগের সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেনঃ

"আপনারা যাঁরা দলের মেরুদণ্ড, গরীবের রক্ত জল ক'রে যাঁরা দল গড়েছেন তাঁরা বড়, না বড় এই ভদ্রলোকটি? আপনারাই শহীদকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করেছেন—তাই তিনি আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। আপনারা তাঁর পিছন থেকে সরে গেলে এ ভদ্রলোকটিকেও সরে যেতে হবে। তাই আপনাদের নির্দেশ পার্টি সদস্য হিসেবে এঁকে মানতেই হবে।"

বক্তৃতা চলাকালীন তিনি আরো বলেছিলেনঃ "পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ যুদ্ধজোটের বিরোধিতা ক'রে ১৯৫৩ সালে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তারপর প্রতি বছর প্রতি অধিবেশনে সে প্রস্তাবের প্রতি জানিয়েছে গভীর আস্থা। আওয়ামী লীগ আজ তাই সে প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়াতে পারে না। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের যে তেরো জন সদস্য আছেন,

তাঁদের দলের ঘোষিত নীতি মেনে চলতেই হবে। এজন্য তাঁদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে যদি পদত্যাগ করতে হয়, তাঁরা বিনাদ্বিধায় তা' করুন।"

জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রতি লক্ষ্য করে ভাসানী সাহেব বলেছিলেন ঃ "এই ভদ্রলোক প্রচার করছেন যে, তাঁর হাতে পড়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি নাকি অনেকখানি সফল হয়েছে। কাশ্মীর প্রশ্নটিকে তিনি নাকি আবার তাজা করে তুলেছেন। কথার উপর ট্যাক্স নেই। অনেক লোক অনেক কথা বলতে পারেন, তার জন্যে ট্যাক্সের কড়ি লাগে না। এই ভদ্রলোকও তেমনি বাক্যব্যয় করছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ শক্তিগুলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আফ্রো-এশিয়ান জাতিগোষ্ঠীর বিশ্বাস হারানোর নাম কি পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য? নিজের ভাবনা, নিজের চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে পরের ডিক্‌টেশনে চলার নাম কি প্রগতি? এই ভদ্রলোক কি নিজের বুকে হাত দিয়ে সে কথা বলতে পারেন?

ভদ্রলোক বলছেন, কাশ্মীর প্রশ্নটিকে তিনি আবার জাগিয়ে তুলেছেন। তার উত্তরে আমি যদি বলি যে এদেশের একশ্রেণীর রাজনৈতিকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাশ্মীর সমস্যার নাম ক'রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছেন। তবে আমার পাশে বসা আপনাদের প্রধানমন্ত্রী তার কি জবাব দিবেন? সে জবাব তাঁর কাছ থেকে আপনারা দাবী করুন।"

শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেদিন ভাসানী সাহেবকে জব্দ করার জন্য একটি চিরকুট আর একটি টেলিগ্রাম নিয়ে গিয়েছিলেন। ভাসানীর বিরুদ্ধে এ দুটো অস্ত্র তৈরী করেছিল পাকিস্তানী গুপ্তচর বিভাগ। শহীদ সাহেব স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এ দিয়ে ভাসানী সাহেবকে কাবু করা যাবে না। তাই ভাসানী সাহেবকে তিনি আর বিপর্যয়ের দিকে না নিয়ে ঘোষণা করলেন, "প্রয়োজন হলে পদত্যাগ করব।" কিন্তু সাথে সাথে একথাও তিনি ঘোষণা করলেন যে, পূর্ব বাংলার স্বার্থে আজ আমাদের সমগ্র পথ নির্ণয় করতে হবে। শহীদ সাহেবের নিকটেই বসা ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি শহীদ সাহেবের উপরিউক্ত উক্তির পর উঠে বললেন, "স্যার, আপনাকে আমরা ছাড়বো না, ছাড়তে পারি না। বাংলাদেশের স্বার্থেই আপনার কেন্দ্রে থাকবার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

কাগমারী সম্মেলন ভাসানী সাহেবের পক্ষেই গিয়েছিল। কিন্তু ভাসানী সাহেব যা' চেয়েছিলেন তা' তিনি করতে সক্ষম হন নি। কেননা তরুণ নেতা শেখ মুজিবুরের ব্যক্তিত্ব সকল নেতৃত্বকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিল। যদিও সম্মেলন ডেকেছিলেন মওলানা ভাসানী, কিন্তু উদীয়-মান নেতা শেখ মুজিব এই সম্মেলনের মাধ্যমে এক অনন্য ব্যক্তি-পুরুষ হিসেবে বেরিয়ে এলেন। এ কারণেই এ সম্মেলনের কিছুদিন পর ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ ক'রে অন্য দল গঠন করলেও আওয়ামী লীগ তাতে শক্তি হারায় নি, বরঞ্চ নতুন শক্তি লাভ করেছে। কাগমারী সম্মেলন শেষ হলে শহীদ সাহেব ঢাকা হয়ে করাচীতে ফিরে গেলেন। পরদিন সকালে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের সময় সাংবাদিকদের কাছে তিনি বললেন, "শতকরা ৯৮ জন সদস্যই আমাদের সরকারের বৈদেশিক নীতি অনুমোদন করেছে।" এছাড়াও তিনি দাবী করলেন যে, তাঁর দলের সদস্যরা তাঁর প্রতি আস্থাবান এবং বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে কাউন্সিলে প্রস্তাব উঠলেও তিনি তাতে শঙ্কিত হন নি। তিনি আরও দাবী করলেনঃ "আমি প্রধানমন্ত্রী হবার পর পূর্ব বাংলাকে ইতিমধ্যেই ৯০ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে।"

কাগমারী সম্মেলনের পর

মওলানা ভাসানী দু'দিনব্যাপী সম্মেলনের পর অবস্থার ব্যাখ্যা ক'রে সাংবাদিকদেরকে বললেনঃ "১৯৫৬ সালের মে মাসের সিদ্ধান্ত বাতিল ক'রে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পার্টি কাউন্সিল আমাকে ক্ষমতা প্রদান করেছে যে, যে কোন সদস্য, মন্ত্রী, এম. পি. এ., অথবা এম. এন. এ. যাই হোন না কেন, তিনি যদি পার্টির সিদ্ধান্ত অমান্য করেন তবে আমি যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবো।" সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এ সময়টা ভাসানীর পক্ষে খুবই সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে। কাগমারী সম্মেলনে তিনি ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ এবং কিছু কিছু স্তম্ভ ভারতীয় নেতাদের নামে নামকরণ করেছিলেন, ফলে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তাঁর বিরুদ্ধে ভারতের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনে। তিনি এতে অতিষ্ঠ এবং বিব্রত হয়ে ওঠেন। ভাসানী চুপ করে থাকলেন না। তিনি বললেন যে, "নিপীড়িত জনগণের দাবী আদায়ের সংগ্রাম যদি

ষড়যন্ত্র হয়, তবে কাগমারী সম্মেলনে তো প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও প্রাদেশিক মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সেখানেই একথা উত্থাপন করেন নি কেন? আর ষড়যন্ত্রের কথা যদি জানতেনই তবে কেন তাঁরা সম্মেলনে হাজির হলেন?"

বলাই বাহুল্য, ভাসানী মন্ত্রীদের প্রতি এরূপ কটাক্ষ করলেও কোন মন্ত্রী বা আওয়ামী লীগ নেতা তাঁর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ করেন নি।

কাগমারী সম্মেলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে তখন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত মিঃ হারেস এ. হিল্‌ড্রেথ ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, সিয়াটো চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা, কোন সদস্য-রাষ্ট্র—সে পাকিস্তান হ'লেও কম্যুনিস্ট আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন আক্রমণে সাহায্য করতে বাধ্য নয়। যা হোক, ভাসানীর তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও যথাসময়ে জাতীয় পরিষদে সোহরাওয়ার্দী তাঁর বৈদেশিক নীতি অনুমোদন ক'রে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শহীদ সাহেবের প্রতি শেখ মুজিবের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তিনি পরিষদে ভোটদানে বিরত থাকেন। আতাউর রহমান খানও উক্ত নীতির প্রশ্নে ভোটদান থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু করাচী থেকে ঢাকায় এসে সাংবাদিকদের কাছে তিনি শহীদ সাহেবের পররাষ্ট্র নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।

মাস দু'য়েক পরে ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল শেখ মুজিবের সাথে আলোচনাক্রমে অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ প্রাদেশিক আইন-সভায় এক প্রস্তাব আনলেন। তাতে প্রাদেশিক সরকারকে বলা হ'ল যে, তাঁরা যেন একমাত্র অর্থ, বৈদেশিক দফতর ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা বাদে আর সব বিষয়ে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিরোধী দলের নেতা আবু হোসেন সরকারসহ অনেকেই এ প্রস্তাব সমর্থন করলে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হ'ল। এই প্রস্তাবটি যাতে গৃহীত হয় তার জন্য শেখ মুজিব অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং প্রস্তাবটি অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ উত্থাপন করলেও শেখ মুজিবের দানই ছিল সবচেয়ে বেশী।

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। মুসলিম লীগের সংবাদপত্রগুলো কড়া ভাষায় এর বিরোধিতা করতে লাগলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পশ্চিম পাকিস্তানী মীর গোলাম আলী খান তালপুর হুমকি দিয়ে বললেন ঃ "পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পশ্চিম বঙ্গের লেজুড় বানানোর যে-কোন প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীয় সরকার তার লৌহ মুষ্ঠির আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে দেবে।"

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী পূর্ব বাংলার এম. এ. খালেক তালপুরের বিবৃতির তীব্র সমালোচনা ক'রে বললেন যে, পূর্ব বাংলার পাঁচ কোটি মানুষের প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত প্রস্তাবের প্রতি হস্তক্ষেপ করার অধিকার তালপুর সাহেবের নেই। শেখ মুজিবও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে হুশিয়ার করে দিয়ে বললেন ঃ "বাঙালীদের ব্যাপারে মাথা গলাতে আসবেন না। বাঙালীরা জানে কিভাবে অধিকার আদায় করতে হয়। আপনাদের কামান-বন্দুকের পরোয়া তারা করে না।" কিন্তু আশ্চর্যের কথা সোহরাওয়ার্দী সাহেব পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদের এই প্রস্তাবকে সেদিন খুব সুনজরে দেখতে পারেন নি। পরবর্তী কালে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারিয়ে এবং আইয়ুব খানের হাতে শিকারে পরিণত হয়ে তিনি অবশ্য তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত-শাসনকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে ভাসানীর সম্পর্ক এমন একটি পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যে, মওলানা সাহেব আওয়ামী লীগের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ভাসানী-চরিত্রে একই আদর্শে চিরদিন অবিচলিত নিষ্ঠায় থাকা এবং একই প্রতিষ্ঠানে বিশ্বস্ত হওয়া লিখিত নেই। সুতরাং এ ঘটনা বিচিত্র কিছু নয়। যা হোক, দল থেকে পদ-ত্যাগের অভিপ্রায় জানিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ভাসানী এক পত্র লিখলেন ঃ "কেন্দ্র ও পূর্ববঙ্গে সমতার আসনে বসে আওয়ামী লীগের নায়কগণ, বিশেষ ক'রে জনাব সোহরাওয়ার্দী দলের আদর্শ ও একুশ-দফা ক্রমাগতই লংঘন ক'রে চলেছেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী দলের মূলনীতির প্রতি ও বহু প্রস্তাবের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দেশকে ধীরে ধীরে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির জোয়ালের সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছেন। কাজেই আমি আর এ দলের সভাপতি পদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে চাই না। আগামী ২৫শে জুলাই থেকে আমি এ দলের সদস্যও থাকতে চাই না।"

অবশ্য এই পদত্যাগ ও দলত্যাগের পশ্চাতে রহস্য ছিল অন্যরূপ। এ সম্পর্কে জনাব আবুল মনসুর আহমদ অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "আগেই তিনি মিয়া ইফতিখার উদ্দিন ও জি. এম. সৈয়দ প্রভৃতি বামপন্থী পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ ও শহীদ সাহেব কর্তৃক বিতাড়িত সাবেক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব মাহমুদুল হক ওসমানীর সাথে গোপন পরামর্শ করিতে থাকেন ... ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা বন্ধ দরজায় মওলানা ভাসানীর সাথে পরামর্শ করিয়া গিয়াছেন। এটা চলে পর পর কয়েকদিন। তবুও কাউন্সিল মওলানাকে ইস্তাফা প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। মওলানা তদুত্তরে ন্যাপ গঠন করেন। ন্যাপ গঠনে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার হাত ছিল এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

ভাসানীর পদত্যাগ ও নয়া দল গঠন

[আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ঃ আবুল মনসুর আহমদ, পৃঃ ৪৯২]

মনসুর সাহেবের সন্দেহ অমূলক ছিল না। সোহরাওয়ার্দী ক্ষমতায় যাবার পর প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ইচ্ছামত শাসনকার্য চালাতেন। এতে পশ্চিমাগোষ্ঠী বিশেষ সুবিধা করতে পারছিলেন না। আবার তাঁদেরকে ক্ষমতা না দিলেও নির্বিঘ্নে পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করতে পারলেন, আওয়ামী লীগের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি না করতে পারলে তাঁদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না। আর সে জন্যই সোহরাওয়ার্দীকে ক্ষমতা দানের মাধ্যমে অথবা তোষামোদ ক'রে পূর্ব বাংলার স্বার্থের বিরুদ্ধে সচেতন রাখতে চেষ্টা করা হয় আর যাতে ক'রে আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙন ধরানো যায় সেই চেষ্টা পুরোপুরি চলতে থাকে। অবশ্য সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁদের সেই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এসব ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছেন।

ওদিকে ভাসানীকেও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করা হয় এবং তা' যে সফল হয় তাতে সন্দেহ নেই। ভাসানী স্বভাবে আবেগপ্রবণ, অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ধীরস্থিরভাবে কোন কিছু বিচার করবার মত মানসিকতা তাঁর নেই। আর তাই পশ্চিমাগোষ্ঠীর উস্কানীতে ভাসানী সাহেব অতি সহজেই সোহরাওয়ার্দীর ওপরে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আর সেই বিতৃষ্ণা নিয়েই তিনি নিজেই গঠন করলেন একটি রাজনৈতিক দল। জন্ম

হ'ল 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'। ১৯৫৭ সালের ২৫শেজুলাই ঢাকার সদর-ঘাটে অবস্থিত একটি সিনেমা হলে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে পাকিস্তান গণতন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল। এর আগে ১৭ই জুলাই এক বিবৃতিতে তিনি এ সম্মেলন আহ্বান করেন। তাঁর এ আহ্বানে যোগ দিয়েছিলেন (আবুল মনসুর সাহেবের মতে আগে থেকেই এ বিষয়ে কথাবার্তা ছিল) সীমান্ত-গান্ধী খান আবদুল গাফফার খান, খান আবদুস সামাদ খান, জনাব জি.এম. সৈয়দ, জনাব আবদুল মজিদ সিন্ধি, আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভার রাজস্ব মন্ত্রী জনাব মাহমুদ আলী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গ। সম্মেলনে প্রায় ১২০০ কর্মী যোগ দিয়েছিলেন। জন্ম হ'ল এক নতুন সংগঠন—নাম 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'। সংক্ষেপে 'ন্যাপ'। মওলানা ভাসানী হলেন ঐ সংগঠনের অন্যতম শক্তিশালী কর্ণধার। ইতিমধ্যে শেখ মুজিব পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির ইচ্ছানুসারে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন থেকে তিনি উপলব্ধি করছিলেন যে, জনতাকে যদি সংঘবদ্ধ করতে হয় তবে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে তাঁকে পার্টিতে ফিরে যেতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণও উপলব্ধি করলেন যে ভাসানীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে আওয়ামী লীগকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় ও জনপ্রিয় ক রে তুলতে হয় তবে শেখ মুজিব ছাড়া গত্যন্তর নেই। শেখ মুজিবের সাংগঠনিক শক্তি অপরিসীম। সুতরাং মন্ত্রিত্বের আসনের চেয়ে শেখ মুজিব জনগণের মিছিলে সামিল হওয়াটাকেই অধিকতর শ্রেয়ঃ বলে মনে করলেন। একথাও তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ফলে জনগণের কাছ থেকে তিনি অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন। আর সেই বেদনাবোধ তাঁকে অহরহ পীড়া দিত। তাই তিনি আবার নেমে এলেন পথে। শেখ মুজিব কাজ শুরু করার সাথে সাথে আওয়ামী লীগ নতুন শক্তি ফিরে পেল—দিন দিন এই প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো অপূর্ব গতিতে। বর্ষীয়ান নেতা ভাসানী, আতাউর রহমান সবাই সরে যেতে লাগলেন পর্দার অন্তরালে আর জনতার পর্দায় এগিয়ে আসতে লাগলো একটি ব্যক্তিত্ব—শেখ মুজিব। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানেও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের জন্য দাবী উঠতে শুরু ক'রে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট মীর্জা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দানের চেয়ে এক-নায়কতন্ত্র শাসন চাপিয়ে দেয়ারই পক্ষপাতী। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৭

সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে তিনি এক ঘোষণায় বললেন—ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার অনুকরণে পাকিস্তানে যে শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, পাকিস্তানীরা তাতে অনভ্যস্ত এবং অনুপযুক্ত। কাজেই এ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে মন্ত্রীদের ক্ষমতার বিলোপ সাধন ক'রে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপ্রধান শাসন-ব্যবস্থা চালু করতে হবে। প্রেসিডেন্টের এরূপ মন্তব্য সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে চিন্তিত করলো। কেননা, তিনি বেশ কিছুদিন ধরে মীর্জাকে সরিয়ে তাঁর প্রিয়পাত্র গুরমানীকে প্রেসিডেন্ট পদে বসানোর জন্য গোপনে কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন। এতে ক'রে তিনি নিশ্চিতভাবে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন বলে মনে করতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মীর্জা সাহেবের দল 'রিপাবলিকান পার্টি'র নেতৃবর্গের সঙ্গেও গোপনে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সব ভরসাই নির্মূল হয়ে গেল। মীর্জা সাহেব সোহরাওয়ার্দীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি শহীদ সাহেবকে গদিতে রাখা আর সমীচীন মনে করলেন না। ১৯৫৭ সালের ১১ই অক্টোবর দীর্ঘ ১৩ মাস প্রধানমন্ত্রিত্বের পদে আসীন থেকে সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। শেখ মুজিব তখন পাকিস্তান প্রতিনিধিদের সাথে রাশিয়ার পথে ক্যানাডায় ছিলেন। তিনি সোহরাওয়ার্দীর তারবার্তা পেয়ে দেশে ফিরে আসেন। অবশেষে পাকিস্তানের ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হলেন মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা—জনাব আই. আই. চুন্দ্রীগড়। কিন্তু চুন্দ্রীগড়ের ভাগ্যেও বেশীদিন প্রধানমন্ত্রিত্ব টিকলো না। প্রেসিডেন্ট মীর্জা তাঁর জায়গায় এনে বসালেন মালিক ফিরোজ খান নুনকে। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি তেও একের পর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটতে লাগলো। ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ প্রাদেশিক গভর্নর ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত ক'রে তাঁর দলকেই আবার ক্ষমতায় বসালেন। এবারেও মুখ্যমন্ত্রী হলেন আবু হোসেন সরকার। আওয়ামী লীগকে পদচ্যুত করায় সোহরাওয়ার্দী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। সেদিন রাতেই তিনি কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুনকে টেলিফোনে ভয় দেখালেন যে, যদি আধ ঘন্টার মধ্যে গভর্নর

সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগ

আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা বাতিল ও আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন

ফজলুল হক ও আবু হোসেনের মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত না করা হয় তা' হ'লে তিনি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সদস্যদেরকে ফিরোজ খান নুন-এর মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দেবেন।

নুন সাহেব ভয় পেয়ে গেলেন। মন্ত্রিত্ব হারাবার আশঙ্কা দেখা দেয়ায় মাত্র ৪ ঘন্টার মধ্যে তিনি ফজলুল হককে বরখাস্ত ক'রে পূর্ব বাংলার চীফ সেক্রেটারী জনাব হামিদ আলীকে প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করলেন।

শেরে বাংলা অপসারিত ও আবু হোসেন সরকারের বিদায়

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে হামিদ আলী পরদিনই অর্থাৎ ১লা এপ্রিল ('৫৮) মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকারকে বরখাস্ত করলেন। মাত্র ১২ ঘন্টা অন্ধকারে (শুধু ৩১শে মার্চ রাত্রিবেলা) রাজ্য শাসন ক'রে আবু হোসেনের বিদায় নিতে হ'ল।

পুনরায় আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা গঠন

আবার আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য গভর্নর আহ্বান জানালেন। ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রদেশে তাঁদের ক্ষমতা ফিরে পেলেন।

কিন্তু ১৮ই জুন আওয়াম লীগ মন্ত্রিসভা আবার সংকটের সম্মুখীন হ'ল। ইস্কান্দার মীর্জা গোপনে গোপনে কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এই ষড়যন্ত্র সফল হয়েছিল। ১৯৫৮ সালের ১৮ই জুন প্রাদেশিক আইন-সভায় অতর্কিতভাবে একটি প্রস্তাব ভোটে অসমর্থিত হয়। পরদিন অর্থাৎ ১৯শে জুন আইন-সভায় একটি cutmotion-এ হেরে যাওয়ার ফলে আতাউর রহমান মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। ইতিমধ্যে হামিদ আলীর স্থলে জনাব সুলতানউদ্দিন আহমদ পূর্ব বাংলার স্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার পতন হওয়ায় তিনি আবু হোসেন সরকারকে পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানালেন। ২০শে জুন ('৫৮) জনাব সরকার রাজশাহীর প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী ও সিলেটের জনাব আবদুল হামিদসহ গভর্নর সুলতান আহমদের নিকট শপথ গ্রহণ করলেন। এই নিয়ে আবু হোসেন সরকার তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

আতাউর রহমান খানের পতন ও আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠন

কিন্তু সরকারের দুর্ভাগ্য, শেষের বারেও তিনি তিনদিনের বেশী মন্ত্রিত্ব করতে পারলেন না। ২২শে জুন ('৫৮) শেখ মুজিব আইন-সভায় আবু হোসেনের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। প্রস্তাবটি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ১৫৬—১৪২ ভোটে পাশ হ'ল।

আঃ হোঃ সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন ও তাঁর পতন

এ সময় সরকার দলীয় সদস্যরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। পরদিন ২৩শে জুন বাধ্য হয়ে আবু হোসেন গভর্নরের কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন।

প্রদেশের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিতে কসুর করলেন না ইস্কান্দার মীর্জা। দেশে ডিক্‌টেটারশিপ চালু ক'রে মহাপরাক্রমশালী দেশনায়ক হয়ে আজীবন রাজত্ব করবার খায়েশ তিনি বহুদিন থেকে মনে মনে পোষণ করছিলেন। পূর্ব বাংলার আইনসভা সাময়িকভাবে বাতিল করে দিয়ে চালু করলেন প্রেসিডেন্টের শাসন—আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবার এই হ'ল প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মীর্জা সুবিধা করতে পারলেন না। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় খণ্ডেই তখন সাধারণ নির্বাচনের দাবীতে জনগণ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগের নেতা খান আবদুল কাইয়ুম খান মীর্জাকে হুশিয়ার করে দিয়ে বললেন যে, অবিলম্বে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হ'লে একটা রক্তাক্ত কাণ্ড ঘটে যাবে।

পূর্ব বাংলায় প্রেসিডেন্ট শাসন জারী

১৯৫৮ সালের ৬ই জুলাই শহীদ সোহরাওয়ার্দীও ঢাকার নারায়ণগঞ্জে এক বিশাল জনসভায় বললেনঃ "স্বাধীনতার পর ১১ বছরের মধ্যে ভারতে দুটো সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল, তৃতীয় নির্বাচনও আসন্ন, অথচ আমাদের দেশে নির্বাচনের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না।" উভয় প্রদেশের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মীর্জা সাহেবও ১৯৫৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদে একটি বিলও গৃহীত হ'ল।

অবস্থার চাপে পড়ে দু'মাস পর ইস্কান্দার মীর্জা পূর্ব বাংলা থেকে

প্রেসিডেন্ট শাসন তুলে নিতে বাধ্য হলেন। আওয়ামী লীগকে আবার মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানানো হ'ল। আতাউর রহমান খান ২৫শে আগস্ট ('৫৮) পুনরায় পূর্ব বাংলার নবম মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

আতাউর রহমান খানের পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দল প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্পীকার কৃষক-শ্রমিক দলভুক্ত জনাব আবদুল হাকিমের প্রতি বিশ্বাস রাখতেন না। তাই ২০শে সেপ্টেম্বর আইন-সভার অধিবেশন বসলে সরকারী দল তাঁকে অপসারণের চেষ্টায় ব্রতী হলেন। কিন্তু হাকিম সাহেব নিজের ভুলের জন্যই বিপদ ডেকে আনলেন। আইন-সভার অধিবেশনের প্রথম দিনেই মুসলিম লীগের হাশেম উদ্দিন ৬ জন আওয়ামী লীগ সদস্যের প্রতি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন যে, এঁদের সভাগৃহে থাকার কোন অধিকার নেই। যাঁদের উদ্দেশ ক'রে কথাগুলো বলা হয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করা হয় যে, বিগত নির্বাচনে নির্বাচনী কমিশন তাঁদের নির্বাচন বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন; কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চাপে পড়ে ফিরোজ খান নুন এক অর্ডিন্যান্স জারী ক'রে নির্বাচনী কমিশনের সিদ্ধান্তকে বাতিল ক'রে দেন এবং ঐ ছয়জন আওয়ামী লীগ নেতাকে আইন-সভায় পুনর্বহাল করা হয়। হাশেম উদ্দিনের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্পীকার ২৩শে সেপ্টেম্বর রুলিং দেবেন বলে ঘোষণা করলেন; কিন্তু তাঁর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সভায় তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। স্পীকার অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে কয়েকজন সদস্যকে সভাকক্ষ ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিলেন।

আইন-সভার অধিবেশন

ফল হ'ল বিপরীত। সদস্যরা স্পীকারের নির্দেশ তো মানলেনই না, বরঞ্চ এর ফলে পরিষদে শুরু হ'ল তুমুল বিক্ষোভ ও হট্টগোল। স্পীকারের আহ্বানে ই. পি. আর-এর একটি বাহিনীও সভাকক্ষের বাইরে টহল দিতে লাগলো। সকল সদস্যই তা' লক্ষ্য করলেন। ফলে উত্তেজনা বেড়েই চললো। আর এই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সদস্য দেওয়ান মাহবুব আলী স্পীকারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন, কিন্তু স্পীকার তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবটি নাকচ ক'রে দিলেন।

এতে ক্ষুব্ধ হয়ে একদল সদস্য স্পীকারের আসনের দিকে ছুটে গিয়ে উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে, অতএব কালবিলম্ব না ক'রে জনাব হাকিমকে সভাকক্ষ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আইন-সভার কর্মচারীরা স্পীকারকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে তাদের সঙ্গে উত্তেজিত সদস্যদের হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। হাতের সামনে যিনি যা পেলেন বিপক্ষের প্রতি তিনি তাই নিক্ষেপ করতে লাগলেন। চেয়ার, টেবিল, কালির দোয়াত, মাউথ পীচ সবকিছুই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগলো। শেখ মুজিবও এই সংঘর্ষ থেকে রেহাই পেলেন না। তিনিও আহত হলেন। অবস্থা আয়ত্তে আনতে না পেরে স্পীকার আবদুল হাকিম সভাকক্ষ ছেড়ে বাইরে গেলেন। ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী ছিলেন আওয়ামী লীগপন্থী।

স্পীকারের অনুপস্থিতিতে তাঁরই অধিবেশন চালানোর কথা। আর সেই জন্যই তিনি স্পীকারের শূন্য আসনের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে ক'রে ফিরে এসে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের পাশে বসে তিনি সভার কাজ চালাতে লাগলেন। মনোরঞ্জন ধর গ্রুপের কংগ্রেস সদস্য পিটার পল গোমেজ স্পীকার আবদুল হাকিমকে বদ্ধ উন্মাদ বলে একটি প্রস্তাব আনলে সদস্যদের ভোটে তা' গৃহীত হ'ল। এর পরই ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী পরদিন বিকেল ৪ টায় আবার অধিবেশন বসার কথা ঘোষণা করলে কৃষক-শ্রমিক দলের ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) তাঁর দিকে উত্তেজিতভাবে এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সরকার পক্ষের সদস্যরা ইউসুফ আলীর প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়লে তিনি তাল সামলাতে না পেরে ভূলুণ্ঠিত হন। পরে আওয়ামী লীগ সরকার স্পীকার জনাব হাকিমের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে চার্জশীট দাখিল করলেন।

২১শে সেপ্টেম্বর আবদুল হাকিম ও শাহেদ আলী উভয়ের অনুপস্থিতিতে স্পীকারের প্যানেলভুক্ত কৃষক-শ্রমিক পার্টি'র সৈয়দ আজিজুল হক আইন-সভার কাজ পরিচালনা করেন। ইতিমধ্যে সদস্যদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল যে যতদিন স্পীকার সমস্যার সমাধান না হয়, ততদিন স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার কেউ অ্যাসেম্বলীতে আসতে

পারবেন না। কিন্তু সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে কিছুতেই এ বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। বিরোধী দল অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক ও মুসলিম লীগপন্থীরা অবস্থা অনুকূল নয় দেখে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারকে বানচাল ক'রে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। স্থির করলেন, পরদিন ২৩শে সেপ্টেম্বর অধিবেশনে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়ে দেবেন —এতে যদি প্রেসিডেন্টের শাসনও জারী হয় তাতেও কুণ্ঠিত হবেন না। আসলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য তাঁরা মনে মনে প্রেসিডেন্টের শাসনই কামনা করছিলেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর এগিয়ে এলো। চারিদিকে থমথমে আবহাওয়া। সরকার দল বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, সেজন্য শাহেদ আলী নার্ভাস হয়ে পড়লেন। আওয়ামী লীগ নেতারা তাঁকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলেন। বেলা তিনটার সময় অধিবেশন বসলো। কিন্তু সভাকক্ষের প্রাঙ্গণে দেখা গেল ই. পি. আর. ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ইস্কান্দার মীর্জার সঙ্গে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আগে থেকেই বেশ যোগসাজস ছিল। মুসলিম লীগ তো রয়েছেই। সুতরাং পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনী যে তাঁর নির্দেশে মোতায়েন করা হয়েছিল এ বিষয়ে কারো কোন তথ্য জানা ছিল না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন কোন সাংবাদিকই অধিবেশনে যোগ দিতে সাহস পান নি। স্পীকার আবদুল হাকিম দেহরক্ষী নিয়ে সভাকক্ষে ঢুকবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁকে ঢুকতেই দেওয়া হ'ল না। বিকেল ৪টার সময় শাহেদ আলী অধিবেশন-কক্ষে যোগ দিয়ে স্পীকারের আসনে বসলেন। সরকার পক্ষ তাঁকে Acting Speaker হিসেবে স্বীকৃতি জানালেন।

কিন্তু বিরোধী দলের সদস্য জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, আবদুল মতিন, গোলাম সারোয়ার, মুহম্মদ-উন-নবী চৌধুরী প্রমুখ সমস্বরে দাবী জানালেন যে, শাহেদ আলী যেন কালবিলম্ব না ক'রে স্পীকারের আসন ত্যাগ করেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কৃষক-শ্রমিক দলের নেতা জনাব আবু হোসেন সরকার ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন, "আপনি যদি এই মুহূর্তে বেরিয়ে না যান তা' হ'লে আপনাকে আমরা খুন

করবো, আপনার বিবি ও বাচ্চারাসহ সারা পরিবার ধ্বংস হ'য়ে যাবে।" কিন্তু শাহেদ আলী এতটুকু বিচলিত হলেন না। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে স্পীকারের আসনে বসে রইলেন। বিরোধী দলের সদস্যরা অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে তাঁকে আক্রমণ করলেন। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড মারামারি। হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই নিয়েই চললো প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রমণ। শাহেদ আলী এবার সত্যই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। অকস্মাৎ তাঁর প্রতি কে যেন একটি কঠিন বস্তু নিক্ষেপ করলো। গুরুতর আহত হলেন তিনি। তাঁর ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সংজ্ঞা হারিয়ে স্পীকারের আসনেই লুটিয়ে পড়লেন শাহেদ আলী।

আইন-সভায় বিশৃঙ্খলা

বিরোধী কৃষক-শ্রমিক দল সভ্যতার রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে যে চরম বর্বরতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার প্রত্যক্ষ বিবরণ দিতে গিয়ে জনাব আবুল মনসুর আহমদ "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" গ্রন্থের ৫৫৬-৫৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ "ডেপুটি স্পীকারের সভাপতিত্বে হাউস শুরু হইল। হাউস শুরু হইল মানে অপজিশন দলের হট্টগোল শুরু হইল। শুধু মৌখিক নয়, কায়িক। শুধু খালি হাতে কায়িক নয়, সশস্ত্র কায়িক। পেপার ওয়েট, মাইকের মাথা, মাইকের ডাণ্ডা, চেয়ারের পায়া, হাতল ডিপুটি স্পীকারের দিকে মারা হইতে লাগিল। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া প্রচুর দেহরক্ষীর ব্যবস্থা ছিল। তাঁরা হাতে চেয়ারে বসা ডিপুটি স্পীকারকে অস্ত্র-বৃষ্টির ঝাপ্টা হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অপজিশনের কেউ কেউ মঞ্চের দিকে ছুটিলেন। তাদের বাধা দিতে আমাদের পক্ষেরও স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী দু' চারজন আগ বাড়িলেন। আমার পা ভাংগা ছিল। তাই না যোগ দিতে পারিলাম মারামারিতে, না পারিলাম সাবধানীদের মত হাউসের বাহিরে চলিয়া যাইতে। নিজ জায়গায় অটল অচল বসিয়া বসিয়া সিনেমায় ফ্রি স্টাইল বক্সিং বা স্টেডিয়ামে ফাউল ফুটবল দেখার মত এই মারাত্মক খেলা দেখিতে লাগিলাম। খেলোয়াড়দের চেয়ে দর্শক খেলা অনেক ভাল দেখে ও বুঝে। আমি তাই দেখিতে ও বুঝিতে লাগিলাম। যা দেখিলাম তাতে ভদ্রের ইতরতায় যেমন

ব্যথিত হইলাম, বুদ্ধিমানের মূর্খতায় তেমন চিন্তিত হইলাম। গণ-প্রতিনিধিরা বক্তৃতা ও ভোটের দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার দায়িত্ব লইয়াই আইন সভায় আসিয়াছেন। গুণ্ডামী করিয়া কাজ হাসেল করিতে আসেন নাই, ভাল কাজ হইলেও না। শিক্ষিত ভদ্র ও সমাজের নেতৃস্থানীয় বয়স্ক লোকেরাও কেমন করিয়া ইতরের মত গুণ্ডামী করিতে পারেন, চেনা-জানা, সু-পরিচিত, সমাজের শিক্ষিত ভদ্র সহকর্মী, ডিপুটি স্পীকারের উপর সমবেতভাবে মারাত্মক অস্ত্রের শিলা-বৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন তা' দেখিয়া আমার সারা দেহ-মন ও মস্তিষ্ক বরফের মতো জমিয়া গিয়াছিল। সে বরফের যেন উত্তাপ ছিল। আমারও রাগ হইয়াছিল। সে অবস্থায় আমার হাতে রিভালভার থাকিলে আমি নিজের আসনে বসিয়া আক্রমণকারীদের গুলি করিয়া মারিতে পারিতাম। ওরা সবাই আমার সহকর্মী, শিক্ষিত ভদ্রলোক। অনেকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু। তবু তাদের গুলি করিয়া মারিতে আমার হাত কাঁপিত না।"

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আহত শাহেদ আলীকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। পরে সরকার পক্ষের প্যানেলভুক্ত জিয়াউল হাসানকে স্পীকারের চেয়ারে বসিয়ে সভার কাজ চালানোর চেষ্টা করা হ'ল। কিন্তু বিরোধী দলের লোকেরা তথাপি হাঙ্গামা চালিয়েই যেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পুলিশের আই. জি. জনাব ইসমাইল একদল শসস্ত্র বাহিনীসহ সভাকক্ষে ঢুকে পড়ে বিরোধী দলের সদস্যদের শান্ত করতে চেষ্টা করলে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে পুলিশ সৈয়দ আজিজুল হক, ইউসুফ আলী চৌধুরী, গোলাম সারোয়ার প্রমুখ কয়েক জন সদস্যকে গ্রেফতার করে বাহিরে নিয়ে যান। পরে অবশ্য তাঁদেরকে জামিনে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

পরদিন ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক গভর্নর এক আদেশবলে আইন-সভার বৈঠক মুলতবী ঘোষণা করলেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর ('৫৮) একটি শোকাবহ ঘটনা সবাইকে বিপদগ্রস্ত ক'রে তুললো। হাসপাতালে জনাব শাহেদ আলী মৃত্যুবরণ করলেন।

ডেপুটি স্পীকারের মৃত্যু

সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক লজ্জার এবং করুণ অধ্যায় সংযোজিত হ'ল। আর এই মর্মান্তিক ঘটনার পর কারো অবিদিত রইল না যে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

তথাপি কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী যে-কোন মূল্যে এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করা হবে ব'লে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তাঁর এই প্রতিশ্রুতি দানের কথা শুনে ওদিকে ইস্কান্দার মীর্জা বোধহয় মুচকি মুচকি হাসছিলেন; কেননা তাঁর হাতে সুবর্ণ সুযোগ সত্যি সত্যি এসে গেছে। পূর্ব বাংলার রক্তারক্তি ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে এই মুহূর্তে ডিক্‌টেটরশীপ কায়েম করা উচিত।

কিন্তু জনাব নুনকে সরাবেন কিসের অজুহাতে? উপায় তিনি স্থির করতে লাগলেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধ বাধিয়ে দেবার চেষ্টায় অতঃপর তিনি বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠলেন। ফিরোজ খান নুনকে তিনি নির্দেশ দিলেন যে আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রিসভায় লোক নিতেই হবে। ফিরোজ খান নুনের পক্ষে এই নির্দেশ না মেনে কোন গত্যন্তর ছিল না।

সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীর আসন না দিলে জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগের সদস্যরা প্রথমে মন্ত্রিত্ব নিতে রাজী হলেন না। তবে এতে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে এমন আশঙ্কা ক'রে কয়েক দিন পরে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। শেখ মুজিব দলের কয়েক জন সদস্যকে নিয়ে এই উদ্দেশ্যে করাচী রওয়ানা হয়ে গেলেন। আওয়ামী লীগের জনাব জহির উদ্দিন, জনাব নূরুর রহমান, জনাব দিলদার আহমদ, জনাব আদেল উদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুর রহমান খান এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক কংগ্রেসের পিটার পল গোমেজ কেন্দ্রের নয়া মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। কেন্দ্রের মন্ত্রিসভা স্ফীতকায় হয়ে তার সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল ২৬ জন। অথচ জাতীয় পরিষদে তখন সদস্যসংখ্যা ছিল মোট ৮০ জন।

স্বাভাবিকভাবেই মালিক ফিরোজ খান নুন জাতীয় পরিষদে দুর্বল হয়ে পড়লেন। কৃষক-শ্রমিক পার্টি'র সৈয়দ আজিজুল হক-গোষ্ঠীর নেতা হামিদুল হক তাঁর পাশে দাঁড়াতে চাইলেন; তবে তিনি অর্থ, বাণিজ্য বা শিল্প—এই তিনটির যে কোন একটি দফতরের মন্ত্রিত্ব দাবী করলেন। নুন সাহেব দলের শক্তি বৃদ্ধির কথা ভেবে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই সঙ্গে সঙ্গে তাতে রাজী হয়ে গেলেন। তাঁকে দেয়া হ'ল অর্থ দফতরের ভার।

অথচ অর্থ দফতরের ভার আগে থেকেই সৈয়দ আমজাদ আলীকে দেয়া ছিল। ব্যাপারটা সুবিধাজনক হ'ল না ভেবে তিনি আবার মন্ত্রিসভা ভেঙে নতুন ক'রে গড়লেন। সেদিন ছিল ৭ই অক্টোবর। একই দিনে দু'দুবার ভাঙলেন আর গড়লেন। গড়লেন বটে, কিন্তু তাকে আর কোন দিন কাজে লাগাতে পারলেন না। পারলেন না তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে।

সংগ্রামী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়

(১৯৫৮-১৯৬৫)

১৯৫৮ সালকে পাকিস্তানের ইতিহাসে এক ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাল বলে চিহ্নিত করতে হয়। ভাগ্য-বিপর্যয় নেমে এলো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ললাটে।

সেদিন ছিলো ৭ই অক্‌টোবর। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুন তখন তাঁর মন্ত্রী-পরিষদের সদস্য নির্বাচন ও দফতর বন্টনের দুরূহ কাজে গলদঘর্ম। কিছুতেই তিনি শেষ মীমাংসায় উপনীত হ'তে পারছিলেন না। তার কারণ, তাঁর দলের এককভাবে কোনরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। যুক্তফ্রন্টের অধীনে তাঁকে মন্ত্রী-পরিষদ গঠন করতে হয়েছিল, কিন্তু কোয়ালিশন দলের প্রতিটি সদস্যই মন্ত্রী হতে চান। নুন সাহেবও কাউকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস পাচ্ছেন না। আগেই বলা হয়েছে যে, বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের ৮০ জন সদস্যের ২৬ জনকেই মন্ত্রিত্বের পদ দিতে হয়েছিল। এমন কি একই দফতর দু'জনকে দেবার মত কেলেঙ্কারীও তিনি করেছিলেন। ফলে সেদিন সেই অক্‌টোবরে মালিক নুনকে দু'দু'বার মন্ত্রিসভার রদ-বদল করতে হয়েছে। এর কারণ এই যে, ঐদিন সকাল বেলায় প্রধান মন্ত্রী নুন তাঁর মন্ত্রিসভার যে দফতরগুলো পুনর্বন্টন করেছিলেন তাতে

নুন-মন্ত্রিসভা গঠনে সংকট

আওয়ামী লীগ-পন্থী মন্ত্রীদের ভাগে কতকগুলো গুরুত্বহীন পদ দেয়া হয়েছিল। এবং এরই প্রতিবাদে তাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

বাধ্য হয়ে সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় আবার দফতরগুলোর রদবদল করতে হয়। কিন্তু এতেও আওয়ামী লীগের প্রতি সুবিচার করা হ'ল না। অবশ্য এবার আওয়ামীলীগ পন্থীরা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের স্বার্থে, নুন-মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করলেন না। কারণ তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন, ফিরোজ খান নুনের মন্ত্রিসভার যদি পতন ঘটে তা' হ'লে পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটবে। সেদিন এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে আওয়ামী লীগের কর্ণধার শেখ মুজিবুর রহমান করাচীতে বলেছিলেনঃ

মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে শেখ মুজিব

"পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বন্টন নিয়ে প্রধান মন্ত্রী ফিরোজ খান নুন তাঁর নিজের দলের মধ্যে প্রচণ্ড বাধা ও চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন। এই বাধা এত প্রবল এবং এমনই ধরনের যে, এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের আর মন্ত্রিসভায় থাকা নিরর্থক, কিন্তু এ সত্ত্বেও আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের আগে নুন সরকার থেকে আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে আমরা দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার কোন সুযোগ প্রতিক্রিয়াশীলদের দেবো না।"

[গতিবেগ চঞ্চল বাংলাদেশঃ মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিবঃ
অমিতাভ গুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৩১৯]

কিন্তু এতদসত্ত্বেও নুন সাহেবের শেষরক্ষা হ'ল না। তাঁর প্রধানমন্ত্রী থাকবার দুর্বার লোভ ধ্বসে গেল। কারণ প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন (Martial Law) জারী ক'রে তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন। এবং সেই সঙ্গে চলতি সংবিধানও নাকচ ক'রে দিলেন তিনি। মীর্জা এর জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। আর মীর্জার পশ্চাতে একজন জাঁদরেল সৈনিক। সৈনিকের পশ্চাতে পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য। পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হ'ল। সৃষ্টি হ'ল পাকিস্তানের ইতিহাসে এক জঘন্যতম এবং অন্ধকারময় অধ্যায়। সেদিন ছিল ৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল।

সেদিনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মঞ্চস্থ নাটকেরও একটি নেপথ্য কাহিনী রয়েছে, যার কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপদান করেছিলেন পাকিস্তানের কালো দশকের একচ্ছত্র অধিপতি জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান।

আইয়ুব খান কিভাবে নেপথ্যে থেকে ধীরে ধীরে এই নাটকের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন তার ব্যাখ্যা তিনি আত্মজীবনীতেই দিয়েছেন ঃ

আইয়ুব খানের আবির্ভাব

"দিনটি ছিল ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৮ সাল। আমি আমার রেলগাড়ির সেলুনের মধ্যে যখন অবস্থান করছিলাম, তখন জানতাম যে, শীঘ্রই দেশে একটা যুগ শেষ হয়ে আসছে। আমি করাচী যাচ্ছিলাম। সেখানে একটি মর্মন্তুদ সুদীর্ঘ রাজ নৈতিক প্রহসন ধীরে ধীরে শেষ হচ্ছিল। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা আমাকে জানিয়েছিলেন যে, পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং তিনি কর্মপন্থা গ্রহণ করা স্থির করেছেন। বহু বৎসর ধরে আমরা সবাই আশা করেছিলাম যে, দেশের রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবেন। তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেমিক লোক ছিলেন, গুণবান এবং দক্ষ ব্যক্তিও ছিলেন এবং কায়েদে আযমের সেই সব নিকট-সহচররাও ছিলেন যাঁরা দূরদৃষ্টি, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং অনড় সংকল্প নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। পরবর্তীকালেও তাঁরা দেখে-ছিলেন, কি করে লিয়াকত আলী খান দঢ়তা এবং সাহসিকতার সাথে রাষ্ট্রীয় অর্ণবপোতকে অশান্ত স্রোতের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছিলেন। সার্কাসের দড়াবাজদের মত এক এক সময় এক এক জন লাফ দিয়ে মধ্যের দোলনার আড়টিকে ধরে ফেলে একটু ঝুলে উজ্জ্বল বাতির আলোকের মধ্যে এসে উপস্থিত হচ্ছিলেন, আবার পর মুহূর্তে ষড়যন্ত্র ও সামর্থ্য হীনতার জালের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলেন।"

[সৈয়দ আলী আহসান অনূদিত 'প্রভু নয় বন্ধু', ঢাকা, ১৯৬৮ পৃঃ ৯০]

এবং সেই সাথে সাথে আইয়ুব খান যে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল পরি-কল্পনার ছবি মনে মনে আঁকছিলেন, তা' না বললেও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লে-ষণে তা' ধরা পড়ে। আর সে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার গোপন উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি পরদিন অর্থাৎ ৫ই অক্টোবর গিয়েছিলেন প্রেসি-ডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার নিকট। আইয়ুব খান নিজেই লিখেছেন ঃ

"I arrived in Karachi on 5th October. Yahya, Hamid and one or two other officers had proceeded me. I went to see General Iskandar Mirza. He was sitting on the lawn, broading, bitter and desperate. I asked him, "Have you made up your mind, Sir ?" "Yes," he replied. "Do you think it is absolutely necessary ?" "It is absolutely necessary", he said, firmly. My reaction was that it was very unfortunate that such a desperate stage had been reached, necessitating drastic action. And it was not pleasent to get involved in it, but there was no escape. It was the last bid to save the country."

[*Friends Not Masters* : Mohammad Ayub Khan, Ox. Un. Preess, 1967, P. 70.]

দু'জনে অনেক শলাপরামর্শ করলেন। তারপর দেশকে 'রক্ষার' খাতিরে ৭ই অক্‌টোবর রাত আটটায় নাটকীয়ভাবে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী ক'রে দিলেন। আইয়ুব খানকে নিযুক্ত করা হ'ল প্রধান সামরিক আইন পরিচালক (Chief Martial Law Administrator), পূর্বাঞ্চলের সামরিক আইন পরিচালক হলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জি. ও. সি. মেজর জেনারেল ওমরাও খান।

সামরিক আইন জারী

অথচ সেদিনই—সামরিক আইন জারীর কিছু পূর্ব মুহূর্তে সন্ধ্যা বেলায় ফিরোজ খান নুনের মন্ত্রিসভার সদস্যদের আপ্যায়নের জন্য মীর্জা তাঁর করাচী বাসভবনে একটি রঙিন তরল পানীয়ের পার্টি'র আয়োজন করেছিলেন। আয়োজন করেছিলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রাপথকে সুগম করবার জন্য। গণতন্ত্রকে নিয়ে কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

আইয়ুব খান আটঘাট বেঁধেই প্রধান সামরিক আইন পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন—যাতে ক'রে কোনরূপ সমালোচনার সম্মুখীন যেন তাঁকে না হতে হয়। এর জন্য তিনি মীর্জা সাহেবের কাছ থেকে লিখিতভাবে কয়েকটি শর্তও আদায় করে নেন। এই শর্তের মূল কথা হ'ল—সমস্ত ঘটনা যেন মীর্জা সাহেবের একক সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি বলে ঘোষণা করা হয়—এতে তাঁর (আইয়ুবের) কোন ভূমিকা নেই।

এইমর্মে আইয়ুব খান ফিরোজ খান নুনের কাছে ইস্কান্দার মীর্জাকে দিয়ে একটি চিঠিও লিখিয়ে নেন। চিঠিটি হুবহু এখানে উদ্ধৃত হল :

President's House
Karachi,
7th October, 1958

My dear Sir Firoze,

মীর্জার ভাগ্য বিপর্যয় ও আইয়ুবের ক্ষমতা দখল

After very careful searching of the heart I have come to conclusion that the country can not be sound unless I take full responsibility and take over the administration. The constitution of the 3rd March, 1956 is not only unworkable but dangerous to the integrity and solidarity of Pakistan. If we go on trying to work it we will have to say good bye to Pakistan.

As head of the state, therefore, I have decided to abrogate the Constitution, take over all powers, dissolve the Assemblies, the Parliament and the central and provincial Cabinets. My only regret is that this drastic revolutionary action I have to take while you were Prime Minister. By the time you get this letter, Martial-Law will come into operation and General Ayub, whom I have appointed as the Chief Martial-Law Administrator, will be in position.

For you personally, I have great regard and will do all that is necessary for your personal happiness and well-being.

Yours sincerely,
Iskandar Mirza.

[গতিবেগ চঞ্চল বাঙলাদেশ : মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব, অমিতাভ গুপ্ত, পৃঃ ৩২৪]

সেদিন পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন করাচীতে। এঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ—সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব, ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) প্রমুখ নুন-

মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচনের আলোচনা বৈঠকে যোগদানের জন্য ওখানে গিয়েছিলেন। আতাউর রহমানও কয়েকদিন আগে ইকোনমিক কাউন্সি-লের মিটিংয়ে যোগ দিতে গিয়ে করাচীতে অবস্থান করছিলেন। শুধুমাত্র নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৃষক-শ্রমিক পার্টির হামিদুল হক চৌধুরী ও আওয়ামী লীগের আবুল মনসুর আহমদ সাহেব ঢাকায় ছিলেন।

সামরিক আইন জারীর খবর পেয়ে সবাই হতচকিত হয়ে পড়লেন। মনসুর সাহেব দৌড়িয়ে গেলেন প্রাদেশিক গভর্নর সুলতান উদ্দিন আহমদ সাহেবের বাসায়। গভর্নর সাহেবও তাঁর পরিণাম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। জানতেন না তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্ভাবনার কথা।

শেখ মুজিব জানতে পারলেন ৮ই অক্টোবর ভোরবেলা। আগের দিন অর্থাৎ ৭ই অক্টোবর রাতে তিনি ঢাকার পথে আকাশে উড়েছিলেন। পরদিন তেজগাঁ বিমান বন্দরে নামতেই সহকর্মী বন্ধুরা সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্র তাঁর সামনে তুলে ধরলেন। কাগজ থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সেখানে জমাট বাঁধা অন্ধকার মেঘ। আরো দেখলেন পূর্বদিক থেকে একটা ঝড়ের প্রচণ্ড বেগ সে অন্ধকার মেঘকে গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছে। আপন অন্তরেও তিনি অনুভব করলেন এক সুউষ্ণ অথচ চঞ্চল গতিবেগ।

এরপর কি ঘটতে পারে শেখ সাহেবের তা' অজানা ছিল না। তিনি জানতেন—অচিরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। কারণ রাজনৈতিক নেতাদের কারাপ্রাচীরের বাইরে রেখে কোন দেশে নিশ্চিন্তে মিলিটারী ডিক্‌টেটরশীপ চালানো সম্ভবপর নয়। অতএব, তাঁকেও কারাগারে যেতে হবে। তার আগে বাবা-মা-আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করার পালা শেষ করা দরকার। কে জানে আবার কতদিনের জন্যে তাঁকে সমাজ-সংসারের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে। অতএব বাড়ীর দিকেই রওয়ানা দিলেন তিনি।

যথাসময়ে প্রাদেশিক গভর্নর সুলতান উদ্দিন আহমদের ভাগ্যের পতন ঘটল। নতুন একজন গভর্নর হয়ে এলেন, নাম—জাকির হোসেন। ভদ্রলোক অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর কৃপায় একদা প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের ডি.আই. জি. হতে পেরেছিলেন—যে পদ ব্রিটিশ

রাজত্বে ভারতীয়দের পক্ষে ছিল বিলাসী বাসনা। দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব বাংলার আই. জি. পুলিশ হয়েছিলেন। পরে সে পদ থেকে অবসর নেবার পর খাজা নাজিমুদ্দিনের হাতেপায়ে ধরে পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। তার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যখন তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করছিলেন—সে সময় তাঁর হঠাৎ খায়েশ হয়েছিল যে, তিনি রাজনীতি করবেন। সে উদ্দেশ্যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের কাছে এসে তাঁকে গুরুজ্ঞানে আওয়ামী লীগে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে আগামী ইলেকশনের নমিনেশনের পদপ্রার্থী হলেন। খান সাহেব সে বিষয়ে কোনরূপ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা প্রকাশ করেছিলেন।

এই সেই জাকির হোসেন—যিনি কয়েক মাস আগে সংসদ সদস্যের নমিনেশনের জন্য আওয়ামী লীগের নিকট ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে গিয়েছিলেন—তিনি হলেন প্রদেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

তাঁর এই গভর্নর পদ প্রাপ্তিরও একটি কারণ আছে। জাকির হোসেন যখন পুলিশের আই. জি. ছিলেন, তখন আইয়ুব খানও ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের জি. ও. সি.। এ সময় এই দুই ভবিষ্যৎ নেতার মধ্যে বেশ দহরম-মহরম গড়ে উঠেছিল। আইয়ুব খান প্রধান সামরিক-প্রশাসক হয়েই পুরোনো বন্ধুর কথা স্মরণ করলেন। তিনি যখন ইস্কান্দার মীর্জার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছিলেন, তখনই এই জাকির সাহেবকে তলব করেন। জাকির হোসেনই একমাত্র ভাগ্যবান বাঙালী যিনি আইয়ুব-ইস্কান্দারের গোপন চক্রান্ত সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

জাকির হোসেন গভর্নর হয়েই পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ হয়তো তিনি আইয়ুব খানের কাছ থেকেই পেয়ে থাকবেন। যদিও প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা কয়েকদিন পরে এক প্রশ্নোত্তরে এ গ্রেফতারের জন্য প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছানুযায়ী হয়েছে বলে জানিয়েছেন। ঢাকায় পাইকারীভাবে এই গ্রেফতার চললো। ১০ই অক্টোবর রাত দশটার সময় আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের বাসায় গিয়ে তাঁর সারা বাড়ী তছনচ করে বে-আইনীভাবে তাঁকে গ্রেফতার

করা হ'ল। গ্রেফতার করার সময় ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাঁকে জানান যে, তাঁকে নিরাপত্তা আইনে নয়—দুর্নীতি দমন আইনে গ্রেফতার করা হচ্ছে।

মনসুর সাহেবের মত পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সকল নেতাকেই গ্রেফতার করা হ'ল। বলা বাহুল্য, শেখ মুজিবও বাদ পড়লেন না।

শেখ মুজিবসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার

বাদ পড়লেন না বর্ষীয়ান নেতা মওলানা ভাসানীও। মওলানা সাহেবকে গ্রেফতার করা হয় ৮ তারিখে। তিনি নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারকৃত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন, হামিদুল হক চৌধুরী, প্রাক্তন সোহরাওয়ার্দী ক্যাবিনেটের শ্রমমন্ত্রী জনাব আবদুল খালেক, শিল্প দফতরের সেক্রেটারী জনাব আসগর আলী শাহ্ সি.এস.পি., পি.ডব্লু.ডি.র চীফ ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, বাণিজ্য দফতরের আণ্ডার সেক্রেটারী জনাব আমিনুল ইসলাম সি.এস.পি., আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাক্তন পরিষদ সদস্য জনাব নুরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

শেখ সাহেব ও মনসুর সাহেবসহ এঁদের সবাইকে এস.ডি.ও. সাহেবের এজলাসে হাজির করা হলে তাঁরা বে-আইনীভাবে আটকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জামিনের আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু এস.ডি.ও. সাহেব সে আবেদন নাকচ করে দেন। ফলে সবাইকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের পুরোনো হাজতে বন্দী ক'রে রাখা হ'ল।

মার্শাল-ল' জারী করার কয়েকদিন পরেই জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান ঢাকায় এলেন। উদ্দেশ্য—সামরিক শাসন জারীর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। তাঁর সম্মানে হোটেল শাহবাগে একটি নাগরিক সম্বর্ধনার আয়োজনও করা হয়েছিল।

ওদিকে আইয়ুবকে সামরিক প্রশাসক-এর প্রধান করার পর থেকে ইস্কান্দার মীর্জার চোখের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। তিনি ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিলেন, অবস্থাচক্র তত সহজে মোড় নিল না। আইয়ুব খানকে অনুগত রেখে পাকিস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি হবার বাসনা ছিল তাঁর। কিন্তু আইয়ুব সব কিছুতেই হুকুমদারী শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। তা' ছাড়া তাঁর কার্যকলাপেও মীর্জা সাহেবের মনে সন্দেহের উদ্রেক হ'ল।

বাধ্য হয়ে আইয়ুব খানকে সরাবার মতলব আঁটলেন তিনি। বিমান বাহিনীর কমাণ্ডারের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইলেন মীর্জা সাহেব। মতলবটা আইয়ুব খানের অগোচরে থাকল না। তিনি তখন ঢাকায়—তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। সামরিক বাহিনীর অফিসারেরাও মীর্জা সাহেবের বিরুদ্ধে আইয়ুব খানকে উস্‌কিয়ে দিলেন। আইয়ুব একবার ইস্কান্দার মীর্জার কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক ক'রে দিয়ে এলেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে মীর্জা সাহেব তাঁর শেষ চাল চাললেন। কতিপয় সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারকে হাত করার উদ্দেশ্যে

ইস্কান্দার মীর্জার মন্ত্রিসভা গঠন

তিনি তাঁদেরকে মন্ত্রিত্বের পদের উৎকোচ দিয়ে ২৫শে অক্‌টোবর একটি মন্ত্রিসভা গঠন করলেন,—রইলেন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তিনি এবং প্রধানমন্ত্রী করলেন জেনারেল আইয়ুবকে। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার সে মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল তাঁরা হলেন ঃ

প্রধানমন্ত্রী—জেনারেল আইয়ুব খান

অন্যান্য মন্ত্রী ঃ

১। পুনর্বাসন মন্ত্রী—লেঃ জেনারেল আযম খান
২। স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী—লেঃ জেনারেল এ. বাকী
৩। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী—লেঃ জেনারেল কে. এম. শেখ
৪। শিল্প ও পূর্ত মন্ত্রী—আবুল কাশেম খান
৫। শিক্ষা ও তথ্য মন্ত্রী—হাবিবুর রহমান
৬। পররাষ্ট্র মন্ত্রী—মনজুর কাদির
৭। আইন মন্ত্রী—বিচারপতি মহম্মদ ইব্রাহীম
৮। যোগাযোগ মন্ত্রী—এফ. এম. খান
৯। অর্থ মন্ত্রী—মোহাম্মদ শোয়েব
১০। কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী—হাফিজুর রহমান
১১। বাণিজ্য মন্ত্রী—জুলফিকার আলী ভুট্টো।

কিন্তু এতেও ইস্কান্দার মীর্জা শেষরক্ষা করতে পারলেন না। পারলেন না তাঁর প্রেসিডেন্টের পদকে টিকিয়ে রাখতে। ২৭শে অকটোবর

ইস্কান্দার মীর্জা আইয়ুব খান ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে শপথ গ্রহণ করান।

ইস্কান্দার মীর্জার ভাগ্যবিপর্যয়

কিন্তু শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দুই ঘন্টা পর মীর্জা সাহেব দেখতে পেলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আইয়ুব খানের তিন সৈনিক দূত। অতএব, ইস্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতা ছাড়তে হ'ল। প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হ'ল তাঁকে। দস্তখত লিখে দিতে হ'ল যে, তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছেন। এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে আইয়ুব খানের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করছেন। শুধু পদত্যাগই নয়, আইয়ুবের নির্দেশে পরে সপরিবারে তিনি দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন।

২৭শে অক্টোবর মধ্যরাত্রি থেকে আইয়ুব খান পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হয়ে বসলেন। সেই সঙ্গে তিনি নিজেকে সামরিক বাহিনীরও সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করলেন। সারা দেশে তাঁর সামরিক অবস্থানকে মজবুত করা হ'ল। আইয়ুব খান ক্ষমতায় গিয়েই রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শুরু ক'রে দিলেন। তাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ—তাঁরাই যে দেশটাকে সমূলে ধ্বংস করতে বসেছিলেন একথা তিনি জোরের সাথে চিৎকার ক'রে বলতে লাগলেন। এবং আরো বললেন, রাজনৈতিক নেতাদের নির্মূল না করলে দেশকে টিকিয়ে রাখা যাবে না।

আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল

বলা বাহুল্য, এটা তাঁর ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবার একটা চাল মাত্র। এ ব্যাপারে জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য আইয়ুব খান কতকগুলো পদক্ষেপও গ্রহণ করলেন ঃ

॥ এক॥ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দোকানদার-ব্যবসায়ীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত ক'রে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক করা হ'ল।

॥ দুই ॥ দুর্নীতি দমনের নামে মারপিট ও গ্রেফতার করা হ'ল। এই উদ্দেশ্যে আইন জারী ক'রে প্রশাসনিক ও ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে কিছু রদবদল ঘটানো হ'ল।

॥ তিন ॥ দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তিনি গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। বারবার বলতে লাগলেন—গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি পুনরায় সেনাবাহিনীতে ফিরে যাবেন।

স্বভাবতঃই আইয়ুব খানের এইসব কার্যকলাপ ও প্রতিশ্রুতি প্রদানে জনগণ তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপন ক'রে ফেলল। বিশেষ ক'রে পূর্ব বাংলায় তিনি প্রাথমিকভাবে বেশ কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন।

এর কারণও আছে। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক কোন্দল এ দেশের জনগণকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে যুক্তফ্রন্টের নেতাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই মুহূর্তে আইয়ুব খানের আকস্মিক কার্যকলাপেও তাঁর কথাবার্তায় বিশ্বাস ক'রে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অভিনন্দন জানাল। জনগণের একটি অংশ এতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও দেশের বিবেকবান বুদ্ধিজীবী ভবিষ্যতের দুর্যোগময় দিনগুলোর কথা চিন্তা ক'রে শিউরে উঠলেন। যাহোক, সুযোগ বুঝে আইয়ুব খান তাঁর জাল ফেলতে শুরু করলেন। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে আগেই নিষিদ্ধ ক'রে দেয়া হয়েছিল। এবার সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ ক'রে দেয়া হ'ল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৫৯ সালের ৭ই আগস্ট দুটো আইনও জারী করলেন।

॥ এক ॥ পোডো (Public Office Disqualification Order)

॥ দুই ॥ এবডো (Elective Bodies Disqualification Order)।

এই আইনের আওতাভুক্তদের মধ্যে জনাব হোসেন শহীদ সোহরা-ওয়ার্দীও ছিলেন।

এর পরবর্তী ঘটনাগুলোতে জনগণের তন্দ্রা ছুটে গেল। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে থাকল যে, আইয়ুব খানের আসল উদ্দেশ্য কোন্ পথে।

২৬শে অক্টোবর ('৫৯) জেনারেল আইয়ুব খান নিজেকে ফিল্ড মার্শাল হিসেবে ঘোষণা করলেন। পরদিন অর্থাৎ ২৭শে অক্টোবর তিনি পালন কর-লেন তাঁর "বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী"। আর এই বার্ষিকী উপলক্ষে পেশ করলেন একটি মহান (?) পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাকে তিনি অভিহিত করেছেন Basic Democracy বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র নামে। তিনি সদম্ভে ঘোষণা করলেন, 'It has come to stay'—অর্থাৎ এই গণতন্ত্র টিকে থাকতেই এসেছে।

মৌলিক গণতন্ত্র

আইয়ুবের এই নবপ্রবর্তিত গণতন্ত্রের প্রণয়নকারী হলেন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতাকে স্থায়ী ক'রে রাখবার জন্য উক্ত অধ্যাপকদের কাছে পরামর্শ চান—তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই অদ্ভুত গণতন্ত্র প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

নির্দিষ্ট সময়ে এই মৌলিক গণতন্ত্রের আদেশ জারী করা হ'ল। খান সাহেবের চেলারা এ আদেশকে স্বাগত জানিয়ে খুব হৈ-চৈ শুরু ক'রে দিল। এই গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য হ'ল—যেহেতু পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত এবং যেহেতু পাকিস্তান একটি গরম ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, সেহেতু এদেশের মানুষ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম। তারা শুধু স্থানীয় এলাকা থেকে একজন ক'রে উভয় প্রদেশে মোট ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত করতে পারবেন। এবং ঐ আশি হাজার গণতন্ত্রীই নির্বাচিত করবেন দেশের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য।

এই গণতন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রশাসন সংস্থা ও তার কর্ম-কর্তাদের পদের নাম পরিবর্তন করা হ'ল। যেমন, ইউনিয়ন বোর্ড হ'ল ইউনিয়ন কাউন্সিল, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড—ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, প্রেসিডেন্ট হলেন চেয়ারম্যান ইত্যাদি।

আইয়ুব খান ক্ষমতা হাতে নেয়ার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি দেশে গণতন্ত্র দেবেন—তবে সে গণতন্ত্র কোন্ পদ্ধতির হবে সে বিষয় তিনি একবারও উচ্চারণ করেন নি। এক্ষণে তাঁর প্রতিশ্রুত গণতন্ত্র (?) প্রদান করলেন।

ওয়াদা করেছিলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। সে উদ্দেশ্যে (!) তিনি ১৯৬০ সালের ১১ই জানুয়ারীতে একটি সাধারণ নির্বাচনও দিলেন। এতে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হ'ল। নিন্দুকেরা বলতে থাকলো ৮০ হাজার ফেরেশ্‌তা পয়দা করা হ'ল।

এর পর মৌলিক গণতন্ত্রীরা একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করলেন। কিন্তু কাকে? আইয়ুব সবিনয়ে বললেন, 'যদি আপত্তি না থাকে তা' হ'লে আমিই 'জনপ্রতিনিধিত্বশীল' সরকারের প্রেসিডেন্ট হতে পারি।' অর্থাৎ

তাঁর প্রতি আস্থা আছে কি-না তা' জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উভয় প্রদেশে ব্যাপক গণসংযোগ অভিযান চালালেন। ১৯৬০ সালের ২১শে জানুয়ারীতে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন।

আসলে আইয়ুব খানের এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক গণতন্ত্রী-দেরকে বোঝানো যে, এই গণতন্ত্র তাঁদেরকে কি সুবিধা দিতে পারে। পরবর্তীকালে আইয়ুব খানের এই শাসন-ব্যবস্থা তাঁদেরকে কি সুবিধা দিয়েছিল তা' যথাসময়ে আলোচনা করা যাবে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হ'ল। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ছিল না কারণ সে রকম কোন সুযোগ তিনি দেন নি।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রহসন

মৌলিক গণতন্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ ছিল শুধুমাত্র তাঁর প্রতি আস্থা আছে কি-না তা 'হ্যাঁ' অথবা 'না'-সূচক ব্যালটের মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে হবে।

স্বাভাবিকভাবেই 'হ্যাঁ' এর আস্থাভাজন হয়েছিলেন তিনি। মৌলিক গণতন্ত্রীরা জানতো, 'না' এর বাক্সে ভোট দিলেও আইয়ুব খানের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ তাঁকে নির্বাচিত না করা হলে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা থেকে সরাবার সাহস কারো হবে না, উপরন্তু তাঁরা অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। আইয়ুব খান এই নির্বাচন প্রহসনে শতকরা ৯৫ ভাগ ভোট পেলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে তিনি প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। পরদিন জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট দেশকে একটি শাসনতন্ত্র দেবার কথা ঘোষণা করলেন।

এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি শাসনতন্ত্র কমিশনও গঠন করা হ'ল। যার অন্যতম সদস্য ছিলেন বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী। বিচারপতি চৌধুরী তখন ঢাকা হাইকোর্টের একজন প্রথিতযশা আইনজীবী ছিলেন।

আইয়ুব খানের এই নয়া শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কিছু বলে রাখা ভাল। যদিও এই শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্য একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল,

তবু কমিশনের সদস্যরা দেশ ও জাতির পক্ষে যা কল্যাণকর তার উপযোগী শাসনতন্ত্র তৈরী করতে পারেন নি। কমিশন জনমত যাচাই ক'রে পার্লামেন্টারী ধরনের শাসন-ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন। ১৯৬১ সালের ২৯শে এপ্রিল তাঁদের রিপোর্ট সই ক'রে ৬ইমে তা' প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নিকট অনুমোদনের জন্য দেয়া হ'ল। কিন্তু আইয়ুবের তা' মনঃপূত হ'ল না। না হবারই কথা। কারণ এতে তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির সম্ভাবনা থাকতে পারে। তাই শাসনতন্ত্র কমিশনের এই রিপোর্ট বানচালের উদ্দেশ্যে তিনি একটি 'ক্যাবিনেট সাবকমিটি' গঠন করলেন— যাতে ক'রে তাঁর একাধিপত্যকে বজায় রাখা যায়।

আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন

এই ক্যাবিনেট সাবকমিটির পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যবৃন্দ প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ইচ্ছানুযায়ী প্রেসিডেন্সিয়াল ধরনের সরকারের পক্ষেই ওকালতি করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে বর্তমান পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো, মঞ্জুর কাদির ও মোহাম্মদ শোয়েব-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু উক্ত কমিটির অন্যতম সদস্য কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম তীব্র মতপার্থক্যের সম্ভাবনাকে এড়ানোর জন্য উক্ত কমিটির বৈঠকে যোগ না দিয়ে রাওয়ালপিণ্ডি ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন।

এ সময় (মে, ১৯৬১) পূর্ব বাংলায় এসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বাঙালীদের জন্য মুখে বেশ দরদ প্রকাশ করলেন। এবং তাদের যাবতীয় সমস্যাবলীর আশু প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করলেন। এরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। কারণ তিনি জানতেন যে, এ অঞ্চলের লোকেরা তাঁর প্রেসি-ডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসনতন্ত্র সহজভাবে গ্রহণ করবে না। আর গ্রহণ না করার অর্থই পূর্বাঞ্চলে আন্দোলন গড়ে ওঠা। বাঙালীদের আন্দোলন সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। কারণ ১৯৪৮ সালে কায়েদে আযমকে যখন চরম-ভাবে অপমান ক'রে বাঙালীরা ভাষার জন্য চারদিকে আগুন জ্বালিয়েছিল, আইয়ুব খান তখন ঢাকাতেই ছিলেন। বাঙালীর আন্দোলনকে তাঁর বড় ভয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আইয়ুব খান যখন ঢাকায় এলেন তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন লেঃ জেনারেল আযম খান—যিনি

ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক ঘোষিত আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। জাকির হোসেন সাহেব হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। গভর্নর থাকাকালীন আযম খান পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের প্রতি যথেষ্ট আন্ত-রিকতা ও সহানুভূতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নিজে একজন উর্দুভাষী হয়েও বাঙালীদের সাথে তিনি একাত্ম হয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। আর এটাই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়াল। তাঁর জনপ্রিয়তায় আইয়ুব ঈর্ষান্বিত হলেন—ফলে তাঁকে ঢাকা ছাড়তে বাধ্য করা হ'ল। তিনি ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬২ সালের ১১ই মে পর্যন্ত এই দু'বছর মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন। এই দু'বছরে তিনি বাঙালীর হৃদয় জয় করেছিলেন। এবং তাঁর বিদায়ের সময় জনগণ তাঁকে অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে বিদায় দিয়েছিল।

আইয়ুব খান ঢাকায় এসে প্রাদেশিক গভর্নরদের একটি কনফারেন্সে শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত খসড়াটি অনুমোদন করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ থেকে দেশের নয়া শাসনতন্ত্র চালু করা হবে। আরো ঘোষণা করা হ'ল যে এপ্রিল মাসে (১৯৬২) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং জুন মাসে সামরিক আইন উঠে যাবে।

সোহরাওয়ার্দী তখনও জেলের বাইরে। মাঝে মাঝে ঢাকায় আসেন হাইকোর্টে মামলা-মোকদ্দমার সওয়াল করতে। তবে ১৯৬০ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তাঁর বিরুদ্ধে যে 'এবডো' নোটিশ জারী করা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। শহীদ সাহেব প্রথমে এটাকে মেনে নিতে পারছিলেন না, ফলে তাঁকে ট্রাইব্যুনালের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যদিও ট্রাইব্যুনালে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন, তথাপি তাঁকে 'এবডো'র আওতা থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয় নি।

শেখ মুজিবের মুক্তি

ইতিমধ্যে ১৪ মাস কারাভোগের পর ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করলেন। মুক্তি দেয়ার সময় তাঁর বিরুদ্ধে কতকগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। যেমন ঢাকা ত্যাগ করলে তাঁকে গন্তব্য সম্পর্কে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে

জানাতে হবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

তা' ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ সব সময় তাঁর পেছনে ছায়ার মত থাকতো। এ বিষয়ে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে সতর্ক করে দিলেও তিনি তা' উড়িয়ে দিতেন। জনগণের কাছে শেখ মুজিবকে হেয় করার উদ্দেশ্যে সরকার তাঁর বিরুদ্ধে অপমানজনক কয়েকটি মামলাও দাঁড় করালেন। শেখ মুজিব মন্ত্রী হিসেবে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার বা নিজের পদমর্যাদার বলে আর্থিক সুবিধা অর্জন করেছেন, এই অভিযোগের ভিত্তিতে আনীত মামলা থেকে ঢাকা বিভাগের স্পেশাল জজ এ. এস. এম. রাশেদ তাঁকে অব্যাহতি দিলেন। এই মামলায় শেখের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তারিখটি ছিল ১৯৫৯ সালের ৩০শে মে.

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা

এর পরে ১২ই জুলাই লেঃ কর্নেল আই. এ. শামিমের সভাপতিত্বে গঠিত চার নম্বর স্পেশাল মিলিটারী কোর্ট শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতি ও দুর্নীতিতে সহায়তা করার মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার অভিযোগে ঐ মামলার অন্যতম সাক্ষী আল্ আমিন ইণ্ডাস্ট্রির পার্টনার আনোয়ার আলী ও মুজিবর রহমান চৌধুরীকে যথাক্রমে চার ও দু' বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে আসামীরা স্বীকার করেন যে, পুলিশের প্রচণ্ড চাপে পড়েই তাঁরা শেখের বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁরা বিচারপতির কাছে তাঁদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে করুণা ভিক্ষাও করেছিলেন।

এরপরও শেখ মুজিব রেহাই পেলেন না। ১৯৫৯ সালের ২২শে আগস্ট ঢাকা জেলার ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশান্স জজ আবদুল মওদুদের আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী পদমর্যাদা অপব্যবহারের মামলা হয় এবং এই মামলায় জজ সাহেব ১২ই সেপ্টেম্বরে তাঁকে দু'বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানায় (অনাদায়ে আরো ছয় মাস জেল) দণ্ডিত করেন।

এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব হাইকোর্টে আপীল পেশ সাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন জানালে ২০শে সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের

বিচারপতি জনাব ইদ্রিস অবকাশকালীন বেঞ্চে তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। এর পরে ২১শে জুন (১৯৬১) ঢাকা হাইকোর্টে বিচারপতি আসির ও বিচারপতি আলীকে নিয়ে গঠিত এই মামলার শুনানী ডিভিশন বেঞ্চে আরম্ভ হয়। ঐদিন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখের পক্ষে পাঁচ ঘন্টা ধরে সওয়াল করেন। আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র চালু, নির্বাচন ও মার্শাল-ল' জারীর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে সারা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া বেশ গরম হতে শুরু করেছে। যদিও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ছিল, তথাপি তাঁর পক্ষে আর নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভবপর হ'ল না। তিনি আসন্ন রাজনৈতিক পটভূমিকায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বঙ্গের নেতাদেরকে এক গোপন বৈঠকের আহ্বান জানান। এই আহ্বানের ফলে ১৯৬২ সালে ২৪শে জানুয়ারী রাত্রে জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনে শেখ মুজিবুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), আবু হোসেন সরকার, মাহমুদ আলী, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) প্রমুখ উপস্থিত হয়ে আলোচনা শুরু করেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব এই বৈঠকে দলমত নির্বিশেষে সব বিভেদ-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে এক আদর্শের ভিত্তিতে সংগ্রাম করার আহ্বান জানালে সকল নেতাই তা' সমর্থন করলেন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে গোপনে তাঁদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করতে হবে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক তৎপরতা

পরদিন সোহরাওয়ার্দী করাচী গেলেন। কথা ছিল, সাতদিন পর তিনি ঢাকায় ফিরে এসে এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে কাজ চালাবেন। কিন্তু তার আগেই ৩০শে জানুয়ারী (১৯৬২) তাঁকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রদেশে আগুন জ্বলে উঠল। সরকারী মহলে টনক নড়লো। স্বয়ং আইয়ুব খানকেও এই গ্রেফতারের সাফাই গাইতে হ'ল। তিনি বললেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেব নাকি পাকিস্তানের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন শক্তিদের সাহায্যে দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছিলেন।

সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ

কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণ কোন কথাই শুনতে রাজী নয়। তরুণ ছাত্র-সমাজ রাস্তায় নেমে পড়লো। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তখন ঢাকায়। পহেলা ফেব্রুয়ারীতে তিনি এখানে এসেছেন। তাঁর উপস্থিতিতেই ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। এই প্রথম দেশে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠলো। বলা বাহুল্য, এই আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সোহরাওয়ার্দীরই সুযোগ্য শিষ্য শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুরের ওপর যে সকল বাধা-নিষেধ ছিল তিনি তাঁর কোন পরোয়াই করলেন না।

আইয়ুবের ঢাকা আগমন ও ছাত্র বিক্ষোভ

এই আন্দোলনের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের এক মাস আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রমজানের ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। ফেব্রুয়ারীর ৬ তারিখে ছাত্ররা এক সভা ক'রে এর প্রতিবাদ জানালো। প্রতিবাদ সভার পর ছাত্ররা সোহরাওয়ার্দীসহ অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল সহকারে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করলেন। শুধু তাই নয়, বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ছবিকেও পদদলিত করলেন ও তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। পরদিন ৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকাসহ প্রদেশে পূর্ণ হরতাল পালনের আহ্বান জানানো হ'ল।

কিন্তু শেখ মুজিব আর সে হরতালে নেতৃত্ব দিতে পারলেন না। তার আগেই অর্থাৎ ৬ই ফেব্রুয়ারীর গভীর রাতে 'পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে' তাঁকে আটক ক'রে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এটা যে আইয়ুব খানের নির্দেশেই হয়েছিল তা' বলাই বাহুল্য।

শেখ মুজিবের গ্রেফতার

শেখের সঙ্গে আর যাঁদেরকে গ্রেফতার করা হ'ল, তাঁরা হলেন: জনাব আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন (বর্তমানে মোজাফ্ফর ন্যাপের ভাইস প্রেসিডেন্ট), জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), কোরবান আলী, শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার, আবদুর রব সেরনিয়াবত প্রমুখ।

এর ফলে ৭ই ফেব্রুয়ারীর গণবিক্ষোভ আরো দানা বেঁধে উঠল। এক বিরাট মিছিলের ওপর হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালের সামনে পুলিশ মিলিটারীর একটি বিরাট বাহিনী কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে ও লাঠি

চার্জ করে। এতদসত্ত্বেও বিক্ষোভকারীরা দমে যান নি। তাঁরা তেজগাঁও এয়ারপোর্টে আইয়ুবের সম্মানে নির্মিত একটি তোরণও ভেঙে ফেলে দিয়েছিলেন।

এলো ২১শে ফেব্রুয়ারী। শেখ মুজিব ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতারা জেলের ভিতর থেকেই ভাবগম্ভীর পরিবেশে শহীদ দিবস উদযাপন করলেন। যথা সময়েই ১লা মার্চে (১৯৬২) আইয়ুব খানের নয়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হ'ল। আতাউর রহমান খান লিখেছেন: "এক হাজার নয়শ' বাষট্টি সালের পয়লা মার্চে হিজরী মোতাবেক এক হাজার তিনশ' একাশি সনের তেইশে রমজান আইয়ুব খান প্রণীত শাসনতন্ত্র ভূমিষ্ঠ হ'ল।"

[স্বৈরাচারের দশ বছর: আতাউর রহমান খান, পৃ: ১৯৮]

আইয়ুবের নয়া শাসনতন্ত্র

আল্লাহর নামে শুরু ক'রে ও নিজের নামে শেষ ক'রে আইয়ুব ভূমিকা দান করেন: "এক হাজার নয়শ' বাষট্টি সালের ফেব্রুয়ারী মাসের...তারিখে পাকিস্তানের জনগণ আমাকে যে ম্যাণ্ডেট দিয়েছে তারই বলে বলীয়ান হয়ে পাকিস্তানের উত্তরোত্তর অগ্রগতি লাভ, বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসন গ্রহণ, আন্তর্জাতিক শান্তি, মানবতার কল্যাণ সাধনে পাকিস্তানের জনগণের যথাযোগ্য সহায়তা প্রদান ইত্যাদি শুভ ইচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে আমি অমুক, হিলালে পাকিস্তান, হিলালে জুরঅত, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট অদ্য তারিখে এই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিলাম।

এক ব্যক্তির দেওয়া শাসনতন্ত্র! পাকিস্তানের জনগণের উল্লেখ অবান্তর। তারা কোন ম্যাণ্ডেট দেয় নাই।"

[স্বৈরাচারের দশ বছর: পৃ: ১৯৮]

এই শাসনতন্ত্রের প্রধান দু'টো বৈশিষ্ট্য হ'ল:

(১) সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। দেশের সর্বময় কর্তা প্রেসিডেন্ট—তিনি সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী।

(২) জনগণের ওপর পূর্ণ অনাস্থা। তাদের প্রত্যক্ষ ভোটে দেশের সর্বময় ক্ষমতাধিকারী প্রেসিডেন্টকে নির্বাচনের অধিকার জনগণের নেই। সরকার কতিপয় দালাল সৃষ্টি ক'রে দেবে—তারাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে।

আইয়ুবের এই শাসনতন্ত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে আতাউর রহমান খান যথার্থই লিখেছেন: "গণতন্ত্রের বহির্বাস বহাল করা হয়েছে। অন্তর অসার। কেন্দ্রে ও প্রদেশে পরিষদ হবে। তাদের অধিবেশনও হবে। সেখানে বক্তৃতা, তর্কবিতর্ক, প্রশ্নোত্তর সবই হবে। তার জন্য আইন-কানুনও প্রণীত হবে। অর্থাৎ সংবাদপত্রের খাদ্য পুরোপুরি থাকবে। পরিষদে সব বিষয়ের আলোচনা হবে। এমনকি বাজেটেরও। কিন্তু তার উপর ভোটাভুটি চলবে না। স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ পরিষদ রবার স্ট্যাম্প, পঙ্গু ও ক্লীব। তবুও......সদস্যদের মান-মর্যাদা আছে। পদাধিকার আছে। বেতন আছে। ভাতা আছে। রাহা খরচও আছে। আপখোরাকী নয়। মন্ত্রিমণ্ডলীর থাকারও ব্যবস্থা আছে......তাদের গাড়ী-বাড়ী থাকবে। আরদালী চাপরাশিও থাকবে। থাকবে না শুধু ক্ষমতা। ক্ষমতা থাকবে প্রেসিডেন্টের হাতে এবং তাঁরই হুকুমে গভর্নর ও কর্মচারীরা ক্ষমতার অধিকারী হবেন।"

[প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৮-১৯৯]

স্বাভাবিকভাবেই স্বৈরাচারী আইয়ুবের এই শাসনতন্ত্র পূর্ব বাংলার জনগণ মেনে নিতে পারলেন না। ১৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমাজ এই শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে ধর্মঘট করলেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত একটি সভায় এই শাসনতন্ত্রের দু'টি কপি ভস্মীভূত করা হ'ল। সরকার ও শাসনতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপে আইয়ুব খান পূর্ব বাংলাবাসীদের উপর ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। এই প্রথম বাঙালীদের বিরুদ্ধে তিনি মুখ খুললেন।

পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট

২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মূল তিনদফা দাবীর ভিত্তিতে পুনরায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করলেন। দাবীগুলো হ'ল:

(১) নয়া শাসনতন্ত্র অবিলম্বে বাতিল কর;

(২) দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম কর;

(৩) সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাও।

ছাত্ররা মিছিল ক'রে যখন শহর প্রদক্ষিণ করছিলেন সে সময় পুলিশ তাঁদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং দু'শ সাতজন ছাত্রকে আটক করা হয়। বারোদিন ধর্মঘট পালন করার পর ৪ঠা এপ্রিল ছাত্রগণ তা' সাময়িকভাবে তুলে নেন। এপ্রিলের ১৪ তারিখে আতাউর রহমান খান,

নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, মাহমুদ আলী প্রমুখ সাতজন নেতা একটি যুক্ত বিবৃতিতে আটকবন্দী রাজবন্দী ও ছাত্রদের মুক্তি দাবী করেন।

ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, নয়া শাসনতন্ত্রের অধীনে ২৮শে এপ্রিল (১৯৬২) পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্র-সমাজ এই নয়া শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দও এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রদেশের প্রতিক্রিয়াশীল কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা—যাঁরা পরবর্তীকালে আইয়ুব খানের সাকরেদ হিসেবে বিভিন্ন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন—তাঁরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেন। এঁদের অধিকাংশই প্রাক্তন মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদের নির্বাচন

প্রদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ না করায় মুসলিম লীগের প্রার্থীরা সহজেই জয়লাভ করলেন। এঁদের মধ্যে বগুড়ার মোহম্মদ আলী, হাবিবুর রহমান, সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, আবুল কাশেম খান, আবদুল মোনেম খান প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগের দিন সারা বাংলার বুকে এক শোকের ছায়া নেমে আসে। ২৭শে এপ্রিল (১৯৬২) শুক্রবারে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেরে বাংলা ফজলুল হক ৮৮ বৎসর ৫ মাস ২৮ দিন বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি নাকি প্রতি মুহূর্তে বিলাপ করে বলতেনঃ "আল্লাহ্! যে দেশে আমার ভোট নেই, সে দেশে বাঁচার ইচ্ছা আমার নেই। আমাকে তুমি তুলে নাও।"

শেরে বাংলার মৃত্যু

নির্বাচনের পর ১৯৬২ সালের ৮ই জুন আইয়ুব খানের মার্শাল-ল' উঠে গেল। ঐ একই দিনে মার্শাল-ল' উঠে যাওয়ার পর-পরই জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ নয়া শাসনতন্ত্রের অধীনে শপথ গ্রহণ করলেন। এর কয়েকদিন পর অর্থাৎ ১৩ই জুন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করলেন। এতে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, আবদুস সবুর খান,

আইয়ুব খানের প্রথম মন্ত্রিসভা

ফজলুল কাদের চৌধুরী, ওয়াহিদুজ্জামান এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরবর্তী-কালের কুখ্যাত গভর্নর আবদুল মোনেম খান পূর্ব পাকিস্তান থেকে আইয়ুবের মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন।

মার্শাল-ল' উঠে যাবার পর অবৈধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলগুলোর স্বভাবতঃই বৈধ হবার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যেই ছাত্র-সমাজের আন্দোলন দিন দিন জোরালো হতে লাগল। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুত্থিত হ'লে তার মাধ্যমে ছাত্র-জনতার আন্দোলন আরও জোরদার হবে—তার ফলে প্রেসিডেন্টের গদি থেকে তিনি স্থানচ্যুত হতে পারেন—এই আশঙ্কায় আইয়ুব ১০ই মে (১৯৬২) "The Political Organisation (Prohibition of Unregulated Activities) Ordinance of 1962" নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করলেন। এতে বলা হ'ল যে, আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত দেশে যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকবে।

১৯৬২ সালের ১৮ই জুনের সকালে শেখ মুজিব মুক্তি পেলেন।

শেখ মুজিবসহ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার মুক্তি

তার আগে তাজউদ্দিন আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ, কে. জি. মোস্তফা প্রমুখ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিক মুক্তি পেয়েছিলেন।

শেখ মুজিব মুক্তি পাওয়ার পর পরই আবার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অনিবার্য পতন থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য তিনি আতাউর রহমানসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। গভীর আলাপ-আলোচনার পর পূর্ব বাংলার শীর্ষস্থানীয় কতিপয় নেতা সংবাদপত্রের মাধ্যমে এক জোরালো বিবৃতি দান করেন। এই বিবৃতি Nine Leader's Statement বা নয় নেতার বিবৃতি নামে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৬২ সালের ২৪শে জুন এই বিবৃতি দেয়া হয়, পরদিন ২৫শে জুন তা' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর-দানকারীদের অন্যতম আতাউর রহমান লিখেছিলেন: "এই বিবৃতিই ছিল তৎকালে পাকিস্তানী জনগণের আশা-আকাঙক্ষার প্রতিধ্বনি।"

ঐতিহাসিক নয় নেতার বিবৃতি

বিবৃতিতে বলা হ'ল: "সত্যিকার গণ-প্রতিনিধি ছাড়া কোন ব্যক্তি

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার অধিকারী নয়। করলে তা' স্থায়ী, সহজ ও কার্যকরী হতে পারে না। জনগণ সার্বভৌম—এই হচ্ছে গণতন্ত্রের সারকথা। জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। এই ইচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত বাধা-বিঘ্নমুক্ত ও অবাধ বিকাশের একান্ত প্রয়োজন।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় গণ-প্রতিনিধির লক্ষ্য থাকে যাতে কালের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ক'রে শাসনতন্ত্র টিকে থাকতে পারে এবং সম্ভাব্য বাধা-বিপত্তি ও সঙ্কটমুক্ত হয়ে নিজের অস্তিত্বও রক্ষা করতে পারে—এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা।

শাসনতন্ত্রকে স্থায়িত্বের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ও গুণসম্পন্ন হতে হ'লে সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধির প্রতিফলন অবশ্যই থাকতে হবে। এই পদ্ধতিতে প্রণীত বিধানগুলোই বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবী বংশধরদের মনে অকৃত্রিম আনুগত্য ও আবেগের প্রেরণা দিতে পারে। এই আনুগত্য ও আবেগই শাসনতন্ত্রের প্রধান অবলম্বন ও দুর্ভেদ্য বর্মবিশেষ। জনমতের উপর নির্ভর না ক'রে বাইরে থেকে চাপানো শাসনতন্ত্র বিপর্যয়ের মুখে জনসমর্থন লাভ করতে পারে না।

বর্তমান শাসনতন্ত্রে এই গুণাবলী না থাকায় এটা অন্তঃসারশূন্য। যতই প্রচার করা হোক না কেন, জনমতের প্রতি উপেক্ষা ও অনাস্থাই হচ্ছে এই নয়া শাসনতন্ত্রের ভিত্তিভূমি। আট কোটি (তখন যা ছিল) জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র আশি হাজারকে দেয়া হয়েছে ভোটের অধিকার। আবার এই অতি কমসংখ্যক ভোটারের ভোটে নির্বাচিত যে পরিষদ তাকেও সত্যিকার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। মাত্র তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আমূল পরিবর্তন না করলে এই শাসনতন্ত্র কাজের অনুপযোগী।

সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা সদস্যদের না থাকার ফলে শুধুমাত্র সরকারের তীব্র ও চরম সমালোচনার মাধ্যমে সদস্যরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে প্রলুব্ধ হবে। যোগ্য ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরা এই ধরনের সরকারে যোগ দিতে কোন আগ্রহ বোধ করবে না। ফলে শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রাণ আমলাতন্ত্রের হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়বে।

যথাসম্ভব দ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বিশেষ সংস্থা গঠন ক'রে, দেশবাসী বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে, এমন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার আহ্বান আমরা জানাই। ছয় মাসের মধ্যে একটি সুষ্ঠু শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব বলে আমরা মনে করি। শাসনতন্ত্র প্রেসিডেন্সিয়াল না পার্লামেন্টারী হওয়া উচিত, সে প্রশ্নের জবাব আমরা এখন দিতে চাই না। তবে দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ পার্লামেন্টারী ধরনের সরকার কায়েমের পক্ষপাতী; কেননা বহুকাল ধরে ঐ ধরনের শাসন-পদ্ধতির সাথে আমাদের পরিচয় ঘটেছে এবং তার অভিজ্ঞতা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। শাসনতন্ত্র ফেডারেল বা য়ুনিটারী হবে, এ প্রশ্নেরও জবাবের প্রয়োজন হবে না। বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেল শাসনতন্ত্রই গ্রহণযোগ্য হবে; এতে সন্দেহের অবকাশ নাই। একটি জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান করা একান্ত কর্তব্য। সেটা হচ্ছে দুই অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক বৈষম্য। উভয় অংশের জনগণের সদিচ্ছার অভাব নাই। তাই আমরা মনে করি গণপ্রতিনিধিদের সত্যিকার দায়িত্বভার দিলে, তারা সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কার্যে মনোযোগ দেবে আর অনুন্নত অঞ্চলগুলোর দিকে অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, এটা সুনিশ্চিত।

এতকাল ধরে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে জনগণের কোন কথা বলার সুযোগ না থাকায় সঙ্কীর্ণমনা ও শ্রেণী-স্বার্থের রক্ষকদের হাতে পড়ে দুই অংশের ভেতর উন্নয়ন ক্ষেত্রে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে একবার যদি রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনমত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, তা' হ'লে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থের দিন শেষ হয়ে যাবে। পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ব্যাপারে সত্যিকার রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায় নাই বললেই চলে। এই সব কারণেই দুই অঞ্চলে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। আজাদী লাভের পর সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার সমাবেশ হয়েছিল মুষ্টিমেয় সরকারী অফিসারদের হাতে। তার উপর দেশে একটিও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়ার ফলে জনগণ রাষ্ট্র চালানোর ব্যাপারে কথা বলার সুযোগই পায় নাই। এমতাবস্থায় অন্তর্বর্তীকালে কি করণীয়, সেটাই হচ্ছে

গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সামরিক শাসন উঠে যাওয়ার ফলে দেশে যে সদিচ্ছার উদ্ভব হয়েছে, তাকে আরও জোরদার ক'রে তোলার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে গভীর রাজনৈতিক প্রস্তার। জনসাধারণ ও সরকারী শাসনতন্ত্রের ব্যবধানের প্রাচীর আর গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের দায়িত্ব অপরিসীম। আমরা আশা করি, তিনি এটা বুঝতে অক্ষম নন।

আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি মতে একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়া সাপেক্ষে দেশের সরকার পরিচালনার কাজও চালিয়ে যেতে হবে।

তাই আমাদের প্রস্তাব ঃ উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়গুলো নয়া শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত করতে হবে।

যে পরিষদ বর্তমান বিধান অনুযায়ী গঠিত হয়েছে তার উপর সরকারের আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। লাভজনক পদবন্টন ক'রে ভাগ্যবান সদস্যদের দিয়ে পরিষদগৃহ ভর্তি করার আসক্তি বর্জন করতে হবে। তা' না হ'লে যে ক্ষীণমাত্র স্বাধীনতা পরিষদের আছে তা'ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একথা ভুললে চলেব না যে, বিশ্বাসেই বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

সরকারের উপর জনগণের আস্থা যাতে ফিরে আসে তার জন্য বিনা বিচারে আটক সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত যাবতীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল ক'রে দিতে হবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু। দেশে অবাধে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার পথে যত কিছু বাধা অন্তরায় আছে তার অবসান ঘটাতে হবে। দেশের সকলকে সমবেতভাবে এইসব সমস্যা সমাধানের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। দেশ একটি বিরাট পরীক্ষার মুখে। এক অস্থির অবস্থায় দেশ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আমাদের শেষ আহ্বান—আসুন, সকলে মিলে যতশীঘ্র সম্ভব শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ক'রে সমস্ত বিতর্ক বন্ধ ক'রে দেশকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাবার এক দুর্জয় সংকল্প নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করি।"

[স্বৈরাচারের দশ বছর, পৃঃ ২২০-২২৩]

এই বিবৃতিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেন তাঁরা হলেন, আওয়ামী লীগ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, কৃষক-শ্রমিক পার্টি থেকে

হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক, পীর মোহসীন উদ্দিন আহমদ, মুসলিম লীগ থেকে ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), নূরুল আমীন. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি থেকে মাহমুদ আলী।

এই নয় নেতার বিবৃতি সারা বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। কায়েমী স্বার্থবাদী ও কুচক্রীদের জঘন্য হস্ত থেকে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করার আবেদন জানিয়ে দৈনিক হাজার হাজার অভিনন্দন বাণী বর্ষিত হতে থাকে। মানুষ আবার নতুন সূর্যোদয়ের সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে ওঠে।

কায়েমী স্বার্থবাদীরা আতঙ্কিত না হয়ে পারলো না। তাদের মুখপত্র ডন, মর্নিং নিউজ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে তারা নয় নেতার উদ্দেশে গালাগালি দিতে শুরু ক'রে দিল। উপহাস ও বিদ্রূপের বাণে জর্জরিত করতে চাইলো। সবুর খান তো নয় নেতার বিবৃতিকে 'ব্যাবিলনের নয়জন জ্ঞানীর বিবৃতি' বলে ব্যঙ্গোক্তি করতে লাগলেন। তাঁদের নেতা আইয়ুব খানও কম গেলেন না। বিবৃতি তাঁকে যথেষ্ট বিব্রত করলেও তিনি 'ধিকৃত রাজনীতিক'দের উদ্দেশে 'নিমকহারামী'র অভিযোগ এনে যাচ্ছেতাই গাল দিলেন। আতাউর রহমান লিখেছেন—"এটা স্বাভাবিক। ক্রোধের উচ্ছ্বাস, ভয়েরও। রাজনীতিকরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, দেশের জনগণ তাঁদের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য। তা' হলেই খাঁ সাহেবের স্বপ্ন ভেঙে যায়। নিরাপদে সিংহাসনে বসে দশকোটি মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেজে আছেন। এসব ভেঙে পড়ে ধূলিস্যাৎ না হয়ে যায় এই চিন্তায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন।"

[প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৪]

সরকারের প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও এই বিবৃতির সমর্থনে নেতৃবৃন্দ ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভা করলেন। সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সমর্থন জানালেন। তারপর চট্টগ্রাম, বরিশাল, টাঙ্গাইল, সিলেট প্রভৃতি জায়গায় জনসভা ক'রে দেশবাসীকে আন্দোলনের আহ্বান জানালে—তারা অকুণ্ঠচিত্তে সাড়া দেয়। ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনাময় সুখ-সমৃদ্ধির রঙিন ছবি তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সোহরাওয়ার্দী তখন

করাচীর কারাগারে নিঃসঙ্গ বন্দী অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছিলেন। দু' একজন বন্ধুস্থানীয় নেতা তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে সাক্ষাৎ করলে তিনি আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। নেতৃবৃন্দের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল।

সরকার এই গণ-ঐক্য ভাঙ্গবার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। কিভাবে ভাঙ্গা যায়? চেলা-চামুণ্ডাদের কাছ থেকে আইয়ুব খান পরামর্শ চাইলেন। ওঁরা একবাক্যে পরামর্শ দিলেন—সরকার-বিরোধীদের বিরুদ্ধে একটা সংগঠন শক্তি গড়ে তোলা হোক। কিন্তু দেশে রাজনৈতিক দল যে নিষিদ্ধ। তাতে কি? আবার পুনরুজ্জীবিত করা হোক। এতে যে ওরাই জেগে উঠতে পারে? 'কুছ পরোয়া নেহি'। ওদের প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ একটি নতুন অর্ডিন্যান্স জারী করতে হবে।

অতএব, ৩০শে জুন সরকার রাজনৈতিক দল গঠন সম্পর্কে Political Partics Bill (1962) নামে একটি বিল জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করেন। এই বিলে বলা হ'ল ইসলামী আদর্শ ও পাকিস্তানের সংহতিবিরোধী মতামত প্রচার বা কার্যকলাপ চালানোর উদ্দেশ্যে কোন দল গঠন করা যাবে না। এবডো, প্রোডো আইনে বা অন্যায় কারণে অযোগ্য ঘোষিত রাজনীতিবিদরা কোন দল গঠন করতে বা দলের সদস্য হতে পারবেন না।

এই বিলটির মাধ্যমে সরকার রাজনৈতিক তৎপরতা সীমিত রাখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এতে বিন্দুমাত্র দমলেন না। জুলাই মাসের ৮ তারিখে পল্টন ময়দানে নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। এই সভায় শেখ মুজিব আবেগময়ী ভাষায় সরকারের তীব্র সমালোচনা ক'রে বললেন, "স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যারা ইংরেজ-প্রভুদের গোলামী করেছিল, তারাই আজ দেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" শেখ মুজিব এবডোসহ সকল কালা-কানুন বাতিল ক'রে সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী প্রমুখ রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করলেন। ঐ সভায় আতাউর রহমান খান বলেছিলেন, "এই শাসনতন্ত্র চাই না। এই শাসনতন্ত্র পুড়িয়ে ফেলতে হবে—

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তিকা
ভস্মরাশি ফেলে দাও কীর্তিনাশা জলে।"

পরদিন ৯ই জুলাই (১৯৬২) প্রকাশিত দৈনিক আজাদ এই জনসভা সম্পর্কে লিখেছেন—"প্রায় চার বছর পর অতীতের বিভিন্নমুখী দলীয় শক্তি-পরীক্ষার কেন্দ্রস্থল পল্টন ময়দান আবার বিপরীত নীতি ও মতবাদের সমর্থক বিভিন্ন সাবেক রাজনৈতিক দলের যৌথ সমাবেশে বক্তৃতার শব্দ সম্ভারে মুখরিত হয়ে উঠে।" ১৪ই জুলাই Political Parties Bill জাতীয় পরিষদে গৃহীত হ'লে এর পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিব ২০শে জুলাই সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, আবদুল গফ্ফার খানের অনুপস্থিতিতে (তাঁরা সবাই তখন জেলে আটক ছিলেন) কোন রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত করা সমীচীন নয় বলে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগপন্থী জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কামরুজ্জামান সাহেব সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আলোচনা করতে করাচী জেলে গেলে শহীদ সাহেবও Political Parties Bill-এর আওতায় এবং অগণতান্ত্রিক পরিবেশে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের বিপক্ষে মত দেন।

সোহরাওয়ার্দীর মুক্তিলাভ

১৯শে আগস্টের (১৯৬২) সন্ধ্যায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচী সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পান। এর আগে নাকি সরকার পক্ষের দু'একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এই দেখা করাকে নিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা অনেক আজগুবি কথা বলে বেড়াতে লাগলেন। তিনি নাকি আর রাজনীতি করবেন না, এরূপ দস্তখত লিখে দিয়েই মুক্তি পেয়েছিলেন। আরো বলে বেড়াতে লাগলেন যে, শহীদ সাহেব নাকি নয় নেতার বিরুদ্ধেও নানারূপ কটুক্তি করেছেন। এসব কথা তখন দালাল খবরের কাগজগুলোর মুখ্য বিষয়বস্তু।

ঢাকা বিমান বন্দরে সোহরাওয়ার্দীর ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা

এর সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরেই। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য প্রায় মাসখানেক করাচীতে বিশ্রামের পর ১৬ই সেপ্টেম্বর বেলা ১-৪৫ মিনিটের সময় তিনি ঢাকার মাটিতে পা দেন। বিমান ঘাঁটিতে তাঁকে যে অপূর্ব ও অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আতাউর রহমান খান লিখেছেন, "লক্ষ লক্ষ লোক পাঁচ-সাত ঘন্টা আগে থেকেই সমস্ত বিমানঘাঁটি দখল ক'রে বসে রইল। যখন প্লেন

এলো—তখন প্লেনটি নির্ধারিত স্থানে নামতে না পেরে বহুদূরে অবতরণ করে। সেখান থেকে বিমানঘাঁটিরই একটা গাড়ী ক'রে তাঁকে নামিয়ে আনা হ'ল। সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই তিনি ঘোষণা করলেন, নয় নেতার বিবৃতির ফলে দেশে নয় কোটি নেতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে তিনি খুব আনন্দিত। এত নেতা এককালে দুনিয়ার কোন দেশে দেখা যায় নাই। পশ্চিম পাকিস্তানেও অদ্ভুত সাড়া জেগেছে। তারা নেতৃত্বের জন্য চেয়ে আছে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে। এটাই সূর্যোদয়ের দিক।

লক্ষ কণ্ঠের জিন্দাবাদে বিমান বন্দর ফেটে পড়ার মত হয়ে গেল। কথায় কথায় শহীদ সাহেব হেসে বললেন, "আমিও নয় নেতার সামিলে। আমার নম্বর দশ।"

[স্বৈরাচারের দশ বছর, পৃঃ ২৩৫]

পরদিন ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সাল। এ দিনটি বাংলার রাজনীতিতে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী দিন। শিক্ষা সংস্কারের নামে তোগলকি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে ছাত্র-সমাজ সেদিন সারা দেশে হরতাল পালনের আহবান জানিয়েছিলেন। ছাত্রনেতা রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে ঢাকার ছাত্ররা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল ও অন্যান্য কয়েকটি গণতান্ত্রিক দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। আইয়ুব খান তখন ঢাকায় ছিলেন। ঐ দিনই তিনি ঢাকা কার্জন হলে গেলেন ভাষণ দিতে। কিন্তু প্রচণ্ডভাবে তাড়িত হলেন তিনি। ছাত্ররা একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে উঠলো। ক্রুদ্ধ অপমানিত জেনারেল আইয়ুব কোন ভাষণ না দিয়েই হল থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু ছাত্রদেরকে শায়েস্তা করার নির্দেশ দিতে ভুললেন না তিনি। পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো ছাত্রদের ওপর। প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'ল। শেষে পুলিশ উপায়ান্তর না দেখে গুলী বর্ষণ করে। এতে তিনজন নিহত এবং দু'শতাধিক ছাত্র-জনতা আহত হন। অগণিত ছাত্র-জনতাকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। তবুও অকুতোভয় ছেলেরা তা' ভঙ্গ করে এবং আইয়ুবের কুশপুত্তলিকা দাহ ক'রে তার সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে শহর প্রদক্ষিণ করে। এই রক্তঝরা দিনটিকে ছাত্ররা পরবর্তী কালেও ভুলে নি। প্রতি বৎসর এই দিনটির স্মরণে ছাত্র-সমাজ

'ছাত্র দিবস' হিসেবে পালন ক'রে আসছেন। এই হামলার প্রতিবাদে ২৯শে সেপ্টেম্বর সারা প্রদেশে পালিত হ'ল সাধারণ ধর্মঘট ও দমননীতি দিবস। সরকারী পুলিশের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও গ্রেফতারের নিন্দা করেন মুজিব ও সোহরাওয়ার্দীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শুধু তাই নয়, শেখ মুজিব এবং অন্য আট নেতা তৎকালীন গভর্নর গোলাম ফারুকের কাছে গিয়ে এর তীব্র প্রতিবাদও জানিয়ে এলেন।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন

দেশের লুপ্ত গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে শেষ পর্যন্ত সোহরা-ওয়ার্দীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একটি দলহীন ঐক্য সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এর নাম হবে National Democratic Front বা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন।

শেখ মুজিবের লাহোর যাত্রা

কিছুদিন পর ২৪শে সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খানসহ পূর্ব পাকিস্তানের ১৭ জন নেতা একই উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে লাহোরে গেলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের আরো কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ তাঁরা গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের জন্য সেপ্টেম্বরের ২৫, ২৬ ও ২৮ তারিখে পর পর তিনটি জনসভার আয়োজন করেছিলেন; কিন্তু আইয়ুবের গুণ্ডাদের আক্রমণে তাঁরা সফলকাম হতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, গুজরান-

সোহরাওয়ার্দীর প্রাণনাশের চেষ্টা

ওয়ালায় জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যখন সোহরাওয়ার্দী গাড়ী থেকে নামছিলেন, তখন আইয়ুবের কতিপয় ভাড়াটে গুণ্ডা তাঁর দিকে লক্ষ্য ক'রে গুলী ও বোমা ছুঁড়ে মারলো। আকস্মিকভাবে সেদিন তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন।

অবশেষে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে ১৯৬২ সালের ৪ঠা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট-এর ৫৪ জন নেতৃবৃন্দের নাম ঘোষণা করা হ'ল। এতে পাকিস্তানের দু'অংশের বিভিন্ন দল ও মতের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: পূর্ব বাংলার —শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ আলী, সৈয়দ আজিজুল হক প্রমুখ। দু'দিন পর নূরুল আমীনও যোগ দেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের—মওলানা আবুল আলা মওদুদী, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, আইয়ুব খুরো, জেড. এইচ. লারী প্রমুখ। এই সংস্থায় যে-সকল রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়েছিল, সেগুলো হ'ল—আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি ও জামাতে ইসলাম।

পাকিস্তানী শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রীকরণের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সোহরাওয়ার্দী অক্টোবরের ৬ তারিখে ঢাকায় এলেন। পরদিন নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে সোহরাওয়ার্দীর জীবন-নাশের অপচেষ্টার প্রতিবাদে এক জনসভা হয়। এতে শহীদ সাহেব স্বয়ং উপস্থিত হয়ে এক স্মরণীয় ভাষণ দেন। সেদিন তিনি বিরাট জনসমুদ্রকে উদ্দেশ ক'রে প্রশ্ন করেন—"আপনারা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চান কি-না?" লক্ষ লক্ষ জনতা সমস্বরে গর্জে উঠেন—"চাই—চাই।"

১১ই অক্টোবর থেকে শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে অবিশ্রান্তভাবে প্রদেশের প্রতিটি জেলায় জনসভা ও বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন।

ঠিক এই মুহূর্তেই পূর্ব বাংলার ভাগ্যাকাশে অভিশাপের কালো ছায়া হয়ে আবির্ভূত হন মোনেম খান। আইয়ুব তাঁকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ সাতটি বছর প্রগতিশীল সকল রাজ-নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। জনগণের স্বার্থকে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে পদদলিত করেন। বাংলার ইতিহাসে তিনি এক ধিক্কৃত ব্যক্তিত্ব।

মোনেম খানের আবির্ভাব

আইয়ুবের নির্দেশিত প্রথম জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন তখন এই কুখ্যাত মোনেম খান সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। সাধারণ বটতলার উকিল আইয়ুবের আশীর্বাদে হলেন একজন কীর্তিমান পুরুষ—প্রথমে জাতীয় পরিষদের সদস্য। সদস্য হয়েই তিনি রাতারাতি একেবারে নেতা বনে গেলেন। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করলেন।

তিনি সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবকে জাতির ও দেশের শত্রু বলে অভিহিত করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন। ফলে প্রথম জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার সময় ক্রুদ্ধ জনতা তাঁর উপর হামলা চালায়। কিন্তু এ সবে দমবার পাত্র ছিলেন না মোনেম খান। পূর্ব বাংলার জনগণের প্রথম শ্রেণীর শত্রু বলেই আইয়ুবের নিকট তিনি পেলেন অপূর্ব স্বীকৃতি। প্রথমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব এবং পরে গভর্নর। অবশ্য তাঁর পরবর্তী স্বীকৃতি এসেছে জনগণের হাত থেকে—সে কাহিনী বিপরীতমুখী। প্রথমে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা, পরে স্বাধীনতা সংগ্রামকালে মুক্তি বাহিনীর গুলীতে মৃত্যু।

যাহোক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েই তিনি প্রভু আইয়ুবের নৈকট্য লাভের এবং অধিকতর খেদমতের সুযোগ পেলেন। সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখানোর জন্য তিনি আইয়ুবের কাছে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত থাকলেন। এমন কি আযম খানের মত উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানী লোককেও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের পদ থেকে সরানোর মূলে মোনেম-সবুর চক্রের কৃতিত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁরা আযম খানের বাঙালী-প্রীতি দেখে এবং তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে আইয়ুবের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে বারংবার বিষোদগার করতে লাগলেন। অবশেষে ১৯৬২ সালের ১০ই মে আযম খানকে বিদায় নিতে হ'ল।

গভর্নর গোলাম ফারুক

এরপর এলেন গোলাম ফারুক। গভর্নর ফারুক প্রথম দিকে বাঙালীর প্রতি বেশ কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা ক'রে তিনি সেই সহানুভূতিশীলতার পরিচয় দিতে পারেন নি। সেই ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল না। তবুও আন্তরিকভাবেই তিনি চেষ্টা করেছিলেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণ তথা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া না হ'লে দেশের মঙ্গল সাধিত হবে না। গভর্নর ফারুক এ বিষয়ে এখানকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অনেক আলাপ করেছেন। আতাউর রহমান খানকে তিনি বলেছিলেন—"আইয়ুব খান লোকটা নেহাত খারাপ নন। কতকগুলি

স্বার্থান্বেষী কর্মচারী দিনরাত তাঁর কানে গুন্‌গুন্‌ ক'রে তাঁর স্তুতিবাদ ক'রে আর ফাঁকে ফাঁকে দু' একটি কাজ সেরে নেয়। তিনি অবশ্য তাঁদের মতামতের তোয়াক্‌কা করেন না। কিন্তু অষ্টপ্রহর চাপলুসী করলে মানুষের মাথা ঠিক রাখা মুশকিল। তাই অনুরোধ করি, আপনারা এসে একটু পরিবর্তন করুন। সরাসরি বিপ্লব তো আপনারা করতে পারছেন না। এই অবস্থায় ক্রমবিবর্তনের পথই আপনাদের গ্রহণ করতে হ'বে। দেশকে বাঁচাতে হবে। তিনি আরও বললেন, ধরুন প্রেসিডেন্ট যদি একটা জাতীয় সরকার গঠন করতে চান আর আপনাদের যোগদান করার আহ্বান জানান, তা' হ'লে আপনাদের যোগ দেওয়া উচিত হবে না?

—একদম বিনা শর্তে?

—না, না, বল্লামইত। কিছুটা মেনে নিলে বাকী সব ধীরে ধীরে আদায় করতে পারবেন। একেবারে আপোষহীন সংগ্রামের কথা বলে অটল হয়ে বসে থাকলে চলবে না। দেশের কল্যাণে আপোষ করতেই হয়। নেতার সাথে আলাপ করুন। আমি নিজে প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করেছি। সোহরাওয়ার্দীর সাথে তাঁকে আলাপ করতে বলেছি। তিনি আমাকেই আগে দেখা করতে বললেন। বিদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি দেখা করবেন। তবে সাবধান! মন্ত্রীরা যেন টের না পায়। তা' হ'লে সর্বনাশ। আপনাদের সাথে আপোষ হ'লে ওদের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠবে।"

[প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৯-৪০]

কিন্তু মন্ত্রীরা কেমন ক'রে যেন কথা টের পেয়ে গিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা গভর্নর ফারুকের বিরুদ্ধে একথা সেকথা লাগিয়ে আইয়ুবের মন বিষিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন, ফলে আইয়ুব খান পিছু হটে গেলেন। শুধু তাই নয়, গভর্নরের উপর খাপ্পাও হলেন।

সে সময় ছাত্রজনতার প্রবল আন্দোলনের ফলে আইয়ুবশাহীর ভীতটা নড়ে উঠলো। ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় তাঁর উপস্থিতিতে ছাত্ররা যে অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন, গভর্নর ফারুক তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সামান্য কয়েকজন নিহত, আহত ও গ্রেফতারের সংবাদে আইয়ুব খান খুশী হতে পারেন নি। তিনি স্থির

করলেন বাঙালীকে দিয়ে বাঙালীদেরকে শায়েস্তা করতে হবে। এবং এর জন্য তিনি যাঁকে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করতে পারলেন,—তিনি আবদুল মোনেম খান।

২৮শে অক্টোবর ('৬২) পূর্ব বাংলার লাটবাহাদুর হিসেবে শপথ নিলেন মোনেম খান। দীর্ঘদিন পর বাংলার মাটিতে এলেন আরেক মীরজাফর।

ক্রমাগত কয়েক মাস ধরে গণসংযোগ সফরের ফলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব হঠাৎ হৃদপীড়ায় আক্রান্ত হ'লেন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে করাচীর জিন্নাহ্ সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করানো হ'ল—সেখানে কিঞ্চিৎ সুস্থ হলে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিপূর্ণ বিশ্রামের ও সুচিকিৎসার জন্য ১৯৬৩ সালের ১৯শে মার্চ তিনি গেলেন বৈরুত।

ইতিমধ্যে মওলানা ভাসানীকেও বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। আইয়ুবের সাক্রেদরাই তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা আইয়ুবকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মওলানা ভাসানী সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবের ঘোর বিরোধী। সোহরাওয়ার্দী-মুজিবরা যে নীতি গ্রহণ করবেন, ভাসানী তার বিরোধিতা করবেনই। সে-সময় শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে সারা পূর্ব বাংলায় আগুন ঝরানো আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সে আগুন নেভাতে হ'লে ভাসানীর মত নেতাকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে মাঠে নামিয়ে দেয়া উচিত।

মুক্তি পাবার পর প্রথমে ১৯৬৩ সালের ৩১শে মার্চ ভাসানী করাচীতে এক জনসভায় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে স্বাগত জানালেন।

মওলানা ভাসানীর মুক্তিলাভ

কিন্তু ২রা এপ্রিল ঢাকায় ফিরে এসে তিনি অন্য সুর ধরলেন। তিনি N.D.F.-কে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে সমর্থন করতে পারেন বলে জানালেন। এগুলোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবীর কথা থাকতে হবে। দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং 'সিয়াটো' 'সেন্টো' বহির্ভূত একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির দাবী তুলতে হবে। এছাড়া তিনি আরও কয়েকটি কর্মসূচীর কথাও উল্লেখ করেন।

অথচ ভাসানীর এই কর্মসূচীর সঙ্গে N.D.F.-এর কোন বিরোধ

ছিল না। তবে N.D.F. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনকেই মুখ্য হিসেবে গ্রহণ ক'রে এসেছেন। এমন সময়ে মওলানা সাহেবের এইসব শর্তের আরোপ যে উদ্দেশ্যমূলক একথা সত্বরই উপলব্ধি করা গেল। তিনি গণতন্ত্র হয়ত আন্তরিকভাবেই কামনা করেন, কিন্তু আসলে N. D. F.-এর অভূতপূর্ব জনসমর্থনে তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। এবং এই সব কথা বলে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তিনি প্রকাশ্যভাবে N. D. F.-এর বিরোধিতা করতে সাহস পান নি। তবে কৌশলে এই ঐক্যজোটকে তিনি দুর্বল করতে চেয়েছিলেন। অভিজ্ঞ ও ধূর্ত রাজনীতিবিদ ভাসানী ধীরে ধীরে তাঁর দাবার গুটি চালতে শুরু করলেন। সে গুটি যে আইয়ুব সরকারের প্রশাসন-যন্ত্র থেকে তৈরী হয়েছিল সেটা তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপেই প্রমাণ করে দেয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জামান এ সময় প্রদেশের দুটো দৈনিক 'ইত্তেফাক' ও 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর বিরুদ্ধে ন্যক্কারজনক উক্তি করায় শেখ মুজিব ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এই পত্রিকা দুটো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থনে কাজ করছিল। এই আক্রমণের প্রতিবাদে শেখ মুজিব ১৯৬৩ সালের ২৩শে এপ্রিল এক বিবৃতিতে ওয়াহিদুজ্জামানকে তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন-যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেনঃ "১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে দশ হাজারেরও বেশী ভোটের ব্যবধানে ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত ক'রে আমি জয়ী হয়েছিলাম। যদি জনাব জামান নিজেকে এতই জনপ্রিয় বলে মনে করেন তবে আমি তাঁকে আবার আমার সঙ্গে নির্বাচনে লড়বার জন্য আহবান জানাচ্ছি। এবং আমি আশা করি, তিনি আমার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন। মন্ত্রী পদে ইস্তাফা না দিয়েও সেই সুবিধাজনক পদে অধিষ্ঠিত থেকেই তিনি আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে দেখুন। ইনশাল্লাহ্ এবার আরও বিপুল ভোটাধিক্যে আমি তাঁকে হারাতে পারব।" কিন্তু জামান সাহেব তাঁর সেই নির্বাচনী-যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নি।

যাহোক, মওলানা সাহেব সম্পর্কে যা ভয় করা গিয়েছিল তাই সত্যে পরিণত হ'ল। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানী খোলাখুলিভাবেই N. D. F.-এর

বিরোধিতা শুরু ক'রে দিলেন। তিনি N.D.F.-কে 'Nothing Doing Front' বলেও ব্যঙ্গোক্তি করলেন। ভাসানী সাহেবের এই সকল উক্তির ফলে কাণ্ডারীবিহীন N. D. F. -এর ক্রিয়াকলাপ শিথিল হতে লাগলো। নূরুল আমীন ছিলেন এই ফ্রন্টের পূর্বাঞ্চল-প্রধান। শেখ মুজিবের প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শহীদ সাহেব ১৯৫২ সালের খুনী নূরুল আমীনকে আঞ্চলিক প্রধান মনোনীত করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ ছিল—গণতন্ত্র উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই তিনি এই আপোষ করেছিলেন। কিন্তু শহীদ সাহেবের অনুপস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল নূরুল আমীন সাহেবের ভূমিকা মোটেই আন্দোলনমুখী ছিল না। উপরন্তু ভাসানীর প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করবার মত বুকের বল ও সৎ সাহস তাঁর ছিল না।

N.D.F.-এর এই অচল অবস্থার দরুন বাধ্য হয়ে শেখ মুজিব ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গ্রহণের পরামর্শের জন্য নেতা সোহরাওয়ার্দীর কাছে গেলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন বৈরুত হয়ে লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন। ১৯৬৩ সালের ৮ই আগস্ট রাতে শেখ মুজিব ঢাকা থেকে লণ্ডনের পথে করাচী যাত্রা করলেন। এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে ২৮শে আগস্ট করাচীতে ফিরে এলেন। ঢাকায় এসে তিনি আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের বাসায় এক বৈঠকে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার পূর্ণ বিবরণী পেশ করলেন।

২রা সেপ্টেম্বর (১৯৬৩) আইয়ুব সরকার এক নয়া অর্ডিন্যান্স জারী করলেন। এতে পাকিস্তানের সংবাদপত্র ও পত্রিকার ওপর কতকগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই অর্ডিন্যান্স জারীর ফলে উভয় অঞ্চলের সাংবাদিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে এক হরতাল পালন করেন। সেদিন বিকেলে প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের এক সমাবেশে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেনঃ "বর্তমানে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তা' শুধু সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার জীবন-মরণের সংগ্রামই নয়, সে সংগ্রামের সঙ্গে একটি স্বাধীন জাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইও বিজড়িত।"

নয়া প্রেস অর্ডি-ন্যান্সের প্রতিবাদে তোফাজ্জল হোসেন

এ সময় দেশের কয়েকটি অঞ্চলে জাতীয় পরিষদের সদস্যদের কয়েকটি পদের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কেননা জাতীয় পরিষদের কয়েকজন সদস্য মন্ত্রীপদে যোগ দেয়ায় তাঁদের সদস্যপদ বাতিল হয়। এই পদগুলো যাতে বাতিল হয়ে না যায় তার জন্য তাঁরা এবং তাঁদের সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু ঢাকা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী তাঁরা সদস্যপদ হারান। ফলে, তাঁদের স্ব-স্ব এলাকায় পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রদেশের উপনির্বাচন

এই নির্বাচনে শেখ মুজিব N. D. F. প্রার্থীদের পক্ষে জোর প্রচারণা চালান। কিন্তু দুর্নীতিবাজ আইয়ুব সরকারের অর্থের লোভে বশীভূত হয়ে মৌলিক গণতন্ত্রী' নামধারী দালালরা জনগণের সমর্থনকে ও স্বার্থকে উপেক্ষা ক'রে সরকারী দলের প্রার্থীকেই নির্বাচিত করেন। তা' ছাড়া সরকারী কর্মচারীরাও নিজেদের বিবেক-বিবেচনাকে বিসর্জন দিয়ে চাকরী রক্ষার খাতিরে সরকারের পক্ষে দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ চালায়। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় কাজ সেরে ১৮ই অক্টোবর শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে আসেন। এবং ২০শে অক্টোবর তাঁর বাসভবনে (ঢাকায়) এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারী কর্মচারীদের অন্যায় কার্যকলাপের বর্ণনা ক'রে তার কঠোর নিন্দা করেন। তিনি সাংবাদিকদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, পূর্ব বাংলার লোকেরা পিণ্ডির উপনিবেশে পরিণত হয়েছে।

শহীদ সাহেব তখন বৈরুতে। লণ্ডন থেকে পুনরায় বৈরুতে গিয়ে এক হোটেলে অবস্থান করছিলেন। 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেনের কাছে চিঠিতে তিনি দেশে ফেরার জন্য আকুল বাসনার কথা বার বার জানাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে দেশের জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে চলেন।

কিন্তু বাঙালীর দুর্ভাগ্য। যে নেতার নির্দেশে তাঁরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁকে আর কোনদিন নিজেদের মধ্যে তাঁরা ফিরে পেলেন না। ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার সময় হঠাৎ ঢাকায় মর্মান্তিক এক খবর ছড়িয়ে পড়লো। সেদিনই রাত তিনটা কুড়ি মিনিটে বৈরুতের কন্টিনেন্টাল হোটেলে বাংলার নির্ভীক নেতা শেখ মুজিবের রাজনৈতিক

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু

গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অনাত্মীয় নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর বছর দুই মাস সাতাশ দিন।

নেতার মৃত্যুর সংবাদে সারা বাংলাদেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ৬ই ডিসেম্বর ('৬৩) 'দৈনিক ইত্তেফাক' শিরোনামায় লিখলেন: "পাকিস্তানের ভাগ্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—নিপীড়িত জনতার অকৃত্রিম সুহৃদ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মহাপ্রয়াণ।"

শহীদ সাহেবের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে অনেকে সন্দেহের চোখে দেখলেন। অস্বাভাবিক এইজন্য যে, মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই তিনি শীঘ্র সুস্থ হয়ে ঢাকায় ফিরছেন বলে জানিয়েছিলেন। কেউ কেউ ধারণা করেন যে, আইয়ুব খানের নির্দেশে তাঁকে বিষের ইন্‌জেকশন দিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁকে যে মেরে ফেলার চক্রান্ত করা হয়েছিল এ বিষয়ে বোধ হয় তিনি টের পেয়েছিলেন। ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন সাহেবের কাছে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে এ আশঙ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন: Of course, this is for you only. If I die, I shall be happy. There is no point in living. I am of no further use to anybody and if of use to myself then life is not worth it.

ডিসেম্বরের ৮ তারিখে নেতার মরদেহকে বৈরুত থেকে করাচী হয়ে ঢাকায় আনা হ'ল। তাঁকে ঢাকা বিমান বন্দরে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবসহ লক্ষ লক্ষ দর্শক কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পরে মর-হুমকে শেখ মুজিবের নির্দেশে রমনা রেসকোর্সের কাছে শেরে বাংলা ফজলুল হকের পার্শ্বে কবর দেয়া হয়। শেখ মুজিব নেতার মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি ১৫ই ডিসেম্বর ('৬৩) জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট কর্তৃক আহূত এক শোকসভায় এর প্রতিশোধ নেবার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণকে আহ্বান জানালেন। তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে বললেন: "আমি জানি না, জনাব সোহরাওয়ার্দী মারা গিয়েছেন কি-না, কিন্তু আমি মনে করি—আমার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে জেলে পুরে আমার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। আমার বাঙালী ভাইরা, ঐক্যবদ্ধ হোন এবং প্রতিশোধ নিন। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ুন। যারা

আমাদের নেতাকে হত্যা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিশোধ নিতে হবে।"

[গতিবেগ চঞ্চল বাঙলাদেশ : মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিবঃ অমিতাভ গুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৫২৪]

পরে অবশ্যই শেখ মুজিবের এই বক্তৃতার জন্য তাঁকে অনেক মাশুল দিতে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ক'রে হয়রানী করা হয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পাক সরকারের উস্কানি

১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাস। সারা পূর্ব বাংলা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে কলুষিত হয়ে গেল। কাশ্মীরের এক মসজিদে রক্ষিত হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর কেশ অকস্মাৎ চুরি হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তান সরকার সেটা হিন্দু কাফেরদের কীর্তি বলে অভিযোগ আনেন এবং দেশবাসী মুসলমানদেরকে তার প্রতিশোধ নেবার জন্য উস্কানি দিতে থাকেন। এই উস্কানির ফলে খুলনা থেকে আরম্ভ ক'রে সারা পূর্ব বাংলায় হিন্দু নিধনযজ্ঞ শুরু হয়।

এই সময় শেখ মুজিব দেশবাসীকে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা ও ধর্মান্ধতার শিকারে পরিণত না হবার জন্য বার বার আহ্বান জানান। উক্ত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ১৪ই জানুয়ারী ইত্তেফাক পত্রিকায় লেখা হ'ল: "সীমান্ত পারের ঘটনার নামে দেশ, জাতি ও মানবতার চিরদুশমন এবং সভ্যতার দুরপণেয় কলঙ্ক সমাজদ্রোহীরা নারায়ণগঞ্জের শিল্প-এলাকা ও ঢাকায় যেভাবে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে তাহা সর্বশক্তি দিয়া প্রতিরোধের জন্য শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন দেশবাসীর কাছে আকুল আবেদন জানাইতেছি।"

শেখ মুজিব নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৪ই জানুয়ারী সকালে নারায়ণগঞ্জের মিলে

দাঙ্গা প্রতিরোধে শেখ মুজিব

দাঙ্গা বেধে যায়। শেখ মুজিব দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হাজার হাজার উত্তেজিত শ্রমিককে মানবতার বিরোধী এই জঘন্য কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য আকুল আবেদন জানান। এমন কি বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য উত্তেজিত মুসলিম শ্রমিকদের সামনেই মিলের ভেতরে তিনি আহত হিন্দু শ্রমিকদেরকে দেখার জন্য গেলেন।

পরদিন ঢাকার উয়ারী এলাকা থেকে হিন্দুদেরকে নিরাপদ স্থানে সরানোর সময় তিনি এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। মুসলিম দাঙ্গা-কারীরা তাঁর ওপর আক্রমণ চালায়। ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। সেদিন 'ইত্তেফাক' অফিসেও হামলা করা হয়েছিল। কিন্তু গুণ্ডারা সুবিধা করতে পারে নি। ইত্তেফাককে আক্রমণ করার কারণ হ'ল এই প্রগতিবাদী পত্রিকা সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর জন্য সরকারের তীব্র নিন্দা করেন এবং এর প্রতিরোধের জন্য দেশবাসীকে আকুল আবেদন জানাচ্ছিলেন। সেদিন অর্থাৎ ১৫ তারিখের সকালেই ইত্তে-ফাকের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিলঃ "সীমান্তের অপর পারে যাহাই ঘটুক, আমাদের স্বদেশভূমিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ও আত্মঘাতী রক্তপাত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য এ দেশের কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী সকলের প্রতি আমরা পুনর্বার আকুল আহ্বান জানাই-তেছি।" সে আহ্বান দুষ্কৃতিকারীদের মনঃপূত হবার কথা নয়। তাই সেদিন সেই জঘন্য আক্রমণ। এখানে বলে রাখা ভাল যে, এই দাঙ্গা-কারী মুসলমানরা ছিল অবাঙালী। এইসব অবাঙালীরা ছিল ভারতের বিহার অঞ্চল থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তু। এরা বিহারী বলে সবার কাছে পরিচিত। ভারত থেকে এদের বিতাড়নেরও কারণ রয়েছে। পাক-ভারত স্বাধীনতার প্রাক্কালে মুসলমানদের আলাদা অস্তিত্ব নিরূপণের জন্য তৎকালীন মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এদেরকে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে। দেশ ভাগের পর এরা স্বভাবতঃই ভারতীয় হিন্দুদের কোপদৃষ্টিতে পড়ে। ফলে প্রাণের ভয়ে তারা পূর্ব বাংলায় পালিয়ে আসে। পাকিস্তান সরকারও এদেরকে সাদরে গ্রহণ করে। এবং ভবিষ্যতে এদেরকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে বাঙালী মুসলমানদের থেকে আলাদা ক'রে রেখে তালিম দিতে থাকে। এরা প্রকৃতিতে নির্ভীক এবং নিষ্ঠুর। বাইরে চাকুরী ও কুলী-শ্রমিকের খোলস পরে থাকলেও আসলে গুণ্ডামিই এদের মূল পেশা। তাই পাকিস্তান সরকার যথাসময়ে এদেরকেক াজে নামিয়েছিল। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর সংবাদে পূর্ব বাংলার জনগণ আবার অধীরত্ত হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ শেখ মুজিব এই জাগ্রত

চেতনাকে ধীরে ধীরে বাঙালী জাতীয়তাবাদ উজ্জীবনের পক্ষে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হন। তাঁর সে প্রয়াস যেমন আন্তরিক, তেমনি নিরলস। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণতন্ত্রের একজন অতন্দ্র প্রহরী—শেখ মুজিব তাঁরই অনুসারী। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই শেখ মুজিব তাঁর আদর্শের অনুসরণে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যদিও তখনো তিনি N. D. F.-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ফলে আইয়ুব-মোনেম চক্র শেখের গতিকে রুদ্ধ ক'রে দেবার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে লাগলেন। সুযোগও এল। একটা অজুহাতকে কেন্দ্র ক'রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়া হ'ল। উদ্দেশ্য, জনগণকে বোঝানো যে, মুসলমানরা হিন্দুদের চিরশত্রু। এবং তারা সব সময় মুসলমাদের ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট। অতএব, মুসলমানদেরও উচিত হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

সাময়িকভাবে একটি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম ক'রে গণ-আন্দোলনকে দমিয়ে দেবার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলতে লাগল। আর ভবিষ্যতেও যাতে ক'রে শেখ মুজিব কখনও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চিন্তাধারার মাধ্যমে জনমত গঠন করতে না পারেন, তার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মনে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু-বৌদ্ধদের সম্পর্কে একটা বৈষম্যমূলক ধারণার দেয়াল খাড়া ক'রে রাখার চেষ্টাকে শক্তিশালী ক'রে তোলা হ'ল।

এই দাঙ্গা যে সম্পূর্ণভাবে সরকারের প্ররোচনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, দাঙ্গা প্রতিরোধ সম্পর্কে সরকারের সম্পূর্ণ উদাসীনতাই তার প্রমাণ দেয়। মানবতার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতাসীন চক্র ব্যক্তিগত স্বার্থের খড়্গের সাহায্যে ক্ষমতার স্তম্ভকে অটুট রাখবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু বাঙালী মুসলমান জনগণ সরকারের ইঙ্গিতকে বিন্দুমাত্র সমর্থন করেন নি। বরং এই বর্বরতাকে প্রতিরোধের জন্য জীবন দানের দৃষ্টান্তও বিদ্যমান রয়েছে। ঢাকার শাজাহানপুরনিবাসী বিশিষ্ট সমাজকর্মী, সংস্কৃতিসেবী ও সাহিত্যিক জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী দাঙ্গাকারী মুসলমানদের মানবতার দোহাই দিয়ে বাধা দিতে গিয়ে শাহাদৎ বরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাঁকে ছুরিকাঘাতে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

এইসব অবাঙালী দুষ্কৃতিকারীরা শুধু যে মানুষই খুন করেছে তাই নয়, তারা মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, বাড়ী-ঘর লুট করেছে, আগুন

ধরিয়ে দিয়েছে। আর এদের কার্যকলাপে সরকার ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এই হ'ল মৌলিক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার একটি উজ্জ্বল পদক্ষেপ।

জানুয়ারীর ১৬ তারিখে ইত্তেফাক অফিসে ঢাকায় সমাজের সর্বস্তরের ৯৯ জন নাগরিক নিয়ে একটি বেসরকারী 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটির উদ্যোগী ছিলেন শেখ মুজিব ও তোফাজ্জল হোসেন। কমিটির আহবায়ক এবং সদস্য নিযুক্ত হন শেখ মুজিব। এর অফিস ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপিত হ'ল ঢাকার ৩৩ নং তোপখানা রোডে। সেদিনই অর্থাৎ জানুয়ারীর ১৬ তারিখেই শেখ মুজিবের উদ্যোগে 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' কর্তৃক "পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও" শীর্ষক এক ইস্তাহার প্রচার করা হয়। এই ইস্তাহারে বলা হ'ল ঃ

দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন

"সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তের ঘৃণ্য ছুরি আজ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘাতকের ছুরি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার মানুষের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্বৃত্তের হামলায় ঢাকার প্রতিটি পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা আজ বিঘ্ন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ী পোড়ান হইতেছে, সম্পত্তি বিনষ্ট করা হইতেছে। এমন কি জনাব আমীর হোসেন চৌধুরীর মত শান্তিকামী মানুষদেরও দুর্বৃত্তের হাতে জীবন দিতে হইতেছে। তাঁহাদের অপরাধ কি ছিল একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। গুণ্ডারা মুসলমান ছাত্রীনিবাসে হামলা করিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের মা-বোনদের সম্ভ্রম আজ মুষ্টিমেয় গুণ্ডার কলুষ স্পর্শে লাঞ্ছিত হইতে চলিয়াছে।

এই সর্বনাশা জাতীয় দুর্দিনে আমরা মানবতার নামে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্মান ও মর্যাদার নামে দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি ঃ

আসুন সর্বশক্তি লইয়া গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াই। শহরে শান্তি ও পবিত্র পরিবেশ ফিরাইয়া আনি।

মনে রাখিবেন, আজ ঢাকা ও অন্যান্য শহরে যে জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইতেছে উহা আমাদের নিজেদের সম্পত্তি এবং নিজেদের ভাই-বোনের জীবন। এই গুরুতর ক্ষতি পূর্ব বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার

উপর গুরুতর আঘাত হানিবে। আরও মনে রাখিবেন, সীমান্তের অপর পারে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে উহাকে মূলধন করিয়া দুর্বৃত্তরা লুণ্ঠন ও অন্যান্য উপায়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার চক্রান্তে মাতিয়াছে। ইহাদের একটি বিশেষ কায়েমী স্বার্থবাদী মহল হইতে প্ররোচনা ও সাহায্য দেওয়া হইতেছে। সর্বশক্তি দ্বারা ঐক্যবদ্ধভাবে এই দুশমনদের আজ রুখিতে না পারিলে ভবিষ্যতে এই ঘাতকশ্রেণীর ছুরি আমাদের সকলের জীবন ও সম্পত্তির উপর উদ্যত হইবে। আমাদের চোখের সামনে আমাদের মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হইবে, পূর্ব বঙ্গের মানুষ নিজগৃহে পরবাসী হইবে।

পূর্ব বাংলার জীবনের উপর এই পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে আমরা পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে আহ্বান জানাইতেছি :

* প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন।
* গুণ্ডাদের শায়েস্তা করুন, নির্মূল করুন।
* পূর্ব পাকিস্তানের মা-বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষ্যতকে রক্ষা করুন।"

[দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান]

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক এই প্রচারপত্র ছেড়ে দেবার অভিযোগে শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হ'ল। অবশ্য পরে তাঁরা উভয়েই জামিনে মুক্তি পান। কিন্তু পুলিশের আইন থেকে তাঁরা রেহাই পেলেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে 'প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স' ও পাকিস্তান দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারার অপরাধ অনুষ্ঠানের চার্জ এনে মামলা দায়ের করা হ'ল।

শেখ মুজিব-তাজউদ্দিনের গ্রেফতার ও মুক্তি

শহীদ সাহেবের মৃত্যুর পর শেখ মুজিব জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের আর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না। তাই তিনি রাজনৈতিক জীবনের পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদেরকে নিয়ে স্বীয় পার্টি 'আওয়ামী লীগ'কেই পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জানুয়ারীর ২৫ ('৬৪) তারিখে মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশের সভাপতিত্বে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে সাবেক

আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন

আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। তবে এই সভায় জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা উপস্থিত হন নি। এই সভায় জনগণের সার্বভৌমত্বসহ পূর্ণ গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরদিন পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে কয়েকটি রাজনৈতিক দাবী সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবাকারে গৃহীত হ'ল। যেমন—

(১) দেশে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন।

(২) আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব।

(৩) পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিকভাবে শক্তিশালী করা।

(৪) পাকিস্তানের নৌবাহিনীর সদর দফতর চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা।

(৫) রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি।

কিন্তু আতাউর রহমান খান আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনে সমর্থন জানালেন না। বরং এতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাঁর মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ক'রে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

অবশ্য পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগ জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বিরোধী ছিল না। বরং এন. ডি. এফ. এর একটি অঙ্গদল হিসেবেই আওয়ামী লীগ বাইরে থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল।

আতাউর রহমান খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের যে মতবিরোধ তা' এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ৬ই মার্চ ঢাকার গ্রীনরোডে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী এক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এর আগে পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগকেও পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল। কাউন্সিলে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের জাতীয় পরিষদ সদস্যসহ প্রায় এক হাজার কাউন্সিলার অংশ গ্রহণ করেন। সেদিন সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এক গুরুত্বপূর্ণ লিখিত ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি বলেছিলেনঃ "আওয়ামী লীগের

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন

ইতিহাস আপনাদের সংগ্রামের ইতিহাস। আপনারা জানেন, কোন্ অবস্থায় কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল। আপনারা জানেন, সৃষ্টি থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত কত রকম প্রতিকূল অবস্থা ও বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে আপনারা আওয়ামী লীগকে দেশের সেরা ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পেরেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গণতন্ত্রের মূলনীতি যে দেশ থেকে যখন তখন মুষ্টিমেয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষমতাসীন মহলের ইঙ্গিতে নির্বাসন দেওয়া হয়, যে দেশে কথায় কথায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নেতা ও কর্মীদের জেলে আটক করা হয়, সে দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করা এক বিরাট কাজ, সুকঠিন দায়িত্ব।"

অমিতাভ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০৬—৫০৭]

এই সুকঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি তাঁর সহকর্মীদেরকে আকুল আবেদন জানালেন। তিনি বললেনঃ "আসুন, আজ আমরা এই শপথ গ্রহণ করি যে, যতদিন না পাকিস্তানের বুক থেকে স্বার্থান্বেষী মহলের পরাজয় ঘটবে, যতদিন না এদেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে পারব, যতদিন না দেশকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে পারব, যতদিন না সমাজ থেকে শোষণের মূলোৎপাটন হবে, যতদিন না দেশের প্রত্যেক নাগরিক দলমতধর্ম নির্বিশেষে অর্থনৈতিক মুক্তি ও আর্থিক প্রাচুর্যের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে, যতদিন না শ্রেণী-বিশেষের অত্যাচার থেকে সমগ্র দেশ ও জাতিকে মুক্তি দেয়া যাবে, ততদিন আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। ন্যায় আমাদের নীতি, আমাদের আদর্শ। জয় আমাদের অনিবার্য।"

[ঐ, পৃঃ ৫০৮]

শেখ মুজিবের এই ভাষণ সেদিন কর্মীদের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করলেন।

১১ই মার্চ ('৬৪) ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রাপ্তবয়স্কদের

ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি (All parties action committee) গঠন। এই সংগ্রাম কমিটির ঘোষণাপত্রে আওয়ামী লীগের পক্ষে স্বাক্ষর করেন শেখ মুজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে আগামী ১৮ই ও ১৯শে মার্চ ('৬৪) সারা পূর্ব বাংলায় 'প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন দিবস' পালন করা হবে।

সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি

১৮ই মার্চ ভোটাধিকার দাবী দিবসের প্রথম দিনেই শেখ মুজিবের অন্যতম দুই সহকর্মী তাজউদ্দিন আহমদ ও কোরবান আলীকে পুলিশে গ্রেফতার করলো। এদিন ছাত্র-জনতার মিছিলের ওপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। পরদিন ঢাকায় হরতাল পালিত ও বিকেলে পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন জনসভা শেষে এক বিশাল জনসমুদ্র মিছিলের আকারে ঢাকার রাজপথে নেমে পড়ে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব।

তাজউদ্দিন ও কোরবান আলীর গ্রেফতারের প্রতিবাদ মিছিলে শেখ মুজিব ও ভাসানী

সেদিনের জনসভায় ভাসানী ও শেখ মুজিব উভয়েই হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দান করেন। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেনঃ "সভ্যতার কোন পর্যায়েই জন্মগত অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যায় নি। ফেরাউন মানুষকে জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে নি, হিটলার পারে নি, আজ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীও পারবে না। একদিন দেশবাসী দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের জন্মগত অধিকার ছিনিয়ে আনবেই আনবে।"

অমিতাভ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১৩]

আগের দিনের মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও গ্রেফতারের কঠোর সমালোচনা ক'রে শেখ মুজিব বলেনঃ "আজ জাতি যখন তার দাবী নিয়ে সংগ্রামে নেমেছে তখন ঢাকা শহর পুলিশে পুলিশে ছেয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ এই সেদিন যখন দাঙ্গাবাজদের উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে পৌঁছেছিল, তখন এই পুলিশ পুঙ্গবরা কোথায় ছিল?"

[ঐ, পৃঃ ৫১৩]

তিনি লক্ষ লক্ষ জনতাকে উদ্দেশ ক'রে আরো বললেনঃ "বাংলার ভায়েরা আমার, স্পষ্ট ক'রে আজ আপনাদের থেকে জেনে যেতে চাই আমরা যদি জেলে চলে যাই পারবেন কি আপনারা হৃত অধিকার ছিনিয়ে আনার জন্য গ্রামে গ্রামে দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে যেতে? জেল-জুলুমের মুখে আপনাদের ছেলেরা আজ যেমন বুক পেতে দিয়েছে, পারবেন কি আপনারা তেমনি ক'রে ত্যাগ ও সাধনার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে? পারবেন কি আপনারা হাজারে হাজারে আইয়ুব সরকারের কারাগার ভরে তুলতে?"

লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ সমস্বরে গর্জে উঠলো—"পারব, পারব।"

[ঐ, পৃঃ ৫১৪]

সেদিনের জনসভায় মওলানা ভাসানীও এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি আইয়ুব সরকারকে সতর্ক ক'রে বললেনঃ "বাঙালী সম্রাট অশোককে মানে নি। মোগল পাঠানেরও অনুগত হয় নি। ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করে নি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ায় জনতার রুদ্ররোষে প্রবল ক্ষমতাশীল মুসলিম লীগ আজ কবরে শায়িত। এবারো সরকার যদি ভোটাধিকারের দাবী মেনে না নেন, তবে দেশে আর এক রাষ্ট্রভাষার ঘটনা ঘটবে।"

[ঐ, পৃঃ ৫১৪]

এই গণজাগরণের মুখেই রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ই মার্চে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের দিনে ছাত্ররা প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এর কয়েকদিন পর ২২শে মার্চ ('৬৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮তম সমাবর্তন উৎসবের কথা ছিল। পদাধিকারবলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলার ছিলেন গভর্নর মোনেম খান। তিনি যখন ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ছাত্ররা চারিদিক থেকে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অপমানিত গভর্নরের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং তিনজন সাংবাদিকসহ ৩১৩ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে।

কয়েকদিন ধরে ব্যাপক ধর-পাকড় চলল। যাদেরকে গ্রেফতার করা

হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন সংগ্রামী যুব নেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও পাবনার ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। এঁদেরকে মার্চের ২৬ তারিখে গ্রেফতার করা হয়।

২৯শে মার্চ ('৬৪) সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করা হয়। এইদিন পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তার ভাষণে শেখ মুজিব ভোটাধিকার না দিলে সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার ক'রে দেন।

এর কয়েকদিন পর ২রা এপ্রিল ছাত্র আন্দোলন সংক্রান্ত সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশের দায়ে 'দৈনিক সংবাদ' ও 'আজাদ' থেকে ৩০,০০০ টাকা ক'রে জামানত তলব করলে পরদিন শেখ মুজিব সরকারকে আর এক দফা হুঁশিয়ারী ক'রে বলেন যে, গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করতে না দিলে জনগণ অগণতান্ত্রিক পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে।

শেখ মুজিব এপ্রিল ও মে মাসে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন জেলায় গণসংযোগ সফরে বেরিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার জন্য জনসমর্থন অর্জন করা।

১৯৬৪ সালের মে মাসের ২৭ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরু অকস্মাৎ নয়াদিল্লীতে পরলোক গমন করেন।

জওয়াহেরলাল নেহেরুর মৃত্যু

শেখ মুজিব গণতন্ত্রের দিশারী এই মহান দার্শনিক ও চিন্তানায়কের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে নেহেরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করলেন। অর্থের দ্বারা বশীভূত মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা আইয়ুব খান নিজেকে একবার বাজিয়ে নিতে চাইলেন। আর চাইলেন নিজের কর্তৃত্বকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে।

কিন্তু নিজেদের আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিরোধী দলের বিষদাঁত ভেঙে দেয়া একান্ত আবশ্যক। আর যাঁর দাঁতের ধার সবচেয়ে বিষাক্ত ও তীক্ষ্ণ তিনি হলেন শেখ মুজিব। অতএব তাঁকে শায়েস্তা করা প্রয়োজন।

এই প্রয়োজনের খাতিরে ১৯৬৪ সালের ৩১শে মে বিকেল বেলায় শেখ মুজিবকে তাঁর ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন থেকে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭(৩) ধারা এবং পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারা অনুযায়ী গ্রেফতার করা হ'ল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে পল্টনের এক শোকসভায় নেতার মৃত্যুর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ ক'রে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহিতা-মূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অবশ্য পরে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। জুলাইয়ের ৫ তারিখে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

শেখ মুজিবের গ্রেফতার

এই বৈঠকে আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে কাকে দাঁড় করানো যায়, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলের সাথে নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি তিনজন বিশিষ্ট নেতার ওপর ভার দিলেন। এঁরা হলেন—শেখ মুজিবুর রহমান, নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও জনাব আবদুস সালাম খান। যদিও শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ব্যতিরেকে মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে কোনরূপ নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন না, তথাপি স্বৈরাচারী সর-কারকে উৎখাতের প্রশ্নে এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে-ছিল। শেখ মুজিব এই নির্বাচনকে একটা যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধ শোষিত নিপীড়িত মানুষের বাঁচা-মরার যুদ্ধ।

স্বৈরাচারী সরকার আইয়ুবের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জন্য ১৯৬৪ সালের ১২ই জুলাই সারা পূর্ব পাকিস্তানে 'জুলুম প্রতি-রোধ দিবস' উদযাপিত হয়। ঐদিন পল্টন ময়দানে শেখ মুজিব যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তা' নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ নীচে দেয়া হ'ল ঃ

জুলুম প্রতিরোধ দিবস

"সোনার বাংলার ভাইয়েরা আমার! স্বাধীনতার ১৭ বছর পরে আবার জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নামতে হবে—১৭ বছর পরে আবার ভোটের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হবে—১৭ বছর পরে আবার রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে হবে—একথা কোন

দিন ভাবি নি। নিজ দেশে নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধেও ব্রিটিশ আমলের মত জনগণের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হবে ভাবলে মন আমার শিউরে ওঠে।

গত কদিনে দিনাজপুরের পঞ্চগড় থেকে শুরু ক'রে চট্টগ্রামের কক্স-বাজার পর্যন্ত সিলেটের সীমান্ত থেকে বরিশাল পর্যন্ত ঘুরেছি। অন্ততঃ ৬০টি জনসভায় বক্তৃতা করেছি—দাবী করেছি, প্রস্তাব পাশ করেছি: "জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দাও, বাঁচার মত বাঁচতে দাও।" কিন্তু ফল কিছুই হয় নি, সরকার কানে তুলো দিয়েছেন।

আজ জুলুম প্রতিরোধ দিবসের সভায় দাঁড়িয়ে মনে পড়ে সেই দিনটির কথা, যেদিন ১৯৫৮ সালে আল্লাহ্‌র রহমতে ইস্কান্দার মীর্জা আইয়ুব খানের হাতে বন্দুক দিয়ে 'ধিকৃত রাজনীতিকদের' হাত থেকে পাকি-স্তানকে 'রক্ষা' করেছিলেন।

গতকাল এইখানে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীলীগের জনাব সবুর শাহেদ আলীর হত্যার প্রসঙ্গ তুলে দেশে সামরিক শাসন জারীর 'মরতবা' বিশ্লেষণ ক'রে গিয়েছেন। সামরিক শাসন জারীর কারণ ব্যাখ্যা ক'রে সবুর ভাই সেদিনকার সামরিক শাসনের যে প্রশস্তি গেয়েছেন, তা' কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব, কেননা সামরিক শাসন জারীর পর, তাঁর প্রতি সামরিক শাসন-কর্তার যে 'নেক নজর' পড়েছিল তার স্মৃতিই হয়ত তাঁকে এ প্রশস্তি গাইতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আমার সবুর ভাই অভিযোগ করেছেন যে, জনাব শাহেদ আলীর হত্যার মধ্য দিয়ে ধিকৃত রাজনীতিকরাই এদেশে সামরিক শাসন ডেকে এনে-ছিল। জবাবে আমি বলব, মরহুম শাহেদ আলী আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন। সুতরাং আওয়ামী সরকার নিশ্চয়ই তাঁকে হত্যা করেন নি। তা' হলে তাঁকে হত্যা করলো কে?

শাহেদ আলীকে হত্যা করেছে কে?

মরহুম শাহেদ আলীর হত্যার পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। দেশে সামরিক শাসন জারীর ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল সে ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য। এই কারণেই সামরিক শাসন জারীর পর মরহুম শাহেদ আলী হত্যাকাণ্ডের তদন্ত বন্ধ করা হয়। জিজ্ঞাসা করি, ধিকৃত রাজনীতিকরাই যদি শাহেদ

আলীর হত্যার জন্য দায়ী ছিলেন তবে সামরিক সরকার সে হত্যা-কাণ্ডের তদন্ত বন্ধ করলেন কেন? কেনই বা তাঁর হত্যাকারীদের বিচার করা হ'ল না। এ প্রশ্নের জবাবও আমাদের অজানা নাই। আমরা জানতাম শাহেদ আলীর হত্যার তদন্ত করা হ'লে অনেক রহস্যই ফাঁস হয়ে পড়তো। তাই 'ন্যায়বিচারকের' আসনে বসে সামরিক সরকার আমার মত অনেক অভাগার উপর বিভিন্ন অভিযোগে জেল-জুলুম আর অত্যাচার-নির্যাতনের বন্যা বইয়ে দিলেন, কিন্তু শাহেদ আলীর হত্যা-কাণ্ডের তদন্ত বা বিচারের প্রশ্নে টুঁ শব্দটিও করলেন না।

সামরিক শাসন জারীর কারণ কি এই নয়?

শাহেদ আলীর হত্যাকাণ্ড যদি দেশে সামরিক শাসন জারীর কারণ হয়ে থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আজ যেখানে আপনারা রাজধানী করেছেন, সেই রাওয়ালপিণ্ডির প্রকাশ্য জন-সভায় দিনে দুপুরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে যখন হত্যা করা হ'ল, তখন কেন দেশে সামরিক শাসন জারী করা হ'ল না? জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ১৯৫২ সালের মজহাবী হাঙ্গামায় পশ্চিম পাকিস্তানে রক্তের বন্যা বয়ে গেল, তখন কেন সামরিক শাসন জারী করা হ'ল না? জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ১৯৫৩ সালে জনাব গোলাম মোহাম্মদ যখন পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে খাজা নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত ক'রে দেশে মারাত্মক শাসনতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি করেছিলেন, তখন কেন সামরিক শাসন জারী করা হ'ল না? তাই বলি সামরিক শাসন জারীর কারণ জনাব শাহেদ আলীর হত্যাকাণ্ড নয়, অন্য কিছু। সামরিক শাসন জারীর কারণ কি এই নয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের ১৫টি উপনির্বাচনে একের পর এক ১৪টি আসনেই আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত হতে দেখে এবং আওয়ামী লীগের গণস্বার্থমুখী ভূমিকা দৃষ্টে এদেশের উপরতলার এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ বাদী মহলের টনক নড়ে যায়। তাই, দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের মাত্র ৪ মাস বাকী থাকতে তাঁরা যখন আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল আঁচ করতে পারেন, বিশেষ করে তাঁরা যখন বুঝতে পারেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে তবে পূর্ব পাকিস্তানের পাওনা কড়ায়

গণ্ডায় তারা আদায় ক'রে নেবে। তখনই তারা 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে' লিপ্ত হন। আর সেই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শেষ গুটি চালা হয় দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের মাত্র ৪ মাস আগে দেশে সামরিক শাসন জারীর মাধ্যমে। আর তারই প্রথম শিকার হন আওয়ামী লীগ ও তার নেতা দেশবরেণ্য জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

গতকাল সবুর ভাই অতীতের রাজনৈতিক আমলের সরকারদের বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা অভিযোগ ক'রে গিয়েছেন তা' শুনলে খোদ শয়তানও 'লা হাওলা' পড়ে দেশ ছেড়ে পালাবে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৮২৬ জন রাজবন্দী কারাগারে আটক ছিলেন, এমন কথা কেবল বেহায়ারাই বলতে পারে।

শয়তানও লা হাওলা পড়ে দেশ ছেড়ে পালাবে

একমাত্র আওয়ামী লীগই জেল থেকে সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েছিল একথা সবুর ভাইও জানেন, তবে এখন প্রয়োজনের খাতিরে তিনি ন্যাকা সেজেছেন। কেবল তাই নয়, আওয়ামী লীগ নিরাপত্তা আইনও সমূলে বাতিল করেছিল। আওয়ামী লীগ যদি নিরাপত্তা আইন বলবৎ রাখতো এবং সবুর ভাইদের যদি জেলে পুরে দুই দিনের জন্যও লাপ্সি খাওয়াবার ব্যবস্থা করতো তবে আজ তাঁরা নিরাপত্তা আইনের নামও মুখে আনতেন না।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১০ বৎসর যাবৎ দেশে যে দল ক্ষমতাসীন ছিলেন, জনাব সবুর নিজেও সে দলের সদস্য ছিলেন। বৈষম্যের গোড়াপত্তনও তাঁদের আমলেই ঘটে। মাঝে মাত্র তের মাসের জন্য পরিষদে ১২ সদস্য-বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ অন্যের কাঁধে ভর ক'রে ক্ষমতাসীন হয়। এই সামান্য সময়ে তাঁরা বৈষম্য নিরসনের জন্য চেষ্টা পান। কিন্তু কুচক্রী মহলের আঁতে ঘা লাগায় ক্ষমতার আসন হতে তাঁদের নেমে আসতে হয়।

বর্তমান সরকারের আমলে একটি মাত্র নজির তুলে ধরে আমি জনাব সবুরের কাছে জানতে চাই যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আমলে প্রণীত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে পূর্ব পাকিস্তানে দেশের শতকরা ৫৬ জন লোকের বাস সেই পূর্ব পাকিস্তানকে মাত্র ৯৫০ কোটি টাকা দিয়ে যে পশ্চিম পাকিস্তানে দেশের শতকরা ৪৪ জনের বাস, সেই পশ্চিম পাকিস্তানকে ১,৩৫০ কোটি টাকা দেওয়া আর এই পরিকল্পনার বাইরে রেখে সিন্ধু

এ কোন্ ধরনের ইনসাফ?

অববাহিকা পরিকল্পনা ও লবণাক্ততা দূরীকরণের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা ও ইসলামাবাদে রাজধানী নির্মাণের জন্য ৫০০ কোটি টাকা সর্বসাকুল্যে পশ্চিম পাকিস্তানকে ৩,৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা কোন্ ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা? পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি এ কোন্ ধরনের সুবিচার? এরই পাশাপাশি আমি আরো জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ একর জমি নষ্ট হয়ে যায় অথচ এই অবস্থা নিরসনের জন্য ক্রুগ মিশনের প্রস্তাবিত ১০০ কোটি টাকা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করার মত মানসিকতা ক্ষমতাসীনেরা পান না, কিন্তু পরিকল্পনার বাইরে রেখে ২,০০০ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা সম্ভব হয়। এ কোন্ ধরনের ইনসাফ!

দুঃখ আমার এইখানে

দুঃখ আমার এইখানে যে, বাংলাদেশের মানুষ প্রথমে বুঝতে পারে না। পরে যখন বোঝে তখন কেবল আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই তাদের করার থাকে না। দেশে মার্শাল-ল' জারী ক'রে শাসনতন্ত্র ছুড়ে ফেলে দেয়া হ'ল, নেতৃবৃন্দকে ধিকৃত রাজনীতিক আখ্যা দিয়ে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হ'ল, অসংখ্য রাজনীতিক ও হাজার হাজার কর্মীকে জেলে ঠেলে দেওয়া হ'ল, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'ল, অত্যাচার-নির্যাতনের বন্যা বয়ে গেল, আর ভাইরা আমার ক্ষমতা দখলকারীর জিন্দাবাদে মশগুল হয়ে উঠলো।

বাঙালীর যা চরিত্র

বাঙালীর যা চরিত্র গতকাল পল্টন ময়দানে তারই আর একদফা পরিচয় পাওয়া গেল। গদীর মায়ায় সবুর ভাইয়ের মুখে কত মিথ্যারই না খৈ ফুটল। সবুর সাহেব বিরোধী দলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে করতে নূরুল আমীন মন্ত্রিসভার কার্যকলাপেরও তীব্র সমালোচনা ক'রে গেলেন। ৪ হাজার লোকের 'বিরাট জনসভা'র শ্রোতাদের তিনি ধারণা দিয়ে গেলেন যে, অতীতের সরকারই যত অনাসৃষ্টির মূল। আর তিনি নিজে ও গভর্নর মোনেম সাক্ষাৎ ফেরেশতা। গদির মোহে সবুর ভাইয়ের মুখে এমনিতর খৈ ফুটা স্বাভাবিক।

চোখে যার ঠুলি বাঁধা, জনগণকে বোকা ঠাউরে আত্মপ্রসাদ লাভ করা কেবল তারই সাজে, এই জন্যই সবুর সাহেব হয়তো ভুলে যেতে চেয়েছেন

যে, কালই পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে যে নূরুল আমীন সরকারের তিনি নিন্দা ক'রে গেলেন, সেদিন তিনি নিজেই ছিলেন সে দলের প্রচার-সম্পাদক। আর গভর্নর মোনেম ছিলেন তাঁদের ময়মনসিংহ জেলার কর্ণধার। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তাঁদের দল মুসলিম লীগই ক্ষমতায় ছিল। এই দীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত দেশবাসীর উপর যে অত্যাচার-অনাচার চালান হয়েছিল সবুর সাহেব কস্মিনকালেও তার প্রতিবাদ করেছিলেন কি? না, তিনি মুসলিম লীগের প্রচার-সম্পাদক হিসেবে তার প্রশস্তিই গেয়েছিলেন?

জনাব সবুর নিজেই তখন সেই দলের প্রচার-সম্পাদক

সবুর সাহেব আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যত প্রচারই করুন না কেন, খাতাপত্রে, জাতীয় পরিষদে প্রসিডিং বই-এর পাতায় পাতায় এই সত্যেরই প্রমাণ মিলবে যে, জনাব সবুর ও তাঁর মুরুব্বীর দল আজ যে বৈষম্যের কথা তুলে নিজেদের ফেরেশতা সাজাতে চাইছেন, সেই বৈষম্যের কথা জনাব সবুরের মুরুব্বীরা এই সেদিন পর্যন্তও স্বীকার করতে না চাইলেও ১৯৫৫ সালে মাত্র ১২ জন সদস্য নিয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে আওয়ামী লীগই সর্বপ্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল কিভাবে বছরের পর বছর পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করা হয়েছে। কিভাবে তাকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

১৯৫৫ সালের আওয়ামী লীগ

আজ সবুর সাহেবেরা বড় গলায় যত কথাই বলুন না কেন, একথা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একমাত্র আওয়ামী লীগই কেন্দ্রীয় সরকারের একচোখা নীতি ধরিয়ে দিয়েছিলেন এবং মাত্র ১২ জন সদস্য নিয়ে অন্যদলের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন ক'রে সর্বপ্রথম এই বৈষম্য রোধের চেষ্টা পেয়েছিলেন। সে দিনের সে আওয়ামী কোয়ালিশনের এই বৈষম্যবিরোধী প্রচেষ্টায় কায়েমী স্বার্থী মহলের আঁতে ঘা লাগে। তাই, 'প্যালেস ক্লিকে'র টানাপোড়েনে সোহরাওয়ার্দী সরকারকে ক্ষমতার আসন থেকে নেমে আসতে বাধ্য করা হয়। তাই সবুর সাহেবদের উদ্দেশে একথা আমি জোর গলায় ঘোষণা করতে চাই যে, আওয়ামী লীগ আর যাই করুক, পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা তাঁরা

কায়েমী স্বার্থীদের আঁতে ঘা

কোন কালেই করেনি বলেই জেল-জুলুম আর অত্যাচার-নির্যাতন আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের আজ নিত্য সহচর।

১৯৫৮ সালের ইতিহাস বড় করুণ, বড়ই নির্মম। আওয়ামী লীগ তখন প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতায় ছিল না। ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানের ১৫টি উপনির্বাচনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪টি আসন দখল করে। ফলে, উপরতলায় কুচক্রীমহলে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল চিন্তা ক'রে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। সোহরাওয়ার্দী সরকারের ১৩ মাসের শাসনে এমনিই তাদের নাভিশ্বাস উঠেছিল। এবার তাই তারা মরিয়া হয়ে উঠলো কি ক'রে আওয়ামী লীগকে রোখা যায়। উপরতলায় দুর্নীতি-পরায়ণ অফিসার মহলও সক্রিয় হলেন। তাঁরা বোঝাতে লাগলেন, সাধারণ নির্বাচন দিলে আওয়ামী লীগকে আর রোখা যাবে না, আর তারা যদি একবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে, তবে আর নিস্তার নেই। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বঞ্চনার মাশুল তারা কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নেবে। পশ্চিম পাকিস্তানের শতকরা ৩০টা কারখানা বাজারের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই পূর্ব পাকিস্তানীদের নির্বাচনের প্রতিশ্রুত তারিখের মাত্র ৪ মাস আগে দেশে মার্শাল-ল' জারী করা হ'ল। সারা দেশে চার হাজার রাজনৈতিক ও কর্মীকে বন্দী করা হ'ল। এদেশের মানুষ সবই দেখলো কিন্তু আন্দোলন করতে সাহস পেল না। দেশবাসীর এই নির্জীব অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রতি-পক্ষের স্পর্ধা আরো বেড়ে গেল। একের পর এক দেশবাসীর অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে সারা দেশে কবরের শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হ'ল।

আওয়ামী লীগকে রোখো

করাচী থেকে রাজধানীও আজ সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সবুর সাহেব দর্পভরে এলান ক'রে গিয়েছেন যে, করাচীর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের একটি পয়সাও ব্যয় করা হয় নি। আমি বলি, তিনি মিথ্যাচর্চা করেছেন। সে কয়-বছরে পূর্ব পাকিস্তান যে ১,২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে-ছিল তার সিংহভাগই করাচীকে গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করা হয়েছিল, একথা অস্বীকারের কোন উপায় নেই।

সবুর সাহেব মিথ্যা বলেছেন

কে-না জানে যে, দেশরক্ষা ও কেন্দ্রীয় চাকুরীতে গোটা দেশের বাজেটের শতকরা ৮০ ভাগ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভের পরে আজো কোথাও শতকরা ১০ জনের বেশী বাঙালী নেই।

মোটামুটি ৫টি স্তম্ভের উপর যে-কোন দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম থাকে, যথা—কেন্দ্রীয় সরকার, রাজধানী, প্রতিরক্ষা, মূলধন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বা পার্লামেন্ট। আজাদী অর্জনের পর থেকে এর প্রথম চারটি স্তম্ভ কোন কালেই পূর্ব পাকিস্তানীদের নাগালে ছিল না—ছিল কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এই রাজনৈতিক ক্ষমতার যথাসম্ভব সুব্যবহারের যে সুযোগ-টুকু আমাদের ছিল, তাও আজ কেড়ে নেয়া হয়েছে। পার্লামেন্টের হাতে আজ কোন ক্ষমতাই নেই। 'কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন গেয়ে' আসা ছাড়া পার্লামেন্টের সদস্যদের আজ আর অন্য কোন কাজ নেই। মূলধনের কথা না বলাই ভালো। মাত্র ২০টি ভাগ্যবান পরিবারের হাতে আজ এদেশের পুঁজি।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ৫টি স্তম্ভ বনাম পূর্ব পাকিস্তান

সামরিক শাসন জারী ক'রে যে ভেলকী দেখান হ'ল সে এক ইতিহাস। ৭ই অক্‌টোবর যিনি প্রধান সামরিক শাসনকর্তা, ২২শে অক্‌টোবর তিনি প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট তাঁকে করলো কে? তিনি নিজেই। তারপর গড়লেন তিনি মৌলিক গণতন্ত্রী। এঁরা কারা— তাঁর বশংবদ। তারপর করলেন কি? আস্থা ভোট। প্রার্থী কে কে? তিনি একলা। ভোটের ফলাফল যাচাইয়ের ব্যবস্থা কি?—'হ্যাঁ' হলেও আমি, 'না' হলেও আমি।

ভেলকী!

তারপর বললেন, এবার আমি দেশকে এমন একটা শাসনতন্ত্র দেব যা দুনিয়ার কেউ কখনো দেখে নি। তার কথাই ঠিক—সত্যই দুনিয়ায় এমন শাসনতন্ত্র কেউ কখনো দেখে নি!

আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সোডা ওয়াটারের বোতল, তাই অল্প পরেই সবকিছু ভুলে যান। এদেশের ছাত্রদের ইতিহাস, শ্রমিক ইতিহাস, শিক্ষকদের ইতিহাস, আপনারা শুনেছেন, জানেনও। পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষার ভার সরকার স্বহস্তে নিয়েছেন, আর পূর্ব পাকিস্তানের মাধ্যমিক শিক্ষকরা আজো বাঁচার মত বেতনের দাবীতে ধর্মঘট করতে যান।

বাংলাদেশের মানুষ বড়ই ভুলো স্বভাবের

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবন্ধুরাও কম যান না। গভর্নর মোনেম খান যাবেন চ্যান্সেলর হিসেবে সমাবর্তনে বক্তৃতা করতে। ছাত্ররা বললো, সমাবর্তন উৎসবে আমরা শিক্ষাবিদদের বক্তৃতা শুনব, রাজনীতিকের নয়। গভর্নর বললেন, আমার বক্তৃতাই তোমাদের শুনতে হবে। ছাত্ররা বিগড়ে বসলো। গভর্নর সাহেব সমাবর্তন মণ্ডপে পা দিলেন, দেখলেন—চেয়ার-টেবিল, ফুলের টব সবই বিধ্বস্ত, লণ্ডভণ্ড। তবু যে কথা সেই কাজ। বিধ্বস্ত সমাবর্তন মণ্ডপে টিয়ার গ্যাস সেল ছোঁড়ার শব্দ আর ছাত্রদের বিক্ষোভ ধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা ক'রে কঠোর পুলিশ প্রহরায় সগর্বে তিনি বেরিয়ে এলেন। এসেই হুকুম দিলেন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কর! হল বন্ধ কর! ছাত্রদের তাড়াও! বশংবদের দল তৎপর হ'ল। এক ঘন্টার মধ্যে ইকবাল হলের তিন শতাধিক ছাত্র রমনা থানার হাজতে স্থান পেল। ৭ দিন পর সেখান থেকে জেলে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ কর

আমার বিরুদ্ধে এখনো তিনটা মামলা আছে। তার কারণ না হয় বুঝি। কিন্তু ছাগলনাইয়ার ৭টি নাবালক স্কুল ছাত্র কি এমন অপরাধ করেছিল, যার জন্য দুইমাস পর্যন্ত তাদের হাজতে আটক রাখা হ'ল? হাইকোর্ট জামিন না দেওয়া পর্যন্ত দুইমাস যাবৎ তাদের জামিন দেওয়া হয় নি। নাবালক স্কুল ছাত্রদের এইভাবে শাস্তি দেওয়া বা হয়রান করার নজীর কোনও সভ্যদেশের ইতিহাসে নেই।

নাবালক ছেলে ক'টির অপরাধ কি?

পে কমিশনের রিপোর্ট দিবালোকের মুখ দেখল না। তবু তারই রোয়েদাদ অনুযায়ী নাকি সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। বাড়ান হয়েছে ঠিকই, তবে কিনা উপরতলায়। আদতে গরীব কর্মচারীদের বেতন কিছুই বাড়ে নি। ২০ টাকার বেতনের কর্মচারীর ৫ টাকা বেড়েছে, কিন্তু ২,০০০ টাকা বেতনের কর্মচারীর বেতন বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করি, এই কি তোমাদের বিচার? নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দরুন ২,০০০ টাকার কর্মচারীর জীবনে আদৌ কি কোনও বিপর্যয় ঘটেছিল? কুড়ি টাকার কর্মচারীর জীবনে যে বিপর্যয়

তেলা মাথায় তেল!

ঘটেছে—তার প্রতিবিধান কি ৫।৭ টাকা বেতন বৃদ্ধিতেই সম্ভব? তেলা মাথায় তেল না দিয়ে এদেশের গরীব কর্মচারীদের বেতন ন্যায়সঙ্গত পরিমাণে বাড়ান কি একেবারে অসম্ভব ছিল?

গুরুতর কোন সমস্যা খতিয়ে দেখে তার প্রতিবিধানের পথনির্দেশের জন্যই দেশে দেশে কমিশন গঠন করা হয়ে থাকে। আর আমাদের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ক্ষমতাসীন হওয়ার পর কত কমিশনই না নিয়োগ করলেন! কিন্তু তার রিপোর্টের হ'ল কি? পে কমিশন, ভোটাধিকার কমিশন, শাসনতন্ত্র কমিশন কোনটির রিপোর্টই তিনি গ্রহণ করেন নি। বেছে বেছে নিজ পছন্দমত বিচক্ষণ লোক দিয়ে যে কমিশন তিনি গঠন করলেন, তাদের সুপারিশ যদি তিনি গ্রহণই না করেন, তা' হ'লে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লোক দেখানো এ কমিশন গঠনের অর্থ কি? এমন কি খাস ক'রে সরকারী অফিসারদের নিয়ে অর্থনৈতিক কমিশন গঠন করা হয়, তার রিপোর্টও গোপন করা হয়েছে। রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানকে কিভাবে শোষণ করা হয়েছে তার বিবরণ স্থান পেয়েছিল বলেই কি তা' গোপন করা হয় নি।

আইয়ুব সরকারের কমিশন।

এদেশের কৃষককুল আজ ধ্বংসের মুখে। কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা দাবী করেছিলাম ২৫ বিঘা পর্যন্ত যাদের জমি আছে তাদের খাজনা মওকুফ করা হোক। তাতে ক্ষমতাসীনরা হেসেছেন। কিন্তু সরকারী রিপোর্টের খোঁজ রাখা হয়তো তাঁরা প্রয়োজন মনে করেন নি। আমাদের কথা নয়, সরকারী রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকরা ৯৩ কোটি টাকা ঋণগ্রস্ত। যে কৃষককুল দেশের সর্বোচ্চ পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, তাদের বাঁচিয়ে রাখার কথা চিন্তা করার অবসর সরকারের নেই। ৯৩ কোটি টাকার এ ঋণ শোধ দেওয়া তো দূরের কথা, চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পেতে পেতে অদূর ভবিষ্যতে তা' যে তার সমগ্র সত্তাকেই গ্রাস করতে চলেছে, এ কথাও ভেবে দেখার সময় সরকারের নেই। জানি সরকারের সময় অত্যন্ত মূল্যবান। তবু দেশের স্বার্থে কৃষককুলকে বাঁচাবার জন্য খাজনা মওকুফ করা একান্ত অপরিহার্য। রাজস্ব ঘাটতির অমূলক আশঙ্কায় সরকার এ প্রস্তাবে সম্মত

এদেশের কৃষককুল বনাম সরকার

হতে নারাজ—অথচ কোটিপতি শিল্প মালিকদের ১০ বছরের জন্য ট্যাক্স মওকুফের বেলায় তারা দরাজদিল্। শিল্প ব্যাঙ্ক থেকে যে ভাগ্যবানের দল শতকরা ৭৫ ভাগ ঋণ পেয়ে রাতারাতি ধনকুবের বনে মুনাফার পাহাড় গড়ছেন, তাঁদেরকে ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দিয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী, ঋণভারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এদেশের ভুখানাঙ্গা কৃষক-কুলকে খাজনা থেকে অন্ততঃ কয়েকটি বছরের জন্য অব্যাহতি দিলে নিশ্চয়ই আকাশ ভেঙে মাথায় পড়তো না। অথচ ওয়ার্কস প্রোগ্রামের নামে বিনা হিসাবে বিনা অডিটে বছরে ২০।২৫ কোটি টাকা অনুৎপাদনধর্মী কাজে ব্যয় ক'রে যে ফায়দা না উঠান যাচ্ছে, ৭ থেকে ৮ কোটি টাকার খাজনা মওকুফ করলে তার চেয়ে অনেক বেশী ফায়দা উঠান যেত। কৃষককুলকেও কৃতজ্ঞ-তার পাশে আবদ্ধ করা সম্ভব হোত। এই কারণেই বলি, যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান এসেছিল সেই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে, অন্যথায় পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচবার উপায় নাই।

ওঁরা বলেন, আওয়ামী লীগ হাল্কা শ্লোগানে লোক ভুলায়। জবাবে আমি বলবো, আওয়ামী লীগ হাল্কা শ্লোগান দেয় না। গ্রামে গ্রামে ঘুরে

আওয়ামী লীগ হাল্কা শ্লোগান দেয় না

গ্রামবাসী মানুষের অভাব-অনটন—অনাহার-অনশনের যে চিত্র আমরা দেখেছি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে আমরা আমাদের দাবী তুলেছি। সোনার বাংলা আজ শ্মশানে পরিণত। একদিন ছিল যখন কবি, জারী, সারি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়ার সুরে এই বাংলার পথ-প্রান্তর, মাঠ-ঘাট ও নদীগুলি মুখরিত হয়ে থাকতো, আজ সে সুরের শেষ রেশটুকুও মুছে গেছে। সোনার পূর্ব বাংলা আজ ভুখানাঙ্গা। আর তারই যোগানো অর্থে আবার নতুন ক'রে আজ পিণ্ডিতে রাজধানী গড়ে উঠেছে।

আওয়ামী লীগ গণআন্দোলনে বিশ্বাসী। জেল-জুলুমের তারা তোয়াক্কা করে না। জনসাধারণের দাবী আদায়ের সংগ্রামে পিছন থেকে ছুরিকা-

আওয়ামী লীগ গণআন্দোলনে বিশ্বাসী

ঘাত করবে না এমন নির্ভীক সংগ্রামশীল যে-কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জাতীয় সমস্যার সমাধানে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগ্রামে হাত মিলিয়ে কাজ করতে আওয়ামী লীগ সর্বদাই প্রস্তুত। যেসব রাজনৈতিক

রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে আয়েশী রাজনীতি করেন বা জনসাধারণের দাবী নিয়ে আলাপ-আলোচনা বা দর কষাকষির মাধ্যমে আন্দোলন সংক্ষেপ করার পক্ষপাতী, আওয়ামী লীগ তাদের এখন দূরে থাকার পরামর্শ দেয়। জেল-জুলুমের ধকল সয়ে এদেশের নির্যাতিত জনতা যদি কোন-দিন তাদের সংগ্রামে জয়ী হয় তখন এইসব রাজনীতিককে আমরা হাসিমুখে বরণ ক'রে নেব।

যে দলে খুশী যোগ দিন

কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি জনগণকে আওয়ামী লীগে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে পেতে হলে দেশবাসীর স্বার্থ নিয়ে সংগ্রাম করে এমন, অথবা, আওয়ামী লীগের চেয়ে অধিকতর ত্যাগী কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকলে. সেই প্রতিষ্ঠানে আপনারা যোগদান করুন, আমরা বিন্দুমাত্র দুঃখিত হব না। কারণ আমরা চাই, দেশবাসী তাদের হৃত অধিকার ফিরে পাক, সে যে দল থেকেই হোক। স্মরণ রাখবেন, আসন্ন নির্বাচনে বিরোধী দল জয়লাভ করলেই বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না, কারণ এ সরকারের পিছনে দেশবাসীর সমর্থন না থাকলেও অন্য ধরনের ক্ষমতাবান শ্রেণীর সমর্থন আছে। আজকের এ সংগ্রামকে আওয়ামী লীগ সর্বাত্মক সংগ্রাম বলেই জানে এবং তারা বিশ্বাস করে যে, এই আন্দোলনে জয়ী হতে হলে দেশবাসীকে চরম ঝুঁকি নেবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। স্মরণ রাখবেন, এবারকার সংগ্রাম আমাদের সর্বাত্মক সংগ্রাম, এবারকার সংগ্রাম আমাদের বাঁচা বা মরবার সংগ্রাম, এবারকার সংগ্রাম আমাদের অধিকার পাব কি পাবনা-এর সংগ্রাম। এ সংগ্রামে অনেককে হয়তো ফাঁসিকাষ্ঠেও ঝুলতে হতে পারে।

এই বাংলা তিতুমীরের বাংলা

এই ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানের অসম্মান ঘটিয়ে মাত্র ৪ হাজার লোকের বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে এক মন্ত্রী ভায়া বলেছেন, এদেশে বিরোধী দল কিছু আছে বলে তিনি জানেন না। জবাবে পল্টন ময়দানে আজকের এই বিশাল জন-সভাকে সাক্ষী রেখে আমি বলব, মন্ত্রী ভায়া, বাংলার ইতিহাস আপনি জানেন না। এই বাংলা মীরজাফরের বাংলা। আবার এই

বাংলাই তিতুমীর সুভাষ-নজরুল-ফজলুল হক সোহরাওয়ার্দী-মওলানা-ইসলামাবাদীর বাংলা। এই বাংলা যদি একবার রুখে দাঁড়ায়, তবে আপনাদের সিপাই, বন্দুক, কামান, গোলা সবই স্রোতের শেওলার মত কোথায় ভেসে যাবে, হদিসও পাবেন না। মন্ত্রী ভায়াকে আজো বলি, জনগণের ভোট ফিরিয়ে দিয়ে আপনাদের নেতাকে নির্বাচনে নামান—যদি শতকরা ২০টা ভোটও আপনারা পান, তবে আজীবনের জন্য তাঁকে আমরা প্রেসিডেন্ট হিসাবে বরণ করব। আর তা' যদি না পান, তবে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার মত ভাগ্যবরণের জন্য আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

ভাইসব, কাল আমার দেশদ্রোহিতার মামলার দিন। আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবার পূর্ব মুহূর্তে পল্টনের এই জনসমুদ্রের মাঝে যে আশা-ভরসা আর দুর্দমনীয় প্রাণাবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখে গেলাম, তাই আমাদের আগামী দিনের একমাত্র সম্বল, একমাত্র পাথেয়। এই পাথেয় যাদের আছে, কোন শক্তিই তাদের গতিরোধ করতে পারবে না। জনগণের প্রাণবহ্নির সম্মুখে নমরুদ ফেরাউন যখন টিকে নাই, তখন লক্ষ কোটি নিরন্ন বুভুক্ষুর ক্রোধানলের সম্মুখে এদেশের ক্ষমতাসীনরাও টিকবে না।"

[শেখ মুজিব ও বাঙলাদেশ ঃ শহীদ আশরাফ সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৭১, পৃঃ ৭৬-৯১]

স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর আমলে এমন নির্ভয় ও নিঃসংকোচ ভাষণ সেদিন শুধু উপস্থিত শ্রোতাদের মনকেই আলোড়িত করে নি, সারা দেশ এতে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়েছিল। যাহোক, স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে দেশের পাঁচটি বিরোধী দল এই মর্মে জুলাইয়ের ২১ তারিখে ('৬৪) খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে ৪ দিনব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হয়। এই বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামাতে ইসলাম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম পার্টি। ২৪ তারিখে এই পাঁচটি বিরোধী দল সর্বসম্মতভাবে একটি ৯-দফা নির্বাচনী কর্মসূচী স্বাক্ষর ক'রে এক যুক্ত ইস্তাহারে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসহ

সম্মিলিত বিরোধী দল গঠন

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাদের সবার পক্ষ থেকে মাত্র একজনকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই নির্বাচনী ঐক্য-জোটকে নাম দেয়া হ'ল সম্মিলিত বিরোধী দল—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Combined Opposition Party সংক্ষেপে C. O. P.

C. O. P.-এর পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড় করিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে। ফাতেমা জিন্নাহ্‌ ছিলেন পাকিস্তানের 'জাতির পিতা' কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ভগ্নী।

মিস জিন্নাহ্‌কে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত করার পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। যদিও তিনি বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলবিশেষের মতাবলম্বী ছিলেন না. তথাপি আইয়ুবী শাসন-ব্যবস্থার তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। ১৯৬৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে গভীর দুঃখের সাথে তিনি বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে দেশবাসীকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। তিনি বলেছিলেনঃ "গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে যে দেশের সৃষ্টি বা জন্ম, সেই দেশের জন-সাধারণ প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের যোগ্য বা অযোগ্য তা' আজ পর্যন্ত অমীমাংসিত থাকা একান্তই নিন্দনীয়।"

মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ্‌

মিস জিন্নাহর এই বিবৃতির ফলে আইয়ুব সরকারের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী আবদুল ওয়াহেদ খান মিস জিন্নাহ্‌র কঠোর সমালোচনা করেন।

C. O. P.-এর এই মনোনয়নকে পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ স্বাগত জানান। কিন্তু মৌলিক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের আর মূল্য কতটুকু।

সরকার পক্ষ থেকে আইয়ুব খানকে পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড় করিয়ে দেয়া হ'ল। সরকার পক্ষ বলতে অবশ্য তিনি নিজেই ছিলেন. তার চেয়ে

বলা ভালো যে আইয়ুব খান নিজেই প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়ালেন। ক্ষমতার লোভ তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। আর এই লোভে তিনি স্বাভাবিক ঔদার্য, মানবতাবোধ, গণসহানুভূতি সব কিছুকেই বিসর্জন দিয়েছিলেন। তা' ছাড়া বৃহৎ কয়েকটি পুঁজিপতি পরিবারের মনস্তুষ্টি করে তিনি যে-কোন উপায়ে ক্ষমতাকে আঁকড়ে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই পুঁজিপতিদেরও একটি রাজনৈতিক দল ছিল। বলা বাহুল্য, সেটা মুসলিম লীগ। পাকিস্তান সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই এই দলটির চরিত্র ছিল যেমন বুর্জোয়া তেমনি সাম্প্রদায়িক। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের শ্রেণী-চরিত্র সম্বন্ধে আইয়ুব ওয়াকিবহাল ছিলেন। সামরিক শাসনের আওতায় থেকে যখন তিনি দেখলেন যে, এভাবে পূর্ণভাবে ডিক্‌টেটরশীপ চালানো বেশী দিন সম্ভব নয়, তখন তিনি তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বন্ধু-বান্ধবদের হাত করার চেষ্টা করলেন। ক্ষমতার লোভে অনেক মোসাহেব জুটে গেল। বিশেষ ক'রে মুসলিম লীগের এক বিরাট অংশ তাঁর ডাকে সাড়া দিল। ১৯৬২ সালের ৪ঠা ও ৫ই সেপ্টেম্বর তাদেরকে নিয়ে আইয়ুব খান একটি নতুন সরকারী রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। এই নবগঠিত রাজনৈতিক দলের নাম হ'ল কনভেনশন মুসলিম লীগ।

কনভেনশন মুসলিম লীগ

আইয়ুব খান প্রথমে এই দলের প্রাথমিক সদস্য হিসেবে থাকলেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালের ২২শে মে তিনি নিজেই সে দলের সভাপতি হয়ে বসলেন। প্রাক্তন মুসলিম লীগেরই আরেকটি অংশ এই কনভেনশন থেকে দূরে সরে থাকলেন। প্রতিবাদস্বরূপ তাঁরা নিজেরাই একটি দল গঠন করলেন যার নাম হ'ল কাউন্সিল মুসলিম লীগ। পরে এই কাউন্সিল মুসলিম লীগও সম্মিলিত বিরোধী দলের অন্যতম অঙ্গদল হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে।

সম্মিলিত বিরোধী দল যখন তাঁদের প্রেসিডেন্টের প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে নামবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে পূর্ব বাংলার ছাত্র-সমাজ ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৪) 'ছাত্র-দিবস' পালন করার জন্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। কিন্তু সরকার ছাত্র-দিবসকে ব্যর্থ ক'রে দেয়ার

ছাত্র-দিবস

জন্য পূর্বেই ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ক'রে দেবার নির্দেশ দেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ছাত্রগণ নির্দিষ্ট দিনে সঙ্ঘবদ্ধভাবেই দিবসটি পালনে সচেষ্ট হয়। সরকারের ইঙ্গিতে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারী ক'রে হিংস্র জানোয়ারের মত তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বহু ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করে। এই নির্যাতনের প্রতিবাদে সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯শে সেপ্টেম্বর সারা পাকিস্তানে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হরতাল, শোভাযাত্রা ও জনসভার মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে এই দিবসটি পালন করা হয়। লক্ষ লক্ষ জনতা সেদিন পল্টনে সমবেত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে গর্জন ক'রে ওঠেন।

জুলুম প্রতিরোধ দিবস

এদিনটিকে বানচাল করার জন্যও সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে-ছিলেন। তারা গুণ্ডাও নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু দুর্জয় ও নির্ভীক সংগ্রামী মানুষের অগ্নিমিছিল দেখে গুণ্ডারা তাদের গায়ে হাত দেবার সাহস পায় নি।

সম্মিলিত বিরোধী দলে আর একটি ব্যক্তিত্ব সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি লেঃ জেঃ আযম খান। আযম খান কোন দলবিশেষের সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তিনি জানতেন যে, তাঁকে অন্যায়ভাবে গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত ক'রে পূর্ব বাংলার মানুষকে সেবার সুযোগ দান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আইয়ুবের শাসনতন্ত্র একটি ন্যায় ও আদর্শবর্জিত স্বৈরতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব তাকে উৎখাত করা একান্ত আবশ্যক। আর সেই জন্যই তিনি সম্মিলিত বিরোধী দলের নির্বাচনী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন।

শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌র সঙ্গে নির্বাচনী অভি-যানে সারাদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা উভয়েই ১৫ই অক্টোবর (১৯৬৪) ঢাকায় এসে উপস্থিত হন।

ক্রমাগত কয়েকদিন সারা প্রদেশে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ মিস জিন্নাহ্ বক্তৃতা দিয়ে

বেড়ালেন। সর্বত্রই তাঁরা জনতার বিপুল সমর্থন পেলেন। তাঁদের সভায়

নির্বাচনী প্রচারে শেখ মুজিব

উপস্থিত হওয়ার জন্য গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লোকজন বন্যার মত আসতে লাগলো।

অবস্থা বেগতিক দেখে আইয়ুব সরকার নতুন পাঁয়তারা কষতে লাগলেন। ইসলামী রাষ্ট্রে নারী রাষ্ট্রপ্রধান শরীয়ত-বিরোধী। এই প্রচারণা চালিয়ে ধর্মান্ধ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে চাইলেন। এর জন্য মোল্লাহ-মুসল্লিও নিয়োগ ক'রে মসজিদে মসজিদে প্রচার চালানো হ'ল। শুধু তাই নয়, মিস জিন্নাহ্‌র চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করতেও সরকারী প্রচারকরা দ্বিধাবোধ করে নি। গভর্নর মোনেম নিজে এই সকল প্রচারণায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

এতদসত্ত্বেও বিপুল জনসমর্থন কুড়িয়ে মিস জিন্নাহ্‌ অক্‌টোবরের ২৩ তারিখে করাচী ফিরে গেলেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবও তাঁর শাসন আমলে নিজের কৃতিত্ব জাহির ক'রে নির্বাচনী প্রচার চালাতে থাকেন। নিজের প্রশংসা জাহিরের সঙ্গে

আইয়ুবের নির্বাচনী প্রচার অভিযানের জবাবে বাংলার জনগণ

সঙ্গে পূর্ব বাংলার বাঙালীদের প্রতি তিনি চরম অবমাননাও প্রদর্শন করতে থাকেন। এর প্রতিক্রিয়া শুরু হতেও দেরী হয় নি। ২৮শে অক্‌টোবর যখন তিনি ঢাকায় এসে এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন চারিদিক থেকে তাঁর প্রতি ইষ্টক বর্ষণ শুরু হয়েছিল। সরকারী দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যভাবে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে থাকলেন। তাঁরা জনগণকে বোঝাতে চাইলেন যে, মিস জিন্নাহ্‌কে ভোট দিলে তা' শেখ মুজিব ও আবদুল গাফ্‌ফার খানকেই দেয়ার নামান্তর হবে। তাঁরা আরও বোঝাতে চাইলেন যে, মুজিব ও গাফ্‌ফার ভারতের দালাল, ফলে পরিণতিতে এদেশ ভারতের হাতে চলে যাবে। তাঁরা এই দু'জন নেতাকে পাকিস্তানের দুশমন বলে ফতোয়াও জারী করেছিলেন। আসলে পূর্ব বাংলার শেখ মুজিব ও সীমান্তগান্ধী আবদুল গাফ্‌ফার খান দু'জনই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। আর এর জন্য তাঁরা বার বার সরকারকে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের অনুরোধও জানিয়ে এসেছেন।

নির্বাচনী প্রচারণায় আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনার জন্য শেখ মুজিবকে ১৯৬৪ সালের ৭ই নভেম্বর তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফ্-তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হ'ল। অবশ্য পরে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছিল।

শেখ মুজিবের গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তি

প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের প্রাথমিক পর্যায়ে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এই নির্বাচন হয় ১৯৬৪ সালের ১৯শে নভেম্বর। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে তার দশ দিন আগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দু' প্রদেশে দুইদিন সময় দেবার পেছনে সরকারের যথেষ্ট ধূর্ত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, পশ্চিমাঞ্চলে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবেন আর সেখানে জয়ী হতে পারলে পূর্ব বাংলায় তার প্রভাব ফলানো যেতে পারে।

মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন সমাপ্ত হলে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন বিষয়ে মাদারে মিল্লাত মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌র সঙ্গে আলোচনার জন্য ২২শে নভেম্বর শেখ মুজিব করাচী যান। ৬দিন পর ঢাকায় ফিরে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান, বেলুচ ও সিন্ধিরা যে সম্পূর্ণ আইয়ুব-বিরোধী তা' তিনি বেশ জোরের সাথে উল্লেখ করেন। এর কয়েকদিন পর ডিসেম্বরের ৩ তারিখে শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনে আবার গ্রেফতার করা হ'ল। অবশ্য পরে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।

শেখ মুজিবের পুনরায় গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তি

মিস ফাতেমা জিন্নাহ্ দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ১৮ই ডিসেম্বর পূর্ব বাংলায় আসেন এবং প্রদেশের বিভিন্ন অংশে আবার তাঁরা প্রচার চালাতে থাকেন। আইয়ুব খান সরকার প্রেসি-ডেন্ট পদপ্রার্থীদের পরিচিতি সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। সর্বত্রই মাদারে মিল্লাত অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন। 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়"—মাদারে মিল্লাতের এই উক্তি সারা দেশে শ্লোগানে পরিণত হ'ল। এই শ্লোগান জনগণের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তানের নির্বাচনী কমিশনের

মিস জিন্নাহর নির্বাচনী প্রচার অভিযান

ঘোষণানুযায়ী ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো, অবস্থার বৈপরীত্যে সরকার ততই বেসামাল হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁরা ব্যাপকভাবে ধরপাকড় আরম্ভ করলেন। ২৪শে ডিসেম্বর ('৬৪) আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা এবং বিরোধী দলের নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এবং কুমিল্লার প্রখ্যাত জননেতা ও মাদারে মিল্লাত প্রচার কমিটির সভাপতি শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেফতার করা হ'ল।

শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই পাকিস্তানের প্রচার মাধ্যমগুলোকে সরকার-দলীয় প্রার্থীর প্রচারের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এমন কি উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারীদেরকেও একই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল। আমলারা আইয়ুবী আমলে প্রাপ্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার বদৌলতে ব্যাপকভাবে সরকারের পক্ষে প্রচার চালায়। এই সব আমলা ও সরকারী দালালদের সহায়তায় আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রীদের হাত করার জন্য শেষ পর্যন্ত অসৎ পন্থা অবলম্বন করেন। তাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ ঢালা হতে থাকে। নগদ অর্থ ছাড়াও তাদের সামনে আরো কয়েকটা লোভের টোপ ফেলা হয়। এর আগে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের নামে ১০০ কোটি টাকা তাদেরকে অবাধে খরচ করবার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এর জন্য কোন হিসেব পর্যন্ত চাওয়া হয় নি।

সুতরাং মৌলিক গণতন্ত্রীর পদ নিঃসন্দেহে লোভনীয়। কিন্তু সরকার এবং তার দালালরা প্রচার করতে লাগলো যে মিস ফাতেমা জিন্নাহ্ প্রেসিডেন্ট হলে সম্মিলিত বিরোধী দল মৌলিক গণতন্ত্র প্রথা সম্পূর্ণ-ভাবে বাতিল ক'রে দেবে এবং তাদের সদস্যপদ নিশ্চয় বাতিল হয়ে যাবে।

মিস ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেবার প্রতিশ্রুতিতে জয়লাভ করলেও এই সকল গণতন্ত্রীর অনেকে লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেদের বিবেক-বিবেচনাকে বিসর্জন দিয়ে ফেলে। ফলে নির্বাচনের ফলাফলে যা হবার তাই হ'ল।

নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ২রা জানুয়ারীর রাতেই প্রধান নির্বাচনী কমিশনার জনাব জি. মঈনুদ্দিন প্রেসিডেন্ট হাউসে এক রেকর্ডকৃত বেতার

ভাষণে নয়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইয়ুব খানকে পুনরায় আগামী ৫ বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন। এই নির্বাচনে আইয়ুব খানের স্বপক্ষেভোট ছিল ৪৯,৯৫১ এবং মিস জিন্নাহ্‌র স্বপক্ষে ছিল ২৮,১৯১। নানা মহল থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সরকার ব্যাপক দুর্নীতি ও অসাধুতার পথ অবলম্বন করেছিলেন,—পরাজয়ের পর মিস্ জিন্নাহ্‌ও এই অভিযোগ করেন। তা' ছাড়া এই ফলাফলকে শাসনতন্ত্র ও সরকারী নীতির অনুমোদন হিসেবে গ্রহণ করা যায় না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

প্রেসিডেন্টর নির্বাচনী ফলাফল

সম্মিলিত বিরোধী দল নির্বাচনে হেরে গেলেও শেখ মুজিব এতটুকুও ভেঙে পড়েন নি। তিনি জানতেন যে পরিণতি এমন হবেই। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সর্বসাধারণের ভোটের যেখানে কোন মূল্য নেই সেখানে এই নির্বাচনের ফলেরই বা মূল্য কতটুকু। অর্থ দ্বারা যে তথাকথিত গণতন্ত্রীদের ভোট কিনে নেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়, একথাই অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল যে, প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে এবং সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যদি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না করা যায় তবে দেশের কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই তিনি জানুয়ারীর ৪ তারিখে আইয়ুবের তথাকথিত বিজয় সম্পর্কে দেশবাসীকে বললেন, 'গণতন্ত্রের সংগ্রাম চলবেই।' তিনি আশা প্রকাশ করে বললেন, সংগ্রাম অব্যাহত রাখলে জনতা পরিণতিতে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবেই।

নির্বাচনে জয়লাভ ক'রে আইয়ুব বিজয় উৎসব পালনে মত্ত হলেন। উৎসবে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য বিরোধী দলের কয়েকজন কর্মীকে গ্রেফতার করলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আওয়ামী লীগের জনাব তাজউদ্দিন আহমদ। উৎসবের দিনে আইয়ুবের দালালরা নেশার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। করাচীর লিয়াকতাবাদ ও নাজিমাবাদে উন্মত্ত অবস্থায় তারা ব্যাপকহারে মানুষ হত্যা ও ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করে। এই নৃশংসতার কারণ হ'ল, এ সব এলাকায় আইয়ুব খানকে চরম পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। আর তারই প্রতিশোধ নিলো মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। ফাতেমা জিন্নাহ্‌ এই নির্যাতন ও গণহত্যার কঠোর

আইয়ুবের বিজয় উৎসব

নিন্দা করেছেন। শেখ মুজিব জানুয়ারীর ৬ তারিখে এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে বলেছেন, "এটা হচ্ছে জাতির জন্য ভবিষ্যতের গর্ভে সঞ্চিত দুর্যোগের সূচনা মাত্র।" জানুয়ারীর ৮ তারিখে নির্বাচনী কমিশনার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ২১শে মার্চ (১৯৬৫) জাতীয় পরিষদের এবং ৫ই মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সারা পাকিস্তানে একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। ২২শে মে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের তারিখ হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়।

এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ নির্বাচনে অংশ নেবেন কিনা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য করাচীতে লাখাম হাউসে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। অনেক সদস্য এই নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের নির্বাচনে পুনরায় অংশ গ্রহণের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এটা মেনে নিতে পারলেন না। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যূনতম সুযোগকেও গ্রহণ করতে হবে এই নীতিতেই তাঁরা বিশ্বাসী।

শেষ পর্যন্ত ২৫শে মার্চ ঢাকায় এ বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিরোধী দল ঘোষণা করেন যে, N.D.F. এবং C.O.P. একই সঙ্গে সরকারের বিরোধী দল হিসেবে নির্বাচনে লড়বেন।

শেখ মুজিব কর্তব্যের ডাকে আবার নির্বাচনী অভিযানে বের হলেন। ২১শে মার্চে যথাসময়ে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। ফলাফল পূর্ববৎ। এবারেও সরকারী দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে C. O. P. ১০টি, N. D. F. ৫টি এবং ৬টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। বলা বাহুল্য সরকারী দল এবারেও দুর্নীতি ও অসাধুতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দু'দিন পর অর্থাৎ ২৩শে মার্চ তথাকথিত পাকিস্তান দিবসে আইয়ুব খান নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন এবং এক নয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন ক'রে তার সদস্যদের নামও ঘোষণা করলেন। এই মন্ত্রিসভায় বর্তমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হলেন।

আইয়ুব খানের শপথ গ্রহণ

এর দু'দিন পর অর্থাৎ ২৫শে মার্চ ঢাকা হাইকোর্ট থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দেশদ্রোহিতা সম্পর্কিত একটি মামলার রায় দান করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত নিম্নকোর্টে বিচারাধীন দেশদ্রোহিতামূলক মামলাটিকে খারিজ করবার অথবা অন্য কোর্টে সুবিচারের জন্য স্থানান্তরের আবেদনকে বাতিল ক'রে দেয়া হয়। অবশ্য উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবকে সুপ্রীমকোর্টে আপীলের অনুমতি প্রদান করা হয়। পল্টন ময়দানে এক বক্তৃতাকে কেন্দ্র ক'রে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এই দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। আবেদনকারীর পক্ষে বলা হয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দেশদ্রোহিতামূলক কোন কিছুই তিনি করেন নি। শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার বাকস্বাধীনতার ওপর ভিত্তি ক'রেই তিনি জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেছেন। তা' ছাড়া পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারাটি শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

শেখ মুজিবের মামলা

৩রা এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ঘোষণা করা হয় যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির সভা

একই দিনে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জনাব মঞ্জুর কাদির 'ভাষা প্রসঙ্গে' এক অদ্ভুত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৭ বছর পর আবার মাতৃভাষার ওপর হামলা চালাবার ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেল। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর দালাল জনাব মঞ্জুর কাদির সেদিন পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ফেডারেশনের অভিষেক অনুষ্ঠানে ভাষণ দান প্রসঙ্গে প্রস্তাব দেন যে, দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে সংযোগ সাধনের মাধ্যম

ভাষার ওপর পুনরায় হামলা চালাবার চেষ্টা

হিসেবে ব্যবহারের জন্যে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা ও ইংরেজীর সংমিশ্রণে একটা সাধারণ ভাষা গঠন করা উচিত।

সারা প্রদেশব্যাপী এপ্রিল মাসের ৬ তারিখে 'বন্দী মুক্তি দিবস' পালন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রশক্তি কর্তৃক আহূত জনসভায় দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বন্দী ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তির দাবীতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের আগে ও পরে অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে জাতীয় পরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্মী জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীকে ফেব্রুয়ারীর ১৫ তারিখে হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী নিবর্তনমূলক আটক থেকে মুক্তি দেয়া হয় এবং ফরিদপুরের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা শ্রী ফণীভূষণ মজুমদারকে এপ্রিলের ৪ তারিখে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। শ্রী ফণীভূষণকে ফেব্রুয়ারীর ৬ তারিখে ফরিদপুর জেলার রাজৈরে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

বন্দী মুক্তি দিবস

১৬ই মে ('৬৫) প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন। জাতীয় পরিষদে ব্যর্থতা সত্ত্বেও শেখ মুজিব এতটুকুও নির্বাচনবিমুখ হন নি। তিনি আবার পূর্ণ উদ্যমে নির্বাচনী প্রচারের জন্য গ্রাম গ্রামান্তরে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। ঠিক এমনি এক পর্যায়ে মে'র ১১ তারিখে তাঁর জন্মস্থান এলাকায় এক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। এর ফলে তাঁকে সাতদিন ধরে বিশ্রাম গ্রহণ করতে হয়।

প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন

যথাসময়ে ভোট গ্রহণের পর দেখা গেলো এবারে সরকারী দল অনেকটা নাস্তানাবুদ হয়েছে। ১৪৯টি আসনের মধ্যে কনভেনশন মুসলিম লীগ পান ৬৬টি আসন। বিরোধী দল ২৫টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেন ৫৮টি আসনে। প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থীদেরকে ধরে বিরোধী দলই নির্বাচনে জয়লাভ করে। কিন্তু সরকারী দল নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানাভাবে প্রলুব্ধ করে অনেক স্বতন্ত্র সদস্যকে নিজেদের দলে টেনে নিতে সমর্থ হন।

এই হ'ল বুনিয়াদী গণতন্ত্রের পরিচয়—কায়েমী স্বার্থবাদীদের উদ্দেশ্য সফলের এ এক নতুন পন্থা। এই গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সমগ্র পাকিস্তানের মানুষকে শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট করা হয়েছে আর বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার মানুষকে একটি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার নিগড়ে আবদ্ধ করা হয়েছে। গভর্নর মোনেম খান বিপুল শক্তিতে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতিকে এবং প্রগতিবাদী চেতনাকে প্রতিরোধ ও নির্মূল করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু শোষিত ও নিপীড়িত মানবতার জ্বলন্ত প্রতীক শেখ মুজিব এ অন্যায় ও অত্যাচারকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। এত বড় পরাজয়ের মুখেও তিনি নতুন উদ্যমে শক্তি সঞ্চয় ক'রে পুনরায় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কেননা তিনি জানেন সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। তাই এক সংগ্রাম শেষ হতে না হতেই নতুনতর সংগ্রামের জন্য তিনি পথ প্রস্তুত করেছেন সারাজীবন। এবারের সংগ্রাম আরো কঠিন, আরো দুর্বার, আরো বিপদসংকুল। এবার তিনি উপলব্ধি করলেন ঃ

বহ্নিবন্যাতরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাসঝটিকার মেঘ,
ভূতল-গগন—
মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্র তীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবে না
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
এসেছে আদেশ
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হ'ল শেষ।

সংগ্রামী জীবনের চতুর্থ অধ্যায়

(১৯৬৫-৬৯)

শেখ মুজিব এবার আরো তীব্র রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করলেন। ১৯৬৫ সালের ৬ই ও ৭ই জুন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভার বৈঠক বসলো। দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দুর্বার গণ-আন্দোলন চালিয়ে যাবার সংকল্প ঘোষণা করলেন। ঘোষণা করলেন যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী ক্ষমতাসীনদের উৎখাত করতে হবে।

শেখ মুজিবের এই সংকল্পের কথায় সরকারী সচেতনা নতুন ক'রে জাগ্রত হয়ে উঠল। করাচী, লাহোর, পিণ্ডি ও ঢাকা যৌথভাবে শেখ মুজিবকে এবং গণঐক্যকে পর্যুদস্ত করতে কাজ শুরু করে দিল।

জুলাই-এর ৬ তারিখে ঢাকার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার জনাব এম. বি. আলম বিগত ১৫ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দেবার জন্য শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগের খসড়া তৈরী করলেন।

কয়েকদিন পর ২০শে জুলাই শেখ মুজিব নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য করাচী যাত্রা করলেন। এই আলোচনা বৈঠকে তিনিই ছিলেন সভাপতি।

এর দু'দিন পর মোনেম খানের পুলিশ এক বর্বর আক্রমণে ঢাকার প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের ওপর অত্যাচার চালায়। সরকারের ইঙ্গিতে,

সাংবাদিক নির্যাতন ঃ শেখ মুজিবের নিন্দা

প্রায় অকারণেই বলা যায়, অকস্মাৎ এক বিরাট পুলিশ বাহিনী ঢাকা প্রেসক্লাবে নৃশংসভাবে হামলা চালায় এবং টিয়ার গ্যাস সেল ছুঁড়ে সাংবাদিকদের এক শ্বাসরুদ্ধকর বীভৎস পরিবেশে নির্যাতন করে। শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন। তিনি এর বিচার বিভাগীয় তদন্তেরও দাবী জানালেন। কিন্তু সরকার তাঁর কথায় কোন কর্ণপাতই করলেন না।

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শেখ মুজিবের সংগ্রামী ঘোষণা শুনে আইয়ুব-মোনেম চক্রের চক্রান্ত দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। লাহোর প্রস্তাবে স্টেটগুলোকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কথা উল্লেখ ছিল। শেখ মুজিব যদি এই আন্দোলনে সফল হন তা' হ'লে পূর্ব বাংলা স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়তে পারে এবং পাকিস্তানের 'জন্মশত্রু' প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ক'রে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে পারে। অতএব আইয়ুব চক্রের অনেকগুলো কার্যক্রমের একটি কার্যক্রম স্থির হ'ল এই যে, ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যে

সরকারী প্রচারণা

অপপ্রচার চালিয়ে তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের, বিশেষ ক'রে পূর্ব বাংলার জনগণের মনকে বিষিয়ে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে উভয় প্রদেশের জাতীয় সংহতির কথা বারবার প্রচারিত হতে থাকল। এর দ্বারা সরকার আর একটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইলেন। তা' হ'ল শেখ মুজিবের প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের ইমেজকে নষ্ট ক'রে দেয়া। একথা সবাই জানেন যে, শেখ মুজিব এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসী। তা' ছাড়া আওয়ামী লীগ বরাবর অসাম্প্রদায়িক নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। তাঁদের এই নীতি ও আদ-র্শের অপব্যাখ্যা ক'রে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণকে

বোঝাতে চান যে, ওরা কাফেরদের বন্ধু, ভারতের দালাল। সুতরাং শেখ মুজিব ও তদীয় অনুসারীদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না—তাঁদের ডাকে, কোন আন্দোলনে শরিক হলে দেশের অকল্যাণ হবে। শুধু এ পর্যন্তই নয়, কাশ্মীরকে নিয়ে পাকিস্তান সরকার এ সময় বড্ড বেশী নাচানাচি শুরু ক'রে দিলেন। বলতে লাগলেন, যেহেতু কাশ্মীর মুসলিম-প্রধান অঞ্চল সেহেতু তার ওপর ভারতের কোন অধিকার নেই। নির্বাচনে জয়লাভ ক'রে আইয়ুবের মিলিটারী মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। সুরার নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন তিনি। আইয়ুব খান মুসা খান ও ইয়াহিয়া খানকে 'ফিল্ড ওয়ার্কে' মনোযোগ দিতে বলেন। ভুট্টো তো দু'হাতের তালু মেলেই ছিলেন—এবারে আইয়ুব প্রশংসাসূচক তালি মারলেন। শুরু হ'ল পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত এলাকা কচ্ছের রান ও কাশ্মীরে ঠোকাঠুকি। এই ঠোকাঠুকি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। আইয়ুব যদিও প্রচার করেছিলেন যে ভারতই পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু একথা সত্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীরে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের প্রেরণ ক'রে সেখানে অঘোষিত যুদ্ধে যখন ভারতকে পর্যুদস্ত করতে তিনি ব্যস্ত, তখন ভারত উপায়ান্তর না দেখে লাহোর আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। ভারত প্রকাশ্য আক্রমণ করে, কিন্তু পাকিস্তানের গোপন আক্রমণই তার জন্য দায়ী।

পাক-ভারত যুদ্ধ বাধানোর জন্য আইয়ুবের পাঁয়তারা

সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে প্রকাশ্যভাবে এই যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৭ দিন এই যুদ্ধ চলে। জাতিসংঘের স্বস্তিপরিষদ (Security Council) ২০শে সেপ্টেম্বর এই যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিলে উভয় দেশই তা' মেনে নেন। পরে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের আমন্ত্রণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মিলিত হন এবং "যুদ্ধ নয়" চুক্তির মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়।

পাক-ভারত যুদ্ধ : কোসিগিনের মহৎ প্রচেষ্টা

যদিও মাত্র সতের দিন যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল, তবু এই যুদ্ধের ফলে

পূর্ব বাংলার জনগণের চোখ খুলে যায়। তারা দেখল, বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখে তাদেরকে রক্ষা করবার মত কোন সুনিশ্চিত ব্যবস্থাই করা হয় নি। এই যুদ্ধে বহির্বিশ্ব থেকে পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এমনকি, পাকিস্তানের অন্য অংশের সঙ্গে এই অংশের কোন যোগাযোগই ছিল না। উভয় অংশের মাঝখানে বিরাট রাষ্ট্র ভারতের অবস্থিতি। সেই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে দুই অংশের মধ্যে যোগসূত্র যেমন বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য, তেমনি ভারতের দুরভিসন্ধি থাকলে যে কোন মুহূর্তে এই অরক্ষিত অঞ্চল বাংলাদেশকে অধিকার করা তাদের পক্ষে মোটেও কঠিন ছিল না। সৌভাগ্যের বিষয়, ভারত সরকার এত বড় একটি সুযোগের কোন সদ্ব্যবহারই করেন নি। বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব ভারত সরকারের কোন দিনই ছিল না। বরং এই অংশের মানুষের কল্যাণই তাঁরা কামনা করে এসেছেন। তাই ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারত সরকার ও জনগণ যথেষ্ট মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। এই যুদ্ধের ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধ আরও বেশী চলতে থাকলে বাংলাদেশের আর্থনীতিক ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ত। একে তো পাকিস্তান আমলে কোনকালেই এখানে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য মজুত ক'রে রাখা হ'ত না, উপরন্তু বহির্বিশ্বের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় বাইরে থেকে কোন সাহায্য আনবার পথও খোলা ছিল না। এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে এই অঞ্চলের মানুষকে ধীরে ধীরে ঠেলে দেয়া হ'ত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

পূর্ব বাংলার জনগণের অসহায়ত্বের নগ্ন-চিত্র

যাহোক, যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট এই অঞ্চলের সার্বিক অসহায়ত্বের একটি নগ্নছবি প্রকটভাবে ধরা পড়ে। তারা মর্মে মর্মে অনুভব করে যে, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ মনোভাব দিনে দিনে তাদেরকে গোলামীর কঠিন জিঞ্জিরে বেঁধে ফেলছে এবং এক ভয়াবহ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার প্রতি কঠিন উপেক্ষা যেমন প্রকট হয়ে ওঠে, তেমনি আবার সচেতনভাবে এই অঞ্চলের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবার

ষড়যন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত বেতারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ক'রে দেয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন (যদিও ব্রাহ্ম) এবং হিন্দুস্থান আমাদের শত্রু—অতএব তাঁর লেখা গান মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ হতে হবে। নজরুল ইসলাম যদিও মুসলমান—কিন্তু ছিলেন হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত, সে কারণেই তাঁর যে সব গানে হিন্দু ঐতিহ্যের ছাপ আছে সেগুলোকে বর্জন করা হয় এবং তাঁর ইসলামী গানগুলো থেকে শ্মশান, কৃষ্ণচূড়া, রামধনু এবং এই জাতীয় বহু শব্দ বাদ দেয়া হয়।

সংস্কৃতির ওপর এই আঘাত পূর্ব বাংলার জাগ্রত জনতাকে, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মহলকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জনমনে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর উদাসীনতা ও বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতি অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে নতুন পথে জমাট বাঁধতে থকে। জনগণের সাথে যার প্রাণের যোগ সবচেয়ে নিবিড়, সেই গণনেতা শেখ মুজিব এই সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহারের জন্য এগিয়ে আসতে থাকেন। তিনিই প্রথম এ ব্যাপারে সোচ্চার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে চরম উদাসীনতা প্রদর্শনের জন্য সরকারকে প্রকাশ্য জনসভায় তিনি ধিক্কার প্রদান করেন। তিনি দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, মওলানা ভাসানী এবং N. D. F. এর নেতৃবৃন্দ—নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, মাহমুদ আলী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ পূর্ব বাংলার অন্যান্য নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়ার পরিবর্তে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনে আইয়ুব খানের সঙ্গে ২৬শে ডিসেম্বর (১৯৬৫) তারিখে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ভারতের নিন্দা প্রচারাভিযান চালাতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। পরবর্তীকালে জনসভায় দাঁড়িয়ে এঁরা এই প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন।

শেখ মুজিব ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা এবং আইয়ুব সরকারের মিথ্যা প্রশংসা—এই দুই জাতীয় কাজ থেকেই অনেক দূরে থাকতেন। পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মত ভারতীয় হামলার নিন্দা

করতে তিনি সোচ্চার হলেন না—এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সংযতবাক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। ভারতীয় হামলার সমালোচনা তিনি যে করেন নি, তা' নয়। তবে এই যুদ্ধে পাকিস্তানের দায়িত্বকেও তিনি অস্বীকার করেন নি। এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারীদের পাঠিয়ে আইয়ুব খান নিজেই যুদ্ধকে ডেকে এনেছেন। তাঁর মনে একটি প্রচ্ছন্ন কুমতলব কাজ করেছিল। পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে এবং কাশ্মীরে সুশৃঙ্খলভাবে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে তিনি ভেবেছিলেন যে, এতে ভারত পূর্ব বাংলা দখল ক'রে নেবে এবং তিনিও কাশ্মীর হস্তগত করবেন। অর্থাৎ সরাসরি কাশ্মীরের সাথে পূর্ব বাংলার আদান-প্রদান, যাকে বলে বার্টার ডিল, সেটা না ক'রে আইয়ুব এই সুচতুর পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত তাসখন্দ বৈঠকের আলোচনায় তাঁর বক্তব্যই এই দুরভিসন্ধির সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। কিন্তু ভারত তাঁর এই চালাকি বুঝতে পেরেই পূর্ব বাংলার দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে লাহোর আক্রমণ ক'রে বসলেন। আইয়ুবের গণনায় বড় ভুল হয়ে গেল। এ কথা বাঙালী নেতাদের মধ্যে একমাত্র শেখ মুজিবই যথার্থভাবে অনুভব করেছিলেন

তা' ছাড়া যুদ্ধ যেদিক থেকেই আসুক, শেখ মুজিবের তা' কাম্য ছিল না। তিনি যুদ্ধ কামনা করেন না—তিনি কামনা করেন শান্তি, ঐক্য, প্রগতি, —এই হ'ল তাঁর অন্তরের চিরন্তন বাণী।

কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারীদের পাঠিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আর সেই সাথে পূর্ব বাংলাকে বলতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রাখা এবং তাসখন্দের বৈঠকে প্রায় চারদিন ধরে বাচাল পররাষ্ট্র মন্ত্রীসহ নিজে কাশ্মীর কাশ্মীর ক'রে গোঁ ধরা, আইয়ুবের এবম্বিধ কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তিনি বাংলাদেশের বিনিময়ে কাশ্মীর চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করতে পারলেন না। আইয়ুবের এই দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য আর কারো নিকট ধরা না পড়লেও শেখ মুজিবের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। তাই ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর থেকে শেখ মুজিবের কার্যকলাপের প্রবাহ নতুন খাতে বইতে শুরু করলো। ছয়-দফা এই নতুন প্রবাহপথের প্রথম ফসল—পূর্ব বাংলার মুক্তিসনদ, তথা

ঐতিহাসিক ছয়-দফার পটভূমিকা

স্বাধীন বাংলাদেশের পথে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ এদিক থেকে স্বাধীন বাংলার স্বপ্নকে উজ্জীবিত ও ত্বরান্বিত করেছিল।

মহামতি লেনিনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সব সময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন ক'রে এসেছে। পাক-ভারত যুদ্ধ যখন ভয়াবহ রূপে মোড় নিতে যাচ্ছিল, তখন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোসিগিন দুই দেশকেই শান্তি স্থাপনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই আহ্বানে দুই দেশই সাড়া দিয়েছিল। মিঃ কোসিগিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে তাসখন্দে একটি বৈঠকে আমন্ত্রণ জানালেন। এই আমন্ত্রণে দুই পক্ষই সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

আইয়ুব খান যদিও অস্ত্রের বলে দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা ক'রে একচ্ছত্র অধিপতি সেজেছিলেন, তথাপি জনগণের সমর্থন যে তাঁর পেছনে নেই এই ভয় সর্বদাই তাঁকে প্রেতাত্মার মত অনুসরণ করেছে। তাসখন্দ-এ যাবার পূর্বে তিনি তাই পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দের অনুভূতিকে যাচাই ক'রে দেখতে চাইলেন। আইয়ুবের মোসাহেব গভর্নর মোনেম খান পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দকে আলোচনার জন্য আহ্বান করলেন। অনেকেই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেও শেখ মুজিব স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে পশ্চিমা তল্পিবাহকের সাথে কোন আলোচনা হতে পারে না। আলোচনা যদি হতেই হয়, আইয়ুবের সাথেই হবে। শেখ মুজিব ব্যতিরেকে পূর্ব বাংলায় অন্য নেতৃবৃন্দের গুরুত্ব কতটুকু আছে এ কথা মোনেম খানও জানতেন, আইয়ুব খানও বুঝতে পারতেন। সুতরাং আইয়ুবকে ঢাকায় আসতে হ'ল। ১৯৬৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে বৈঠক বসল। নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, ফরিদ আহমদ প্রভৃতির সাথে আওয়ামী লীগ থেকে বসলেন শেখ মুজিব, সালাম খান, তাজউদ্দিন আহমদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী এবং জহিরুদ্দিন। কিন্তু বৈঠকের প্রারম্ভেই গোলমাল দেখা দিল। আইয়ুব খান প্রথমেই প্রশ্ন ক'রে বসলেন—"বলুন আপনারা কেন এসেছেন, কি আপনাদের বক্তব্য।" শেখ মুজিব এতে বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি সোজা দাঁড়িয়ে বললেন, "আমরা তো নিজে থেকে আসি নি—আপনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাই এসেছি—আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, কিন্তু এভাবে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে এসে অপমান করার

অধিকার আপনার নেই।" আইয়ুবের মুখের ওপর এভাবে কেউ কথা বলতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁর এই প্রথম অভিজ্ঞতা। তিনি যেমন ক্ষুব্ধ হলেন, তেমনি অবাক না হয়েও পারলেন না।

যাহোক, সালাম খান মাঝখান থেকে দাঁড়িয়ে বিষয়টি সহজ ক'রে দিলেন। নূরুল আমীন অনেক স্তাবকতার পর গণতন্ত্র সম্পর্কে সামান্য কিছু বলতে লাগলেন। শেখ মুজিব তাঁকে বাধা দিয়ে পূর্ব বাংলাকে যুদ্ধের সময় কিভাবে অরক্ষিত রাখা হয়েছিল এবং কিভাবে পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এসব কথা বললেন। তিনি যদিও দফাওয়ারীভাবে ছয়-দফার বর্ণনা দেন নি, কিন্তু আভাসে-ইঙ্গিতে তিনি তাঁর ছয়-দফার সারমর্মই আইয়ুবের সামনে বিচ্ছিন্ন-ভাবে তুলে ধরেন। হামিদুল হক চৌধুরী শেখ মুজিবের এই বক্তব্যে বাধা দান করেন। কিন্তু শেখ মুজিবও তার সমুচিত জবাব দিতে কুণ্ঠিত হন নি।

যদিও কোন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই বৈঠক শেষ হয় নি, তবু আইয়ুব খান একথা অবগত হয়ে গেলেন যে পূর্ব বাংলায় যে সিংহপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁকে সহজে কাবু করা যাবে না, আর এই সিংহপুরুষের পশ্চাতে দেশের গণসমর্থন দিন দিন বিপুল থেকে বিপুলতর হতে যাচ্ছে।

ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি

এবার তাসখন্দ বৈঠকের কথায় ফিরে আসা যাক। ১৯৬৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারী দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে গত ১৮ বৎসরব্যাপী উত্তেজন র অবসানকল্পে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক উদ্যোগে তাসখন্দে যে ঐতিহাসিক সম্মেলন শুরু হয়, সেখানে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ প্রথমে ৮ই জানুয়ারী তারিখে ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পন্ন করতে রাজী হন নি। আইয়ুব ও তদীয় করুণাপুষ্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ছাড়া কোনরূপ চুক্তি করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁরা প্রথম থেকেই গোঁ ধরলেন যে, "ন্যায় ও সম্মানজনক পন্থায় কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলে, অথবা এ সমস্যা সমাধানের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করা না হলে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি অপ্রাসঙ্গিক হবে।"

অবশেষে তার দু'দিন পর অর্থাৎ ১০ই জানুয়ারী ('৬৬) উভয় দেশের

মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিকেই ঐতিহাসিক 'তাসখন্দ চুক্তি' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই তাসখন্দ চুক্তির মর্মকথা হল ঃ

(১) একের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ পথে সকল বিরোধের মীমাংসা ও দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধপূর্ব স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

(২) হাই কমিশনারদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যার্বতন ও স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

(৩) ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নিজ নিজ সৈন্য ৫ই আগস্টের (১৯৬৫) সীমানায় প্রত্যাহার।

(৪) যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণের নির্দেশ দান।

(৫) পারস্পরিক অপপ্রচার হতে বিরত থাকা।

(৬) দু'দেশের মধ্যেকার যাবতীয় চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন।

(৭) বাস্তুত্যাগ বন্ধের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি।

(৮) শরণার্থী ও বহিরাগত উচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রশ্নে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া।

(৯) পারস্পরিক স্বার্থসংক্রান্ত প্রশ্নে শীর্ষ বা অন্য পর্যায়ে বৈঠক।

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৬]

কিন্তু এই ঐতিহাসিক চুক্তির মাত্র নয় ঘণ্টা পর ১১ই জানুয়ারী তারিখে গভীর রাতে (স্থানীয় সময় ১-১৫ মিনিট) আকস্মিকভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে। শেখ মুজিবও এক শোকবাণী পাঠিয়েছিলেন। বাণীতে তিনি বললেন যে, শাস্ত্রিজী দুই দেশের শান্তি ও প্রগতির জন্য আত্মত্যাগ করেছেন।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু

ঐতিহাসিক 'তাসখন্দ চুক্তি' পূর্ব বাংলার সর্বত্রই বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল। কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনরূপ মনোমালিন্য নিয়ে বাংলার জনগণ বসবাস করতে চায় না।

তাসখন্দ চুক্তিতে পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়া

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের নিকট শান্তির চেয়ে বড় কথা ছিল স্বার্থ। বাংলার বিনিময়ে কাশ্মীরকে পাওয়ার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় কাশ্মীর প্রশ্ন তাঁদের নিকট আরও বড় হয়ে দেখা দিল। তাই যে তাসখন্দ চুক্তিতে কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান নেই, সে চুক্তিকে তাঁরা অভিনন্দন জানাতে পারেন নি।

তাসখন্দ চুক্তিতে শাসকচক্রের প্রতিক্রিয়া

আসলে আইয়ুব ভুট্টোও এই চুক্তিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বিশ্বের নেতৃবৃন্দের চাপে পড়েই তাঁদেরকে এ ধরনের চুক্তিকে মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু যা করেছেন তাকে তো আর সহজে বাতিল করা যায় না, ভবিষ্যতে আবার সুযোগমত প্রতিশোধ নেয়া যাবে—এই ভেবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে ব্যাপারটি আপাততঃ ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করলেন তাঁরা। কিন্তু উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নেতারা আইয়ুবের এই অন্তর্গূঢ় রহস্যের কথা অনুধাবন করতে পারেন নি। ফলে, ধীরে ধীরে তাসখন্দ চুক্তি-বিরোধী একটি আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, সরকার ওখানকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দিতে বাধ্য হন। এমন কি, আইয়ুব খান নিজেও বাধ্য হয়ে তাসখন্দ চুক্তির প্রথম ধারাটি পর্যন্ত অস্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি।

যা হোক, শেখ মুজিব এই সময় অত্যন্ত সাবধানে কথাবার্তা বলেছেন এবং তাসখন্দ চুক্তি অভিনন্দনের সাথে সাথে পূর্ব বাংলার স্বার্থই বড় ক'রে তুলেছেন। এই সময় তাঁর নামে আনীত বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রবিরোধীমূলক মামলা-মোকদ্দমা দায়ের ক'রে তাঁকে হয়রানী করা হতে থাকে।

২৮শে জানুয়ারী (১৯৬৬) অর্থাৎ ১৫ই মাঘ (১৩৭২) শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দানের অভিযোগে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ধারা মতে এক বৎসর এবং আপত্তিকর বক্তৃতা দানের জন্য জন-নিরাপত্তা আইনের ৭ (৩) ধারামতে আরো এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জানুয়ারী মাসের ৪ তারিখে এই মামলার রায় ঘোষণার তারিখ ধার্য ছিল। উক্ত তারিখে এবং পরবর্তী আরো দু'টি তারিখে—

১০ই ও ১৭ই জানুয়ারী এই মামলার রায় প্রদান স্থগিত থাকে। দু'বছর কারাদণ্ডাদেশের রায় ঘোষিত হওয়ার পর পরই উক্ত কোর্টে হাইকোর্টে আপীল সাপেক্ষে শেখ মুজিবের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন পেশ করা হলে কোর্ট তা' প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁকে সরাসরি কোর্ট থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। শেখ সাহেবকে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই হাইকোর্টে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের এবং অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন করা হলে বিচারপতি আর. টি. তালুকদার উক্ত আবেদন গ্রহণ ক'রে তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তির আদেশ প্রদান করেন। ফলে সেদিনই তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি দানের সময় শেখ সাহেবকে জেলগেটে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

শেখ মুজিবের হয়রানী

পরদিন অর্থাৎ ২৯শে জানুয়ারীতেও আবার শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনের ৭ (৩) ধারামতে অপর একটি অভিযোগ আনয়ন করা হয়।

ফেব্রুয়ারীর ৯ তারিখে "পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও" শীর্ষক প্রচারপত্র মামলার শুনানী হবার কথা ছিল, কিন্তু ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শুনানী মুলতবী রাখা হয়। এই মামলাতেও শেখ মুজিব অন্যতম আসামী ছিলেন। তিনি ছাড়া অন্যান্য যাঁরা এতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা হলেনঃ সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, শাহ আজিজুর রহমান, এম. এন. এ., তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী, মাহমুদ আলী এম. এন. এ., ডঃ আলীম-আল-রাজী এম. এন. এ., অলি আহাদ, আলী আকসাদ (ইত্তেফাকের সহযোগী সম্পাদক) ও ওবায়দুর রহমান। এইভাবে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে পর পর অনেকগুলো মামলার জাল বিস্তার ক'রে তাঁকে হয়রানী করা হচ্ছিল।

এদিকে তাসখন্দ চুক্তিকে কেন্দ্র ক'রে কিছু সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ আবার রাজনীতির জুয়াখেলাকে জীবন্ত করবার জন্য কসরত শুরু করলেন। এঁরা ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে একটি জাতীয় কনফারেন্স আহবান করলেন। শেখ মুজিব প্রথমতঃ এই সম্মেলনে যোগদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এই সময় আওয়ামী

লীগের নিখিল পাকিস্তানী সভাপতি ছিলেন নসরুল্লাহ্ খান, সাধারণ সম্পাদক জহিরুদ্দিন। পূর্ব বাংলার সভাপতি ছিলেন আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ আর সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু কার্যতঃ, যাঁর স্থান যেখানেই হোক না কেন, আওয়ামী লীগের সমস্ত শক্তির উৎস শেখ মুজিব। লাহোর কনফারেন্সে যেতে শেখ মুজিব অস্বীকার করায় নসরুল্লাহ্ খান ছুটে এলেন পূর্ব বাংলায়। অনেক আলোচনার পর স্থির হ'ল যে, পূর্ব বাংলা থেকে প্রতিনিধি যোগদান করবেন। শাহ আজিজুর রহমান তখন আওয়ামী লীগে ছিলেন। শেখ মুজিব তাঁর নেতৃত্বে কয়েকজনকে পাঠানোর কথাই প্রথম দিকে ভাবছিলেন। কিন্তু ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া বললেন, "মুজিবর মিয়া (এই নামেই তিনি সব সময় ডাকতেন) যদি যেতেই হয়, আপনিই যান। আর আপনার মনে এতকাল যে কথাগুলো আছে সেগুলো লিখে নিয়ে যান। ওরা শুনুক না শুনুক, এতে কাজ হবে।"

শেখ মুজিব দ্বিতীয় চিন্তায় স্থির করলেন যে তিনি নিজেই যাবেন এবং এতকাল পূর্ব বাংলার স্বার্থ নিয়ে তিনি যে কথা ভেবেছেন, যে কথাগুলো অগোছালোভাবে বলে এসেছেন, সেগুলো লিখে নিয়েই যাবেন।

অতঃপর তিনি তাঁর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রের কয়েকজন অনুরাগী নিয়ে আলফা ইনসিওরেন্সের কক্ষে বসে ছয়-দফার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া প্রণয়ন করলেন। বাঙালীর মুক্তিসনদ ছয়-দফা এভাবেই প্রণীত হ'ল। এর সামগ্রিক প্রণেতা শেখ মুজিব নিজে। ছয়-দফা তাঁর সুদীর্ঘকাল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞার ফসল। দীর্ঘকাল তিনি দেশ ও দেশের সমস্যা সম্পর্কে যে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, ছয়-দফায় তার ফলশ্রুতি ঘটেছে। কোন কোন মহলকে এরূপ মন্তব্য করতে শুনেছি যে বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতদের নিকট থেকে ছয়-দফার ধারণা ধার করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের অবগতির জন্য বলা দরকার যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। একদিন হঠাৎ বসে কয় ঘণ্টার মধ্যেই এমন বৈপ্লবিক বক্তব্যের বিকাশ ঘটতে পারে না। এর জন্য সুদীর্ঘকাল চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন, প্রয়োজন পরিপক্ক অভিজ্ঞতার। ১৯৪৫ সাল থেকে

ছয়-দফার জন্ম

ক্রমাগত রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত থেকে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ক'রে যে অভিজ্ঞতা শেখ মুজিব সঞ্চয় করেছিলেন ছয়-দফায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে। ছয়-দফা প্রণয়নের পূর্বে বহু সভা-সমিতিতে তিনি এসব বক্তব্য ছাড়া ছাড়া বলেছেন। তাসখন্দ বৈঠকের পূর্বে আইয়ুব খান এলে তাঁর সামনেই এলোমেলোভাবে তোসনো ছয়-দফার কথাই তিনি বলেছেন। আলফা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কক্ষে যেদিন তিনি ছয়-দফা প্রণয়ন করলেন সেদিন তাঁর সুদীর্ঘকালের সুশৃংখল চিন্তা ও অবিন্যস্ত বক্তব্য ছয়-দফায় বিন্যস্ত রূপ ধারণ করলো। সুতরাং ছয়-দফার স্বাপ্নিক তিনি, প্রণেতাও তিনি নিজেই। আশা করি এতে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটবে।

যাহোক, ছয়-দফা যদিও বিশেষ গোপনতার সঙ্গে প্রণীত হয়, তবু সেখানে একজন সাংবাদিক ছিলেন এবং তিনি টাইপ-করা একটি কপি হস্তগত করেন। ইনি তৎকালীন তরুণ কথাশিল্পী এবং নবীন সাংবাদিক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। অতঃপর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্সে যোগদানের জন্য তাজউদ্দিন আহমদ ও নূরুল ইসলাম চৌধুরীসহ শেখ মুজিব লাহোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পূর্ব বাংলার অন্যান্য দল থেকে যাঁরা গেলেন তাঁদের সবাইকে নিয়ে যোগদানকারীর সংখ্যা ছিল ২১, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সদস্য ছিলেন ৬০০ এর ওপর।

এদিকে আলফা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কক্ষ থেকে সাংবাদিক চৌধুরী খসড়া ছয়-দফায় যে একটি কপি নিয়েছিলেন তিনি তা' কাগজে প্রকাশ ক'রে দিলেন। ৩২, শরৎগুপ্ত রোডস্থ অনুপম মুদ্রণালয় থেকে প্রকাশিত সান্ধ্য-দৈনিক 'আওয়াজ'-এ এই প্রথম ছয়-দফার খসড়া প্রকাশ পায়। এতে আওয়ামী লীগের কেউ কেউ বিরক্ত হয়েছিলেন। তবে এতে ক্ষতি না হয়ে লাভই হয়েছিল, কেননা রীতিমাফিক পদ্ধতিতে ছয়-দফা নেতার দ্বারা জনসমক্ষে উপস্থাপনের পর্বেই একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকলো।

ফেব্রুয়ারীর ৫ তারিখে যথাসময়ে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাস-ভবনে কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ আফজলের সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। সাবজেক্ট কমিটির মিটিং-এ শেখ মুজিব তাঁর ছয়-দফা দাবী পেশ করেন। কিন্তু তা' গৃহীত হয় না, এমন কি পূর্ব বাংলায়

ফরিদ আহমদ জাতীয় নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত এতে আপত্তি করেন। ৬ই তারিখে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি পত্রিকা শেখ মুজিবের ছয়-দফা বিকৃত ক'রে প্রকাশ করে এবং শেখ মুজিব যে দেশের দুই অংশকে বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছেন এ কথাই জোরালো ভাষায় প্রচারিত হয়। পশ্চিম পাক নেতৃবৃন্দের অনমনীয় মনোভাব দৃষ্টে শেখ মুজিব জাতীয় কনফারেন্সে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। এদিকে কাগজে বিকৃত খবর প্রকাশের ফলে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে, বিশেষ করে লাহোরে শেখ মুজিব ও তাঁর সঙ্গীদের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। তাঁরা গোপনে করাচী গিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যার বাসভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে ট্রাঙ্ককলের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দকে অবস্থা অবহিত করানো হয় এবং তাঁরা করাচী থেকে কখন ফিরে আসছেন তাও জানিয়ে দেয়া হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শেখ মুজিব তাঁর সঙ্গীদের সহ ঢাকায় ফিরে এলে বিমান বন্দরেই সাংবাদিকদের নিকট তিনি তাঁর ছয়-দফা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন এবং এই দাবীর প্রতি পশ্চিমপাক নেতৃবৃন্দের অনীহার কথাও উল্লেখ করেন। 'এখন কথা নয়, সংগ্রাম শুরু করতে হবে' এই ছিল তাঁর সেদিনকার সুস্পষ্ট বক্তব্য।

লাহোরে বিরোধী দলের জাতীয় সম্মেলন

উক্ত জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মী ব্যতীত পূর্ব বাংলার অধিকাংশ তথাকথিত নেতার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক যে ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ব বাংলার স্বার্থ তাঁদের নিকট মোটেই প্রাধান্য লাভ করে নি।

প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দৃষ্টিতে জাতীয় সম্মেলন

দৈনিক ইত্তেফাক-এর প্রথম পৃষ্ঠায় পূর্ব বাংলার উক্ত তথাকথিত বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার দৃষ্টিতে লাহোরের জাতীয় সম্মেলনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরটি ছিল এইরূপ ঃ

"ফরিদ আহমদের দৃষ্টিতে লাহোরের জাতীয় সম্মেলন ঃ

গতকল্য (বুধবার) নেজামে ইসলাম নেতা জনাব ফরিদ আহমদ ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, লাহোর জাতীয় সম্মেলনে গণতন্ত্র

পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই দেশব্যাপী এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী দেশের ৪টি বিরোধীদল ও দেশের নির্দলীয় বিশিষ্ট নেতবৃন্দ একই প্ল্যাট-ফরম হইতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম শুরু করিতে সম্মত হইয়াছেন।

জনাব ফরিদ আহমদ লাহোর জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের পর গত মঙ্গলবার ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিন তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, জাতীয় সম্মেলন সম্পূর্ণভাবে সফল হইয়াছে। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকা ছাড়া প্রতিটি তহশীল হইতে এই সম্মেলনে প্রতিনিধি যোগদান করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, সম্মেলনে মুলতঃ দুইটি প্রধান বিষয়ের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথমতঃ, দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করাকে সম্মেলনে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় সম্মেলনে তাসখন্দ ঘোষণাপত্র সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে। সম্মেলন এই ঘোষণাপত্রকে সমর্থন করিতে পারে নাই। কারণ সম্মে-লন মনে করে যে, তাসখন্দ ঘোষণাপত্রে কাশ্মীরের দাবীকে চিরতরে শিকায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং জাতীয় মর্যাদার বিনিময়ে এই ঘোষণাপত্র অর্জন করা হইয়াছে। এই পর্যায়ে জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে জনাব ফরিদ আহমদ বলেন যে, দুই দিবসব্যাপী সম্মেলনের যে অধিবেশনে তাসখন্দ ঘোষণা-বিরোধী প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয় সেই অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল যোগদান করে নাই। আওয়ামী লীগ দলের এই অধিবেশন বর্জনের কারণ জানিতে চাহিলে জনাব ফরিদ আহমদ বলেন যে, তাসখন্দ ঘোষণাপত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির কোন সঠিক সিদ্ধান্ত না থাকায় তাঁহারা অধিবেশনে উপস্থিত হতে পারেন নাই।

তিনি বলেন যে, অচিরেই দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগের নবাবজাদা নসরুল্লাহ্, জামাতে ইসলামীর মওলানা মওদুদী, নেজামে ইসলামের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, কাউন্সিল মুসলিম লীগের সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল

এবং স্বতন্ত্র দলের পক্ষে এডভোকেট আনোয়ারকে লইয়া ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটি শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তান সফর করিবেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬]

ফরিদ আহমদের এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, লাহোরের তথাকথিত জাতীয় সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য পূর্ব বাংলার জন্য কল্যাণকর ছিল না। আর এই সম্মেলনে শেখ মুজিব যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে ফরিদ আহমদের ন্যায় অদূরদর্শী নেতা কটাক্ষ ক'রে তাচ্ছিল্য-ভাব প্রদর্শন করলেও জনগণ তাঁর ভূমিকায় সন্তুষ্ট হয়েছিল। তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতায় শেখ মুজিব অংশ নেন নি, এই কথাই শুধু এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ফরিদ আহমদ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি কেন অংশ নেন নি তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে ফরিদ আহমদ ব্যর্থ হয়েছেন।

ওদিকে শেখ মুজিবও পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলন (১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬) আহবান করেন। সাংবাদিকদের নিকট তিনি জাতীয় সম্মেলন সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন। দৈনিক ইত্তেফাক থেকে তাঁর সেই বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করছি ঃ

জাতীয় সম্মেলন সম্পর্কে শেখ মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলন

"পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং দেশরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রশ্নটা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া চিত্রিত করা উচিত নহে।

শেখ সাহেব বলেন যে, সাম্প্রতিক যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অকৃত্রিম ভালবাসাই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষার ব্যাপারে সুসংহত রাখিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানবাসী

দেশরক্ষা ব্যাপারে তাহাদের প্রদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে থাকে।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, দেশরক্ষা ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হয় তাহা হইলে জাতি তাহাদের মাতৃভূমির সংহতির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত যে কোন হামলা অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে।

তিনি বলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন জাতি ও সংহতির কোন ক্ষতি তো করিবেই না বরং পাকিস্তানকে আরও বেশী শক্তিশালী করিবে।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকর সংসদ কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার পূর্বে তাসখন্দ ঘোষণা সম্পর্কে এই পর্যায়ে তিনি কোন মতামত প্রকাশ করিবেন না।......।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬]

যাহোক, লাহোরের জাতীয় সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর স্বার্থের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করে নি। তারা একতরফাভাবে ইসলামী গণতন্ত্র রক্ষার সংকল্প প্রকাশ ক'রে পূর্ব বাংলার দাবীকে ধামাচাপা দিয়েছে। এ বিষয়ে এখানকার তথাকথিত বিরোধী দলীয় কতিপয় নেতাও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন, ফরিদ আহমদ-এর সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই তা' সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন নি। আর পারেন নি বলেই তিনি পূর্বোক্ত জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে লাহোর থেকে করাচী হয়ে ১১ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ফিরে আসেন। শেখ মুজিবের এই আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকার প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিপুল ভাবে অভিনন্দন জানায়। ঢাকা বিমান বন্দরে যখন তিনি পৌঁছলেন— সাংবাদিকরা তখন তাঁকে ঘিরে ফেললেন। সেদিন সাংবাদিকদের নিকট তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন সে বিষয়ে পরদিন দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছেন ঃ "পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে

জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে শেখ মুজিবের সম্পর্ক ছিন্ন ঃ বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের নিকট ব্যাখ্যা দান

পাঁচ কোটি মানুষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভবপর নহে। সে কারণে লাহোর সম্মেলনের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব দেশের উভয় অংশের মধ্যে অটুট ঐক্য ও সুদৃঢ় সংহতি গড়িয়া তোলার জন্য ৬-দফা কর্তব্য নির্দেশ করেছেন।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য শুক্রবার করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোষণা করেন যে, লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী শিবিরের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদিই নয়, গোটা সম্মেলনের সঙ্গেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

তেজগাঁও বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রায় একঘন্টাকাল আলাপ-আলোচনার সময় লাহোর সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে তিনি যে সব সুপারিশ পেশ করেন সেই প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, পাক-ভারতের মধ্যকার বিগত ১৭ দিনের যুদ্ধে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে প্রশাসনিক দিক দিয়া জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের কথা বিবেচনা করিয়া দেশের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে নতুন করিয়া চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তিনি বলেন, বিগত অস্বাভাবিক ধরনের জরুরী দিনগুলিতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানীদের ঐক্যবোধই দেশের দু'প্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, ঘটনাক্রমে নয়।

শেখ মুজিব সাংবাদিক সম্মেলনে আরো বলেন যে, জাতীয় সম্মেলনের 'সাবজেক্ট কমিটি'তে তিনি যে সব বিষয়ে সুপারিশ করিয়াছেন তা' পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলকে একত্র ও একই রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে বিশ্ব মানচিত্রে কায়েম রাখার জন্যই করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি লাহোর সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটিতে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানে একটি শাসনতান্ত্রিক ফেডারেশন গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। সুপারিশকৃত এই শাসনতন্ত্রে বিশ্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার কায়েমের এবং আইন-পরিষদসমূহের সার্বভৌমত্বের বিধান থাকিতে হইবে।

ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারাধীন যে সব বিষয় থাকিবে বলিয়া শেখ মুজিবুর সুপারিশ করিয়াছেন তাহা এই যে, ফেডারেল সরকার

দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব পালন করিবেন। এই দুইটি বিষয় ছাড়া আর বাকী যে সব বিষয় থাকিবে তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে ফেডারেল অন্তর্ভুক্ত স্টেটসমূহের হাতে।

দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্পর্কে শেখ মুজিব সাবজেক্ট কমিটিতে অবাধে বিনিময়যোগ্য দুইটি পৃথক ধরনের মুদ্রার অথবা শর্তসাপেক্ষে একটি মুদ্রা-ব্যবস্থা কায়েম রাখার সুপারিশ করিয়াছেন।

তিনি সুপারিশ করিয়াছেন যে, ফেডারেশনের জন্য যদি একটি মুদ্রা-ব্যবস্থা কায়েম রাখিতে হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে এবং এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য কার্যকরী শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে। এ ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

কর ধার্য করা সম্পর্কে শেখ মুজিব যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, সর্বপ্রকারের কর ও শুল্ক ধার্যের একচেটিয়া অধিকার ফেডারেশনের স্টেটসমূহের হাতেই থাকিবে। ফেডারেল সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের অধিকার থাকিবে না। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যয়নির্বাহের জন্য স্টেটসমূহের করের একটা অংশ ফেডারেল সরকার পাবেন। স্টেট-সমূহের সকল প্রকার করের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ দ্বারাই ফেডারেল সরকারের তহবিল গঠিত হইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে শেখ মুজিব পাঁচ-দফা সুপারিশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, ফেডারেশনের প্রতিটি স্টেটের পৃথকভাবে বিদেশী বাণিজ্যের হিসাব রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী বাণিজ্যের দ্বারা আহৃত বিদেশী মুদ্রা স্টেটগুলির অধিকারে থাকিবে। তৃতীয়তঃ, ফেডারেল সরকারের বিদেশী মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সম্মত কোন একটা হারে স্টেটসমূহ মিটাইবে। চতুর্থতঃ, প্রয়োজনীয় স্বদেশে প্রস্তুত সকল দ্রব্যই বিনা শুল্কে বা টেরিফের বিধানমুক্ত অবস্থায় স্টেটসমূহের মধ্যে যাতায়াত করিবে। শেষতঃ, শাসনতান্ত্রিক বিধান করিয়া স্টেটসমূহকে বিদেশে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণের এবং সংশ্লিষ্ট স্টেটের স্বার্থে বিদেশে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার দিতে হইবে।

শেখ মুজিব শাসনতন্ত্র মতে স্টেটসম্পর্ক আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য 'প্যারা মিলিটারী' বা আঞ্চলিক বাহিনী সংরক্ষণ অধিকার দানেরও সুপারিশ করেন। শেখ মুজিব সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, লাহোর সম্মেলনের উদ্যোক্তা প্রভাবশালী একটি মহল পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া আলোচনা তো দূরের কথা, শুনিতে পর্যন্ত প্রস্তুত না থাকায় তিনি তাঁহার প্রতিনিধিদলসহ সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল রহিয়াছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস।

তাসখন্দ ঘোষণা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক তাসখন্দ প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বে এই প্রশ্নে কোন মতামত দেওয়ার এখতিয়ার তাঁহার নাই এবং সেই জন্যই লাহোর সম্মেলনে এই প্রশ্নে তাঁহার কোন মতামত দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন আশা করা গিয়াছিল যে, এই সম্মেলনে জাতীয় সমস্যাদি পুংখানুপুংখভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য জাতির সামনে একটা সুস্পষ্ট কর্মসূচী তুলিয়া ধরা হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সম্মেলনের প্রভাবশালী উদ্যোক্তারা সব কিছুই পূর্বাহ্নে সাজাইয়া রাখিয়াছেন এবং দেশের প্রধান প্রধান সমস্যাদির কিছুই তাহারা বিচার-বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নন।

জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব আরো বলেন যে, লাহোর সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির কাছে তিনি যে ৬-দফা সুপারিশ করিয়াছেন, সেই ৬-দফা অন্তর্ভুক্ত করিয়া গণতান্ত্রিক কোন সংগ্রামের জন্য কোন প্ল্যাটফরম গঠন করা হইলে তিনি সেই প্ল্যাটফরমের সঙ্গে থাকিবেন। তিনি অবশ্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, রাজনৈতিক দল ভাঙিয়া দিয়া বিভিন্নমুখী মতবাদসম্পন্ন দলসমূহের সঙ্গে মিলিয়া এক দল করা সম্ভব নহে এবং সেই প্রশ্নে তিনি সম্মতও নন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬]

লক্ষণীয় যে, লাহোরের তথাকথিত জাতীয় সম্মেলনেই শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা প্রস্তাবটি তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সম্মেলনের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তাঁর এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন নি। তাঁদের মধ্যে বাঙালী নেতৃবৃন্দও ছিলেন যাঁদের অন্যতম মুখপাত্র ফরিদ আহমদ। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে সম্মেলনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে আসতে হয়েছিল। জাতীয় সম্মেলনে উপস্থাপিত তাঁর এই বক্তব্যকে শেখ মুজিব পরবর্তীকালে ৬-দফা সুপারিশের মাধ্যমে দেশবাসীর সম্মুখে যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে তুলে ধরেন। এই ৬-দফাকে বাঙালী তাঁদের মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ নামধারী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র শেখ মুজিবের এই স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার গন্ধ খুঁজে পান। অথচ তাঁর এই ৬-দফার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকে সামনে রেখে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ যেভাবে চিন্তা-ভাবনা ক'রে আসছিল, শেখ মুজিব ৬-দফা দাবীতে সেই মনোভাবকেই একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন। এখানেই এর নতুনত্ব।

প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তের জন্যই যে দাবীগুলোকে তিনি এতদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি, এবার সত্যিকার রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি সেগুলোকে প্রকাশ করলেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বহু সমস্যায় জর্জরিত পূর্ব বাংলার জনগণ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা ফজলুল হকের মৃত্যুর পর তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে রয়েছে। নেতাদের দিয়ে যেটুকু সম্ভব হবার তা' হয়েছে কিন্তু যা কিছু অসম্পূর্ণ সেগুলো তাঁকেই করতে হবে। এজন্যই তিনি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাকে সামনে তুলে ধরেছেন। এই পরিকল্পনাই সেই ঐতিহাসিক ৬-দফা—বাংলার জনগণের মুক্তির সনদ—স্বাধীনতার সূর্য-সম্ভাবনাময় এক প্রত্যক্ষ প্রেরণা।

ছয়-দফা আন্দোলনের সামগ্রিক প্রস্তাব ও ব্যাপক কর্মসূচী শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে ১৯৬৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পেশ করেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে ৬-দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন

এবং আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দান করা হয়। যে একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে বাঙালী জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই পবিত্র দিনে বাঙালী জাতির মুক্তির দলিল ৬-দফা গৃহীত হ'ল। ইতিহাসের দুটো প্রবল প্রবাহের ধারা এবার একই খাতে এসে যেন মিলিত হ'ল। এবার যিনি মহাকর্ণধার তিনি যথাসময়েই যথানিয়মেই তরণী ভাসিয়েছেন।

এসময় পুস্তিকাকারে প্রথম যে ৬-দফা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তিনি একটি ছোট্ট ভূমিকা সংযোজন করেছিলেন। ভূমিকাটি ছিল এইরূপ ঃ

৬-দফার প্রস্তাবনা

"ভারতের সাথে বিগত সতের দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা স্মরণ রেখে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আজ নতুনভাবে চিন্তা ক'রে দেখা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে বাস্তব যে সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রশ্নটির কথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জাতীয় সংহতি অটুট রাখার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্পই দেশকে এই অস্বাভাবিক জরুরী অবস্থাতে ও চরম বিশৃঙ্খলার হাত হতে রক্ষা করেছে।

এই অবস্থার আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে পাকিস্তানের দু'টি অংশ যাতে ভবিষ্যতে আরো সুসংহত একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে এই সংক্ষিপ্ত ইশতাহারটির লক্ষ্য তা-ই। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই আমি দেশবাসী জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের আজিকার কর্ণধারদের কাছে নিম্নলিখিত ছয়-দফা কর্মসূচী পেশ করছি।

[ছয়-দফা ঃ সম্পাদনায় নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পৃঃ ৫]

উক্ত পুস্তিকায় পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ একটি ভূমিকায় এই ৬-দফা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। ৬-দফা কর্মসূচীর সঙ্গে তাঁর বক্তব্যটিও একটি উল্লেখযোগ্য দলিল বলে এখানে বক্তব্যটি দেয়া হ'ল ঃ

"একটি রাষ্ট্রের উন্নতি, অগ্রগতি, সংহতি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে উহার আভ্যন্তরীণ শক্তির উপর। সেই শক্তির উৎস সন্তুষ্ট জনচিত্ত। আঠার বৎসর পূর্বে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আজও ইহার রাষ্ট্রীয় কাঠামো গণসমর্থনের মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে নাই। পাকিস্তানের মূলভিত্তি ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, পরবর্তীকালে ঐ মূলভিত্তি হইতে বিচ্যুতিই এই অবস্থার আসল কারণ। এই বিচ্যুতি ঘটাইবার মূলে ছিল একটি কায়েমী স্বার্থবাদী শোষকদলের স্বার্থান্বেষী কারসাজি। ইহারা ইসলাম ও মুসলিমের নামে সারা পাকিস্তানের গোটা সমাজকে শোষণ করিয়া নিঃশেষ করিতেছে, অপরদিকে পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই বিশেষ মহলই পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের নামে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাহাড় গড়িয়া পূর্ব পাকিস্তানে অবাধ শোষণ চালাইয়া যাইতেছে। ফলে একদিকে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ সর্বহারায় পরিণত হইতেছে, অপরদিকে জুলুমের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিবাদ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝি ও তিক্ততার সৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে অবাধ শোষণ চালাইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ মহল ঐক্য ও সংহতির জিগীর তুলিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে সম্পূর্ণ পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। বিগত আঠার বৎসরব্যাপী আবেদন-নিবেদন ও আন্দোলনের মাধ্যমে উক্ত মহলকে অবস্থা উপলব্ধি করিতে সম্মত করান সম্ভব হয় নাই। বরং নানারূপ সূক্ষ্ম কৌশলে ইহারা উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বৈরী ভাব সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়া চলিয়াছেন।

সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে দেশের প্রকৃত অবস্থা, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানীদের নাজুক অবস্থা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে এবং দেশের সংহতি, নিরাপত্তা ও পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে সকল কেন্দ্রীয় শক্তির কার্যকারিতার শ্লোগানী রূপের অসারতাও প্রমাণিত হইয়াছে। পাকিস্তানের কোন মঙ্গলকামীকে বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারবঞ্চিত অসহায় জনসাধারণকে আর সস্তা বুলিতে ধোঁকা দেওয়া চলিবে না। তাঁহারা আজ দেশের প্রকৃত সংহতি, নিরাপত্তা, শক্তি, উন্নতি ও অগ্রগতির সঠিক পন্থা নিরূপণ ও আশু বাস্তবায়নের দাবী করেন।

পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান সম্ভূত প্রশ্নে বিগত আঠার বৎসরব্যাপী সঞ্চিত প্রজ্ঞা ও সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের শিক্ষার আলোকে বিচার করিলে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ৬-দফা কর্মসূচী উপরে উল্লেখিত গণদাবীর প্রশ্নে এক বাস্তব, সুষ্ঠু ও কার্যকরী উত্তর। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এই ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতিফলন উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের ঈপ্সিত-কল্যাণ, প্রকৃত সংহতি ও কার্যকরী নিরাপত্তা বিধান করিবে বলিয়া সকল বাস্তব চিন্তাশীল মহলের বিশ্বাস। এই কর্মসূচীতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা প্রভৃতি অপরিহার্য মূল বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার বাস্তব কার্যকরী ব্যবস্থার সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। এই ব্যবস্থা গৃহীত হইলে বর্তমানে নাজুক পূর্ব পাকিস্তান সকল বিষয়ে সবল ও শক্তিশালী হইয়া সারা পাকিস্তানকে অধিক শক্তিশালী ও সুসংহত করিবে এবং উভয় অঞ্চল সমতালে অগ্রসর হইয়া যে-কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে।

শেখ সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচী প্রকাশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে চিরা-চরিত নিয়মানুসারে এক বিশেষ মহল সবিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানকে ভালবাসেন এবং উভয় অঞ্চলের জনসাধারণের মঙ্গল ও নিরাপত্তা কামনা করেন এমন কেউ এই কর্মসূচীর পাইকারী বিরোধিতা করিতে পারেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। তবে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ও তাদের অনুগতদের কথা আলাদা। এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের স্বার্থ নিহিত নাই, এমন কোন ভাল কর্মসূচীকে কখনও সমর্থন দিয়াছে, তাহার নজীর বিশ্ব-ইতিহাসে নাই, বরং নিজ স্বার্থের পরিপন্থী হইলে ইহারা যে মরিয়া হইয়া উহার বিরোধিতা করিয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে বর্তমান। তাই আমি শেখ সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচী বস্তুনিষ্ঠভাবে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য সাধারণ মানবাধিকারে আস্থাবান সকল মহলের প্রতি আবেদন জানাইতেছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই কর্মসূচীর ভিত্তিতেই পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসী প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তির সন্ধান পাইবেন এবং তাঁহাদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে সুদৃঢ় তথা পাকিস্তানকে

আরো সুসংহত ও শক্তিশালী করিতে সক্ষম হইবেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের কাছে আমার আরজ, স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হইয়া তাঁহারা যেন পূর্ব পাকিস্তান-বাসীর জীবন-মরণ সমস্যাগুলি বাস্তবের আলোকে বিচার করিয়া দেখেন। শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ছয়-দফা কর্মসূচী পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ-বিরোধী কোন কর্মসূচী নহে। একজন সাধারণ পূর্ব পাকিস্তানীর ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইগণও পাকিস্তানের উন্নতি, অগ্রগতি, সংহতি ও নিরাপত্তার অর্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের কথাও ভাবেন। তাই পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে শক্তিশালী করিবার দাবী উঠিলে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের মত আতঙ্কিত না হইয়া যৌক্তিকতার ভিত্তিতে তাঁহারা এই দাবীর প্রতি সমর্থন দিবেন, ইহাই স্বাভাবিক ও ইহাই বিশ্বাস করি।"

[প্রাগুক্ত, পৃঃ ১-৪]

এই পুস্তিকায় শেখ মুজিব যে ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচী পেশ করেছিলেন কিছুদিন পর ১৮ই মার্চ (১৯৬৬) ঢাকার মতিঝিলে ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা সহকারে "আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা কমসূচী" শীর্ষক পুস্তিকার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারার্থে পেশ করা হয়েছিল। শেখের এই কর্সসূচী তখন এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, পূব বাংলার প্রায় প্রতিটি ঘরেই এই পুস্তিকা সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল। এই পুস্তিকায় শেখ মুজিব যা বলেছেন তা হুবহু এখানে উদ্ধৃত হ'ল ঃ

আমাদের বাঁচার দাবী
৬-দফা কর্মসূচী
শেখ মুজিবুর রহমান

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬-দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদেব দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও

গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবী যখন উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ চৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি সনদ একুশ-দফা দাবী, যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবী, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষালাভের মাধ্যম করার দাবী ইত্যাদি সকল প্রকার দাবীর মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতেও এরা তেমনিভাবে পাকিস্তানকে দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটী শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবী অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬-দফা দাবী আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবীতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থবাদী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম ও তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এদের অফুরন্ত, মুখ এদের দশটা, গলার সুর এদের শতাধিক। এরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকারী দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির বেলায়, এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলাকলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এঁদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার-সচেতন দেশবাসী

যে বিভ্রান্ত হইবেন না, তাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬-দফা দাবীর তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬-দফা ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরো পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মিগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

॥ ১ নং দফা ॥

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন-সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে। ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আযমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ এক বাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিয়াছিলেন, এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ-দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবী ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবী। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেই ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব

বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবী করিয়া আমি কোন নতুন দাবী তুলি নাই, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরান দাবীরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁহারা আঁৎকিয়া উঠেন, তাঁহারা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে আগ্রহী ছিলেন না, অথবা তাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবী-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থবাদী-দের দালালী করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে, সরা-সরি নির্বাচন ও আইন-সভার সার্বভৌমত্বের যে দাবী করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভালো, না প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইন-সভাই ভালো, এ বিচারের ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য সংহতির এই তরফদারেরা এইসব প্রশ্নে রেফারেণ্ডামের মাধ্যমে জনমত যাঁচাই-এর প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁহারা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক।

॥ ২নং দফা ॥

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবল মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অব-শিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেট্সমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে। এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

উভয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকী সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তিভঙ্গ করায় 'ক্যাবিনেট প্ল্যান' পরিত্যক্ত হয়। তাহা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজো ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেট্‌সমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশোয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা' নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা-ই স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, পোস্ট অফিসের ব্যাপারেও এসত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ-দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দেবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুইটি বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি তিন নম্বর দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না। আর একটি ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে, আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে প্রদেশ না বলিয়া স্টেট্‌ বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থী শোষকরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, স্টেট অর্থে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেট স্টেট বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা' সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড়

ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া স্টেট্‌স বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানী, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে স্টেট্‌স ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা প্রদেশ নয় স্টেট, এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া স্টেট হওয়ার সম্মান পাইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তাদের এত এলার্জি কেন?

॥ ৩নং দফা ।

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অলটারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে-কোন একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে।

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে, দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অলটারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ-দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোন সুপারিশ করিয়াছি, এ কথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝা-

বুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য মানিয়া লইয়াছি। তাঁরা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্টও হইবে না। 'ক্যাবিনেট প্ল্যানে' নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেরও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে, পৃথক পৃথক স্টেট্ ব্যাঙ্কের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই, তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সোভিয়েত ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকার অর্থাৎ স্টেট্ রিপাবলিকসমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী-দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরিউক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে। এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লিখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং 'পশ্চিম

পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্প গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকশায় মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোন উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধিনিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইন-সিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারী স্টেট্ ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু' একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব ব্যাঙ্কের ডিপোজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরের ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি ঢেকের টিউবওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে।

বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোন দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট অব ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতিহেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতা, জনগণের, বিশেষতঃ পাটচাষীদের দুর্দশা, সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি পাঁচ নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট অব ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে একপাও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এই অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

॥ ৪নং দফা ॥

এই দফায় আমি প্রস্তাব দিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা করধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না থাকিলে সে সরকার চলিবে কি রূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র। কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয়, সেটা বুঝিবার বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের নিশ্চয়ই

আছে। তবু যে তাঁরা এসব কথা বলিতেছেন তার একমাত্র কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করিবার অধিকার। তারা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এইটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এই খবরও রাখেন না যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান ব্রিটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল, কেন্দ্রকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ-দফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েত ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী বা অর্থ-দফতর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী, পররাষ্ট্র দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশ-রক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ, আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সেই টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার

বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অর্থের অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসার বাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থতঃ, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থবিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

॥ ৫নং দফা ॥

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি ঃ

১। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে,

২। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে,

৩। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে,

৪। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী রফতানী চলিবে,

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা তিন নম্বর দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের

আঠারো বছরের আথিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে—

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই, এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণে ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানী করে, আমদানী করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকেরও কম। ফলে, অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী-করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা, আবাদী খরচাটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যতদিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনের বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরীব পাটচাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট

ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোন প্রতিকার নাই, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এই উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সেই আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তাহা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড্‌ আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। এই অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানী-রফতানী সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তাদামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

॥ ৬নং দফা ॥

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এই দাবী অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ-দফার দাবীতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবী করিয়াছিলাম। তাহা তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্ত ই. পি. আর. বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রকারখানা ও নৌ-বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এই অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবী একুশ-দফার দাবী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবীও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবী করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান

আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেরই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই, আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদের তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌবাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অল্প খরচে ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিলেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়ে যাওয়া হয় কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরীবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবী কি অন্যায়? এই দাবী করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা? এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইবোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে ঃ

॥ এক ॥ তাঁরা মনে করিবেন না যে, আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবী করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবীও সমভাবেই রহিয়াছে। এই দাবী স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

॥ দুই ॥ আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে, তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এই বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র

পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সে অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায়। এই একুন শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থবিজ্ঞানের কথা ঃ সরকারী আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের আয়, এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায়, সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাঁদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত, তবে এই সব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যে সব দাবী করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তহ্‌মত দিতেছেন, সেই সব দাবী আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মত আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

॥ তিন ॥ আপনারা ঐসব দাবী করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? অপানাদের সব দাবী মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গালি দিতাম না। কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, ঐসব আপনাদের হক্ পাওনা। নিজের হক্ পাওনা দাবী করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবী করিতে হইত না। আপনাদের দাবী করার আগেই আপনাদের হক্ আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক্ দাবী করিতেছি বলিয়া আমাদেরে স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হক্টাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদেরে লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হক্টাই চাই। আপনাদের হক্টা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার তাওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে ঃ

(১) প্রথম গণপরিষদে আমাদের মেম্বর সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা' করি নাই।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাইয়ের দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা' না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবী করিয়াছিলাম।

(৪) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান! আপনারা দেখিতেছেন,

যেখানে যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয়ই দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবী করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্য সত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশ-সমূহকে পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানীরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট বড় নির্বিশেষে তা' সকল পাকিস্তানীর। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরী গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানীদের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাইতাম না। আপনাদের পি. আই. ডি. সি., আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি. আই. টি., আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানী আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফবোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে, কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা ; যে নেতা বিশ্বাস করেন, পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এইসব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে ; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে ; যে নেতা বিশ্বাস

করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া শুনিয়া যাহারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায়, তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদেরে শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ৬-দফা কর্মসূচীর বিচার করিবেন। তা' যদি তাঁহারা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ৬-দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের বাঁচার দাবী নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবী।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬-দফা দাবীতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান-বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্কসহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন্ ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বাংলা ফজলুল হককে এঁরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভি-যোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীর কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বীদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে-সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এই কাজে যে-কোন

ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবীর জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তার পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই। আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি।

আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা, আল্লাহর দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন আপনাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি। ইতি—

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম,

৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২ শেখ মুজিবুর রহমান

পুস্তিকাটি "তাজউদ্দিন আহমদ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পক্ষে ১৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত" হয়। এর মূল্য ০·২৫ টাকা। পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

শেখ মুজিব প্রথম যখন ৬-দফার দাবী সরকার এবং জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন তখন থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দৃষ্টিও তাঁর বিরুদ্ধে সুতীব্র হয়ে উঠলো। পূর্ব বাংলায় আইন ও পার্লামেন্টারী দফতরের মন্ত্রী আবদুল হাই চৌধুরী করাচীতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব কর্তৃক পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে নিয়ে কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবকে দেশদ্রোহিতার নামান্তর বলে অভিহিত করলেন।

৬-দফা সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া

বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৬-দফার সারবত্তা প্রমাণ করার জন্য শেখ মুজিব ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৬) এক সাংবাদিক সম্মেলনের আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের ১৫ নং পুরানা পল্টন অফিসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন দৈনিক ইত্তেফাকের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যা থেকে উক্ত খবরের অংশবিশেষ তুলে ধরছি:

৬-দফার সারবত্তা নিরূপণে শেখ মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলন

"গতকল্য বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, রাজনীতিতে মধ্যপন্থা আর বিশ্বাস করা চলে না। তাই দেশের বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি জাতির সামনে ৬-দফা সুপারিশ তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই ৬-দফা কোন রাজনৈতিক দর কষাকষি নয়, কোন রাজনৈতিক চালবাজীও নয়—এই ৬-দফার সহিত পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসীর জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত।

...১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব আজ গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া যাঁহারা যুক্তি দেখাইতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশে শেখ মুজিব বলেন যে, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তানের ভিত্তি। এই প্রস্তাবভিত্তিক ভাবী পাকিস্তানের উপরই পাক-ভারতের জনসাধারণকে মতামত দানের জন্য সেদিন আহ্বান জানান হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাক-ভারতের মুসলমানেরা এই লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়া দেশ বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান কায়েম করিয়াছিল। এই পর্যায়ে এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন যে, ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে মুসলিম লীগের উদ্যোগে যে 'লেজিসলেচরস্ কনভেনশন' হয় তাহার পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সে নির্বাচনে জনসাধারণ লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের পক্ষেই রায়দান করে। মুসলিম লীগ কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং জনসাধারণ কর্তৃক অনুমোদন-স্বীকৃত সত্যকে বানচাল করিয়া দেওয়ার কোন এখতিয়ার দিল্লীর 'লেজিসলেচরস্ কনভেনশনের' ছিল না। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, সাম্প্রতিক লাহোর সম্মেলনের সাথে পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ যেভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে সেভাবে ছিন্ন করার পূর্ণ গণতান্ত্রিক এখতিয়ার প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের আছে। তিনি বলেন যে, লাহোর সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে আওয়ামী লীগ দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারেন কেবল তাঁহারাই—আওয়ামী লীগের গঠনতান্ত্রিক সম্পর্কে যাঁহাদের সুস্পষ্ট ধারণা নাই। কেবল স্বকল্পিত ব্যাখ্যার দ্বারা ৬-দফার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া এই দফার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের জনমত কি, গণভোটের মাধ্যমে তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার

জন্য তিনি বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, দেশবাসী আপামর জনসাধারণ ৬-দফার পক্ষে আছে এবং বিগত যুদ্ধের স্মৃতি যাঁহারা স্পষ্টভাবে স্মরণ রেখেছেন, তাঁহাদের এই ৬-দফার বিরুদ্ধাচরণ করার কোন উপায় নাই।

কাউন্সিল লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা আজ লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করছেন, শেখ মুজিব তাঁহাদেরকে স্মরণ করিয়া দেন যে, ১৯৫৫ সালে যে একুশ-দফার ভিত্তিতে মুসলিম লীগকে খতম করা হইয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সেই একুশ-দফার অন্যতম প্রধান দাবী ছিল।

একটু চেষ্টা করিলেই ৬-দফার বিরুদ্ধাচারীরা নিশ্চয়ই স্মরণ করিতে পারিবেন যে, ১৯৫৪ সালের যে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে দেশবাসী জনসাধারণ লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্বলিত একুশ-দফার সমর্থকগণকেই শতকরা ৯৭টি আসনে জয়যুক্ত করিয়াছিল। আর তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া তদানীন্তন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলকে ভরাডুবি বরণ করিতে হইয়াছিল।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তথা লাহোর প্রস্তাবের ইস্যুটিকে যদি কেহ, বা কোন দল পুনরায় গণ-আদালতে উত্থাপন করিয়া আর একবার জনমত যাচাই করিয়া দেখিতে রাজী থাকেন, আমরা সানন্দে তাঁহাদের সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

তিনি বলেন, মুসলিম লীগের নামে এতকাল কায়েমী স্বার্থবাদী মহল যে গণবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে আজ তাহা খতম হইয়াছে। তাই আজ তাহাদের কেহ কেহ নতুন উদ্যমে ইসলামের দোহাই দিয়া সমগোত্রীয়দের সাথে একীভূত হইয়া নতুন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী জনাব আবদুল হাই ৬-দফা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের দেশপ্রেমের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন শেখ মুজিব তাহার জবাব দিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, মৌলিক গণতন্ত্রের দেশে কেবল সৌজন্যের খাতিরেই মন্ত্রী বলা হয়। আসলে জনাব হাই কেবল নামেই মন্ত্রী। কারণ, তিনি যেমন দেশবাসীর

কারো প্রতিনিধি নহেন, তেমনি তাঁহার পলিসি নির্ধারণেরও কোন ক্ষমতা নাই।

শেখ মুজিব দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল শান্তিকামী মানুষকে বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডত্ব রক্ষার প্রশ্নটি পুনরায় গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, 'আমি সার্বিকভাবে অসাম্প্রদায়িক নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু তাই বলিয়া আমার দেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিজয়ীর বেশে আসিয়া প্রবেশ করিবে, দেশের লক্ষ কোটি মানুষের মত, প্রাণ থাকিতেও আমি তাহা বরদাশ্‌ত করিতে পারি না। পাকিস্তানের শক্তি তাহার এলাকা-বিশেষে নিহিত নয়। দেশের শক্তির আসল উৎস দেশের কন্দরে কন্দরে। একটা বিষয়ে পরিষ্কারভাবে বুঝা দরকার যে, কেন্দ্রের উপর 'বিষয়ের হিমালয়' চাপাইয়া দিলেই কেন্দ্র শক্তিশালী হয় না, অঙ্গসমূহের শক্তিই আসলে কেন্দ্রের শক্তি। কেন্দ্রকে যাঁহারা শক্তিশালী করিতে বা রাখিতে চান, তাঁহাদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আজ সকল ক্ষমতার অধিকারী একটি মহাশক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার দেশে কায়েম থাকা সত্ত্বেও বিগত যুদ্ধের সময় অসীম শক্তিধর সে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানীদের চরম বিপদের দিনে তাহাদের কি সাহায্য করিতে পারিয়াছিল? খোদা না খাস্তা সীমান্ত পার হইতে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যদি সর্বাত্মক কোন হামলা হইত তাহা হইলে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে তার এলাজ করিতেন. বিগত যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে শক্তিশালী কেন্দ্রের বিশ্বাসীদের নিকট হইতে এটাই আমার জিজ্ঞাসা?"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রহৃত ও শেখ মুজিবের নিন্দা

ইতিমধ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের অরাজকতা ইতিহাসে এক জঘন্য অধ্যায় সংযোজন করে। সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ ওসমান গণি ও সিণ্ডিকেটের আটজন সদস্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ আবু মাহমুদের সঙ্গে জনৈক অধ্যাপককে অবৈধভাবে নিয়োগের বিষয় সম্পর্কিত মামলায় হাইকোর্টের রায়ে হেরে যান। ফলে মোনেম খানের

পোষা একশ্রেণীর ছাত্র নামধারী গুণ্ডা সরকারী ইঙ্গিতে ডক্টর মাহমুদের উপর জঘন্যভাবে হামলা চালায়। ফলে ডক্টর মাহমুদ গুরুতর আহত হন। এই জঘন্য ঘটনায় প্রদেশের বুদ্ধিজীবীসহ ছাত্র-জনতা প্রবলভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। শেখ মুজিব কঠোর ভাষায় এই হামলার নিন্দা করেন। এমনকি তিনি বলেনঃ "ডঃ মাহমুদকে প্রহারকারী ছাত্রদল সম্ভবতঃ লাটভবনে আশ্রয় লইয়াছে।"

সরকারের নিকট অপ্রিয় হলেও শেখ মুজিবের এই সত্যভাষণ প্রকাশ করবার 'ধৃষ্টতা প্রদর্শন করায়' গভর্নরের নির্দেশ অনুসারে হোম পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সেক্‌শন অফিসার জনাব হাবিবুর রহমান 'দৈনিক আজাদের' ২০ হাজার টাকা জামানত তলবের নোটিশ দেন এবং দশ দিনের মধ্যে তার কারণ দর্শাবার নির্দেশ দান করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে ১৯৬৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৬-দফা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়।

৬ দফা ঃ
গণ-সংযোগ

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ৬-দফা পাশ হবার পর শেখ মুজিব দেশের মানুষের কাছে তাঁর তাৎপর্য তুলে ধরবার জন্য গণ-সংযোগ সফর শুরু করলেন। তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই তাঁর বক্তব্য বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ('৬৬) এক বিশাল জনতা ৬-দফাকে সামনে রেখে "দেশ ও দশের বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে"—দাবী আদায়ের জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প ঘোষণা করেন। ৬-দফা এই প্রথম একটি জনসভায় পেশ করা হ'ল এবং প্রথম যাত্রালগ্নেই এই পরিকল্পনা ব্যাপক গণসমর্থন অর্জন করলো। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দান সেদিন থেকে একটি ঐতিহাসিক ময়দানে পরিণত হ'ল।

পরদিন আওয়ামী লীগ কর্মী সমাবেশে দলীয় কর্মসূচীর কি ও কেন ব্যাখ্যা ক'রে শেখ মুজিব বলেন যে, "দেশবাসী যাহাতে স্বাধীনতার সত্যিকার স্বাদ ভোগ করিতে পারে আওয়ামী লীগের ৬-দফা দেশবাসীর ইপ্সিত সেই শক্তিশালী পাকিস্তানেরই সুস্পষ্ট রূপরেখা।"

২৭শে ফেব্রুয়ারী নোয়াখালী জেলার মাইজদী কোর্টে জেলা আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলনে শেখ মুজিব বলেন, "আমরা আর নেতাদের

ঐক্যে বিশ্বাস করি না। আমরা জনগণের ঐক্যে বিশ্বাসী এবং জনগণের ঐক্য কায়েমের প্রত্যাশী। আমরা চাই, তথাকথিত প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসান ঘটুক এবং রাজনীতি মানুষের অধিকারে আসুক। বিবেকের দংশন যিনি অনুভব করেন, আসুন আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীকে সমুন্নত করিয়া তুলুন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬]

শেখ মুজিব যখন প্রদেশের গ্রাম গ্রামান্তরে তাঁর মহান আদর্শ জনগণের সামনে তুলে ধরতে ব্যস্ত, তখন আইয়ুব খান সাত তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন ঢাকায়। উদ্দেশ্য, শেখের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগা। মার্চের ৭ তারিখে ঢাকা বিমান বন্দরে তিনি প্রদত্ত এক মানপত্রের জবাবে 'এক শ্রেণীর' রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে বললেনঃ "ওরা সুস্থ রাজনীতি শিখে নাই।" এর আগে রাওয়ালপিণ্ডিতে এক মাস-পয়লা বেতার ভাষণে দেশের ঐক্য ও সংহতির ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে 'এক শ্রেণীর লোক' যে-সব দায়িত্ব-হীন কথাবার্তা বলেন তাঁদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ ক'রে বলে-ছিলেন যে, "উক্ত ব্যক্তিদের অসৎ উদ্দেশ্য অঙ্কুরেই বিনষ্ট ক'রে দেওয়া হবে।" লক্ষণীয় যে, আইয়ুব খানের চেলারা অনেক আগে থেকেই একমাত্র শেখ মুজিবকেই দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনাশকারী বলে চিৎকার ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। আর তাঁদের প্রভু আইয়ুব এক শ্রেণীর লোক বলতে যাঁদেরকে বুঝাচ্ছেন তাঁরা যে শেখ মুজিব এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ, তা' বলাই বাহুল্য।

মার্চের ১৬ তারিখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব রাজশাহীতে প্রকাশ্যভাবে ৬-দফার বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেন এবং বললেন—"ইহা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নেরই একটি পরিকল্পনা। তিনি এর বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ ক'রে বলেন, এই 'জঘন্য স্বপ্ন' বাস্তবায়িত হ'লে পূর্ব পাকিস্তান-বাসী গোলামে পরিণত হবে, তাই এ কাজ তিনি কখনই সফল হতে দেবেন না।"

আইয়ুবের হুমকি

শুধু তাই নয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তান মুসলিম লীগের কনভেন-শনের সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণদান প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট

আইয়ুব শেখ মুজিব ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ ক'রে গৃহযুদ্ধেরও হুমকি প্রদান করেন। তারিখটি ছিল সম্ভবতঃ ১৯ অথবা ২০শে মার্চ। আর একই দিনে শেখ মুজিবও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তি দিবসে পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দানকালে বলেনঃ "কোন হুমকিই বাংলার মানুষকে ৬-দফা দাবী থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।"

১৮, ১৯ ও ২০শে মার্চ ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। পনেরো বৎসর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পর তিনি তাঁর দায়িত্ব জনাব তাজউদ্দিন আহমদের হাতে অর্পণ করেন এবং নিজে সর্বসম্মতিক্রমে দলের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। তাঁর সহকর্মী হিসেবে যাঁরা পরবর্তী এক বৎসরের জন্য 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে'র কর্মকর্তা নির্বাচিত হন তাঁরা হলেনঃ

আওয়ামী লীগ সভাপতি পদে শেখ মুজিব

সহ-সভাপতি ঃ জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম,
,, জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান,
এবং
,, জনাব মুজিবুর রহমান (রাজশাহী),
সাধারণ সম্পাদক ঃ জনাব তাজউদ্দিন আহমদ,
সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী,
শ্রম সম্পাদক ঃ জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী,
প্রচার সম্পাদক ঃ জনাব আবদুল মোমেন এডভোকেট,
মহিলা সম্পাদিকা ঃ মিসেস আমেনা বেগম,
অফিস সম্পাদক ঃ জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ,
সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি জনাব কে. এম. ওবায়দুর রহমান,
কোষাধ্যক্ষ ঃ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের হুমকির জবাব শুধুমাত্র শেখ মুজিবই দেন নি। প্রদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদরাও ৬-দফার সমর্থনে

তাঁর হুমকির কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেন। আইয়ুবের এককালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (যিনি মন্ত্রী থাকাকালীন আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে না পারার দরুন পদত্যাগ করেছিলেন) বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম ২৬শে মার্চ (১৯৬৬) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আইয়ুবকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন যে, "অস্ত্রের ভাষা বিদেশী আক্রমণের জন্য রাখিয়া আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যুক্তির ভাষায় কথা বলুন। তাঁহার নিকট যদি ৬-দফা গ্রহণযোগ্য না হয় তাহা হইলে তাঁহার বিকল্প কর্মসূচী লইয়া তিনি যেন জনগণের সামনে হাজির হন।" তিনি আরো বলেন, "ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সহিত ৬-দফার কোন গরমিল নাই।" এই সময় আইয়ুব খানের বাকসর্বস্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোও প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্য ৬-দফার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে তিনি পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি 'বাকযুদ্ধে' অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এক চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। শেখ সাহেবের তরফ থেকে সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ২১শে মার্চ উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে পল্টন ময়দানে অথবা ভুট্টোরই পছন্দ মত কোন জায়গায় যে-কোনদিন তাঁর সঙ্গে বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। এই সঙ্গে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ জনাব ভুট্টোকে ৬-দফার প্রশ্নটি চিরতরে মীমাংসার জন্য তাঁর প্রভুকে পূর্ব বাংলাব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠানে রাজী করাবার প্রস্তাব দেন এবং উক্ত গণভোটে জনাব ভুট্টোর দল শতকরা ৩০টি ভোট পেলে আওয়ামী লীগ ৬-দফার প্রশ্নে স্বীয় নীতি পুনর্বিবেচনায় প্রস্তুত বলেও তিনি ঘোষণা করেন। পরে ১৩ই এপ্রিল শেখ মুজিব নিজেই ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে তাঁর সঙ্গে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশেষে ১৭ই এপ্রিল 'সম্মুখ সমরের' দিন ধার্য হয়। স্থান ও কর্মপদ্ধতি উভয়ের মধ্যে আলোচনা-সাপেক্ষে স্থির করা হবে বলে ভুট্টো মত প্রকাশ করেন। কিন্তু এপ্রিলের ১৫ তারিখে ৬-দফার পেছনে জনতার বিপুল সমর্থন রয়েছে জেনে জনাব ভুট্টো 'সম্মুখ সমরের' উৎসুক দর্শকদের

৬-দফার বিরুদ্ধে ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ

শেখ মুজিব কর্তৃক ভুট্টোর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

নিরাশ ক'রে রণে ভঙ্গ দিলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, সময়ের স্বল্পতা হেতু মুসলিম লীগের নেতারা সভার আয়োজনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তা' ছাড়া পাকিস্তানে সফররত গণচীনের চেয়ারম্যান লিও শাও চীর সম্বর্ধনার জন্য তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হবে বলে তিনি 'সম্মুখ সমর' সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

সম্মুখ সমরে ভুট্টোর পৃষ্ঠপ্রদর্শন

জনাব ভুট্টো কেটে পড়ায় শেখ মুজিব বলেন যে. এর ফলে "৬-দফার নৈতিক বিজয় সূচিত হইয়াছে।"

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ৬-দফার প্রতি বাঙালী জাতির বিপুল সমর্থন থাকা সত্ত্বেও বাঙালীর জাতীয় নেতা বলে কথিত মওলানা ভাসানী বাঙালীর এই মুক্তি সনদের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। প্রতি-ক্রিয়াশীল চক্রের সাথে বেশ কিছুদিন ধরে অনেক শলাপরামর্শ ক'রে অবশেষে ভাসানী সাহেব ৭ই এপ্রিল ('৬৬) ঢাকায় যা বললেন ৮ই তারিখে প্রকাশিত দৈনক আজাদ পত্রিকা থেকে তার রিপোর্ট তুলে ধরছি ঃ

"ছয় দফা সম্পর্কে ভাসানী যাহা বলেন ঃ

ঢাকা ৭ই এপ্রিল। ন্যাপপ্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অদ্য শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা দাবী বাতিল করিয়া দেন। সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচরবর্গ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে শোষণ চালাইয়া যাইতেছে তার সমাধানের কোন পন্থাই উক্ত কর্মসূচীতে নাই বলিয়া তিনি তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুসারে প্রদেশসমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি তাঁহার পূর্ণ সম্মতি রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাও প্রতিফলিত করিতে হইবে।"

৬-দফা সম্পর্কে ভাসানীর প্রতিক্রিয়া

[দৈনিক আজাদ, ৮ই এপ্রিল, ১৯৬৬]

৬-দফা সম্পর্কে ভাসানীর এই মন্তব্য সত্যি দুঃখজনক। মওলানা ভাসানী সারাজীবন মজলুম মানুষের নেতা হবার চেষ্টা করেছেন। তিনি সারাটি জীবন জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গীত করেছেন। কিন্তু জনগণের সত্যিকার সমস্যা অনুধাবন করতে হ'লে যে মনীষা ও

প্রজ্ঞার প্রয়োজন, আমার মনে হয়, চিরদিন তিনি তা' অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখেও একথা বলা যায় যে, তাঁর 'ভাসানী' নামটি সার্থক হয়েছে। তিনি সারা জীবন শুধু পানির উপরি-ভাগে ভাসমান পদার্থের ন্যায় ভেসেই বেড়িয়েছেন, গভীরে প্রবেশের সামর্থ্য তাঁর হয় নি। সে কারণে চাঞ্চল্য ও বালখিল্য চাপল্যই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। গভীর ভারত্ব ও সংযমী সাধনা তাঁর মধ্যে কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এমনি ভাসমান বলেই, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি বারবার কিছুসংখ্যক তথাকথিত অতি প্রগতিবাদী রাজনীতিবিদদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন। যখনই তিনি এই ব্যবহারের বলয় থেকে বাইরে এসেছেন তখনই তাঁর নিজস্ব স্বরূপ অর্থাৎ আসল মওলানার যে চেহারা সেই চেহারায় তিনি ফিরে এসেছেন। সে কারণেই কখনো তিনি গণতন্ত্রের পূজারী, আবার কখনো আইয়ুবের প্রবর্তিত নীতি স্বৈরতন্ত্রের—কখনো সমাজতন্ত্রের উপাসক, কখনো বা ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা—কখনো বলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই মুক্তির একমাত্র পথ, আবার কখনো বলেন কোরানে আল্লাহ্ যে সমাজতন্ত্র বেঁধে দিয়েছেন তার ওপর আর কিছু হতে পারে না—কখনো ৬-দফার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের গন্ধ পেয়ে সোচ্চার ভাষায় বলবেন যে রোজকেয়ামততক পাকিস্তান তার দুই অংশ নিয়েই বেঁচে থাকবে, তা' ধ্বংস করবার সাধ্য কারো নেই—আবার ১৯৭০-এর নির্বাচনে কোন একটি আসনেও যখন তাঁর দল গণ-সমর্থন লাভ করলো না তখন তিনি বললেন, "মুজিবের ৬-দফা ছাড়ো, এক দফায় নেমে এসো—বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাই।" এই সব পরস্পর বিরোধী উক্তিই তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। আর তাঁর এই বৈপরীত্য মাঝে মাঝে বালকোচিত বলে মনে হতে পারে।

মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেবার প্রয়োজন অনুভব করছি। ১৯৬৩ সালের ৩১শে আগস্ট আমি আমেরিকায় দুই বছর অধ্যয়নের পর দেশে ফিরবার পথে করাচী অবতরণ করি। মনে তখন অপরিসীম আশা—বাংলাদেশকে পরাধীনতার জিঞ্জির থেকে মুক্ত করতে হবে। আমেরিকায় অবস্থান কালে

তরুন বন্ধুদের সাথে এটাই ছিল আমার মূল আলোচনার বিষয়। কিন্তু করাচী নেমেই অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, সেখানকার দৈনিক কাগজে আইয়ুব ও ভাসানীর আলিঙ্গনরত ছবি প্রকাশ পেয়েছে—ভাসানী আইয়ুবের সমগ্র নীতি সমর্থন করেছেন। এমন একটি দৃশ্য ও সংবাদের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাই মুষড়ে পড়লাম। পরদিন ঢাকার পথে রওয়ানা হয়ে বিমানে উঠেই দেখি, মওলানা ভাসানী সেই একই বিমানে ঢাকা ফিরছেন। আমি এক সময় তাঁর পাশে বসে নিজের পরিচয় দিলাম এবং সবিনয়ে বললাম, "হুজুর, আপনার বয়স হয়েছে, বলতে গেলে কবরে এক পা দিয়েই আছেন, এই সময় আপনার নিকট থেকে আমরা আশা করেছিলাম যে, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আপনার হাত দিয়েই আসবে। কিন্তু আপনি কিনা শেষ পর্যন্ত আইয়ুবের নিকট পূর্ব বাংলার স্বার্থকে বিক্রয় করলেন? কাল আপনি যখন মারা যাবেন, বাংলার মানুষ আপনার কবরের দিকে ফিরেও তাকাবে না।"

ভাসানী একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, "দেখো বাপু, তোমাদের রক্ত এখনো গরম তাই বুঝতে পারো না। আইয়ুব খারাপটি কি করেছেন? তাঁর 'ফরেন পলিসিটি' বিচার করে দেখেছো? কেমন চমৎকার ভারসাম্য রক্ষা ক'রে চীনের সাথে তিনি মিতালী করেছেন। পেরেছে তোমাদের সোহরাওয়ার্দী? আমি ঐ সব বাংলা ফাংলা বুঝি না—বর্তমান দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কই হ'ল আসল। আমার কাছে বাংলাদেশ, পশ্চিম পাকিস্তান বা ভারত এসবের কোন মূল্য নাই। পৃথিবীর মজলুম মানুষ সবই এক, তারা যেখানেই বাস করুক। তা' ছাড়া বেশী বাংলা বাংলা করলে পাকিস্তান ভেঙে যাবে। এটা আল্লাহ্‌র দেশ। পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র, এই দেশকে তোমরা ভাঙতে চাও? তা' আমি হতে দেব না।"

এরপর মওলানার সাথে আর বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন বোধ করি নি। বুঝতে পারলাম, ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে এন. ডি. এফ.-এর নেতৃবৃন্দ যখন দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় আইয়ুবের পক্ষে সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে মওলানা ভাসানী চীনের প্রজাতন্ত্র দিবসে যোগদানের জন্য গিয়েছিলেন। ফিরে এসে

বললেন, "চীনে গিয়া আমার গোটা রাজনৈতিক জীবনটাই যেন বদ-লাইয়া গিয়াছে। চীনারা কথা কয় কম, কিন্তু কাজ করে বেশী। কিন্তু আমার দোষ হইতেছে আমি কথা কই বেশী, কাজ করি কম।" সুতরাং চীনা ফেরত মওলানা কথা কম বলে যে কাজ শুরু করলেন তার বেশীর ভাগই নিয়োজিত হ'ল আইয়ুবের স্বার্থে, বাংলার স্বাধিকার অর্জনের স্বপক্ষে নয়।

প্রগতিবাদী চিন্তায় শুধুমাত্র তাঁদের একচেটিয়া অধিকার—এই ধরনের ধারণা যাঁদের হৃদয়ে বদ্ধমূল, তাঁদের কেউ কেউ ভাববেন যে, আমি মওলানা ভাসানী সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছি তার মধ্যে মওলানার প্রতি আমার অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। আমি আবার বলছি, তাঁর বয়সকে, তিনি যে সুদীর্ঘকাল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টিকে আছেন সেই অসাধারণ সামর্থ্যকে, রাজনৈতিক জীবনে তিনি অনেককে যে দীক্ষা দান করেছেন সেই মহানুভবতাকে, চলনে-বলনে আহারে-বিহারে তাঁর নিজস্ব একটি ক্ষমতাকে, অসমসাহসিকতাকে, জনগণের প্রতি তাঁর যে দরদ আছে সেই ঐকান্তি-কতাকে আমি শ্রদ্ধা করি—কিন্তু তাঁর ভাসমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে, অপরের দ্বারা পরিচালিত রিক্ত মনীষাকে, অসার প্রজ্ঞাকে এবং শূন্যগর্ভ সাধনাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারি না। আমার এই অশ্রদ্ধা সম্পূর্ণ-ভাবেই একাডেমিক বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি। তাঁর জীবন থেকে বহু ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমার বক্তব্যকে আমি প্রমাণ করতে পারি। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। শেখ মুজিবের জীবনে মওলানা ভাসানীর কোন প্রভাবই আমরা সন্ধান ক'রে পাই না, যদিও তাঁর প্রাথমিক রাজনৈতিক জীবনে মওলানার সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধাচরণ করেও তিনি মুজিবের কোন লাভ বা ক্ষতি সাধন করতে পারেন নি। সে কারণেই বলছিলাম, ৬-দফা সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর বক্তব্য দুঃখজনক। দুঃখজনক আমাদের জন্য, কেননা তাঁর নিকট থেকে ঠিক এমন প্রত্যাখ্যান আমরা আশা করি নি। দুঃখজনক তাঁর নিজের জন্যেও, কেননা এর ফলে তিনি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রবাহ-পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। যদিও শেখ মুজিবের জন্য ভাসানীর কোন মন্তব্য, কার্যকলাপ বা হুমকি, কোনটিই দুঃখজনক নয়। কেননা

ভাসানীকে একটি শক্তি হিসেবে শেখ মুজিব কোন দিনই বিশেষ পরোয়া করেন নি। কেন করেন নি তার কারণ আমার এতক্ষণ প্রদত্ত মন্তব্যে মিলবে। অধিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন।

যাহোক বাঙালীর মুক্তি সনদ ৬-দফা প্রসঙ্গে ভাসানী সাহেব কি বললেন না বললেন, অথবা আইয়ুব কি ভাবলেন না ভাবলেন ইত্যাদি নিয়ে শেখ মুজিব মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি তাঁর কর্মসূচী নিয়ে বাংলার পথেঘাটে নিরলস ঝটিকা সফর ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

৬-দফার গণসংযোগ ও শেখ মুজিবের উত্তরাঞ্চল সফর

৬-দফা ঘোষণার পর শেখ মুজিব তঁর কয়েকজন সহকর্মীসহ উত্তরাঞ্চল সফর আরম্ভ করেন ৭ই এপ্রিল থেকে। ঐ দিন পাবনায় এক বিরাট জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা করেন। অতঃপর ৮ তারিখে বগুড়ায়, ৯ তারিখে রংপুরে, ১০ তারিখে দিনাজপুরে, ১১ তারিখে রাজশাহীতে, ১৪ তারিখে ফরিদপুরে, ১৫ তারিখে কুষ্ঠিয়ায়, ১৬ তারিখে যশোহরে এবং ১৭ তারিখে খুলনায় তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ভাষণ দান করেন। রাজশাহীতে এলে আমি তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমার গৃহে আমন্ত্রণ জানাই। উদ্দেশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ৬-দফা সম্পর্কে তাঁর একটি ঘরোয়া ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা। আজও সেকথা স্মরণ হতে আমার লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে যে, শেখ মুজিব সেদিন আমার বাড়ীতে যথাসময়ে এসেছিলেন। কিন্তু একজন অধ্যাপক বা বুদ্ধিজীবীও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সাহস সঞ্চয় করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালের গ্রীষ্মে শেখ মুজিব রাজশাহী গেলে সেবারেও একই উদ্দেশ্যে, একইভাবে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমার গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এবারেও তিনি এসেছিলেন কিন্তু অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী অনেককেই অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও উপস্থিত হয়েছিলেন মাত্র তিনজন। দু'বারেই আমার বন্ধুরা বলেছেন যে কারণে আসতে পারেন নি সে হ'ল ভীতি। মোনেম খানের রাজত্বে মুজিবের সাথে আলোচনা ক'রে শেষে চাকুরীটি খোয়াবেন নাকি। এঁদের দু' একজন পরবর্তীকালে শেখ মুজিবের অনুগ্রহে প্রচুর তরক্‌কী করেছেন।

দিনে দিনে ৬-দফার দাবীর আন্দোলন এমন জোরদার হয়ে উঠল যে, আইয়ুব খান বেসামাল হয়ে দমননীতির প্রয়োগ শুরু ক'রে দিলেন। প্রথমেই শেখ মুজিবকে জেল-জুলুমের ভয় দেখাতে লাগলেন।

শেখ মুজিব তাচ্ছিল্যভরে তাঁদের সে স্পর্ধার জবাব দিয়ে বললেন, "ওরা এতই অর্বাচীন যে আমাকে জেলের ভয় দেখায়। ওদের আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, অতীতে আমি জেল খেটেছি, মামলার আসামী হয়েছি। এবারেও জেল খাটতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য পাওনা বা দাবীর ব্যাপারে কোন আপোষ করতে মুজিবুর রহমান জানে না। কারো অস্ত্রের ভাষার জবাব যদি দিতে হয় তবে তা' জনগণই দেবে—জনগণ অস্ত্রের ভাষার যথার্থ জবাব জানে।"

শেখ মুজিবের হয়রানী

এবার শেখ মুজিবের আপোষহীন যাত্রা শুরু হ'ল। জীবনে কোন বিপদ-বিপত্তিকেই তিনি পরোয়া করেন নি। এবারেও তাই হ'ল। বিপদ ঘনীভূত হয়ে এল। প্রত্যেক জেলায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি ক'রে শেখ মুজিবকে প্রত্যেক জেলা থেকে জারীকৃত ওয়ারেন্ট বলে গ্রেফতার করা হ'ল।

১৭ই এপ্রিল রাত্রি ৪টায় খুলনায় একটি জনসভায় ভাষণ দান করার পর ঢাকা ফেরার পথে যশোরে তাঁকে ঢাকার রমনা থানা থেকে জারীকৃত ওয়ারেন্ট অনুযায়ী পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৪৭(৫) ধারা বলে পুলিশ গ্রেফতার করে। যশোরে সদর দক্ষিণ মহকুমা হাকিমের এজলাস হতে তিনি জামিনে মুক্তিলাভ ক'রে সদলবলে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

যশোরের মহকুমা হাকিমের নির্দেশক্রমে শেখ মুজিব ২১শে এপ্রিল ('৬৬) ঢাকার দক্ষিণ মহকুমা হাকিমের আদালতে স্বইচ্ছায় উপস্থিত হ'লে আদালত তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ ক'রে দেন। পরে ঢাকার সেশন জজের নিকট জামিনের আবেদন করা হ'লে তিনি উক্ত আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন।

কিন্তু সেদিনই রাত ৯টায় সিলেট এস. ডি. ও. আদালতের এক পরোয়ানা বলে ঢাকার জনৈক অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বাধীনে একটি পুলিশ পার্টি তাঁর ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেফতার

ক'রে ঢাকার মহকুমা হাকিমের (দক্ষিণ) বাসভবনে হাজির করলে হাকিমের নির্দেশ অনুসারে তাঁকে পুলিশ প্রহরাধীনে সিলেট প্রেরণ করা হয়। তাঁর অনুরাগী বন্ধু আবদুল মোমেন তাঁর সঙ্গে গমন করেন। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে. ১৪ই মার্চে ('৬৬) সিলেটের বিখ্যাত ময়দানে তিনি রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতা দান করেন।

পরদিন সিলেট মহকুমা হাকিমের এজলাসে তিনি জামিনের আবেদন করলে তা' নাকচ ক'রে দিয়ে হাকিম তাঁকে জেল-হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন। ২৩শে এপ্রিল শনিবার সিলেটের জেলা দায়রা জজ তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জামিন মঞ্জুর করলেন। কিন্তু তবুও পুলিশের হাত থেকে তাঁর আর নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয় নি। সেদিনই সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিংহ থেকে পাঠানো এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে পুলিশ সিলেটের কারাগার থেকেই পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার ক'রে বেলা দু'টোর দিকে এক নাটকীয় পরিবেশে জেলগেটে সমবেত জনতার প্রবল বিক্ষোভ ধ্বনির মধ্যে তাঁকে সরাসরি স্টেশনে নিয়ে যায় এবং সেশন জজের আদালতে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন পেশের প্রস্তুতির পূর্বেই পুলিশ তাকে নিয়ে আখাউড়াগামী ট্রেনযোগে ময়মনসিংহের পথে পাড়ি দেয়। ট্রেনটি যদিও লোকাল ট্রেন ছিল, কিন্তু জনগণের মধ্যে খবর রটে যাওয়ায় স্টেশনে স্টেশনে অসংখ্য মানুষের সমাগম দেখে ট্রেনটি প্রায় কোন স্টেশনেই থামে না।

২৪শে এপ্রিল শেখ মুজিবকে ময়মনসিংহ সদর মহকুমা হাকিমের বাসভবনে হাজির করা হয়। বিজ্ঞ এস. ডি. ও. সাহেব যথারীতি তাঁর আবেদন বাতিল ক'রে দেন। কিন্তু পরদিন অর্থাৎ ২৫শে এপ্রিল সোমবার ময়মনসিংহের জেলা ও দায়রা জজ জনাব গোলাম মওলা তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। জামিনে মুক্তিলাভের পর জেল থেকে শেখ সাহেব বেরিয়ে এলে সেখানে উপস্থিত বিরাট জনতা তাঁকে বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

এর আগের দিন অর্থাৎ ২৪শে এপ্রিল ('৬৬) আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টনে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসনের জন্য নির্ণীত চেয়ারটি শূন্য রেখে সভার কাজ পরিচালনা করা হয়েছিল। এই

সভায় সর্বজনাব শাহ আজিজুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য আমরণ সংগ্রাম ক'রে যাবার কথা ঘোষণা করেন। সভায় নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবকে এভাবে হয়রানী ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু সরকার এসব কথায় কর্ণপাত করলেন না। শেখ সাহেবকে হয়রানী ও নির্যাতন থেকে রেহাই দেয়ার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

২৫শে এপ্রিল মুক্তি পাবার পর ৭ই মে পর্যন্ত শেখ মুজিব জেলের বাইরে ছিলেন। অতঃপর ১৯৬৬ সালের ৮ই মে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় মে দিবস স্মরণে শ্রমিক ও জনতার এক বিরাট সমাবেশে ভাষণ-দান শেষে শেখ মুজিব রাত ১টার সময় যখন বাসায় ফেরেন তখন পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২ (১) ক ধারার বিধানবলে তাঁকে এবং তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন সর্বজনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জহুর আহমদ চৌধুরী, মুজিবুর রহমান (রাজশাহী) ও চট্টগ্রামের এম. এ. আজিজ। সেই রাতেই তাঁদের সবাইকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

শেখ মুজিবের ওপর চূড়ান্ত নির্যাতনের পালা শুরু হ'ল। আইয়ুব ও মোনেম দু'জন মিলে এই দেশবরেণ্য নেতাকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করলেন।

সাথে সাথে ছাত্র-জনতার মধ্যেও শুরু হ'ল সংগ্রামী প্রস্তুতির পালা। এবার শোষক ও শোষিতের মুখোমুখি হবার পালা। ইতিহাস তার অমোঘ নিয়মে জনগণের গলায় জয়মাল্য পরিয়েছে।

৮ই মে'র ঘটনা সম্পর্কে নারায়ণগঞ্জের তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মোস্তফা সারোয়ার ১৯৭৩ সালের ৭ই জুন 'দৈনিক বাংলা'য় 'বিক্ষুব্ধ ৭ই জুন' শীর্ষক একটি নিবন্ধে যে স্মৃতিচারণ ক'রেছেন তার থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি ঃ

"১৯৬৬ সালের ৮ই মে। আমি তখন নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সৌভাগ্যবান সভাপতি। সেইদিন নারায়ণগঞ্জের এক ঐতিহাসিক জনসভা

হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম। মিছিলের পর মিছিল। জঙ্গী মিছিল। মিছিল আসছিল কলকারখানা থেকে। মিছিল আসছিল আদমজী জুটমিল থেকে। মিছিল আসছিল আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মহল্লা-শাখা-প্রশাখা থেকে। মিছিল আসছিল ছাত্র-জনতার মাঝ থেকে। ওরা আসছিল মিলিটারীর দাপটওয়ালা প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর শুনতে। এসেছিল বাঙালীদের ভাগ্য ৬-দফার সমর্থনে। এই সভাতেই সর্বপ্রথম ৬-দফার ৬টি চিহ্নসহ শেখ মুজিবকে ৬-দফার প্রতীক স্বর্ণপদক উপহার দেওয়া হ'ল। ৬-দফার জন্য ৬টি শান্তির পায়রা আকাশে উড়িয়ে শুরু হ'ল সভা। রাত ৮টা পর্যন্ত অবিরত করতালি আর জঙ্গী শ্লোগানের মাঝখানে বক্তৃতা করলেন শেখ মুজিব। আর চ্যালেঞ্জ করলেন আইয়ুব-মোনেম খানকে।

বক্তৃতার শেষে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের গগনবিদারী ধ্বনি, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠলো শেখ মুজিবের ডাকে। হাত উঠিয়ে শপথ নিলেন তাঁরা। প্রতিজ্ঞা করলেন শেখ মুজিবের অবর্তমানে ৬-দফার সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দেবেন।

সেই বজ্রধ্বনিতে নারায়ণগঞ্জের ছোট্ট শহর প্রকম্পিত হয়ে উঠল। অন্য-দিকে প্রকম্পিত হ'ল মোনেম খানসহ প্রশাসনযন্ত্রের কিছু আমলার বুক। সভার শেষে বের হ'ল প্রায় দশ সহস্রাধিক জঙ্গী কর্মীর মশাল শোভাযাত্রা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, যশোরের জনাব মশিউর রহমান (স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় যাবার পথে আমার নবনির্মিত বাসভবনে একটু বসলেন কর্মীদের নিয়ে। বঙ্গবন্ধুই আমার নতুন বাড়ীর নাম রাখলেন 'বাংলা ভবন'।

কর্মীদের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত থাকার সময় বঙ্গবন্ধু হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, 'একটু দেখে আয় তো, তোর বাড়ীর আশেপাশে গোপনে কয়টা জীপ ফলো করছে?' একটু হেসে গর্বিতভাবে বললেন, 'সব সময় তো একটা থাকেই। তবে এখন কয়টা আছে, দেখ গিয়ে।'

বঙ্গবন্ধুর কথামতো গিয়ে দেখলাম রাস্তার অদূরে একটা জীপ, একটা ভ্যান তারপর আর একটা জীপ। সম্ভবতঃ ওয়্যারলেস ফিট করা ছিল।

প্রমাণিত হ'ল, বঙ্গবন্ধুর অনুমান সঠিক। বঙ্গবন্ধু শুনে নিশ্চিত মনে বললেন, আজকের রাতটা পার হতে পারলে নারায়ণগঞ্জের মত আরও দু'চারটা জনসভা করতে পারবো। তারপর ধরে নিয়ে যায় যাক।

বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, সেদিনের জনসভার ভাষা ছিল অস্ত্রের ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মোনেম খানকে বহুবার তিনি প্রত্যক্ষভাবে গুণ্ডা বলে আখ্যায়িত করেছেন। মোনেম খানের ভাষাতেই প্রতিউত্তর ছিল 'যে কথা বলার শক্তি কারো বাবার নেই, তা' শেখ মুজিব বলেছেন।'

সেইদিন রাতেই বঙ্গবন্ধু আমার বাড়ী থেকে যাবার কয়েক ঘন্টা পরই গ্রেফতার হলেন। গ্রেফতার হলেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, চট্টগ্রামের এম. এ. আজিজ (মরহুম), জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। পরে পাবনার জনাব মনসুর আলী, মরহুম বগা মিয়া, ময়মনসিংহের রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া, রাজশাহীর জনাব মজিবুর রহমান গ্রেফতার হলেন কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হ'ল।"

নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার ক'রে কারাগারে আটকের সংবাদে পরদিন রাজধানী ঢাকার সর্বমহলে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সেদিনই অর্থাৎ ৯ই মে, ১৯৬৬ জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা জনাব নুরুল আমীন এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে গৃহীত এই ব্যবস্থাকে 'চিন্তা ও বাক-স্বাধীনতার উপর নয়া হামলা' বলে অভিহিত ক'রে বলেন যে, যুদ্ধোত্তর কালেও দেশরক্ষা আইনবলে বিনা বিচারে নেতৃবৃন্দের এই আটক কেবল অসংগতই নয়, নীতিবিগর্হিতও।

জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের সহকারী নেতা শাহ আজিজুর রহমান এই গ্রেফতারকে 'অযাচিত জবরদস্তিমূলক' বলে অভিহিত ক'রে বলেন যে, ধৃত নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের সার্বজনীন দাবীই ধ্বনিত হচ্ছিল।

'নেজামে ইসলাম' নেতা জনাব ফরিদ আহমদ এক বিবৃতিতে এই আটককে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেন।

১০ই মে দৈনিক ইত্তেফাকের মুসাফির তাঁর 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে লিখলেন ঃ

"৬-দফার যে বিপুল জনসমর্থন রহিয়াছে, সেই প্রশ্ন এখানে না তুলিয়াও বলা চলে যে, নির্যাতনের পথে কোন সমস্যার সমাধান হয় না, বরং সমস্যা জটিল হয়। যাঁরা রাজনৈতিক কারণে বিশেষতঃ জনগণের দাবী-দাওয়া তুলিতে গিয়া নির্যাতিত, নিগৃহীত হইতেছেন তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রহিল। জাতির জন্য কোন ত্যাগই বৃথা যায় না. ইহাই আজিকার সান্ত্বনা ও প্রেরণা।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই মে, ১৯৬৬]

শেখ মুজিবসহ তাঁর সহকর্মীদের মুক্তির দাবীতে সেদিন ঢাকা শহরে ও শ্রমিক এলাকায় চরম বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়।

১৩ই মে দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে 'প্রতিবাদ দিবস' পালিত হয়। এইদিন প্রদেশের দিকে দিকে বিক্ষুব্ধ মানুষের ক্রুদ্ধ গর্জনে সারাদেশ মুখরিত হয়। হাজার হাজার শ্রমিক তাঁদের কলকারখানার কাজে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করে এবং পল্টনে অনুষ্ঠিত জনসভায় উপস্থিত হ'য়ে সরকারের দমন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে।

হরতাল

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ গ্রেফতার হ'লে চাঁদপুরের জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী তাঁর দায়িত্ব অস্থায়ীভাবে গ্রহণ করেন। ২০ মে ('৬৬), দলের ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক আহ্বান ক'রে আগামী ৭ই জুন সারা প্রদেশব্যাপী এক সর্বাত্মক হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এই উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ যে প্রচারপত্র ছাপিয়েছিলেন সরকারের নির্দেশে পুলিশ মুদ্রণ প্রেস থেকে তার তিন হাজার কপি আটক করে এবং দেয়ালে পোস্টার লাগানোর সময় কতিপয় আওয়ামী লীগ কর্মীকেও গ্রেফতার করা হয়। দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এই আটকের তীব্র নিন্দা করেন।

শুধু তাই নয়, এই হরতাল যাতে সার্থক না হয় তার জন্য প্রাদেশিক গভর্নর মোনেম খান জুনের ৩ তারিখে কঠোর হুঁশিয়ারী বাক্য উচ্চারণ ক'রে ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে, 'অশুভ প্রচেষ্টার মোকাবিলার জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছেন।'

এর আগের দিন অর্থাৎ ২রা জুন তারিখে এই প্রস্তুতির প্রমাণ তিনি কিছুটা দেখিয়েছেন। তাঁর নির্দেশক্রমে পুলিশ আওয়ামী লীগের ৮ জন নেতাকে দেশরক্ষা আইনে এবং ১ জনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারাবলে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার-কৃত নেতৃবৃন্দ হলেন ঃ

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার

দেশরক্ষা আইনে ঃ

(১) প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রচার সচিব—
জনাব আবদুল মোমেন (এডভোকেট)

(২) সমাজ সেবা সম্পাদক—
জনাব ওবায়দুর রহমান

(৩) সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি—
জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মুসা

(৪) সিটি আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি—
জনাব শাহাবুদ্দিন চৌধুরী

(৫) রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি—
জনাব হারুন-অর-রশিদ

(৬) ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সহ-সম্পাদক ও মৌলিক গণতন্ত্রী—
জনাব রাশেদ মোশাররফ

(৭) পত্রিকা হকার— জনাব জাকির হোসেন

(৮) নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি—
জনাব মোস্তফা সারোয়ার

এছাড়া ফৌজদারী কার্যবিধির বলে জনাব আবু তাহেরকে গ্রেফতার করা হয়।

পরদিন গভর্নরের হুঁশিয়ারীর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শামসুল হককেও গ্রেফতার করে।

নির্বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ৪ঠা জুন সরকারকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে বললেন ঃ "জেল-জুলুম আর নির্যাতন চালিয়ে এ আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না।"

জুনের ৬ তারিখে প্রাদেশিক পরিষদে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে যায়। গভর্নর মোনেম খানের প্রতি বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যারা চরম অবমাননা প্রদর্শন করেন। পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু হ'লে গভর্নর যখন বক্তৃতা দিতে থাকেন তখন উপরোক্ত সদস্য-বৃন্দ প্রদেশব্যাপী বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ওপর বেপরোয়া নির্যাতন এবং গ্রেফতারের প্রতিবাদে পরিষদ কক্ষে অনুপস্থিত থাকেন। বিরোধী দলীয় নেতা আওয়ামী লীগের জনাব আবদুল মালেক উকিল এবং স্বতন্ত্র দলের নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খান একটি যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, "গণজীবনের পুঞ্জীভূত ফরিয়াদের অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্যই তাঁরা গভর্নরের ভাষণ বর্জন করেছেন।"

যাহোক, ইতিমধ্যে ২২শে মে খাদ্যের দাবীতে সারা পূর্ব বাংলায় 'খাদ্য দাবী দিবস' পালিত হয়। সে সময় প্রদেশে খাদ্য সমস্যা যে তীব্র রূপ ধারণ করেছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'জনতা' পত্রিকার মন্তব্য থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। "দেশময় আজ হা-অন্ন হা-অন্ন রব উঠিয়াছে, আজ হাহাকার উঠিয়াছে পূর্ব বাংলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের ঘরে ঘরে।"

শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'লে সারা পূর্ব বাংলায় অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। দেশে এমনিতেই খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। বেকার সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা ও শিক্ষা সমস্যা ইত্যাদি মানুষকে অহরহ পীড়া দিচ্ছিল। এ ঘটনার সাথে যুক্ত হ'ল নেতৃবৃন্দের ওপর, বিশেষ ক'রে জনগণের প্রাণের নেতা শেখ মুজিবের ওপর এই অত্যাচার। সুতরাং সারা পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ ঘনীভূত হতে থাকে। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ থেকে যখন ৭ই জুন হরতাল পালনের আহ্বান জানান হ'ল, তা' জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমন্ত্রণ জানাল।

বিক্ষুব্ধ ৭ই জুন

সরকারের শত প্রকার নির্যাতনমূলক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ৭ই জুন সারা প্রদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হ'ল। ঐদিন কলকারখানা, গাড়ীর চাকা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব বাংলায় নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ ভাবে স্তব্ধ হয়ে

পড়ে। সরকার এর জন্য প্রস্তুত ছিল। সমস্ত বর্বরশক্তি নিয়ে সরকারী শক্তি নিরস্ত্র লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ধর্মঘটী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলী বর্ষণ করে। এর ফলে মনু মিয়া, মজিবুল হক প্রমুখ শ্রমিক-জনতাসহ এগার জন শহীদ হন এবং আটশ' লোককে গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিব তখন সেন্ট্রাল জেলে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন। পরদিন দৈনিক পত্রিকাসমূহে এই হরতালের রিপোর্ট বিশদভাবে পড়বেন বলে জনগণ উৎসুক ছিলেন। কিন্তু না, সরকার যথাসময়েই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেছেন। পত্রিকার পাতা খুলতেই দেখা গেল প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বেড় হরফে লেখা সরকারী প্রেসনোট। তবে অনিবার্য কারণবশতঃ পত্রিকাগুলোতে যে স্টাফ রিপোর্টারদের হরতাল সংক্রান্ত বিবরণ ছাপানো সম্ভব হ'ল না, একথা সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত ক'রে পাঠকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল। এই অনিবার্য কারণটা যে কি তা' মূর্খেরও বুঝতে কষ্ট হয় নি।

সরকারী প্রেসনোটে অবশ্য দশ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সাফাইও গাওয়া হয়েছে যে, এতে পুলিশের কোন দোষ নেই। ৮ই জুন ('৬৬) প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক থেকে এই সরকারী প্রেসনোটটির হুবহু অনুলিপি উদ্ধার করা যাচ্ছে ঃ

সরকারী প্রেসনোট

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জেও পুলিশের গুলীতে ১০ জন নিহত (সরকারী প্রসনোট)। "ঢাকা, ৭ই জুন—আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত হরতাল ৭-৬-৬৬ তারিখে অতি প্রত্যুষ হইতে পথচারী ও যানবাহনের ব্যাপক বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন এলাকায় ছোকরা ও গুণ্ডাদের লেলাইয়া দেওয়া হয়। ই. পি. আর. টি. সি. বাসগুলিতে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয় এবং টায়ারের পাম্প ছাড়িয়া দিয়া সর্বপ্রকার যান-বাহনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হয়। নিরীহ জনসাধারণ ও অফিস যাত্রীদের অপমান ও হয়রান করা হয়। হাইকোর্টের সম্মুখে তিনটি গাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ কার্জন হল, বাহাদুর শাহ পার্ক ও কাওরান বাজারের নিকট গুণ্ডাদের বাধা দান করে এবং টিয়ার

গ্যাস ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। তেজগাঁওয়ে ২-ডাউন চট্টগ্রাম মেইল তেজগাঁও রেলস্টেশনের আউটার সিগন্যালে আটক করিয়া লাইনচ্যুত করা হয়। ট্রেনখানা প্রহরাদানের জন্য একদল পুলিশ দ্রুত তথায় গমন করে। জনতা তাহাদের ঘিরিয়া ফেলে এবং তুমুল-ভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে বহু পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। যখন পুলিশ জনতার কবলে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন আত্ম-রক্ষার জন্য তাহারা গুলী বর্ষণ করে। ফলে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

পূর্বাহ্নে ১০ ঘটিকায় প্রায় ৩০০ উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক তেওগাঁওস্থ ল্যাণ্ড রেকর্ড ও সার্ভে ডিরেক্টরেট অফিস আক্রান্ত হয়। জনতা তুমুল-ভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে অফিসের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। জনতা অতঃপর সেটেলমেন্ট প্রেসের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রিন্টিং মেশিনসমূহের দারুণ ক্ষতি সাধন করে। আক্রমণের সময় প্রেসের তিনজন কর্মচারী আহত হয়।

নারায়ণগঞ্জে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় গলাচিপা রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট ঢাকাগামী ট্রেন আটক করে। পরে জনতা নারায়ণগঞ্জগামী ৩৪ নং ডাউন ট্রেন আটকাইয়া উহার বিপুল ক্ষতি সাধন ও ড্রাইভারকে প্রহার করে। জনতা জোর করিয়া যাত্রীদের নামাইয়া দেয়। যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য আগত একটি পুলিশ দল আক্রান্ত এবং বহু সংখ্যক পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। পুলিশ দল লাঠিচার্জের সাহায্যে জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অতঃপর বন্দুকসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক জনতা নারায়ণগঞ্জ থানা আক্রমণ করিয়া দারুণ ক্ষতি সাধন এবং বন্দুকের গুলীতে পুলিশ অফিসারদের জখম করে। উচ্ছৃঙ্খল জনতা থানা-ভবনে প্রবেশ করার পর পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলীবর্ষণ করার ফলে ছয় ব্যক্তি নিহত ও আরো ১৩ ব্যক্তি আহত হয়। ৪৫ জন পুলিশ আহত হন এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।

পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব এম. এ. জাবেদের মোটর গাড়ী ভস্মীভূত ও তাঁহার বাড়ী লুণ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জ ও চাষাড়ার মধ্যে রেলওয়ে সিগন্যালিং লাইন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়।

টঙ্গীতে বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে এবং একটি মিছিল বাহির করে। কাওরান বাজারের এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা একজন সার্জেন্টকে প্রহার ও তাহার স্কুটারের ক্ষতি সাধন করে এবং রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট একটি মালবাহী ট্রেন থামাইয়া দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের এক শ্রেণীর ছাত্র পিকেটিং করে এবং সেখানে আংশিক ধর্মঘট পালিত হয়।

ঢাকা হলও বাহিরের লোকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিশ ও ই. পি. আর. দ্রুত ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে।

দুপুরে আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ডেমরা এলাকার শ্রমিকগণ ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ঢাকা নগরীর দুই মাইল দূরে ই. পি. আর. বাহিনী একটি শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। অপরাহ্নে এক জনতা গেণ্ডারিয়ার নিকট একখানি ট্রেন আটক করে। চট্টগ্রামগামী গ্রীন এ্যারো ও ঢাকা অভিমুখে ৩৩-আপ ট্রেনখানিকে অপরাহ্নের দিকে তেজগাঁও স্টেশনে আটক করা হয়। যা হউক, ট্রেন যোগাযোগ অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় চালু করা হয়। সন্ধ্যার পর একটি উচ্ছৃঙ্খল জনতা কালেক্টরেট ও পরে স্টেট ব্যাঙ্ক আক্রমণ করে। রক্ষিগণ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলী বর্ষণ করে। বেলা ১১টায় ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। শহরের অন্যান্য স্থানে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই জুন, ১৯৬৬]

প্রেস রিপোর্টটিতে সরকার চমৎকার সাফাই গেয়েছেন। পত্র-পত্রিকার কণ্ঠরোধ ক'রে সরকার বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরেই পুলিশকে পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য গুলীবর্ষণ করতে হয়েছে আর তার ফলেই কয়েকজন 'গুণ্ডাকে' (সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী হরতালে অংশ গ্রহণকারীরা ছিল গুণ্ডা) মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। সেদিন ১০ জন নিহত হলেও পরের দিন আহতদের একজন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে।

সেই দিনই অর্থাৎ জুনের ৮ তারিখে রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদে এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ সমর্থক সদস্যগণ পুলিশের এই গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে পরিষদ অধিবেশন বর্জন করেন। প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলের নেতা আওয়ামী লীগের আবদুল মালেক উকিল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গুলী বর্ষণের প্রতিবাদ ক'রে বলে ওঠেন : 'আইয়ুবশাহীর নির্যাতন কঙ্গোর বর্বরতা-কেও হার মানিয়েছে।" কিন্তু এতে সরকারের বা সরকার সমর্থক পরিষদ সদস্যদের কোন মানসিক পরিবর্তন ঘটে নি।

১১ই জুন ('৬৬) জাতীয় পরিষদে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ শোয়েব ১৯৬৬-৬৭ সালের আথিক বছরের বাজেট পেশ করেন। এতে ৩৬.৫৬ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয় এবং নতুন নতুন করধার্যের মাধ্যমে সে ঘাটতি পূরণের প্রস্তাব দেয়া হয়। এর কয়েক দিন পর ১৭ই জুন-এ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী জনাব এম. এন. হুদা এ ব্যাপারে আরো একডিগ্রী উপরে ওঠেন। অর্থনৈতিক সংকট, খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে নিক্ষিপ্ত পূর্ব বাংলার কর ভারাক্রান্ত স্কন্ধের উপর ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার ৬টি নয়া কর ধার্যের প্রস্তাব করেন। ডক্টর হুদা সেদিন প্রাদেশিক পরিষদে ১৯৬৬-'৬৭ সালের বেসামরিক উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করেন। এই নয়া করের শতকরা ৬১ ভাগ সেচের পানি ব্যবহারকারী দরিদ্র চাষীদের নিকট থেকে আদায় করার প্রস্তাব করা হয়।

সংবাদ জগতের নির্ভীক সৈনিক পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সোচ্চার কণ্ঠ ইত্তেফাকের সবচেয়ে জনপ্রিয় অঙ্গ 'রাজনৈতিক মঞ্চের' লেখক মুসাফির জনাব তোফাজ্জল হোসেনের কণ্ঠকে স্তব্ধ ক'রে দেয়ার উদ্দেশ্যে আইয়ুব-মোনেম চক্রের নির্দেশে পুলিশ পাকিস্তান দেশরক্ষা বিধির ৩২ (১) 'খ' ধারা অনুযায়ী ১৬ই জুন (১৯৬৬) তাঁর ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন থেকে জনাব তোফাজ্জল হোসেনকে গ্রেফতার করে। সেদিন ইত্তেফাক অফিসের নিকট থেকে পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের জনাব এ. কে. এম. রফিকুল হোসেনকেও

তোফাজ্জল হোসেনের গ্রেফতার

গ্রেফতার করা হয়। শুধু তাই নয় ঐ একই দিনে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর একটি আদেশ মারফৎ পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৫২ নম্বর ধারার ২ নম্বর উপধারা মোতাবেক দৈনিক ইত্তেফাকের প্রেস ১নং রামকৃষ্ণমিশন রোডস্থ 'নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস' বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন।

ইত্তেফাক প্রকাশনা বন্ধ

এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ই জুন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যগণ একটি মুলতবী প্রস্তাব এবং একটি অধিকার প্রস্তাব আনয়ন করলে স্পীকার তা' বাতিল করে দেন। ফলে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যগণ স্বল্পকালের জন্য ওয়াক আউট করেন।

সেদিনই পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের কলঙ্কিত নায়ক আইয়ুবের বিশ্বস্ত গুণধর পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোকে মন্ত্রী পরিষদ থেকে বিদায় নিতে হয়। তাঁর পদত্যাগ সম্পর্কে ক্রমাগত কয়েকদিন ধরে জোর গুজব চলছিল। অবশেষে চিকিৎসার জন্য ছুটির অজুহাতে তাঁকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়।

ভুট্টোর পতন

কিন্তু মন্ত্রী পরিষদ থেকে ভুট্টো সাহেব বিতাড়িত হলেও রাজনৈতিক জীবন থেকে তিনি সরে দাঁড়ান নি। আইয়ুবের বিতাড়ন তাঁর পক্ষে শাপে বর হয়ে দেখা দিল। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর পরবর্তী ভূমিকা যথাসময়ে তুলে ধরা যাবে।

৭ই জুনের হরতাল পালনকারী নিরীহ জনতার ওপর পুলিশ নির্বিচারে গুলী বর্ষণ ক'রে হত্যাযজ্ঞ চালানো সত্ত্বেও সরকারের দমননীতির স্পৃহা এতটুকুও শিথিল হয় নি। জুন মাসের ২২ তারিখে পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমানকে তাঁর চাঁদপুরস্থ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার আগে শেখ ফজলুল হক মনি, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোল্লা জালালউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রনেতা শেখ শহীদুল ইসলামকেও আটক করা হয়।

মীজানুর রহমানের গ্রেফতারকে কেন্দ্র ক'রে ২৮শে জুন জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের সদস্যগণ দু'বার ওয়াক আউট করেন। সেদিন

বিরোধী দলের সদস্য জনাব মাহমুদ আলী পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে স্পীকারের নিকট জানতে চান যে, জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম. এন. এ'র গ্রেফতারের বৈধতা সম্পর্কে তিনি যে নোটিশ দান করে-ছিলেন তার কি হয়েছে? স্পীকার জনাব অবদুল জব্বার খান তা' নাকচ ক'রে দেয়া হয়েছে বলে জানালে জনাব মাহমুদ আলী চীৎকার করতে থাকেন এবং স্পীকার নির্দেশ দান করলেও স্তব্ধ হতে অস্বীকার করেন। অতঃপর স্পীকার তাঁর উপর রুলিং জারী করলে নূরুল আমীনের নেতৃত্বে বিরোধী দলের সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন। ইতিমধ্যে মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র মধ্যে কোন্দল দেখা দেয়ায় পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। মওলানা সাহেব নিজে আইয়ুব খানের গুণগ্রাহী। আইয়ুবের বদৌলতে তাঁর চীন সফরের সৌভাগ্য হয়েছিল—চীনে গিয়ে তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে বলে তাঁর ও তাঁর ভক্তদের ধারণা।

অতএব চীনের সমাজতান্ত্রিক নীতিই তাঁর আদর্শ হয়ে দাঁড়ালো। অপর দল মস্কোপন্থী—তাঁরা রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নীতির অনুসারী। চীন-রাশিয়ার মধ্যে এই সময় বিরোধ বেশ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। সেজন্য দুই দেশের অনুসারীদের মধ্যেও বিরোধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ালো। ওয়ালীর নেতৃত্বে মস্কোপন্থীরা সরে দাঁড়ালেন—তাঁরা বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হলেন। ওয়ালীপন্থী পূর্ব পাকিস্তানের ন্যাপ শাখা ৬-দফার প্রতি তাঁদের সমর্থন রাখলেন।

ন্যাপের ভাঙ্গন

ভাসানী যে ৬-দফার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তা' আগেই বলা হয়েছে। দল বিভক্ত হওয়ার পর তিনি ও তাঁর অনুসারীরা আইয়ুবের সমর্থনে সেই একই ভূমিকা পালন ক'রে যেতে লাগলেন। ৭ই জুনে এই যে হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ল—আওয়ামী লীগের ওপর দিয়ে গ্রেফতার ও নির্যাতনের ঝড় বয়ে গেল—ভাসানী সাহেবরা এর বিরুদ্ধে এত-টুকুও প্রতিবাদ জানালেন না। উপরন্তু তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন যে, যদি ন্যাপ (ভাসানী) ক্ষমতায় থাকতেন, তাহলে তাঁরাও ৬-দফা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের মতই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

৭ই জুন ('৬৬) আন্দোলনের পর সরকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আওয়ামী লীগ অনেকদিন প্রায় নেতৃত্বহীন অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। এর কারণ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় সবাইকেই কারারুদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মীজানুর রহমানের গ্রেফতারের পর পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে কোনমতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু সরকার গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরার জন্য যত রকম ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব তার সবগুলোই প্রয়োগ করতে থাকেন।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে যাঁরা পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, নির্বাচনের পর এঁদের কেউ কেউ আওয়ামী লীগের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন এবং আওয়ামী লীগও নিজের মনে ক'রে তাঁদেরকে গ্রহণ করেছিল—আবার আওয়ামী লীগের বাইরে স্বতন্ত্র দলেও অনেকে ছিলেন—কিন্তু যেভাবেই থাকুন, স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে এঁদের কিছু কিছু ব্যক্তির ভূমিকা প্রশংসাজনক ছিল না। সরকারী সমর্থকদের ভূমিকা যে ঘৃণিত ছিল, সেকথা উল্লেখের প্রয়োজন করে না। কিন্তু অপ্রিয় হ'লেও একথা সত্য যে, অনেকেই আছেন, যাঁরা রাজনীতিবিদ-সমাজে আজকে মর্যাদাসম্পন্ন আসনে বিরাজমান, সেদিন আওয়ামী লীগের বিপদের দিনে যে সাহস, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও আন্তরিকতা দেশের জনগণ তাঁদের নিকট থেকে আশা করে-ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ সেই আশা যথাযথভাবে পূরণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। শেখ মুজিব ও তাঁর বিশিষ্ট অনুসারীবৃন্দ যখন কারাগারে, তখন স্বতন্ত্র সদস্যদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু আওয়ামী লীগ সমর্থক সদস্যদের কারো কারো আচরণ ছিল দুই নৌকায় পা রাখার আচরণ। তবে পরবর্তী কালে এঁরা দুগ্ধের মাখনের ভাগ ঠিকই ভোগ করেছেন।

শুধু মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় নির্বাচিত মুষ্টিমেয় আওয়ামী লীগের পরিষদ সদস্যদের কারো কারো সম্পর্কেই যে এই কথা প্রযোজ্য ছিল তা' নয়—রাজনীতিবিদদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও কেউ কেউ এই সময় জেল-জুলুমের ভয়ে যথার্থ সাহস প্রদর্শনে এবং নির্ভীক ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য গণ-আন্দোলন

যখন জোরালো হতে থেকেছে এবং ছাত্র-জনতা যখন সামনের কাতারে নেমে এসেছে, তখন এঁরা দুর্বলতার বলয় থেকে বেরিয়ে এসে সোচ্চার হবার চেষ্টা করেছেন। শেখ মুজিবকে কারাগার থেকে জনগণ যখন ছিনিয়ে নিয়ে আসলো, তখন এঁরা আরো সোচ্চার, আরো দুর্বার হয়ে অতীতের দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। শেখ মুজিব তাঁর সহকর্মীদেরসহ যখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন তারপর থেকে, একজন শিক্ষাবিদ হয়েও, বাংলাদেশের স্বার্থে আমি সমগ্র উত্তরাঞ্চলে ছাত্র-জনতার মধ্যে ৬-দফা আন্দোলনকে জোরালো করবার জন্য নিরলস প্রয়াসে লিপ্ত ছিলাম। আত্ম-প্রশংসা আমার উদ্দেশ্য নয়—কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরেই এখানে নিজের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে হচ্ছে। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও অধ্যক্ষ—কলা অনুষদের ডীন-এর দায়িত্ব থেকে সবে মুক্ত হয়েছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি যে সে সময় অনেক নেতার সাহায্য প্রার্থনা করেও আমি ব্যর্থ হয়েছি। ৬-দফা আন্দোলনকে মনেপ্রাণে সমর্থন করলেও প্রকাশ্য আন্দোলনে নামতে তাঁদের কারো কারো দ্বিধা ও সংকোচের অন্ত ছিল না। ১৯৬৭ সালের ১লা জুলাই তারিখ থেকে আমি শাহ মখদুম ছাত্রাবাসের প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করি। তখন থেকে ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার ব্যাপক সুযোগ আমার এসেছিল এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সমগ্র উত্তরাঞ্চলে সেই সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার আমি করেছি। সেই সময় যদি এই নেতৃবৃন্দের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা আমি লাভ করতাম, তা' হলে এন. এস.এফ.-এর দৌরাত্ম্য দমনে ও ৬-দফার প্রচারণায় উত্তরাঞ্চলে আরো অধিক সুফল পাওয়া যেত। কিন্তু থাক সেকথা। কথাগুলো আত্মশ্লাঘার মত শোনায়।

যাহোক, পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। দেশের পরিস্থিতি যখন এক নিদারুণ রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি করল সেই সময় এন. ডি. এফ.-এর নেতা জনাব নূরুল আমীনের আহ্বানে তাঁর বাসভবনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পন্থা উদ্ভাবন সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ৩১শে জুলাই ('৬৬) সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সভা শুধু আলোচনায়ই সীমাবদ্ধ থাকে। শেষে আর তার কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।

৮ই আগস্ট ঢাকা জেলের অভ্যন্তরে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আফসার উদ্দিনের কোর্টে শেখ মুজিবের মামলার শুনানী হয়। ২০শে মার্চ তারিখে আউটার স্টেডিয়ামে প্রদত্ত বক্তৃতার জন্য পাকিস্তান রক্ষাবিধিবলে এই মামলা আনয়ন করা হয়েছিল।

শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মামলা

পরদিন ৯ই আগস্ট ('৬৬) পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৩২ দফাবলে জনাব তোফাজ্জল হোসেন ও আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ তাঁদের আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ ক'রে ঢাকা হাইকোর্টে এক আবেদন পেশ করেন। কিন্তু হাইকোর্টের একটি বিশেষ বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে তাঁদের আটক আইনসঙ্গত বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং পেশকৃত আবেদনসমূহ নাকচ ক'রে দেন।

সেদিনই বিচারপতি জনাব বি. এ. সিদ্দিকীর নেতৃত্বে পাঁচজন বিচারপতি সমবায়ে গঠিত ঢাকা হাইকোর্টের এক বিশেষ বেঞ্চ সর্বসম্মত রায়ে সরকার কর্তৃক পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৫২(২)(খ) দফা বলে ইত্তেফাকের মুদ্রণালয় নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্তকরণকে অবৈধ ও আইনের দৃষ্টিতে মূল্যহীন বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৭ই নভেম্বর প্রাদেশিক গভর্নর পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৫২ নং বিধির ২নং উপধারা অনুযায়ী উক্ত প্রেসকে পুনরায় বাজেয়াপ্ত করেন। তোফাজ্জল হোসেনের মামলাও অক্টোবরের ১০ তারিখে সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে শুরু হয়। ঢাকা কোর্টের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম. এ. রউফ এই মামলার বিচার করেন। ২৪শে অক্টোবর ('৬৬) শেখ মুজিবকে নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কার্যকলাপের অভিযোগ থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অনুষ্ঠিত বিচারের রায়ে অব্যাহতি দেয়া হয়। ১৯৬৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর সম্মিলিত বিরোধী দলের জুলুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের ৭/৩ ধারা অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ক'রে এ মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

নভেম্বরের ১৫ তারিখে অকস্মাৎ পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আসেন। বিমান বন্দরে ওয়ালীপন্থী ন্যাপের নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও ছাত্র ইউনিয়নের কিছুসংখ্যক ছাত্র তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এ সময় জনাব ভুট্টো রাজনীতিতে বিচিত্র চাল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ওয়ালী ন্যাপ তাঁকে দলে টানার জন্য চেষ্টা করছিলেন, কারণ ইতিমধ্যেই ভুট্টো বেশ আইয়ুব-বিরোধী কথাবার্তা বলতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। ভুট্টোও ন্যাপের কাছে ধরা দিব কি দিব না'র মত মনোভাব নিয়ে চলছিলেন। কিন্তু সবাই একদিন সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো ৬-দফার অন্যতম শত্রু ভুট্টো আওয়ামী লীগের সাথে হাত মেলাবার জন্য ঘোরাঘুরি করছেন। ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬৬। শেখ মুজিব তখন জেলে। ভুট্টো কয়েকদিন ঢাকায় অবস্থানের পর সেইদিন অকস্মাৎ বেগম শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করার জন্য শেখ মুজিবের বাসভবনে যান। বেগম মুজিব সে সময় ব্যক্তিগত কাজের জন্য বাইরে থাকার দরুন ভুট্টো তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন নি, ফলে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন।

ভুট্টোর ঢাকা আগমন

এ সময় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যদের সংগ্রামী ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কঠোর সমালোচনার মুখে সরকারের স্বীকারোক্তি থেকে আঞ্চলিক বৈষম্যের স্বরূপ ধরা পড়তে থাকে। কিন্তু সরকার বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যদের তীব্র সমালোচনায় কোনরূপ কর্ণপাত না ক'রে পূর্ব বাংলার মানুষকে শোষণের ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে একের পর এক বিল পাশ ক'রে যেতে লাগলেন। সরকার জনগণের অনুভূতির কোন খবর রাখবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের সদস্য আওয়ামী লীগের জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর আটকের বৈধতার প্রশ্নে জনাব মাহমুদ আলীর উত্তেজনা প্রকাশের কথা আগেই বলা হয়েছে। ৮ই ডিসেম্বর তারিখে এ বিষয়ে তিনি ১৯২ ধারার উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাবে ১৯২-ক ধারা নামে একটি নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব ক'রে দাবী করেন যে, যখন কোন পরিষদ সদস্যকে প্রশাসনিক আদেশে আটক

রাখা হয়, সেই সদস্যকে পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ প্রদানের জন্য পরিষদের অধিবেশন চলাকালে এ বিষয়ে স্পীকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

আওয়ামী লীগ সদস্য কামরুজ্জামান এই প্রস্তাব সমর্থন ক'রে বলেন যে, "জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যকে দেশের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার জন্য অনিষ্টকর হিসেবে অভিহিত করা ভ্রান্তি-জনক।"

[দৈনিক আজাদ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬]

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে বিরোধী দলের সকল সমালোচনা উপেক্ষা ক'রে জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্রের ৭ম সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। বিরোধী দলের সদস্যগণ এই বিলের তীব্র সমালোচনা ক'রে বলেন, "দেশকে ধোঁকা দেবার জন্যই জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্রের ৭ম সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। এর ফলে পরিষদ একেবারে পঙ্গু হয়ে যাবে—জনগণের কোন কল্যাণের কাজেই তা' (পরিষদ) আসবে না।" সে দিনই কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ জাফর জাতীয় পরিষদে ভাষণ দানকালে এক উদ্ভট মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, যারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চায়, তারা দেশের শত্রু। তিনি এই সব শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার হুমকিও প্রদর্শন করেন।

জাফরের এই মন্তব্যে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ঢাকা হাইকোর্ট বার সমিতি এই উক্তির নিন্দা ক'রে তা' প্রত্যাহারের দাবী জানান। ২০শে ডিসেম্বর পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় ছাত্র ও জনতা সম্মিলিতভাবে জাফরের উক্তির প্রতিবাদে প্রত্যক্ষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

এই সময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব বাংলায় তসরিফ এনেছিলেন। ৭ই জুনের বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর পুলিশের পৈশাচিক হামলার ফলে এবং শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতাকে কারাগারে আবদ্ধ করবার ফলে এ দেশের জনগণ যে কিভাবে কোমরভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে তা' তিনি সকৌতুকে প্রত্যক্ষ করলেন এবং প্রতিটি জনসভায় এ বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক ক'রে

আইয়ুবের ঢাকা আগমন ও হুমকী প্রদর্শন

দিয়ে বললেন যে, সরকারের বিরুদ্ধে কোন 'অপচেষ্টা' চালানোর প্রয়াসে লিপ্ত হলে তাদেরকে কঠিন শাস্তিই পেতে হবে। ১৭ই ডিসেম্বর ('৬৬) দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁয়ে তিনি এ ধরনের যে হুঁশিয়ারী জারী করেন, পরদিন প্রকাশিত 'দৈনিক আজাদ-এর খবর থেকে তার কিছুটা নমুনা দেয়া যেতে পারে ঃ

"বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করব" ঃ আইয়ুব

ঠাকুরগাঁও (দিনাজপুর), ১৭ই ডিসেম্বর।—

আজ এখানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঘোষণা করেন যে, যে সকল শক্তি দেশের উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বিরোধী বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে এবং তাহার দ্বারা দেশের মূল ভিত্তিকে দুর্বল করার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের সে চেষ্টাকে বানচাল করিবার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়া যাইবেন। তিনি বলেন, যতদিন আমি জীবিত থাকিব এবং যতদিন আমি রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে থাকিব, ততদিন আমি তাহাদের জঘন্য কারসাজীকে সফল হইতে দেব না।"

পরবর্তীকালে অবশ্য জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আইয়ুবের এই দাম্ভিকতাকে অসর প্রতিপন্ন করেছিল।

পূর্ব বাংলা সরেজমিনে তদন্ত ক'রে খান সাহেব যখন দেখলেন যে, পাকিস্তানেরউ ভয় অঞ্চলের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ ভাবেই তাঁর করায়ত্ত, তখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি নিজের মহত্ব ও উদারতা প্রকাশ করার জন্য একটি বিস্ময়কর কাজ ক'রে ফেললেন। ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে মার্শাল-ল' জারীর পরবর্তীকালে যে পাঁচ হাজার ব্যক্তির 'এবডো' প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা' থেকে তাঁদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়। এঁদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ভোট দানের অধিকার থেকে আরম্ভ ক'রে সকল প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর বিচার করার জন্যে দুটো প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় ট্রাইব্যুনাল থেকে যাঁদেরকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়—তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পূর্ব বাংলার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল মনসুর আহমদ, ফজলুর

রহমান প্রমুখ। প্রাদেশিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অযোগ্য ঘোষিতদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, বসন্ত কুমার দাস, দুর্গাদাস চন্দ্র লাহিড়ী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ইউসুফ আলী চৌধুরী, এম. মনসুর আলী, সৈয়দ আজিজুল হক, আবদুস সালাম, দেওয়ান মহিউদ্দিন, আবদুস সালাম খান, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ।

এদিকে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একের পর এক মামলার বিচার চলতে থাকে। ১৯৬৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম. এস. খানের কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার বিচার শুরু হয়। ১৯৬৪ সালের ২৯শে মার্চ পল্টন ময়দানে আপত্তিকর বলে কথিত এক বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলার অভিযোগ আনা হয়।

শেখ মুজিবের মামলা

১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চে আর একটি বক্তৃতা দানের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে যে বিচার চলছিল ১৯৬৭ সালের এপ্রিলের ২৮ তারিখে তার রায় প্রকাশ করা হয়। এই রায়ে তাঁকে ১ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

গণদাবী আদায়ের ক্ষেত্রে N.D.F. ব্যর্থ হওয়ায় দেশের পাঁচটি বিরোধী দল ৮-দফার ভিত্তিতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পুনরায় 'পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট' (P.D.M.) নামে একটি ঐক্যফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই মুভমেন্টের কর্মসূচীতে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন, প্রাপ্তবয়স্কের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত পার্লামেন্টারী ও ফেডারেল ধরনের শাসন-ব্যবস্থা কায়েম, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়, মুদ্রা, ফেডারেল ফাইন্যান্স, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, আন্তঃ-আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয় বাদে অবশিষ্ট সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব আঞ্চলিক সরকার-সমূহের হাতে অর্পণ, দেশরক্ষা ব্যাপারে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলকে সম-পর্যায়ে প্রস্তুত করা, নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব বাংলায় স্থানান্তর প্রভৃতি দাবী তাঁদের কার্যসূচীতে সন্নিবেশিত হয়। এদিকে শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের কারাগারে আবদ্ধ করেই সরকার তার দায়িত্ব শেষ করে নি।

পি. ডি. এম. গঠন

৮ই মে থেকে ১৭ মাস শেখ মুজিবকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল-এর একটি সেল-এ নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হ'ল। তিনি বহির্বিশ্ব, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সবার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেন। একটি ছোট্ট ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আবদ্ধ অবস্থায় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ মুক্তিদাতার দুর্বিষহ দিনগুলো কাটতে লাগলো। অসীম ধৈর্য, বাংলাদেশের জন্য কোন দুঃখ-কষ্টই বড় নয় এই একক অনুভূতি, অসাধারণ মনোবল, অনমনীয় চারিত্রিক শক্তি ইত্যাদির বলে তিনি কাল গণনা ক'রে যেতে লাগলেন। অতঃপর যখন তাঁর ঘরে অপর একজন আবদ্ধ বন্ধুকে সঙ্গী হিসেবে নেবার অনুমতি এল তখন কোন কোন ব্যক্তি তাঁর ঘরে সঙ্গী হয়ে যেতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাঁর দুর্দিনের সহযাত্রী বন্ধু আবদুল মোমেন (তৎকালীন আওয়ামী লীগের প্রচার-সম্পাদক) এই সংবাদে ব্যথিত হন এবং নিজে উপযাচক হয়ে তাঁর ঘরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ আগরতলা মামলার আসামী হিসেবে শেখ মুজিবকে নিয়ে যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আবদুল মোমেন একান্ত সুহৃদ হিসেবে শেখ সাহেবের ঘরে বন্দী জীবন যাপন করেন।

পুনরায় সংস্কৃতির ওপর আঘাত ও পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে আবার বাংলার সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার চেষ্টা করলো। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তারা প্রথম এর সুযোগ নিয়েছিল। এখানকার বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশকে সরকার দেশ-প্রেমের নামে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে নিয়োগ করিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেমে গেলে আইয়ুব সরকার এক ঘোষণায় ভারত থেকে পুস্তক আমদানী নিষিদ্ধ ক'রে দেন এবং এক অর্ডিন্যান্স-এর দ্বারা ভারতীয় পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ বন্ধ ক'রে দেয়া হয়। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কতিপয় সুযোগসন্ধানী লেখক সাধুবাদ জানান। কিন্তু ছাত্র-শিক্ষকরা এর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সরকারী ঘোষণা সত্ত্বেও এখানে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় বই সম্পাদিত হয়ে নব আঙ্গিকে পুনর্মুদ্রিত হতে থাকে।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় বেতার-টেলিভিশনে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ হলেও জনগণের দাবীর ফলে পরে পুনরায় তা' শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৭ সালের ২৩শে জুন জাতীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ঘোষণা করেন যে, জাতীয় আদর্শ ও ভাব-ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ করা হবে।

'রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচার করা হবে না'—এই শিরোনামে পরদিন ২৪শে জুন (১৯৬৭) একটি সংবাদ প্রকাশ ক'রে 'দৈনিক পাকিস্তানে' লেখা হয়ঃ

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন গতকাল জাতীয় পরিষদে বলেন যে, ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবে না এবং এ ধরনের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে। রাজশাহী থেকে নির্বাচিত বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব মুজিবুর রহমান চৌধুরীর এক অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে খাজা শাহাবুদ্দিন উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, শিল্পীগোষ্ঠী, কবি-বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষা-বিদসহ সকল শ্রেণীর নাগরিকের মধ্যে এক বিরাট প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ২৫শে জুন, ১৯৬৭ 'দৈনিক পাকিস্তান'-এ রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত—'১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি' এই শিরোনামে একটি প্রতিবাদ-মূলক বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়—"স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৩শে জুন, ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারী মাধ্যম হতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তার সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিতে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে তা' রবীন্দ্রনাথকে ভাবী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে।

সরকারী নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।"

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী হিসেবে যাদের নাম উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল, তাঁরা হলেন—ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খোদা, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জনাব জয়নুল আবেদীন, জনাব এম. এ. বারি, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডঃ খান সারওয়ার মুরশিদ, জনাব সিকান্দর আবু জাফর, জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, জনাব শামসুর রাহমান, জনাব হাসান হাফিজুর রহমান, জনাব ফজল শাহাবুদ্দিন, ডঃ আনিসুজ্জামান, জনাব রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

আমি নিজে অনুরূপ একটি বিবৃতিতে সরকারী নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে জনাব বদরুদ্দীন উমরের হাতে ঢাকার পত্রিকাগুলোতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিই। এতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিবাদী শিক্ষক প্রায় সকলেই দস্তখত করেছিলেন।

এইসব বিবৃতি ছাপার সঙ্গে সঙ্গে সরকার বে-সামাল হয়ে পড়লেন। বিভিন্ন স্থানে এই বিবৃতির সমর্থনে প্রতিবাদ-সভা ও গণমিছিল বের হতে থাকে। কিন্তু সরকারের গোপন নির্দেশে এইসব সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়া হয় এবং ভেতরে ভেতরে কিছুসংখ্যক শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীর সমর্থনও সরকারী প্রচেষ্টায় আদায় করা হয়।

২৯শে জুন, ১৯৬৭ সালের 'দৈনিক পাকিস্তান' এর পরিপ্রেক্ষিতে "১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি—বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষক কর্তৃক মতানৈক্য প্রকাশ"—এই শিরোনামে একটি এবং "৪০ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি—রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে ১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি মারাত্মক" —এই শিরোনামে অপর একটি, মোট দু'টো বিবৃতি ছাপা হয়। প্রথমটিতে বলা হয়—"সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কতিপয় ব্যক্তির বিবৃতিতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে বলে আমরা মনে করি এবং এই বিবৃতি পাকিস্তান-বিরোধী প্রচারে ব্যবহৃত হতে পারে। বিবৃতির ভাষায় এই ধারণা জন্মে যে, স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী পাকিস্তানী ও বাংলাভাষী

ভারতীয়দের সংস্কৃতির মধ্যে সত্যিকারের কোন পার্থক্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এই ধারণার সাথে আমরা একমত নই বলেই এই বিবৃতি দিচ্ছি।"

এই বিবৃতিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেন, তাঁরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যক্ষ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টির ডীন জনাব এম. শাহাবুদ্দিন, ইতিহাস বিভাগের রীডার জনাব মোহাম্মদ মোহর আলী, অংক বিভাগের রীডার জনাব এ. এফ. এম. আবদুর রহমান ও ইংরেজী বিভাগের সিনিয়র লেকচারার জনাব কে. এম. এ. মুনিম। 'দৈনিক পাকিস্তান'-এ প্রকাশিত দ্বিতীয় বিবৃতিতে বলা হয়—"পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে ঘোষিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ক'রে সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মহলের যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাংলা-ভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই উক্তির প্রতিবাদ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে, এই উক্তি স্বীকার ক'রে নিলে পাকিস্তানী ও ভারতীয় সংস্কৃতি যে এক এবং অবিচ্ছেদ্য, এই কথাই মেনে নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তা' হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি—যে সংস্কৃতির মূল কথা হ'ল 'শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন'। এবং যে সংস্কৃতি এই উপমহাদেশের মুসলমানদের অভিহিত করে 'হিন্দু-মুসলমান' বলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম তাঁর এক প্রবন্ধে এই উপমহাদেশের মুসলমানদের 'হিন্দু-মুসলমান' বলে অভিহিত করেন। সংস্কৃতি সম্পর্কে এই যে ধারণা, এর সাথে পাকিস্তানী সাংস্কৃতিক ধারণার আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে এবং বলা যেতে পারে একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে তামুদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, উপরোক্ত বিবৃতি মেনে নিলে সে ভিত্তিই অস্বীকৃত হয়। এই কারণে উপরোক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতির বিরোধী বলেও মনে করি।" স্বাক্ষরকারী হিসেবে বিবৃতিতে যাঁদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা হলেন ঃ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ,

বিচারপতি আবদুল মওদুদ, মুজিবর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, কবি আহসান হাবীব, কবি ফররুখ আহমদ, ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ, ডঃ হাসান জামান, ডঃ গোলাম সাকলায়েন, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, কবি বেনজীর আহমদ, কবি মঈনুদ্দীন, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন, জনাব আ. কা. মু. আদম উদ্দীন, কবি তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, সানাউল্লাহ নূরী, কবি আবদুস সাত্তার, কাজী আবুল কাসেম (শিল্পী), মুফাখখারুল ইসলাম, শামসুল হক, ওসমান গনি, মফিজউদ্দীন আহমদ, আনিসুল হক চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক মোহাম্মদ মতিউর রহমান, জহুরুল হক, ফারুক মাহমুদ, মোহাম্মদ নাসির আলী, এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম, কবি জাহানারা আরজু, বেগম হোসনে আরা, বেগম মাফরুহা চৌধুরী, আবদুল ওয়াদুদ ও আখতার-উল-আলম।

জাতীয় পরিষদে বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সরকারী দলের নেতা আবদুস সবুর খান এ বিষয়ে বেশ পাণ্ডিত্য (?) প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি এক বক্তৃতায় বললেন, একথা বলা হয়েছে যে, "ডঃ রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন এবং তাঁর কাব্য-বিহনে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা এতিম হয়ে পড়েছেন, এই শ্রেণীর মূর্খদের গলাবাজির প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২রা জুলাই, ১৯৬৭]

এই উক্তি থেকেই বুঝা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সবুর খানদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা কত লজ্জাজনক ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর মোনেম খানও নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব আবদুল হাইকে ডেকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "আপনারা বইয়া বইয়া করেন কি, রবীন্দ্র-সঙ্গীত লিখবার পারেন না?"

রবীন্দ্র-সঙ্গীত বর্জনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আস্তে আস্তে পূর্ব বাংলার রাজনীতি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ২রা আগস্ট প্রদেশের ছাত্ররা সকল প্রকার রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে 'বন্দী মুক্তি দিবস' পালন করেন। ঐদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সভা ও শোভাযাত্রার ওপর

পুলিশ উপর্যুপরি কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং বেয়োনেট ও লাঠিচার্জ করে। এর ফলে অর্ধ শতাধিক লোক আহত হয়। পুলিশ ৪৫ জন ছাত্র ও হাসপাতাল স্টাফকেও গ্রেফতার করে।

ইতিমধ্যে শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালের ৮ই মে তারিখে এক বক্তৃতা দানের অভিযোগে আটকাদেশের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ ক'রে ঢাকা হাইকোর্টে এক রীট আবেদন করেছিলেন। আগস্টের ৯ তারিখে (১৯৬৭) উক্ত হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে এক ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে তাঁর আটকাদেশ বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। অতঃপর সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করলে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট পুনর্বিবেচনার জন্য উক্ত আদালতকে নির্দেশ দান করেন। ওদিকে আইয়ুবের প্রাক্তন করুণার্থী জুলফিকার আলী ভুট্টো আস্তে আস্তে বেশ জনদরদী হবার কসরত চালাতে থাকেন। ঢাকায় এসে পূর্ব বাংলার জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সরকারের কাছে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী ক'রে তিনি বলেন যে, শেখ মুজিব একজন জাতীয় নেতা। ২৬শে মার্চ এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। ৬-দফার কথা উল্লেখ ক'রে জনাব ভুট্টো বলেন যে, "উক্ত কর্মসূচী আলোচনার উপযুক্ত। শেখ মুজিব সাহেবকে তাঁহার নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া আখ্যা প্রদান করা ঠিক নহে।"

জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্বীকারোক্তি

[দৈনিক আজাদ, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৬৭]

১৯৬৭ সালের ১লা ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ক্ষমতাসীন সরকারী দল পার্লামেন্টের ইতিহাসে এক নয়া নজীর স্থাপন করেন। সেদিন অধিবেশন চলাকালে স্পীকারের নির্দেশে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র ও বিরোধী দলীয় তিনজন সদস্য জনাব ডঃ আলীম-আল-রাজী (স্বতন্ত্র), জাতীয় পরিষদের সাবেক ডিপুটী স্পীকার জনাব আবুল কাসেম ও জনাব মোখলেসুজ্জামান খানকে (বিরোধী দল) পরিষদ কক্ষ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

পার্লামেন্টের ইতিহাসে নয়া নজীর

আইয়ুব খানের আত্মজীবনী 'ফ্রেণ্ডস্ নট মাস্টারস্' গ্রন্থ সম্পর্কে আনীত ডঃ আলীম-আল-রাজীর একটি বিধিসঙ্গত প্রশ্ন স্পীকার কর্তৃক

বাতিল করার ফলে উত্থাপিত বৈধতার প্রশ্নে স্পীকার কর্ণপাত না করায় এবং বিরোধী দলের মতে "এইরূপ অবাঞ্ছিত শক্তি প্রয়োগের পূর্বে পার্লামেন্টারী কনভেনশন অনুযায়ী সকল পদ্ধতি অনুসৃত না হওয়ার" প্রতিবাদে স্বতন্ত্র ও বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ পরিষদ কক্ষ বর্জন ক'রেন। ক্রমাগত কয়েকদিন ধরেই ঐ কারণে তাঁরা অধিবেশন বর্জন ক'রে চলেন। এমন কি ১১ই ডিসেম্বর বিরোধী দলের সদস্য জনাব মোখলেসুজ্জামান খান স্পীকার জনাব আবদুল জব্বার খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশও প্রদান করেন।

আইয়ুব খান তখন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম ৬-দফা কর্মসূচীর অধীনে জনগণকে ইতিমধ্যেই সক্রিয় করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। জনগণের সমর্থন সর্বত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে। জনগণ যে ভেতরে ভেতরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে আইয়ুব সরকার তা' স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছিলেন। তাঁরা যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারেন তার জন্যই আইয়ুব খানের সফর এবং স্বৈরাচারী ভাষণ। এ প্রসঙ্গে খুলনার মঙ্গলায় ১২ই ডিসেম্বর তিনি যে বক্তৃতা দেন দৈনিক সংবাদের পাতা থেকে তার নমুনা দেয়া যেতে পারে :

আইয়ুব খানের ঢাকা আগমন ও পুনরায় হুঁশিয়ারী উচ্চারণ

"প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে বিরোধী দলের 'বিভ্রান্তিপূর্ণ, নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক' মনোভাব সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেন এবং আরও বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধনই বিরোধী দলের উদ্দেশ্য। প্রেসিডেন্ট বিরোধী দলগুলির তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাহারা কেন্দ্রকে দুর্বল করিয়া দেশের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনিতে চায়। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টারী সরকার কায়েমের দাবীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইলে দেশ ধ্বংস হইয়া যাইবে।"

[দৈনিক সংবাদ, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭]

বলা বাহুল্য, বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁদেরকে অভিহিত করেছেন—তাঁরা ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মিগণ। আওয়ামী লীগ ৬-দফা দেওয়ার পর থেকে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাঁদের বিরুদ্ধে এই জাতীয় অভিযোগ করতে থাকে। এদেশের প্রগতিবাদী শক্তিকে সব সময় ভারতের গুপ্তচর বলে উল্লেখ ক'রে জনগণকে সাবধান করতে সরকারী চক্র দ্বিধা করে নাই। শেখ মুজিবসহ তাঁর বিশিষ্ট কতিপয় সহকর্মীকে ঐ একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অভিযোগে মামলা দায়ের ক'রে কারান্তরালে রাখা হয়েছিল। এই সময় পূর্ব বাংলার গভর্নর আবদুল মোনেম খান সদম্ভে বলেছিলেন, "যতদিন আমি ক্ষমতায় আছি শেখ মুজিবকে আর কারাগারের বাইরে আসতে হবে না।" তাই একের পর এক মিথ্যা ও বানোয়াট মোকদ্দমা চালিয়ে শেখ মুজিবকে অপদস্থ ও হয়রানী করা হতে থাকলো। কিন্তু বিচারের কষ্টিপাথরে সকল প্রকার মোকদ্দমাই অমূলক প্রমাণিত হয়। এর ফলে ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারীতে রাত্রি একটায় তাঁকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়।

জেলের অভ্যন্তরে শেখ মুজিব

শেখ মুজিব জেলের মধ্যে সারাদিন বই পড়তেন, মাঝে মাঝে গুন গুন করে গান করতেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর প্রিয়তম গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি', 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার কোলে ঠেকাই মাথা' এবং 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'। বই পড়তে পড়তে যখনই হাঁপিয়ে পড়তেন তখন জেলের সহ-সঙ্গী আবদুল মোমেন পড়তেন, তিনি শুনতেন। মাঝে মাঝে আবার তিনি পড়তেন, আবদুল মোমেন শুনতেন। সরবে বই পড়তে শেখ মুজিব ভালবাসেন।

এমনি করেই তাঁদের দিন যাচ্ছিল। ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী দিনগত রাত্রি একটার দিকে হঠাৎ তাঁদের ঘরের দরজায় মৃদু আঘাত শোনা গেল। শেখ মুজিব তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জনাব মোমেন একটি শব্দেই জেগে গেলেন। জিজ্ঞেস ক'রে তিনি জানলেন যে ডিপুটি জেলার তোজাম্মেল মিয়া বাইরে অপেক্ষা করছেন। তোজাম্মেল মিয়া শেখ মুজিবকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তিনি মৃদু ও ভাঙা গলায়

বললেন, 'দরজা খুলতে হবে স্যার।' মোমেন সাহেব দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকলেন তোজাম্মেল মিয়া এবং সেপাই আম্বর আলী। শেখ সাহেব তখনো ঘুমুচ্ছেন। সাথে সাথেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে, তিনি চোখ কচলিয়ে বললেন, "দুঃসংবাদ নয়, সুসংবাদ—কোন খবরই খারাপ নয়। বলুন কি খবর।" তোজাম্মেল মিয়া একটি লিখিত আদেশ শেখ মুজিবের হাতে দিয়ে বললেন, "দেখুন স্যার, আপনাকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে।"

কয়েকদিন হ'ল নানা খবর বাতাসে কয়েদখানার মধ্যে শেখ মুজিবের কানেও পৌঁচেছে। আগরতলা ষড়যন্ত্রে তাঁকে জড়ানোর চেষ্টা চলছে। শেখ মুজিব তাই নির্লিপ্তভাবেই প্রশ্ন করলেন, "আমাকে খালাস দেয়া হ'ল কি নতুন কোন ফাঁদে নেবার জন্য?"

ডিপুটি জেলার তোজাম্মেল মিয়া উত্তরে কোন কথা বললেন না, মাথা নীচু করে রইলেন। সেপাই আম্বর আলীরও একই অবস্থা।

শেখ মুজিব একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনেই বলে উঠলেন, "বুঝলাম, সংগ্রাম ঘনিয়ে আসছে, মুক্তি এগিয়ে আসছে, বাংলার মুক্তি।"

বিদায়ের পূর্বে বন্ধু আবদুল মোমেনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বন্ধু! বাংলাদেশকে আপনাদের হাতে রেখে গেলাম। জানিনা, কোথায় এরা আমাকে নিয়ে যাবে—হয়তো বাংলার মাটি থেকে এই আমার শেষ যাত্রা। যাবার সময় আপনাকে শুধু একটি কথা বলে গেলাম—বাংলাদেশের সাথে কোনদিন আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি নি, কোনদিন করবো না। আপনারা রইলেন, বাংলাদেশ রইল। এই দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সার্বভৌম স্বাধীনতাই আমার স্বপ্ন, আমার লক্ষ্য।" শেখ মুজিবের দু'চোখ বেয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সেই অশ্রু স্পর্শ করলো আবদুল মোমেনের গ্রীবাদেশ। অশ্রু নয়, বিপ্লব-বন্যার দুই ফোঁটা উজ্জ্বল পূর্বাভাস। পার্শ্বে দণ্ডায়মান কর্তব্যরত দুইজন পুলিশের গণ্ডদেশও এই দৃশ্যে অশ্রুর বন্যায় অভিসিক্ত হ'ল। বিশ্বস্ত সহচর আবদুল মোমেনের কণ্ঠে শিশুর কান্নার আবেগ।

অপসৃয়মান সূর্যের মত শেখ মুজিব ধীরে ধীরে জেলগেটের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত মোনেম খান তাঁর ওয়াদা রেখেছিলেন। শেখ মুজিবকে আর বাইরের মাটিতে বেশীক্ষণ পা রাখতে দেয়া হয় নি। জেলগেট থেকে বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে একটি মিলিটারী ভ্যান সঙ্গীন উঁচিয়ে দাঁড়াল তাঁর সামনে। তাঁকে বিজাতীয় ভাষায় জানানো হ'ল—'তুমি আবার বন্দী, চল আমাদের সঙ্গে।'

—অপরাধ?

উত্তর নেই। শেখ মুজিবও জানেন উত্তর পাওয়া যাবে না। তিনি মিলি-টারীর সামনে দাঁড়িয়ে শুধু একটি অনুরোধ জানালেন: 'শুধু এক মুহূর্ত সময় দাও ভাই তোমরা আমাকে।' তারপর কারাগারের সামনের পথ থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে কপালে স্পর্শ ক'রে প্রার্থনা জানালেন—

আবার গ্রেফতার

'এই দেশেতে জন্ম আমার,
যেন, এই দেশেতেই মরি।'

অতঃপর সেই একমুঠো মাটি নিজের কাছেই রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য, যদি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়, তা' হ'লে মৃত্যুর সময় তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ থেকে তিনি অনেক দূরে থাকবেন। তখন এই এক মুঠি মাটির স্পর্শে তাঁর মনে হবে যে, জননী জন্মভূমি মাটির পবিত্র স্পর্শ তাঁর অঙ্গে লেগে আছে। বাংলাদেশ, এই দেশের মাটি তাঁর নিকট কত প্রিয় এ থেকেই তা' অনুধাবন করা যায়। যখনই সময় এসেছে, শেখ মুজিব সব নির্যাতন ও মৃত্যুকে প্রতি পদে পদে এমনি সহজভাবেই বরণ ক'রে নিয়েছেন। ভয়ে বা বেদনায় কখনোই মুষড়ে পড়েন নি তিনি। এবার অনিশ্চিতের পথে মৃত্যুকে সামনে রেখেই শুরু হ'ল তাঁর অকুতোভয় যাত্রা।

বন্দীশালায় গিয়ে দেখলেন, সেখানে পরিচিত অপরিচিত আরো কয়েক-জন আগে থেকেই আবদ্ধ রয়েছেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হলেন।

বন্দীরা সবাই জানালেন যে, ভারতের সঙ্গে যোগসাজস ক'রে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার এক ব্যাপক ষড়যন্ত্রে নাকি তাঁরা সবাই লিপ্ত ছিলেন—আর তার পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিব—এই অভিযোগে তাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী ২ জন সি. এস. পি. অফিসারসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে প্রকাশিত একটি প্রেসনোটে বলা হয় যে, "গতমাসে (ডিসেম্বর, ১৯৬৭) পূর্ব পাকিস্তানে উদ্ঘাটিত জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাঁদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে প্রেসনোট

প্রেসনোটে অভিযোগ করা হয়ঃ "গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা ঢাকাস্থ ভারতীয় ডিপুটি হাই কমিশনারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে আসছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল।"

প্রেসনোটে বলা হয়, "আটক ব্যক্তিদের কয়েকজন ভারতীয় এলাকা সফর করে এবং লেঃ কর্নেল মিশ্র, মেজর মেনন প্রমুখ ভারতীয় সামরিক অফিসারদের সঙ্গে তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে।"

এছাড়াও প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়, "তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের পরিকল্পনা সফল ক'রে তোলার জন্য প্রচুর অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। এই মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মানিক চৌধুরীসহ আটক ব্যক্তিদের কয়েকজনের মাধ্যমে তারা ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করেছে।"

প্রেসনোটে বলা হয়, "এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তদন্তানুষ্ঠান সমাপ্ত-প্রায়। শীঘ্রই মামলার শুনানী শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।"

প্রেসনোটে দাবী করা হয় যে, "তদন্তকালে আটক ব্যক্তিদের অধিকাংশই স্ব-স্ব ভূমিকা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছেন। আগরতলার আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে সংগৃহীতব্য অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকাসহ বহুসংখ্যক দলিলপত্র আটক করা হয়েছে।"

সরকারী প্রেসনোটে আরও দাবী করা হয় যে, "এইসব লোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন, তা' নস্যাৎ ক'রে দেয়া হয়েছে।"

বেতার ও পত্র-পত্রিকা মারফৎ এই সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্ব বাংলায় এক নিদারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কতিপয় সি. এস. পি. অফিসার, সামরিক বাহিনীর সাবেক কর্মচারী এবং বেসামরিক নাগরিকের গ্রেফতার সম্পর্কে কানাঘুষা চলে আসছিল। ঐ মাসের শেষার্ধে গ্রেফতারকৃত কামাল উদ্দিন আমহদ ও সুলতান উদ্দিন আহমদ নামক দু'জন সাবেক কর্মচারীর পক্ষ থেকে আটক কর্তৃপক্ষের হাতে অমানুষিক নির্যাতনের অভিযোগ ক'রে ঢাকা হাইকোর্টে রীট মামালা পেশ করা হয়েছিল। মহামান্য হাইকোর্ট আটক ব্যক্তিদ্বয়কে অবিলম্বে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর এবং তাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ পরীক্ষা করার জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দান করেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই সরকারের এইভাবে পাইকারী গ্রেফতারে জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে পারেন নি। কয়েকদিন পর ১৮ই জানুয়ারী ('৬৮) সরকার আর একটি প্রেসনোট প্রকাশ করেন। এতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 'পরিকল্পনা ও পরিচালনার অভিযোগ আনয়ন করা হয়।' প্রেসনোটটিতে শেখ মুজিব ছাড়াও জনাব শামসুর রহমান সি. এস. পি. সহ আরো কতিপয় ব্যক্তিকে কথিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়।

সরকার এই ষড়যন্ত্রকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' বলে অভিহিত করেন। তথাকথিত এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামালায় যাঁদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁরা হলেন ঃ

১। শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর)
২। লেঃ কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (বরিশাল)
৩। স্টুয়ার্ড মজিবর রহমান (মাদারীপুর)
৪। প্রাক্তন এল. এস. সুলতান উদ্দিন আহমদ (নোয়াখালী)
৫। এল. এস. নূর মোহাম্মদ (ঢাকা)
৬। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান সি. এস পি. (ঢাকা)
৭। ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ (নোয়াখালী)
৮। প্রাক্তন কর্পোরাল এ. বি. সামাদ (বরিশাল)
৯। প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন (বরিশাল)
১০। জনাব রুহুল কুদ্দুস সি. এস. পি. (খুলনা)

১১। ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক (বরিশাল)
১২। ভূপতি ভূষণ (মানিক) চৌধুরী (চট্টগ্রাম)
১৩। বিধানকৃষ্ণ সেন (চট্টগ্রাম)
১৪। সুবেদার আবদুর রাজ্জাক (কুমিল্লা)
১৫। মুজিবর রহমান ই.পি.আর.টি.সি. ক্লার্ক (কুমিল্লা)
১৬। সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক (কুমিল্লা)
১৭। সার্জেন্ট জহুরুল হক (নোয়াখালী)
১৮। মোহাম্মদ খুরশীদ (ফরিদপুর)
১৯। কে. এম. শামসুর রহমান সি.এস.পি. (ঢাকা)
২০। রিসালদার শামসুল হক (ঢাকা)
২১। হাবিলদার আজিজুল হক (বরিশাল)
২২। এস. এ. সি. মাহফুজুল বারি (নোয়াখালী)
২৩। সার্জেন্ট শামসুল হক (নোয়াখালী)
২৪। মেজর শামসুল আলম (ঢাকা)
২৫। ক্যাপ্টেন মুত্তালিব (ময়মনসিংহ)
২৬। ক্যাপ্টেন শওকত আলী (ফরিদপুর)
২৭। ক্যাপ্টেন খন্দকার নজমুল হুদা (বরিশাল)
২৮। ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান
২৯। সার্জেন্ট আবদুল জলিল (ঢাকা)
৩০। মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী (সিলেট)
৩১। লেঃ এম.এম.এম. রহমান (যশোর)
৩২। প্রাক্তন সুবেদার তাজুল ইসলাম (বরিশাল)
৩৩। মোহাম্মদ আলী রেজা (কুষ্ঠিয়া)
৩৪। ক্যাপ্টেন খুরশীদ (ময়মনসিংহ)
৩৫। লেঃ আবদুর রউফ (ময়মনসিংহ)

এছাড়া আরো ১১ জন অভিযুক্ত ছিলেন যাঁদেরকে পরে রাজসাক্ষী হতে রাজী হওয়ায় ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। এঁরা হলেন ঃ

১। লেঃ মোজাম্মেল হোসেন (ময়মনসিংহ)
২। এক্স কর্পোরাল আমীর হোসেন মিয়া (মাদারীপুর)

৩। সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদ (ময়মনসিংহ)
৪। ডাঃ সাইদুর রহমান (চট্টগ্রাম)
৫। মীর্জা রমিজ (চট্টগ্রাম)
৬। ক্যাপ্টেন আবদুল আলীম ভূঁইয়া (কুমিল্লা)
৭। কর্পোরাল কামাল উদ্দিন (পাবনা)
৮। কর্পোরাল সিরাজুল ইসলাম (কুমিল্লা)
৯। মোঃ গোলাম আহমদ (মাদারীপুর)
১০। মোঃ ইউসুফ (বরিশাল)
১১। সার্জেন্ট আবদুল হালিম (কুমিল্লা)

এই সকল অভিযুক্ত আসামীদেরকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে ১৮ই জানুয়ারী তাঁদেরকে দেশরক্ষা আইন থেকে মুক্তি দিয়ে আমি, নেভী এ্যাণ্ড এয়ারফোর্স এ্যাক্টে পুনরায় গ্রেফতার ক'রে সেন্ট্রাল জেল থেকে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবের নামে সরকারের মিথ্যা অভিযোগ আনার সাথে সাথে সারা বাংলাদেশে আগুন জ্বলে ওঠে। ১৯শে জানুয়ারী (১৯৬৮) ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ছাত্রগণ তাঁর মুক্তির দাবীতে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন।

২১শে জানুয়ারী আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াকিং কমিটি শেখ মুজিবের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ সরকারের কাছে প্রকাশ্য বিচারের দাবী করেন।

এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাইস-এডমিরাল এ. আর. খান ২৬শে জানুয়ারী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জানান ঃ

"পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত আটক ২৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্তকার্য প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে এবং শীঘ্রই দেশের আইন অনুসারে তাহাদের প্রকাশ্যে বিচার করা হইবে।"

[দৈনিক সংবাদ, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৬৮]

অতঃপর ১৯৬৮ সালের ২১শে এপ্রিল প্রেসিডেন্ট 'ফৌজদারী আইন সংশোধনী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) ১৯৬৮ (অর্ডিন্যান্স নং ৫-১৯৬৮)' বলে

সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বে বিচারপতি জনাব মজিবুর রহমান খান, বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিমকে নিয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। এই ট্রাইব্যুনালের ওপর কুর্মিটোলা সেনানিবাসে আটক অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ ব্যক্তির বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক এই ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার কোন সুযোগ ছিল না।

১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও টেলিভিশন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে ভারতের

ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী

অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যপুষ্ট হয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আনীত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার শুনানী শুরু হয়।

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মঞ্জুর কাদিরসহ বেশ কিছু-সংখ্যক আইনজীবী সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য উপস্থিত হন। লণ্ডনে অবস্থানরত পাকিস্তানী ছাত্র-জনতা নিজেরা চাঁদা সংগ্রহ ক'রে বিশ্ববিখ্যাত ষড়যন্ত্র মামলাবিশারদ ইংল্যাণ্ডের রানীর আইন বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস উইলিয়মকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আইনজীবী হিসেবে ঢাকায় প্রেরণ করেন। এ ছাড়াও আসামীদের পক্ষে ছিলেন ডঃ আলীম-আল-রাজী, জনাব আবদুস সালাম খান, খানবাহাদুর ইসলাম, খানবাহাদুর নাজিরুদ্দিন, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব জহিরুদ্দিন, জনাম জুলমত আলী, মোল্লা জালালউদ্দিনসহ বহু সংখ্যক আইনজীবী।

এই মামলার গোড়ায় ২২৭ জন সাক্ষীর তালিকা পেশ করা হলেও শেষ পর্যন্ত আড়াই শতাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে চাকরী-বাকরী, প্রমোশন-লাইসেন্স প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে এসব সাক্ষী দাঁড় করানো হয়। সাক্ষ্য গ্রহণকারী একজন রাজসাক্ষী এ বি এম ইউসুফ এবং তিনজন সরকারী সাক্ষী বৈরী ঘোষিত হয়।

অত্যাচারের নির্মম পেষণে জর্জরিত হয়ে কামাল উদ্দিন শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী প্রধান কৌসুলী চিন্তা

করতেও পারেন নি যে সরকার যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন কামাল উদ্দিন সাক্ষ্য দিতে এসে ঠিক তার বিপরীত কথা বলবেন।

কামাল উদ্দিন সাহেব ট্রাইব্যুনালের সামনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সেনাবাহিনী কর্তৃক অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করলেন। তিনি তাঁর জবানবন্দীতে বললেন ঃ

"বাড়ী থেকে ধরে প্রথমে আমাকে সিদ্ধেশ্বরীতে সিটি এস-বি অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে 'আই-বি'র ডি. এস. পি. এম. ইয়াসিন এবং ইন্সপেক্টর কে. আহমদ প্রায় সারা রাত ধরে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বলে, আমি নাকি সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে জড়িত আছি। জোর ক'রে আমার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করল। ইন্সপেক্টর কে. আহমদ আমায় বলল, 'ভারতের সঙ্গে যোগসাজসে তোমরা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে যারা জড়িত আছ সকলের নাম লিখে স্টেটমেন্ট ক'রে দিচ্ছি, সই ক'রে দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'আমি এসবের কিছুই জানি না, আপনারা আমায় অযথা হয়রানী করছেন।'

কাজ হাসিল হ'ল না দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল সে। ঘাড় ধরে মাটিতে ফেলে দিল আমায়। পিঠে রুল দিয়ে কয়েকটা ঘা দিল। পরদিন আমাকে মিলিটারীর হাতে তুলে দিল। মিলিটারী ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন সুলতান এবং নৌবাহিনীর লেফ্‌টেন্যান্ট শরীফ দিনের পর দিন আমাকে জেরা ক'রে ভয় দেখিয়ে অত্যাচার ক'রে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করল। ওরা এক ডিগ্রী থেকে পাঁচ ডিগ্রী পর্যন্ত নির্যাতন চালালো আমার ওপর।

একদিন তো কানের কাছে এমন প্রচণ্ড চড় কষালো যে, এখনও কানে ভাল শুনতে পাই না। কয়েকটা নখে সুঁই ঢুকিয়ে দিয়েছে কতবার, রুল দিয়ে মেরে মেরে আঙুল ভেঙে দিয়েছে। আঙুলগুলো আর নড়াতে পারি না। এতেও ওদের নির্যাতন শেষ হ'ল না। আমাকে উলঙ্গ করে গুহ্যদ্বারে ব্যাটন ঢুকিয়ে জোর করিয়ে হাঁটিয়েছে। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা কী বলব! কতোবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছি।

আর একদিন মাটিতে শুইয়ে হাত-পা বেঁধে উপুড় ক'রে ফেলে রুল দিয়ে গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে দিল বরফের কতকগুলো টুকরো। তারপর চললো জিজ্ঞাসাবাদঃ 'বল্ তোদের নেতা কে? মুজিবুর রহমান? ইণ্ডিয়ায় কার সঙ্গে যোগসাজস আছে? ঢাকায় ইণ্ডিয়ান হাই কমিশন অফিসে কার সঙ্গে যোগাযোগ আছে? কোথায় কোথায় তোদের ঘাঁটি আছে, বল্?'

আমি জ্ঞান হারাতে হারাতে শুধু বলতে পেরেছি, 'আমি এ-সবের কিছুই জানি না।'

দিনের পর দিন ওরা নিত্য-নতুন নির্যাতন চালিয়েছে আমার ওপর। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ছুরি দিয়ে শরীরের নানান স্থান কেটে কেটে কাটা জায়গায় নুন আর লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার যন্ত্রণাবিকৃত মুখ দেখে ওখানকার মিলিটারী অফিসাররা পৈশাচিক হাসিতে ভরিয়ে তুলেছে টর্চার-চেম্বার।

আর একবার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে শরীর থেকে কাপড় খুলে নিল একজন সিপাই। তারপর আমার পুরুষাঙ্গ ধরে প্রবলভাবে টানা-হেঁচড়া করতে লাগল। অণ্ডকোষ দু'টি দু'হাতে রগড়ে পিষে দিতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার ক'রে উঠলাম। মাথা ঘুরে গেল। চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম, স্যাঁৎসেঁতে একটা মেঝেতে পড়ে রয়েছি। শরীরে কোন কাপড় নেই। সারা শরীর তখনও অসহ্য ব্যথায় টনটন করছে।

ঐ দিনই কয়েক ঘন্টা বাদে আবার আমায় স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য নিয়ে গেল। চ্যাঙ্গা একজন মিলিটারী অফিসার বলল, 'ভারতের সঙ্গে যোগসাজসে তোমরা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছিলে। তোমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। আর আমরা যাদের কথা বলি তারাও তোমার সঙ্গে ছিল—এই স্বীকারোক্তি লিখে দিতে হবে। স্বীকারোক্তি লিখে দিলে তোমাকে ক্ষমা করা হবে। ভেবে দেখ। আর যদি স্টেটমেন্ট না দাও, তোমার স্ত্রী আর মেয়েদের এনে তোমার সামনে উলঙ্গ ক'রে চাবুক দিয়ে শরীর কেটে কেটে লঙ্কা-নুন ছিটিয়ে দেবো। তোমার রূপসী স্ত্রীকে তোমার চোখের সামনে ন্যাংটো ক'রে সাধারণ সৈন্যদের লেলিয়ে দেবো তাকে ধর্ষণ করার জন্যে।'

অফিসারটির কথা শুনে অদূরে দাঁড়ানো সৈন্যটির চোখ দু'টো লোভে জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে উঠলো। জিভটা দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিল।

এত অত্যাচারেও আমাকে দিয়ে যা করাতে পারে নি, এই একটি কথাতেই তা' পারল। খুকি আর আমার ছেলেমেয়েদের ওপর নির্যাতনের কথা ভেবে শিউরে উঠলাম। ওদের ওপর বিন্দুমাত্র নির্যাতন আমি সইতে পারব না। কিছুতেই না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না, না, ওদের কিছু করবেন না, আমি স্টেটমেন্ট দেব। আপনারা যা বলবেন, তাই লিখে দেব।'

১৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার ওরা আমাকে দিয়ে একটি দলিলে সই করিয়ে নিল। কয়েক সীট কাগজে আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ নিল। দিনের পর দিন অমানুষিক নির্যাতনে আমার মাথা তখন শূন্য, হতচেতন অবস্থা। কি করল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বাধাও দিলাম না। সে শক্তিও ছিল না। তারপর কতগুলো 'মিষ্টি কালো জাম' ও এক গ্লাস ওষুধ খেতে বলল, ওষুধটার স্বাদ অনেকটা 'রাম'-এর (এক জাতীয় মদ) মতো। তারপর আমার হাতে তুলে দিল কাগজ আর কলম। একজন একটা টাইপ-করা কাগজ দেখে দেখে ডিক্‌টেশন দিচ্ছিলেন, আমাকে তা' লিখে যেতে বলা হ'ল। সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর অনেকের, কয়েকজন সি.এস.পি. অফিসার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীর নাম লিখতে বলল। পঞ্চাশ জনের মতো হবে বোধহয়। তারপর একটা জবানবন্দী লিখতে বলল। নির্যাতনের ভয়ে তা' লিখে দিলে তারপর থেকে আমার ওপর আর অত্যাচার করে নি।"

[প্রাগুক্ত, কল্‌হন, পৃঃ ১৯৪-১৯৭]

কিন্তু যাঁদের নাম কামাল উদ্দিন সাহেব স্টেটমেন্টে লিখেছিলেন তাঁদের অনেকেরই সাথে তাঁর মোটেই যোগাযোগ ছিল না। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে শত্রু বলে ঘোষণা করলেন। পরদিন থেকে কামাল উদ্দিন সাহেবকে জেরা করতে শুরু করা হ'ল।

সালাম খান আসামী পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী ছিলেন। তিনি কামাল উদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, মিঃ আহমদ, কাল যখন আপনি বলছিলেন যে, বন্দী থাকাকালে আপনার ওপর নৃশংস অত্যাচার

করা হয়েছে, আপনি কি সেই সময় ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন যে আদালতে তো মাত্র দশ মিনিট, তারপর আমার কী হবে?'

জেরার উত্তরে কামাল উদ্দিন বলেনঃ 'যে অমানুষিক নির্যাতন আমার ওপর করেছে, আবার করলে আমি আর বাঁচব না। ভয়ে আমি মন খুলে সাক্ষ্য দিতে পারছি না।'

সালাম খান কামাল উদ্দিনের জবাব শুনে ট্রাইব্যুনালের বিচারপতির দিকে একবার তাকালেন। তারপর তাঁর সহকারীর নিকট থেকে এক চিরকুট নিয়ে বললেন, 'জীপটা কি আপনার কেনা?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কোন্ মডেলের?'

'সিক্সটি ফাইভ মডেলের। একজন লোকের কাছ থেকে গাড়ীটা আমার কেনা।'

'আচ্ছা, আপনি বলেছেন জীপটা কিছুদিন কে. জি. আহমদও ব্যবহার করেছেন। তাঁর সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

'প্রথম দিকে তিন মাস তিনি আমাদের সেলভেশন কোম্পানীর চেয়ার-ম্যান ছিলেন।'

'রক্সি হোটেল থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ীর দূরত্ব কতখানি?'

'রক্সি হোটেল মীরপুর রোডে। মুজিবুর রহমানের বাসা আমি চিনি না এবং তাঁকে আমি কখনো দেখিও নি।'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে সালাম খান আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি বলেছেন করাচীতে যখন আপনি সুলতান উদ্দিনের বাসায় তখন একদিন সেখানে একটা সভা হয়েছিল। নক্ শুনে দরজা খুলে দাঁড়াতে আপনি কাকে দেখেছিলেন?'

'লেফটেন্যান্ট মোজাম্মেল হোসেনকে।'

'কতক্ষণ চলেছিল সভা?'

'তিনটে থেকে চারটে। চারটের পর আমি বেরিয়ে যাই।'

'আপনার উক্তি থেকে জানা যায়, ক্যান্টনমেন্ট মেসে মেজর হাসান এবং মেজর শরীফ আপনার কাছে প্রায়ই যেতেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁদের কেউ কি আপনাকে জবানবন্দী দিতে বলেছিলেন?'

'লেফটেন্যান্ট শরীফ বলেছিলেন।'

'জবানবন্দী লিখতে রাজী করানোর সময় তাঁরা কি আপনাকে অত্যাচার করেছিলেন?'

'হ্যাঁ করেছিলেন। আমি জবানবন্দী দিতে অসম্মত দেখে একজন সুবেদার বলে উঠল, স্যার, ভাল কথায় কাজ হবে না, ভাল ক'রে 'বানালে' ভাল ছেলের মত কথা শুনবে। পরে জেনেছিলাম, সুবেদারের নাম শফি। তারা আমার উপর তো অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল, তারপর আমার স্ত্রী ও মেয়েদের ওপর অত্যাচারের ভয় দেখালে আমি স্টেটমেন্ট লিখে দিতে রাজী হই। লেফটেন্যান্ট শরীফ কতকগুলো পয়েন্টের উপর স্টেটমেন্ট লিখতে বললেন।'

সালাম খান জিজ্ঞেস করলেন, 'পয়েন্টগুলো কী?'

শেখ মুজিবুর রহমান এবং এ. এফ. রহমান সি.এস.পি-কে আমার বন্ধু বলে উল্লেখ করতে বললেন।

'আর কারও নাম লিখতে বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ, বলেছিলেন। চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী আমার বিশেষ পরিচিত এবং তিনি একদিন আমার বাসায় এসে গোপনে জেনারেল আযম খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন এবং আরও কয়েকজনকে আমি চিনি—এসব লিখতে বলেছিলেন। সনাক্ত করতে অসুবিধা না হয় সেজন্য তাঁরা আমাকে তাঁদের ফটো দেখাবে। মেজর হাসান জবানবন্দী বলে গিয়েছিলেন, আমি লিখেছি মাত্র।'

'বলতে পারেন, মেজর হাসান কি আদালতে হাজির আছেন?'

কামাল উদ্দিন সাহেব আদালত কক্ষের চারিদিকে সকলের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন, 'না, তিনি এখন এখানে নেই।'

সালাম খান জেরা সমাপ্ত ক'রে চেয়ারে উপবিষ্ট হওয়া মাত্র সরকারী পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী মঞ্জুর কাদির কামাল সাহেবকে প্রশ্ন করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী টমাস উইলিয়ম আপত্তি তুললে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান মিস্টার টমাসের আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে মঞ্জুর কাদিরকে জেরা করার অনুমতি দেন।

মঞ্জুর কাদির কামাল উদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার উপর নির্যাতন সম্পর্কে আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তা' হাইকোর্টে রীট আবেদন করার আগে না পরে?'

'আগে লেখা।'

'আপনার উপর নির্যাতন করা হয়েছে—পাঁচজন ডাক্তারের বোর্ড এ সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট দিয়েছেন কি?'

'তাঁরা কি রিপোর্ট দিয়েছেন তা' আমার জানা নাই।'

'ডাক্তাররা কি আপনার শরীরের উপর আঘাতের চিহ্ন দেখেছেন?'

'আমি আমার দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়েছি। তারা কি দেখেছেন জানি না। তবে তাঁদের একজন বলেছিলেন, 'দেখুন, আমাদের হাত-পা বাঁধা, যেন থেকেও নেই।'

মঞ্জুর কাদির জেরা সমাপ্ত করেন। কামাল উদ্দিনের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিচারপতি এস. এ. রহমান কামাল উদ্দিনকে বলেন, 'আপনি এখন মুক্ত মানুষ।'

তারপর আদালত কক্ষে শুরু হয় প্রাক্তন কর্পোরাল আমীর হোসেনের জেরা। ইনি ফরিদপুরের লোক। ইনি প্রথমে বিমান বাহিনীর লোক ছিলেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি করাচীর কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসে যোগ দেন। আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি যে জবানবন্দী দেন এবং কৌঁসুলীদের জেরার সম্মুখীন হন—এর একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে আবার আমি কল্হনের উক্ত গ্রন্থের (পৃঃ ২০১—২২৩) শরণাপন্ন হচ্ছি।

আমীর হোসেনের জবানবন্দী

সরকার পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী আগরতলার ষড়যন্ত্রের উৎস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে আমীর হোসেন জবাব দেন, '১৯৬৪ সালের শেষের দিকে অথবা ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে স্টুয়ার্ড মুজিবরের সাথে আমার পরিচয় হয়। সে সময় লীডিং সীম্যান সুলতান উদ্দিনের সাথেও আমার পরিচয় হয়। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনকেও আমি তখন চিনি এবং পরিচয় হয়। এঁদের সাথে আলাপ হওয়ার কিছুদিন পর স্টুয়ার্ড মুজিবর এবং সুলতান উদ্দিন আমাকে পূর্ব ও

পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে একটা বিরাট বৈষম্য চলছে, সে সম্পর্কে অনেক কথাই বলেন। তাঁরা আরো বলেন, পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন না হলে এদেশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তাঁদের এসব কথায় আমল দিতাম না। তাই একদিন আমাকে লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় নিয়ে গেলেন। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম তাঁদের কথায় বিশ্বাস রাখতে বললেন। তিনি বললেন, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' গঠন করতে হবে। প্রাক্তন এবং কার্যরত সৈনিকদের নিয়ে 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা'র জন্য সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এসব কথা শোনার পর আমি তাঁদের দলে যোগ দিই। লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেমের বাসায় প্রায়ই গোপন বৈঠক বসত। আমিও সেখানে যেতাম। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং সুলতান উদ্দিন ছাড়া আরও অনেকেই উক্ত সভায় যোগ দিতেন। সেখানে গেরিলা বাহিনীর হাবিলদার দলিল উদ্দিনও যেতেন। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে সুলতান উদ্দিন আহমদ ঢাকা গিয়েছিলেন আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে। সেখান থেকে তিনি আমাকে তিনখানি চিঠি লিখেন।

সরকার তরফ থেকে তিনখানি চিঠি পেশ করা হ'ল। মঞ্জুর কাদির চিঠিগুলোর ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, 'চিঠিতে কি লিখা ছিল আপনার মনে আছে কি?'

আমীর হোসেন জানালেন, চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু ঠিক হুবহু মনে নেই, তবে সুলতান উদ্দিন লিখেছিলেন, ঢাকার ছাত্র-সমাজের সাথে মিশে 'স্বাধীন পূর্ব বাংলার' কাজ তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। চিঠিতে তিনি আরও লিখেছিলেন—স্টুয়ার্ড মুজিবরের ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি না যাওয়ায় আন্দোলনের ক্ষতি হচ্ছে; আমি যেন তাঁর বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানাই। আর এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, শেখ মুজিবের বাসভবনে এক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। আমি যেন উক্ত সভায় যোগদানের জন্য তৈরী থাকি। প্রথম পত্রের উল্টো পিঠে লিখা ছিল, আমি যেন তাঁর কাছে C/o. মোহাম্মদ মতিউর রহমান (এস) 'পথিকাবাস', ৪নং মোমেনপুর, ঢাকা-৫ এই ঠিকানায় চিঠি লিখি। উক্ত ঠিকানায় ব্রাকেটের এস অবশ্যই লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

তৃতীয় পত্রে সুলতান উদ্দিন সম্ভবতঃ জানিয়েছিলেন, তিনি একটি গোপন প্রেস পেয়েছেন—সেই প্রেসের মাধ্যমে আন্দোলনের প্রচারপত্র ছাপানো যাবে। তিনি আরো লিখেছিলেন, আমি কয়েকদিনের মধ্যেই টাকা পাঠাচ্ছি। লীডিং সীম্যান নূর মোহাম্মদকে নিয়ে টাকা পাওয়া মাত্রই যেন ঢাকায় চলে আসি।

বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী সাক্ষীর কথা বানোয়াট বলে আপত্তি তুললে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান আমীর হোসেনকে তাঁর সাক্ষ্য চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন।

আমীর হোসেন তাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরেই বলেনঃ ঐ চিঠির সাথে একটি লিফলেটও পাই। কয়েকদিনের মধ্যে পনের শ' টাকা পাই। নূর মোহাম্মদও তাঁর টাকা পেয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালের ২৮শে আগস্ট সন্ধ্যার ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশ্যে করাচী ত্যাগ করি। কিন্তু নূর মোহাম্মদের ছুটি মঞ্জুর না হওয়ায় তিনি আমার সাথে যেতে পারেন নি।

ঢাকার বিমান বন্দরে নেমে দেখি স্টুয়ার্ড মুজিবর এবং সুলতান উদ্দিন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। তাঁরা একটা জীপে ধানমণ্ডির ২নং রোডে একটা বাসায় নিয়ে গেলেন। বাড়ীটার সদর দরজায় 'আলেয়া' লিখা ছিল। পরে জেনেছি ওটা লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমের আত্মীয় ডাঃ খালেকের বাড়ী। ওখান থেকে আমাকে নিয়ে গেল ঢাকা হোটেলে। স্টুয়ার্ড মুজিবর ও সুলতান উদ্দিন আমার সাথে হোটেলে উঠলেন।

পরদিন হোটেল থেকে উক্ত জীপে ধানমণ্ডির উক্ত বাড়ীতে গেলাম। সেদিন আমরা চারজন বেলা তিনটের সময় শেখ মুজিবুর রহমানের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। শেখ সাহেব আমাদেরকে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। উক্ত বৈঠকে রুহুল কুদ্দুস সি. এস. পি.-ও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে মোয়াজ্জেম হোসেন বললেনঃ 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' গঠনের জন্য শেখ সাহেব যে ডাক দিয়েছিলেন তাতে বিশেষ সাড়া জেগেছে। সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠেছে। কিন্তু আরও অর্থ ও অস্ত্রের প্রয়োজন।

উক্ত বৈঠকে শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, আমি যতদূর পারি ভারত থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় রয়েছি। আপাততঃ আপনা-দিগকে কয়েকটি কিস্তিতে ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা দিচ্ছি। প্রয়োজন

হলে টাকাটা আপনারা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। আপনারা সশস্ত্র বাহিনী গঠনের কাজ চালিয়ে যান, টাকার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই।

বৈঠক শেষ হওয়ার পর ঢাকা হোটেলে ফিরে আসি। পরদিন লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন করাচী চলে যান। ১লা সেপ্টেম্বর খরচের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব আমার হাতে সাতশ' টাকা দেন।

৯ই সেপ্টেম্বর মুজিবুর সাহেবের বাসায় যাই। সেদিন তিনি আমার হাতে ৪ হাজার টাকা দিলেন। হোটেলের খরচ বাবদ কিছু টাকা স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং সুলতান উদ্দিন আহমদের হাতে দিই। কিছুদিন পর ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়। চলে আসি করাচী। করাচীতে এসে সব টাকা মোয়াজ্জেম হোসেনের হাতে তুলে দেই। নভেম্বর মাসে করাচীতে কে. জি. আহমদ এবং ফজলুর রহমান সি. এস. পি. সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়। সেখানে মোয়াজ্জেমের বাড়ীতে দু'টো বৈঠক বসেছিল। উক্ত সভায় প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে আলোচনাক্রমে মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, অভ্যুত্থানের গতি দ্রুত করার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সামাদকে ঢাকায় পাঠাবেন।

উক্ত সভায় মোয়াজ্জেম হোসেন বললেনঃ 'আমাদের ট্রানজিস্টার ট্রান্সমিটার প্রয়োজন।' একথা শোনার পর ফজলুর রহমান সাহেব জানালেন, "লণ্ডন থেকে ট্রান্সমিটার আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাঁর ছোট ভাই লণ্ডনে পড়াশোনা করছে। এসব জিনিস সে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।'

উক্ত সভার দু'তিন দিন পরে 'ইলাকো হাউজে' বৈঠক বসে। সেখানে মোয়াজ্জেম হোসেন জানালেন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান এবং সুলতান উদ্দিনের প্রচেষ্টায় পূর্ব বাংলায় আন্দোলনের গতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তাঁদের পার্টির সদস্যসংখ্যা তিন হাজারের বেশী হয়ে গেছে।

আমীর হোসেন আদালতে জানালেন, '৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার উদ্দেশ্যে আমি করাচী ত্যাগ করি। ঢাকায় এসে 'হোটেল আরজু'তে উঠি।'

এ সময় মঞ্জুর কাদির একটি চিঠি সাক্ষীর হাতে দিয়ে বললেন, 'চিঠিটি কে কাকে লিখেছে ?'

আমীর হোসেন জবাবে বললেন, 'এই পত্রে 'আলো' লিখছে 'উল্কা'র কাছে অর্থাৎ লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন চিঠি লিখছেন আমার কাছে।'

তারপর সরকার পক্ষের কৌঁসুলী চিঠিতে বর্ণিত কতকগুলি সাংকেতিক শব্দের উত্তর ব্যাখ্যা করতে বলেন ঃ

'চিঠিতে 'কনট্রাক্টরী ব্যবস্থার' কথা উল্লেখ রয়েছে, তা' দিয়ে কি অর্থ প্রকাশ করে?'

'সেটা আন্দোলন।'

'মায়ের অসুখের অর্থ কী?'

'পূর্ব পাকিস্তানের অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এরপর মঞ্জুর কাদির চিঠিতে উল্লেখিত 'ডাক্তার কে? আর ওষুধপত্রই বা কী?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে আমীর হোসেন জবাবে বলেন ঃ 'ডাক্তার শেখ মুজিবুর রহমান এবং ওষুধপত্র বলতে অস্ত্রশস্ত্রকে বুঝানো হয়েছে।' মঞ্জুর কাদির তার পরের ঘটনা বর্ণনা করার নির্দেশ দিলে আমীর হোসেন তাঁর জাবানীতে বলেন ঃ

"১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের নিকট থেকে একটা নির্দেশ পাই। সে নির্দেশে বলা হয়েছে, এক্স কর্পোরাল সামাদকে আহমদ ফজলুর রহমানের কাছে নিয়ে গিয়ে যেন তাঁর চাকুরীর একটা ব্যবস্থা করি। আহমদ ফজলুর রহমান তাঁকে ধানমণ্ডিস্থ 'গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্প'-এ ম্যানেজারের একটি চাকরী দিলেন। কিন্তু পেট্রোল পাম্পের মালিক ছিলেন মিসেস ফজলুর রহমান। সেখানে সামাদের নিয়োগের উদ্দেশ্য হ'ল ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারী এবং আহমদ ফজলুর রহমানের মধ্যে যোগাযোগের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা।

মার্চ মাসেই মহাখালী এয়ার পোর্টের নিকটে এক গোপন স্থানে এক বৈঠক ডাকা হয়। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, কর্পোরাল সামাদ, সুবেদার আশরাফ আলী খান, ই. পি. আর. টি. সি-র ক্লার্ক মুজিবর রহমান। ই. পি. আর. টি. সি-র সিকিউরিটি অফিসার রাজ্জাক, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কম্পাউণ্ডার ইউসুফ, এডুকেশনাল ইন্সট্রাক্টর, ফ্লাইট সার্জেন্ট হক নওয়াজ, সার্জেন্ট মিয়া ও জি. টি. জেড. এ. চৌধুরী।

মঞ্জুর কাদির তাঁদের সনাক্ত করার নির্দেশ দিলে তাঁদের তিনি সনাক্ত করেন। তিনি বলেন, 'এই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করা।'

এরপর বারই মার্চ মোয়াজ্জেম হোসেন ঢাকায় ফিরে এলে সেদিন সন্ধ্যেবেলা তাজউদ্দিন সাহেবের বাসায় এক বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত বৈঠকে কি বিষয় আলোচিত হয়েছিল এই প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আমীর হোসেন বলেন : লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের ভাষণে তিনি জানান যে, সামরিক ও বেসামরিক বহু লোককে তাঁদের দলে টানা হয়েছে। ভারতের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেলেই আন্দোলন গড়ে উঠবে। শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, শীঘ্রই হাবিলদার দলিল উদ্দিন এবং জয়দেবপুর থেকে একজন ক্যাপ্টেনকে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে ভারতে পাঠানো হবে।

জনাব তাজউদ্দিন উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা, বাদীপক্ষের কৌঁসুলী একথা জিজ্ঞেস করলে আমীর হোসেন 'না' উত্তর দেন।

তারপর বিবাদী পক্ষের খ্যাতনামা ব্রিটিশ আইনজীবী টমাস উইলিয়াম আমীর হোসেনকে জেরা করতে শুরু করেন।

'মিয়া সাহেব, আপনি বিয়ে করেছেন?'

'জী হ্যাঁ।'

'ছেলে-পুলে কয়টি?'

'ছেলেপুলে হয় নি।'

'করাচীতে আপনি কোথায় থাকতেন?'

'জাহাঙ্গীর রোডে।'

'ঢাকায় আসার পর কোথায় ছিলেন?'

'১৯৬৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমি 'ঢাকা হোটেলে' ছিলাম। পরে হোটেল 'আরজু'-তে গিয়েছিলাম।'

'আরজু হোটেল থেকে উঠে কোথায় গিয়েছিলেন?'

'১০৭ দীননাথ সেন রোডে—ভাড়া বাড়ীতে গিয়ে উঠি।'

'বাড়ীর মালিকের নাম কি?'

'এ্যাসিসট্যান্ট সেসন জজ হারুন-অর-রশীদ'

'আগে তাকে চিনতেন?'

'না।'

'আপনি দলের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেন কবে?'

'১৯৬৬ সালের এপ্রিলের শেষে অথবা মে-এর প্রথম সপ্তাহে।'

মিস্টার উইলিয়ম একটু পরিষ্কার ভাষায় বলেনঃ 'তার মানে, দীননাথ সেন রোডের বাসায় ওঠার কিছুদিন পরেই।'

'হ্যাঁ।'

'দল ছাড়ায় লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম আপনাকে ভয় দেখান নি?'

'দেখিয়েছিলেন।'

'কোন ক্ষতি করেছিলেন কী?'

'না।'

তারপর মিস্টার উইলিয়াম PW 3/59 চিহ্নিত একটি দলিল দেখিয়ে বললেন, 'এটা আপনি চিনতে পারেন কি? নিশ্চয়ই পারছেন? আপনাকে করাচীতে ডেকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু কেন?'

আমীর হোসেন এ সওয়ালের জবাবে বলেনঃ 'জানি না।'

'আপনি কখন গ্রেফতার হয়েছিলেন?'

'ওই বছরই ১৩ই ডিসেম্বর ঢাকা এয়ারপোর্টে নামতেই দু'জন সাদা পোশাক পরা পুলিশ আমাকে ধরে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে গেল।'

'আপনি যে গ্রেফতার হবেন সেটা কি আগে থেকেই জানতেন?'

'না। তারপর সেন্ট্রাল জেল থেকে রাজারবাগে তিন চার ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।'

টমাস উইলিয়ম গলার স্বরটা একটু নীচে নামিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'মিয়া সাব. অত্যাচার হয় নি. কেবল চার ঘন্টা ধরে জেরার ফলেই কি আপনি বন্ধুদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন?'

আমির হোসেন একটু উষ্ণভাবে বলে উঠলেন, 'বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নই উঠতে পারে না।'

'কোন পুলিশ অফিসার আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?'

'ডি. এস. পি. মান্নাফ ও আর দু' একজন।'

'ডাইরী দু'টো আনার চিরকুট কার হাতে দিয়েছিলেন ?'

'মান্নাফ সাহেবের হাতেই।'

'পরে যে চিঠিগুলো দাখিল করেছিলেন সে সময় চিঠিগুলোর কথা বলেন নি কেন ?'

'মনে ছিল না।'

'চিঠিগুলো আপনি নষ্ট না ক'রে রেখে দিয়েছিলেন কেন ?'

আমীর হোসেন বেশ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, 'বুড়ো বয়সে আত্মজীবনী লিখব বলে।'

'চিঠি ও ডাইরীগুলো পুলিশের হাতে পড়লে বিপদের আশঙ্কা—এ জেনেও আত্মজীবনী লিখবেন বলে রেখে দিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

টমাস সাহেব একটু হেসে বললেন ঃ 'মিয়া সাহেবের দেখি জীবনী লিখার খুবই সখ !'

টমাস সাহেবের এই বিদ্রূপাত্মক কথায় দর্শকের গ্যালারী থেকে মৃদু হাস্যের গুঞ্জন উঠেছিল। এ সময় মিঃ টমাস একটি টেলিগ্রাম দেখিয়ে বললেন ঃ '১৯৬৫ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কি আপনি ঢাকায় এসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম সাহেবের নির্দেশমত ২৮শে আগস্ট আমি মিটিং-এ যোগ দেবার জন্য ঢাকায় আসি।'

'আপনি কি সে সময় করাচী অফিসে টেলিগ্রাম করেছিলেন, 'পি. আই.এ-র ফ্লাইট বন্ধ, পরামর্শ চাই।'

'হ্যাঁ, লিখেছিলাম। ভারতের সাথে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় ফ্লাইট বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছিল।'

আমীর হোসেনের হাতে টেলিগ্রামটি দিয়ে টমাস উইলিয়ম ঠিকানাটা জোরে জোরে পড়ার নির্দেশ দিলে সাক্ষী তা' জোরে জোরে পড়লেন, '১০৭, ডি. এন. সেন রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা-৪।'

'পোস্ট-অফিসের স্ট্যাম্পের তারিখ কত ?'

একটু বিব্রত হয়ে আমীর হোসেন বললেন ঃ '১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।'

সাক্ষীর এই জবাবের পর টমাস উইলিয়ম বললেন ঃ 'আপনি বলেছেন,

১৯৬৬ সালের এপ্রিলে ওই বাসায় যান এবং বাড়ীর মালিককে আগে থেকে চিনতেন না—ব্যাপার কী?'

ধরা পড়ে গিয়ে আমীর হোসেন চুপ থাকেন। দর্শকদের গ্যালারীতে আবার গুঞ্জন ওঠে। টমাস উইলিয়ম এবার জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনাকে তো ভারত, আমেরিকা ও চীনের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ ক'রে সাহায্য চাইতে বলা হয়েছিল? আপনি যোগাযোগ করেছিলেন কি?'

'আমি নিজে যোগাযোগ করি নি। তবে ১৯৬৫ সালের জুন-জুলাই মাসে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন করাচীস্থ মার্কিন দূতাবাসের এ্যাসিস্ট্যান্ট নৌ-এ্যাটাচি মিঃ নোবল-এর বাসায় আমায় নিয়ে যান। সেখানে তিনিই আমাদের পরিকল্পনার কথা বলেন।'

'মোয়াজ্জেম সাহেব তো নিজেই যোগাযোগ করতে পারতেন—আপনাকে ভার দিয়েছিলেন কেন?'

'জানি না। যাঁরা ভার দিয়েছিলেন তাঁদের জিজ্ঞেস করুন।'

টমাস উইলিয়ম একটু রসিকতা ক'রে বললেন: 'ও, তাই নাকি!'

এরপর বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী আবদুস সালাম খান উঠে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনার গায়ের শার্টটা কি আপনার নিজের কেনা?'

আমীর হোসেন বেশ রাগান্বিত হয়েই উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

'কিসের কোর্ট? কত দাম?'

'টেট্রনের। দাম ২২ টাকা।'

'আচ্ছা মিয়া সাব, আপনার জুতো জোড়াও কি কেনা?'

এ প্রশ্ন শুনে সাক্ষী ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠলেন, 'রাবিশ। আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।'

সালাম খান জেদ ক'রেই বললেন: 'প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতেই হবে।'

আমীর হোসেন রাগে চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন, 'না, দেবো না।'

তাঁর এ আচরণের জন্য তাঁকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল।

... ...

তারপর সালাম খান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: 'কে. জি. আহমদ কি আপনার দলের সদস্য ছিলেন?'

'না।'

'ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলেছিলেন কে. জি. আহমদ দলের সদস্য ছিলেন, এখন আবার বলছেন না—দু'রকম কথা কেন?'

সাক্ষী নিরুত্তর।

'১৯৬৫ সালের আগস্টের শেষে কতোদিন আপনি ঢাকায় ছিলেন?'

'২৬ দিন। ঢাকা হোটেলে ছিলাম।'

'ঢাকা হোটেলের রেজিস্টারে আপনার নাম কি লিখা ছিল?'

'নিজের নামে ছিলাম না, আবদুর রহিম নামে থাকতাম।'

'সে সময় (১৯৬৫ সালের আগস্ট) ঢাকার এসে লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেমের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল কি?'

'হ্যাঁ, ২৯শে আগস্ট ধানমণ্ডির 'আলেয়া'তে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়।'

'যুদ্ধের সময় লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন কোথায় ছিলেন?'

'করাচীর নৌ-বাহিনীর সদর দফতরে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করতেন।'

'করাচীর নৌ-বাহিনীর সদর দফতরটি কোথায়?'

'জানি না।'

'সমুদ্রবক্ষে কি... ... ?'

'আমি জানি না।'

'আপনি যখন ঢাকায় এসেছিলেন, যুদ্ধটা তখনি হয়েছিল, তা' হ'লে মোয়াজ্জেম সাহেব ঢাকায় এলেন কি ক'রে?'

আমীর হোসেন নিরুত্তর থাকেন।

'বিপ্লবের জন্য আপনারা কি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন?'

'আমি থাকা পর্যন্ত কিছুই হ'তে দেখি নি।'

'আপনাদের দলে নতুন লোক নিলে আপনি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। শপথের বয়ানটি কি ছিল?'

আমতা আমতা ক'রে সাক্ষী জবাব দিল: 'পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের

স্বাধীনতা চাই... ...পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে—এসব আর কি?'

'এর অর্থ হচ্ছে, আপনি আর জানেন না।'

'না, আরও আছে।'

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান সেগুলো বলার জন্য সাক্ষীকে নির্দেশ দিলে সাক্ষী আমীর হোসেন হতচকিত হয়ে থেমে থেমে বলতে শুরু করলো: 'পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হচ্ছে ... ...পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানে বেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে... ...এসব আর কি!'

সালাম খান উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'শুধু এই?'

'হ্যাঁ স্যার।'

... ...

আপনাকে ভারত, চীন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের ভার দেয়া হয়েছিল। সবুর খানের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল—সি. এস. পি. অফিসারদের দলে টানতে বলা হয়েছিল—কোন কাজই তো করেন নি। তারপরও দলের নেতারা আপনার উপর আস্থা রেখেছিল? সমস্ত গোপন কথাই কি আপনাকে জানানো তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য? যেখানে যত গোপন বৈঠক বসেছে, প্রত্যেকটিতেই আপনি রয়েছেন—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?'

'আপনাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর আমার হাত নেই।'

সেদিনের মত আদালতের অধিবেশন মুলতবী থাকে।

চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ডাঃ সাইদুর রহমানের সওয়াল-জবাবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিক কলহন তাঁর 'জয়বাংলা-মুক্তিফৌজ ও শেখ মুজিব' গ্রন্থে (পৃঃ ২২৩-২৩৮) এ প্রসঙ্গে যা বর্ণনা করেছেন তা' সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে তুলে ধরা হ'ল:

ডাঃ সাইদুর রহমানের জবানবন্দী

প্রধান কৌঁসুলী মঞ্জুর কাদিরের প্রশ্নের উত্তরে সাইদুর রহমান বলেন: '১৯৬৬ সালের জুন মাসে ১৫ দিন অন্তর আমার বাসায় দু'টো গোপন বৈঠক বসে। প্রথম বৈঠকটিতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে

লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন, সুলতান উদ্দিন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও খুরশিদ। দ্বিতীয় বৈঠকটিতেও তাঁরা ছিলেন। উক্ত বৈঠক দুটোতে পার্টির সদস্যদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান সেদিন দলীয় কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করেন। উক্ত রিপোর্টে তিনি কোথায় কোথায় নতুন লোক নিয়োগ করেছেন, সামরিক ব্যক্তিদের সাথে তাঁর যোগাযোগ কেমন হয়েছে ইত্যাদি বিষয় তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন। অর্থসংক্রান্ত বিষয় নিয়েও সেখানে আলোচনা চলে। তবে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির আর কোন উপায় নাই।

বোধ হয় জুলাই মাসে মোয়াজ্জেম হোসেন একটি অস্ত্রতালিকা দিয়ে আমাকে ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী পি.এন. ওঝার সাথে দেখা করতে বলেন। তালিকাটি মানিক চৌধুরীর দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু ২১ তারিখে তিনি পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি এর পূর্বে আমাকেসহ দু' একবার পি. এন. ওঝার সাথে দেখা করেছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৮ই মে তারিখে গ্রেফতার হন। সে সময় আওয়ামী লীগের জরুরী বৈঠক বসে। বৈঠকে যোগদানের জন্যই আমি আর মানিক চৌধুরী ঢাকা গিয়েছিলাম। সে সময় মানিক চৌধুরী ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন অফিসে মিস্টার ওঝার সাথে আমার আলাপ করিয়ে দেন। কিন্তু জুলাই মাসে অস্ত্রতালিকাটি আমি মিস্টার ওঝার হাতে দিতে সাহস পাই নি। কারণ শেখ সাহেবের ৬-দফাকে ভিত্তি ক'রে তখন আওয়ামী লীগের কর্মীদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছিল। জুলাই-এর শেষদিকে মিস্টার ওঝা চট্টগ্রামের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হন। সেদিন মানিক চৌধুরীর খোঁজ-খবর নেন এবং পরদিন সন্ধ্যায় রেলওয়ে রিফ্রেশমেন্ট রুমে তালিকাটি দিয়ে আসতে বলেন। তাঁর নির্দেশমত পরদিন সন্ধ্যায় আমি তালিকাটি মিস্টার ওঝার কাছে পৌঁছে দিই।

মিস্টার ওঝা আমাকে নির্দেশ দিলেন যে ঢাকায় গিয়ে কোন পাবলিক ফোনে সকাল ১০টা নাগাদ তাঁর সাথে যেন আমি কথা বলি। তিনি ফোনে

আলাপের ব্যাপারে বললেন, 'আমি সাঈদ বলছি। ভিসার বিষয়ে মিস্টার ওঝার সাথে আলাপ করতে চাই। যেই ফোন ধরুক, বুঝে নেবে।' —এইভাবে নির্দেশ দিলেন।

আগস্টের প্রথম দিকে আমি মোয়াজ্জেম হোসেনসহ তাঁর গাড়ীতে ঢাকায় আসি। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানও আমাদের সাথে ছিলেন। মিস্টার ওঝার নির্দেশমাফিক সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে তাঁর সাথে একত্রিত হবার দিন ও স্থান ঠিক ক'রে নিই। ঢাকা আসার পথে মোয়াজ্জেম হোসেন ক্যাপ্টেন এস. আলমের বাড়ীতে যান এবং সেখানে আমার সাথে মিঃ আলমের পরিচয় ঘটে। ঢাকায় এসে আমি গ্রীন হোটেলে উঠি আর মোয়াজ্জেম হোসেন এবং স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ধানমণ্ডিতে তাঁর আত্মীয় ডাঃ খালেকের বাসায় ওঠেন।

মিঃ ওঝার সাথে আলোচনা করার পর আমরা 'সাকুরা'র সামনে অপেক্ষা করি। তিনি একটি গাড়ীতে সেখান থেকে আমাদের তুলে নিয়ে ধানমণ্ডির এক বাসায় ওঠেন। অস্ত্রের তালিকা নিয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের সাথে মিস্টার ওঝার আলোচনা হয়। তিনি আমাদেরকে জানান যে, অস্ত্রের ব্যাপারে ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ করলে তিনি তাঁর অক্ষমতার কথা বলেন। তবে অস্ত্রের বিষয়ে মাসখানেক পরে তাঁর সাথে যোগাযোগের কথা বলেন। আমাদেরকে দ্বিতীয় রাজধানীর নিকটে নামিয়ে তিনি চলে যান।

মিস্টার ওঝার নির্দেশমত সেপ্টেম্বরের দিকে পাবলিক টেলিফোনে তাঁর সাথে আলাপ করি। তিনি রাত ন'টায় সেরিমনিয়াল আর্চ-এর সামনে অপেক্ষা করতে বলেন। যথাসময়ে আমাদের দু'জনকে (আমি ও মোয়াজ্জেম হোসেন) গাড়ীতে তুলে নিজ বাসার দিকে চলে গেলেন। তিনি আমাদের বললেন যে, ভারত সরকার অস্ত্র সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছেন ; কিন্তু নির্বাচন উপলক্ষে তাঁরা সকলেই ব্যস্ত, তাই অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হবে।

একটু থেমে ডাঃ সাইদুর রহমান আবার বলতে শুরু করলেন ঃ মানিক চৌধুরী জেল থেকে ছাড়া পেলেন ১৯৬৭ সালের জানুয়ারীতে।

মোয়াজ্জেম সাহেব তখন চট্টগ্রামে। একদিন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমার বাসায় গিয়ে জানালেন আমি যেন মানিককে নিয়ে শিগগীর ঢাকায় গিয়ে মিঃ ওঝার সাথে অস্ত্রের বিষয়টা ঠিক ক'রে ফেলি। আমি ৮ই মার্চ ঢাকা এসে গ্রীন হোটেলে উঠি। পরদিন মানিক চৌধুরী আসেন এবং আমার সাথেই উক্ত হোটেলে থাকেন। মিঃ ওঝা ১০ই মার্চ রাত্র ন'টার দিকে সেরিমনিয়াল আর্চের নিকট থেকে আমাদেরকে তাঁর গাড়ীতে ক'রে তাঁর বাসায় নিয়ে যান। মোয়াজ্জেম সাহেব তখন ঢাকায় ছিলেন এবং তিনিও আমাদের সাথে ছিলেন। সেখানে মিঃ ওঝা জানালেন যে, শ্রীমতি ইন্দিরা দেবী'র প্রধান মন্ত্রিত্বের নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মানিক চৌধুরীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সেদিন পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। তিনি তো প্রথমে টাকা সাহায্য দিতে অসম্মত হয়েছিলেন, পরে আবার সম্মত হয়েছিলেন কেন সেটা আমি জানি না।

শ্রীমতি ইন্দিরা দেবী প্রধান মন্ত্রীর পদে আবার অধিষ্ঠিত হয়েছেন, —এরপর ৩১শে মার্চ মিঃ ওঝার সাথে দেখা করি। তিনি জানালেন যে, তাঁদের সরকার স্বাধীন 'পূর্ব বাংলা' গঠনের জন্য অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন। কথা পাকাপাকি করার জন্য ভারতের কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী ও সামরিক অফিসারের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হতে হবে। এই বৈঠক আগরতলায় বসবে।

আগরতলা বৈঠকে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান ও আলী রেজাও গিয়েছিলেন। আমি স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কাছ থেকে পরে জেনেছিলাম, আগরতলা বৈঠক সফল হয়েছে। মিঃ ওঝা পূর্বের পাঁচ হাজার টাকা ছাড়া আরও দশ হাজার টাকা মানিক চৌধুরীকে দিয়েছিলেন। এ খবর আমি পরে মানিক চৌধুরীর কাছ থেকে পাই। সব টাকাই লেঃ মোয়াজ্জেম সাহেবকে দেওয়া হয়।

বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী খানবাহাদুর নাজির উদ্দীন সাহেবের এক প্রশ্নের জবাবে ডাঃ সাইদুর রহমান বলেন যে, ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে তাঁর চট্টগ্রামের বাসা থেকে রাত দুটোয় গ্রেফতার ক'রে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়—সেখান থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। তারপর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়।

সে সময় সালাম খান বলে ওঠেনঃ আটক থাকাকালীন স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারীর কাছে লিখিত এক দরখাস্তে আপনি বলেছেন যে, আই-জি স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নিয়ে গিয়ে আপনাকে এক কুঠরীতে আটক রাখা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আপনাকে চেয়ারের হাতল দিয়ে মারে—চড়, ঘুষি ইত্যাদি মেরে আপনার দেহের নানা জায়গা জখম ক'রে দেয়। জ্ঞান থাকা পর্যন্ত এ ধরনের অমানুষিক অত্যাচার চলতে থাকে। তিন দিন ধরে এরূপ নির্যাতন চলতে থাকে এবং পরে জোর ক'রে ডিক্‌টেশন দিয়ে স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেয়।

এ প্রশ্নের জবাবে সাইদুর রহমান বলেনঃ 'দরখাস্ত আমি ঠিকই লিখেছি, তবে আপনার কথা সত্য নয়।'

সালাম খান দরখাস্তের এক কপি সাক্ষীর হাতে দিয়ে জোর ক'রে পড়ে শোনাতে বললেন।

সাক্ষী সাইদুর রহমান অপারগতার কথা ঘোষণা করলে ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বলে উঠলেনঃ 'না, না, আপনি এক্ষুনি পড়ুন।'

ডাঃ সাইদুর রহমান অনিচ্ছা সত্ত্বেও জায়গা-জায়গা বাদ দিয়ে দরখাস্ত-খানি পড়ে শেষ ক'রে বললেন, 'যা লিখা হয়েছে, তা' সত্য নয়।'

সরকারী কৌঁসুলীর নির্দেশক্রমে তিনি মানিক চৌধুরী, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, খুরশিদ, সুলতান উদ্দিন আহমদ এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে সঠিকভাবে সনাক্ত করলেন।

তারপর আবদুস সালাম খান, বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী, উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আওয়ামী লীগে কতদিন থেকে আছেন?'

'প্রায় সৃষ্টির পর থেকেই।'

'মুজিবুর রহমানের ৬-দফা সম্বলিত পুস্তিকা কি আপনি পাঠ করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি জনসাধারণের মধ্যে সেগুলো প্রচার করেছিলেন?'

'করেছি।'

'আপনার নিশ্চয় মনে আছে, ৬-দফার মূল কথা ছিল, পূর্ব পাকি-স্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করা।'

'হ্যাঁ।'

'আশা করি আপনি ভালভাবেই জানেন যে, ৬-দফার ২ দফায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দেশিত হয়েছে। উক্ত ২-দফায় দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। অবশিষ্ট ক্ষমতা-সমূহ স্টেট বা প্রদেশের হাতে থাকবে। এই দফায় আরো বলা হয় যে, দুটো পৃথক অথচ অবাধ বিনিময় মুদ্রা চালু কিংবা বর্তমানের মতোই দুটো প্রদেশে একই মুদ্রা চালু থাকতে পারে। তবে শাসনতন্ত্রে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মুদ্রা পাচার হতে না পারে। এজন্য পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠন করতে হবে।

'হ্যাঁ, এসব আমি পড়েছি।'

'পঞ্চম দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অঙ্গরাজ্যগুলোই সমান-ভাবে মিটাবে এবং আরও বলা হয়েছে যে, দেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদি চলাচলে কোন রকম বাধানিষেধ থাকবে না।

কৌঁসুলীর এই কথায় সাক্ষী সম্মতি জানাল।

সালাম খান আরও জিজ্ঞাসা করলেনঃ '৬ষ্ঠ দফায় যে আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর কথা বলা হয়েছে তাতে আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্যই যে পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী গঠনের প্রয়োজন, তা' ঠিক নয় কি?'

'হ্যাঁ।'

'১৯৬৫ সালে লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান এই ৬-দফা ঘোষণা করেছিলেন—আপনি কি তা' জানেন?'

'আমার ঠিক স্মরণ নেই।'

৬-দফা প্রকাশের পর প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এই আন্দো-লনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করেন—এই আন্দোলনের ফলে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং তা' দমনের জন্য অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন হবে—এ সমস্ত কথা কি আপনি জানেন?'

'আমার মনে নেই।'

'আপনি জানেন কি, ৬-দফা ঘোষণার পর বহু আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়?'

'হ্যাঁ। ১৯৬৬ সালের মে মাসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।'

'শেখ সাহেব ৬-দফার ব্যাখ্যা বহু জায়গায় বক্তৃতা দানকালে করেছিলেন —আপনি কি তা' জানেন?'

'চট্টগ্রামের এক জনসভায় তিনি ৬-দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা দান করেন। কিন্তু অন্য জায়গার কথা আমি জানি না।'

'১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দাবী তুলেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান—সে খবর কি আপনি রাখেন?'

'জী, হ্যাঁ।'

'চট্টগ্রামে নৌ-বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন, পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারী একাডেমী এবং অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী স্থাপনেরও দাবী তুলেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান—আপনি কি তা' জানেন?'

'হ্যাঁ।'

'দাবীগুলো কি মেনে নেওয়া হয়েছিল?'

'না, তবে জয়দেবপুরে নাকি অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী তৈরী হচ্ছে—এ খবর শুনেছি।'

'সমুদ্রের পানি থেকে যে লবণ মানুষ তৈরী করে—তার উপর কেন্দ্রীয় সরকার শুল্ক বসিয়েছেন—তাকি আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ।'

আপনার কি মনে হয়—পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লবণ আমদানী যাতে ব্যাহত না হয়—তাই এ শুল্ক বসানো হয়েছে?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না।'

এ সময় সরকার পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী উঠে বললেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়ে এসব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক।

সালাম খান মুচ্‌কি হেসে বললেনঃ 'এসব প্রশ্ন যথার্থ প্রাসঙ্গিক, তাই প্রমাণ করছি।

ট্রাইব্যুনালের বিচারপতির নির্দেশে সালাম খান আবার সাক্ষীকে জেরা করতে শুরু করেন।

'চাকুরীর ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্যের দাবী এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—আপনার কি মনে হয়?'

'আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

'ভারতীয় হাই কমিশনের মিস্টার ওঝার সাথে আপনাদের যে ষড়যন্ত্র তা' সম্পূর্ণভাবে কল্পিত এবং এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সংখ্যাসাম্যের দাবীকে বানচাল করার জন্যই এই কাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে—আপনার কি মত?'

'আমি যা বলেছি তাই সত্য।'

'মানিক চৌধুরী আপনাকে নাকি বলেছিলেনঃ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হবে—আপনার কি বিশ্বাস হয়, প্রতিষ্ঠিত সরকারের হাত থেকে শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতাচ্যুত করা কি সম্ভব?'

'মানিক চৌধুরীই আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কর্মচারীরা বিদ্রোহ করবে এবং সমস্ত সামরিক ছাউনি দখল ক'রে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হ'তে বিচ্ছিন্ন করবে।'

'আচ্ছা বলুন তো পূর্ব পাকিস্তানী কত জন সেনাবাহিনীতে কাজ করেন?'

'আমি জানি না।'

'আপনি নিশ্চয় জানেন যে, সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীরা কাজ করে শতকরা ৪ জন এবং প্রতি ৯০ জন অফিসারে একজনও পূর্ব পাকিস্তানী না?'

'আমি ঠিক জানি না।'

সওয়ালের মোড় ঘুরিয়ে সালাম খান সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেনঃ

'ঢাকায় এসে আপনি কি 'আরজু হোটেল'-এ উঠেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সেখানে কয়দিন ছিলেন?'

'তিন দিন।'

'হোটেল রেজিস্টারে আপনি নাম এনট্রি করেছিলেন?'

'করেছিলাম।'

'আপনি কবে ঢাকায় এসেছিলেন?'

'১৯৬৬ সালের ১৯শে মে।'

সালাম খান হোটেলের রেজিস্টারটি নিয়ে সাক্ষীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'আপনার নাম কোথায় এনট্রি করা রয়েছে একটু দেখিয়ে দিন?'

ডাঃ সাইদুর রহমান রেজিস্টারখানা নিয়ে অনেক খোঁজার ভান ক'রে বললেন, 'আমার নাম এখানে দেখতে পাচ্ছি না।'

আপনি লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে নিয়ে যে গাড়ীতে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছিলেন মিস্টার ওঝার সাথে দেখা করতে—সেই গাড়ীটি কি দুই দরজাওয়ালা অথবা চার দরজাওয়ালা?'

'আমার মনে নেই।'

'আপনি বললেন যে গাড়ীটি ছিলো হিলম্যান।'

'হবেও বা।'

'আপনি জানেন না হিলম্যান গাড়ির কয়টি দরজা?'

'না।'

'সেবার গ্রীন হোটেলে উঠে কি নাম এন্ট্রি করেছিলেন?'

'জানি না।'

আমি বলছি, '১৯৬৬ সালের ১৯শে মে মোটেই আপনি ঢাকায় আসেন নি বা গ্রীন হোটেলে ওঠেন নি।'

'তা' সত্য নয়।'

'তাহ'লে হোটেল রেজিস্টারে নাম এন্ট্রি করা নেই কেন?'

'মিঃ ওঝার সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলাম বলে হোটেলে নাম রেজেস্ট্রি করি নি।'

'কিন্তু ১৯৬৭ সালে ৮ই মার্চ মিঃ ওঝার সাথে যখন গোপনে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তখন তো নাম রেজিস্ট্রি করিয়েছিলেন?'

সাক্ষী নিরুত্তর থাকেন।

'হোটেল সাকুরার নিকটেই সেরিমনিয়াল আর্চ থেকে কোন্ পথে মিঃ ওঝার বাড়িতে যেতে হয়?

'আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

'চট্টগ্রামের লালদীঘির ময়দানে সভাশেষে শেখ মুজিবুর রহমান কি আপনার বাসায় উঠেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর সাথে আর কে কে ছিল?'

'মানিক চৌধুরী।'

'আপনার বাড়িতে সে সময় আর কেউ ছিলেন?'

'না।'

'মানিক চৌধুরী আর মুজিবুর রহমান ফিরেছিলেন কিসে?'

'মানিক চৌধুরীর কারে।'

'আমি জানি, মানিক চৌধুরীর কোন কার নেই।'

'আছে। আমি বহুবার সে কারে ঘুরেছি।'

'গাড়ির নাম কী?'

'মনে নেই।'

'তার নম্বর কতো?'

'তাও মনে নেই।'

'আমি হলপ ক'রে বলতে পারি, শেখ মুজিবকে এই ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানোর জন্যই একথা বলছেন। শেখ সাহেব আপনার বাসায় ওঠেন নি।'

'না, একথা ঠিক নয়।'

... ...

'১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে আপনি কি ঢাকায় এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ। আগস্টের ২৯ বা ৩০ তারিখে আমি ঢাকায় এসে 'গ্রীন হোটেল'-এ উঠেছিলাম। মানিক চৌধুরী আমার সাথেই ছিলেন।'

'মানিক চৌধুরী কি গ্রীন হোটেলেই উঠেছিলেন?'

"না, তিনি উঠেছিলেন 'হোটেল ক্যাসেরিনায়'।"

সালাম খান ক্যাসেরিনা হোটেলের রেজিস্টারখানা ডাঃ সাইদুর রহমানের হাতে দিয়ে মানিক চৌধুরীর নাম খুঁজে বের করতে বললেন। তিনি মানিক চৌধুরীর নাম খুঁজে পেলেন না।

'আপনি জবানবন্দীতে বলেছেন যে, আপনি আর মানিক চৌধুরী একই হোটেলে অর্থাৎ গ্রীন হোটেলে উঠেছিলেন?'

'না, তা' ঠিক নয়।'

আবদুস সালাম খান আর প্রশ্ন না ক'রে বসে পড়লেন। তারপর

সওয়াল করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান। তিনি সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করলেন:

'আপনি কি আওয়ামী লীগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, না, এর পেছনে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কোন উদ্দেশ্য ছিল?'

'না, আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম।'

'আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে যে সব দাবী-দাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, তাতে পূর্ব পাকিস্তানের বেশীর ভাগ লোকের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে—আপনি কি তা' বিশ্বাস করেন?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।'

.. ..

'আপনাকে রাজসাক্ষী হ'তে প্রথমে কে বলেন?'

'আমার স্বীকারোক্তি দানের পর মেজর নাসের এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি রাজসাক্ষী হতে চাই কি না।'

'আচ্ছা, বলুন তো, মিঃ ওঝার বাড়ী কী রকম?'

'দোতলা বাড়ী।'

'সেটা রাস্তার কোন্ পাশে?'

'ঠিক মনে নেই।'

'আপনি তার বাড়ীতে ক'বার গিয়েছেন?'

'বোধ হয়—দু'বার।'

'আপনারা কোথায় বসতেন?'

'দোতলার ড্রয়িং রুমে।'

'মিঃ ওঝার মাথায় কি টিকি ছিল?'

'আমি লক্ষ্য করি নি।'

... ...

আতাউর রহমান বসে পড়ার সাথে সাথেই বিবাদী পক্ষের কৌসুলী জুলমত আলী খান জিজ্ঞেস করলেন: '১৯৬৬ সালের ১৮ই মে থেকে ২২শে মে আপনি কি আপনার শ্বশুর বাড়ী সীতাকুণ্ডে ছিলেন?'

'আমি 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলতে পারছি না।'

'ঠিক আছে আপনি এখন যেতে পারেন।'

এরপর যিনি সাক্ষ্য দেন তাঁর নাম মীর্জা রমিজ। তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বললেন সাংবাদিক কল্হনের গ্রন্থ (পৃঃ ২৩৮—২৪৯) থেকে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে তুলে ধরছি ঃ

"১৯৬৬ সালের জুন-জুলাই মাসে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং নূরুজ্জামানের সঙ্গে এক সভায় 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়। উক্ত বছরেই এক গোপন সভায় কে. এম. এস. রহমান সি. এস. পি-র সাথে আলাপ হয়। তিনি তখন চিটাগাংয়ের উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। তিনি দু'একবার আমার বাসায়ও গিয়েছিলেন। এক সময় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে কি টিকতে পারবে?' তিনি দৃঢ়স্বরেই বলেছিলেন, 'হ্যাঁ', এবং তার কারণও ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় আমার ফ্লাটে এক গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন, ক্যাপ্টেন আলম, ক্যাপ্টেন হুদা, ক্যাপ্টেন মুতালেব, লীডিং সীম্যান সুলতান উদ্দিন, স্টুয়ার্ড আহমদ এবং স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় লীডিং সীম্যান সুলতান উদ্দিনকে সনাক্ত করতে বলায় সাক্ষী মীর্জা রমিজ সকলের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন এবং অবশেষে নূর মহম্মদকে দেখিয়ে বললেন, ইনি সুলতান উদ্দিন। এধারে দর্শকমণ্ডলীর ভেতরে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি উত্থিত হয়েছে। সাক্ষী রমিজ বেশ বুঝতে পেরেছেন, তাঁর সনাক্তকরণ ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে। তাঁর বিব্রত ভাবকে ঢাকার জন্য তিনি বলতে আরম্ভ করলেন ঃ লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম জানালেন, 'ভারত অর্থ সাহায্য করতে তৈরী। তবে এ আন্দোলন পরিচালনা করবে কে? কেউ কেউ মন্তব্য করলেন—সামরিক অফিসার আবার কেউ কেউ বললেন, রাজনৈতিক নেতাদের হাতেই এই আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া দরকার।' তবে উক্ত সভায় এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি। উক্ত সভায় আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম ঃ 'পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হ'লে কি অন্যান্য রাষ্ট্র আমাদের স্বীকৃতি দেবে?' কে. এম. এস. রহমান সি. এস. পি. জানালেন, এ সম্পর্কে ভারতের সাথে আলাপ হয়ে গেছে। ভারত এবং তার সমর্থক রাষ্ট্রগুলো আমাদের স্বীকৃতি দেবে। আবার আমি জিজ্ঞেস

করলাম, পরে ভারত যদি আমাদের আক্রমণ করে? আমার এই প্রশ্নের জবাবে রহমান সাহেব জানালেন, এ যুগে তা' সম্ভব নয়। কারণ আন্ত-র্জাতিক অনেক বাধানিষেধ রয়েছে। উক্ত সভায় লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ক্যাপ্টেন মুতালিবের ওপর প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ করার এবং অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং দেওয়ার দায়িত্ব দিলেন।

অক্টোবর মাসের এক বিকেলে লেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর 'মস্কোভিচ' গাড়ি ক'রে আমাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেলেন। সেখানে কর্নেল ওসমানী এবং কর্নেল শেখ-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বরিশাল থেকে ঢাকায় এসে আমার বাসায় দেখা করলেন। আমার বাসায় এক বৈঠক হ'ল। লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন বললেন, মিঃ ওঝার কাছ থেকে অনেক অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে। রুহুল কুদ্দুস ও আহমদ ফজলুর রহমান সাহেবও অর্থ সংগ্রহ করছেন। কিন্তু আরও টাকার প্রয়োজন। আমার মনে হয়, আমাদের এখন যা টাকা রয়েছে তা' দিয়ে একটি বাড়ী ভাড়া ক'রে ব্যবসা করা যায়। এতে দলের সম্পদও বাড়বে এবং দলের কর্মীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মী বলেও চালানো যাবে।

ঠিক এই মুহূর্তে বাদীপক্ষের কৌঁসুলী সাক্ষীর হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে বলেন, দেখুন তো, এই টেলিগ্রামটা চিনতে পারেন কি না? টেলি-গ্রামটির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে রমিজ সাহেব বলতে লাগলেনঃ ১৯৬৭ সালের ২৯শে মার্চ মোয়াজ্জেম হোসেন ঢাকায় আসছেন বলে এই টেলিগ্রামটি করেন। আমাকেও ঢাকায় যেতে বলেন। ঢাকায় আমার ফ্ল্যাটেই এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, সাবেক কর্পোরাল সামাদ, কে. এম. শামসুর রহমান, ক্যাপ্টেন মুতালিবও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ওয়ারলেস সেট সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা হয়। আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা দেয়া হ'ল বাড়ী ভাড়া ও ব্যবসা করার জন্য। ১৩ নং গ্রীন স্কোয়ারে একটা বাড়ী ভাড়া নিলাম, ওখানেই আমাদের গোপন সভা বসত। সেখানে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও অস্ত্র সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'তো। এ বাড়ীতে মে মাসে ছয়-সাতটি

সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বাড়ীতে বাস করতেন সুবেদার জে. ইউ. আহমদ, প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদ, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, হাবিলদার দলিল উদ্দিন এবং লুৎফর হুদা। এই বাড়ীতেই আগরতলায় ভারতীয় সামরিক অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে যোগদানের জন্য যে প্রতিনিধিদল যাবেন তাঁদের নামের তালিকা এক সভায় ঠিক করা হয়। ফেনী হয়ে আগরতলা যাওয়ার কথাবার্তা এখানেই ঠিক হয়। ফেনী থেকে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান আমাকে ট্রাঙ্ককল করেছিলেন। সেটা ছিল ১৯৬৭ সালের ১১ই জুলাই। ফেনীতে আমাকে যেতে বললেন। প্রতিনিধিদলটি ফেনীর 'ডেনোফা হোটেল'-এ উঠবেন তা' পূর্বেই ঠিক করা হয়েছিল। পি. আই. এ-র 'ডজডার্ট' নিয়ে চিটাগাং থেকে ফেনী গেলাম। ডজডার্ট টা বেশি ব্যবহার আমিই করতাম। ফেনী থেকে ফিরতে রাত হবে ভেবে পি. আই. এ-র আনোয়ার হোসেনকে সাথে নিই। বিকেল ৬ টার দিকে ফেনী পৌঁছাই। 'ডেনোফা হোটেল'-এ গিয়ে দেখলাম, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, প্রাক্তন নায়েব সুবেদার জে. ইউ. আহমদ, আলী রেজা, প্রাক্তন কর্পোরাল সামাদ, হাবিলদার দলিল উদ্দিন আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এই প্রতিনিধি দলটি ভোর চারটায় সীমান্ত অতিক্রম করবে বলে ঠিক হয়েছিল। ডজডার্ট-এ ক'রে তাঁদের আমি বেলুনিয়ায় পৌঁছে দিলাম। তাঁরা সীমান্তের অপর পারে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। যে গাড়ি দিয়ে তাঁদের পৌঁছে দিয়েছিলাম তার নম্বর কে. এ. ই. ৩১৯৪। ....

......আগরতলা বৈঠক শেষ ক'রে আলী রেজা আমার সাথে দেখা করেন। তাঁর কাছেই শুনেছি ভারতীয় এক ক্যাপ্টেন সীমান্ত থেকে গাড়ি ক'রে তাঁদের আগরতলায় নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারত সরকারের হ'য়ে প্রতি-নিধিত্ব করেছিলেন একজন কর্নেল এবং একজন মেজর। আমাদের প্রতিনিধি দল তাঁদের নিকট অস্ত্রশস্ত্রের এক তালিকা দেন। অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে ছিল মেশিনগান, সাব মেশিনগান, হাতবোমা প্রভৃতি। ভারতীয় প্রতিনিধিরা জানিয়েছিলেন, অস্ত্র সাহায্যের ব্যাপারে তাঁরা বিবেচনা করবেন এবং সে খবর তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের মারফত জানাবেন। যে দু' লক্ষ টাকা দেয়ার কথা হ'ল তাও নাকি ডেপুটি হাই কমিশনারের মাধ্যমে দেয়া হবে।

বাদী পক্ষের কৌঁসুলী মঞ্জুর কাদেরের প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন, টাকা পাওয়ার বিষয়ে আমি লেঃ মোয়াজ্জেম সাহেবকে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার কৌতূহলে বিরক্ত হন। তবে, পার্টির টাকা দিয়ে একটা হিলম্যান গাড়ি ও একটা ফিয়াট গাড়ি কিনেছিলাম। অন্যান্য কাজের জন্যও আমাকে কয়েক হাজার টাকা দেয়া হয়েছিল! তাতে মনে হয়, টাকাটা ভারত সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল।

মীর্জা রমিজ-এর জবানবন্দী শেষ হ'লে বিবাদী পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী আবদুস সালাম খান উঠে জেরা করতে শুরু করেন।

'আপনার হাতে পার্টির কাজের জন্য কত টাকা দেয়া হয়েছিল?'

'পঁচিশ হাজার টাকা।'

'তা' থেকে নিজের জন্য আপনি কত খরচ করেছিলেন?'

'দু'হাজার টাকা।'

'স্কুটার কিনতে কয় হাজার টাকা দিয়েছিলেন?'

'দুই হাজার টাকা '

'টাকাটা কি নগদ দিয়েছিলেন?'

'না, চেকে।'

'কি চেক—বীয়ারার না ক্রস?'

'ক্রস-চেক। '

'গোপন কাজের জন্য ক্রস-চেক উপযোগী?'

সাক্ষী নিরুত্তর থাকলেন।

'আপনি পি. আই. এ-র কর্মচারী—মাসে কত টাকা বেতন পান?'

'বারো শ' টাকা।'

'আপনি বলেছেন যে, '৬৭ সালের মে মাসে গ্রীন স্কোয়ারের বাড়ীতে অনেকগুলো মিটিং হয়। ক্যাপ্টেন মোতালেবও সে সব সভায় উপস্থিত থাকতেন। আচ্ছা, ওই বছর এপ্রিল মাসে ক্যাপ্টেন মোতালেব কোথায় ছিলেন জানেন কি? কোনো হাসপাতালে ছিলেন কি?'

'হ্যাঁ, মার্চের শেষ ভাগে ঢাকা মেডিক্যালে এবং এপ্রিলে কুমিল্লা হাস-পাতালে ছিলেন।'

'কিন্তু আমি যদি বলি তিনি '৬৭ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত ঢাকা

ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে ছিলেন?'

'হ'তে পারে। আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

'১৯৬৭ সালের জুন মাসে সীম্যান সুলতান উদ্দিন আহমদ করাচীতে ছিলেন, এটা কি ঠিক?'

সাক্ষী এ প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'জানি না। তবে উক্ত মাসে তিনি ঢাকায় আমার বাসায় এক মিটিং-এ যোগ দিয়েছেন।

'কিন্তু, যদি বলা হয়, সুলতান উদ্দিন সারা জুন মাসই করাচীতে ছিলেন?'

'আমি তা' জানি না।'

... ...

"আপনি যে আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে 'ডজডার্ট'-এ ক'রে ফেনী সীমান্তে গিয়েছিলেন—সে কে?"

'সে পি. আই. এ-র একজন টেলিফোন অপারেটর।'

'আপনি পি. আই. এ-র একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার। আপনার সাথে একজন টেলিফোন অপারেটরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কী ক'রে থাকে?

'আনোয়ার হোসেন ছিলেন পি. আই. এ-র এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী। সেই সূত্রে পরিচয়।'... ...

'স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান কী কাজ করতেন আপনি কি তা' জানেন?'

'তিনি নৌ-বাহিনীর একটা অফিসার্স মেসে কাজ করতেন।'

'তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু?'

'আমি জানি না।'

'আমরা জানি—'স্টুয়ার্ড' মানে যে খাবার এনে দেয়। এমন লোককে কেন আপনারা অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন?'

'মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছিলেন, অস্ত্রশস্ত্র ব্যাপারে স্টুয়ার্ড মুজিবরের বেশ জ্ঞান আছে।'

"আপনাদের দলে তো বেশ কয়েকজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এবং ক্যাপ্টেনও ছিলেন। তাঁরা স্টুয়ার্ড মুজিবরের চাইতে বেশী যোগ্য। তবু কেন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানকে সেখানে পাঠানো হ'ল? আলী রেজাই বা সেখানে গেলেন কেন? তিনি তো আর অস্ত্রবিশারদ নন।"

'আমি জানি না, মোয়াজ্জেম হোসেন জানেন।'

'আগরতলা সীমান্তে প্রতিনিধিদের পেঁাছে দেবার দিন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের কাছ থেকে যে ট্রাঙ্ককল পান সেটা কখন?'

'ওই দিন বেলা তিনটে নাগাদ।'

'ডজগাড়ি ঘন্টায় কত মাইল যায়?'

'৫০ থেকে ৬০ মাইল।'

'চট্টগ্রাম থেকে ফেনীর দূরত্ব কত?'

'৬৫ মাইল।'

'আপনি বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে কোন ট্রাঙ্ককল পান নি?'

'একথা ঠিক নয়।'

'আপনি এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কতদিন যুক্ত ছিলেন?'

'গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।'

'কিন্তু আপনি ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেবের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যাওয়ার পর পার্টির সঙ্গে কোন সংযোগ ছিলো না।'

'কী বলেছি মনে নেই।'

অবদুস সালাম খান একটা দলিল পরীক্ষা ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, 'কর্নেল শেখ কি বাংলাভাষী?'

'না।'

'আপনি আপনার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন, স্বাধীন পূর্ব বাংলায় সব সম্পত্তি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হবে। পৃথিবীর আর কোন দেশ সম্পত্তি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেছে বলে শুনেছেন?'

'সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন করেছে।'

'সভায় যে পরিকল্পিত পতাকাটি পেশ করা হয়েছিল তা' কিসের তৈরী?'

'কাপড়ের।'

'ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপনি কি বলেছিলেন যে, পতাকায় পাটের ছবি অাঁকা ছিল?

'আমার মনে নেই।'

'ডি-ডে'র (ক্ষমতা দখলের দিন) কোন তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল কি ?'

'না।'

... ...

সালাম খান জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দলে টানার জন্য আপনি কারুর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কি ?'

'কে. এম. শামসুর রহমান ছাড়া আমি আর কারো সাথে যোগাযোগ করি নি।'

'শামসুর রহমান সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন ?'

'শামসুর রহমান সি. এস. পি. পরীক্ষায় ফাস্ট' হয়েছিলেন। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন।'

'পূর্ব পাকিস্তানের কোন বাঙালী সামরিক অফিসারকে চেনেন কি ?'

"হ্যাঁ, কর্নেল রব, কর্নেল জাব্বার, কর্নেল রহমান এবং কর্নেল মাশকুরুল হক।'

'তাঁদের দলে আনার চেষ্টা করেছিলেন কি ?'

'না।'

'ওসমানীর সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় ক্যান্টনমেন্টের গেটে কি কি জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন ?'

'একটা বাঁশের ফাঁড়ি, একজন সেন্ট্রি ও একটা সাইন বোর্ড।'

'আচ্ছা, বলুন তো ওয়ারলেস সেটের আকৃতি কিরূপ ?'

'ওয়ারলেস সেট দু' বা এক ফুট বা তারও ছোট হ'তে পারে।'

'এ ধরনের যন্ত্রে কতো দূরের খবরাখবর আদান-প্রদান করা যায় ?'

'আমার জানা নেই।'

"ট্রান্সমিটার সম্পর্কে আপনার ধারণা কী ?'

'একটা রেডিও সেটে কিছু পার্টস সংযোজন করলেই ট্রান্সমিটার সেট করা যায়।'

'ওয়ারলেস সেট সম্পর্কে আপনাদের সভায় কি কোন আলোচনা হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ, মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছিলেন, আমাদের ৬টি স্লেভ সেট এবং

একটি মাস্টার সেটের প্রয়োজন। শ্লেভ সেটগুলো মাস্টার সেটের সাথে যুক্ত করা হবে।'

'আচ্ছা বলুন তো, একটা ট্রানজিস্টারাইজড এবং একটি ওয়ারলেস সেটের মধ্যে পার্থক্য কী?'

'আমি জানি না।'

'আপনাদের দলের কেউ ওয়ারলেস সেট ব্যবহার করতে জানতেন কি?'

'বোধ হয়, কেউ জানতেন না।'

'আপনি কি জানেন কর্পোরাল সামাদ ওয়ারলেস ইন্সপেক্টর ছিলেন?'

'আমার জানা নেই।'

সালাম খান আর জেরা না ক'রে বসে পড়লেন। এর পর উঠে দাঁড়ালেন আতাউর রহমান খান। তিনি সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেন, আপনার প্রকৃত নাম কী?'

'রমিজ উদ্দীন মোল্লা'। ১৯৫৩ সালে বিমান বাহিনীতে চাকুরী নেয়ার সময় আমি আমার নাম পরিবর্তন করি।'

'আপনি বোধাই মণ্ডলকে চেনেন?'

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সাক্ষী বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি আমার প্রপিতামহ। আমার পিতার নাম আলিম উদ্দীন।'

'রোজিয়া বিবিকে চেনেন?'

সাক্ষী যেন একটু রেগে উঠলেন। তারপর বললেন, 'না, চিনি না।'

আতাউর রহমান একটু স্মিত হাসি হেসে বললেন, 'সে কি! নিজের খালাকে চেনেন না।'

একথা বলার পর আতাউর রহমান সাহেব বসে পড়লেন। অপর কয়েকজন জেরা করলেন। তারপর কয়েক দিনের জন্য অধিবেশন মুলতবী রাখা হ'ল।

২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬৯ সাল। সময় সকাল ১০টা বেজে পনেরো মিনিট। কুর্মিটোলা ছাউনির অভ্যন্তরে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সামনে আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন শেখ মুজিব। ভারতীয় অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগের জবাব দিতে হবে তাঁকে।

আদালতের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন শেখ মুজিব। তারপর দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, 'পূর্ব বাংলার দাবী-দাওয়া ধামাচাপা দেওয়াই এ মামলার উদ্দেশ্য। উক্ত আদালতে তিনি যে লিখিত জবানবন্দী পেশ করেন, তা' আজো ইতিহাসের বিষয় হয়ে রয়েছে। জবানবন্দীটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

শেখ মুজিবের জবানবন্দী

"স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ কাল থেকেই আমি পাকিস্তান অর্জনের জন্য নিরলস সংগ্রাম করেছি। আমি প্রাক-আজাদী কালে ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের বিশেষ সক্রিয় সদস্য ছিলাম এবং লেখা-পড়া জলাঞ্জলি দিয়ে আমি পাকিস্তান হাসিলের জন্য কাজ ক'রে গেছি। আজাদী লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও নিয়মতান্ত্রিকতার পথ অনুসারী একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত ছিল এবং এখনো তা' সেইরূপই রয়েছে।

১৯৫৪ সালে আমি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই এবং পরে আমি জাতীয় পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দু'বার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলাম। তা' ছাড়াও আমি গণচীন রিপাব্লিকে প্রেরিত পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেছিলাম। জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠনের জন্য ইতি-পূর্বেই এ সময়ের মধ্যে আমাকে কয়েক বৎসর কারাভোগ করতে হয়েছে। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর বর্তমান সরকার আমার ওপর নির্যাতন চালাতে শুরু করেন। তাঁরা ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুসারে আমাকে গ্রেফতার করেন এবং প্রায় দেড় বৎসর কাল আমাকে বিনা বিচারে আটক রাখেন। আমি এ ভাবে আটক থাকার সময় তাঁরা আমার বিরুদ্ধে ৬টি ফৌজদারী মামলা রুজু করেন, কিন্তু সকল অভিযোগ থেকে আমি সসম্মানে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর অথবা ১৯৬০ সালের জানুয়ারী নাগাদ উক্ত

আটক অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করি। আমার মুক্তিলাভের সময়ে আমার উপর এই মর্মে বিধি-নিষেধ জারী করা হয় যে, ঢাকা ত্যাগ করতে হ'লে আমাকে লিখিতভাবে, আমি কোন্ কোন্ স্থানে যেতে চাই তার বিবরণ স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাতে হবে এবং ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পরও লিখিত-ভাবে সে বিষয় স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাতে হবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা সর্ব সময় ছায়ার মত আমার পিছনে থেকেছে। অতঃপর ১৯৬২ সালের বর্তমান শাসনতন্ত্র জারী করার প্রাক্‌কালে আমার নেতা মরহুম এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় আমাকেও জন-নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুসারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয় মাসকাল আমাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের উভয় অংশেই অন্যতম রাজনৈতিক দল হিসাবে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের অন্যতম অঙ্গদল হিসাবে আমরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী হিসাবে জনাব আইয়ুব খানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মোহাতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে মনোনয়ন দান করা হয়। আমরা তখন নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। আমার বক্তৃতাসমূহ সম্পর্কে কয়েকটি মামলা রুজু ক'রে পুনরায় আমার বিরোধিতা ও আমাকে হয়রানী করা শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকার সময় যে সকল রাজনৈতিক নেতা ভারতীয় আক্রমণের নিন্দা করেন আমি তাঁদের অন্যতম এবং সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে পুরাপুরিভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার পার্টি ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও তার সকল ইউনিটের নিকট সার্কুলার প্রেরণ ক'রে উক্ত যুদ্ধের সময়ে পূর্ব পাকিস্তান গভর্নরের ভবনে যে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উহার পক্ষ থেকে আমি এই অংশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে একটি যুক্ত বিবৃতি ইস্যু করি। উক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের নিন্দা করা হয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ ক'রে

যাওয়ার জন্য এবং দেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আগমন করলে আমন্ত্রিত হয়ে আমি স্বয়ং এবং অন্যান্য সকল রাজনৈতিক নেতা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। উক্ত সাক্ষাৎকারের সময়ে আমি পূর্ব পাকিস্তানকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দান এবং যুদ্ধের সময়ের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তোলার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধের সময়ে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান এবং বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করেছিলাম। কারণ আমার পার্টি ও আমি অগ্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী, বিধায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে যাবতীয় আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা হওয়া উচিত বলে মনে করি।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে একটি সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের বিষয়-নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধানের উপায় হিসাবে ৬-দফা কর্মসূচী পেশ করি। ৬-দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়কেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দানের কথা বলা হয়েছে।

অতঃপর আমার পার্টি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং যাতে দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্যমূলক অবস্থা দূর করা যেতে পারে তার জন্য উহার (অর্থাৎ ৬-দফার) অনুকূলে জনমত গঠনের উদ্দ্যেশ্যে আমরা জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই।

তাতে সরকারী-যন্ত্র এবং প্রেসিডেন্টসহ সরকারী দলের নেতৃবৃন্দ আমার প্রতি অস্ত্রের ভাষায় ও গৃহযুদ্ধের হুমকী প্রদান করেন এবং আমার বিরুদ্ধে ডজনখানেকেরও বেশী মামলা রুজু ক'রে আমাকে হয়রানী করতে শুরু করেন। তাঁরা প্রথমে ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে যশোরে আমাকে গ্রেফতার করেন। এ সময়ে আমি খুলনায় জনসভা অনুষ্ঠানের পর যশোর হয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করছিলাম।

আপত্তিকর বলে কথিত বক্তৃতা দানের অভিযোগে ঢাকা থেকে প্রেরিত গ্রেফতারী পরোয়ানাবলে তথায় আমাকে আটক ও গ্রেফতার করা হয়। আমাকে ঢাকা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। আমি ঢাকার সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হই। কিন্তু তিনি আমার জামিন মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেন। তবে মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন মঞ্জুর করলে ঐ দিনই আমাকে মুক্তি দেয়া হয়। আমি সন্ধ্যা সাতটায় সময় স্বগৃহে আগমন করি। ঐ দিন রাত ৮টার সময় সিলেটে তথাকথিত আপত্তিকর বক্তৃতা দানের ব্যাপারে সিলেট থেকে প্রেরিত একটি গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ পুনরায় পুলিশ আমার গৃহে উপস্থিত হয়। আমাকে তখন গ্রেফতার করা হয় এবং ঐ দিন রাত্রে পুলিশ পাহারাধীনে আমাকে সিলেটে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং তিনি আমাকে জেলে পাঠান। পরদিন সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন মঞ্জুর করেন। মুক্তিদানের পর পুলিশ ময়মনসিংহের এক জনসভায় আপত্তিকর বলে কথিত একটি বক্তৃতা দানের দায়ে ময়মনসিংহ থেকে প্রেরিত একটি গ্রেফতারী পরোয়ানাবলে সিলেটে আমাকে গ্রেফতার করে। আমাকে ময়মনসিংহের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। অনুরূপভাবে তিনি আমার জামিন মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেন এবং আমাকে জেলে প্রেরণ করেন। ধারাবাহিকভাবে এসব গ্রেফতার, হয়রানী ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। পরদিন ময়মনসিংহের দায়রা জজ আমার জামিন মঞ্জুর করেন এবং জেল থেকে মুক্তিলাভ ক'রে আমি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ৮ই মে তারিখে আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা দান করি এবং রাত্রে আমি আমার বাসায় প্রত্যাবর্তন করি। ঐ দিন রাত্রি একটার সময় পুলিশ পাকিস্তান রক্ষাবিধি অনুসারে আমাকে গ্রেফতার করে। তারপরই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী তাজউদ্দিন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক আহমদ, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মজিবর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী

এম. এ. আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন ট্রেজারার নুরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের লেবার সেক্রেটারী জহুর আহমদ চৌধুরীসহ অন্যান্য বহুসংখ্যক পার্টি নেতাকে যুগপৎ গ্রেফতার করা হয়। কয়েক দিন পর এম. এন. এ. ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী মেসার্স মীজানুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পাবলিসিটি সেক্রেটারী এ. মোমেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারী ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শামসুল হক, ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মোহাম্মদ মুসা, এডভোকেট ও পূব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন মন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম. এন. এ. আমজাদ হোসেন, এডভোকেট আমিন উদ্দিন আহমদ, পাবনার এডভোকেট আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মোস্তফা সারোয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী মহিউদ্দিন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, এডভোকেট ও অন্যতম নেতা জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সেক্রেটারী জনাব বজলুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব সিরাজুদ্দিন আহমদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব হারুন-অর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর নর্থ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব আবদুল হাকিম, ধানমণ্ডি আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব রাশেদ মোশাররফ, সিটি আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব সুলতান আহমদ, গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সেক্রেটারী জনাব. এম. এ. মান্নান, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, ময়মনসিংহের গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব এ. রহমান সিদ্দিকী, এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক কর্মী ও ছাত্র এবং শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষাবিধির ৩২নং ধারা অনুসারে গ্রেফতার করা হয় ও কারাগারে

আটক রাখা হয়। তাঁরা আমার এক ভাগিনেয় প্রাক্তন জি. এস. ই. পি. এস. এল. শেখ ফজলুল হক ও এক ভ্রাতুষ্পুত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ রেখেছেন।

উপরোক্তগুলি ছাড়াও সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংবাদপত্র 'ইত্তেফাক'কে নিষিদ্ধ করেছেন। উহার একমাত্র কারণ এই যে, উক্ত পত্রিকা কখনো কখনো আমার পার্টির অভিমতকে সমর্থন করতেন। সরকার উহার প্রেসকেও বাজেয়াপ্ত করেছেন, উহার সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন স্বনামধন্য সাংবাদিক জনাব তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে আটক করেন, তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে রাখেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি ফৌজদারী মামলা রুজু করেন। চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ নেতা এবং চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষাবিধি অনুসারে কারারুদ্ধ করা হয়।

আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদস্বরূপ আমার পার্টি ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন তারিখে সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে। সারা প্রদেশে অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ ধর্মঘটের সময়ে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলি চালনায় ১১ জন নিহত হয় ও প্রায় ৮০০ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়, এবং অন্যান্য অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে কতিপয় মামলা রুজু করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর জনাব মোনায়েম খান কমবেশী খোলাখুলিভাবেই দলে দলে অফিসার ও অন্যান্যদের বলেন যে, যতদিন তিনি (জনাব মোনায়েম খান) বর্তমান থাকবেন ততদিন শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে থাকতে হবে। ইহা অনেকেরই জানা আছে।

আমাকে আটক রাখার পর থেকে আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে কতিপয় বিচারের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে এবং ঐ সময় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলেই আদালতের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হ'ত। উক্ত আটক অবস্থার প্রায় ১১ মাস পরে ১৯৬৮ সালের ১৭ই। ১৮ই জানুয়ারী নাগাদ রাত ১টার সময় আমাকে আটক অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং জেলগেট থেকে কতিপয় সামরিক কর্মচারী আমাকে জোরপূর্বক ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসে

এবং তথায় একটি রুদ্ধ কক্ষে আমাকে আটক রাখা হয় ও আমাকে কারো সাথে দেখা করতে দেওয়া হয় না। আমাকে এমনকি খবরের কাগজও পড়তে দেওয়া হয় নি। দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে আমাকে কার্যতঃ বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। এ সময়ে আমার প্রতি অমানুষিক মানসিক নির্যাতন চালান হয় এবং আমাকে যাবতীয় সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। সেই মানসিক নির্যাতন সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

১৮ই জুন তারিখে অর্থাৎ বর্তমান মামলা শুরু হওয়ার ঠিক একদিন পূর্বে সর্বপ্রথম আমি এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং আমি তাঁকে অন্যতম আইনজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত করি।

আমাকে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে এবং আমাকে ও আমার পার্টিকে লোক-চোক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আমাকে মিছামিছি মামলায় জড়িত করা হয়েছে। ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীকে এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সংখ্যা-সাম্যের দাবীকে ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ মামলায় আমাকে ও আমার পার্টিকে মিছামিছি জড়িত করা হয়েছে। আমি লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, লেঃ মোজাম্মেল হোসেন, ভূতপূর্ব কর্পোরাল আমীর হোসেন, এল. এস. সুলতানউদ্দিন আহমদ, কামাল উদ্দিন আহমদ, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহ্ফুজুল্লাহ্ এবং মামলায় জড়িত স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর অন্যান্য কর্মচারীদের কাউকেই এই কোর্টে আসার আগে আমি চিনতাম না। আমি সি. এস. পি. অফিসারত্রয় মেসার্স আহমদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস এবং শামসুর রহমানকে জানি। কারণ আমি মন্ত্রী থাকা কালে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকুরী করতেন বিধায় সময় সময় তাঁদের জানার সুযোগ আমি পেয়েছি। কিন্তু আমি তাঁদের সাথে কখনও রাজনীতি বা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলাপ করি নি। লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন বা কামাল উদ্দিন আহমদের করাচীস্থ বাসভবনে অথবা তাজউদ্দিন আহমদের বাড়ীতে এ মামলায় জড়িত কারো সাথে আমার কোনও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নি। ও সব লোক কখনো আমার বাড়ী যান নি। বর্তমানকার তথাকথিত ষড়যন্ত্র

মামলায় জড়িত কাউকে আমি কোন অর্থ দেই নি। আমি কখনো ডাঃ সাইদুর রহমান বা মানিক চৌধুরীকে অভিযোগে প্রকাশিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করতে বলি নি। তাঁরা আমার পার্টির শত শত কর্মীর মতই সাধারণ কর্মী মাত্র। আমার পার্টির (পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ) তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ৪৪ জন কার্যকরী সংসদ সদস্য, একজন জেনারেল সেক্রেটারী ও ৮ জন সেক্রেটারী রয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বহু প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী, এম. এন. এ. ও এম. পি. এ.। বর্তমানে জাতীয় পরিষদের ৫ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ১০ জন সদস্য আমার দলভুক্ত। চট্টগ্রাম জেলা ও নগর আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী-গণ প্রাক্তন এম. এন. এ. এবং এম. পি. এ.। তা' ছাড়া সেখানকার বহু প্রতিপত্তিশালী ও ধনবান লোক আমার পার্টিতে রয়েছেন। তাঁদেরও আমি কখনো কোন সাহায্যের কথা বলি নি। কাজেই মানিক চৌধুরীর মত সাধারণ ব্যবসায়ী এবং সাইদুর রহমানের মত সাধারণ একজন এল. এম. এফ. ডাক্তারকে সাহায্যের কথা বলাটা আমার পক্ষে অসম্ভব। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর বিরোধিতা করার দায়ে ডাঃ সাইদুর রহমানকে পার্টি থেকে সাস-পেণ্ড করা হয়েছিল। আমি কখনো ডাঃ সাইদুর রহমানের বাড়ী যাই নি।

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আমি প্রেসিডেন্ট। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নকল্পে আমার পার্টির সুনির্দিষ্ট ও গঠনমূলক ম্যানিফেস্টো এবং কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। ৬-দফা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত উপায়ে দেশের উভয় অংশের প্রতি সুবিচারই আমার কাম্য। যা কিছু দেশের পক্ষে কল্যাণকর মনে করেছি, তাই নিয়ম-তান্ত্রিক সীমার মধ্যে থেকে আমি সর্বদাই প্রকাশ্যতঃ বলেছি। তথাপি শাসকগোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা আমাকে এবং আমার পার্টিকে দমিয়ে রেখে পাকিস্তানী জনগণকে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানীদের শোষণের ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করতে চায়।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমি মাননীয় আদালত সমক্ষে আরো বলতে চাই যে, প্রতিহিংসাবশে আমায় এ মামলায় মিথ্যা জড়নো হয়েছে।

পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের ৬ই জানুয়ারী (১৯৬৮) তারিখের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ২৮ জন অভিযুক্তের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এবং তাতে আমার নামের তালিকা ছিল না। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে, সকল আসামীই দোষ স্বীকার করেছে। তদন্ত প্রায় শেষ হয়ে আসছে এবং শীঘ্রই বিচার শুরু হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মন্ত্রী দফতর কর্তৃক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচার প্রসঙ্গে একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলতে পারি যে, পূর্বাহ্নে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিল পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন বিভাগ হতে কোন প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না। এবম্বিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রচারপত্র প্রকাশ করতে হলে পূর্বে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন নেওয়া আবশ্যক। বর্তমান মামলাও উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করেছে, এই মামলা তারই বিষময় প্রতিক্রিয়া।

আমি পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে কখনো কিছু করি নি এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য স্থল, বিমান বা নৌবাহিনীর কোন কর্মচারী অথবা অন্য কারো সাথে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করি নি। আমি নির্দোষ এবং সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ। কথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

[কৃত্তিবাস ওঝা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৯-৩১৭]

এরপর দুই নম্বর আসামী লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর জবানবন্দীতে বললেনঃ "গ্রেফতারের পর আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এইমর্মে একটি বিবৃতি দিতে বলে যে, আমি শেখ মুজিবুর রহমান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, এস. এম. মোর্শেদ, সি. এস. পি অফিসার এ. এফ. রহমান, শামসুর রহমান এবং আরো অনেকের নাম বলে গেলে তাঁদের চিনি এবং বলি তাঁরা সকলে স্বাধীন পূর্ব বাংলার আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। বিবৃতিতে যেন আরো উল্লেখ করি, কমাণ্ডো স্টাইলে বিপ্লব

লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের জবানবন্দী

করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সৈনিকদের সংঘবদ্ধ করতে বলেন আমাকে। আমি যেন বলি, ভারত আমাদের অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে মিস্টার ওঝার মারফৎ।

আমি এই মিথ্যা বিবৃতি দিতে অস্বীকার করায় কর্নেল আমীর হোসেন ঘুঁষি মেরে আমার দাঁত ভেঙে দেন।

লেঃ কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম তার সেই ভাঙা দাঁতটি সঙ্গে সঙ্গে আদালতে দাখিল করলেন এবং বললেনঃ তাঁরা আমায় বললেন, যদি আমি তাঁদের কথানুযায়ী বিবৃতি দেই, তা' হলে আমার অবসর গ্রহণের আবেদন মঞ্জুর করা হবে। অন্যথায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমাকেও ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠাবে। কর্নেল আমীর বললেন, 'তুমি সহযোগিতা না করলেও অনেকেই করবে। বেসামরিক আদালতে যদি শেখ মুজিব রেহাই পান, সামরিক আদালতে তাঁর মুক্তিলাভের চান্স নেই। মুজিবকে আমরা শেষ করবো। আমাদের প্রেসিডেন্টের বড় শত্রু সে।'

প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও আমি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজী হলাম না। শেখ মুজিবুর কখনও দেশদ্রোহী হতে পারেন না। তিনি দেশপ্রেমিক। পূর্ব বাংলার সাড়ে ছয় কোটি মানুষের নেতা। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ আমায় ক্ষমা করবেন না। বিবৃতি দিতে রাজী হই নি বলে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়েছেন সরকার।"

[কৃত্তিবাস ওঝা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০২-৩০৩]

তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর বাইশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি লিখিত বিবৃতিও তিনি দাখিল করলেন। এরপর আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান। তাঁর উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল, তিনি আদালতে তার এক হৃদয়বিদারক বর্ণনা দেন। জবানবন্দীতে স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান বলেনঃ

"১৯৬৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা থেকে আমাকে গ্রেফতার ক'রে প্রথমে রাজারবাগ, পরে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যায়। ১১ই ডিসেম্বর আবার আমাকে রাজারবাগ নিয়ে গেল। আমি একটা কক্ষে বসে আছি। একটু বাদে কয়েক শীট টাইপ করা কাগজ হাতে নিয়ে ঢুকলেন লেফটেন্যান্ট

শরীফ। তিনি কাছে এসে টাইপকরা শীটগুলো পড়ে গেলেন। তাতে বহু আর্মি অফিসার, সি. এস. পি. অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর নাম উল্লেখ ছিল। উল্লেখ ছিল, তাঁরা কিভাবে 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' গঠন করবার চেষ্টা করছেন। লেফটেন্যান্ট শরীফ আমাকে ঐ তৈরী স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি বিবৃতি দিতে বললেন।

স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমানের জবানবন্দী

বলতে লাগলেন, আমি তাঁদের চিনি এবং ঐ দলে ছিলাম। এই মিথ্যা বিবৃতি দিতে অস্বীকার করলাম আমি। তখন একটা নির্জন কক্ষে নিয়ে গেল আমাকে। তারপর শুরু হ'ল নির্যাতন। নখের ভিতর পিন ঢুকিয়ে দিল। রুল দিয়ে পিটোতে লাগলো একটি লোক। জামা কাপড় রক্তে সপ্‌সপে হয়ে উঠল; নাক, মুখ, মাথা দিয়ে রক্ত গড়াল আমার। জ্ঞান হারালাম, বিকেল চারটের দিকে জ্ঞান ফিরলে দেখলাম মেজর নাসের ঘরে ঢুকছেন। তিনিও আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঐ মিথ্যা জবানবন্দী দিতে বললেন। 'আমি পারব না' বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চড় কষালেন তিনি আমার গালে। মারপিটে আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। শেষে ডাক্তারের পরামর্শে কয়েকটা দিন মারপিট বন্ধ রাখল তারা। ১৮ই ডিসেম্বর আবার শুরু হ'ল অত্যাচার। ন্যাংটো ক'রে আমাকে বরফের মধ্যে শুইয়ে রাখল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ১০ মিনিটে শরীর জলে গেল। তখন কম্বল জড়িয়ে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

পনেরো ষোল বারেরও বেশী মেজর নাসের, কর্নেল শরীফ আমাকে মিথ্যা বিবৃতি দিতে চাপ দেন। আমি অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই বারবার আমার উপর অমনি নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়। বিবৃতি দিতে অস্বীকার করার জন্যই আমার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ আনা হয়েছে।"

[কল্হন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭-২৫৮]

ঠিক এ সময় বাহিরে শোনা গেল শ্লোগান 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'মিথ্যা মামলা তুলে নাও', 'আইয়ুবশাহী ধ্বংস হউক।' গ্যালারিতে বসা ছিল একদল ছাত্র। তারাও 'শেখ সাহেবের মুক্তি চাই' ধ্বনিতে আদালত কক্ষ মুখরিত ক'রে বেরিয়ে গেল। জনতা-ছাত্র সমানে শ্লোগান দিয়ে

চলেছে। মুজিবুর রহমানকে মিলিটারী প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হ'ল ক্যান্টনমেন্ট জেলে। মিলিটারীরা ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিল। সেদিনের মত অধিবেশন মুলতবী থাকে।

ষড়যন্ত্র মামলার অধিবেশনের বাইরে সারা প্রদেশ জুড়ে তখন আগুন আর আগুন। প্রতিদিন শত শত বিক্ষোভ মিছিলের জোয়ারে ভেসে চলেছে

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা

বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আইয়ুব-মোনেম এর লেলিয়ে দেয়া গুণ্ডারা নির্বিচারে সে মিছিলের উপর গুলী বর্ষণ করলো। শত শত শহীদের তাজা রক্তে ভেসে গেল রাজপথ-জনপথ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ আন্দোলন উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে অভিহিত হয়ে আসছে। এ আন্দোলনের পটভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করলে একটা দেশের জন্ম এবং তার জন্মদাতার ভূমিকার পুরোপুরি মূল্যায়ন সম্ভব নয়। ১৯৬৬ সালে পূর্ব বাংলায় যখন ৬-দফার কর্মসূচী আদায়ের সংগ্রাম চলছে, তখন পশ্চিম পাকিস্তানেও তেমনি আইয়ুবকে সরিয়ে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র চলছিল। ঐ সালেই ('৬৬) নভেম্বরে লণ্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফের করাচীস্থ প্রতিনিধি এ বিষয়ে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করেন। সংবাদে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর একটা অংশ কালাবাগের নবাবের নেতৃত্বে আইয়ুবের উপর হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল। কালাবাগের নবাব আগে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন কিন্তু আইয়ুব খান তাঁকে বরখাস্ত করেন। আইয়ুব ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে ১১ জন জেনারেল এবং ২৯ জন কর্নেলকে অযোগ্যতার অভিযোগে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করলেন। শুধু তাই নয়, বখতিয়ার রানা সেনাবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও আইয়ুব খান তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারলেন না এবং তাঁকে ডিঙ্গিয়ে জেনারেল মুসা খানকে সি-এন-সি নিযুক্ত করলেন।

এদিকে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে শেখ মুজিব ও অন্যান্যদেরকে গ্রেফতার ক'রে মামলা দায়ের করা হ'ল। এই ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৬৮) তারিখে এক বিবৃতিও দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন যে,

"কোন দেশপ্রেমিক পাকিস্তানী রাষ্ট্রদ্রোহিতাকে ক্ষমা করিতে পারে না। যে সকল শক্তির তীব্র বিরোধিতার মুখে আমরা পাকিস্তান অর্জন করিয়াছি সেই শক্তি আবার পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়।"

কিন্তু জনগণ সরকারের এই ভাওতাবাজীতে বিশ্বাস করতে পারে নি। তারা স্পষ্টতঃই বুঝতে পেরেছিল যে, ৬-দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ ক'রে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এই ষড়যন্ত্র মামলা দাঁড় করানো হয়েছে।

৪ঠা জুলাই আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে জরুরী দাবীর ভিত্তিতে জনগণকে তাই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়া হ'ল। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন এই ডাকে সাড়া দেন। ১৯৬৮ সালের ৭ই জুন সারা প্রদেশে ৬-দফা আন্দোলনের প্রতীক দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। কিন্তু সরকার এদিনও ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে ১৪৪ ধারা জারী ক'রে আন্দোলনের গতিকে স্তব্ধ ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। এর প্রতিবাদে পর দিন প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যরা অধিবেশন কক্ষ বর্জন করেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতেই পরিষদের নেতা, শিল্পমন্ত্রী দেওয়ান আবদুল বাসেত বলেন ঃ "আমরা সাতই জুন-এ নিহতদেরকে শহীদ বলিয়া মনে করি না। তাহারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং তাহারা অপরাধীর (ক্রিমিনাল) চাইতেও নিকৃষ্ট।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই জুন, ১৯৬৮]

ঐ সালেই বর্ষাকালে পূর্ব বাংলার কয়েকটি জেলা সর্বনাশা বন্যার প্লাবনে ডুবে যায়। দুর্গত জনসাধারণের সাহায্যার্থে সর্বদলীয় ছাত্রসমাজ রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা সংগ্রহে নেমে পড়ে। ১৪ই জুলাই ('৬৮) বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় এমনি একটি ছাত্রদল প্রদেশের বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের আহবান সম্বলিত ব্যানারসহ অর্থ সংগ্রহের জন্য ইকবাল হল থেকে বের হয়ে নিউ মার্কেটের পথে 'বলাকা' সিনেমা হলের সম্মুখে ভিক্ষা সংগ্রহের সময় লাঠি, ব্যাটন, ঢালধারী ও লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত একদল পুলিশ পশ্চাৎ দিক থেকে অকস্মাৎ তাদের আক্রমণ ক'রে মারধোর করে এবং বহু ছাত্রকে গ্রেফতার করে। পরদিন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলের সদস্য এ বিষয়ে একটি মুলতবী প্রস্তাব তুললে ডিপুটি স্পীকার

জনাব গমিরউদ্দিন প্রধান তা' নাকচ করে দেন। এর প্রতিবাদে বিরোধী দলের সদস্যরা পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন।

এর পরদিন অর্থাৎ ১৬ই জুলাই প্রদেশের সর্ববৃহৎ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বেসরকারী কলেজ ঢাকা জগন্নাথ কলেজকে সরকার এক নির্দেশবলে সরকারী কলেজে রূপান্তরিত করায় ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এর প্রতিবাদে ২৪শে জুলাই ('৬৮) ঢাকায় ছাত্র সংগঠনগুলোর এক মিলিত আহবানেও অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। সরকারের এই শিক্ষা সংকোচন নীতি ও ১৯৬২ সালে প্রণীত হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিলের দাবীতে ১৯৬৮ সালের ১৩ই আগস্ট ছাত্র সংগঠনগুলো প্রদেশব্যাপী এক ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। ময়মনসিংহের ধর্মঘটী ছাত্রদের ওপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হওয়ার খবর জানা যায়। তা' ছাড়া ২০ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতারও করে। পুলিশের এই নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে ক্রমাগত তিন দিন ধরে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করে। এর কিছুদিন পরে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী আবার বাংলা ভাষার উপর হামলা চালানোর প্রচেষ্টা চালায়। সরকারের কতিপয় দালালসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সংস্কার সাধনের নামে বাংলা বর্ণমালা, বানান পদ্ধতি ও লিখন রীতির আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের কুখ্যাত অধ্যক্ষ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন। এর প্রতিবাদে প্রদেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহল আতঙ্কগ্রস্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ৩১শে আগস্ট (১৯৬৮) ৪১ জন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পী এর প্রতিবাদে এক বিবৃতি দান ক'রে বলেন, "বাংলা হরফের রদবদল বিশৃংখলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করবে।"

এতদসত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঢাকায় এসে ২৪শে সেপ্টেম্বর ('৬৮) নজরুল একাডেমীতে প্রদত্ত এক সম্বর্ধনা সভায় ঘোষণা করেন, "একদিন দেশের সকল ভাষার সংমিশ্রণে একটি পাকিস্তানী ভাষা হবে।" ১লা অক্টোবর জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণেও আইয়ুব খান ঐ একই কথা ঘোষণা করেন।

ঠিক সেই দিনই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর প্রখ্যাত উদারনৈতিক শিক্ষা-বিদ ডক্টর মাহমুদ হোসেন আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশের পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেন। ১৯শে অক্টোবর ('৬৮) ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জনাব তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)। সভায় জরুরী দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণ-আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। চারটি পন্থায় এই গণ-আন্দোলন চালিয়ে যাবার কথা ঘোষণা করা হয়ঃ (১) সভা-সমিতি ও মিছিল, (২) হরতাল, (৩) অসহযোগের মাধ্যমে, (৪) প্রয়োজনবোধে আইন অমান্য করে। এই উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রথমে পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মীজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মালেক উকিল, রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ নেতা। সভায় কতকগুলো প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলো হ'ল, 'শেখ মুজিবের নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন, রাজবন্দীদের মুক্তি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত সাহায্য দান, ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন, ৬-দফা বাস্তবা-য়নের জন্য দুর্বার গণ-আন্দোলন। এই গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়। সভায় 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' নামক আইয়ুবের ভাষা সংস্কারের প্রচেষ্টাকে নিন্দা করা হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য সবার প্রতি আবেদন জানানো হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য প্রস্তাবাবলীতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিধান, ইত্তেফাকের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস, শ্রমিক শোষণ বন্ধ ইত্যাদি দাবী করা হয়।

২৭শে অক্টোবর (১৯৬৮) আইয়ুব খান মহাসাড়ম্বরে তাঁর উন্নয়ন দশক বা Decade of Reforms পালন করেন। পূর্ব বাংলার জনগণ আইয়ুবের এই কীর্তিকলাপে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। ভেবে

পেলেন না, বাংলার জনগণের জন্যে কি উন্নতি তিনি বিধান করেছেন? রাস্তাঘাট? সেতো মৌলিক গণতন্ত্রীরা ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা খেয়ে (যা কিনা ভোটের বিনিময়ে আইয়ুব খান তাদেরকে ঘুষ দিয়েছিলেন) গ্রামের নিরন্নক্লিষ্ট মানুষকে দিয়ে দেশ সেবার নাম করিয়ে কেটে নিয়েছে। দালান-কোঠা? সেটাতো সরকারের কতিপয় তাবেদার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকদের ভাগ্যেই তৈরী করার সুযোগ ঘটেছে। শিক্ষা-দীক্ষা? চাকুরীর সংস্থান? কিন্তু এখনো প্রদেশের শতকরা ৮০ জন লোক নিরক্ষর কেন? আর কেনইবা যে পরিমাণ ছাত্র পাশ ক'রে বেরুচ্ছে বেকারত্বের অভিশাপে তাদের জীবন জর্জরিত? আইন-শৃংখলার উন্নতি? হ্যাঁ, এদিক দিয়ে আইয়ুব-মোনেম যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার নজীর বিরল। তার মৌলিক শাসন-ব্যবস্থায় আইনের বিরুদ্ধে যে কেউ এক ধাপ গিয়েছেন, সরকার তাঁর বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন—জেলে পুরেছেন, বেয়োনেট আর টিয়ার গ্যাস আর লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী করেছেন, প্রয়োজনবোধে হত্যাও করেছেন। আইয়ুব খানের দশ বছরের এই ইতিহাসকে 'উন্নয়ন দশক' বা 'ডিকেড অব রিফর্মস্' হিসেবে অভিহিত করা যায় বটে।

আইয়ুবের উন্নয়ন দশক

অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই উন্নয়ন দশক উৎসব পালন করে। কেননা গত দশ বৎসরে তাদের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পূর্ব বাংলার জনগণের রক্ত চুষে নিয়ে তাদের দেহে তা' সঞ্চার ক'রে দেয়া হয়েছিল। খাওয়া পরার অভাব নেই, সরকারী খরচে রাস্তাঘাট ঝকঝকে করা হয়েছে—মরুভূমির শুষ্ক বালির বুক চিরে শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে খনন করা হয়েছে খাল। বড় বড় দালান-কোঠা গড়ে তোলা হয়েছে, গড়ে উঠেছে বড় বড় কলকারখানা। পাশ করে বেরুলেই চাকুরী পাওয়া যায়। কিছুসংখ্যক লোকের পক্ষে, বিশেষ ক'রে যাঁদের হাতে ক্ষমতা, অর্থ ও প্রতিপত্তি আছে, তাঁদের পক্ষে আমোদ-প্রমোদ-বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করার তো কোন অসুবিধে নেই—অতএব আইয়ুবের উন্নয়ন দশক তাঁদের জন্যই সার্থক। তবে একই দেশের দুই অঞ্চলে বৈষম্যের যে চিত্র দিন দিন প্রকট হয়ে উঠেছে, আইয়ুব সরকারের পক্ষে সেই চিত্র সম্পূর্ণ লুকিয়ে

ছাপিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। সরকার অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েছে এই বৈষম্যের কথা স্বীকার করতে। গত কয়েক বৎসরে জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে সরকার যে সব বৈষম্যের কথা স্বীকার করেছেন, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে তার অংশবিশেষ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির কিয়দংশ এখানে তুলে ধরে দেখানো যেতে পারে যে, পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের সরকার কি ভাবে দেশের একটি অঞ্চলকে বঞ্চিত ক'রে অপর অংশকে গড়ে তুলেছেন।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য

॥ ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫, দৈনিক ইত্তেফাক ॥

আজকের দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক তথ্য থেকে ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ বলে জানা গেছে ঃ

	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৪	৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ
১৯৫৫	১৩ ,,	৪৭ ,,
১৯৫৬	৫ ,,	১০ ,,
১৯৫৭	১৭ ,,	৮৩ ,,
১৯৫৮	২৬ ,,	৯০ ,,
১৯৫৯	১৮ ,,	১০৮ ,,
১৯৬০	১৮ ,,	৯৭ ,,
১৯৬১	১৫ ,,	৮৫ ,,
১৯৬২	৩২ ,,	৯৯ ,,
১৯৬৩	৪২ ,,	১১৪ ,,
	মোট ১৯১ লক্ষ	মোট ৭৫৮ লক্ষ
শতকরা হার—	২০%	৮০%

॥ ১৭ই মার্চ, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ॥

গতকাল জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে পররাষ্ট্র দফতরের পার্লা-মেন্টারী সেক্রেটারী জানান যে, বিদেশে পাকিস্তানের হাই কমিশনসমূহে

কর্মরত বিভিন্ন শ্রেণীর ৩১ জন কর্মচারীর মধ্যে ১৩ জন পূর্ব পাকিস্তানী এবং ৮ জন হাই কমিশনারের মধ্যে ২ জন পূর্ব পাকিস্তানী।

পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব আবদুল আওয়াল ভূঁইয়া জনাব মুখলেসুজ্জামানের এক প্রশ্নের জবাবে জানান যে, বিদেশে কার্যরত ৩৫ জন রাষ্ট্রদূতের মধ্যে ৭ জন পূর্ব পাকিস্তানী। তিনি আরো বলেন যে, সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী জাতিসংঘের সেক্রেটারীয়েটে পাকিস্তানী কর্মচারীদের সংখ্যা ৩০ জন। এঁদের মধ্যে কে যে কোন প্রদেশের বাসিন্দা তার পুরো তথ্য এখনো পাওয়া যায় নি। এ পর্যন্ত যে ২৫ জনের তথ্য জানা গেছে তার মধ্যে ২১ জন পশ্চিম পাকিস্তানী এবং ৪ জন পূর্ব পাকিস্তানী। ডঃ আলীম-আল-রাজীর এক প্রশ্নের জবাবে জনাব আওয়াল জানান যে, পররাষ্ট্র দফতরে ১০৪ জন প্রথম শ্রেণীর মধ্যে ৩০ জন পূর্ব পাকিস্তানী এবং ২০৪ জন ২য় শ্রেণীর ননগেজেটেড কর্মচারীর মধ্যে ৫৫ জন পূর্ব পাকিস্তানী।

।। ১৮ই মার্চ, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ।।

জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক গতকাল জানান যে, ১৯৬৩ সাল হতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষা দফতর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সর্বমোট ৩৫টি বৃত্তির মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী ছাত্রদের ৩০টি বৃত্তি দেয়া হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রগণ ৫টি বৃত্তি লাভ করেছে।

জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে জনাব কাশিম মালিক জানান যে, দেশের ২৩টি বেসামরিক বিমান বন্দরের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৮টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে রয়েছে ৭টি। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর ৪টি বন্দরও পি. আই. এ. ব্যবহার ক'রে থাকে।

।। ২৩শে মার্চ, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ।।

জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে তথ্য দফতরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মালিক আল্লা ইয়ার খান জানান যে, গত বৎসর জুন হতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে সরকার পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন

খাতে ব্যয় করেছেন পশ্চিম পাকিস্তানে ৭ লক্ষ ৮৬ হাজার ২১০ টাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানে ২ লক্ষ ২ শত ৯৩ টাকা।

তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন গতকাল বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৫টি ক'রে বেতার কেন্দ্র রয়েছে। এদের মধ্যে ট্রান্সমিটিং ক্ষমতা যথাক্রমে ১৬৫ কিলোয়াটসম্পন্ন পূর্ব পাকিস্তানে এবং ২৫৪·৫ কিলোয়াটসম্পন্ন পশ্চিম পাকিস্তানে রয়েছে। জনাব মুখলেসুজ্জামান খানের এক প্রশ্নের জবাবে মালিক আল্লা ইয়ার খান এক তথ্য প্রকাশ ক'রে বলেন যে, রেডিও পাকিস্তান ডিরেকটরেটে ২০ জন প্রথম শ্রেণীর অফিসারের মধ্যে ১৯ জন পশ্চিম পাকিস্তানী এবং ১ জন পূর্ব পাকিস্তানী রয়েছেন।

॥ ৫ই এপ্রিল, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ॥

কেন্দ্রীয় শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ দফতরের মন্ত্রী জনাব আলতাফ হোসেন অদ্য করাচীর 'তোগলক হাউসে' অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিনিয়োগ তফসীল বা কর্মসূচী ঘোষণা করেন—এই তফসীল অনুযায়ী মোট ২০০টি শিল্পে ১ হাজার ৮৮ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হবে ৫০২ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হবে ৫৮৬ কোটী ৭ লক্ষ টাকা। জনাব আলতাফ হোসেন উল্লেখ করেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনা আমলে বেসরকারী খাতে (প্রাইভেট সেক্টরে) দেশের দু'অঞ্চলের জন্য মোটামুটি বরাদ্দ হ'ল পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৪৬ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৫৪ ভাগ।

॥ ৪ঠা জুন, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ॥

গতকাল জাতীয় পরিষদে যোগাযোগ দফতরের পার্লামেন্টারী সেক্রে-টারীর ভাষণে প্রকাশ ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে যথাক্রমে ৫৩৩০টি ও ৬০২টি, পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে যথাক্রমে ৬,৬৩০টি এবং ১২৮৬টি।

।। ৭ই জুন, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ।।

গত ৫ই জুন কেন্দ্রীয় সংখ্যাতত্ত্ব অফিস কর্তৃক পরিবেশিত অস্থায়ী হিসেব থেকে জানা যায় যে, মে মাসে বহির্বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তান রফতানী করে ১২·৪৪ কোটী এবং পশ্চিম পাকিস্তান রফতানী করেছে ১১·৩২ কোটী টাকা। কিন্তু আমদানীর ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য করা হয়েছে ১৮·৭২ কোটী টাকা এবং পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছে ৮·৪৬ কোটী টাকা।

।। ১০ই জুন, ১৯৬৬, দৈনিক ইত্তেফাক ।।

গতকাল জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে এক তথ্যে প্রকাশ রাষ্ট্রদূতসহ প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী রয়েছেন ৫৮ জন, পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ১৭৯ জন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী যথাক্রমে ৪৮, ১৭ ও ৮ জন এবং পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী রয়েছেন যথাক্রমে ১৯৬, ৫৮ এবং ৮৯ জন। উভয় প্রদেশের শতকরা হার হ'ল পূর্ব পাকিস্তানী ২০·১৮% এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ৭৯·৮২%।

।। ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ।।

জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে গতকাল অর্থনৈতিক দফতরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জানান যে, ১৯৬২—১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান লাভ করেছে ১০৫৭টি বৃত্তি আর পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে ১৯৫১টি বৃত্তি। এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯৬০—১৯৬৫ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ২৫ লক্ষ ২২ হাজার ৯১৯ টাকা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৩১ লক্ষ ৭১ হাজার ১১৯ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়েছে। অর্থনৈতিক দফতরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নওয়াব জান সাদিক আলী জনাব মুখলেসুর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে জানান, ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬৫-৬৬ সরকার আমেরিকা থেকে যে ২৫ কোটী ৮০ লক্ষাধিক ডলার ঋণ গ্রহণ করেন তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনাসমূহে ৪ কোটী ৭০ লক্ষ ৪৭ হাজার ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হয় এবং

পশ্চিম পাকিস্তান পরিকল্পনা খাতে ৫ কোটী ৮৩৩০ হাজার ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। অবশিষ্ট ডলার কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে খরচ করা হয়।

॥ ২৬শে নভেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥

গতকাল ডক্টর আলীম-আল-রাজীর এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র বিভাগের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জানান, স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রথম শ্রেণীর ৩২ জন কর্মচারীর মধ্যে ৫ জন পূর্ব পাকিস্তানী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১ জন রয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানী।

॥ ২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥

গতকাল জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় জনৈক সদস্যের প্রশ্নের জবাবে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব রফিক সায়গল জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনে কর্মরত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মচারীদের সংখ্যার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈষম্যের কথা স্বীকার করেছেন।

	পশ্চিম পাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানী
কেন্দ্রীয় দফতরে	১৪৪ জন	৫৫ জন
প্রথম শ্রেণীর	১৭ জন	৫ জন
দ্বিতীয় শ্রেণীর	৩১ জন	৮ জন

॥ ৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥

গতকাল জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব ইউসুফ আলী অভিযোগ করেন যে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পি. আই. এ-র কর্মচারীদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগের বেশী নয়। সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের একজনও লোক নাই।

বিরোধী দলীয় অপর সদস্য জনাব মুখলেসুজ্জামান খান বলেন যে, পি. আই. এ-র ১২ হাজার কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা মাত্র ৮০০ জন। এই ৮০০ জন কর্মচারীর অধিকাংশ পিয়ন, লোডার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

।। ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ।।

গতকাল জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব মুখলেসুজ্জামান খানের এক প্রশ্নের জবাবে কৃষি ও খাদ্য দফতরের মন্ত্রী জানান, কৃষি-সংখ্যাতত্ত্ব ও মার্কেটিং ইন্টেলিজেন্স বিভাগে মোট ৩৭২ জন কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ১০০ জন পূর্ব পাকিস্তানী।

জাতীয় পরিষদে আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে চাকরীতে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা সরকার স্বীকার করেন তার শতকরা হার নিম্নরূপ ঃ

পদ	পূর্ব পাকিস্তানী	পশ্চিম পাকিস্তানী
প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারীয়েট	১৯	৮১
দেশরক্ষা	৮˙১	৯১˙৯
শিল্প	২৫˙৭	৭৪˙৩
স্বরাষ্ট্র	২২˙৭	৭৭˙৩
শিক্ষা	২৭˙৩	৭২˙৭
তথ্য	২০˙১	৭৯˙৯
স্বাস্থ্য	১৯	৮১
কৃষি	২১	৭৯
আইন	৩৫	৬৫

।। ২রা ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ।।

গতকাল জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে ডঃ আলীম-আল-রাজীর এক প্রশ্নের জবাবে যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব খান এ. সবুর জানান, পাকিস্তানে মোট ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৪২টি টেলিফোন রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৩১ হাজার ৪৩৪টি পূর্ব পাকিস্তানে আর অবশিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানে রয়েছে।

ডঃ রাজীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে খান সবুর বলেন, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে যেখানে পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের ২৬টি ইঞ্জিন, ১৪৬টি যাত্রীবাহী বগী ও ২৯৪টি মালবাহী বগী ছিল, সেখানে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের জন্য ৭৮টি ইঞ্জিন, ৪৫৮টি যাত্রীবাহী বগী ও ৬৯৫৯টি মালবাহী বগী ছিল।

বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব মুখলেসুজ্জামান খানের এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য দফতরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব নূরুল হক চৌধুরী জানান, কেন্দ্রীয় আমদানী-রফতানী নিয়ন্ত্রণ দফতরে ৮৯ জন একজি-কিউটিভ অফিসারের মধ্যে মাত্র ১৬ জন পূর্ব পাকিস্তানী ও ৭৩ জন পশ্চিম পাকিস্তানী এবং ৪৫ জন সহকারী আমদানী-রফতানী কন্ট্রো-লারের মধ্যে মাত্র ১৫ জন পূর্ব পাকিস্তানী ও বাকী ৩০ জন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী।

ডঃ রাজীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে আইন দফতরের পার্লা-মেন্টারী সেক্রেটারী বলেন, ইসলামী গবেষণা সংস্থা উর্দু ভাষায় ৪টি পুস্তক প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু বাংলা ভাষায় একটিও করা হয় নি। এই সংস্থায় কর্মরত ২৮ জন অফিসারের মধ্যে মাত্র ৬ জন পূর্ব পাকিস্তানী।

॥ ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে দেশরক্ষা দফত-রের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী কর্তৃক প্রদত্ত এক অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে প্রকাশ, চাকুরী সন্ধানী পূর্ব পাকিস্তানীদের ব্রিটেন যাবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান হ'তে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ভাউচার প্রদান প্রথা বিলুপ্ত করা হলেও পশ্চিম পকিস্তানে তা' টিকিয়ে রাখা হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ চলতি সালের জানুয়ারী হ'তে অক্টোবর পর্যন্ত সময়কালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের লণ্ডন যাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে মাত্র ৮৭৯ জন হয়েছে, সেখানে একই সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানী লণ্ডন যাত্রীর সংখ্যা ৫১৮৬ জন। ১৯৬৫ সালে সেকশন অফিসারের পদে উন্নীত ১৬ জন এ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মধ্যে একজনও পূর্ব পাকিস্তানী নেই। এস্টাবলিশমেন্ট দফতরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব শহীদুল্লাহ এই তথ্য প্রকাশ করেন।

॥ ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥

জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আওয়ামী লীগের জনাব নূরুল ইসলামের একটি প্রশ্নের জবাবে জানান, সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হেড

অফিসে কর্মরত ২০০ কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান হতে মাত্র ২৭ জন কর্মচারী রয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারের পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের একজন কর্মচারীও নেই।

॥ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥

গতকাল জাতীয় পরিষদে জনাব মালিক কাশিম জনাব মুখলেসুজ্জামান খানের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, পি. আই. এ. সি-র মোট ১২৩ জন সিনিয়র অফিসারের মধ্যে মাত্র ২৩ জন, ৭ জন ভাইস প্রেসিডেন্টের মধ্যে ১ জন এবং ৪ জন জেনারেল ম্যানেজারের মধ্যে ১ জন পূর্ব পাকিস্তানী রয়েছেন। তিনি আরো জানান, পি. আই. এ. সি-র দেশী এবং বিদেশী স্টেশনসমূহে কর্মরত মোট ১০ হাজার ৯৫০ জন কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ২ হাজার ৩ শত ৫৯ জন পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দা।

॥ ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥

অর্থ দফতরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ খান ডঃ আলীম-আল-রাজীর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সদর অফিসে ২০৩ জন কর্মচারী রয়েছেন, তন্মধ্যে মাত্র ৬৪ জন পূর্ব পাাকস্তানী।

॥ ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥

দেশরক্ষা দফতরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ মালিক কাশিম সদস্য জনাব নূরুল ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে গতকাল জানান, পি. আই. এ-র ১ শত ৩ জন বিমানবালার মধ্যে মাত্র ৪ জন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী।

॥ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥

পররাষ্ট্র দফতরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব আবদুল আওয়াল ভুঁইয়া এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, ২৮ জন রাষ্ট্রদূতের ৪ জন, ৯ জন মন্ত্রীর ৪ জন, ২৭ জন উপদেষ্টার ১৩ জন এবং ২৪ জন প্রথম শ্রেণীর সেক্রেটারীর মধ্যে মাত্র ১১ জন পূর্ব পাকিস্তানী রয়েছেন।

॥ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬, দৈনিক আজাদ ॥

পাক আমলে ৮টি আর্থিক বছরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথা-পিছু আয়ের মধ্যকার বৈষম্য সামগ্রিকভাবে শতকরা ৪১ ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে।

বৈষম্যের কয়েকটি দিক—

বেসরকারী খাতে পূর্ব পাকিস্তানের পুঁজি বিনিয়োগ ১৯৬৫-৬৬ সালে শতকরা ২২ ভাগ	পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৭৮ ভাগ।	পুঁজি বিনিয়োগ তফসীল পূর্ব পাকিস্তান ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ সালে শতকরা ৩৩ ভাগ	পশ্চিম পাকিস্তানে উক্ত দু'বৎসরে শতকরা ৬৭ ভাগ
পিকিক-এর ঋণ ১৯৬৫-৬৬ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ২২·২০ ভাগ।	পশ্চিম পাকিস্তানে উক্ত সময়ে শতকরা ৭৭·৮০ ভাগ।	শিল্প ব্যাঙ্কের ঋণ ১৯৬৫-৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ২৪ ভাগ	পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৭৬ ভাগ

১৯৬০-৬১ ও '৬১-৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান রফতানীতে পাকিস্তানের শতকরা ৭০ ভাগ আয় করতো। বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের রফতানী বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান ১৯৬৭ সালে শতকরা মাত্র ৫৬ ভাগ রফতানী আয় করেছে।

॥ ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭, সাপ্তাহিক পূর্বদেশ ॥

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আমদানী-রফতানী সম্পর্কিত ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের ফলে পূর্ব পাকিস্তান একাধারে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার দিক হতে দারুণভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের দিক থেকেও মার খাচ্ছে।

১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ১০ বছরে সাড়ে চারশত কোটী টাকার অধিক পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে। এই সময় পর্যন্ত ৬৪৬ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকার পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য পূর্ব পাকিস্তানে আমদানী করা হয়, আর পূর্ব পাকিস্তান

থেকে তার বদলে পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানী করা হয় মাত্র ২৯৬ কোটী ৯১ লক্ষ টাকার পণ্য।

১৯৬৫ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৬৬ সালের ডিসম্বর পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৮০ কোটী ২৮ লক্ষ টাকার পণ্য পূর্ব পাকিস্তানে আমদানী করা হয়। আর পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানী হয় মাত্র ১০৩ কোটী ২৮ লক্ষ টাকার পণ্য। এই বৎসরে ৮৩ কোটী টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছে।

১৯৬৪-৬৫ সালেও পশ্চিম পাকিস্তানে এমনিভাবে পাঠানো হয়েছে ৩৫ কোটী টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালে ৩৮ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা, ১৯৬২ সালে ৪৮ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা।

আমদানীর ব্যবধান

১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আমদানীর পরিমাণ যথাক্রমে ৫১ কোটী ১২ লক্ষ টাকার পণ্য ও ৫২ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা, পক্ষান্তরে ঐ বৎসরসমূহে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আমদানী করা হয় যথাক্রমে ৯০ কোটী ৫২ লক্ষ ও ১৩৬ কোটী ৬২ লক্ষ টাকার পণ্য।

॥ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭, সংবাদ ॥

পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের অধীনে জাহাজগুলিতে ডেক ও ইঞ্জিন রুমের ৩৯৩ জন অফিসারের মধ্যে মাত্র ৪৩ জন পূর্ব পাকিস্তানী আর বাকী ৩৫০ জনই পশ্চিম পাকিস্তানী।

পাকিস্তান শিপিং কর্পোরেশনের করাচীস্থ সদর দফতরে অফিসার, কেরানী, সাবরডিনেট স্টাফ মিলিয়ে ২৬০ জন কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল ৭৪ জন (৭ জন অফিসার, ৫৭ জন কেরানী ও ১০ জন সাবরডিনেট) আর চট্টগ্রাম, খুলনা ও ঢাকা অফিসের অফিসার, কেরানী ও সাবরডিনেট স্টাফ মিলে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল ৩৫ জন অফিসার (১ম শ্রেণী ১৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণী ২২ জন, কেরানী ৮০ জন, সাবরডিনেট ২৪ জন)। পক্ষান্তরে ৬ জন ডেপুটেশনিস্ট ছাড়াও ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণী মিলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল ৫৬ জন, কেরানী ১০৬ জন ও সাবরডিনেট ১৯ জন।

॥ ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮, দৈনিক আজাদ॥

জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে, ১৯৬৭ সালে জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ককে ৩ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে ৫ কোটী ২ লক্ষ টাকার কৃষি ঋণ দেয়া হয়েছে। মোট কথা পূর্ব পাকিস্তানকে ১ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা কম দেয়া হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৬ মাসের (জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) কৃষি ঋণের হিসেবে দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা প্রায় আড়াই গুণ অধিক ঋণ পেয়েছে।

॥ ৩রা জুলাই, ১৯৬৮, দৈনিক পাকিস্তান॥

যোগাযোগ বিভাগের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব রফিক সায়গল গত ২।৭।৬৮ তারিখে জাতীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, Post Office Directorate-এর জন্য কোন Asstt. Director-এর পদ মঞ্জুর করা হয় নি। তবে করাচীস্থ সি. এ. ও. (Central Accounting Office)-তে এ ধরনের দুটি পদ রয়েছে। এ ধরনের পদগুলির মধ্যে একটি পদে একজন পূর্ব পাকিস্তানী নিযুক্ত রয়েছেন।

॥ ৬ই জুলাই, ১৯৬৮, দৈনিক আজাদ॥

সরকারী এক ঘোষণা থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তান ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য চলতি সালের নিমিত্ত বার্ষিক প্ল্যান অনুযায়ী ৩০ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অপরপক্ষে পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাবদ ১৫ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন পরিসংখ্যানের সূত্র থেকে আইয়ুবী শাসনে উভয় প্রদেশের মধ্যে বৈষম্যের যে চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে তার একটি উল্লেখযোগ্য নমুনা এখানে তুলে ধরা হ'লঃ

॥ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ॥

(শতকরা হারে)

বিষয়	পঃ পাক	পূঃ পাক
বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মদ্রা	৮০%	২০%

(শতকরা হারে)

বিষয়	পঃ পাক	পূঃ পাক
বৈদেশিক সাহায্য (মার্কিন সাহায্য ছাড়া)	৯৬%	৪%
মার্কিন সাহায্য	৬৬%	৩৪%
পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন	৫৮%	৪২%
পাকিস্তান শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন	৮০%	২০%
শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক	৭৬%	২৪%
গৃহ নির্মাণ	৮৮%	১২%
মোট গড়পড়তা ব্যয়	৭৭%	২৩%

[*Why Bangladesh*—by A group of Scholars in Viena : Bangladesh Documents, P. 16.]

আইয়ুবী শাসনের এই উন্নয়ন দশক স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের পক্ষে উৎফুল্লজনক ছিল। কিন্তু বাংলার নিপীড়িত, নিষ্পেষিত জনগণ সরকারের মুখে থুথু না ছিটিয়ে পারেন নি। তাঁদের কাছে মনে হ'ল, সরকারের উন্নয়ন দশক উদ্যাপন আসলে এক নগ্ন উপহাস। তাঁরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন এবং এই উৎসবের আয়োজনকে তছ্‌নছ্‌ ক'রে দেবার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন।

এই 'উন্নয়ন দশক উৎসব' আইয়ুবের পক্ষে মারাত্মক পরিণতির সূচনা বয়ে আনলো। উন্নয়ন দশকের নামে "এই প্রবঞ্চনার সত্যটি যখন উদ্ঘাটিত হ'ল তখন অন্য কোন লাভের আফিম খাইয়ে বাঙালীকে আর ঘুম পাড়িয়ে রাখা গেল না। অর্থের প্রশ্নটি যখন সামনে এসে দাঁড়ালো, ধর্মের বাঁধন তখন গেল টুটে। এক জাতি, এক প্রাণ একতার মোহটাকে ভেঙে নবজাতীয়তায় মোক্ষ সন্ধান করলো বাঙালী। উদ্দীপ্ত হ'ল বাংলার মুক্তি আন্দোলন।"

[বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত: মতিলাল পাল, রক্তাক্ত বাংলা, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ১৫৪]

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম আবার আস্তে আস্তে নব দিগন্তের পথে যাত্রা শুরু করলো—এবারের সংগ্রামের ভিত্তি গণ-আন্দোলন। আইয়ুবের গুণগ্রাহী মওলানা ভাসানীও শেষ পর্যন্ত আইয়ুব-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি আইয়ুব সরকারের বিরোধিতা

করা প্রতিটি জনগণের নৈতিক কর্তব্য বলেও মত প্রকাশ করলেন। ৩রা নভেম্বর (১৯৬৮) পল্টন ময়দানে এক জনসভায় সরকারের তীব্র সমালোচনা ক'রে এই বর্ষীয়ান নেতা বলেন যে, দারিদ্র্য প্রপীড়িত জন-সাধারণের কল্যাণ সাধনে সরকার ব্যর্থ, তাই আইয়ুব খানকে এই মুহূর্তে পদত্যাগ করা উচিত। তিনি আরো বলেন যে, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী আজ প্রদেশের এক সার্বজনীন দাবীতে পরিণত হয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের দাবীর সাথে সাথে মওলানা ভাসানী রাজবন্দীদের মুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জরুরী আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবীও সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে সরকার আবার দমন-নীতির মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায়ের দাবীকে নস্যাৎ ক'রে দেবার প্রচেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠলে, প্রতিবাদে ছাত্র-জনতার সাথে সাথে প্রদেশের বুদ্ধিজীবী মহল রাস্তায় নেমে পড়েন।

১৮ই নভেম্বর ('৬৮) ঢাকার আইনজীবীরা সরকারী দমন-নীতির প্রতিবাদে কালো কোট ও কালো টাই পরিধান ক'রে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুনসহ এক বিরাট মিছিল বের করেন। তাঁদের দাবী-দাওয়ার মধ্যে ছিল "রাজবন্দীদের মুক্তি চাই", "পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা চলবে না", "কালা কানুন বাতিল কর", "স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক", "স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে", "বিনা বিচারে আটক রাখা চলবে না", "জরুরী আইন প্রত্যাহার কর", "সরকারী নির্যাতন বন্ধ কর" "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক", "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে", "সার্বজনীন ভোটাধিকার দিতে হবে", "দ্রব্যমূল্য হ্রাস কর", "শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন প্রত্যাহার কর", "কৃষকদের বর্ধিত খাজনা নেওয়া বন্ধ কর", "শিক্ষা সংকোচন-নীতি বাতিল কর", "শিক্ষা বিভাগে সরকারী হস্তক্ষেপ বন্ধ কর", "ছাত্র-জনতার দাবী মানতে হবে", "একনায়কত্ব ধ্বংস কর" প্রভৃতি।

মিছিল বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জমায়েত হলে পর সমিতির সভাপতি বলেন, "আমাদের এই বিক্ষোভ মিছিল কোন নতুন সংগ্রাম নয়, আমাদের সংগ্রাম বহু পূর্বেই শুরু হয়েছে। আজকের মিছিল তারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

সেদিন ছাত্ররাও সারা প্রদেশব্যাপী প্রতীক প্রতিবাদ দিবস পালন করেন। সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল।

সে আন্দোলনের নেতা ছিলেন আইয়ুব কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো। এখানে বলে রাখা ভাল যে, তাঁদের সে আন্দোলনের পেছনে পূর্ব বাংলার মত অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক মুক্তি'র কোন দাবী ছিল না। যা ছিল তা' হ'ল ক্ষমতা দখলের লড়াই। ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের যুবশক্তিকে সংহত ক'রে নিজের অনুকূলে নেবার চেষ্টা করলেন এবং সেই কাজে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করলেন। সুদীর্ঘ স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এমনিতেই সেখানে জনমত ও তরুণ সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ ছিল। ভুট্টোর নিজের চিন্তায় যত স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্যই থাক, সময়মত সুচতুর পন্থায় অগ্রসর হয়ে এই পরিবেশকে তিনি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করলেন। নিজে একটি দল গঠন করলেন এবং গালভরা নাম দিলেন 'পিপল্‌স পার্টি'।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপল্‌স পার্টি

এই রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে তিনি আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুললেন। লারকানার নবাব নিম্নশ্রেণীর জনগণকে নবাব, জমিদার ও শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। ভুট্টো বার বার ঘোষণা করতে লাগলেন যে, তিনি ক্ষমতায় যেতে পারলে ধনী-নির্ধন সবাইকে এক পর্যায়ে এনে ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন।

সাধারণ জনগণ এবং তরুণ সমাজ তাঁর এরকম ভাল কথা স্বাভাবিক-ভাবেই লুফে নিল—কেননা এ ধরনের কথা আর কোন পশ্চিমা রাজনৈতিক দল কোন দিন শোনান নি। ফলে তুখোড় যৌবনের চাঞ্চল্যে উৎক্ষিপ্ত রাজনীতিবিদ ভুট্টো অতি সহজেই জনগণের সমর্থন আদায় ক'রে নিয়ে আইয়ুবের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহসী হলেন।

আইয়ুব সরকারের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র বেড়ে গেল। এতদিন তিনি পূর্ব বাংলার জনগণকে দমন করতেই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ভুট্টোকে বরখাস্ত করার পরিণতি যে এমন মারাত্মক হবে তা' তিনি ভাবতেও পারেন নি। তাই এখন পশ্চিম খণ্ডেও তাঁর নিজস্ব লোকজনকে লেলিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। ভুট্টো সাহেবকে গ্রেফতার করা হ'ল। গ্রেফতার হলেন তাঁর অনেক সহকর্মী, তাঁর মিছিলের ওপর চালানো হ'ল নির্বিচারে গুলী।

ভুট্টোর গ্রেফতার ও তাঁর সভা-মিছিলের ওপর গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে

পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতাও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতার প্রধান উদ্দেশ্য স্বৈরাচারী আইয়ুবের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া, ভুট্টো একটি উপলক্ষ মাত্র।

ক্রমাগত কয়েক দিন ধরেই এদেশের ছাত্র-জনতা পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-গণহত্যা ও গ্রেফতার-নির্যাতনের প্রতিবাদে মিছিল-সভা ক'রে অবিলম্বে তা' বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানালেন।

২৯শে নভেম্বর (১৯৬৮) পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-সমাজের যে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় তা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐদিন ঢাকার সর্বদলীয় ছাত্র-সমাজ নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত এক সভায় শাসকগোষ্ঠীর কঠোর নিন্দা ক'রে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া পেশ করা হয়। তারপর তাঁরা একটি বিরাট মিছিল বের ক'রে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মিছিলে ছাত্রগণ 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ', 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে', 'গণতন্ত্র ফিরিয়ে দাও', 'জরুরী আইন বর্জন কর', 'প্রহসনী নির্বাচন বন্ধ কর', 'বন্যা সমস্যার সমাধান চাই' প্রভৃতি দাবী-দাওয়া লিখিত প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার ব্যবহার করেন এবং শ্লোগান দান করেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এই সময় জোরদারভাবে সভা-সমিতি ও মিছিলের মাধ্যমে ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনকে মারমুখী ক'রে তোলেন।

এই উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালীপন্থী) সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন আওয়ামী লীগ, ভাসানী-পন্থী ন্যাপ ও পি. ডি. এম-এর নেতৃবৃন্দের নিকট অবিলম্বে একটি নেতৃ-বৈঠকে শরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এক পত্র দেন। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এই ঐক্যের আহ্বানে সাড়া দেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদে ১লা ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় সাংবাদিকগণ ও সংবাদপত্রসেবীরা মিছিল বের ক'রে গভর্নর হাউজের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা এক সভায় মিলিত

হয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

২রা ডিসেম্বর ('৬৮) আড়াই বছর আটক থাকার পর আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি-লাভের পর তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়।

সরকারী দমন-নীতির বিরুদ্ধে পি. ডি. এম'-এর পূর্বাঞ্চল শাখা দশ-দিনব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং ডিসেম্বরের ৪ তারিখ থেকে তা' শুরু করেন।

ভাসানীপন্থী ন্যাপ, কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের মিলিত উদ্যোগে পল্টন ময়দানে ঐদিন এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে সরকার এই ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে-ছিলেন, পরে বাধ্য হন। সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী "বর্তমান দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করতঃ ক্ষমতার আসন ত্যাগ করিয়া অবসর জীবন যাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রতি আহ্বান জানান।" তিনি প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর মোনেম খানকে তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

মওলানা ভাসানী পাকিস্তান আন্দোলনের অঙ্গীকারের প্রতি সততা প্রদান ক'রে অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী মেনে নেওয়ার জন্য শাসকশ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "এই দাবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন চলিতে থাকিলে পূর্ব পাকি-স্তানবাসী বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন পূর্ব বাংলা গঠন করিবে।"

ঐস ভায় রিক্সাচালকদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে পরদিন ঢাকা শহরে হরতাল আহ্বানের জন্য রিক্সাচালক ইউনিয়নের জনৈক কর্মকর্তা মওলানা সাহেবকে অনুরোধ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা' মেনে নিয়ে পরদিন এক হরতালের আহ্বান করেন। এই সাথে সাথে তিনি গভর্নর মোনেমের ভবন ঘেরাও ক'রে দাবী-দাওয়া পেশ করার জন্য আহ্বান জানান।

ঐ দিন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী

লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিবৃতিতে ন্যাপ-আওয়ামী লীগের যুক্ত উদ্যোগে ১৩ই ডিসেম্বর ('৬৮) 'দমন-নীতি প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য আহ্বান জানান।

মওলানা ভাসানীর আহ্বানে ৭ই ডিসেম্বর ঢাকা শহরে যথানিয়মে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। কিন্তু সরকার জঘন্যভাবে হরতাল পালনকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই দিনের হরতাল ও পুলিশী নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন ঢাকায় প্রকাশিত দৈনিক সাংবাদপত্রগুলো। ৮ই ডিসেম্বরের একটি দৈনিক থেকে এর অংশবিশেষ তুলে ধরছি ঃ

হরতাল

"বিক্ষুব্ধ জনতা পুরানা পল্টন মোড়ে অবস্থিত পেট্রোল পাম্প, পি. আই.এ-র নিকট একটি গাড়ী এবং কতিপয় আইল্যাণ্ডের গাছপালা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে।

পুলিশ সারা দিন বিভিন্ন এলাকায় সময় সময় দোকানপাট এবং সরকারী বেসরকারী ভবনে প্রবেশ করিয়া জনতার উপর লাঠিচার্জ করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। মগরেবের নামাজের পর পুলিশ বায়তুল মোকাররমে প্রবেশ করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণকারী ভীত-সন্ত্রস্ত বালকসহ বহু লোককে প্রহার করে এবং মসজিদ হইতে প্রায় ৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শহরে পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনীর গুলীবর্ষণ, বিভিন্ন স্থানে পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপে তিন জন নিহত ও কমপক্ষে ত্রিশজন আহত হয়।

॥ এই ঘটনার সূত্রপাত ॥

দোকানের অভ্যন্তরে...সকাল প্রায় ১১ টার সময় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য নীলক্ষেতের নিকট পুলিশ সর্বপ্রথম লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠিচার্জে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু স্বল্পক্ষণ পর আবার জমায়েত হইয়া পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এই সময় সর্বপ্রথম গুলী বর্ষণ করা হয়। উক্ত গুলী বর্ষণে পাক ইলেকট্রিক শপের ম্যানেজার জনাব আবদুল মজিদ ও কর্মচারী জনাব আবদুল

হক আহত হয়। বুলেট আবদুল মজিদের বক্ষে লাগে। তাঁহাদের হাসপাতালে প্রেরণ করা হইলে তথায় জনাব মজিদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

॥ গুলিস্তানের নিকট ॥

বেলা প্রায় ১১-৪০ মিনিটের সময় গুলিস্তানের নিকট গুলী বর্ষণ করা হয়। ফলে একটি বালক ঘটনাস্থলেই নিহত এবং আরো তিনজন গুরুতরভাবে আহত হয়।

॥ আবার গুলী বর্ষণ ॥

বেলা প্রায় সোয়া একটার সময় ইডেন বিল্ডিং সেকেণ্ড গেটের নিকট বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুনর্বার গুলী বর্ষণ করা হয়। উক্ত গুলী বর্ষণে সোহেল আহমদ নামক জনৈক ব্যক্তি আহত হয়।

॥ সর্বশেষ গুলী বর্ষণ ॥

সন্ধ্যা ৫ টার সময় নবাবপুর রেল ক্রসিং-এর নিকটে সমবেত জনতার প্রতি উক্ত দিনের সর্বশেষ গুলী বর্ষণ করা হয়। ফলে আবদুস সাত্তার নামক জনৈক ব্যক্তি আহত হয়।

[দৈনিক সংবাদ, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮]

গুলী বর্ষণে কমপক্ষে তিন জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হওয়া ছাড়াও পুলিশ প্রায় তিন শতাধিক লোককে গ্রেফতার করে।

পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনীর এই জঘন্য নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া অচিরেই শুরু হ'য়ে গেল। এই পরিস্থিতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার দাবী জানিয়ে সে দিনই জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কয়েক ঘন্টার জন্য সভার কাজ মুলতবী রাখার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সরকার পক্ষের সদস্যগণ উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করলে উভয় পক্ষে প্রবল তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলীয় সদস্যগণ পরিষদ অধিবেশন বর্জন ক'রে আহতদের দেখার জন্য শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গমন করেন।

ঢাকায় পুলিশের গুলী বর্ষণ, বেপরোয়া লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, ব্যাপক গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রদেশে প্রতিবাদের ঝড় শুরু হয়। গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে পরদিনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করা হয়। ঐ দিন কর্মরত সাংবাদিকের ওপর পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে পরদিন অর্থাৎ ৯ই ডিসেম্বর সারা দেশে সাংবাদিকগণ ধর্মঘট পালন করেন। সেদিন শান্তিপূর্ণ হরতাল পালনের মাধ্যমে সংযুক্ত বিরোধী দল আহূত দমন-নীতি প্রতিরোধ দিবসকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে ডক্টর কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আবদুল হক, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার ভিখারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও ইসমাইল খানসহ ঢাকা হাইকোর্ট বার ও ঢাকা জেলা বারের অর্ধশতাধিক আইনজীবী একটি বিবৃতি প্রদান করেন। অটোরিক্সা ড্রাইভার্স এবং রিক্সাচালক সমিতিও 'দমন-নীতি প্রতিরোধ দিবস' পালনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

এলো ১৩ই ডিসেম্বর। এদিনও সারা প্রদেশে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে পূর্ণ হরতাল পালিত হ'ল। আদমজী-টঙ্গীর কলকারখানার শ্রমিকরা মিছিল সহকারে সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। পুলিশ তাদের মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং বহু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও ই. পি. আর. মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ ছাড়া তারা ৩৬ জন লোককে গ্রেফতার করে। এদিকে চট্টগ্রামে সেদিন চট্টগ্রামের ইতিহাসে বৃহত্তম মিছিল বের হয়েছিল। সেখানেও পুলিশ লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলী বর্ষণ করে। গুলী বর্ষণে ১২ ব্যক্তি আহত হয়। পরদিন আহতদের একজন শাহাদৎ বরণ করেন। পুলিশ সহস্রাধিক লোককে গ্রেফতারও করেছিল।

১৭ই ডিসেম্বর সম্মিলিত বিরোধী দলের এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে গুলী বর্ষণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করা হয়।

পরদিন সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, "জনগণের সম্মিলিত আন্দোলনের মোকাবিলা করার সাধ্য সরকারের নাই।" তিনি বিরোধী দলগুলোর

প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালে সেদিনই ওয়ালীপন্থী ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ তাঁর সে আহ্বানে সাড়া দেন।

অবশেষে ৮ই জানুয়ারী (১৯৬৯) একনায়কত্বের অপসারণ ও মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ৮-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্মিলিত বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (Democratic Action Committee) গঠিত হ'ল। দেশের প্রধান ৮টি বিরোধী দলের এই ঐক্যফ্রন্ট ঐদিন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়ঃ

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠন

"আমরা নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, জামিয়াতুল উলেমা-ই-ইসলাম, পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও পি. ডি. এম-এর অঙ্গদল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ, পাকিস্তান জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও জামাতে ইসলামের প্রতিনিধিগণ দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, দেশে বর্তমান স্বৈরাচারী ও নিপীড়নমূলক এক ব্যক্তির শাসন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয় ও ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে। বিশেষ করিয়া এই ব্যক্তির শাসন সচেতন নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন, গণতন্ত্র, জনগণের সার্বভৌমত্ব, সকল মৌলিক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে।

সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করিয়া ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী শ্রেণীর উপর বর্তমান সরকার নির্যাতন চালইবার অপরাধে অপরাধী।

বর্তমান অগণতান্ত্রিক সরকার দেশের সম্পদরাজি কতিপয় পরিবারের কুক্ষিগত করার জন্য সুপরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করিয়াছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন চক্র, আমলাতন্ত্র ও প্রশাসন-ব্যবস্থার সহিত জড়িত বিভিন্ন পর্যায়ের লোকের মধ্যে দুর্নীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। দুর্নীতি সরকারী ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অঙ্গের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

ব্যাপকভিত্তিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার, সম্পূর্ণ অন্যায়-ভাবে জরুরী অবস্থা বলবৎ রাখা, মৌলিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা হরণের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমানভাবে স্বেচ্ছাচারী সরকার নির্যাতনমূলক

শাসন চালাইয়া যাইতেছে। এই সরকার এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৈষম্য বৃদ্ধির গতি অপ্রতিহত রহিয়াছে, এই অবস্থায় অর্থনৈতিক সুযোগ ও সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে সাধারণ মানুষ অসহ্য মুদ্রাস্ফীতি ও সম্পূর্ণ ক্ষমতাবহির্ভূত উচ্চমূল্যের অসহায় শিকারে পরিণত হইয়াছে। উপরোক্ত সরকার দেশের সামরিক শক্তি ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা জোরদার করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। উপরন্তু সরকার দেশের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্ষমতাহীনতা ও পরবাসীসুলভ মনোভাব জাগ্রত করিয়াছে।

বর্তমান দুর্যোগপূর্ণ জাতীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উপরোল্লিখিত অন্যায় ও দুর্নীতির প্রতিকার ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উল্লেখিত দলসমূহের প্রতিনিধিগণ পাকিস্তানে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম ও জনগণকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনঃ প্রদানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্ব স্ব দলের দ্ব্যর্থহীন সংকল্পের কথা ঘোষণা করিতেছে। দেশে তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জনের জন্য স্ব স্ব দলের দ্ব্যর্থহীন সংকল্পের কথা ঘোষণা করিতেছে ঃ

(ক) ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার।

(খ) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন।

(গ) অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার।

(ঘ) নাগরিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও সকল কালো আইন, বিশেষ করিয়া বিনা বিচারে আটক ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল।

(ঙ) শেখ মুজিবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান ও জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজবন্দী, আটক ছাত্র, শ্রমিক ও সাংবাদিককে মুক্তিদান ও অদালতে এবং ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন সকল মামলার প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক মামলা জারীকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার।

(চ) ১৪৪ ধারা মতে জারীকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার।

(ছ) সংবাদপত্রের উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, নতুন ডিক্লারেশন প্রদান, পত্রপত্রিকা ও সাময়িক পত্রের বাজেয়াপ্তি নির্দেশ প্রত্যাহার এবং 'ইত্তেফাক' ও 'চাত্তান'সহ যে ক্ষেত্রে ডিক্লারেশন বাতিল করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে উহা পুনঃ প্রদান, প্রোগ্রেসিভ পেপারস্ লিঃ-কে উহার সাবেক মালিকদের পুনঃ প্রদানের জন্যও সংকল্প গ্রহণ করা হইতেছে।

এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী সকল দলের বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত ও সংকল্প হইতেছে যে, অবাধ ও পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ না হইলে বর্তমান ব্যক্তি-স্বাধীনতাবিবর্জিত ও অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত যে কোন নির্বাচনই পাকিস্তানের জনগণের নিকট প্রবঞ্চনা বলিয়াই বিবেচিত হইবে। আমরা তাই আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি ও নির্বাচন বর্জনের জন্য জনগণের নিকট আহ্বান জানাইতেছি।

সমগ্র দেশে বর্তমান ব্যাপক গণ-জাগরণে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পাকিস্তানের জনগণ বর্তমান একনায়কতন্ত্র ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমাদের এই ব্যাপারে কোন সংশয় নাই এবং আমরা কৃতসংকল্প যে সমগ্র দেশে যে গণ-আন্দোলনের জোয়ার প্রবাহিত হইতেছে, স্বেচ্ছাচারী ও নির্যাতনকারী সকল শক্তিকে ভাসাইয়া না নেয়া পর্যন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। আমরা স্ব স্ব দলের পক্ষে এই মর্মে সংকল্প ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা এবং আমাদের দলসমূহ এই বিরাট ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমিক দায়িত্ব পালন ও উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহের পূর্ণ ও দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন, অহিংসক, সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল গণ-আন্দোলন জোরদার করার জন্য যে কোন আত্মত্যাগে কুণ্ঠিত হইব না।"

ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন ঃ

(১) জনাব আমীর হোসেন শাহ, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, (২) মোহাম্মদ আলী, সভাপতি, নেজামে ইসলাম পার্টি, (৩) মুফতী মাহমুদ, সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে উলেমা-ই-ইসলাম, (৪) জনাব মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা, সভাপতি,

পাকিস্তান মুসলিম লীগ, (৫) জনাব নসরুল্লাহ্ খান, সভাপতি, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, (৬) জনাব নূরুল আমীন, সভাপতি, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, (৭) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত), পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, (৮) জনাব তোফায়েল মিয়া, আমীর (ভারপ্রাপ্ত), জামাতে ইসলাম, পাকিস্তান।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৬৯]

এই ঘোষণার সাথে সাথে সর্বত্র তা' বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়। এবং ডাক-এর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দুর্জয় শপথ গ্রহণ করা হয়।

মওলানা ভাসানী ১২ই জানুয়ারী ('৬৯) দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, সরকার বিরোধী আন্দোলন ও অর্থনৈতিক অবস্থাদি পর্যালোচনার জন্য এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে তিনি বলেন, দেশের সর্বত্র এমন ব্যাপক ও সর্বাত্মক কার্যকরী গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে বর্তমান শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়।

এর দু'দিন পর ঢাকার হাতিরদিয়ায় এক গণ-সমাবেশে তিনি বলেন, জনসাধারণের ভোটাধিকার, লাহোর প্রস্তাবে উল্লিখিত পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিব।

এদিকে যেদিন 'ডাক' গঠিত হয় সেদিনই আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রস্তাবে আগামী সাধারণ নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আরেক প্রস্তাবে দলীয় সদস্যদের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যপদ থেকে ইস্তাফা দেওয়ার আহ্বান জানান হয়।

১২ই জানুয়ারী 'ডাক' প্রাদেশিক সমন্বয় কমিটির এক সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে ১৭ই জানুয়ারী নিম্নলিখিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে 'দাবী-দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

(ক) পল্টনে জনসভা অনুষ্ঠান।

(খ) শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকার প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ।

(গ) যদি ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা না হয় তা' হ'লে তিনজন ক'রে শোভাযাত্রা বের করা।

নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ১৭ই জানুয়ারী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে দেশব্যাপী 'দাবী-দিবস' উদযাপিত হয়। সরকার ১৪৪ ধারা জারী করেন এবং তা' লঙ্ঘন করলে যে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে পূর্বাহ্ণেই এই হুমকি প্রদর্শন করা হয়। তথাপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমাজ ১৪৪ ধারা উপেক্ষা ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত ছাত্র-সভা শেষে মিছিলযোগে রাজপথে নেমে এলে রাস্তায় অপেক্ষমান পুলিশের সাথে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ মিছিলকারী ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে, এবং ২৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের কয়েকজনকে পুলিশ নির্মমভাবে প্রহার করে। প্রহারের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় বর্ষ অনার্সের ছাত্র জনাব মোয়াররেফ হোসেন ও ঢাকা কলেজের বি. এ. ক্লাশের ছাত্র জনাব নূরুল ইসলামের মাথা ফেটে যায়।

পুলিশের এই নির্যাতনের প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র-সমাজ পরদিন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দুটো গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছিলেন। গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের পন্থা হিসেবে এই সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১-দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। যে ৬-দফায় পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ মাত্র। সংগ্রামী ছাত্র-সমাজ সেদিন যে ১১-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামে মৃত্যুপণ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তা' ইতিহাসের বুকে চিরদিন অম্লান থাকবে। ছাত্র-সমাজের বিখ্যাত ১১-দফা দাবী-গুলো নিম্নরূপ ঃ

১। (ক) আত্মনির্ভর কলেজগুলোকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি ছাড়তে হবে। জগন্নাথ এবং অন্যান্য যে সব কলেজকে এই আইনের আওতায় আনা হয়েছিল, তাদের সাবেক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসার যদি সত্যিই সরকারের কাম্য হয়, তবে গ্রামাঞ্চলে আরও অনেক স্কুল-কলেজ খুলতে হবে, যে সব স্কুল-কলেজ ইতিমধ্যে খুলেছে তাদের অনুমোদন দিতে হবে। কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই খুব বেশী, কাজেই সরকারের উচিত আরো বেশী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল স্কুল খোলা।

(গ) কলেজের সংখ্যা না বাড়ার দরুন ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। কাজেই প্রতিটি কলেজেই নৈশ বিভাগ খোলা উচিত।

(ঘ) ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজের মাইনে অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমাতে হবে। স্কলারশীপ এবং স্টাইপেণ্ডের পরিমাণ বাড়াতে হবে। আন্দোলন করার অপরাধে ছাত্রছাত্রীদের এইসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না।

(ঙ) হোস্টেলে খাওয়া খরচার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সরকারকে দিতে হবে সাবসিডি হিসেবে।

(চ) হল, হোস্টেল এবং অন্যান্য ছাত্রাবাসের বিভিন্ন অসুবিধা দূর করতে হবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) অধিকাংশ স্কুল-কলেজেই অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা খুব কম। সরকারকে এর মোকাবিলা করতে হবে এবং শিক্ষকদের বাক-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

(ঝ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(ঞ) মেডিক্যাল ইউনিভারসিটি খুলতে হবে। মেডিক্যাল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স এবং নমিনেশনে ভর্তির ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। নার্স ছাত্রীদের সমস্ত দাবী মেনে নিতে হবে।

(ট) প্রকৌশল শিক্ষায় অটোমেশন প্রথা এবং অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থা বিলোপ করতে হবে।

(ঠ) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্স'-এর সুযোগ দিতে হবে এবং ডিপ্লোমা দানের ভিত্তি হবে 'সেমিস্টার' পরীক্ষা।

(ড) কৃষিবিদ্যালয়ের ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মেনে নিতে হবে।

(ঢ) রেলপথে যাতায়াতের জন্য ছাত্রছাত্রীরা তাদের আইডেনটিটি কার্ড দেখালে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কনসেশনে টিকিট পাবে। বাসে দূরবর্তী

অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য এই একই সুবিধে ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত পূর্ব পাকিস্তানেও শহরের ভেতরে বাসভাড়া দশ পয়সা করতে হবে, যাতে শহরের যে কোন জায়গায় সহজেই যাওয়া যায়। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাওয়ার জন্যে আরও অনেক বাস চালু করতে হবে।

(ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা দিতে হবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল, জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট বাতিল করতে হবে। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গণমুখী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক করতে হবে।

২। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে। বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা চলবে না।

৩। পূর্ব পাকিস্তানের মেহনতি মানুষ চায়, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। এই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি হিসাবে তারা দাবী করে যে—

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেল ব্যবস্থাভিত্তিক। এই যুক্তরাষ্ট্রে আইন-পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই ক'টি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যান্য বিষয়ে প্রদেশগুলির ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ।

(গ) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা থাকবে এবং কেন্দ্রই হবে মুদ্রা-ব্যবস্থার পরিচালক। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন একটা সুনির্দিষ্ট বিধান রাখতে হবে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। একই কারণে দেশে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং দুই অঞ্চলে দুটি আলাদা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বসাতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে একটা আলাদা অর্থনীতি চালু করতে হবে।

(ঘ) সকল রকমের কর, খাজনা ইত্যাদি ধার্য এবং আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য

করার ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায় হওয়া মাত্রই ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলির উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য বহির্বাণিজ্যের আলাদা হিসাব রাখবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা তাদের অধীনেই থাকবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী সরবরাহ করবে। দেশে প্রস্তুত যে কোন জিনিসই অঙ্গরাজ্যগুলিতে আমদানী বা রফতানী করা চলবে। এর জন্য কোন শুল্ক থাকবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি করার বা বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন করার অধিকার অঙ্গরাজ্যগুলির থাকবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রকারখানা নির্মাণ এবং নৌবাহিনীর সদর দফতর বসাতে হবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সমস্ত রাজ্যকেই স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং এদের নিয়ে একটা সাব-ফেডারেশন গঠন করতে হবে।

৫। ব্যাঙ্ক, ইন্স্যুরেন্স, পাটের ব্যবসা এবং অন্যান্য বড় শিল্পের জাতীয়করণ চাই।

৬। কৃষকদের খাজনা ও ট্যাক্সের হার কমাতে হবে। বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করতে হবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল করতে হবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি চল্লিশ টাকা ধরতে হবে এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী, বোনাস, উপযুক্ত শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান দিতে হবে। ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ এবং জন-সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। জরুরী আইন, নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন তুলে নিতে হবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল ক'রে জোট-বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি চালু করতে হবে।

১১। দেশের বিভিন্ন জেলখানায় আটক সমস্ত ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। যাবতীয় গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া ও মামলা ফিরিয়ে নিতে হবে।

[মহানায়ক মুজিবুর : অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ,
কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ১৩৪-১৩৮]

এদিকে ছাত্রদের ১১-দফার দাবীতে ১৮ই জানুয়ারী ('৬৯) ছাত্রগণ যথারীতি ধর্মঘট পালন করে। কিন্তু ধর্মঘটী ছাত্রদের উপরে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ ক'রে শতাধিক ছাত্রকে আহত করে এবং বহু ছাত্র-নাগরিককে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে ৩৪ জন ছাত্রকে গ্রেফতারের কথা স্বীকার করা হয়। এক পর্যায়ে ছাত্র-পুলিশের খণ্ডযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে ই. পি. আর. বাহিনী তলব করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও পুলিশ ও ই. পি. আর. কর্ডন ভেদ ক'রে কয়েক শত ছাত্রের একটি দল দীর্ঘ মিছিল বের করতে সক্ষম হয়।

এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র গ্রুপের সদস্যগণ ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশী জুলুম এবং সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রতিবাদে একযোগে পরিষদ কক্ষ বর্জন করেন। তাঁরা পরিষদে পুলিশের নির্মম, জঘন্য ও বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে আলোচনা করতে সরকারী বিরোধিতারও তীব্র প্রতিবাদ করেন।

ছাত্র বিক্ষোভের তৃতীয় দিবসেও অর্থাৎ ১৯শে জানুয়ারীতে ঢাকায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে ও লাঠিচার্জ করে। বেলা ১১টার দিকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র ১৪৪ ধারা অমান্য ক'রে মিছিল ক'রে এগুতে থাকলে পুলিশের সঙ্গে তাদের এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই সংঘর্ষ চলার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। সেইদিন ঢাকায় ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের জুলুম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়।

ছাত্র বিক্ষোভের তৃতীয় দিবস ছিল ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারী। মোনেম খানের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ ও গুণ্ডারা জঘন্য কীর্তির পরিচয় দেয়। ঢাকায় ছাত্র-মিছিলের ওপর গুলী চালিয়ে একজন ছাত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর নাম আসাদুজ্জামান—ছাত্র সমাজের একটি প্রিয় নাম—সকলের আসাদ ভাই। ২০শে জানুয়ারী পূর্ব ঘটনা অনুযায়ী ছাত্রগণ যথারীতি তাদের উপর পুলিশ ও ই. পি. আর. জুলুমের প্রতিবাদে এবং ঐতিহাসিক ১১-দফার দাবীতে ঢাকাসহ প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় দশ হাজার ধর্মঘটী ছাত্রছাত্রী ১৪৪ ধারা উপেক্ষা ক'রে মিছিল সহকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে রাজপথ প্রদক্ষিণ করতে থাকলে পুলিশ বাধা দেয় এবং ফলে উভয়ের মধ্যে এক রক্ত-ক্ষয়ী সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলী বর্ষণ করে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র জনাব আসাদুজ্জামান (২৫) নিহত হন এবং ১ জন সাংবাদিকসহ ৪ জন ছাত্র আহত হন।

এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নাগরিকগণ স্তম্ভিত হয়ে যান এবং শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। ছাত্রগণ পরে শহীদ আসাদের লাশসহ মিছিল ক'রে শহর প্রদক্ষিণ করতে চাইলে পুলিশ ও ই. পি. আর. ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্ডন ক'রে রাখায় তা' সম্ভব হয় না। পরে শহীদ আসাদের স্মৃতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কালো পতাকাসহ দুই মাইল লম্বা একটি বিরাট শোক মিছিল নগ্নপদে শহর প্রদক্ষিণ করে। পরদিন ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে রাজধানীসহ প্রদেশের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

হরতাল

২২শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত সংবাদপত্রে ঐদিনের আন্দোলনের দুর্বারতা ও ঢাকার মিছিলের যে বর্ণনা তুলে ধরা হয়, তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ ঃ

॥ লাখো মানুষের মিছিল ॥

পল্টন ময়দানে শহীদ আসাদুজ্জামানের গায়েবানা জানাজা পাঠশেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া প্রায় এক লক্ষ লোকের একটি বিশাল মিছিল

সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলের পুরোভাগে শহীদ আসাদুজ্জামানের একটি রক্তমাখা সার্ট বহন করা হয়। মিছিলে অসংখ্য কালো পতাকা ও রক্ত আঁকা ফেস্টুনও বহন করা হয়। মিছিলে ছাত্রছাত্রী, কিশোর, মহিলা, শ্রমিক, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, পরিষদ-সদস্য, শিল্পী-সাহিত্যিকসহ সকল শ্রেণীর নাগরিক যোগদান করেন। স্মরণকালের এতবড় গণমিছিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় নি।

এই বিশাল গণমিছিলের দৃপ্ত পদভারে ও বজ্র-নির্ঘোষ আওয়াজে ঢাকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হইয়া উঠে। মিছিল যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ইহার কলেবরও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পথিপার্শ্বস্থ গৃহসমূহের ছাদ ও জানালা হইতে মিছিলকারীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়।

মিছিলটি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করার সময় যখন রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে গগনবিদারী আওয়াজ তুলিতেছিলেন,

কারাগার হইতে ফুল নিক্ষেপ

তখন কারা-প্রাচীরের অভ্যন্তর হইতে রাজবন্দিগণ মিছিলকারীদের লক্ষ্য করিয়া ফুল ছুড়িতে থাকিলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়।" "... ... মিছিলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, এন. ডি. এফ., জমিয়তে উলেমায়ে ইসলামসহ 'ডাক'ভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহ ও ভাসানীপন্থী ন্যাপের নেতা ও কর্মিগণ, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্যগণ, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস. এম. মোর্শেদ, ঢাকা হাইকোর্ট ও ঢাকা জেলা বার-এর আইনজীবিগণও মিছিল করিয়া যোগদান করেন।

[দৈনিক সংবাদ, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৬৯]

ঐদিনও পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনী কয়েক রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে এবং বেয়োনেট ও ব্যাটন চার্জ করে। ফলে ১৫ জন ছাত্রীসহ বহুসংখ্যক ব্যক্তি আহত হন।

ক্রমাগত কয়েকদিন ধরে ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র শোক ও মশাল-মিছিল এবং গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। গণবিক্ষোভকে দাবিয়ে রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী তলব করে। সেনারা

সারা রাস্তা টহল দিতে থাকে। কিন্তু এতে ছাত্রদের আন্দোলন আরো দুর্বার হয়ে উঠলো। ২৫শে জানুয়ারী ('৬৯) ঢাকার কয়েকটি জায়গায় এবং খুলনাতে সেনাবাহিনী গুলীবর্ষণ করে। ঢাকায় টহলদানকারী সেনাবাহিনীর গুলীবর্ষণে, আদমজী নগরে পুলিশের গুলীবর্ষণে এবং নারায়ণগঞ্জে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপে ও ব্যাটন চার্জে ২ জন নিহত এবং তোলারাম কলেজের কয়েকজন অধ্যাপকসহ কমপক্ষে ৩০ জন আহত হন। পরে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সান্ধ্য-আইন জারী করা হয়।

অনুরূপ ঘটনা ঘটে খুলনার দৌলতপুর ও খালিশপুর এলাকাতেও। পুলিশ ধর্মঘটী ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করলে ৩ জন নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হন। পরে খুলনা শহরেও সর্বত্র কারফিউ জারী করা হয়।

পরদিনও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে ধর্মঘটী ছাত্র-জনতার ওপর সেনাবাহিনী গুলীবর্ষণ করে। এতে ৬ জন নিহত ও ১৪ জন বুলেটবিদ্ধ হন। সরকারী প্রেসনোটে অবশ্য ৩ জন নিহত ও ১০ জন আহত হওয়ার কথা স্বীকার করা হয়। ময়মনসিংহে শোক-মিছিলের ওপর পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং ৮৪ জনকে গ্রেফতার করে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় সান্ধ্য-আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটিসহ সকল বিরোধী দলীয় নেতা এতে বিক্ষুব্ধ হন এবং কারফিউ ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের জন্য তাঁরা সরকারের নিকট দাবী জানান।

ঢাকায় ক্রমাগত কয়েক দিন পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানেও গণবিক্ষোভের ঢেউ বয়ে যায়। সেখানকার অবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে ২৭শে জানুয়ারী করাচী ও লাহোরে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। ঐদিন করাচীতে পুলিশের গুলীতে ১ জন নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হন। করাচী এবং লাহোরে উভয় জায়গাতেই সেদিন কারফিউ জারী করা হয়।

পরদিন পেশোয়ারেও সেনাবাহিনী তলব করা হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে দেন। ফলে বহু লোক আহত হন।

২৯শে জানুয়ারী ('৬৯) গুজরানওয়ালায় সেনাবাহিনী তলব করা হয়। সেনাবাহিনী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ ক'রে ৩ জন লোককে নিহত করে।

শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সংগ্রামী জনতার উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে আইয়ুবশাহীর সিংহাসন কেঁপে উঠলো। বিগত বছরসমূহে সরকারের তাবেদারী ক'রে যারা বহু টাকা লুটেছিল এবং গত একটি দশকে যাদের কায়েমী স্বার্থ সমগ্র সমাজের ওপর পাথরের ন্যায় চেপে বসেছিল, তাদের জানমালের নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হ'ল। ছাত্র-জনতা তাদের কারো কারো ঘরবাড়ী ঘেরাও করলো। অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করলো। শেষ পর্যন্ত পুলিশ-ই. পি. আর. বাহিনীও হাঁপিয়ে উঠলো। রাস্তায় রাস্তায় মানুষের তাজা রক্ত দেখতে দেখতে তারা ক্রমাগত বিবেকের দংশনে জর্জরিত হচ্ছিল। ফলে আস্তে আস্তে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে থাকলে সরকার কঠোর হস্তে দমনের জন্য সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। কিন্তু এতেও শেষরক্ষা হ'ল না। ১লা ফেব্রুয়ারী বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কতকটা নতিস্বীকার ক'রে বললেন, "শীঘ্রই আলাপ-আলোচনার জন্য আমি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিবর্গকে আমন্ত্রণ জানাইব।"

এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ এবং সর্বদলীয় সংগ্রামী ছাত্র পরিষদ জানান যে, নেতৃবৃন্দকে কারাগারে রেখে কোন প্রকার আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। সাবেক বিচারপতি এস. এম. মুর্শেদ আলোচনা বৈঠকের পূর্বে মুজিব-ভুট্টো-ওয়ালীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন।

আইয়ুব খান ১৭ই ফেব্রুয়ারী বিরোধী দলের সাথে এই আলোচনার প্রস্তাব করেন। রাওয়ালপিণ্ডিতে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হবার কথা জানানো হয়।

৬ই ফেব্রুয়ারী ('৬৯) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঢাকায় আসেন পরিস্থিতি অবলোকন করার জন্য। তিনি সাংবাদিকদেরকে বলেন, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। পরদিন অপর এক সাংবাদিক সম্মেলনে এক তথ্যে দেশরক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ বন্ধ রাখার

সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী ('৬৯) দৈনিক ইত্তেফাক-এর ছাপাখানা 'নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস'-এর ওপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

৯ই ফেব্রুয়ারী পল্টনে এক ঐতিহাসিক সমাবেশে ১১-দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়।

ঐ দিন সরকারের নীতির প্রতিবাদে ভাসনীপন্থী ন্যাপের সদস্য জনাব মশিউর রহমান ও জনাব আরিফ ইফতেখার জাতীয় পরিষদের সদস্য-পদ থেকে ইস্তাফাদান করেন।

প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রশ্নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে থাকে। আওয়ামী লীগ ঘোষণা করেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া তাঁরা সে বৈঠকে যোগ দেবেন না। মওলানা ভাসানীও একইরূপ সিদ্ধান্তের কথা আগে ঘোষণা করেছিলেন। ছাত্র-জনতারাও এবিষয়ে অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ১১ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা ত্যাগের প্রাক্‌কালে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের সঙ্গে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িত বলে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইলেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তি লাভ করেন। ঐ দিন সরকারের নির্যাতন ও গণহত্যার প্রতিবাদে এবং ১১-দফার সমর্থনে জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় সাতজন সদস্য পদত্যাগ করেন। সেদিন জাতীয় পরিষদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় পরিষদের সদস্য-পদ থেকে বিরোধী দলের কতিপয় সদস্যের পদত্যাগ

১৪ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এক ঘোষণায় বলেন যে, ফেব্রুয়ারী মাসের ১৭ তারিখ থেকে জরুরী আইন প্রত্যাহার করে নেয়া হবে।

ঐ দিনই পল্টনে তিন লক্ষাধিক নাগরিক 'ডাক'-এর আহ্বানে জমায়েত হয়ে পার্লামেন্টারী সরকার কায়েম ও সার্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের

দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী এক অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটে যায়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহরুল হককে নির্মমভাবে গুলী ক'রে হত্যা করা হয়। সরকারী ভাষ্যে বলা হয়, আসামী নাকি পালাতে চেষ্টা করছিলেন, তাই তাঁর এবং অন্য একজনের প্রতি প্রহরীরা গুলীবর্ষণ করলে উক্ত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। আসলে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেবার জন্যই উপরোক্ত মিথ্যা ভাষ্য প্রদান করা হয়েছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে আসামীরা তাঁদের জবানবন্দীতে তাঁদের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যে দৈহিক নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরেছিলেন, তাতে স্বভাবতঃই জনগণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি তাঁদের ১১-দফায় তাই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ক'রে বিনা শর্তে আসামীদের মুক্তি দাবী করেছিলেন। এর স্বপক্ষে জনমতের যে প্রবল তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তাতে সেনাবাহিনী নাখোশ হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। অভিযুক্তদেরকে যে আর শাস্তি প্রদান করা যাবে না, এ বিষয়ে তারা ক্রমে কমে উপলব্ধি করতে পারছিল, কিন্তু মামলা যদি সরকার তুলে নেন, তা' হ'লে সেটা হবে সেনাবাহিনীর পক্ষে চরম অপমানজনক। তাই প্রতিশোধ স্পৃহায় দিশাহারা হয়ে তারা একে একে সব অভিযুক্তকে গুলী ক'রে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। আর তাদের সে পরিকল্পনার প্রথম শিকার হলেন সার্জেন্ট জহরুল হক। সার্জেন্ট জহরুল হক ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক। সৈনিক জীবনে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকদের বর্বরতা, বাঙালীর প্রতি তাদের ঘৃণা ও বৈষম্যমূলক আচরণ এবং সর্বোপরি বাঙালী সৈনিকদের ন্যায়সংগত অধিকার থেকে প্রতি মুহূর্তে বঞ্চনা করা ইত্যাদি তিনি বেদনার সাথে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি শুধু এসবের নীরব দ্রষ্টা ছিলেন না, তাঁর বিবেকচঞ্চল মন এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তিনি বাংলাদেশের তাঁদেরই একজন ছিলেন যাঁরা নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের মুক্তি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারতেন না। বাংলাদেশের সার্বিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে এই মুক্তি সম্ভব নয়। তাই তিনি স্বাধীনতার

সার্জেন্ট জহরুল হককে নির্মমভাবে হত্যা

পথে নির্ভয়ে পা বাড়িয়েছিলেন। এই পথ যে কত বিঘ্নসংকুল, এই পথে যে কত মৃত্যুর লেলিহানশিখা প্রজ্বলিত, তা' তিনি জানতেন। তবু একজন নিবেদিতচিত্ত দেশপ্রেমিক হিসেবে সেই বিঘ্নসংকুল মৃত্যুর পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। আর তাই যে মৃত্যু তিনি বরণ ক'রে নিলেন, সে মৃত্যু মৃত্যু নয়। স্বাধীন বাংলার একজন জাগ্রত অগ্নিপুরুষ হিসেবে চিরদিন এই দেশের মানুষের মনে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলী ক'রে হত্যার প্রতিবাদে পরদিন ষোলই ফেব্রুয়ারী প্রদেশে পুনরায় হরতাল আহ্বান করা হয়। ঐ দিন ক্ষুব্ধ ও শোকাহত জনতা কয়েকটি বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে। ঢাকায় যেসব জায়গায় অগ্নিসংযোগ করা হয় সেগুলো হ'লঃ (১) বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ও পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস. এ. রহমান (স্টেট গেস্ট হাউস), (২) কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের বাসভবন (পরিবাগ), (৩) প্রাদেশিক যোগাযোগ মন্ত্রী সুলতান আহমদ (সরকারী ভবন আবদুল গনি রোড), (৪) প্রাদেশিক পূর্ত মন্ত্রী মং শোয়ে প্রু (সরকারী ভবন, আবদুল গনি রোড), (৫) প্রাদেশিক কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা হাসান আসকারীর বাসভবন। এছাড়াও আরও কয়েকটি প্রেস ও অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অগ্নিসংযোগকালে সেনাবাহিনী ক্ষিপ্ত কুকুরের মত গুলী বর্ষণ করে। গুলী বর্ষণে একজন নিহত ও বহু লোক আহত হন। তা' ছাড়া ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় সান্ধ্য-আইনও জারী করা হয়। সেদিন পল্টনে লক্ষাধিক শ্রমিক-ছাত্র-নাগরিকের এক সমাবেশে বৃদ্ধ জননেতা মওলানা ভাসানী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "দুই মাসের মধ্যে ১১-দফা কায়েম, এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া না হইলে খাজনা বন্ধ করা হইবে।" ঐদিন প্রেসিডেন্ট এক ঘোষণাবলে সারা দেশ থেকে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) সারাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। করাচীতে এক উচ্ছৃংখল জনতার উপর ডব্লু. পি. আর. ও পুলিশ গুলী চালালে দু'জন

উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক অগ্নিসংযোগ

সেনাবাহিনীর গুলীবর্ষণ ও সান্ধ্য-আইন জারী

নিহত ও ২৬ জন আহত হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসনের এক কলঙ্কজনক এবং শোকাবহ দিন। ঐ দিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর ও রসায়ন বিভাগের রীডার ডক্টর শামসুজ্জোহাকে আইয়ুবের বর্বর সৈনিকদল সু-পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। দেশের অন্যান্য স্থানের মত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররাও সরকারী নির্যাতন ও গণহত্যার প্রতিবাদে হরতাল পালন করে চলছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-সমাজের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ছিল শহীদ শামসুজ্জোহার ওপর। তিনি এবং কতিপয় শিক্ষক ধর্মঘটী ছাত্র-দেরকে শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালনে সাহায্য করছিলেন। এঁদের মধ্যে আমি নিজেও ছিলাম। ছাত্রগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে মিছিলসহ শহরের দিকে যাবার প্রস্তুতি নেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটে এসে সমবেত হয়। গেটের সামনেই সৈনিকরা মোতায়েন ছিল। আমি, ডক্টর শামসুজ্জোহা, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান (বর্বর পাক-বাহিনীর হাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় শহীদ হন), অধ্যাপক আবু সাঈদ এবং আরও কয়েকজন অধ্যাপক ছাত্র-সৈনিকের সংঘর্ষ এড়ানোর উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করি যেন তারা চারজন ক'রে একটি দলে রাস্তায় বেরিয়ে যায় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ ক'রে বিপদ ডেকে না আনে। সশস্ত্র বর্বর সৈনিকদের মোকাবেলা করতে হলে এছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। প্রথম দিকে ছাত্রগণ উচ্ছৃঙ্খল হলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের অনুরোধে রাজী হয়ে যায় এবং ৪জন ক'রে দল বেঁধে রাস্তায় প্রবেশ করতে থাকে। উপস্থিত সৈনিকগণও এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করে। কিন্তু যখন সবই শান্ত এবং যখন আমরা ফিরে আসবার জন্য প্রস্তুত, ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতক সৈনিকগণ গুলী-বর্ষণ করে। ডক্টর জোহা আমার পাশেই ছিলেন। গুলী আমার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। ডক্টর জোহা রাস্তার দক্ষিণ দিকে গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিলেন, আমাকে অধ্যাপক আবু সাঈদ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। আমি হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে রাস্তার উত্তর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। যাঁরা ডক্টর

ডক্টর শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা

জোহার সাথে খড়ের গাদার মধ্যে শুয়ে পড়েছিলেন তাঁদের মুখে জানা গেল যে, বর্বর পাক সৈন্যদের একজন বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে ডক্টর জোহার পেট বিদীর্ণ ক'রে। আহত হবার কয়েক ঘণ্টা পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডক্টর দত্ত তাঁকে অপারেশন করেন। আমি নিজে বহু বিপদ পেরিয়ে হাসপাতালে অপারেশন টেবিলে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমাদের সবাইকে নিরাশ ক'রে অপরাহ্নে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আইয়ুব-মোনেমের বর্বরতা একজন নিষ্ঠাবান ও সম্ভাবনাময় অধ্যাপকের জীবনকে এভাবে ধ্বংস করে। ডক্টর জোহা ছাড়া সেদিন নূরুল ইসলাম নামে একজন ছাত্রকেও রাজশাহী শহরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ডক্টর জোহার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এর প্রতিবাদে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট ঘোষণা করেন। পরদিন ঢাকায় কারফিউ থাকা সত্ত্বেও কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতা বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দেন। সরকারী নির্দেশে পুলিশ, ই. পি. আর. ও সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে ২০ জন লোক নিহত হন। এছাড়া কুষ্টিয়া ও নোয়াখালীতেও ৪ ব্যক্তি নিহত এবং বহু লোক আহত হন।

আইয়ুবের ঘোষণা

২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস। ঐ দিন ছাত্ররা অন্যান্য বৎসরের মত যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে শহীদদের স্মৃতি তর্পণ করার জন্য প্রতিটি শহরে মিছিল বের করেন। খুলনায় এমনি একটি মিছি-লের উপর পুলিশ গুলী চালালে ৮ জন নিহত হন। উত্তেজিত ছাত্র-জনতার হাতে একজন পুলিশও মৃত্যুবরণ করে। সেই দিন আইয়ুব খান জাতির উদ্দেশে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াবেন না।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট আহূত গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে মুক্ত মানব হিসেবে যোগ-দানের সুযোগ প্রদানে প্রেসিডেন্ট রাজী হন নি। আওয়ামী লীগের

নেতৃবৃন্দসহ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এর উত্তর দিয়ে বলেছিলেন যে, শেখ মুজিব প্যারোলে বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন না। শেখ মুজিব স্বয়ং ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর যোগদানের প্রশ্নে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিব ছাড়া যে গোলটেবিল বৈঠক কোন মতেই সফল হতে পারে না, আইয়ুব সরকার তা' ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। আর বৈঠক সফল না হতে পারলে যে নিজের ও অনুসারীবৃন্দের স্বার্থকে রক্ষা করতে পারবেন না—এবিষয়েও তিনি নিশ্চিত ছিলেন।

শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি

তাই বাধ্য হয়ে সরকার ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী হঠাৎ এক ঘোষণায় আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ক'রে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীকে বিনাশর্তে মুক্তি দিলেন এবং তাঁকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আইয়ুব খান তাঁর দূত হিসেবে খাজা শাহাবুদ্দিনকে পাঠালেন। শেখ সাহেব পূর্ব বাংলার দাবী আদায়ের জন্য উক্ত বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হলেন। সেনাবাহিনীর ছাউনি থেকে মুক্তি পাওয়ার পর অগণিত ছাত্র-জনতা শেখ সাহেবকে অভিনন্দন জানান। শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তির সংবাদ পরদিনের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে আবেগমণ্ডিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। একটি দৈনিক পত্রিকার বর্ণনা এখানে তুলে ধরা যাক ঃ "পূর্ব বাংলার মাটিতে অবশেষে বাস্তিলের কারাগার ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। জনতার জয় হইয়াছে। গণদাবীর নিকট নতিস্বীকার করিয়া দোর্দণ্ডপ্রতাপ সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিয়া পূর্ব বাংলার অগ্নিসন্তান, দেশগৌরব, আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানসহ এই মামলায় অভিযুক্ত সকলকে কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনির বন্দীনিবাস হইতে গত-কল্য (শনিবার) মধ্যাহ্নে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছে কৃষক নেতা মনিসিং, আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান ও একমাত্র মহিলা রাজবন্দী মতিয়া চৌধুরীসহ নিরাপত্তা আইনে আটক বা দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আরো ৩৪ জন রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে। প্রদেশের কারাগারে কেবলমাত্র

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অপর কেহই আজ আর বিনা বিচারে আটক নাই।" সেদিন নিজ বাসভবন থেকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সমবেত জনতার উদ্দেশে শেখ মুজিব বলেছিলেন: "মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া যে সূর্য-সন্তানেরা অকালে হৃদয় নিংড়ানো রক্তে রাজপথ রাঙ্গাইয়া গেলেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা আমার নাই। আজকের দিনে কোটিকণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমিও বলি, জয়, ছাত্র-জনতার জয়।" অগণিত ভক্তের প্রেম-ভালবাসার অনির্বাণ শিখার সামনে আকণ্ঠ মাল্যভূষিত হইয়া শেখ মুজিব দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, "সংগ্রামী ছাত্ররা যে ১১-দফা দিয়াছেন তার প্রতি আমারও সমর্থন রহিল। কারণ ১১-দফার মধ্যে আমার দলের ৬-দফার রূপরেখাওরহিয়াছে।"

[ইত্তেফাক, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯]

আগরতলার মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে ইত্তেফাক যে সম্পাদকীয় লিখেছেন তা' নানা কারণে উল্লেখযোগ্য: "জয় নিপীড়িত জনগণের জয়, জয় নবউত্থান—আজ উৎসবের দিন নয়, বিজয়ের দিন। আজ আনন্দের দিন নয়, স্মরণের দিন। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। দুঃশাসনের কারাকক্ষ হইতে দেশের প্রিয় সন্তান শেখ মুজিব অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে মুক্ত হইয়া আবার তার প্রিয় দেশবাসীর মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শহিদী ঈদে আমাদের অভিযান সফল হইয়াছে। গণজাগরণের প্রবল প্লাবনের পলিমাটিতে রক্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে নূতন এক উষার স্বর্ণদুয়ার উন্মুক্ত করার অবিস্মরণীয় কাহিনী। এ কাহিনী অসংখ্য শহীদের আত্মদানের, অসংখ্য বীরমাতা ও বীরজায়ার অশ্রু ও হাহাকার সংবরণের কাহিনী।

তবু আজ অহল্যাপ্রতিম পূর্ব বাংলা জাগ্রত। তার অশোক আকাশে ফাল্গুনের রক্তসূর্যে নূতন প্রাণের পতাকা শিহরিত। মেঘের সিংহবাহনে নূতন প্রভাত আসিয়াছে। এই প্রভাতের সাধনায় তিমির রাত্রির তপস্যায় যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন আজ বিপুল বিজয়ের শুভলগ্নে তাদেরই সর্বাগ্রে স্মরণ করি। তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে জানাই আমাদের অবনত চিত্তের অভিনন্দন। চারিদিকে আজ জয়ধ্বনি। চারিদিকে আজ প্রাণোল্লাস। বজ্রের ভেরীতে প্রাণের সাড়া জাগিয়াছে। দুঃশাসনের

বন্দীশালায় সুপ্ত গণবাসকী জাগরণের প্রথম চমকে দুলিয়া উঠিয়াছে। সব বাধা, সব চক্রান্ত, সব আগল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গণবিরোধী প্রতিক্রিয়ার দুর্গে গণজাগরণের বিজয়কেতন একদিন উড্ডীন হইবেই, এ প্রত্যয় আমাদের চিরকালের। ইতিহাসের এই শিক্ষা মিথ্যা হয় নাই। একদিন যাহাকে মনে হইয়াছিল দুর্ভেদ্য, আজ তাহা লুপ্ত। মধ্যরাত্রির সূর্য-তাপসদের যে সাধনাকে একদিন মনে হইয়াছিল ব্যর্থ প্রয়াস, আজ তাহাই জয়ের মহিমায় মহিমান্বিত। এই মহিমা গণচেতনার। এই বিজয় গণমানুষের। দুঃশাসনের লৌহকপাট ভাঙ্গিয়া, প্রভাতের রক্তসূর্য ছিনিয়া আনিয়া এ গণমানুষেরা আবার প্রমাণ করিল, তাহারা অপরাজেয়। তাহারা চিরকালের অপরাভূত শক্তি।

এই শক্তিকে যাহারা দমন করিতে চাহিয়াছিল, তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে। গণ-অধিকারের অপ্রতিরোধ্য প্রতিষ্ঠা আজ সফল সংগ্রামের মাঝে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তবুও আমরা আনন্দ করিব না। দেশের মানুষ আজ তাহাদের হৃত অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনায় অধীর। কারাকক্ষের লৌহকপাট খুলিয়া দেশপ্রেমিক সন্তানেরা দীর্ঘদিনের বন্দীদশা শেষে আবার এক এক করিয়া মুক্ত আলো-বাতাসে ফিরিয়া আসিতেছেন। দেশের মানুষ ফিরিয়া পাইয়াছে তাহাদের প্রিয় মুজিবকে। পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছেন তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার সকল অভিযুক্ত, কেবল ফিরিয়া আসেন নাই একজন। তিনি কোনদিন ফিরিয়া আসিবেন না। প্রিয়জনের ব্যগ্র বাহুর সান্নিধ্য আর তিনি কোনদিন লাভ করিবেন না। বন্দীদশাতেই নির্মমভাবে নিহত হইয়াছেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। বহু নাম জানা আর না-জানা শহীদের রক্তে মিশিয়া গিয়াছে শহীদ জহুরুল হকের রক্ত। এ শোণিত-চিহ্ন আমাদের স্মৃতি হইতে কোনদিন মুছিয়া যাইবে না। জহুরুল হকের শোণিত-রেখা এ দেশের গণজাগরণের প্রদীপ্ত পথরেখা। জহুরুল হক অমর। নিজের প্রাণের মূল্যে এ দেশের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি মৃত্যুহীন প্রাণের পতাকা উড্ডীন করিয়া গেলেন।

ইতিহাসের গতি অনিরুদ্ধ। গণশক্তির বিজয় অপ্রতিরোধ্য। সকল সংগ্রামের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে তাই আমরা আবার আমাদের লক্ষ্যের ধ্রুবতারা

অন্বেষী হইয়াছি। বিজয়ের গৌরবে আমরা যেন মোহাবিষ্ট না হই। পথভ্রষ্ট না হই। জনগণের বিজয়ের রথচক্রে সেই বজ্রের ভেরীই নিনাদিত হউক—যাহার মধ্যে দেশ ও দেশবাসীর প্রকৃত সার্থক ও অধিকার চেতনা জাগ্রত। জনগণের জয় সার্থক হউক, জনগণের উত্থান স্থায়ী ও সফল হউক।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাবার পর অপরাহ্নে শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর সঙ্গে পৌনে এক ঘন্টাব্যাপী এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। পরে সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনেও গমন করেন। পরদিন শেখ মুজিবকে রেসকোর্সে গণ-সম্বর্ধনা জানানোর জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক আহ্বান জানান। পরদিন ২৩শে ফেব্রুয়ারী রবিবার। শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে এক সম্বর্ধনা জানানো হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দশ-লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে শেখ মুজিব সে ভূষণ শিরোধার্যরূপে গ্রহণ করেন। বাংলার নয়নমণি শেখ মুজিব এবার থেকে হলেন বঙ্গবন্ধু।

শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক গণসম্বর্ধনা ও তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দান

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে যাঁদের নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে উজ্জ্বল ভাষায় লেখা থাকবে তাঁদের মধ্যে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বৃহত্তর ঢাকা শহরে এবং সমগ্র পূর্ব বাংলার ছাত্র-সমাজকে আন্দোলনের জন্য সংঘবদ্ধ করতে এই তরুণ ছাত্রনেতার অবদান অবিস্মরণীয়। শেখ মুজিবের ভাবশিষ্য এবং শেখ মুজিবের ন্যায় নির্ভীক ও সাহসী এই যুবক বঙ্গবন্ধুর সাংগঠনিক শক্তি যথার্থভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনে যেমন, এই সংগ্রাম পরিষদকে সুচারু পন্থায় পরিচালনায়ও তেমনি এই যুবক যে ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয়

ঊনসত্তর অভ্যুত্থানের নায়ক তোফায়েল আহমদ

দিয়েছেন তা' প্রায় অতুলনীয়। মোনেম খানের ন্যায় দুর্দান্ত গভর্নর এবং আইয়ুব খানের ন্যায় পরাক্রমশীল প্রেসিডেন্ট তোফায়েল আহমদের শক্তির নিকট সেদিন মাথা নত করতে বাধ্য হন। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে এমন সময় গেছে যখন ঢাকার সমগ্র প্রশাসনযন্ত্র বিকল হয়ে তোফায়েল আহমদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবকে কারাগারের লৌহকপাট ভেঙে মুক্তির সূর্যালোকে নিয়ে আসতেও এই যুবকের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

সেদিন বিশাল জনসুমদ্রের সামনে এই যুবকের হাত দিয়ে বাংলার চিরন্তন বন্ধু শেখ মুজিব লাভ করলেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি। এক সংগ্রামী নেতার হাতে সাড়ে সাত কোটী বাঙালীর প্রাণের অর্ঘ্য অর্পিত হ'ল আর এক সংগ্রামী যুবকের হাত দিয়ে। এ এক অপূর্ব সম্মিলন, এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সেদিন আবেগমণ্ডিত দৃপ্তকণ্ঠে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, ইতিহাসের পাতায় তা' উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান দখল ক'রে থাকবে। তাঁর বক্তৃতার বিবরণ পরদিন প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ " সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঢাকার বুকের সর্বকালের বৃহত্তম গণ-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গতকাল (রোববার) আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, তিনি সরকার পক্ষের সহিত প্রস্তাবিত রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া দেশের উভয় অংশের পক্ষ হইতে দেশবাসীর অধিকারের দাবী উত্থাপন করিবেন এবং যদি উত্থাপিত দাবী গ্রাহ্য করা না হয় তবে সে বৈঠক হইতে ফিরিয়া আসিয়া দাবী আদায়ের জন্য তিনি দুর্বারতর গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবেন। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া বজ্রনির্ঘোষে তিনি ঘোষণা করেন যে, সংগ্রাম করিয়া আমি আবার কারাগারে যাইব, কিন্তু মানুষের প্রেম-ভালবাসার ডালি মাথায় নিয়া দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না। মুহুর্মুহু করতালি ও গগনভেদী জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, বঞ্চিত বাঙালী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পাঠান আর বেলুচের মধ্যে কোন

তফাৎ নাই—কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ হইতে দেশের উভয় অংশের জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হইল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক আজাদী।

গণ-সম্বর্ধনায় সংগ্রামী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামের সার্বিক দায়িত্ব শেখ মুজিবের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া তাঁহার নেতৃত্বের প্রতি ছাত্র-জনতার পক্ষ হইতে অকৃত্রিম আস্থা প্রকাশ করে।

অভূতপূর্ব গণমহাসাগরের সামনে দাঁড়াইয়া শেখ মুজিবুর রহমান সাম্প্রতিক কালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, জেলের তালা ভাঙ্গিয়া আমাদেরকে যে মুক্ত করিয়া আনা হইয়াছে তা' ছাত্র-জনতার সংগ্রামের এক মহাস্মরণীয় বিজয়। এই বিজয়ের দিনে তিনি ছাত্রদের ১১-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া ১১-দফা সংগ্রামে তিনি সক্রিয়-ভাবে শরিক থাকিবেন বলিয়াও সবাইকে আশ্বাস দান করেন।

প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর যোগদানের প্রশ্নে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, আলোচনায় আমি অবশ্যই যাইব। কারণ নির্ভীক ও আপোষহীনভাবে কিভাবে দাবী পেশ করিতে হয় আমি তা' জানি। দাবী আদায় না হইলে আবার আমি সংগ্রামকে দুর্বার হইতে দুর্বারতর করিয়া তুলিব, আবার আমি কারাগারে যাইব, আবার ছাত্র-জনতা সংগ্রাম করিয়া জেল হইতে আমাকে বাহির করিয়া আনিবে।

তাঁহার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার সংক্ষিপ্ত রূপরেখার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট চাই এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, চাকুরী-বাকুরি, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব পর্যায়ে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব চাই। আমি শ্রমিকের শ্রমের ন্যায্য মূল্য চাই। কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য চাই, সাংবা-দিকদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চল, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। এই দুই অঞ্চলের জন্যই আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা

যদি এক ইউনিট বাতিল করিতে চায় তবে অবশ্যই এক ইউনিট বাতিল করিতে হইবে এবং সাবেক প্রদেশগুলি 'প্রাদেশিক' স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হইবে।

শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য মহল্লায় মহল্লায়, শহর বন্দর গঞ্জে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেন। দেশবাসীর প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন যে, আন্দোলন আমাদের চলিবেই. কিন্তু যে প্রকারেই হোক আমাদের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইবে। সেই সাথে তিনি সরকারকেও সর্বপ্রকার উস্কানিমূলক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানান। সরকারের প্রতি তিনি রাজনৈতিক হুলিয়া ও সান্ধ্য-আইন প্রত্যাহার এবং সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নেওয়ার দাবী জানান। প্রতিদানে তিনি সরকারকে আশ্বাস দেন যে, দেশে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব সংগ্রাম কমিটিই বহন করিবে।

মৃত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য প্রসঙ্গে

শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশব্যাপী সাম্প্রতিক গণহত্যার ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (নিহত ও আহত) জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের দাবী জানান। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি বেসরকারী সাহায্য কমিটি গঠন করা হইবে এবং উক্ত তহবিলের জন্য সকল মহলের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালানো হইবে। গণ-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গণনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ, ছাত্রনেতা খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাইফুদ্দিন মানিক, মোস্তফা জামান হায়দার, মাহবুবুল হক দোলন ও মাহবুবুল্লাহ নেতাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ভাষণ দান করেন।

ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা

শেখ মুজিবুর রহমান অতঃপর তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে "ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা" নামে অভিহিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। শেখ মুজিব গতকাল রেসকোর্স ময়দানে 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলার' পটভূমি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ভারত যখন

লাহোর আক্রমণ করে তখন পূর্ব পাকিস্তানের ৬ কোটী মানুষ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, লাহোরের উপর আক্রমণ, পূর্ব পাকিস্তানের উপর আক্রমণ। এই মনোভাবের মধ্য দিয়া পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় ঐক্যের এক চরম প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ব্যাপক দূরত্বের ফলে সৃষ্ট বাস্তব সমস্যাদি প্রকট হইয়া দেখা দেয়। এবং সবাই উপলব্ধি করিতে শিখে যে, একরাষ্ট্র হইলেও চরম বিপদের সময় কেহ কাহারও প্রত্যক্ষ কোন উপকারে আসে না। এই উপলব্ধির আলোকেই আমরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ৬-দফা প্রণয়ন করি।

শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টি করিতে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ৬-দফায় তাই শঙ্কিত হইয়া উঠে এবং যে কোন প্রকারের হিংস্রতা ও বর্বরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হইলেও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের এই দাবীকে দাবাইতে বদ্ধপরিকর হয়। এর ফলশ্রুতিই হইল এই তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলা সাজানোর মন্ত্রণালয় ছিল—ইসলামাবাদ।

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯]

২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গবন্ধু তাঁর দলীয় ৯ জন প্রতিনিধি সমভিব্যাহারে লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ঃ

শেখ মুজিবের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান

সর্বজনাব তাজউদ্দিন আহমদ, মীজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মোমেন, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল মালেক উকিল, এম. এ. আজিজ, ময়েজউদ্দিন ও মতিয়ার রহমান।

পূর্ব বাংলা থেকে ওয়ালীপন্থী ন্যাপের মোজাফ্ফর আহমদও গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে যান। কিন্তু মওলানা ভাসানী বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। আলোচনার ভিত্তি হিসাবে ১১-দফাকে গ্রহণ না করলে সে আলোচনা যে কোনক্রমেই ফলপ্রসূ হবে না সে বিষয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করেন।

সে দিনই ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভাসানী ন্যাপের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় এ বিষয়ে আরও ৬টি পূর্বশর্ত আরোপ করা হয়। নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো পূর্বাহ্নে মেনে না নেওয়া হলে, ন্যাপ

(ভাসানী) গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেন। শর্তগুলো হ'ল ঃ

১। সামরিক বাহিনী ও পুলিশের গুলীতে যাঁরা নিহত ও আহত হয়েছেন তাঁদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান করতে হবে।

২। যাঁদের পূর্বাঞ্চলে পাঁচ একর পর্যন্ত এবং পশ্চিম অঞ্চলে বার একর পর্যন্ত জমি রয়েছে তাঁদের রাজস্ব সব সময়ের জন্য মওকুফ এবং বকেয়া খাজনা ও ট্যাক্স মওকুফ করতে হবে।

৩। শ্রমিকদের বাঁচার জন্য দাবী অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ এবং শ্রমিক-বিরোধী কালাকানুন বাতিল করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার চার্টার মানতে হবে।

৪। নিরাপত্তা আইন ও প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিল ক'রে প্রোগ্রেসিভ পেপারস্ লিমিটেডকে মূল মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে।

৫। বন্যা নিয়ন্ত্রণকে জাতীয় সমস্যারূপে গ্রহণ এবং বন্যাদুর্গত এলাকাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

৬। কৃষক ও জেলেদের ঋণ আদায় করা চলবে না।

এই শর্তগুলো যে গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়, ভাসানী তা' জানতেন, আর জানতেন বলেই তিনি তাতে যোগদানের প্রশ্নে অস্বীকৃতি জানালেন। এই গোলটেবিল বৈঠকে সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানকে আহ্বান জানানো হয় নি বলে শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। পূর্ব বাংলার সাবেক প্রধান বিচারপতি এস. এম. মুর্শেদ আমন্ত্রিত হয়ে আগেই পিণ্ডির পথে লাহোরে গিয়েছিলেন। শেখ মুজিব দাবী পেশের ন্যূনতম সুযোগকে অবহেলা করতে পারেন নি বলেই উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। লাহোর যাবার প্রাক্কালে তাঁর করণীয় ভূমিকা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সাংবাদিকদের অবহিত করেন। সেদিন তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, ৬-দফাভিত্তিক ১১-দফা দাবী না মানা পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষে তিনি আসতে পারেন না। এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, বৈঠকে বসার আগে তিনি নির্দলীয় বিশিষ্ট নেতা এয়ার মার্শাল আসগর

খান, জেনারেল মোহাম্মদ আযম খান, বিচারপতি জনাব এস. এম. মুর্শেদ, জনাব ভুট্টো এবং তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে আশ্বাস দেন যে, বৈঠকে পশ্চিমী-দের পক্ষ নিয়েও তিনি কথা বলবেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোও একই বিমানে গেলেন।

লাহোর বিমান বন্দরে বিমান পৌঁছার সাথে সাথে বিপুল জনতা শেখ মুজিবকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বিমানঘাটি ঘিরে ফেলে। অনেকেরই ধারনা হয়েছিল যে, বোধকরি শুধু শেখ মুজিবকে নয়, ভুট্টোর জন্যও এই বিশাল জনসমাগম। শেখ মুজিব কৌশলে ব্যাপারটি পরীক্ষা করার জন্য ভুট্টো যখন একসাথে বিমান থেকে নামবার প্রস্তাব করলেন, তখন তা' পরিহার ক'রে ভুট্টোকেই আগে নামবার সুযোগ দিলেন। সমবেত জনতার প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক হৈ হৈ করতে করতে চলে গেলেন। কিন্তু শেখ মুজিব যখন বিমান থেকে নামলেন, ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষারত জনতা তাঁকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

লাহোরে শেখ মুজিবের সম্বর্ধনা

লাহোরে শেখ মুজিব এয়ার মার্শাল আসগর খান, এস. এম. মুর্শেদ এবং লেঃ জেনারেল আযম খানের সাথে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে মিলিত হন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী তিনি লাহোর থেকে পিণ্ডি গমন করেন।

পিণ্ডির চাকলালা বিমান বন্দরে পৌঁছার পরও বিপুল জনতা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এগিয়ে আসেন। কিন্তু এবার নেতাকে জনতার হাতে ছেড়ে না দিয়ে পেছন দিকের দরজা দিয়ে বের ক'রে গাড়ীতে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। একজন লম্বা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা যখন সামনের দরজা দিয়ে বের হন, জনতা ধরে নিলেন যে, ইনিই শেখ মুজিব। কিছুক্ষণ পরেই জনতার এই ভুল ভেঙে গেলে শেখ মুজিবকে দেখবার জন্য তাঁরা দৌড়াতে থাকেন। কিন্তু ততক্ষণে শেখ মুজিব বিমানবন্দর পেরিয়ে শহরে প্রবেশ করেছেন।

যাহোক, ২৬শে ফেব্রুয়ারী গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। পরে ১০ই মার্চ পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবী রাখা হয়। ইত্যবসরে

আইয়ুব খান তাঁর চিরদিনের অশান্তির কারণ শেখ মুজিবকে গোপন বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান এবং গোপনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য শেখ মুজিবের নিকট আবেদন জানান। মুজিব তা' প্রত্যাখ্যান করেন। কোন ক্ষমতার লোভ বা ঐশ্বর্যের প্রলোভন তাঁকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। এই সত্য বাংলার মুক্তি, বাংলার স্বাধীনতা। এ সত্যকে তিনি আকৈশোর হৃদয়ে লালন করেছেন।

শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রলোভন দান

১০ই মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সভাপতিত্বে পুনরায় গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তা' নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পুরো ভাষণটি এখানে উদ্ধৃত হ'ল ঃ

"জনাব প্রেসিডেন্ট ও ভদ্র মহোদয়গণ, এক চরম সংকটের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সমগ্র জাতির ভিত্তিমূল আজ প্রকম্পিত। দেশবাসীকে আমরা যাঁরা ভালবাসি আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অপরিসীম মাশুল যোগানোর সে কাহিনী যাঁদের স্মৃতিপটে আজো ভাস্বর, জাতীয় সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁদের সকলেই আজ উদ্বেগাকুল। এ সঙ্কটের নিরসন করতে হলে আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন এর প্রকৃতি অনুধাবনের, তার মূল কারণ অনুসন্ধানের। যে সমস্ত মৌলিক সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে দেশে আজ গণঅভ্যুত্থান ঘটে গেল তা' নির্ণয় ক'রে অবিলম্বে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে যদি আমরা ব্যর্থ হই তবে তার চাইতে বিপর্যয়কর আর কিছু হতে পারে না। বিগত ২১টি বছর যাবৎ এসব সমস্যাকে আমরা এড়িয়ে এসেছি।

গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবের ভাষণ

আজ সময় এসেছে যখন এসব সমস্যার যথাযথ মোকাবিলা আমাদিগকে করতেই হবে। জাতীয় জীবনের এই সব সমস্যার প্রশ্নে বিস্তারিত একটি সমাধান আমাদিগকে খুঁজে বের করতেই হবে। এ আমার স্থির-বিশ্বাস। কেননা পরিস্থিতি আজ সুস্পষ্টভাবে গুরুতর। তাই আপাততঃ ধামাচাপা দিয়ে আধাআধি কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান কোন মতেই সম্ভব নয়। আজ সমগ্র জাতীয় সত্তার ভিত্তি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই প্রতীতিই আমাকে আজ জাতীয় জীবনের মূল সমস্যাগুলির

বিস্তারিত একটি সমাধান নির্দেশের তাগিদ দিচ্ছে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কণ্ঠে যে সব দাবী-দাওয়া আজ ধ্বনিত হচ্ছে, যত্নসহকারে সেগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, তার মূলে মাত্র তিনটি প্রশ্ন নিহিত। প্রথমটি হ'ল, রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার অবলুপ্তি। দ্বিতীয়টি সীমাহীন অর্থনৈতিক অন্যায়-অবিচার। যার ধকল পোহাতে হচ্ছে এ দেশের শ্রমিক-কৃষক-নিম্নমধ্যবিত্ত আয়ের মানুষকে—মোটকথা আপামর জনসাধারণকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে বেধড়ক ব্যয়জনিত ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির মাশুল যোগাতে হচ্ছে যেখানে এ দেশের কোটী নিরন্ন-নিঃসম্বল মানুষকে সে ক্ষেত্রে সে উন্নয়নের সুফল ক্রমবর্ধমান হারে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মাত্র গুটিকয় ভাগ্যবান পরিবারের হাতে, যাঁরা আবার দেশের একই অঞ্চলের বাসিন্দা। তৃতীয় কারণটি হ'ল পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি সমানে অবিচার করা হচ্ছে এই উপলব্ধি। বর্তমান শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ কার্যকর রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুপস্থিতির দরুন বরাবরই তাদের মৌলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে দেখেছে। বর্তমান শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোরও এই একই অবস্থা।

জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার বিলুপ্তির প্রশ্নটি আজ কয়েক দফা সুস্পষ্ট দাবীর আকারে প্রকাশ পেয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজের ১১-দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীতে।

আইন-পরিষদে সার্বভৌমত্বের নীতিভিত্তিক পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের যে দাবী তারা উত্থাপন করেছে তাতে আইন-পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল ইউনিটের প্রতিনিধিত্ব এবং সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরিভাবে জনগণের প্রতিনিধি নির্ধারণের সুপারিশ স্থান পেয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অবিচারের প্রশ্নটিও প্রতিফলন ঘটেছে ছাত্র সমাজের রচিত ১১-দফা কর্মসূচীতে। এ প্রশ্নে তারা দেশের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-পদ্ধতির পুনর্গঠনের জন্যও সুস্পষ্ট দাবী উত্থাপন করেছে। আমার দলের ৬-দফা কর্মসূচীতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়-তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। ৬-দফা কর্মসূচীতে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-

শাসনের যে রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে তা' নিয়ে আমাদের এত চাপা-চাপির কারণ হ'ল এই যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে আমরা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত বলে মনে করি। ৬-দফা ও ১১-দফা কর্মসূচীতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান রেখে ফেডারেশন গঠনের যে দাবী করা হয়েছে, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল ও ইউনিটের প্রতি সুবিচারের প্রশ্নই তার ভিত্তি। পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটের বিলুপ্তি ও সাব-ফেডারেশন গঠনের দাবীর ভিত্তিও এই একই।

জাতীয় জীবনের এইসব মারাত্মক সমস্যার প্রশ্নে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেছেন। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাধনের অতি আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ বরাবরই একমত।

(ক) ফেডারেল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

(খ) সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার-ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা।

নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহেও সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

(ক) পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে একটা সাব-ফেডারেশন গঠন।

(খ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মঞ্জুর

সংগ্রাম পরিষদ একমত হয়ে এও স্থির করেছে যে, বর্তমান সংকটের মূল কারণসমূহ নিরসনের ফলপ্রসূ ও স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য ভিন্ন কোন মত ও পথের সন্ধান দিতে পারেন বলে মনে করলে পরিষদের সদস্য-বর্গ তাও গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপন করতে পারবেন। যেহেতু জাতীয় জীবনের এই সব সমস্যার একটি পাকাপাকি সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, সেহেতু আমি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানকে সত্যিকার শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও বলিষ্ঠ একটি রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে ৬-দফা কর্মসূচীতে বর্ণিত রূপরেখা অনুযায়ী ফেডারেল আইন-পরিষদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে

প্রতিনিধি নির্বাচন ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর ক'রে শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন হওয়া যে দরকার, এই বৈঠকে সমাগত প্রতিনিধি-বৃন্দকে তা' হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য বিষয়টি এখানে অবতারণা করা আমি আমার আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করি। এখানে আমি বলে রাখতে চাই যে, পাকিস্তানের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা শরীক ছিলেন, আওয়ামী লীগ তাঁদেরই দল। এর প্রতিষ্ঠাতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। কিছুটা গর্বের সাথেই আমি আজ বলবো যে, এই মনীষীরই সুযোগ্য নেতৃত্বে আমি ও আমার সহকর্মিগণ সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে সংগ্রাম করেছি। আজ আমি এখানে যে সব প্রস্তাব উত্থাপন করছি, পাকিস্তানকে আরো শক্তিশালী ক'রে গড়ে তুলবার জন্য একান্ত করেই তা' গ্রহণ করবার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ বিশ্বাসই আমার এ প্রস্তাবের মূল উৎস। "এক ব্যক্তি, এক ভোট"—গণতন্ত্রের এই আদ্যনীতি হতেই জন্ম নিয়েছে ফেডারেল আইন-পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবীটি। জাতীয় এই সংস্থাটিতে ৬-দফা কর্মসূচীতে বর্ণিত বিধান মতে, কেবল মাত্র জাতীয় সমস্যাবলীই বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হবে। সে কারণে, জাতীয় পরিষদের সদস্যবর্গের দায়িত্ব হবে সব কিছু জাতীয় দৃষ্টিকোণ হতে বিচারের। সেহেতু আঞ্চলিক ভিত্তিতে সেখানে কোন নির্বাচন হবে না। তদুপরি আইন-পরিষদে জাতীয় দলগুলিরই প্রতি-নিধি থাকবে। বিধায় সেখানে দলগত ভোটাভুটি সুনিশ্চিত হবে—আঞ্চ-লিক ভিত্তিতে নয়। বিগত একুশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করলে এ সত্যই প্রতিভাত হয় যে, জাতীয় পরিষদে সব সময় দলভিত্তিতে ভোটাভুটি হয়ে আসছে, আঞ্চলিক ভিত্তিতে নয়। দেশের দুই অংশের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্যের নীতিটিই বরং এই ভ্রান্ত ধারণাকে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে যে, ফেডারেল আইন-পরিষদের প্রতিনিধিগণ আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভোট দিতে পারেন! এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, সংখ্যাসাম্য নীতিটিই জাতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিকতাবাদকে একটি গুরুতর কার্যকারণ হিসেবে অহেতুক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বিগত একুশ বছরের ইতিহাসের অভিজ্ঞতাই হ'ল এই যে, বহু রকমের জাতীয়

স্বার্থের প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান সর্বসময়ই তার আঞ্চলিক স্বার্থকে চাপা দিয়ে গেছে, যদিও তারা জানতো যে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে তাদেরই দাবী অধিক। একথা কাউকেই স্মরণ করানো প্রয়োজন করে না যে, পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন ৪৪ আর পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্র ২৮ জন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের এই সংখ্যাধিক্যকে তারা কখনো তাদের কোন আঞ্চলিক স্বার্থে কাজে লাগায় নি। বরং এক সময় পূর্ব পাকিস্তান হতেই ছয় ছয়জন পশ্চিম পাকিস্তানীকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করা হয়েছিল। সংখ্যাগুরু প্রদেশ হয়েও পূর্ব পাকিস্তান কেবল কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদেই নয়, বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নিয়েছিল। আজ দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধিত্বের বেলায় এই সংখ্যাসাম্য নীতি বাস্তবায়িত করতে কালবিলম্ব না হলেও বেসামরিক, বৈদেশিক ও সামারিক চাকুরী-বাকুরী-সহ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্য কোন ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে এই সংখ্যাসাম্য নীতির সুফল ভোগ করতে দেওয়া হয় নি। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় ফেডারেল রাজধানী ও সামরিক হেড কোয়ার্টারের কোথাও পূর্ব পাকিস্তানের কোন পাত্তাই নাই বললেও চলে। এর অর্থ দেশরক্ষা ও বেসামরিক প্রশাসন-ব্যবস্থা বাবদ প্রতি বছর যে ২৭০ কোটি টাকা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের সমগ্র বাজেটের শতকরা যে ৭০ ভাগ ব্যয় হচ্ছে তার প্রায় গোটাটাই ভোগ করছে পশ্চিম পাকিস্তান। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা যদি আইনপরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আমাদের আসন দিতে গররাজী হন, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানীগণ ফেডারেল রাজধানী ও সামরিক হেড কোয়ার্টারসমূহ পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের জন্য জিদ ধরতে বাধ্য হবে।

কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবীতে আপত্তি না ক'রে আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইয়েরা যদি তাদের পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের প্রতি তাদের আস্থার পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারেন, তা' হ'লে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ব্যাপারে তাই-ই হবে একটি সত্যিকার পদক্ষেপ। এ পদক্ষেপের ফলে

হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে গড়ে উঠবে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের সুগভীর যোগসূত্র।

দেশের যাবতীয় সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পেতে হ'লে ৬-দফার প্রতিপাদ্য মতে ফেডারেল পরিকল্পনা মেনে নেওয়ার ব্যাপারটি একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করতে হবে। দৃঢ়তার সাথে পুনরায় আমি বলতে চাই যে, ৬-দফা কর্মসূচীর মর্মবাণীই হ'ল এই যে, পাকিস্তানকে ১২ কোটী মানুষ অধ্যুষিত একটি একক, ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে উত্থাপিত করতে হবে। এই লক্ষ্য হাসিল করা সম্ভব কেবল তখনই হবে, যখন কেন্দ্রের হাতে কেবল দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা এই তিনটি বিষয় রাখার ব্যবস্থা করা হবে। একটি শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ পাকিস্তান গড়ে তুলবার একই কারণে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে দেশের দু'অঞ্চলকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার মঞ্জুর করতে হবে। যাতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সর্ব ব্যাপারে তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে।

সমাজ-ব্যবস্থাকে সুষম খাতে ঢেলে সাজাতে হ'লে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি অবিচার-অনাচারমুক্ত করার অনিবার্যতা ফুটিয়ে তুলবার মত জোরালো ভাষা আমার নেই। ছাত্রদের যে ১১-দফা কার্যসূচীর প্রতি আমি সমর্থন জানিয়েছি তাতে দেশের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-পদ্ধতির পুনর্বিন্যাসের যথোপযুক্ত প্রস্তাব রয়েছে। এ দাবী তারা তুলেছে অর্থনৈতিক সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধানেরই মানসে। মানুষে মানুষে, অঞ্চলে অঞ্চলে অর্থনৈতিক সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য যে সব শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন, আমি অবশ্য তার মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিচার-জনিত অবস্থার অতি দ্রুত অবনতি ঘটতে ঘটতে আজ এক সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ দেশের বহুকথিত বাইশ পরিবারের কাহিনীর চর্বিতচর্বণের আর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি নে। ক্ষমতার অলিন্দে অলিন্দে নির্বিচারে প্রবেশের যে ছাড়পত্রের তাঁরা অধিকারী, তাতে দেশের সম্পদ কুক্ষিগত ক'রে দেশ বিদেশে তাঁরা প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করছেন। একচেটিয়া কার্টেলবাদ সৃষ্টি ক'রে দেশের বুকে তারাই এমন

এক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পত্তন করেছেন, যাতে সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয় ও শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর অগণিত মানুষের মধ্যে সীমাহীন ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্যের কথা সুবিদিত। ১৯৫৯-৬০ সালেই প্ল্যানিং কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদদের হিসেবে বলা হয় যে, উভয় অঞ্চলে মাথাপিছু আয়ে প্রকৃত বৈষম্যের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ।

প্ল্যানিং কমিশনের পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং অন্যান্য সাম্প্রতিক দলিলে দেখা যায় যে, মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বর্তমানে তা' শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক। এ ছাড়া উভয় অঞ্চলের সাধারণ অর্থনৈতিক কাঠামো, কর্মসংস্থানের হার, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং চিকিৎসা ও কল্যাণ সার্ভিসেও বৈষম্য রয়েছে। এখানে কয়েকটি নজির দেখানো যেতে পারে: (১) পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিজলী উৎপাদন ক্ষমতা ৫৬ গুণ বেশী। (২) ১৯৬৬ সালে হাসপাতাল বেডসংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে ছিল যেখানে ৬৯০ সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২৬২০০। ১৯৬১—১৯৬৬ এই সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৮টি পলিটেক্নিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ১৮টি পলিটেক্নিক ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়। এছাড়া প্রাপ্ত সম্পদে বৈষম্য আরো বেশী। পূর্ব পাকিস্তানে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পকিস্তানে পাচার করা ছাড়াও বৈদেশিক ঋণের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে গত ২০ বৎসর রফতানীলব্ধ আয় মাত্র এক হাজার তিন শত ৩৭ কোটী টাকা হলেও পশ্চিম পাকিস্তান ৩ হাজার একশত ৯ কোটী টাকা মূল্যের পণ্য আমদানী করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে এই সময়কালে রফতানীলব্ধ আয় ১ হাজার ৬ শত ৫০ কোটী টাকা হলেও পূর্ব পাকিস্তান মাত্র এক হাজার ২ শত ১০ কোটী টাকার পণ্য আমদানী করতে সক্ষম হয়। উপরোক্ত তথ্য প্রমাণে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম অর্থনৈতিক অবিচার করা হয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব উভয় প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

জাতীয় পরিষদে পেশকৃত ১৯৬৮ সালের অর্থনৈতিক বৈষম্য সংক্রান্ত সাম্প্রতিক বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয় যে, বৈষম্য বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। কাজেই দেখা যায় যে, কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিচালনা ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলেই আঞ্চলিক বৈষম্য অবসানের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নি, কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিচালনা ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হতে পারেনি বিধায় এ ক্ষেত্রে এ বিরাট সমস্যার একটি বলিষ্ঠ ও সুপরিকল্পিত সমাধান গ্রহণ করা উচিত। আমার মতে ৬-দফায় ফেডারেশনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা' একটি বলিষ্ঠ ও সুপরিকল্পিত সমাধান।

৬-দফা : একটি বলিষ্ঠ সমাধান

৬-দফা আসলে অঞ্চলসমূহের হাতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণেরই একটি পরিকল্পনা। একমাত্র এটাই (৬-দফা) সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের ফলেই ৬-দফা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দরুন শ্রমিকেরা কর্মসংস্থানের জন্য এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে যেতে পারে না। এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই দেশের দুই অঞ্চলে উন্নয়নের মাত্রা এক নয়। কাজেই এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণেও অর্থনৈতিক পরিচালনা ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা উচিত নয়। আঞ্চলিক সরকারের হাতে অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থার পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করার জন্যই ৬-দফা কর্মসূচীতে মুদ্রা (কারেন্সী), বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং কর ধার্যের ব্যাপারে নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ৬-দফায় মুদ্রা সংক্রান্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য পূর্ব হতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার বন্ধ এবং মুদ্রানীতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে ৬-দফায় যে সকল প্রস্তাব করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য এক অঞ্চলের সম্পদ অন্য অঞ্চলে রাখা এবং উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা। ফেডারেল সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্ব হতে বঞ্চিত না ক'রে আর্থিক নীতির উপর আঞ্চলিক সরকারের কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই করধার্য সংক্রান্ত উপরোক্ত প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ

(ক) মুদ্রার ব্যাপারে এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে পুঁজি পাচার বন্ধ এবং মুদ্রানীতির উপর আঞ্চলিক সরকারের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দু'টি পৃথক মুদ্রা-ব্যবস্থা অথবা প্রত্যেক অঞ্চলে একটি ক'রে পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্কসহ একই মুদ্রা ব্যবস্থার মাধ্যমে এই লক্ষ্য কার্যকরী করা যেতে পারে। এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দু'টি মুদ্রানীতির নিয়ন্ত্রণ করবে। তবে স্টেট ব্যাঙ্ক কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কর্তৃত্ব বজায় রাখবে। এই ব্যবস্থাসাপেক্ষে মুদ্রা (কারেন্সী) একটি ফেডারেল বিষয় হবে।

(খ) বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে আঞ্চলিক সরকার দেশের পররাষ্ট্র নীতির আওতায় বাণিজ্য ও সাহায্য সর্ম্পকে পর্যালোচনা চালানোর ক্ষমতার অধিকারী হবে। পররাষ্ট্র নীতি অবশ্য ফেডারেল পররাষ্ট্র দফতরের দায়িত্ব হবে। প্রত্যেক আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা রাখা হবে এবং তা' আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। একটি সর্বসম্মত হারে ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মিটানো হবে।

(গ) আঞ্চলিক সরকারের হাতেই কর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে, তবে ফেডারেল সরকারকে আঞ্চলিক সরকারের নিকট হতে রাজস্বের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এখানে এটা সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা উচিত যে, ফেডারেল সরকারকে কখনো আঞ্চলিক সরকারের করুণার ওপর ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয় নি। এ সকল মূলনীতির অনুমোদন করা হলে উভয় পক্ষের মনোনীত বিশেষজ্ঞ সমবায়ে একটি কমিটি গঠন ক'রে বিস্তারিত বিধিব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যেতে পারে। গত কয়েক বৎসরে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবিচার পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে হতাশা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে এ সকল সমস্যা দূরীকরণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ এই স্কীমের প্রতি ঐকান্তিক সমর্থন দান করবেন।

অর্থনৈতিক সুবিচারের খাতিরে এবং দেশব্যাপী যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধানকল্পে আমি উপরোক্ত ফেডারেল পদ্ধতির স্কীম গ্রহণ করার জন্য জাতীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে খোলা মনে অংশ গ্রহণকারীদের এগিয়ে আসার আবেদন জানাচ্ছি। অর্থনৈতিক অবিচারই মূলতঃ এই সংকটের মূলে সর্বাধিক শক্তি সঞ্চার করেছে, অন্য কিছু নয়। আসুন, আমরা তার সমাধান করি। আসুন, সমস্যার গভীরতা ও উৎসমূল কোথায় তা' আমরা অনুধাবন করি। এ সকল মৌলিক সমস্যা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার যেকোনরূপ প্রচেষ্টা আমাদের অস্তিত্বকেই সঙ্কটাপন্ন ক'রে তুলবে।

যদি আমরা বাস্তব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই এবং যার ফলে দেশব্যাপী চরম সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান করতে না পারি, তা' হ'লে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এবং ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। এ একটি মহোত্তম সুযোগ। হয়তো এমনিভাবে মিলিত হওয়া অনেকের পক্ষেই আর সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং অবশ্যই আমাদের সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। আসুন, আমাদের প্রিয় পাকিস্তান যে সঙ্কটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা' আমরা সমাধান করি এবং এমন একটি শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করি যাহাতে সত্যিকার ফেডারেল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে এবং যা পাকিস্তানী জনসাধারণের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করবে। কেবলমাত্র শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানই আশা ও আস্থার সাথে ভবিষ্যতে সব সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ১৪ই মার্চ, ১৯৬৯]

শেখ মুজিবের প্রস্তাব শুনে আইয়ুব খান প্রমাদ গুণলেন। তাঁর চোখের সামনে আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল। যাদের স্বার্থ-রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাদের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিয়ে শেখ মুজিবের প্রস্তাবাবলীকে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এখন ভরসা তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ।

ভরসার আলো দেখতে পেলেন আইয়ুব খান। শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাই নন, বঙ্গাল মুলুকের কয়েকজন মীরজাফরও তাঁর শ্রেণীস্বার্থের

সপক্ষে বক্তব্য পেশ ক'রে চললেন। এঁদেরকে খান সাহেব ভাল করেই চেনেন। এঁরা তাঁরই সগোত্রীয়।

১৩ই মার্চে গোলটেবিল বৈঠকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সভাপতির ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানালেন। তিনি জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার ক'রে দুটি প্রস্তাবও মেনে নিলেন। ভাষণে বয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সভাপতির ভাষণে গোলটেবিল বৈঠকে সেদিন যে বক্তৃতা দেন, সংবাদপত্র থেকে তার পূর্ণ বিবরণ নীচে দেয়া হ'ল:

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট মেহমানগণ!

গোলটেবিল বৈঠকে আইয়ুবের ভাষণ

এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমি যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম তাতে আপনারা সাড়া দেওয়ায় আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বর্তমানে দেশ যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনাদের সরল মত প্রকাশের আমি প্রশংসা করছি। গত নভেম্বর মাসে দেশে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে তা' উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং জনসাধারণের জানমাল ও স্বাধীনতা এবং দেশের নিরাপত্তার ওপর হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৬৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জাতির উদ্দেশে আমার বেতার ভাষণে আমি বলেছিলাম, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা এবং যে সব প্রশ্ন জনগণকে বিক্ষুব্ধ করেছে সে সম্পর্কে যুক্তিবাদী রাজনৈতিক নেতাদের সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা হ'লে আমি খুশী হব।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী আমি নবাবজাদা নসরুল্লাহ্ খানের কাছে প্রেরিত পত্রে ১৭ই ফেব্রুয়ারী সম্মেলনে যোগদানের জন্য বিরোধী দলসমূহের প্রতিনিধি মনোনয়ন করতে অনুরোধ জানাই। আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেই যে গণ-তান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির বহির্ভূত দল এবং দলনিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দের নামও তিনি সুপারিশ করতে পারবেন। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি সম্মেলনের জন্য কয়েকটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন। এর প্রতিটি শর্তই পূরণ করা হয়।

১৬ই ফেব্রুয়ারী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি ঘোষণা করেন যে, 'ডাক'-এর (DAC) প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেবেন। ডাক সম্মেলন দু'দিন পরে

অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান, তাঁরা দলনিরপেক্ষ নেতা এবং পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী গ্রুপ) প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণের সুপারিশ করেন। ঐ সুপারিশ অনুযায়ী কাজ হয়।

॥ ক্ষেত্র প্রস্তুত ॥

১৯শে ফেব্রুয়ারী সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দলনিরপেক্ষ নেতারা এবং দু'টি দল বিভিন্ন কারণে সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন।

ডাক (DAC) প্রতিনিধিরা রাওয়ালপিণ্ডি আসেন কিন্তু স্বীকৃত তারিখে সম্মেলনে যোগদানে অসমর্থ হন। ২১শে ফেব্রুয়ারী আমি জাতির উদ্দেশে ঘোষণা করি যে, আগামী নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো না। বিরোধী দলীয় নেতাদের মন থেকে সব সন্দেহ দূর হবে এবং তাঁরা দেশের সমস্যাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সম্মেলনে যোগদান করবেন এই আশা নিয়ে গভীর চিন্তার পর আমি এই ঘোষণা করি।

২৬শে ফেব্রুয়ারী স্বল্পকালের জন্য মিলিত হওয়ার পর সম্মেলন ১০ই মার্চ পর্যন্ত মুলতবী হয়ে যায়। এই মধ্যবর্তী সময়ে সম্মেলনে আলোচনার জন্য একটি সর্বসম্মত ফর্মুলা উদ্ভাবনের আশায় বিরোধী দলীয় নেতারা আলোচনা চালান।

॥ দু' দফা ॥

১০ই ফেব্রুয়ারী নবাবজাদা নসরুল্লাহ্ খান সম্মেলনে নিম্নোক্ত দু' দফার একটি ফর্মুলা পেশ করেন।

(১) দেশের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা।

(২) প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে পরিষদসমূহের প্রতিনিধি নির্বাচন।

এরপর আলোচনা শুরু হয় এবং এ সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকারের সংজ্ঞা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থায় বিরোধী দলের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই। বিভিন্ন বিরোধী দলীয় নেতারা গত ৪ দিন ধরে ফেডারেল পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা এবং

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সীমা সম্পর্কে নিজেদের মত প্রকাশ করেন। বাড়তি কিছু দাবীও সম্মেলনে পেশ করা হয়। এইসব দাবীর মধ্যে ছিল এক ইউনিট বাতিল এবং কতিপয় বিষয় ছাড়া আর সব বিষয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে হস্তান্তর করা। যে সব বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকবে, তা' হ'ল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় এবং কতিপয় শর্তসাপেক্ষে মুদ্রা-ব্যবস্থা।

আরো দাবী করা হয় যে, ফেডারেল পার্লামেন্ট নির্বাচন জনসংখ্যার ভিত্তিতে হতে হবে। বর্তমানে উভয় প্রদেশে যে সংখ্যাসাম্য রয়েছে তার ভিত্তিতে নয়।

পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে কোন কোন বিরোধী দলীয় নেতা বলেন যে, এতে ফেডারেল সরকারের কর আরোপের অধিকার থাকবে না, এবং ফেডারেলভুক্ত প্রতিটি রাজ্যের আলাদা বৈদেশিক বাণিজ্য ও অর্থনীতি থাকবে।

বিরোধী দলের অপর কয়েকজন নেতা বলেন যে, সংখ্যাসাম্য বিঘ্নিত করা ঠিক হবে না। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা' অব্যাহত রাখা দরকার। এই আলোচনা চলাকালে আমি কোন কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়েছি। আপনাদের সহায়তা ও বিরোধিতার জন্যেও আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। যা কিছু বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি সতর্কতার সাথে চিন্তা করেছি এবং সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে সেগুলো আমি বিবেচনা করেছি।

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে যে পদ্ধতি রাখা হয়েছে তা' দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছিল। গত ১০ বৎসর যাবৎ এই পদ্ধতি মোতাবেক কাজ করা হয়েছে এবং সব ক্ষেত্রেই দেশের বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ কথা বলার সময় এ ব্যাপারে বিরোধী দলীয় নেতারা যে সমালোচনা করেছেন সে সম্পর্কেও আমি অনবহিত থাকি নি, কিন্তু এটাও ঠিক যে, এ সময়ে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল এবং সারা বিশ্বে পাকিস্তানের মর্যাদাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র

ইতিহাসের বিচার সব সময় সমসাময়িক ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় না।

গত দশ বছর সম্পর্কে এখানে চূড়ান্ত রায় প্রদান করা হয় নি। চাহিদা মিটানোর জন্য সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে রয়েছে, তবুও এই শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অনেকেই জোরের সাথে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এই ক্ষোভকে আমি '৬২ সালের শাসনতন্ত্রের কোন কোন ধারার বিরুদ্ধে জনগণের রায় বলেই মনে করি। বিভিন্ন নেতা সম্মেলনে যেসব দাবী পেশ করেছেন সেগুলোর পিছনে কি পরিমাণ সমর্থন রয়েছে তা' এই সম্মেলনে বসে আমার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

জনগণের অনুমোদন ছাড়া এ সব দাবী মেনে নেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে বলে ধরে নেওয়াও সম্ভব নয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন নেতার বক্তব্য শোনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সর্বসম্মত দাবী হচ্ছে দু'টি : (ক) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন ও (খ) দেশে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা চালুকরণ। প্রথম পয়েন্টটি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং কোনরূপ অসুবিধা ছাড়াই তা' পরিষদে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, 'আমার সম্মুখে বর্তমানে একটিমাত্র লক্ষ্য রয়েছে তা' হচ্ছে শান্তিপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের এক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করা; বৈঠকে আমি আমার এই লক্ষ্য প্রকাশ করেছি এবং ১লা ফেব্রুয়ারীতে আমি এক ঘোষণা করেছি।'

ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের কাছে এ কথা ঘোষণা করতে আমার দায়িত্ব বলে মনে করি যে, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপরেই অমীমাংসিত প্রশ্নসমূহের সমাধানের ভার ছেড়ে দেওয়া যথাযথ হবে। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একটি সার্বভৌম পরিষদে মিলিত হবেন এবং সে পরিষদে তাঁরা নির্দিষ্ট সমস্যাবলী ও দাবী-দাওয়া উত্থাপন করবেন। বর্তমান গোল-টেবিল বৈঠকে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে সকল সমস্যা ও দাবী উত্থাপন করেছেন তখন নব-নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সেই পরিষদেই তা' উত্থাপন করবেন এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন, 'আমি শক্তিশালী ও স্থায়ী কেন্দ্রসহ একটি অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী।' দেশের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে

প্রেসিডেন্ট বলেন, 'বর্তমান আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমাদের কাছে এক গভীর উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে সময় ও শক্তির অপচয় করা কোন মতেই উচিত হবে না। আমাদের অতি মূল্যবান একটি শিক্ষা-বছর নষ্ট হয়েছে। সকল ক্ষেত্র থেকে দাবী উঠেছে, অথচ দেশের ক্ষমতা ও সম্পদের পরিমাণের প্রতি এতটুকুও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। দেশের অর্থনৈতিক জীবন স্তব্ধ হয়ে আসছে। শিল্প উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা দারুণ সংকটের সম্মুখীন হবে।' প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমাদের সকলের বহুবিধ সমস্যা আছে এবং আমাদের সকলকে সমবেতভাবে মোকাবিলা করতে হবে। দেশে যাতে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসে তজ্জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ ও সমবেতভাবে সমস্যা-বলীর মোকাবিলা করতে হবে।'

প্রেসিডেন্ট বলেন, 'পরিশেষে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, ইসলামের ভিত্তিতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ইসলামের নীতি ও অনুশাসন অনুযায়ী আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করবো। জাতি ও আপনাদের নিকট বিবেচনার জন্য আমি আমার প্রস্তাব-সমূহ পেশ করছি। আমি জানি যে, জনগণ এই বৈঠকটির ফলাফলের জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এবং আমি প্রার্থনা করছি যে, বর্তমান সংকটটি মোকাবিলার জন্য খোদা আমাদের শক্তি ও সাহস দান করুন।'

[দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ই মার্চ, ১৯৬৯]

শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

১৪ই মার্চ ('৬৯) শেখ মুজিব ঢাকা ফিরে আসেন। দেশের আপামর মানুষের স্বার্থের প্রশ্নে তিনি আপোষ করেন নি। তাই বিমান বন্দরে তাঁকে বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বাংলার মাটিতে পা দেবার পৌনে ৪ ঘন্টা পরই বঙ্গবন্ধু এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকি-স্তানের ৪জন নেতা এন. ডি. এফ-এর জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, প্রাদেশিক পি. ডি. এম. প্রধান জনাব আবদুস সালাম খান, পি. ডি. এম-এর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মাহমুদ আলী এম. এন. এ. এবং নেজামে ইসলাম পার্টির সম্পাদক জনাব ফরিদ আহমদ এম. এন.এ'র গোলটেবিল বৈঠকে

ভূমিকার কথা উল্লেখ ক'রে তাঁদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ উত্থাপন করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, "বিগত ২১ বৎসরের ইতিহাসে যে সনাতন কুচক্রী মহল গণদাবীর বিরুদ্ধে চিরন্তনভাবে চক্রান্ত করিয়া আসিতেছে, সে মহল আজও সক্রিয় রহিয়াছে।"

[ইত্তেফাক, ১৫ই মার্চ, '৬৯]

তিনি দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেন যে, "দেশবাসী আশা করিয়াছিল যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিগত ২১ বৎসরের শাসন ও শোষণের ফলে আমাদের নেতৃবৃন্দের চৈতন্যোদয় হইবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে তাঁদের চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তিনি আরো দুঃখ ক'রে বলেন যে, যদি পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়াব প্রশ্নে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন পাওয়া যেত তা' হ'লে প্রেসিডেন্টের পক্ষে সেসব মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।"

[ইত্তেফাক, ঐ]

শেখ মুজিব ঐ বৈঠকে জনাব নূরুল আমীন, বিচারপতি জনাব এস. এম মুর্শেদ ও ন্যাপের আঞ্চলিক সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের বলিষ্ঠ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এর আগে ১৩ই মার্চ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় 'ডাকে'র সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর কারণস্বরূপ শেখ মুজিব সেদিন এক ঘোষণায় বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং এক ইউনিট বাতিলের দাবী সমর্থনে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। সাংবাদিক-সম্মেলনে শেখ মুজিব আরো বলেছিলেন যে, গণদাবী আদায়ের জন্য তিনি অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

দুঃখের বিষয়, ধীরে ধীরে সংগ্রামী জনগণ শেষ পর্যন্ত একেবারে উচ্ছৃঙ্খল কাজে লিপ্ত হতে থাকল—কথায় কথায় চরমপত্র প্রদান, ধর্মঘট, ঘেরাও, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অনাচারে প্রদেশ ছেয়ে গেল। এটা যে গণতান্ত্রিক অধিকারকে পণ্ড করার অশুভ ষড়যন্ত্র, বঙ্গবন্ধু তা' স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। কুচক্রী মহল সংগ্রামী মানুষকে উস্কানি দিয়ে জানমাল সম্পত্তি বিনাশের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম বিপথে চালিত করার জন্য এই সমাজ-বিরোধী ও মানবতা-বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগলো। শেখ মুজিব এই অশুভ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য

১৯শে মার্চ ('৬৯) দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, 'মানবতার প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল, মানবতার স্বার্থে ও কল্যাণে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের সকলের প্রতি আমার আবেদন, স্বার্থসংশ্লিষ্ট এই ঘৃণ্য ও দুরভিসন্ধিমূলক চক্রান্তকে বানচাল করার জন্য সমাজ-বিরোধী এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মজদুর ভাই ও আওয়ামী লীগের প্রতিটি সদস্যের প্রতি আমার সনির্বন্ধ আহ্বান, অবিলম্বে আপনারা দেশের আপামর জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণ ও শান্তি বজায় রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।'

কুচক্রী মহলের উস্কানিতে উচ্ছৃঙ্খলতা ও শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারী

[দৈনিক পাকিস্তান, ২০শে মার্চ, ১৯৬৯]

শেখ মুজিবের এই আহ্বানে দেশের পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল, দেশে উচ্ছৃঙ্খল সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ হ্রাস পেতে শুরু করল।

এই সময় বাংলার ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্কিত নায়ক আইয়ুবের পদলেহী গভর্নর ময়মনসিংহের এককালের বটতলার উকিল লাটবাহাদুর জনাব আবদুল মোনেম খান সপরিবারে সবার অজান্তে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যান। তাঁর স্থলে ২১শে মার্চ ('৬৯) গভর্নর হয়ে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর, মোনের খানের মন্ত্রী পরিষদের সুদীর্ঘকালের অর্থমন্ত্রী ডঃ এম. এন. হুদা। কিন্তু এই মেরুদণ্ডহীন স্বার্থান্ধ শিক্ষাবিদের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত শিকা ছিঁড়ল না। দু' দিনের সম্রাটকে পথ ছেড়ে দিতে হ'ল। ২২শে মার্চ সকাল ১০টায় গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণের পর ডঃ হুদা প্রদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান এবং নূরুল আমীনের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন। প্রদেশবাসীর উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে তিনি সর্বমহলের সহযোগিতা কামনা করেন।

মোনেম খানের পলায়ন ও ডঃ এম. এন. হুদার গভর্নররূপে আগমন

কিন্তু দুর্ভাগ্য, পূর্ব বাংলার জনগণের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যমে তাঁদের অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেওয়া হ'ল না। কেননা ২৫শে মার্চের দিনের শেষে সন্ধ্যাবাতি জ্বালাবার আগেই

'আইয়ুবশাহী' নাটকের যবনিকা-পতন ঘটল। ক্ষণেক বিরতির পর পর্দা উঠলেই দেখা গেল পাকিস্তানের আরেক নাটক—যার নায়ক হিসেবে মঞ্চে এলেন আর এক জেনারেল। পাকিস্তানে পুনরায় সামরিক শাসন কায়েম করা হ'ল এবং এই শাসনের দণ্ড ধারণ করলেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। পাকিস্তানের ভাগ্যে দুঃখের অমানিশা গাঢ়তর হয়ে উঠলো। আর সেই গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ভাগ্যে প্রভাত-সূর্যের সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৃত্যু এবং বাংলাদেশের জন্মের সময় আর বেশী দূরে নয়।

পূর্ব বাংলার ভাগ্যবিপর্যয়

ক্ষমতার এই হাত বদল খুব একটা আশ্চর্যজনক কিছুই নয়। যাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে আইয়ুব খান একদা ইস্কান্দার মীর্জার কাছ থেকে ক্ষমতা দখলের 'ম্যাণ্ডেট' পেয়েছিলেন, তারাই আবার আইয়ুবকে সরিয়ে ইয়াহিয়া খানকে গদিতে এনে বসালো। পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা, সৈনিক ও পুঁজিপতিদের আঁতাত বড়ই শক্ত ও মজবুত। গোলাম মোহাম্মদ, ইস্কান্দার মীর্জা, আইয়ুব খান, এবং পরিশেষে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, সবাই ছিলেন এই আঁতাতের এক একজন নায়ক। সুতরাং জাতীয় জীবনে ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে পূর্ব বাংলার কোনরূপ যোগ্যস্থান এঁরা দিতে পারেন না। তাই যখনই যে মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান তার ন্যায্য অধিকার পাওয়ার পথে সাফল্য অর্জন করতে এগিয়ে এসেছে, সেই মুহূর্তেই পাকিস্তানে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্ব বঙ্গবাসীদের মধ্যে যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের বশংবদ সেজে সোচ্চার হয়েছিল, শুধু তাঁদেরকেই এই আঁতাতের শরীক ক'রে পূর্ব বাংলাকে একটি কলোনী বা বাজার হিসেবে ব্যবহার করবার ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক গতি ও পথ পরিবর্তনের এবং পরিক্রমার ইতিহাস আসলে ষড়যন্ত্র ও আঁতাতের ইতিহাস—শাসন ও শোষণের ইতিহাস।

সংগ্রামী জীবনের পঞ্চম অধ্যায়
(১৯৬৯-১৯৭১)

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের দশ বছর স্থায়ী শাসনকালের ইতিহাস স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস। দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশের সমগ্র ক্ষমতা হস্তগত ক'রে তিনি বারবার দেশের মানুষের নিকট এবং বহির্বিশ্বে মহৎ হবার চেষ্টা করেছেন, একজন সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দিনরাত নিজেকে প্রচার করবার সযত্ন প্রয়াসে লিপ্ত থেকেছেন। কিন্তু দেশবাসী, বিশেষ ক'রে পূর্ব বাংলার মানুষ তাঁর শাসনভার গ্রহণের পর থেকেই উপলব্ধি করেছিল যে, পূর্ব বাংলাকে সমস্ত দিক থেকে শোষণ করবার জন্য, এই অঞ্চলের মানুষকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে, একটি অশুভ শক্তি গায়ের জোরে তাদের মাথার ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে। এই শক্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজসাধ্য নয়—তাই তাঁরা জানতেন যে সামনে কঠিন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আইয়ুব খান ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী তৈরী ক'রে সমগ্র দেশের নৈতিকতাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিলেন। এদেশ 'Too hot for democracy' বলে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র তিনি উদ্ভাবন ও কায়েম করলেন এবং বাইরের বিশ্বে এই নতুন পদ্ধতির মহিমা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাপনার অন্তঃসারশূন্যতা দেশে এবং বিদেশে কারো পক্ষেই উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় নি। আসলে এই

ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখাই যে তাঁর উদ্দেশ্য তা' দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠল। অস্ত্রের বল তাঁর যথেষ্টই ছিল—তবু জনশক্তিকেও তিনি বিশেষ ভয় করতেন। তিনি একথা গভীরভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, শুধু অস্ত্র দিয়ে জনশক্তিকে শান্ত রাখা যায় না—সাময়িকভাবে সম্ভব হলেও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। তাই এই লোকদেখানো গণতন্ত্র, তাঁর ভাষায় মৌলিক গণতন্ত্র।

আইয়ুব খানের শাসনামলে দেশে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছিল, এতে সন্দেহ নেই। বেশ কিছু কাজও যে হয়েছে, একথা আমরা স্বীকার করব। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আইয়ুব বিদেশ থেকে যে পরিমাণ ঋণ এনেছেন সেই অর্থের সামান্য অংশই পূর্ব বাংলায় খরচ করা হয়েছে। সরকারী আনুপাতিক হিসাবের চিত্র যে কি তার কিছু কিছু নমুনা আমি দিয়েছি। এ ছাড়া পূর্ব বাংলায় যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তার একটি মোটা অংশই হয়েছে অপচয় মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে অথবা মুখচেনা ব্যবসায়ী ও কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে। আইয়ুবের আমলে পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন বাইশ পরিবার ফেঁপে উঠেছিলেন, তেমনি পূর্ব বাংলায় গড়ে উঠেছিল কন্ট্রাক্টরদের ও ব্যবসায়ীদের একটি সম্প্রদায়। বাইশ পরিবারের সাথে এদের তুলনা চলে না—তবে পূর্ব বাংলার সমাজে এদের আর্থিক প্রতিপত্তি চোখে পড়বার মত ছিল।

নিজেকে ক্ষমতার আসনে রাখবার জন্য দেশের চরিত্র তিনি ধ্বংস করেছিলেন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে তিনি সামগ্রিকভাবে হনন করেছিলেন।

পূর্ব বাংলার মানুষের বিক্ষুব্ধ চেতনাকে নিজের মধ্যে ধারণ ও লালন ক'রে এই অশুভ শক্তির মোকাবিলার জন্য যিনি প্রস্তুত হলেন, তিনি আমাদের অসমসাহসী দুর্জয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্রিয় নেতা শেখ মুজিব। তিনি বাঙালী বিক্ষুব্ধ চেতনার ও সংগ্রামী অভিযাত্রার প্রতীক। শেখ মুজিব এখন আর একটি নাম নয়, একটি আদর্শ। শেখ মুজিব এমন একটি ব্যক্তিত্ব যাঁর মধ্যে বাঙালীর মুক্তির বাণী সংহত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ কারণেই আইয়ুবের আমলেই শেখ মুজিবকে সাড়ে সাত কোটী বাঙালী যে স্বীকৃতির মাল্যদান করেছে তার নাম বঙ্গবন্ধু। আমরা অতীতে

দেশবন্ধু পেয়েছি, শেরে বাংলাও পেয়েছি—কিন্তু বাংলার সত্যিকার বন্ধু পেয়েছি এই প্রথম একজনকে।

আইয়ুবের ষড়যন্ত্র তাঁর নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল না। গোটা উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক অফিসার তাঁর পশ্চাতে গড়ে তুলেছিল এই ষড়যন্ত্রের ইমারত। সে কারণেই গণ-আন্দোলনের লেলিহান শিখার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি বাহ্যিক দিক থেকে যতই বড়গলা ক'রে গোলটেবিল বৈঠক আহবান করুন না কেন, তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না।

দশ বছরের ষড়যন্ত্রের একটি পর্যায়ের সিঁড়ি থেকে আর একটি সিঁড়িতে দেশকে ঠেলে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। পূর্ব বাংলাকে একটি কলোনী হিসেবে ব্যবহার করবার বিরুদ্ধে যে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল, সেই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাক, আইয়ুব বা তদীয় সমর্থকগণ তা' চিন্তাই করতে পারতেন না। যে শক্তির মোকাবিলা করতে তিনি নিজে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে এরূপ একটি বিকল্প ব্যবস্থাই ছিল তাঁর কাম্য। যখন সেই ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেল তখন তিনি সসম্মানে সরে দাঁড়ালেন। আর তাঁর জায়গায় এসে দাঁড়ালেন বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে এক বর্বরতম ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তির তুলনা চলে একমাত্র নিরো, চেঙ্গিস খান, হালাকু খান, হিটলার প্রভৃতির সাথে। ইয়াহিয়া খান একজন মূর্তিমান জল্লাদ।

বিগত দশ বছরে যেমন, যাবার প্রাক্‌কালেও তেমনি সাধু সাজবার চেষ্টা করেছেন আইয়ুব খান। দশ বছর শাসনকালে নিজের মহৎ কীর্তির কথা কত কাজে, বাচনে ও ভাষণে যে তিনি ঘোষণা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। বিদায়ের বেলায়ও তিনি ঘোষণা করলেন যে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই তিনি সামরিক বাহিনীর প্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ ক'রে গেলেন। দেশ যেন পিতৃপিতামহ থেকে অর্জিত তাঁর নিজের সম্পদ—তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ইচ্ছে করলেই তিনি হস্তান্তর করতে পারেন। জনগণের এখানে কোন বক্তব্যই নেই, কোন মূল্যও নেই। এ এক অভিনব রাজতন্ত্র। স্বৈরতন্ত্রের এক নির্লজ্জ নায়ক তিনি। তাঁর স্থলাভিষিক্ত যিনি হলেন তিনি অবশ্য চিন্তা, চেতনা ও কার্যকলাপের দিক থেকে আইয়ুবের চেয়েও জঘন্য। সে বর্ণনা যথাস্থানে সন্নিবেশ করবো।

বিদায়ের পূর্বে আইয়ুব তাঁর প্রিয় সেনাধ্যক্ষকে একটি পত্র লিখলেন। অথবা যে পথ ধরে তিনি এসেছিলেন সেই পথ ধরে ইয়াহিয়া খান এসে জোর ক'রে তাঁকে দিয়ে এই পত্র লিখিয়ে নিয়েছিলেন। যেদিক দিয়েই সত্য হোক, কথাটি একই দাঁড়ায়। বাঘ যেমন একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে আর কিছুই আহার করতে চায় না, তেমনি সেনাবাহিনী যদি একবার দেশের শাসনভার পরিচালনার সুযোগ পায় তবে ছাউনিতে ফিরে যেতে তার মন চায় না। আইয়ুব বা ইয়াহিয়া আসলে এই শক্তিরই সৃষ্টি। দু'জন হাতের এপিঠ ওপিঠ মাত্র।

আইয়ুব যাবার পূর্বে তাঁর স্বভাবসুলভ দেশপ্রেমিকতার প্রমাণস্বরূপ ইয়াহিয়াকে চিঠি লিখে রাজত্বভার গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন এবং বেতারভাষণ-এর মাধ্যমে দেশবাসীর নিকট নিজেকে সাধুবান্দা হিসেবে প্রচার করলেন।

ইয়াহিয়াকে তিনি লিখলেন (অথবা লিখতে বাধ্য হলেন):

"প্রেসিডেন্ট হাউস
২৪শে মার্চ, ১৯৬৯

প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

ক্ষমতার হাতবদল: ইয়াহিয়ার নিকট আইয়ুবের পত্র

অতীব দুঃখের সহিত আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছে যে, দেশের সমুদয় বেসামরিক প্রশাসন-ব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান উদ্বেগজনক মাত্রায় অবস্থার যদি অবনতি ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা তথা সভ্য জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

এমতাবস্থায়, ক্ষমতার আসন হইতে নামিয়া যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর দেখিতেছি না। তাই আমি পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর হস্তে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া যাওয়ার সাব্যস্ত করিয়াছি, কেননা, সামরিক বাহিনীই দেশের আজিকার একমাত্র কর্মক্ষম ও আইনানুগ যন্ত্র।

আল্লার মেহেরবানীতে আমাদের সেনাবাহিনী পরিস্থিতির মোকাবিলা করিয়া দেশকে চরম বিশৃঙ্খলা ও সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা

করিতে সক্ষম। কেবল তাহারাই দেশের বুকে শুভ বুদ্ধির উন্মেষ ঘটাইয়া বেসামরিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরায় অগ্রগতির পথে আগাইয়া যাইতে সাহায্য করিতে পারেন।

কতিপয় লোক আমার নিকট প্রস্তাব করেন যে, যদি সমুদয় দাবী মানিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আমি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন্ দেশে? এই সকল দাবী মানিয়া নেওয়া হইলে পাকিস্তান ধ্বংস হইয়া যাইত।

আমি সর্বদা আপনাকে বলিয়াছি যে, শক্তিশালী কেন্দ্রের মধ্যেই পাকিস্তানের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। আমি এই জন্য পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিলাম যে, এই পদ্ধতিতে শক্তিশালী কেন্দ্র বজায় রাখার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এক্ষণে বলা হইতেছে যে, দেশ দুইটি অংশে বিভক্ত হইবে এবং কেন্দ্র ক্ষমতাহীন সংস্থায় পরিণত হইবে।

প্রতিরক্ষা বাহিনী পঙ্গু হইয়া উঠিবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক সত্তা বিলোপ করা হইবে। আমাদের দেশ ধ্বংস করিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে পৌরহিত্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার জীবনের বিরাট আশা বাস্তবায়িত হইতে পারিল না দেখিয়া আমি ব্যথিত। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর অব্যাহত রাখার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আমার কামনা। ... ...

...দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শ্রমিকদের উস্কানি দেওয়া হইতেছে এবং অরাজকতাপূর্ণ ও নিষ্ঠুর কাজ করার জন্য বলা হইতেছে। এদিকে হিংসাত্মক হুমকি প্রদর্শন করিয়া অধিক বেতন, মজুরী ও সুবিধার দাবী আদায় করা হইতেছে। উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে এবং রফতানী গুরুতরভাবে কমিয়া যাইতেছে। শীঘ্রই দেশে গুরুতর মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে বলিয়া আমার আশংকা হয়।

যাঁহারা গণ-আন্দোলনের আড়ালে থাকিয়া গত কয়েক মাস যাবৎ দেশের মূলে আঘাতের পর আঘাত হানিয়াছেন, তাঁহাদের বেপরোয়া আচরণের দরুন এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। দুঃখের বিষয়, বহুসংখ্যক নিরীহ লোক তাহাদের দুরভিসন্ধির শিকারে পরিণত হয়।

সকল অবস্থায় সাধ্যমত আমি জনসাধারণের খেদমত করিয়াছি। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি হইয়াছে, তবে সাফল্যও নেহায়েত কম নয়। আমি যাহা কিছু সম্পাদন করিয়াছি, এমনকি আমার পূর্বেকার সরকার-সমূহ যাহা সম্পাদন করিয়াছেন, অনেকেই তাহা নিশ্চিহ্ন করিতে চাহে। তবে সবচাইতে মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ব্যাপার এই যে, কতিপয় ব্যক্তি এমনকি কায়েদে আযমের কীর্তি পাকিস্তান বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক।

বর্তমান সংকটের নিরসনের জন্য আমি সম্ভাব্য সর্বপ্রকার বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছি। জনগণের নেতা বলিয়া গণ্য সকলের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য আমি প্রস্তাব দেই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সম্প্রতি সম্মেলনে যোগদান করেন, তবে তাঁহাদের পূর্বশর্ত মানিয়া লওয়ার পরই তাঁহারা উহাতে যোগদান করেন। অনেকে সম্মেলনে যোগদান করিতে অসম্মত হন। কেন, উহা তাঁহারাই ভাল জানেন।

একটি সর্বসম্মত ফর্মুলা উদ্ভাবনের জন্য আমি তাঁহাদের অনুরোধ জানাই। কিন্তু কয়েকদিনব্যাপী আলোচনার পরও তাঁহারা এই ব্যাপারে ব্যর্থ হন। অবশেষে তাঁহারা দুইটি প্রশ্নে একমত হন এবং আমিও উহার দুইটিই মানিয়া লই। প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়ার পর জনপ্রতিনিধিদের নিকট অমীমাংসিত প্রশ্নসমূহ পেশ করার জন্য অতঃপর আমি প্রস্তাব দেই। আমার যুক্তি ছিল যে, সম্মেলনে যোগ-দানকারী প্রতিনিধিবর্গ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন নাই বলিয়া যে সকল প্রশ্নে তাঁহারা একমত নন, সে সকল বিষয়সহ সমুদয় বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না।

দুইটি সর্বসম্মত প্রশ্ন বিবেচনার জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করার কথা আমি চিন্তা করি। কিন্তু শীঘ্রই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, উহা নিরর্থক হইবে। পরিষদের সদস্যারা আর স্বাধীন প্রতিনিধি থাকিতেছেন না এবং দুইটি সর্বসম্মত প্রশ্ন গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। বস্তুতঃ, সদস্যদের প্রতি হুমকি দেওয়া হইতেছে এবং অধি-বেশন বর্জন অথবা তাঁহাদের এমন সব সংশোধনী উত্থাপনের জন্য বাধ্য করা হইতেছে যাহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বিলুপ্ত হইবে এবং সশস্ত্র

বাহিনী বজায় রাখা অসম্ভব হইবে। দেশের অর্থনীতি বিভক্ত এবং পাকিস্তান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। এই ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিষদ আহ্বান করা হইলে পরিস্থিতি অধিকতর খারাপ হইয়া উঠিত। ক্রমাগত হিংসাত্মক কাজের হুমকির মধ্যে কাহারো পক্ষে কি মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে শান্তভাবে আলোচনা করা সম্ভব?

বর্তমান জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করা বেসামরিক সরকারের সাধ্যাতীত। কাজেই প্রতিরক্ষা বাহিনীকে অবশ্যই অগ্রসর হইতে হইবে।

শুধু বাহিরের আক্রমণই নয়, আভ্যন্তরীণ আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করাও আপনাদের আইনগত এবং শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব। দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষা এবং স্বাভাবিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপনি এই দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া জাতি আশা করে। ১২ কোটী মানুষের এই দুঃখের রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসুক।

আমি বিশ্বাস করি যে, দেশের বিরাট সমস্যার মোকাবিলা করার মত সামর্থ্য, দেশপ্রেম, শিক্ষা ও কল্পনা-শক্তি আপনার রহিয়াছে। আপনি এমন এক বাহিনীর নেতা যে-বাহিনী গোটা বিশ্বের সম্মান ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। পাকিস্তান বিমান-বাহিনী এবং পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে আপনার সহকর্মীরা সম্মানের অধিকারী এবং আমি জানি যে, আপনি সর্বদা তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিবেন। পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে অবশ্যই পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

আপনি যদি প্রত্যেক সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিককে জানান যে, এককালে তাঁহাদের সর্বাধিনায়ক হিসাবে থাকার জন্য আমি গর্ববোধ করি, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। তাঁহাদেরকে মনে রাখিতে হইবে যে, এই সংকটজনক মুহূর্তে তাঁহাদেরকে পাকিস্তানের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। ইসলামের নীতি অনুযায়ী তাঁহাদের আচরণ করিতে হইবে।

এত দীর্ঘকাল সাহসী পাকিস্তানবাসীর সেবা করা একটি বিরাট সম্মান। অকৃত্রিম আনুগত্যের জন্য আমি অবশ্যই আপনার প্রশংসা করিব। আমি জানি, দেশপ্রেম সর্বদা আপনার জীবনে উৎসাহের উৎস ছিল।

আপনার সাফল্য এবং আমার দেশের জনগণের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আমি প্রার্থনা করি। খোদা হাফেজ।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাঃ এম এ. খান"

[ইত্তেফাক, ২৬শে ও ২৭শে মার্চ, ১৯৬৯ঃ দৈনিক পাকিস্তান, ২৭শে মার্চ পৃঃ ৩]

পরদিন অর্থাৎ ২৫শে মার্চ রাত ৮ টায় আইয়ুব খান জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন ঃ

"আমার প্রিয় দেশবাসী, আচ্ছালামু আলাইকুম।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টরূপে আপনাদের সামনে ইহাই আমার শেষ ভাষণ। দেশে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি সাধিত হইতেছে। প্রশাসনিক সংস্থাসমূহকে বিকল করা হইতেছে। জনতা আপন আপন ইচ্ছা মোতাবেক ঘেরাও শুরু করিয়াছে, এবং জবরদস্তির মাধ্যমে তাহাদের দাবী-দাওয়া আদায় করিতেছে। সত্য কথা বলার সাহস কাহারো নাই।

দেশের খেদমতে যাঁহারা আগাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে জনতাকে অনুসরণে বাধ্য করা হইতেছে। এই উন্মত্ত-তাকে রোধ করিবার মত কেহই তাঁহাদের মধ্যে নাই। দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করা হইয়াছে। কলকারখানা বন্ধ হইয়া যাইতেছে, এবং উৎপাদনের পরিমাণ প্রতিদিন হ্রাস পাইতেছে।

এই মুহূর্তে যে সব অনুভূতি আমাকে আপ্লুত করিতেছে, তাহা আপনারা ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে পারেন। আমাদের রক্ত ও মেহনতে যে দেশকে আমরা পরিচর্যা করিতেছি, মাত্র কয়েক মাসেই তাহাকে দুঃখজনক আবর্তে টানিয়া আনা হইয়াছে।

আমি একবার আপনাদের বলিয়াছিলাম যে, বুদ্ধির আলোকেই জাতীয় সমস্যাবলী মীমাংসা করিতে হইবে, ভাবপ্রবণতার উদ্দীপনায় নয়। আপনারা দেখিয়াছেন যে, ভাবপ্রবণতার আগুন একবার প্রজ্জ্বলিত করিলে প্রতিটি ব্যক্তিই অসহায় হইয়া পড়েন।

আমি আমার সর্বোত্তম সামর্থ্য দ্বারা আপনাদের খেদমতের চেষ্টা করিয়াছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তানের জনসাধারণ শাশ্বত ঈমানের আশীর্বাদপুষ্ট এবং প্রতিটি অসুবিধা মোকাবিলায় শক্তি

তাহাদের আছে। আমাদের জনসাধারণের একমাত্র প্রয়োজন ধৈর্য, শৃঙ্খলা এবং ঐক্য।

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারীতে আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, আমি পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব না। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আমার উক্ত ঘোষণার পর জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবে। এবং প্রশান্ত মনোভাব লইয়া দেশের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর উপযুক্ত সমাধান বাহির করার চেষ্টা করিবে। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, ব্যক্তিগত ঘৃণার ভাব তিরোহিত হইবে এবং আমরা সকলে পুনরায় দেশের অগ্রগতির জন্য আত্মনিয়োগে সমর্থ হইব।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিস্থিতি খারাপ হইতে আরো খারাপের দিকে যাইতেছে। আপনারা গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত আছেন। কয়েক সপ্তাহের আলাপ-আলোচনার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ শুধু দুইটি দাবী সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌছাইতে সমর্থ হন এবং আমি উভয় দাবী মানিয়া লই। আমি প্রস্তাব করি, যে-সব প্রশ্নে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই, সেগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। এমন কি জনসাধারণের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হওয়ার অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহাদের প্রত্যেকে অবিলম্বে তাঁহাদের দাবী মানিয়া লইবার জন্য জেদ ধরেন।

কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দেন যে, সকল দাবী মানিয়া লইলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি তাহাদের প্রশ্ন করি ঃ কোন্ দেশে ? কারণ এই সকল দাবী গ্রহণের মধ্যে পাকিস্তান ধ্বংস হইয়া যাওয়ারই আশংকা রহিয়াছে।

আমি বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, শক্তিশালী কেন্দ্রের মধ্যেই পাকিস্তানের মুক্তি নিহিত। আমি পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিলাম। কারণ এই ব্যবস্থাতেও শক্তিশালী কেন্দ্র সংরক্ষণের সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু এখন বলা হইতেছে যে, দেশকে দুইভাগে ভাগ করা হউক। কেন্দ্রকে কর্মক্ষমতাহীন ও শক্তিহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হউক।

দেশরক্ষা বাহিনীকে পঙ্গু করিয়া রাখা হউক এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক সত্তা বিলোপ করিয়া দেওয়া হউক।

প্রেসিডেন্টরূপে দেশের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি মর্মাহত হই যে, আমার জীবনের একটা বড় সাধ পূরণ হইল না। নিয়মতান্ত্রিক পথে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল।

বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা সম্ভব নয়। এমনকি কিছু সংখ্যক সদস্য পরিষদ অধিবেশনে যোগদানে সাহসী হইবেন না। যাঁহারা যোগদান করিবেন তাঁহারাও ভয়ে সত্যিকার মতামত প্রকাশে সমর্থ হইবেন না। জাতীয় পরিষদ কক্ষ রক্তাক্ত সংঘর্ষ-ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ারও আশংকা রহিয়াছে।

দেশের অখণ্ডতার প্রশ্ন সব কিছুরই ঊর্ধ্বে। মৌলিক শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন-সমূহের সমাধান একমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই সম্ভব। কারণ শান্ত পরিবেশেই গণ-প্রতিনিধিরা ধীরেসুস্থে এসব প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারেন। বর্তমানে দেশে সেরূপ পরিস্থিতি বিদ্যমান নেই। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইলেই কেহ না কেহ অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দেয়। ইহা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে, গত দশ বছরে বা তার আগে অর্জিত সবকিছু ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য জনগণ মাতিয়া উঠিয়াছে। এমনও লোক রহিয়াছে, যাহারা কায়েদে আযম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই দেশকে ধ্বংস করিয়া দিতে চায়। এ কথা বলিতে আমার দুঃখ হয় যে, পরিস্থিতি আর সরকারের আয়ত্তে নাই। সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান এখন ভীতি, চাপ ও শক্তি-প্রয়োগের শিকারে পরিণত হইয়াছে। সকল ন্যায়নীতি, সংযম এবং সভ্য মানুষ হিসাবে জীবনযাপনের আদর্শে জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে। দেশের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করা হইতেছে জনপথে। সামরিক বাহিনী ছাড়া পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আর কোন শাসনতান্ত্রিক কিংবা ফলোপধায়ক ব্যবস্থা নাই।

সমগ্র জাতি দাবী করিতেছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান তাঁর শাসন-তান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করুন। পাকিস্তান বিমান এবং নৌ-বাহিনী তাঁহার সহিত রহিয়াছে এবং তাঁহাদের শৌর্যবীর্যের প্রতি, মানুষের কল্যাণের প্রতি

নজর রাখিতে হইবে এবং তাঁহাদের প্রতিটি কার্যক্রম ইসলামের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। দেশের নিরাপত্তার খাতিরে সামরিক বাহিনীর কর্তব্যে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করা যাইবে না এবং তাঁহাদের আইনানুগ দায়িত্ব সম্পাদন করিতে দিতে হইবে। আমি এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি।

আপনাদের মনোভাব সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। সর্বশক্তিমানের উপর ভরসা রাখুন এবং আশা ছাড়িবেন না। আপনারা আমাকে দশটি বছর প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকার সম্মান দিয়াছেন এবং ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে সকল কাজে অংশীদার হইয়াছেন। এ জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি সরকারী কর্মচারীদেরও ধন্যবাদ দিতেছি। সঙ্কট মুহূর্তে তাঁহারা প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহস ও নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছেন।

আমার কোন কোন সহকর্মীরও তীব্র এবং অহেতুক সমালোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এ সবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহারা উৎসর্গীকৃত মনোভাব লইয়া দিবারাত্র জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহাদের পুরস্কৃত করিবেন।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমি বিদায়কালে আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাই, যেন আপনারা সম্ভাব্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে আপনাদের ভাইদের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সহযোগিতা করেন। প্রতিটি সৈনিক আপনাদের ভাই। দেশপ্রেমে তাঁহাদের অন্তর সিক্ত, ইসলামের আলোকে তাঁহারা বুদ্ধিদীপ্ত। দেশে দ্রুত এবং পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আল্লার কাছে প্রার্থনা করি যাতে আমরা গণতন্ত্রের পথ ধরে উন্নতি এবং অগ্রগতির যাত্রা অব্যাহত রাখিতে পারি। আমিন।

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬শে মার্চ, ১৯৬৯]

এর পর ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রি সোয়া ন'টার পর থেকে সারা পাকিস্তানে দ্বিতীয় সামরিক শাসন জারী করা হ'ল। প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান পাকিস্তান বেতারে উক্ত অনির্ধারিত বক্তৃতায় তম্মুহূর্ত থেকে স্বীয় ক্ষমতা ত্যাগের কথা ঘোষণা ক'রে জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হস্তে দেশের শাসনভার অর্পণ করেন। প্রধান সামরিক

আবার সামরিক শাসন জারী

শাসন পরিচালক জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তান সময় রাত্রি সোয়া ন'টায় পাকিস্তান বেতার থেকে সামরিক শাসন সংক্রান্ত নির্দেশ-নামা পাঠ প্রসঙ্গে শাসনতন্ত্র বাতিল, পরিষদসমূহ বিলুপ্ত এবং প্রেসিডেন্ট, গভর্নর ও মন্ত্রী পদে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ আর স্ব স্ব পদে বহাল থাকবে না বলে ঘোষণা করেন।

ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান বেতারে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পটভূমি এবং এর লক্ষ্য বিশ্লেষণ করেন। সামরিক শাসন-ব্যবস্থা জনগণের গোটেই কাম্য নয়, জেনারেল ইয়াহিয়া একথা ভালভাবেই জানতেন—তাঁর ভাষণেও সে ইংগিত ছিল। ১৯৫৮ সালে সারা দেশে যে সামরিক শাসন চালু করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল কিছুটা ভিন্নতর। দীর্ঘকাল এই সামরিক শাসন চালু থাকার পর পুনরায় সামরিক শাসনের প্রবর্তন জনমনে বিক্ষোভের ও হতাশার সৃষ্টি করেছিল। গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্যই যে সামরিক শাসন-ব্যবস্থা, একথা আর কারো অবিদিত রইল না। অস্ত্রের বলে ক্ষমতায় এলেও ইয়াহিয়া বুঝতে পারলেন যে, গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুবের পতন হয়েছে এবং এই গণ-অভ্যুত্থানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলে তাঁকেও আইয়ুবের ভাগ্য বরণ করতে হবে। সে কারণেই ক্ষমতায় এসে তিনিও জনগণকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবেন বলে ওয়াদা করলেন, ওয়াদা করতে বাধ্য হলেন। তিনি জনগণের সামনে সামরিক শাসনের বিধিবিধান তুলে ধরলেন।

এই বিধিবিধানগুলোর প্রধান কয়েকটি হ'ল ঃ

* সামরিক আইনবিধি বা নির্দেশাবলী লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিরা বিধিসমূহে বর্ণিত ব্যবস্থাদি অনুযায়ী দণ্ডিত হইবে।

* সাধারণ আইন লঙ্ঘনজনিত অপরাধের জন্য বিশেষ শাস্তির বিধান করা যাইতে পারে।

* সাধারণ আদালতসমূহকে যে কোন সামরিক আইনবিধি বা নির্দেশ লঙ্ঘনজনিত অপরাধ বিচারের ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা প্রদত্ত হইতে পারে।

* এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে সাধারণ আদালতসমূহের এখতিয়ার খর্ব করা যাইতে পারে।

* শাসনতন্ত্র বাতিলের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল শাসনতন্ত্র বাতিলের পূর্ববর্তীকালের উহাদের সকল ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করা যাইবে। (১) কোন আদালতই কোন সামরিক আইনবিধি বা নির্দেশ বা কোন সামরিক আদালতের কোন রায় বা নির্দেশ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে পারিবে না। (২) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের বিরুদ্ধে বা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বা এখতিয়ার ভোগকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার রীট বা নির্দেশ জারী করা যাইবে না।

* কোন লোক কথায় কিংবা লেখায় অথবা প্রকাশ্য হাবভাবে অথবা অন্য কোন ভাবে সামরিক আইন বলবৎ অথবা ইহার কার্যক্রম সম্পর্কে সমালোচনা করিলে অথবা প্রধান সামরিক প্রশাসক কিংবা যে কোন সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঘৃণা অথবা অসন্তোষ সৃষ্টি করিলে অথবা সৃষ্টির চেষ্টা করিলে অথবা ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি অথবা সৃষ্টির চেষ্টা করা হইলে তাহাকে সর্বোচ্চ ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া যাইবে।

শাস্তির বিধি-বিধানসমূহও উল্লেখযোগ্য ঃ

*(১) মৃত্যু।

(২) অনধিক ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৩) অনধিক ৩০টি বেত্রাঘাত।

* সম্পত্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত হইতে পারে, আবার কোন সম্পত্তি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ ধ্বংস করাও যাইতে পারে। কোন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কিংবা ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হইলে উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যে কোন সম্পত্তির উপর কার্যকরী হইবে।

* ফাঁসির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হইবে।

* ধর্মঘট, তালাবন্ধ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনহিতকর কার্যালয় এবং শিল্প সংস্থাসমূহে উত্তেজনা সৃষ্টিমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা হইতেছে। ধর্মঘট অথবা ধর্মঘটের জন্য সাহায্য করিলে অথবা ধর্মঘটের জন্য প্রচারণা চালাইলে শাস্তি প্রদান করা হইবে। সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

* স্থানীয় সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ভিন্ন কেহ কোন সভা বা শোভাযাত্রার আয়োজন বা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। লিখিত-ভাবে এই অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সভা ও শোভাযাত্রা ভিন্ন কোন সভা ও শোভাযাত্রায় কোন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

* সামরিক শাসনের প্রতি অনানুগত্য দণ্ডযোগ্য, অনুরূপ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বৎসর কারাদণ্ড।

[প্রেস বিজ্ঞপ্তি, রাওয়ালপিণ্ডি, ২৭শে মার্চ, ১৯৬৯]

সামরিক শাসন বিধিগুলোতে শক্তির একটি সদম্ভ হুমকি আছে। জনগণের শক্তিকে সর্বপ্রকারে খর্ব ক'রে স্বৈরাচারী শক্তিকে অক্ষত রাখবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তথাপি জাগ্রত গণচেতনাকে যে কোন আইন প্রয়োগ ক'রে বা বেয়োনেটের সাহায্যে পদদলিত করা যায় না, পৃথিবীর সকল স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়কের ন্যায় ইয়াহিয়া খানও সেকথা জানতেন। আর জানতেন বলেই তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে তিনি দেশের জনগণকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি নিজের স্বার্থের জন্য ক্ষমতায় আসেন নি, ক্ষমতায় থাকবার কোন লোভও তাঁর নেই, আর তাই নিয়মতান্ত্রিক একটি সরকারকে প্রতিষ্ঠা করেই তিনি চলে যাবেন। চলে যাবেন ছাউনিতে ফিরে। বেতার ভাষণে তিনি বলেন ঃ

ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ

"অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আমি আপনাদিগকে জানাইয়া দিতে চাই যে দেশে একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন অভিলাষ আমার নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুষ্ঠু, গলদমুক্ত ও সততাপরায়ণ প্রশাসন ব্যবস্থাই সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন গঠনমূলক রাজনৈতিক জীবনধারার একটি অনিবার্য পূর্বশর্ত।"

তিনি আরো বলেন, "প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত এইসব জনপ্রতিনিধিদের কাজই হইবে দেশকে একটি সচল শাসনতন্ত্র প্রদান করা। এবং যে সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যা প্রতিনিয়ত গণমনকে বিব্রত করিতেছে, তাহার একটি সমাধান নির্দেশ করা।"

মেহনতী মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি নজর তাঁর নাকি ছিল সজাগ। সে সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেন ঃ

"ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সত্যিকার অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন আছি। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাসই দিতে চাই যে, আমার সরকার তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিবেন না।"

দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন ঃ

"......পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটে যে, স্বাভাবিক আইন প্রয়োগ পদ্ধতিসমূহ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও অচল হইয়া পড়ে। দেশে জানমালের গুরুতর ক্ষতি হয় এবং একটি গ্রাসের ভাব জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে। উৎপাদন বিপজ্জনকভাবে নিম্নতর পর্যায়ে হ্রাস পাইয়াছে এবং অর্থনীতিকে সাধারণভাবে একটি নজিরহীন ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ধর্মঘট আর হিংসাত্মক কার্যকলাপ দৈনন্দিন বিষয়ে পরিণত হইয়াছে, এবং দেশকে একটি অতল-গহ্বর ধ্বংসের প্রান্তে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। দেশকে তাই নিরাপদ ও স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে ফিরাইয়া আনা জরুরী কর্তব্যরূপে দেখা দেয়। সশস্ত্র বাহিনী এইরূপ একটি নৈরাজ্যপ্রায় অবস্থায় নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারে নাই। এই জন্যই তাহাদেরকে দেশকে চরম বিপর্যয়ের কবল হইতে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্যই আমি উপরোক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছি।

জনসাধারণের জানমাল আর স্বাধীনতার নিরাপত্তা বিধান এবং প্রশাসনযন্ত্রকে পূর্বাবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠাই আমার সামরিক আইন জারী করার মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব, প্রধান সামরিক-শাসন প্রশাসক হিসাবে আমার প্রথম ও প্রধানতম কর্তব্য হইতেছে, সুস্থ বিবেকবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং প্রশাসনযন্ত্র যাহাতে জনগণের সন্তোষ অনুযায়ী স্বাভাবিক কাজকর্ম পুনরারম্ভ করিতে পারে উহার নিশ্চয়তা বিধান। আমাদের প্রশাসনযন্ত্রে যথেষ্ট শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। কিন্তু আমি দেখিতে চাই যে, কোন প্রকারে যে কোন পদ্ধাততেই যেন ইহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। প্রশাসনযন্ত্রের প্রত্যেকেই এই হুঁশিয়ারীকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করুক।"

অবশেষে দেশবাসীকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বলেন ঃ

"আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ স্পষ্টতার সংগে জানাইতে চাই যে, একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার কায়েমের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ব্যতীত আমার আর কোনই অভিলাষ নাই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, দেশে একটি সুস্থ ও গঠনমুখী রাজনৈতিক জীবনধারা প্রতিষ্ঠা এবং ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট নির্বিঘ্নে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রথমে একটি সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও সৎ প্রশাসনযন্ত্র আবশ্যক। অতঃপর দেশবাসীকে একটি কর্মোপযোগী শাসনতন্ত্র প্রদান এবং জনসাধারণের অন্তরে বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী যাবতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান বাহির করা এই সমস্ত জনপ্রতিনিধিরই কর্তব্য হইবে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭শে মার্চ, ১৯৬৯]

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইয়াহিয়া খান অতি সতর্কতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বিশেষ ক'রে পূর্ব বাংলার প্রতি তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখলেন। আইয়ুবের পতনের দৃশ্যই তাঁকে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে বাধ্য করেছিল।

সামরিক শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনগণকে সামরিক বিধি লঙ্ঘনের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক প্রদান করা ছাড়াও শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলা সামরিক শাসন এলাকাকে চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। ২৮শে মার্চ, ১৯৬৯ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, বিভক্ত অঞ্চলগুলো হবে ঃ অঞ্চল—'ক' ঃ ঢাকা বেসামরিক বিভাগ, সদর-দফতর ঢাকায় অবস্থিত থাকবে। অঞ্চল—'খ' ঃ খুলনা বেসামরিক বিভাগ, সদর-দফতর যশোরে অবস্থিত থাকবে। অঞ্চল—'গ' ঃ রাজশাহী বেসামরিক বিভাগ, সদর-দফতর রাজশাহীতে অবস্থিত থাকবে। অঞ্চল—'ঘ' ঃ চট্টগ্রাম বেসামরিক বিভাগ, সদর-দফতর কুমিল্লায় অবস্থিত থাকবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সামরিক শাসন প্রবর্তনের পব সমগ্র পাকিস্তানকে দুটো সামরিক প্রশাসন অঞ্চলে বিভক্ত ক'রে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'ক' অঞ্চল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে 'খ' অঞ্চল রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

২৭শে মার্চ তারিখে ঢাকায় এক ঘোষণায় রাও ফরমান আলী-কে পূর্ব পাকিস্তান সামরিক শাসন এলাকার ('খ' অঞ্চল) সহকারী সামরিক শাসন পরিচালক নিযুক্তির কথা বলা হয়।

এ সময় একটি বিদেশী সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদের বদৌলতে এই মর্মে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, শেখ মুজিব ও ভাসানীকে গ্রেফতার করা হবে। ৪ঠা এপ্রিল এক প্রেস-বিজ্ঞপ্তিতে সরকার এ বিষয়ে আশ্বস্ত ক'রে জানান যে, এটা একটা গুজব ছাড়া আর কিছুই নয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানী তাঁদের স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করছেন।

এরপরে ইয়াহিয়া খান দেশের একচ্ছত্র কর্ণধার হিসেবে অধিষ্ঠিত রাখার জন্য নিজেকে প্রেসিডেন্টরূপে ঘোষণা করলেন। ১৯৬৯ সালের ৩১শে মার্চ তিনি দেশবাসীকে এক ঘোষণায় জানালেন ঃ

ইয়াহিয়ার নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা

"যেহেতু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এন. পি-কে. এইচ. জে. ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিটের সময় তাঁহার প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার ত্যাগ করিয়াছেন এবং প্রধান সামরিক আইন পরিচালক ও পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে আমি জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এইচ. পি-কে. জে'র নিকট সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়াছেন, সেহেতু, আমি ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চের উক্ত রাত্রে সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার এবং উল্লিখিত ক্ষমতাসমূহ ও এইভাবে অন্যান্য যে সকল ক্ষমতা আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা এপ্রিল, ১৯৬৯]

সাধু প্রস্তাব! আমরা দেশবাসী নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা পালন ক'রে আমাদের ভাগ্যের শেষ পরিণতিটুকু দেখার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকবো, আর যাই হোক পূর্ব বাংলার অবস্থা তেমন ছিল না। ইয়াহিয়ার নতুন দাবার চাল সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলাম। পূর্বেই বলেছি, ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন-এর উদ্দেশ্য একই হলেও পরিবেশ ছিল ভিন্নতর। সেকারণেই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে তাঁকে বিরত থাকতে

হয়েছে। রাজনৈতিক কার্যকলাপকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ ক'রে দেবার দুঃসাহস তাঁর হয় নি। সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ যেমন—লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, খুনখারাবী এগুলো অবশ্য ইয়াহিয়া সরকার কঠোর হস্তে দমন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের বিপুল জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার অন্য দলগুলোকে ঈর্ষান্বিত ক'রে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই সব দল ইয়াহিয়ার আগমনে আনন্দিত হয়েছিল। নতুন প্রভুর আমলে নতুন ষড়যন্ত্রের সুযোগ এলো—নতুন পথে এবার শেখ মুজিব ও তাঁর দলকে ঘায়েল করবার চেষ্টা শুরু হ'ল। কিন্তু জনগণের সত্যিকার নেতা শেখ মুজিব এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না—প্রয়োজনও ছিল না। ইয়াহিয়াকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার খুব কিছু ছিল না। কেননা, আইয়ুব অথবা ইয়াহিয়া যিনিই ক্ষমতায় থাকুন বা আসুন না কেন, সারা পাকিস্তানে শেখ মুজিবকে অস্বীকার ক'রে কারোরই কিছু করবার নেই। দেশের জনগণ তাঁর পশ্চাতে এমন অটল শক্তিতে দণ্ডায়মান যে, দেশ সম্পর্কে যাবতীয় সিদ্ধান্ত তাঁকে বাদ দিয়ে কারো পক্ষেই নেবার অধিকার ছিল না। ইয়াহিয়ার হাতে অস্ত্রের শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু গণশক্তি শেখ মুজিবের হাতে। অস্ত্রের শক্তি গণশক্তির কাছে মাথা নত করে। ইহা ইতিহাসের বিধান।

শেখ মুজিব কিছু দিন সংযতবাক সময় যাপন করলেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এই খেলা নতুন খেলা নয়। অতীতেও যখনই জনগণের হাতে ক্ষমতা দেবার প্রশ্ন এসেছে, একই রকমের ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে।

সুতরাং পাকিস্তানের অতীত রাজনীতির ইতিহাস-সচেতন এই রাজনীতিবিদ এবারেও মিতভাষীর ভূমিকায় থেকে ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

ইয়াহিয়ার ক্ষমতায় আগমন সম্পর্কে সে সময় ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) মোসাফির ছদ্মনামে যে অভিমত ব্যক্ত করেন নানা কারণে তা' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এখানে তা' স্মরণ করি ঃ

"সাধারণভাবে সামরিক শাসন-ব্যবস্থা কাহারো কাম্য নয়। জেনারেল ইয়াহিয়ার বক্তৃতাতেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ ১৯৫৮ সালে

প্রবর্তিত সামরিক শাসন দীর্ঘকাল চলিবার পরে দেশে পুনরায় সামরিক শাসন প্রবর্তন করিতে হইবে, ইহা কেহই ধারণা করে নাই। কিন্তু এবারকার সামরিক শাসন প্রবর্তনের পটভূমি ভিন্ন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের দশ বছর স্থায়ী স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণ এতই বিক্ষুব্ধ ও মারমুখী হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইবেন না, গত ২১শে ফেব্রুয়ারী এই মর্মে সিদ্ধান্ত ঘোষণা এবং পরবর্তী গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠান করিয়াও তাঁহার সরকারের প্রতি কোন অঞ্চলের জনগণেরই আস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই।

.....দেশের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষকরা হঠাৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলেন, যার ফলে এক শ্রেণীর সমাজ-বিরোধী লোক মাথাচাড়া দিয়া উঠিল এবং এখানে ওখানে অবাঞ্ছিত হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হইল। শেষমেষ উপায়ান্তর না দেখিয়াই বিগত ২৫শে মার্চ ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়াকে দেশ শাসনের ভার গ্রহণের জন্য এক পত্র লিখিলেন। এ অবস্থায় জেনারেল ইয়াহিয়া তথা দেশরক্ষা বাহিনীর পক্ষে ভিন্ন কিছু করার ছিল না। তবে দেশকে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ফিরাইয়া নিবার উপর জেনারেল ইয়াহিয়া ও দেশরক্ষা বাহিনীর কৃতিত্ব নির্ভর করিবে। অপরপক্ষে সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হইবে যে, সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনের সুযোগে সমাজ-বিরোধী এক অশুভ চক্র মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়া সাধারণ নাগরিকের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। দেশের সচেতন ছাত্র-সমাজ এবং রাজনীতিকদের অনেকে এই দুষ্কর্মের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে শান্তি-কমিটি স্থাপনপূর্বক আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার আন্তরিক চেষ্টাও তাঁরা করিয়াছেন। উত্তেজনা ও উস্কানির মুলে নিজেদের উপর ঝুঁকি লইয়াও আমরা সংশ্লিষ্ট মহলকে বারে বারে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার এবং দুষ্কতিকারীদের নিবৃত্ত করার আহবান জানাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু সকল সুস্থ মহলের আবেদন সত্ত্বেও এক শ্রেণীর লোক অন্যায় আবদার লইয়া ইদানীং যে সব কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়াছিল এবং রাজনীতির আবরণে একদল উগ্রপন্থী তাদেরকে যেভাবে উস্কানি দিতেছিল তাহা আমরা সমর্থন করিতে পারি নাই।

যাঁরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, এই সকল অগণতান্ত্রিক ও প্ররোচনামূলক আবল-তাবল কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া লজ্জায় তাঁদের মাথা হেঁট হইয়া পড়িয়াছে। এই কার্যকলাপের দরুন দেশের অর্থ-নীতিরও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত শাসন-ব্যবস্থাও রহস্য-জনকভাবে অকস্মাৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আমাদের দেশ অভাবের দেশ। স্বভাবতঃই আমাদের গণজীবনও সমস্যাজর্জরিত, ইহা সকল মহলই স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ শ্রমিক, কৃষক এবং বেকারদের সমস্যা আজ অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উর্ধ্বমূল্য ইহার অন্যতম কারণ।

বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে দেশের দরিদ্র, শ্রমিক, কৃষক, ও নিম্ন-বেতনভুক কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের সহানুভূতি রহিয়াছে, কিন্তু বর্তমান গণ-আন্দোলনের সুযোগে কর্মজীবনের সর্বস্তরের মানুষও মায় হাজার দু'হাজারীরাও যেভাবে প্রচলিত নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি লঙ্ঘন করিয়া 'জ্বালাও' 'ঘেরাও' অভিযানের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে সত্যিকারের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ের সম্ভাবনা সম্পর্কেও আমরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং ইহাদের আচরণে ব্যথিত বোধ করিতেছিলাম। বিশেষতঃ ক্ষমতাসীনরা যখন হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া ছিলেন সেই মুহূর্তে সর্ব শ্রেণীর লোকের দাবী-দাওয়া লইয়া রাস্তায় নামিবার যৌক্তিকতা আমরা অনুধাবন করিতে পারি নাই। পক্ষান্তরে ক্ষেত্রবিশেষে ইহাকে আমরা প্ররোচনামূলক বলিয়া মনে করিয়াছি। সমগ্র পরিস্থিতি আমাদিগকে রীতিমত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। অবশ্য আমাদের মনোভাব দেশবাসীর সম্মুখে সময়মত তুলিয়া ধরিতে দ্বিধা করি নাই। আমরা আগেও বলিয়াছি, এখনও বলিব—দেশের দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন-বেতনভুক কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়াসমূহ পূরণ করিয়া তাদের অর্থনৈতিক দুর্গতি লাঘবের আশু ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, এবং সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের এই মুহূর্তের আবেদনও তাহাই। প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর বেতার ভাষণে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকদের সমস্যার উল্লেখ করিয়া উহা সমাধানে যত্নবান হওয়ার যে প্রতিশ্রুতি

দিয়াছেন, আশা করি প্রথম সুযোগেই উহা যথাসম্ভব পূর্ণ করিয়া দেশের অভাবী মানুষের দুর্দশা লাঘবের পথ তিনি প্রশস্ত করিবেন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮শে মার্চ, ১৯৬৯]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি কিছু কিছু রক্ষা করেছিলেন। তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেও (১০ই এপ্রিল, ১৯৬৯) তিনি ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এঁদের অভাব-অভিযোগের প্রসঙ্গ সহানুভূতিসহ আলোচনা করেছিলেন। তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণকে ভাওতা দিয়ে দাবিয়ে রাখা যাবে না। তিনি আরও বুঝেছিলেন যে, জনগণ সামরিক শাসন-ব্যবস্থা চায় না—গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে জনগণের একান্ত কাম্য। এ কারণেই প্রাথমিক কার্যকলাপে তিনি দেশের প্রকৃত সমস্যাকে জানতে চেষ্টা করেছেন এবং আন্তরিকভাবেই তার সমাধানেও এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু ঘটনা-প্রবাহ এমন পথে চলেছিল যে ভাওতা দেবার কোন অবকাশই সেখানে ছিল না। পরবর্তী কালে যখনই তিনি ভাওতার পথে নেমে এসেছেন তখনই বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছে 'বাংলাদেশ।'

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনামলেই বাংলার জনগণের ওপর নেমে এসেছিল প্রকৃতির নির্মম রুদ্ররোষ। ১৩৭৬ সালের ১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৯) প্রকৃতির খামখেয়ালের শিকারে পরিণত হ'ল ঢাকার ডেমরা, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, তেজগাঁও নাখাল পাড়া, রামপুরা, ত্রিমোহিনী, খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া প্রভৃতি এলাকার মেহনতি মানুষ। সেদিনের পত্রিকার হেডলাইনে বড় বড় অক্ষরে লেখা হ'ল ঃ "রাজধানী ও উপকণ্ঠে কালবৈশাখীর মরণ ছোবল ঃ পাঁচ শতাধিক নরনারী ও শিশু নিহত। প্রায় আড়াই সহস্র যখমী হাসপাতালে ভর্তি"। সেকি করুণ দৃশ্য!

সামরিক বাহিনীর জোয়ানেরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার কার্যে অংশ নিয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্য বাবদ দেড় লক্ষ টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছিল। বাংলার একচ্ছত্র গণনায়ক ও মেহনতি মানুষের বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড়ের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ও দুর্গত মানুষের চরম দুরবস্থার করুণ দৃশ্য অবলোকন ক'রে জনসাধারণকে মুক্ত হস্তে দান করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি

নিজেও দুর্গত এলাকা সফর করলেন এবং তাঁর দলের কর্মীদের সেবা ও সাহায্য কার্যে নিযুক্ত করলেন। শেখ মুজিব ঘূর্ণিদুর্গত এলাকাসমূহের জনসাধারণের খাজনা ও কর মওকুফের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান। সংবাদে বলা হয় ঃ

..."আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য বুধবার এক বিবৃতিতে প্রদেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ঘূর্ণিদুর্গতদের মধ্যে গৃহনির্মাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার স্বীয় সফর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া তিনি বিবৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে এবং অন্যদের মধ্যে আংশিক রেশন দ্রব্য বিতরণের জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব ঘূর্ণিদুর্গত জনসাধারণের ট্যাক্স ও খাজনা মওকুফ করিয়া দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষায়তনগুলি পুনঃ নির্মাণে এবং দরিদ্র ছাত্রদের বই-পুস্তক ক্রয়ের জন্য উদার হস্তে সাহায্য করার জন্যও শেখ সাহেব সরকারের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৬৯]

ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার ধ্বংসলীলার ক্ষত শুকোতে না শুকোতে ময়মনসিংহ, পাবনা ও রাজশাহী জেলার ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় তার মরণ ছোবল হেনে গেল। শেখ মুজিবের নির্দেশে অসংখ্য আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মী এই অঞ্চলগুলোতে দুর্গত মানুষকে সাহায্য করার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। দেশের দুর্দিনে বঙ্গবন্ধু সর্বদাই দুর্গত দেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রকৃত বন্ধুর মত।

ইয়াহিয়ার নির্বাচন দানের ঘোষণা

১৯৬৯ সালের ২২শে এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাওয়ালপিণ্ডি থেকে লাহোরে আগমন করলে সাংবাদিকদের নিকট মন্তব্য করেন, 'যথাশীঘ্র সম্ভব দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।' সাংবাদিকদের আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন ও ভোটার লিস্ট অবশ্যই সংশোধন করা হইবে।' বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মতামত বিনিময়ের ইচ্ছাও এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই উক্তি জনমনে আশার সঞ্চার করেছিল। কারণ পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে দেশে সুষ্ঠু ও অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। আইয়ুবের শাসনামলে গোটা জাতির নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল। তাই জেনারেল ইয়াহিয়ার এই সময়োচিত ঘোষণায় গণতন্ত্রের জন্য ব্যাকুল জনমনে এক নতুন আশার সম্ভাবনা দেখা দিল। নির্ভীক বাঙালীর কণ্ঠস্বর 'ইত্তেফাক' পত্রিকার পার্শ্ব-সম্পাদকীয়তে ছদ্মনামে মানিক মিয়া যে মূল্যবান কথাগুলো লিখলেন তা' থেকেই বাঙালীর তৎকালীন চিন্তার একটি নমুনা পাওয়া যায় ঃ

নির্বাচন সম্পর্কে মোসাফিরের অভিমত

"আমরা আজ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর এত জোর দিতেছি কেন, তা' কিছুটা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। দেশের বর্তমান শাসন পরিচালক-দের কেহ কেহ হয়ত সঙ্গতভাবেই মনে করেন যে, প্রশাসনিক যন্ত্রে যে ব্যাপক দুর্নীতি বিরাজ করিতেছে তাকে বিদূরিত করা না হইলে দেশে গণতন্ত্র প্রচলনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে না। ইহার যৌক্তিকতা অস্বীকার না করিয়াও আমাদের দেশে বিরাজমান উদ্বেগজনক বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক যন্ত্রের শুদ্ধি কার্য পরিচালনা করার কালে অন্য দিকে নজর না দিলে ভিন্নতর সমস্যার সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

আমাদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ-পর্যন্ত জাতীয় ভিত্তিতে একটিবারও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্যই বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে ; নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়ার জন্য মানুষ সুবিচার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে ; আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, দলাদলি, হানাহানি, কোন্দল, বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা, উচ্ছৃঙ্খলা ও নানা ধরনের অশুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত তো হয়ই নাই, বরং কয়েকবার নির্বাচনের সময় ঘনাইয়া আসিতেই একটা না একটা অজুহাত খাড়া করিয়া নির্বাচন-সম্ভাবনা ভণ্ডুল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, জনগণের মৌলিক অধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে এবং অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হইয়াছে। গণমন ইহাতে স্বাভাবিক-ভাবেই আরো বিক্ষুব্ধ, আরো সন্দিগ্ধ হইয়া রহিয়াছে...বিগত দশকে

স্থিতিশীলতার নামে যা কিছু করা হইয়াছে কার্যতঃ তাহা দ্বারা দেশে শোষণ আর দুর্নীতিই প্রসার লাভ করে নাই, জনগণকে দেশের শাসন ব্যবস্থা হইতে দূরে সরাইয়া রাখাও হইয়াছে। পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার নাম করিয়া তথা শক্তিশালী কেন্দ্রের ধুয়া তুলিয়া রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা শুধু একটি স্থানেই নয়, এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। ভৌগোলিক অবস্থান, জনগণের অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেদন-নিবেদন কোন কিছুর প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করা হয় নাই। শাসনতন্ত্রে প্রদেশদ্বয়ের হাতে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল তাহাও বস্তুতঃ এক হাতে দিয়া অন্যহাতে ফিরাইয়া নেবারই নামান্তর ছিল। তথাকথিত প্রাদেশিক আইন-পরিষদের কিংবা মন্ত্রিসভার কোনই ক্ষমতা ছিল না; গভর্নরই ছিলেন প্রদেশের সর্বেসর্বা এবং তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্টের নিযুক্ত এজেন্ট—যে এজেন্টের চাকুরী সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত প্রেসিডেন্টের অনুগ্রহের উপর। সুদীর্ঘ ১১ বৎসর একটানা এ ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের মনে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কি মনোভাব সৃষ্টি হইতে পারে... ...তাহা বিশ্লেষণের প্রয়োজন করে না।

... ...

এক পরিবারের মধ্যে যেখানে বিরোধ থাকিতে পারে সেখানে একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্প্রদায়, ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে বিতর্ক ও বিরোধ না থাকাটাই বরং অস্বাভাবিক। সকল বিরোধের ন্যায়সঙ্গত সমাধান মানুষের আয়ত্তের বাহিরে নয়। এই বিরোধ বা সমস্যা সমাধানের জন্য যা দরকার তা' হইল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমাবেশ। কিন্তু বিগত দশকে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমাবেশ ইচ্ছাকৃতভাবেই ঘটিতে দেওয়াহয় নাই, বরং ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্য ক্ষমতাসীনরাই শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান চালাইয়াছেন এবং নিজেরাই 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসি' অর্থাৎ বিভেদ নীতি অনুসবণ করিয়াছেন এবং এক অঞ্চলকে অপর অঞ্চলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছেন।

... ...

উপরিউক্ত কারণসমূহের জন্যই আমরা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। কেননা, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি

যে, অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যাইবে না। নির্বাচন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা যাচাইয়েরও প্রকৃষ্ট উপায়।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮শে মার্চ, ১৯৬৯]

এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে, সাধারণ নির্বাচন জনমনে এক আনন্দের শিহরণ জাগিয়েছিল। কিন্তু কে জানত যে, এই আনন্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে মৃত্যুর শঙ্কা আর সেই মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদের নবজন্ম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অযথা হয়রানি ও নির্যাতন করা পশ্চিমা শাসক-গোষ্ঠীর একটা নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য ছিল। শেখ সাহেবের কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করার পরিকল্পনা চলছিল চব্বিশ বছর ধরে। ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ আউটার স্টেডিয়ামে আপত্তিজনক বলে কথিত একটি ভাষণের অভিযোগে আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবকে বহুবার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন এবং পরিশেষে তাঁকে ১৫ মাস কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল। শেখ মুজিব এই অন্যায় দণ্ডাজ্ঞাকে মেনে নিতে পারেন নি। তাই ঢাকা হাইকোর্টে তিনি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করেছিলেন।

সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। আইয়ুব-মোনেম চক্র তাঁকে যতই হয়রানি করার চেষ্টা করুন না কেন, ন্যায়বিচারের মাপকাঠিতে তিনি সমস্ত অসত্যের ও অন্যায়ের ঊর্ধ্বেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছেন। ১৯৬৯ সালে ৩০শে এপ্রিল ঢাকা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানী শুরু হয়ে ৬ই মে (১৯৬৯) তারিখে তার রায় প্রদান করা হয়। রায়ে শেখ মুজিবকে সেই দণ্ডাজ্ঞা থেকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়।

এই সম্পর্কে পরদিন প্রকাশিত সংবাদপত্রে বলা হয়ঃ

"......দুইদিনব্যাপী শুনানী ও সওয়াল-জবাবের পর বিচারপতি জনাব আবদুল হাকিম গতকল্য তাঁর রায়ে সরকার পক্ষের কৌঁসুলীর সকল যুক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়া আবেদনকারীর কৌঁসুলীর যুক্তি গ্রহণ করেন এবং নিম্ন আদালতে প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করিয়া শেখ সাহেবের বেকসুর খালাসদান প্রসঙ্গে বলেন, আবেদনকারীর আলোচ্য বক্তৃতার কোথাও কোথাও সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর শব্দ

ব্যবহার করা হইয়াছে সত্য এবং সেই শব্দগুলি অপ্রিয়ও হইতে পারে—তবে সেইগুলি অপ্রিয় সত্য।

......বিচারপতি হাকিম তাঁহার রায়ে আরও বলেন, আবেদনকারী পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নামক একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি। তাঁহার দল ৬-দফা কর্মসূচী বিশ্লেষণ ও দলীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। সরকার তাঁহার দলের উক্ত কর্মসূচী বা তৎসংক্রান্ত প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন নাই এবং উহা অবৈধ বলিয়াও ঘোষিত হয় নাই। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ৬-দফা কর্মসূচীর বিশ্লেষণ ও দেশের কল্যাণের জন্য সরকারের সমালোচনা করার অধিকার শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল। তিনি তাঁহার ভাষণে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা ও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষণের দুই এক স্থানে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন সত্য। উক্ত ভাষণের ঐসব অংশের কোন কোন কথা অপ্রিয় হইতে পারে, তবে সেগুলো অপ্রিয় সত্য।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মে, ১৯৬৯]

এ সময় একটি শোকাবহ ঘটনায় বাংলার জনগণ ভেঙে পড়ে। বাংলাদেশের সমস্যাসঙ্কুল অবস্থাকে জাতির সম্মুখে (তদানীন্তন সামরিক শাসনামলেও) তুলে ধরতে যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জনাব তোফাজ্জল হোসেন অন্যতম। শাসকবর্গের চোখ রাঙানিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে যিনি দেশবাসীর অক্লান্ত সেবা ক'রে গেছেন সেই বাংলার নির্ভীক সংগ্রামী সন্তান মানিক মিয়া জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেন।

সুদীর্ঘকাল পর নির্বাচনের ঘোষণায় নির্যাতিত বাংলার মানুষের বুকে যখন আশার সঞ্চার হয়েছিল, ঠিক সেই সময় বাংলার বীর সেনানী তোফাজ্জল হোসেন মোসাফির ছদ্মনামে ইত্তেফাক পত্রিকার পার্শ্ব-সম্পাদকীয়তে রাজনীতির খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতবাদগুলো ব্যক্ত ক'রে যাচ্ছিলেন। সহসা তাঁর তিরোধানে এমন জোরালোভাবে সত্য কথা বলবার মত সাংবাদিক আর কেউ থাকলেন না। ইত্তেফাক

পত্রিকার প্রথম পাতায় দেশবাসীকে ১৯৬৯ সালের ১লা জুন এই মর্মান্তিক খবর জানানো হ'ল ঃ

"মানিক মিয়া আর নাই।" সংবাদে আরো বলা হয়েছিল — "ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং পূর্ব বাংলার সংগ্রামী বীর জনাব তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) আর নাই। গত রাত্রি আড়াইটায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত পিণ্ডি হইতে টেলিফোনযোগে জানানো হয় যে, তিনি তথায় গতরাত্রে পিণ্ডি সময় ১২-৪০ মিনিটে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ইন্তেকাল করিয়াছেন।" মানিক মিয়াকে হারিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ঃ "মরহুম মানিক মিয়া শুধু একজন দেশপ্রেমিক ও সাংবাদিকই ছিলেন না, মানিক ভাই ছিলেন আমার পথপ্রদর্শক। তাঁহার আকস্মিক ইন্তেকালে আমার অপূরণীয় ক্ষতি হইল।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২রা জুন, ১৯৬৯]

মানিক মিয়ার মৃত্যুতে বঙ্গবন্ধু সত্যিই মুষড়ে পড়েছিলেন। দেশবাসীও তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে সমানভাবে মর্মাহত হয়েছিল। বাঙালী জাতীয়তাবদের চেতনাকে একটি শক্তিতে রূপান্তরিত করতে মানিক মিয়া ও তাঁর 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ভূমিকা ছিল নির্ভীক এবং প্রত্যয়ময়।

ব্যথাহত হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু আবার যাত্রা শুরু করলেন। সামনেই মেহনতি মানুষের মুক্তি সংগ্রামে শহীদ মনু মিয়ার মৃত্যু দিবস। তিনি অত্যন্ত সতর্ক পদবিক্ষেপে সাবধানে অগ্রসর হতে লাগলেন। ইয়াহিয়ার সমগ্র কার্য-পদ্ধতি তিনি সজাগ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'রে নিজের কার্যক্রম নির্ণয় ক'রে চললেন। এ দিকে ইয়াহিয়া খানও মনে মনে যত ষড়যন্ত্রের জালই বিস্তার করে থাকুন, বাইরে একজন সদিচ্ছাপ্রণোদিত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করতে লাগলেন। তিনি জানতেন, জাগরণের যে জলতরঙ্গ আইয়ুবকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে বালির বাঁধ দিয়ে রোধ করা যাবে না। তাই কখনো নির্বাচনের কথা, কখনো হুমকি, কখনো শাসনতন্ত্র, কখনো জনগণের দুঃখে অশ্রু বিসর্জন ইত্যাদি অভিনয়ে নিজেকে বেশ সক্রিয় ক'রে রাখলেন তিনি।

ইতিমধ্যে, পূর্বেই বলেছি, মামলার রায় প্রকাশ পেয়েছে এবং এই রায় তাঁর সপক্ষে যাওয়ায় শেখ মুজিব এবার নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে রাজনৈতিক

তৎপরতায় মনোনিবেশ করতে পারলেন। তাঁর তৎপরতা চলতে লাগলো কখনো প্রকাশ্যে, কখনো অপ্রকাশ্যে—সবই সজাগ সতর্কতার সাথে। প্রকাশ্যে তিনি সরকারের কোন সমালোচনা করলেন না বটে, তবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তিনি জনগণকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা চালালেন। কেননা, তিনি জানেন, জনগণই তাঁর সকল শক্তির উৎস। অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে। শুধু চাই, এ বিষয়ে তাদেরকে সম্যক সচেতন ক'রে দেয়া ও শৃঙ্খলা সহকারে তাদেরকে পরিচালনা করা।

এই উদ্দেশ্যেই জনগণকে তিনি তাদের অধিকার আদায়ের সেই রক্তক্ষরা দিন ঐতিহাসিক ৭ই জুনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়ঃ

"আজ ঐতিহাসিক ৭ই জুন। ১৯৬৬ সালের ঠিক এই দিনটিতে দেশবাসী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং বৈষম্য ও শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের ৬-দফা আন্দোলনের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে গিয়া মোনায়েম সরকারের পুলিশের গুলীতে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন এ দেশের কয়েকটি সোনার সন্তান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহবানে সেই দিন ৬-দফা দাবীর সমর্থনে সারা প্রদেশে হরতাল পালন করা হয় এবং এক পর্যায়ে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে হরতাল পালনরত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ গুলীবর্ষণ করে ও বহুসংখ্যক লোককে গ্রেফতার করা হয়।"

"...........৭ই জুন উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ৬-দফা আন্দোলনে শরিক হইয়া যাঁহারা শাহাদৎ বরণ করিয়াছেন, পরম শ্রদ্ধাভরে আমি আজ তাঁহাদের কথা স্মরণ করিতেছি। এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া অন্য যাঁহারা জেল-জুলুম ও হয়রানির শিকার হইয়াছেন, তাঁহাদের কথাও আমি স্মরণ করি। ইঁহাদের সকলের কথা এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জন ও শোষণবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। সেইদিন আমি ও আমার সহকর্মীদের অনেকেই কারারুদ্ধ ছিলাম। কিন্তু সেই দিন আমাদের মুক্তি

এবং ৬-দফা দাবীর সপক্ষে আন্দোলন চালাইতে গিয়া যাঁহারা চিরতরে আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন, সেই অজানা অচেনা বন্ধুদের স্মৃতি আজ বার বার আমার চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। আমি সেই শহীদ ভাইদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই জুন, ১৯৬৯]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিব সাবধানী গণনায়কের ন্যায় সতর্কতার সাথে পথযাত্রা শুরু করলেন। ৭ই জুন অতিবাহিত হবার পর তিনি সরাসরি ইয়াহিয়াকে লক্ষ্য ক'রে কথা বলা আরম্ভ করলেন। এবার তিনি সরাসরি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য 'অবিলম্বে দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ সাধারণ গণ-নির্বাচনের ব্যবস্থা'র দাবী জানালেন। খবরের কাগজে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় ঃ

'ক্ষমতা হস্তান্তর ও শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে দলীয় নীতি ঘোষণা প্রসংগে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (২২শে জুন, ১৯৬৯) অবিলম্বে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট দাবী জানান।

তিনি বলেন যে, দেশব্যাপী এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য হইবে—দেশে একটি ফেডারেল পার্লামেন্টারী শাসন-কাঠামো কায়েম করা, যে কাঠামোর অধীনে কেন্দ্রে ও প্রদেশে প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ এবং বেসামরিক সরকার কায়েমকরতঃ অবিলম্বে সেই সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ দেশবাসীর জন্য তাঁহাদের দলীয় ৬-দফা ও ছাত্রদের ১১-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্ব প্রতিশ্রুতি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছে। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যার ভিত্তিতে ফেডারেল পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বিলোপ ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশসমূহের পুনর্জীবনের ধ্যান-ধারণায় আওয়ামী লীগ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে জুন, ১৯৬৯]

এদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও নিয়মতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের কথা মাঝে মাঝেই ঘোষণা করছিলেন। তাঁর এই ঘোষণার মাঝে

মাঝে স্বভাবসুলভ দম্ভ ও শাসনের সুর গর্জে উঠলেও কোন ভাওতা ছিল না। ১৯৬৯ সালের ২রা জুলাই তিনি আবার জানালেন ঃ

"১৯৭০ সালে বা তৎপূর্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন একান্ত করিয়া জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। সব কিছু স্বাভাবিক হইলে সামরিক আইন প্রত্যাহার করার এক মুহূর্তও বিলম্ব করা হইবে না।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা জুলাই, ১৯৬৯]

শেখ মুজিব যখন ধীরে ধীরে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু ক'রে দিয়েছেন, ঠিক সেই সময়ই পশ্চিমা প্রতিক্রিয়াশীল কতিপয় রাজনীতিবিদ তাঁর এবং তাঁর দলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে শুরু ক'রে দিলেন। এক সময়ের আওয়ামী লীগের সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি শেখ মুজিবের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দেশপ্রেম সম্পর্কে কটাক্ষ ক'রে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ এবং বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাঁর কঠোর নিন্দা করেন। ৭ই জুলাই ('৬৯) ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ নবাবজাদা নসরুল্লাহকে এই বিষয়ে এক চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতৃবৃন্দও নসরুল্লাহ খানের উক্তির নিন্দা ক'রে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"......নবাবজাদা নসরুল্লাহ তাঁর বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এমন ধরনের মন্তব্য করিয়াছেন যাহার ফলে পাকিস্তানের সকল গণতন্ত্রমনা দেশপ্রেমিক নাগরিকই ক্ষুব্ধ না হইয়া পারেন নাই।

তাঁহারা আরো বলেন, ইহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকে এই পর্যন্ত শেখ মুজিবকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্তের ফলে জীবনের মূল্যবান সময়ের প্রায় দশটি বছর জেলে কাটাইতে হইয়াছে। এই সময়টুকু তিনি জনগণের অধিকার আদায় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সংগ্রামে ব্যয় করিতে পারিতেন।

তাঁহারা আরো বলেন, ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক অভ্যুত্থান তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার খপ্পর হইতে শেখ মুজিবকে উদ্ধার করার মূল উদ্দেশ্য লইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতি হিসাবে উক্ত জীঘাংসাপরায়ণ মামলা প্রণয়নকারীরা ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন। শেখ মুজিব শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি মানুষের দাবী আদায়ের প্রতীক নন, তাঁহাকে পাকিস্তানের ১২ কোটি অত্যাচারিত মানুষের মুক্তিদাতা বলে অভিহিত করা যায়।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ই জুলাই, ১৯৬৯]

ইয়াহিয়ার কার্যকলাপে জনমনে নির্বাচন সম্পর্কে আস্থা ফিরে এলো। তিনি তাঁর মন্ত্রিপরিষদে এবার কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তিকে গ্রহণ করলেন। মন্ত্রিপরিষদে যোগ দিলেন পূর্ব বাংলা থেকে জনাব ডাঃ এ. এম. মালেক, জনাব এ. কে. এম. হাফিজুদ্দিন, জনাব শামসুল হক এবং জনাব আহসানুল হক। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এলেন সরদার আবদুর রশিদ খান, জনাব মুজাফফর আলী কিজিলবাস ও মেজর জেনারেল শের আলী খান। ১৯৬৯ সালের ৪ঠা আগস্ট এই সাত সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ ইয়াহিয়ার নিকট শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পর তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে দফতর বন্টন করা হয়ঃ

"ডাঃ এ. এম. মালেক—শ্রম, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা।

সরদার আবদুর রশিদ খান—স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীর এ্যাফেয়ার্স, স্টেট্স ও ফ্রন্টিয়ার রিজিয়ন।

জনাব এ. কে. এম. হাফিজুদ্দিন—শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ।

নওয়াব মুজাফফর আলী কিজিলবাস—অর্থ।

জনাব শামসুল হক—শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

মেজর জেনারেল নবাবজাদা শের আলী খান—তথ্য ও বেতার।

জনাব আহসানুল হক—বাণিজ্য।

প্রেসিডেন্ট স্বয়ং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, ইকনমিক এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন, প্ল্যানিং ডিভিশন, এস্টাব্লিশমেন্ট ডিভিশন ও কেবিনেট ডিভিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।"

[ঐ, ৫ই আগস্ট, ১৯৬৯]

যদিও এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হ'ল, কিন্তু সামরিক প্রশাসনিক চরিত্রের কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করা হ'ল না।

পূর্ব বাংলার মানুষ যে শেখ মুজিবকে একচ্ছত্র গণনায়ক বলে স্বীকার করেছেন, বঙ্গবন্ধু একথা উপলব্ধি করলেন। এবার তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সমর্থন আদায়ের দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। বিগত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর এই সফরের কথা ছিল, কিন্তু মানিক মিয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি তাঁর সফর স্থগিত রাখেন। অবশেষে এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালের ৭ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সদলবলে করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যাত্রার প্রাক্‌কালে সাংবাদিকদের তিনি বললেন, "পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য তিনি শুভেচ্ছার বাণী লইয়া যাইতেছেন।"

এ সম্পর্কে পরদিন প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়ঃ

"......শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন যে, আজ দেশ ও জাতির জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন হইতেছে যত শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। আশু নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধুমাত্র প্রয়োজনই নয়, ইহা এক্ষণে জাতির জন্য সবচাইতে কল্যাণকর ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন যে, জাতির সামনে হাজারো সমস্যা বিদ্যমান এবং এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দিতে পারেন।

জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর আওয়ামী লীগ সর্বদাই গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছে এবং আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে যে, কয়েক মাসের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব।

শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে তাঁহার দলের ভূমিকার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র দিতে পারেন।

জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন যে, শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে তাঁহার দলের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব, ৬-দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বাতিল—এই তিনটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া আওয়ামী লীগ

দেশের ভাবী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষপাতী। তিনি বিশেষ জোর দিয়া দাবী করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ আওয়ামী লীগের এই মূলনীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

॥ ঐক্যজোট সম্পর্কে ॥

সিন্ধুর প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে আওয়ামী লীগ কোন ঐক্যজোট গঠন করিতে যাইতেছেন কিনা জানিতে চাহিলে শেখ সাহেব সাংবাদিকদের বলেন যে, সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে এই মুহূর্তে ঐক্যজোট গঠন করার ব্যাপারে এক্ষুণি কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এই যুক্তফ্রন্ট এক ইউনিট বাতিলের জন্য কাজ করিতেছেন জানিয়া আমি খুশী হইয়াছি। এই যুক্তফ্রন্ট আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব চাহিতেছেন বলিয়াও তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শেখ সাহেব উল্লেখ করেন যে, সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের তরফ হইতে তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে এবং তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের তরফ হইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি শরিক হইবেন বলিয়াও উল্লেখ করেন।

॥ আমি খোলা মনে যাইতেছি ॥

শেখ সাহেব সাংবাদিকদের বলেন যে, আমি যখনই পশ্চিম পাকিস্তানে যাই, খোলা মন লইয়াই যাই। এবারও আমি খোলা মন লইয়া যাইতেছি। দেশের ও দেশবাসীর যে কোন সমস্যা নিয়া যে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের সঙ্গে আমি আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। বস্তুতঃ আমি অনুরূপ আলোচনার জন্য সবাইকে স্বাগত জানাইব। তিনি বলেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম, পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই, আমরা তাদের ভালবাসি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, করাচীর বাহিরে পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি যাইবেন কিনা সে সম্পর্কে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই। শেখ সাহেব বলেন যে, আমি সোজাসুজি পথের পথিক, ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে আমি নাই।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই আগস্ট, ১৯৬৯]

শেখ মুজিব ও তাঁর দলের লোকজনকে করাচী বিমান বন্দরে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের কথা ছিল, কিন্তু সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সকল রাজনৈতিক সম্বর্ধনা সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তা' বাতিল করা হয়। করাচী পৌঁছার পর শেখ মুজিব এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। তিনি সাংবাদিকদেরকে বলেন ঃ

"একটি ঘোষণা বা একটি সাময়িক বিধি জারীর মাধ্যমে মৌলিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করিয়া দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ...নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন নাই।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই আগস্ট, ১৯৬৯]

বিশেষ চিন্তাভাবনা ক'রে শাসনতন্ত্র রচনার ওপর শেখ মুজিব গুরুত্ব আরোপ করেন, যাতে শাসনতন্ত্রে সমস্যাবলীর স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়।

পরদিন অর্থাৎ ৮ই আগস্ট পি. পি. আই. প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাত-কারে শেখ মুজিব বলেন যে, "ন্যায়বিচার, সাম্য ও সমতার মাধ্যমেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৯ই আগস্ট, ১৯৬৯]

৬-দফা দেশকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে এ অভিযোগকে তিনি 'প্রায়শঃই উচ্চারিত' অভিযোগ বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, "অনুরূপ অভিযোগ অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং এর লক্ষ্য হ'ল জনসাধারণের মধ্যে শোষণের ধারা অব্যাহত রাখা।"

[ঐ]

পরদিন করাচীর একটি স্থানীয় হোটেলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমিতি ও পশ্চিম পাকিস্তান ছাত্র লীগের যৌথ উদ্যোগে শেখ মুজিবকে এক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনার জবাবে তিনি বলেন যে, "প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। কোন অবস্থাতেই বন্দুক অথবা বুলেটের দ্বারা উহা সম্ভব নহে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই আগস্ট, ১৯৬৯]

১০ই আগস্ট সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক স্থানীয় একটি হোটেলে তাঁর সম্মানে আয়োজিত আর একটি সম্বর্ধনার জবাব দানকালে শেখ মুজিব

"এক ইউনিট বাতিল, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে দেশব্যাপী গণভোট গ্রহণের আহ্বান জানান।"

উক্ত সভায় তিনি জোর দিয়ে বলেন ঃ "যদি গণভোট অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে শতকরা ৭০ ভাগ লোক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব প্রদানের অনুকূলে এবং এক ইউনিট বিলোপের পক্ষে রায় প্রদান করিবে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই আগস্ট, ১৯৬৯]

উক্ত সম্বর্ধনা সভায় সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের সভাপতি জনাব জি. এম. সৈয়দ শেখ মুজিবের উদ্দেশে মানপত্র প্রদানকালে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি ফ্রন্টের গভীর আস্থা প্রকাশ করেন এবং এক ইউনিট অবসানের জন্য সিন্ধু ফ্রন্টের প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবের সমর্থন কামনা করেন। একই দিনে সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল এবং সাবেক প্রদেশ-গুলোর সীমান্ত-সংলগ্ন রাজ্যগুলোকে উক্ত প্রদেশগুলোর সঙ্গে যুক্ত ক'রে প্রদেশসমূহের পূর্ব মর্যাদা অবিলম্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানান।

পরদিন ১১ই আগস্ট করাচী প্রেস ক্লাব শেখ মুজিবকে এক অন্তরঙ্গ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই সম্বর্ধনার জবাবে তিনি 'দেশের শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বয়স্ক ভোটাধিকার এবং এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে' সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান। এই সম্বর্ধনা সভার পূর্ণ বিবরণ দিতে গিয়ে একটি পত্রিকা লিখেছেন ঃ

"আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ বিকালে এখানে (করাচীতে) বলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ দেশের বর্তমান সমস্যাবলী সমাধানের এক মাত্র পন্থা হইতেছে গোড়া হইতে ঐ গুলির কাজ শুরু করা। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এবং কায়েদে আযমের মনোবাঞ্ছা মোতাবেক ঐ সব সমস্যা সমাধান করিতে হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।........ ...৫৫ মিনিট ব্যাপী এই ভাষণে আওয়ামী লীগ প্রধান ধারাবাহিকভাবে দেশের গুরুতর সমস্যাবলী আলোচনা করেন। তাঁহার দল ভারতীয় এজেন্টদের সহিত যোগসাজশে পাকি-স্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অথবা ইসলামী পথ কিম্বা পাকিস্তানী আদর্শ

হইতে বিচ্যুত হইবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া যে সমালোচনা করা হইয়া থাকে, তিনি দফাওয়ারীভাবে তাহা খণ্ডন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের যে সংগ্রামী ইতিহাস ও অবদান রহিয়াছে, তিনি তাহা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কায়েমী স্বার্থবাদীরাই এই ধরনের জঘন্য প্রচারণা চালাইতেছে এবং গোটাদেশের উপর শোষণ চিরস্থায়ী করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি বলেন যে, ঐ সব নেতা প্রাপ্তবয়স্ক ভিত্তিক সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ম্যাণ্ডেট না পাইলে অনুরূপ সম্মেলনের কথা চিন্তাই করা যায় না।

অপর পক্ষে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রও গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। কারণ উক্ত শাসনতন্ত্রে সংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব, এক ইউনিট বাতিল এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ জনগণের বিভিন্ন মৌলিক দাবী পূরণের ব্যবস্থা নাই। অনুরূপভাবে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কোনরূপ শাসনতন্ত্র তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইলেও উহাও গ্রহণযোগ্য হইবে না।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ জনগণকে ভাওতা দিবে না। আওয়ামী লীগ দেশকে একটি প্রকৃত গণতন্ত্র প্রদানের জন্য ওয়াদাবদ্ধ, উহার কম-বেশী কিছু করিতে তাহারা রাজী নহে বলিয়া তিনি জানান।

॥ কাহারা দায়ী? ॥

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, পাকিস্তানের জন্য যাহারা দুই আনা পয়সাও চাঁদা দেয় নাই এবং কায়েদে মিল্লাতের মৃত্যুর পর যে সব আমলাতন্ত্রী ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, একমাত্র তাহারাই দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী।

তিনি বলেন, উক্ত কায়েমী স্বার্থবাদিগণ শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীকে পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিতেও ছাড়েন নাই।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, জনাব আইয়ুব খান দেশে যে পদ্ধতি চালু করিয়াছিলেন তাহার ফলে গোটা জাতি, এমন কি ধর্মভীরু গ্রামবাসীরা পর্যন্ত দুর্নীতির শিকার হইয়া পড়িয়াছিল।

ঐ সব কায়েমী স্বার্থবাদীরা জাতির নিকট সুবিদিত এবং তাহাদিগকে সুদে আসলে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তাঁহার বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচেষ্টার যে অভিযোগ করা হয়, সেই সম্পর্কে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হইতে যাইবে কেন? উহার দ্বারা বরং অভিযোগকারীদের অসৎ উদ্দেশ্যই প্রমাণিত হয়। তাহাদের অসৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান বিস্তারিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানীদের অসন্তোষের কারণ বর্ণনা করেন এবং উভয় প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করেন। বিশেষতঃ তিনি চাউল ও গমের মত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য এবং মাথাপিছু আয়ের তুলনা করেন।

তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের মোট ঋণের পরিমাণ হইতেছে দুই হাজার কোটি টাকা। অথচ তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হইতেছে ৫ শত কোটি টাকার কাছাকাছি। তিনি বলেন, সিন্ধু নদের পানি বণ্টনের একটা সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া গেলেও পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যা সমাধানের কোন বাস্তব প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নাই, অথচ পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি বৎসর বন্যার দরুন ৫০ হইতে ১ শত কোটি টাকা লোকসান হয়। ভারতের সহিত বিরোধের ফলে উক্ত সমস্যার সমাধানের অসুবিধা আছে বলিয়া যে যুক্তি দেখানো হয়, তাহা অবাস্তব বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

॥ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ॥

শেখ মুজিবুর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে বলেন যে, উহা একটি বহু পুরাতন বিষয় এবং এই ব্যাপারে ১৯৫৫ সালের দিকে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যাহা চাহে, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও তাহাই চাহে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে আওয়ামী লীগ চাহে দেশে শোষণের অবসান ঘটাইয়া ১২ কোটি লোকের জন্য শোষণহীন সমাজ গঠন করিতে। তিনি ইহাও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানেই হউক আর পশ্চিম পাকিস্তানেই হউক গরীবের ভাগ্য সর্বত্রই এক। উহার অবসান ঘটাইতে হইবে। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বলিতে সর্বক্ষেত্রে প্রদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বুঝায়। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতের সহিত সেপ্টেম্বর যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কোন ক্রমেই কেন্দ্রকে দুর্বল করিবে না। কারণ অর্থ ও পররাষ্ট্র ছাড়াও দেশরক্ষা দফতর কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। একমাত্র দেশরক্ষা দফতরই কেন্দ্রের জন্য যথেষ্ট। ১৯৫৮ সালের এবং চলতি সালের ঘটনাবলীই উহার প্রমাণ করিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ····· ··

······· শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে উহার প্রতিষ্ঠার পর হইতে এ যাবৎ মাত্র ১৩ মাসের জন্য ক্ষমতাসীন হইয়াছিল এবং বাকী সময় বিরোধীদল হিসাবে কাজ করিয়াছে। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ কর্মিগণ জনগণের সাথে কাজ করিয়া যাইবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাহাদিগকে দমাইয়া রাখিতে পারিবে না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তাঁহার দল সমাজতন্ত্র সমর্থন করে। কিন্তু উক্ত সমাজতন্ত্র ধার করা বা আমদানীকৃত আদর্শের ভিত্তিতে নহে, বরং আমাদের পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্র বলিতে একদলীয় শাসনাধীন বা নাস্তিক রাষ্ট্র বুঝায় না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ···· শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, সম্প্রতি গণ-অভ্যুত্থানের সময় দেশের যে সব বীর সন্তান জীবন দিয়াছেন তাহাদিগকে ভুলিলে চলিবে না। কারণ তাহাদিগের ত্যাগ ব্যতিরেকে অনেক কিছু অর্জন করাই বাকী থাকিত।

.... • তিনি সর্বশেষে সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে ফাতেহা পাঠ করার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান এবং বলেন যে, আওয়ামী লীগ শহীদদের রক্ত বিফলে যাইতে দিবে না।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই আগস্ট, ১৯৬৯]

শেখ মুজিব যখন ক্রমাগত স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানিয়ে জনমত গঠনে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অন্যতম নেতা পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আহ্বায়ক জনাব নূরুল আমীন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে 'দেশে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র দাবীরই শামিল' বলে অভিহিত করেন। তিনি লাহোর বিমান বন্দরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত ক'রে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে. "ইহা দেশে দুইটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র দাবী করার শামিল।" [ঐ]

সামরিক শাসন জারীর পর বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্র সমাজের কার্যকলাপ শিথিল হয়ে পড়েছিল। অবশ্য শিথিল হলেও একেবারে যে নিষ্ক্রিয় ছিল একথা বলা যায় না। তাঁরা সামরিক সরকারের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং ভেতরে ভেতরে অধিকার আদায়ের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

ছাত্র সমাজের এই মনোভাবের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১২ই আগস্ট সরকার প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষানীতির কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে। ঐ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে 'ডাকসু' আয়োজিত প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনা সভায় প্রগতিশীল ছাত্র নেতৃবৃন্দ যখন তার কঠোর সমালোচনা ক'রে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সমর্থনপুষ্ট একদল ছাত্র বলে কথিত উচ্ছৃঙ্খল যুবক তাতে বাধা দেয় এবং ইসলামী শিক্ষানীতির সমর্থনে শ্লোগান দিতে থাকে। এর ফলে তুমুল হট্টগোল ও চেয়ার ছোড়াছুড়ি এবং পরে মারামারিতে ১৬ জন ছাত্র আহত হয়। এই আহতদের মধ্যে আবদুল মালেক নামে একজন পরে ১৫ই আগস্ট ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে "খ" অঞ্চলের (অর্থাৎ পূর্ব বাংলার) এক নম্বর সেক্টরের (ঢাকা বিভাগ)

সামরিক প্রশাসক কর্তৃক সেদিনই (অর্থাৎ ১২ই আগস্ট, '৬৯) জারীকৃত এক সামরিক নির্দেশের মাধ্যমে 'ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভা-মিছিল ১৫ দিনের জন্য নিষিদ্ধ' ঘোষণা করা হয়।

পরদিন প্রদেশের ২৬ জন বিশিষ্ট নাগরিক ও ৩১ জন ছাত্রনেতা নয়া শিক্ষানীতির পরিবর্তন দাবী ক'রে সংবাদপত্রে দু'টি আলাদা আলাদা বিবৃতি দেন।

শেখ মুজিব তখন পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন। ১৪ই আগস্ট তারিখে তিনি সদলবলে করাচী থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন। করাচী ত্যাগের প্রাক্‌কালে তিনি বিমান বন্দরে সাংবাদিকদেরকে বলেন, "একমাত্র জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্রই পাকিস্তানের জনগণ গ্রহণ করবে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ই আগস্ট, ১৯৬৯]

শেখ মুজিব তাঁর করাচী সফর সফল হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। আগের দিন বুধবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, "জনসাধারণই ক্ষমতার মূল উৎস। আর তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য অতি সত্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। নতুন ফেডারেল আইনসভা একই সাথে আইনসভা ও গণপরিষদের অর্থাৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে। গণপরিষদ হিসাবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে একটি শাসনতন্ত্র জাতির সামনে পেশ করতে হবে।

......দলের ৬-দফা কর্মসূচী এবং ছাত্রদের ১১-দফা দাবীর ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।........১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে দেশের জনসাধারণের মূল সমস্যাগুলোর সমাধান নেই, তাই আওয়ামী লীগ তা' পুনরুজ্জীবনের বিরোধী।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ঐ]

১৯৬৯ সালের ১৫ই আগস্ট ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং এয়ার মার্শাল এস. নূর খানকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিযুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়।

এদিকে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও কতিপয় পশ্চিমা নেতা পুনরায় শেখ মুজিবের ৬-দফার সমালোচনা করতে শুরু ক'রে দেন।

১৯শে আগস্ট তারিখে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো লাহোরে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ৬-দফার বিরুদ্ধে তাঁর দলের মতামত প্রকাশ ক'রে বলেন যে, "সাবেক সিন্ধু এলাকা থেকে যাঁরা ছ'দফার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন তাঁদের জাতীয় একতা ও সংহতির উপর তাঁদের কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২১শে আগস্ট, ১৯৬৯]

এ সময় কতিপয় ধর্মান্ধ রাজনীতিবিদ ধর্মীয় জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক প্রচার অভিযান চালাতে থাকেন।

এই অশুভ সাম্প্রদায়িক চক্রের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব পুনরায় হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। ২৩শে আগস্ট পাঠচক্রের উদ্যোগে রমনা রেস্টুরেন্টে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "জনগণের দাবী-দাওয়া যখনই উত্থাপিত হয়েছে, তখনই একটি অশুভ চক্র এই দাবী বানচাল করার জন্য সাম্প্রদায়িক ধুয়া তুলেছে।"

[ঐ, ২৪শে আগস্ট, ১৯৬৯]

উক্ত অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব আবার বলেন, "দেশের মানুষ যে রক্ত দিয়ে আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠ হতে বের করে এনেছে তাদের সঙ্গে আমি বেইমানী করতে পারি না।"

[ঐ]

পরদিনও (২৪শে আগস্ট) শেখ মুজিব আবার ইসলাম ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করেন। হোটেল ইডেনে 'ঢাকা জেলা বার সমিতি'র আওয়ামী লীগ দলীয় আইনজীবীদের এক সভায় ভাষণদান কালে তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল মালেকের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর একটি চরমপন্থী রাজনৈতিক দল অপরাপর রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এক নোংরা অপপ্রচার ও অভিযান শুরু করেছে। ইসলাম বিপন্ন বলে তারা জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছে। তারা মসজিদে মসজিদে সভা ক'রে অপরের ঘৃণা পীবত করছে যা ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ।"

[ঐ, ২৫শে আগস্ট, ১৯৬৯]

শেখ মুজিব বলেন যে, '৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময়ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের এসব দালালরা ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল, সচেতন জনগণের কাছে রাজনীতিতে মার খেয়ে তারা আজ আবার ইসলামকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৫শে আগস্ট, ১৯৬৯]

গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে শেখ মুজিব পুনরায় জনসংযোগ অভিযানে বের হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসের ২৮ তারিখে প্রথমে গোপালগঞ্জে যাত্রা করেন। সেখানে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সাথে মিলিত হবার পর তিনি ২৯শে আগস্ট ('৬৯) খুলনা যাত্রা করেন। খুলনায় তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাঁর আগমন উপলক্ষে সেখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা ফজলুল হক, মানিক মিয়া প্রমুখের নামে ২০/২২ টি সুদৃশ্য তোরণ নির্মিত হয়েছিল।

খুলনা পৌরসভা মিলনায়তনে শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে রৌপ্য নির্মিত একখানি নৌকা উপহার দেয়া হয়। নৌকার হালে 'সমাজতন্ত্র' কথাটি লিখিত এবং পালে আওয়ামী লীগের পতাকা খচিত ছিল। পতাকায় আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রতীক স্বর্ণনির্মিত ৬টি তারকাও ছিল।

সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিব ৬-দফা কর্মসূচীর সংগ্রামে তাঁর দলকে সাহায্য করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান। তিনি পাটচাষী-দের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার জন্য দাবী জানান।

৩০শে আগস্ট তারিখে শেখ মুজিব যশোর গমন করেন এবং সেখানকার টাউন হলে আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে তিনি দেশে শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েমের সংকল্প প্রকাশ করেন। স্থানীয় টাউন হলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, "তাঁহার সমাজতন্ত্র দেশের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করিয়া

রচিত হইবে। অন্য কোন দেশ হইতে তিনি সমাজতন্ত্র ধার করিতে চান না। কারণ তাহা আমাদের সমাজের জন্য উপযোগী নাও হইতে পারে। সাম্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপরই আমাদের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এখানে আইনের চক্ষে সকলেই সমান বলিয়া পরিগণিত হইবেন। কিন্তু এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ইসলামের আবরণে পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১শে আগস্ট, ১৯৬৯]

পূর্ব পাকিস্তানের গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে জামাতে ইসলাম প্রধান মওলানা মওদুদীর বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের জবাবে শেখ মুজিব কর্মী সমাবেশে জানান, "পূর্ব পাকিস্তানের গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে মওলানা মওদুদীর বিন্দুমাত্র ধারণা নাই। নিজেদের হারানো অধিকার ফিরিয়া পাওয়ার জন্য প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানী এই আন্দোলনে শরিক হইয়াছিল।"

[ঐ, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]

'পশ্চিম বঙ্গের ইঙ্গিতেই পূর্ব পাকিস্তানে গত গণ-অভ্যুত্থান পরিচালিত হয়' বলে জামাত প্রধান মওলানা মওদুদী সে সময় অভিযোগ করেছিলেন।

জামাতের অন্যতম নেতা মিয়া তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবকে কম্যুনিস্ট বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, "এই সকল নেতার অতীতের কার্যকলাপ সর্বজনবিদিত। কাজেই উহা নতুন করিয়া উল্লেখের প্রয়োজন নাই।"

[ঐ]

৬-দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে শেখ মুজিব পুনরায় জোর দিয়ে বলেন।

এই কর্মী সমাবেশে শেখ মুজিব "অবিলম্বে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন, জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপের দাবী জানান। অনধিক ২৫ বিঘা জমির মালিক কৃষকদের খাজনা হইতে রেহাই দানের জন্যও তিনি দাবী জানান।"

[ঐ]

৩১শে আগস্ট (১৯৬৯) শেখ মুজিব যশোরের ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ কর্মী সমাবেশে রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহারের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে দেশের দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীবৃন্দের প্রতি এক হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। এ সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, "এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামের পবিত্র নাম ব্যবহার করার চেষ্টায় মাতিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে ধর্ম লইয়া খেলা না করার জন্য হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা ধর্মের অবমাননা করারই শামিল হইবে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]

এই কর্মী সমাবেশে বক্তৃতাদান কালে শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে ধর্মকে দূরে রাখার জন্য সকল দল ও মতের নেতা এবং কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

স্বাধীনতা লাভের ২২ বৎসর পরেও জনগণের গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ ক'রে শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করেন। "জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই শুধু শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।"

[ঐ]

পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা এবং এই অঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষের উপর অবিচারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন, "এই সরকারের আমলে লোকের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের জনসাধারণের প্রদত্ত রাজস্ব পশ্চিম পাকিস্তানেই শুধু খরচ করা হইয়াছে। মঙ্গলা এবং তারবেলা বাঁধের জন্য বিরাট অংকের অর্থ খরচ করা হইয়াছে, কিন্তু ফারাক্কা সমস্যার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয় নাই।"

[ঐ]

এর আগে ২৯শে আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের ৪২ জন কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ধর্মের নামে হিংসাত্মক কার্যকলাপে

উস্কানী দানের এক অভিযোগ এনে পত্রিকায় যুক্ত বিবৃতি দান করেন। এই বিবৃতিতে তাঁরা শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র ক'রে জামাতে ইসলামপন্থীদের ধর্মের নামে অপপ্রচারে দেশে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টির, তথাকথিত ইসলাম-পন্থী এবং ইসলাম-বিরোধী এই দুইটি কল্পিত গোষ্ঠী সৃষ্টির নামে প্রকাশ্য উস্কানী ও হুমকী প্রদানের এবং খসড়া শিক্ষানীতির সমালোচকদের ইসলাম-বিরোধী, পাকিস্তান-বিরোধী ও সংহতি-বিরোধী আখ্যাদানের কঠোর নিন্দা করেন। উক্ত ৪২ জন কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ শিক্ষানীতি 'বিজ্ঞানসম্মত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সহজলভ্য' করার প্রস্তাব করেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, "ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম বিরোধিতা নয়। কিন্তু গোষ্ঠী বিশেষ ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলাম বিরোধিতার নামান্তর বলিয়া ঠাওরাইয়া বসিয়াছে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]

৩১শে আগস্ট রবিবার শেখ মুজিব কুষ্টিয়া পৌঁছেন এবং দলীয় কর্মীদের এক ঘরোয়া সমাবেশে জনস্বার্থ বিরোধী বিশ্বাসঘাতক রাজনীতি-বিদদের সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার আহবান জানান। তিনি এই সমাবেশে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং একমাত্র ৬-দফার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার মানুষের ন্যায্য অধিকার লাভ সম্ভব বলে মন্তব্য করেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কুষ্টিয়াকে অবিলম্বে বন্যাদুর্গত এলাকা দাবী এবং সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

১৯৬৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এ্যাডমিরাল আহসান পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি এখানে এসে স্পষ্টভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত ক'রে বলেছিলেন, "৭১ সালে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।" তিনি আরও বলেছিলেন, "......এমন কি সাধারণ পদেও আমি এখানে আসতে উৎসাহী হতাম। এ পদে নিযুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত। এই পদ আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সেবা করার দায়িত্ব দিয়েছে। আমি সকলের কল্যাণের জন্য এ প্রদেশের নাগরিকদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।"

[পূর্বদেশ, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]

গভর্নর আহসান ছিলেন একজন ভদ্র, বিনয়ী ও যুক্তিবাদী সামরিক ব্যক্তি। পূর্ব বাংলার একচ্ছত্র গণনেতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তিনি সাধ্যানুসারে এখানে জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু অতীতে জেনারেল আযম খানকে যে ভাগ্য বরণ করতে হয়েছিল, আহসানের ভাগ্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না, তাঁকেও একই-ভাবে বিদায় নিতে হয়েছিল।

ঐ দিন কুষ্টিয়া থেকে ফরিদপুর যাত্রার প্রাক্‌কালে মাগুরায় শেখ মুজিব দলীয় কর্মীদের এক ঘরোয়া সমাবেশে ভাষণ দেন।

একই দিনে ১লা সেপ্টেম্বর ('৬৯) ফরিদপুরে দলীয় কর্মীদের এক ঘরোয়া সমাবেশে শেখ মুজিব দেশে আশু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীর কথা পুনরায় উল্লেখ করেন। ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ওপরেই দেশের সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন।

২রা সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব রাজবাড়ীতে স্থানীয় একটি সিনেমা হলে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি বন্যা সমস্যা এবং ফারাক্কা বাঁধ সমস্যা প্রসঙ্গে সরকারী নীতির সমালোচনা করেন।

ঐ দিন সকালে এক বিশেষ আমন্ত্রণে শেখ মুজিব ফরিদপুর প্রেসক্লাবে যান এবং প্রেসক্লাবের সদস্যদের প্রতি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি "সংবাদ-পত্রকে গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সাংবাদিকদের দেশ ও জাতির স্বার্থরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া তিনি বলেন, আমাদের সাংবাদিকরা যেভাবে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, দেশের ইতিহাসে উহা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। এ প্রসঙ্গে তিনি মরহুম তোফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়ার) নামোল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রাণঢালা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে শেখ মুজিব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেন।

সপ্তাহকালব্যাপী খুলনা, যশোহর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর জেলা সফর শেষে শেখ মুজিব ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

৯ই সেপ্টেম্বর ('৬৯) চট্টগ্রামে শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনবোধে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু করার জন্য অবিলম্বে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি পূর্ব বাংলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সমান অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবীর পুনরুল্লেখ করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি এবং কারামুক্তির পর সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম সফরকালে শেখ মুজিব স্থানীয় বার লাইব্রেরী হলে এক সমাবেশে উপরোক্ত আহ্বান ও দাবীর পুনরুল্লেখ করেন। এই সমাবেশে তিনি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার বিরোধিতা করেন।

চট্টগ্রামের উক্ত আইনজীবী সমাবেশে শেখ মুজিব দেশে দু'টো পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলন সম্পর্কিত তাঁর দাবীর প্রতি বিভিন্ন মহল থেকে নানা সমালোচনার জবাবে বলেন, তাঁর আসল বক্তব্য হচ্ছে পূর্ব বাংলা থেকে মূলধন পাচার বন্ধের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯ই সেপ্টেম্বর ('৬৯) পাকিস্তান গণতান্ত্রিক পার্টির লাহোর শাখা কর্তৃক লাহোর গেটের অভ্যন্তরে আয়োজিত পার্টি-কর্মীদের এক সমাবেশে নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং এয়ার মার্শাল আসগর খান ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের অভিযোগে আদালতে সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিচার করার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁর পদে ইস্তফাদানের পূর্বে জাতীয় পরিষদের স্পীকারকে পত্রযোগে অবহিত করেন নি।

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]

১১ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চট্টগ্রামে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে দেশে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দলের ইচ্ছার কথা উল্লেখ করেন। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন, "এই সমাজতন্ত্র আমরা রাশিয়া বা চীন হইতে আমদানী করিব না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের নিজস্ব প্রয়োজন মত দেশজ সম্পদের ভিত্তিতেই উহা গড়িয়া

তুলিবেন। এই দেশজ সম্পদ বলিতে আমার দল দেশের পারিপার্শ্বিকতা, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, জীবনের প্রতি মনোভাব, জাতীয় সম্পদ ও দেশের মানুষের প্রতিভাকে বুঝায়।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, "তিনি বাম বা দক্ষিণপন্থী কোনটাই নহেন। তিনি হইতেছেন মধ্যমপন্থী।"

[ঐ]

১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৯) চট্টগ্রামে স্থানীয় মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে দলীয় এক কর্মী সমাবেশে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অবিচার রোধ করার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সামরিক দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তোলার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে আইয়ুব সরকারের ডিকেডী আমল পর্যন্ত বৈষম্যক্ষেত্রে শেখ মুজিব নিম্নোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন ঃ

(ক) প্রতিরক্ষা ও প্রশাসন ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ৩ হাজার ২ শত কোটি টাকা—পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় ৩ শত ৩ কোটি টাকা।

(খ) ২২ বছরে মোট ২ হাজার ২ শত কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন—পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় মাত্র ৬ শত কোটি টাকা।

প্রতিরক্ষা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ মাত্র ১৫ থেকে ২০ ভাগ। শেখ মুজিব এই বৈষম্যকে পুরোপুরি বে-ইনসাফ বলে অভিহিত করেন।

এই সমাবেশে শেখ মুজিব জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে চলার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]

১১ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব বলেন যে, "তিনি নিজে গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পরস্পরবিরোধী নয়। এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ সাহেব বলেন যে, কেবল মাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই একটি স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব

এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে সুনিশ্চিত করা যাইতে পারে। কেননা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জনগণের রায় চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয় এবং কোন প্রকার কারসাজিই জনগণের প্রকৃত রায়দান হইতে বিরত করিতে পারে না।

এই গণতন্ত্রকে অবশ্যই নির্ভেজাল ও সরল হইতে হইবে বলিয়া শেখ সাহেব উল্লেখ করেন।"

[দৈনিক আজাদ, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]

কায়েদে আযমের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে লাহোরে 'আরাফাত আল ইসলামিয়া' হলে পার্টি-কর্মীদের এক সভায় পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নেতা এয়ার মার্শাল আসগর খান পাকিস্তান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য গণবাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গণবাহিনী গঠন পছন্দ করতেন না, কারণ তিনি সেই সময় জনগণের আস্থা হারাইয়াছিলেন।"

১৯৬৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর সামরিক সরকার পশ্চিম পাকিস্তানকে লেঃ গভর্নর শাসিত সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই "সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহ করাচী অঞ্চল, হায়দ্রাবাদ অঞ্চল, মুলতান অঞ্চল, পেশোয়ার অঞ্চল, রাওয়ালপিণ্ডি অঞ্চল, লাহোর অঞ্চল, কোয়েটা অঞ্চল নামে অভিহিত হইবে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]

বিবরণে প্রকাশ, পাকিস্তানের সাবেক বিচারপতি জনাব ফজলে আকবরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশে এই স্কীম বাস্তবায়িত হবে।

১৮ই সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব ঢাকার কচুক্ষেত আওয়ামী লীগ কার্যালয় উদ্বোধন করেন। দলীয় কর্মীদের প্রতি ভাষণে তিনি স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রামে দেশের যুব সমাজকে সংঘবদ্ধ হবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত এবং অবসরপ্রাপ্ত সি. এস. পি. অফিসার জনাব আহমদ ফজলুর রহমান এবং জনাব রুহুল কুদ্দুস ২০শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। তাঁদের আওয়ামী লীগে যোগদান উপলক্ষে ঐদিন ঢাকা আওয়ামী লীগ অফিসে

আয়োজিত এক পরিচিতি সভায় শেখ মুজিব একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি আওয়ামী লীগকে সকল স্বার্থ এবং লোভের ঊর্ধ্বে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করেন। শেখ মুজিব বলেন, "আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীবৃন্দ সব সময়ই সামরিক বিধি কিংবা দেশরক্ষা আইনে কারাবরণ করে আস্‌ছে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর দল আওয়ামী লীগকে তিনি 'সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরিবারের' সন্তান বলে অভিহিত করেন।

গত ২২ বছরেও দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হবার কারণ সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'লে কায়েমী স্বার্থবাদীদের শাসন এবং শোষণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

২১শে সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে এক দিনের সফরে শেখ মুজিব মাদারীপুরে পৌঁছেন। এই সফরসূচীতে মাদারীপুর পাবলিক হলে এক কর্মী-সম্মেলনে শেখ মুজিবের ভাষণ দানের কথা ছিল। কিন্তু স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত সম্মেলনে মাইক ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার প্রতিবাদে শেখ মুজিব উক্ত সম্মেলন বাতিল ঘোষণা করেন। স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি প্রাদেশিক গভর্নর এবং পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসন পরিচালকের নিকট তারবার্তা পাঠান।

২২শে সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব মাদারীপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে এক শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দেন। এই সমাবেশে তিনি পূর্ব বাংলার 'ভাগ্য বিড়ম্বনা', 'বঞ্চনা', 'বৈষম্য' ও 'দুর্ভোগের' জন্য স্বার্থান্ধ এক শ্রেণীর দালালদের দায়ী করেন। তিনি বলেন, "মন্ত্রিত্ব ও ক্ষমতার লিপ্‌সায়, পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থের এই সব দালাল পূর্ব পাকিস্তান ও জনগণের স্বার্থ বিকাইয়া দিতে কোনদিনই বিবেকের কাছে নিজেকে দোষী মনে করে নাই। তিনি বলেন, আসলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ নয়, বরং ঐ অঞ্চলের কায়েমী স্বার্থবাদী ও পুঁজিপতিদের ক্রীড়নক এই প্রদেশের দালালরাই আপনাদের সকল দুর্দশার জন্য দায়ী। তেমনিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানেও কিছুসংখ্যক দালালের

সহায়তায় জনগণের রক্ত শোষণ করিতেছে। সকল স্তরের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'আগামী নির্বাচনে এই সব দালালদের এমন শিক্ষা দিন যেন এদেশের মাটিতে দাঁড়াইয়া আর কেহ কোনদিন দালালী করার সাহস না পায়।'

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]

"বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যদা দান", "স্বায়ত্তশাসন", 'জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব", "এক ইউনিট বিলোপ" এবং "বন্যা নিয়ন্ত্রণের" দাবী তুললে যারা ইসলাম বিপন্ন বলে ধুয়া তুলেন তাঁদের কঠোর সমালোচনা ক'রে শেখ মুজিব শ্রমিক সমাবেশে বলেন, রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়ার পর ইসলাম বিপন্ন হয় নি, কাজেই বৈষম্যের ক্ষেত্রে, অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী সরকার মেনে নিলেও ইসলাম বিপন্ন হবে না।

২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৬৯) শেখ মুজিব ঢাকায় সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে ভারতের আহমদাবাদে সংঘটিত সাম্প্রতিক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার নিন্দা করেন। বিবৃতিতে তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে ত্বরিৎ ব্যবস্থা এবং ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা দানের জন্য ভারত সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

২৮শে সেপ্টেম্বর এক সংক্ষিপ্ত সফরে শেখ মুজিব নোয়াখালী যান এবং চৌমুহনী, ফেনী ও মাইজদী কোর্টে দলীয় কর্মী ও ছাত্র সমাবেশে ভাষণ দান করেন।

চৌমুহনীর কর্মিসভায় শেখ মুজিব বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের প্রতি কার্যকরী ব্যবস্থা, এবং কৃষক ও মেহনতী মানুষের বকেয়া কর মওকুফের জন্য আবেদন জানান। শেখ মুজিব সরকারের নিকট অভিযোগ জানিয়ে বলেন, "শিল্পপতিরা সরকারের নিকট হইতে কর মওকুফসহ বিভিন্ন সুযোগ পাইতেছেন, তখন কৃষক ও মেহনতী মানুষ কর ও খাজনার ভারে জর্জরিত হইতেছে এবং বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য তাহাদের উপর নির্যাতন চালানো হইতেছে।"

[ঐ, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯]

চৌমুহনী থেকে শেখ মুজিব ঐদিন মাইজদী কোর্টে যান এবং এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

ঐ দিনই ফেনীতে আয়োজিত এক কর্মিসভায় শেখ মুজিব প্রদেশের সকল শহর এবং মফস্বলে পূর্ণাঙ্গ ও সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান। কর্মী সমাবেশে তিনি সবরকম উস্কানীর মুখেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান।

এদিকে প্রধান নির্বাচনী কমিশনার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতের জন্য নির্দেশ দান করলেন। ১৯৬৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন যে, নেতৃ-সম্মেলন ডাকতে তিনি রাজি আছেন। তবে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিজেরও চিন্তাভাবনা রয়েছে। উপযুক্ত সময়ে তিনি তা' প্রকাশ করবেন; তবে সে সময় এখনও আসে নি। ইয়াহিয়া খানের এ রকম উক্তিতে দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সমগ্র দেশের মানুষের বক্তব্যই প্রাধান্য লাভ করবে, দু'একজনের খেয়াল-খুশীতে একটি দেশের শাসনতন্ত্র প্রণীত হতে পারে না। দেশের গণ-চেতনার প্রকাশ ঘটতে পারে একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে—একনায়কত্বের মাধ্যমে নয়। যে নির্বাচনের কথা ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া একাধিকবার ঘোষণা করেছেন সেই নির্বাচন সম্পন্ন হ'লে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই দেশের সংবিধান প্রণয়ন করবেন। দেশের সংবিধান কারো খেয়াল খুশীর সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং দেশের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিজের একটি ধারণা আছে, ইয়াহিয়া খানের এইরূপ উক্তিতে ভবিষ্যৎ অশুভ কারসাজির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধা হ'ল না।

এদিকে দুইদিনব্যাপী নোয়াখালী সফর শেষে শেখ মুজিব ২৮শে সেপ্টেম্বর সোমবার গভীর রাতে সদলবলে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। নেতৃবৃন্দ দুই দিনের সফরে ফেনী, চৌমুহনী, মাইজদী কোর্ট, রায়পুরা, রামগঞ্জ এবং লক্ষ্মীপুরে কর্মি সভায় বক্তৃতা করেন।

৩রা অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর পাঁচ দিনব্যাপী প্রদেশ সফর শেষে রাওয়ালপিণ্ডির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকায় অবস্থানকালীন সময়ে তিনি এদেশবাসীর সামনে নিজেকে বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত করবার প্রয়াস পান। কারণ ১লা অক্টোবর, ১৯৬৯ তারিখে তাঁর

সভাপতিত্বে ঢাকায় দেশের সমস্ত গভর্নরদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসের উপায় সম্পর্কে এবং দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ৩রা অক্টোবরের সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। সংবাদসমূহে পূর্ব বাংলার ১৫ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণের ব্যাপারে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য সরকারী সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশিত হয়। প্রকাশ থাকে যে, প্রদেশে তখন সাংঘাতিক খাদ্য সংকট বিরাজমান ছিল এবং সরকারী সক্রিয় পদক্ষেপে অবস্থার উন্নতি হবে এই ভরসা সকলের মনে দেখা দিয়েছিল।

খাদ্য সমস্যা সমাধানের প্রয়াস

তদুপরি যে ছয়জন ছাত্র নেতৃবৃন্দকে সামরিক বিধি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল—তাঁদের প্রতি তিনি মার্জনা ঘোষণা করেন। এই ছয়জন ছাত্রনেতা ছিলেন তোফায়েল আহমদ, আ. স. ম. আবদুর রব, মোস্তফা জামাল হায়দার, মাহবুবুল্লাহ্, শামসুদ্দোহা ও ইব্রাহিম খলিল। এঁদের মামলা প্রত্যাহার ক'রে নেবার জন্য পূর্বাহ্ণেই শেখ মুজিব প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাজউদ্দিন আহমদও একটি বিবৃতি দেন।

ছাত্রনেতৃবৃন্দের মুক্তি

২রা অক্টোবর (১৯৬৯) তারিখে এ সম্পর্কে পত্রিকায় লেখা হয়, "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ছাত্র সমাজের সংগে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছয়জন ছাত্রনেতাসহ ছাত্রদের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।" আরও বলা হয়ঃ

তাজউদ্দিনের বিবৃতি

"গতকাল (বুধবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ইতিমধ্যেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করিয়া স্বাভাবিক পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। আওয়ামী লীগ সম্পাদক বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা বিমান বন্দরে 'ছাত্ররা

আমাদেরই সন্তান' বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, উহা হইতে তাঁহার দরদী মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই মনোভাবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া আইনগত কড়াকড়ির পরিবর্তে পিতৃসুলভ বাৎসল্য ও সহনশীলতার সঙ্গে ছাত্র সমস্যা বিবেচনা করা হইবে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২রা অক্টোবর, ১৯৬৯]

প্রেসিডেন্টের ঢাকা ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে প্রদত্ত এই ঘোষণা সম্পর্কে অধিকন্তু লেখা হয়েছিল, "প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে একাধিক সময়ে সামরিক আইন বিধি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত ছাত্রদের মার্জনা করিয়া দিয়াছেন। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট এই মার্জনার কথা ঘোষণা করেন।"

[ঐ, ৩রা অক্টোবর, ১৯৬৯]

এ ছাড়া গত ২৮শে জুলাই জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে তিনি নির্বাচন এবং গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে কর্মসূচীর কথা বলেছিলেন বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট তার প্রতি অবিচল থাকার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। দেশের সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতিটি এইরূপ ছিল ঃ "এই সুযোগে আমি আরেকবার বলিতে চাই যে, বিগত ২৮শে জুলাই জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে নির্বাচন ও নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের যে কর্মসূচীর কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি, উহাতে অবিচল থাকিতে আমি গভীরভাবে আগ্রহশীল। সুতরাং আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, বে-আইনী কার্যকলাপ, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এবং সামরিক আইনবিধি ও নির্দেশ ভঙ্গের জন্য অন্যদের প্ররোচিত করার কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা আসলে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের সামনে বিরাজমান জাতীয় লক্ষ্যকেই বানচাল করিয়া দিতে চায়। আমি ইহা হইতে দিতে পারি না। আমি আগেও বলিয়াছি, পাকিস্তানের যেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক জীবন যাপনে এবং নিজেদের পছন্দমত একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, তাহাদের প্রতিই আমার প্রধান দায়িত্ব।

ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ

সুতরাং দেশের স্বার্থে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যে কাজ শুরু করিয়াছেন, উহাতে বিঘ্ন সৃষ্টির যে কোন প্রচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করা হইবে। পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগের প্রাক্কালে আমি এই মর্মে দৃঢ় আশা প্রকাশ করিতেছি যে, দেশে শান্তিপূর্ণভাবে সুস্থ গণতান্ত্রিক জীবনধারা প্রচলনে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ব্যক্তিদের খপ্পরে না পড়িয়া ছাত্রসহ সর্বশ্রেণীর জনগণের সাধারণ আদর্শ ও উদ্দেশ্য হাসিলের প্রচেষ্টায় সরকারকে সাহায্য করিবেন।

[দৈনিক ইত্তেফাক, ঐ]

প্রেসিডেন্টের ২৯শে সেপ্টেম্বরের বক্তব্যের সঙ্গে নির্বাচনের প্রশ্নে এই বক্তব্যের সামঞ্জস্য আছে। শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে প্রেসিডেন্টের ২৯শে সেপ্টেম্বরের বক্তব্যে যে অশুভ ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছিল, সে সম্পর্কে শেখ মুজিব সচেতন ছিলেন।

এ সময় প্রেসিডেন্টের কার্যকলাপের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তার আভাস পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগের সাথে সাথে অন্যান্য প্রগতিশীল দলগুলো যেমন, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলোও তেমনি এক বাক্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আহবান জানাচ্ছিলেন। এ সমস্ত দলের ওপর ভরসা রেখেই সম্ভবতঃ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নিশ্চয়তামূলক মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। পূর্ব বাংলার এই সব অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যকলাপ এবং শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে প্রেসিডেন্টের অশুভ ইঙ্গিত প্রভৃতিকে উপেক্ষা ক'রে এই সময় শেখ মুজিব সাংগঠনিক তৎপরতার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেন

বঙ্গবন্ধুর সাংগঠনিক তৎপরতা

ইতিমধ্যেই তিনি প্রদেশের এক অংশ সফর করেছিলেন। এবার তিনি উত্তরাঞ্চল সফর শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৭ই অক্টোবর বগুড়ার পথে রওয়ানা হন। এ সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় লেখা হয়ঃ "আজ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বগুড়া রওয়ানা হচ্ছেন। তিনি বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরে এক সপ্তাহব্যাপী সফর করবেন এবং বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত কর্মিসভায় বক্তৃতা করবেন।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৭ই অক্টোবর, ১৯৬৯]

যেহেতু জনসভা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ছিল, তাই তাঁর সফর উপলক্ষে এই সমস্ত স্থানে কর্মিসভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু এই সব দলীয় কর্মিসভায় প্রচুর লোক সমাগম হতে থাকে এবং তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। এই সমস্ত কর্মিসভার মাধ্যমে একদিকে তিনি বিভিন্ন স্থানের দলীয় ইউনিট-সমূহ সুদৃঢ় করছিলেন, অপরদিকে দলীয় মনোভাব ব্যাখ্যা ক'রে ৬-দফার অনুকূলে জনমত সংগঠনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। একই সাথে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে বিভিন্ন দল যে সমস্ত মনোভাব ব্যক্ত করেছে তিনি সে সম্পর্কেও যথোচিত জবাব প্রদান করেন।

শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে বিভিন্ন দলের মত

এই সময় যে সকল দল প্রেসিডেন্টের প্রতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জন্য আহ্বান জানান তার মধ্যে জামাতে ইসলামী, পি. ডি. পি. প্রভৃতি দল ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে জোরের সাথে কথা বলেন। আবার পি. ডি. পি., ওয়ালী ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপ জনগণের স্বার্থ আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বানও জানাতে থাকেন। মওলানা ভাসানী শাসনতান্ত্রিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার জন্য গোলটেবিল বৈঠকের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: "শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে একটি সমাধান খুঁজে বের করার জন্য প্রেসিডেন্টের উচিত রাজনৈতিক নেতাদের একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকা।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ঐ]

ওয়ালী ন্যাপ: অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব

ওয়ালী ন্যাপের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠারও দাবী জানানো হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহ্‌মুদুল হক উসমানী ১লা অক্টোবরে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের বার্ষিক কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে যে অভিমত প্রকাশ করেন তা' বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এ সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় লেখা হয়: "জনাব উসমানী নির্বাচন পরিচালনা এবং দৈনন্দিন সরকারী দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমবায়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠারও দাবী জানান। তিনি বলেন, যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের আশা-

আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, সেহেতু এদেশে তাঁহার নেতৃত্বেই বেসামরিক সরকার গঠিত হওয়া উচিত। পশ্চিম পাকিস্তানেও একই ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা অক্টোবর, ১৯৬৯]

শেখ মুজিব ১২ই অক্টোবর ('৬৯) ঠাকুরগাঁয়ে দলীয় কর্মিসভায় বক্তৃতা দানকালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন।

মুজিব কর্তৃক অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

বক্তৃতায় তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, সাধারণ নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রই জনসাধারণ বরদাশত করবে না। সংবাদপত্রে তাঁরব ক্তৃতার যে বিবরণ ছাপা হয় তা' নিম্নরূপ ঃ "শেখ মুজিব বলেন যে, প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটে পার্লামেন্টারী ধরনের সরকার কায়েমের জন্য জনসাধারণ বিগত ২২ বৎসর যাবৎ অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। শেখ মুজিব বলেন যে, জনসাধারণের ত্যাগ স্বীকার বৃথা যাইবে না। তিনি বলেন যে, অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত অধিকার আদায়ের আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্র ছাড়া জনসাধারণ কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবে না বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করেন।

দেশের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ছাড়া কোন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে এই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। শেখ মুজিব অনতিবিলম্বে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবী জানাইয়া বলেন যে, "নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণাই বর্তমান সরকারের প্রধান দায়িত্ব।"

[ঐ, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৬৯]

৯ই অক্টোবর রংপুর ছাত্রলীগ কর্মীসমাবেশে ভাষণ প্রসঙ্গে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের সমালোচনা ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সম্পর্কে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। একটি দৈনিকে পরিবেশিত

শাসনতন্ত্র ঃ আগুন নিয়ে খেলা

খবর নিম্নরূপ ছিল ঃ "আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেন এবং এই মর্মে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে, যাঁহারা এই শাসনতন্ত্র জনগণের উপর পুনরায় চাপাইয়া দেওয়ার

প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছেন, তাঁহারা আগুন নিয়া খেলিতেছেন। আওয়ামী লীগ প্রধান ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সম্ভাবনা অস্বীকার করেন এবং অবিলম্বে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান।"

[দৈনিক আজাদ, ১০ই অক্টোবর, ১৯৬৯]

তাঁর প্রদত্ত সকল ভাষণের দ্বারা শেখ মুজিব তথাকথিত শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের অবাস্তবতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ক'রে তোলেন। এসব সময় তিনি জনসভার ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের জন্য বার বার আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে ১৩ই অক্টোবর দিনাজপুর জেলার পঞ্চগড়ের এক দলীয় সমাবেশে শেখ মুজিব যে সব কথা বলেন সেগুলো বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শেখ সাহেব বলেন, "যে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই, সে ক্ষেত্রে জন-সভার উপর বিধিনিষেধ আরোপের কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। তিনি বলেন, দেশবাসীর নিকট আমাদের বক্তব্য সঠিকভাবে তুলিয়া ধরার সুযোগ প্রদানের জন্যই জনসভা অনুষ্ঠানের উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার হওয়া দরকার। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদ্দেশে বলেন, "আমি দেশবাসীর কাছে আমার বক্তব্য পেশ করিতে চাই—তারাও আমার বক্তব্য শুনিতে চায়। সুতরাং অবিলম্বে জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করুন।"

জনসভা থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবীঃ শেখ মুজিব

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৬৯]

শেখ মুজিব 'অতি ডান' এবং 'অতি বাম'-পন্থীদের নির্বাচন বিরোধী চক্র হিসাবে চিহ্নিত করেন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, এটা ভেবেই তারা 'শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের মিথ্যা অস্তিত্ব আবিষ্কারে তৎপর হয়েছে—সে সম্পর্কেও তিনি জনগণকে এই সব সভায় সচেতন ক'রে তোলেন। সেই সঙ্গে আওয়ামী লীগকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই দলকে ব্যাপকতর গণসংগঠনে পরিণত করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ব্যাপারে তিনি আওয়ামী লীগ কর্মীদেরকে

সংগঠনে কর্মীদের প্রতি কঠোর নির্দেশ

আগামী ৩০শে নভেম্বরের পূর্বেই ইউনিয়ন পর্যায়ে দলীয় সাংগঠনিক কার্য সমাপ্ত করার নির্দেশ দেন। এমনকি তিনি দলীয় কর্মীদেরকে এই মর্মে সতর্ক করেও দেন যে, যদি কোন জেলা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী দলকে সুসংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গহীত হবে।

১২ই অক্টোবর (১৯৬৯) তারিখে ঢাকায় জাতীয় শ্রমিক লীগ গঠন সম্পন্ন হয়। এদেশের গণ-আন্দোলনে কৃষক, ছাত্র ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা সব সময়ই ছিল প্রশংসনীয়। এক্ষেত্রে দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত ক'রে ইপ্সিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি হিসেবে শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থান করবার কারণে শেখ মুজিব শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তবে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে তাঁর প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। এই বাণীতে তিনি বলেন, "যে দিন ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সমস্যার সমাধান হইবে সে দিনই হইবে আমার রাজনৈতিক জীবনের সার্থকতা। আর সে জন্য প্রয়োজন ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের একতা। একতা ও বলিষ্ঠতার মধ্য দিয়াই আমরা আমাদের দাবীকে প্রতিটি শ্রমিক-কৃষকের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের নিকট আমার আবেদন, ঐক্যবদ্ধ হউন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ অক্টোবর, ১৯৬৯]

এই বাণীতে তিনি আরো উল্লেখ করেন, "আজকের এই মুহূর্তে সারা দেশে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এ সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার একটি মাত্র পথ ৬-দফা মোতাবেক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপ ও জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব। একমাত্র প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরাই দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষানুরূপ শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারে। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন আমাদের দেশের সম্পদের উপর নির্ভরশীল হইয়া, এদেশের মানুষের মনোভাব অনুযায়ী সামাজিক রীতিনীতির স্বীকৃতি দিয়া এবং জনসাধারণের সম্মতি নিয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্য দিয়া দেশের অর্থনীতি ঢালাই করিয়া সাজাইতে হইবে। রাশিয়া বা চীন

হইতে সমাজতন্ত্রকে আমদানী না করিয়া বা অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুকরণ না করিয়া গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া এদেশের প্রয়োজনে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজবাদ স্থাপনের মধ্যেই এদেশের মানুষের মুক্তি নিহিত। রক্তচক্ষুর শাসন নয়, একচেটিয়া পুঁজি-বাদের শোষণ নয়, এক সুখী-সুন্দর-বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী শোষণহীন সমাজ গড়িয়া তোলাই আমাদের লক্ষ্য।”

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৯]

“শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর এই বাণী নানাদিক থেকে উল্লেখের দাবী রাখে। একদিকে তিনি গণতন্ত্রের পূজারী, অন্যদিকে তিনি সমাজতন্ত্রের অনুসারী। এই দুই আদর্শই তাঁর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর রাজনৈতিক হৃদয় এই দুই আদর্শের জলবায়ুতেই লালিত ও পরিবর্ধিত। তিনি এমন একটা সমাজব্যবস্থা কামনা করেন যেখানে শোষণ থাকবে না অথচ সত্য-ভাষণের অধিকারও বিঘ্নিত হবে না। তিনি চান শোষণহীন সমাজ, তিনি চান ব্যক্তির অধিকার-প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজ। এই বাণীতে তাঁর সেই মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এই সত্যকে একটি ঘোষণা হিসেবে তিনি প্রকাশ করেন পরবর্তী এক সময়ে, যখন তিনি রাজশাহীতে এক বিরাট জনসভায় ভাষণদান করেন। ১৯৭০ সালের ৩০শে জানুয়ারী রাজশাহী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে তিনি প্রথম সমাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক আদর্শের সমন্বয় সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ঘোষণা দেশের ও বিশ্বের সামনে পেশ করেন।

এক সপ্তাহব্যাপী দেশের উত্তরাঞ্চল সফর শেষ ক'রে ঢাকায় ফিরে আসবার পর ১৫ই অক্টোবর ঢাকায় সাংবাদিকদের সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব তাঁর সফরের অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। বিবরণে তিনি উল্লেখ করেন ঃ “প্রদেশের প্রায় সর্বত্র দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা বিরাজ করছে।

উত্তরাঞ্চল সফর শেষে সাংবাদিক সম্মেলন

জনসাধারণের দুর্দশা চরমে পৌঁচেছে। এদিকে চালের দাম উঠেছে ষাট টাকায় আর অন্যদিকে পাট বিক্রি হচ্ছে সরকার নির্ধারিত নিম্নতম মূল্যের অনেক কমে।”

[দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৯]

তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনগণের জীবনে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাকে সঙ্কটপূর্ণ বলে বর্ণনা করেন। টেস্ট রিলিফ, আংশিক রেশন, কম দরে রেশন ও ঋণের অব্যবস্থার উল্লেখ ক'রে দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের নানাবিধ সমস্যার সত্যিকার সমাধানের জন্য তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা অবলম্বনের আহ্বান জানান। তিনি বলেনঃ "জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কার্যকরভাবে এ সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ঐ]

লণ্ডন সফর

তিনি সফর শেষে এ কথা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে, দেশের জনগণ নির্বাচনের জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল গণ-সমর্থন লাভ করবে। এবার তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিছু প্রচারণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এই উদ্দেশ্যে ২৫শে অক্টোবর, (১৯৬৯) তারিখে শেখ মুজিব লণ্ডনে তিন সপ্তাহব্যাপী এক সফরের জন্য ঢাকা ত্যাগ করেন। ২২শে অক্টোবর তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের জনৈক প্রতিনিধির নিকট প্রদত্ত এক বিশেষ সাক্ষাতকারে তিনি চমৎকারভাবে তাঁর লণ্ডন যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। উক্ত পত্রিকায় এ সম্পর্কে যে বিবরণ ছাপা হয়েছিল, তা' হলঃ "এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার লণ্ডন সফরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, আইয়ুব সরকার যখন উহার এক-দশকের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল দিক হইতে নির্যাতন আর নিপীড়নের যাঁতাকল ভীমবেগে পরিচালিত করিয়াছিল, যখন পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ এবং সংগঠন হিসাবে আওয়ামী লীগ এক মহা-অসম সংগ্রামে আপোষহীন ভাবে সংগ্রাম করিয়া যাইতেছিল, তখন লণ্ডনের প্রবাসী পাকিস্তানীরা, বিশেষ করিয়া বাঙালীরা যে ভাবে অপরিসীম সাহায্য ও সহানুভূতির হস্ত সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন, সে স্মৃতি কোন দিন ভুলিবার নয়। ...... তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যে দিন আমাদের আসামীর

কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল, সে দিন প্রবাসী বাঙ্গালীদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিজেদের অর্থ ব্যয় করিয়া বিশিষ্ট আইনজীবী টমাস উইলিয়মকে সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে কুর্মিটোলার বিচার কক্ষে পাঠাইয়াছিলেন। ··· সেদিনও প্রবাসী বন্ধুরা আওয়ামী লীগের বাত্যাদুর্গত সাহায্য তহবিলে ৫,৬৮০ টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ······ তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তাঁহাদের সংগ্রামী ভূমিকার প্রতি একাত্মতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে লণ্ডন যাওয়া আমি কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। ····· প্রবাসী বন্ধুরা আজ দাবী তুলিয়াছেন এবং বিনয়াবনত চিত্তে আমি সে দাবী মানিয়া লইয়া তাঁহাদের কাছে যাইতেছি।" তাঁহার এই লণ্ডন সফরের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক কারণ জড়িত আছে কি না জানিতে চাহিলে শেখ সাহেব বলেন ঃ "এই সফরের সঙ্গে রাজনৈতিক কোন কারণ জড়িত নাই এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া তিনি লণ্ডন যাইতেছেন না।" তাঁহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, "গোপন কারসাজি করার মধ্য দিয়া উদ্দেশ্য হাসিলের রাজনীতি আমি করি না।" ······ আর একটি প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেন যে, "লণ্ডনে থাকার সময় স্বদেশের পরিস্থিতির উপর তিনি সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। লণ্ডন মাত্র ১২ ঘন্টার পথ, প্রস্তাবিত তিন সপ্তাহের যে কোন পর্যায়ে দেশবাসীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি মুহূর্তমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া ছুটিয়া আসিবেন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৬৯]

বলাবাহুল্য, লণ্ডন পৌঁছলে বিমান বন্দরে শেখ মুজিবকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ সম্পর্কে একটি দৈনিক পত্রিকায় লেখা হয় ঃ "প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও কয়েক হাজার পাকিস্তানী হীথ্রো বিমান বন্দরে সমবেত হয় এবং ৬-দফা কর্মসূচী, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পাকিস্তানে সত্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমর্থনে শ্লোগান দেয়। শেখ সাহেবকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয় এবং জনতা তাঁর উপর ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৯]

এদিকে, শেখ মুজিব ও তাঁর ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি রক্ষণশীল ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের আক্রমণ ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। ৬-দফা

সম্পর্কে কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা কাইউম খান এ ধরনের একটি মন্তব্য করেছিলেন। এ. পি. পি. প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "তিনি শেখ সাহেবের ৬-দফার বিরোধী, কারণ ইহার ফলে কেন্দ্র দুর্বল হইয়া পড়িবে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৬৯]

অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে জামাত নেতারা শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট প্রসঙ্গে যে সব কথা প্রচার করেন সে সম্পর্কে পত্রিকায় বলা হয়ঃ "পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর ডেপুটি আমির মওলানা আবদুর রহীম শেখ মুজিবের প্রতি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্মত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এছাড়া বর্তমানে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা দুষ্কর হবে।"

[ঐ, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬৯]

জামাতপন্থীরা বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ধর্মের নামে যে সব জিগির তুলেছিলেন তার সাথে ইয়াহিয়া খানের চিন্তাধারার কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। আসলে ইয়াহিয়া খান ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অনুচর। যাহোক, ঠিক এমনি সময়ে ২৫শে অক্টোবর ইয়াহিয়া খান তেহরানের পথে করাচী ত্যাগের পূর্বে চাকলালা বিমান বন্দরে মন্তব্য করেন ঃ "আমি শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবের কথা বলি নি। আমি শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রের ভিত্তির কথা বলেছি।"

[ঐ, ২৬শে অক্টোবর, ১৯৬৯]

প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত দলগুলোর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্টের এই শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি ভবিষ্যতে এল. এফ. ও. (Legal Framework Order, President's Order No. 2, 1970)-এরই ইঙ্গিত বহন করে।

নভেম্বরের গোলযোগ এবং শেখ মুজিব

১৯৬৯ সালের ১লা নভেম্বর উর্দু ভাষায় ভোটার ফরম প্রদানের দাবীতে ঢাকায় একশ্রেণীর লোক হরতাল পালনের আহ্বান জানায়। এ নিয়ে দু'দল লোকের মধ্যে কোন্দল শুরু হয় এবং পরে তা' সংঘর্ষে পরিণত হয়। সংঘর্ষে ৬ জন নিহত ও ১১১ জন আহত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৭ই অক্টোবর তারিখ থেকে এই ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করা

হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে ১লা নভেম্বর শনিবার রাত্রে প্রাদেশিক সরকারের দেয়া এক প্রেসনোটে বলা হয়ঃ "উর্দু ভাষায় ভোটার ফরম প্রদানের দাবীতে বিশেষ একশ্রেণীর লোক হরতাল পালনের আহ্বান জানায়। সেই অনুসারে কয়েক দল বখাটে এবং সমাজবিরোধী লোককে মীরপুর এলাকায় কতিপয় সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। প্রতিদিনের মত গতকালও এই এলাকার দোকানপাট সকালে খোলা হইলে তাহারা জোর করিয়া সেই দোকানপাট বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করে। এই সময় পুলিশ রাস্তার বাধাসমূহ অপসারণ করিতে এবং দুষ্কৃতিকারীদের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলে তাহারা মারমুখী হইয়া উঠে এবং পুলিশকে তাহাদের কর্তব্যকর্মে বাধা দিতে সচেষ্ট হয়। ইহাতে পুলিশকে কাঁদুনে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জ করিতে হয়। কিন্তু অবস্থা ঘোরালো হইয়া ওঠে এবং জনতা আরও উত্তেজিত হইয়া পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং অন্যান্য উপায়েও আক্রমণ শুরু করে। ফলে কর্তব্যরত একজন পুলিশ সুপার ও কয়েকজন অফিসারসহ বিপুল সংখ্যক পুলিশ আহত হন। ইহাদের মধ্যে ৪০ জনকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হইয়াছে।

গোলযোগ চলাকালে দমকল বাহিনীর একটি গাড়ী ও ছোটখাট কয়েকটি দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। একশ্রেণীর লোক হরতাল পালনে অন্যান্যকে বাধ্য করার চেষ্টা করিলে দুই দল লোকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরে গুজব ছড়াইয়া পড়িলে শহরের অপরাপর কয়েকটি স্থানেও গোলযোগ দেখা দেয় এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে।

জনসাধারণের পক্ষ হইতে ৭১ জন আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার্থে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তাহাদের মধ্যে ৩১ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং বাকী ৪০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

হাসপাতালে ভর্তি আহত ৩১ ব্যক্তির মধ্যে পরে ৪ জন মারা যায়। অপর দুই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনয়ন করা হয়।"

... .

"সরকার এই অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে মূল্যবান জীবনসমূহের অবসান ও সম্পত্তির ধ্বংস সাধনে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর

জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২রা নভেম্বর, ১৯৬৯]

কিন্তু সরকারী হিসাব যাই হোক—হতাহতের সংখ্যা আরো অধিক ছিল এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনী উর্দুভাষীদের সাহায্য করায় যাঁরা হতাহত হন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন বাঙালী।

এদিকে সকল উস্কানির মুখে শান্তি বজায় রাখার সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য দেশের নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। ১লা নভেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে শান্ত থাকার এবং শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, সাবেক জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের ডেপুটি লীডার শাহ আজিজুর রহমান, ওয়ালী ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তান সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি মওলানা নূরুজ্জামান ও পিকিংপন্থী ন্যাপ নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা পৃথক পৃথক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং জনগণকে শান্ত থাকতে অনুরোধ জানান।

এদিকে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন ছিলেন লণ্ডনে। তিনি ঐ সময় লণ্ডনে বসবাসকারী বাঙালীদের সাথে দেখা করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে লণ্ডন সফর করছিলেন। ১লা নভেম্বর সন্ধ্যায় লণ্ডনে পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রদের আয়োজিত এক ছাত্রসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন যে, গণতন্ত্রের জন্য তাঁর সংগ্রাম শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ নয়—পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চল এবং জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরের জন্যই এ সংগ্রাম। তিনি বলেন, তাঁর এই সংগ্রাম বিচ্ছিন্নতার জন্য নয়। তিনি চান দেশের প্রতিটি নাগরিক শোষণহীন জীবন-যাপন করুক।

২রা নভেম্বর রবিবার ঢাকায় আবার গোলযোগ ও সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ১৯ ব্যক্তি আহত ও ৩০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় লেখা হয়, "রোববার এক হিংসাত্মক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার

জন্য সেনাবাহিনী গুলী চালনা করতে বাধ্য হ'লে এক ব্যক্তি আহত হয়। রোববার রাত্রে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক প্রেসনোটে একথা বলা হয়।

মীরপুর, হাজারীবাগ, রায়ের বাজার ও কমলাপুরে বিক্ষিপ্ত ঘটনার পর ১৯ জন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৫ জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। একজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনয়ন করা হয়। গোলযোগের ব্যাপারে এ পর্যন্ত তিনশত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসান, সামরিক শাসনকর্তাদ্বয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গোলযোগপূর্ণ এলাকা সফর করেন এবং হাস-পাতালে আহতদের দেখেন।

পূর্ব পাকিস্তানের ২২ জন রাজনৈতিক নেতা এক যুক্তবিবৃতিতে হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করেন এবং সুস্থ পরিবেশ ও আস্থার মনোভাব ফিরিয়ে আনার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।"

খবরে আরো বলা হয়ঃ "প্রদেশে গোলযোগের খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি বৃটেন সফরের অবশিষ্ট কর্মসূচী বাতিল ক'রে প্রথম যে বিমানটি পাওয়া যাবে তাতেই নিজ দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৩রা নভেম্বর, ১৯৬৯]

পি. পি. আই-এর বরাত দিয়ে খবর সরবরাহ করা হয়ঃ "১লা ও ২রা নভেম্বর শেখ মুজিব লণ্ডন ও বার্মিংহামে জনসমাবেশে ভাষণ দান করেন। এখানে বসবাসরত বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানী তাঁহার বক্তৃতা শোনার জন্য জমায়েত হয়। শেখ সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। তিনি তাঁহার দলের ভূমিকা এবং ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন।

জনতা বারংবার শ্লোগান ও করতালির মাধ্যমে তাঁহার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহার বক্তৃতায় জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপের দাবী জানান।

ঢাকার গোলযোগের খবর পাওয়ায় শেখ মুজিব তাঁহার ম্যাঞ্চেস্টার ও ব্রেডফোর্ডের জনসভা অনুষ্ঠানের কর্মসূচী বাতিল করিয়া এক্ষণে প্রথম বিমানেই ঢাকা প্রত্যাবর্তনের জন্য ৩রা নভেম্বর থেকে অপেক্ষা করিতেছেন।"

[ইত্তেফাক, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৯]

লণ্ডনে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ৪ঠা নভেম্বর মঙ্গলবার রাত ৯ টায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদের সাথে লণ্ডন থেকে টেলিফোনে আলাপ করেন।

"জনাব তাজউদ্দিন ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি শেখ সাহেবকে জানাইলে তিনি সমগ্র ব্যাপারটিকে আগামী নির্বাচন বানচাল করার সুগভীর কার-সাজিরই নগ্ন প্রকাশ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শত উস্কা-নির মুখেও শান্ত থাকিয়া নির্বাচন বানচাল করার এ কারসাজি দেশবাসীকে নস্যাৎ করিতেই হইবে। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজধানীতে অবিলম্বে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরাইয়া আনিতে সর্বপ্রযত্নে উদ্যোগী হওয়ার জন্য ঢাকার সকল শ্রেণীর নাগরিকের প্রতি তাঁহার পক্ষ হইতে অনুরোধ জানাইতে বলেন।

ঢাকার হাঙ্গামার কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য উদগ্রীব হইলেও বৃহস্পতিবারের পূর্বে বিমানে আসন না পাওয়ায় তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই বলে তিনি জানান।"

[ঐ, ৫ই নভেম্বর, ১৯৬৯]

লণ্ডন থেকে তেজগাঁ বিমান বন্দরে

লণ্ডন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ৮ই নভেম্বর শনিবার শেখ মুজিব তেজগাঁ বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা কালে ঢাকায় সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন। শেখ মুজিব ঢাকা গোলযোগের পশ্চাতে যে অশুভ শক্তি সক্রিয় রয়েছে তাদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রে বলেন, "জনসাধারণকে শান্তির পথ ছাড়িয়ে অশান্তির পথে যাওয়ার জন্য যে অশুভ চক্রটি অবিরত উস্কানি দিতেছে, তাহাদের বুঝা উচিত যে, তাহারা আগুন লইয়া খেলিতেছে। দেশের পরিস্থিতি অধিকতর ঘোরালো হওয়ার পূর্বেই ইহাদের চৈতন্যোদয় হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয় বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

তিন সপ্তাহের নির্ধারিত কার্যসূচী অসম্পন্ন রাখিয়া শেখ সাহেব দুই সপ্তাহব্যাপী লণ্ডন সফর শেষে শনিবার ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন।

সকাল ঠিক ৬টা ৫০ মিনিটে তাঁহাকে বহনকারী পি. আই. এ-র একটি বোয়িং বিমান তেজগাঁ বিমান বন্দরে পেঁৗছিলে বিপুলসংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতা উল্লাসে ফেটে পড়ে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই নভেম্বর, ১৯৬৯]

বঙ্গবন্ধু ৮ই নভেম্বর দেশে প্রত্যাবর্তন করার পরপরই উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শনে যান। মীরপুর, মোহাম্মদপুর, রায়ের বাজার ও তেজগাঁর সংশ্লিষ্ট উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন ক'রে তিনি সমগ্র ব্যাপারটিকে 'চেনা মুখের কারসাজি' বলে অভিহিত ক'রে সংশ্লিষ্ট মহলকে আগুন নিয়ে খেলার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দেন।

বঙ্গবন্ধুর কঠোর হুঁশিয়ারীর ফলে ঢাকার গোলযোগপূর্ণ এলাকায় আবার শান্তি ফিরে আসে। নির্বাচনকে নস্যাৎ করার জন্য কুচক্রীমহল যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে চেয়েচিল বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তা' সম্ভব হয় না। পর্যবেক্ষকদের মতে, বঙ্গবন্ধুর হস্তক্ষেপ ছাড়া এই আত্মঘাতী গোলমালের মীমাংসা করা সম্ভব ছিল না।

এ ব্যাপারে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হওয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রশংসা ক'রে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানান।

মজলিসে ওলামায়ে পাকিস্তানের সভাপতি মওলানা আসাদুল কাদরী ১০ই নভেম্বর করাচীতে এক বিবৃতিতে বলেন যে, "পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে শেখ মুজিব লণ্ডন ও করাচীতে অত্যন্ত সুস্থ অভিমত প্রকাশ করেন।............মওলানা কাদরী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান বলিয়া সেখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি সাহায্য করিতে সক্ষম।"

[ঐ, ১১ই নভেম্বর, ১৯৬৯]

লণ্ডন থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর ৮ই নভেম্বর সকালে ঢাকা বিমান বন্দরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব লণ্ডনস্থ পাকিস্তানী

হাই কমিশনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগের কথাও উল্লেখ করেন। একটি দৈনিক থেকে এই সম্মেলনের প্রশ্নোত্তর উদ্ধার করি ঃ "স্বদেশী কূটনীতিকদের যথাযোগ্য তদারকির অভাবে প্রবাসী জীবনে বাঙ্গালীরা কোন রকমে দিনযাপন করিতেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লণ্ডনস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশনের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, হাই কমিশনের তিনশত কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ২০ জন বাঙ্গালী রহিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য শতকরা ৫৬ ভাগ আসনের পুরাতন দাবীটি নতুন করিয়া এবং বিশেষ জোর দিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

বিমান বন্দরে প্রশ্নোত্তর

শেখ সাহেব ক্ষমতায় গেলে এই দাবী বাস্তবায়িত করিতে চাহেন কিনা জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, এখনই এই দাবীর বাস্তবায়ন তিনি কামনা করেন। তিনি প্রশ্নকারীকে বলেন যে, এই দাবী আমাদের সনাতন ও ন্যায্য দাবী এবং এই দাবীর আশু বাস্তবায়নই তিনি কামনা করেন। প্রশ্নকারীকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি রাজনীতি করেন না—দেশবাসীর ন্যায্য দাবী-দাওয়া লইয়া আপোষহীন সংগ্রাম করাই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনাদর্শ। তিনি বলেন যে, আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবী-দাওয়া লইয়াই সংগ্রাম করিতেছি না, পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের জন্যও আমি সংগ্রাম করিতেছি এবং এক ইউনিট বাতিলের যে দাবী আমরা উত্থাপন করিয়াছি তাহার মধ্য দিয়া সে সংগ্রামের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। লণ্ডনে অবস্থানকালে তিনি দৌলতানা বা জনাব ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন কিনা জানিতে চাহিলে শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই এবং লণ্ডনের কোথায় তাঁহারা আছেন তা' তিনি জানেনও না। প্রশ্নকারীকে তিনি বলেন, পর্দার অন্তরালে রাজনীতি করার অভ্যাস আমার নেই। আমার রাজনীতি স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই নভেম্বর, ১৯৬৯]

১৬ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ৬ ঘন্টা-ব্যাপী এক বৈঠকে আগামী এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন সমাপ্তির নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার আহ্বান জানানো হয়। দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

অবিলম্বে রাজনৈতিক তৎপরতা এবং উন্মুক্ত স্থানে জনসভা অনুষ্ঠানের ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের হুলিয়া প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তিদানের জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জোরালো দাবী জানানো হয়।

অবিলম্বে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এবং দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক শাসনতন্ত্র রচনার জন্য সরকারের প্রতি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে একটি আইনসভা গঠনের আহ্বান জানান। দেশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

১৯শে নভেম্বর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে যে তিনশ' ছাত্র বাংলায় বি-এ পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের ফল প্রকাশের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের হস্তক্ষেপ কামনা ক'রে এক তারবার্তা প্রেরণ করেন। পরীক্ষার্থীদের ফল 'উইথহেল্ড' রাখায় তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে তারবার্তায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

জনগণের সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি ক'রে এবং কিছুটা বিভিন্ন মহলের চাপে ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে

ইয়াহিয়ার ঘোষণা ঃ এক ইউনিট বাতিল ঃ নির্বাচনের তারিখ

ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠনের এবং 'এক ব্যক্তি এক ভোট'-এর ভিত্তিতে নয়া জাতীয় পরিষদ গঠনের জন্য আগামী বৎসর (১৯৭০) ৫ই অক্টোবর দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, আগামী ১লা জানুয়ারী থেকে যাবতীয় বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ক'রে দেশে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর অনুমতি দেয়া হবে। উক্ত ঘোষণায় তিনি আরও বলেন যে, আগামী বৎসর অক্টোবর মাসে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদে প্রথম অধিবেশন শুরুর দিন থেকে ১২০ দিনের ভেতরে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে এবং প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভের পরক্ষণেই উহা পাকিস্তানের নয়া শাসনতন্ত্র হিসেবে গণ্য হবে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের

কাজ শেষ হওয়ার পর প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এর পরক্ষণেই প্রতিনিধিত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এই সমুদয় দায়িত্ব পালনকালে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচী বাস্তবায়ন পর্যায়ে সামরিক আইনই দেশে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসেবে বহাল থাকবে।

ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ

"* ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

* ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন আইনগত বুনিয়াদ প্রস্তুত হবে।

* এক ইউনিট ভেঙ্গে দিতে হবে।

* একজন এক ভোট নীতি গ্রহণ করা হবে।

* প্রদেশগুলোকে সর্বাধিক পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, যে পর্যন্ত না তা' জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার পরিপন্থী হয়।

প্রেসিডেন্ট বলেন, মতভেদ না থাকার দরুন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্থিরীকৃত ধরে নেওয়া যেতে পারে ঃ

(ক) পার্লামেন্টারী ফেডারেল সরকার।

(খ) প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোট।

(গ) জনসাধারণের মৌলিক অধিকার এবং আদালতের মাধ্যমে তার প্রয়োগ।

(ঘ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শাসনতন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তার ভূমিকা।

(ঙ) শাসনতন্ত্রের ইসলামী চরিত্র যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে সংরক্ষণ করবে।

* ১৯৭০ সালের ১লা জুনের মধ্যে ভোটার তালিকা তৈরী হতে হবে।

* জাতীয় পরিষদকে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শেষ করতে হবে, অন্যথায় পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

* শাসনতন্ত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নয়া সরকার গঠনের ব্যবস্থা করা হবে।

* জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত দেশে সামরিক আইন বহাল থাকবে।
* ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেয়া হবে।
* গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় নির্দেশিকা অদূর ভবিষ্যতে জারী করা হবে।

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৬৯]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই ঘোষণা দেশের উভয়াংশের বিভিন্ন দল ও নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়ার ঘোষণা সম্পর্কে একটি বিবৃতিতে বলেন ঃ "ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সূচী ও উহার বাস্তবায়ন পদ্ধতির প্রশ্নে মতানৈক্যের অবকাশ থাকিলেও দেশের সমস্যা অনুধাবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য।"

ইয়াহিয়ার ঘোষণা ঃ শেখ মুজিবের বিবৃতি

শেখ মুজিব আরও বলেন, "আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা পাঠ করিয়াছি। দেশ আজ যে সব মৌলিক সমস্যার মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতেছে ও যে সব সমস্যা সম্পর্কে তিনি যে সব প্রতিবিধানের প্রস্তাব করিয়াছেন, সেগুলিও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। দেশবাসী অর্থাৎ ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীরা অক্লান্ত শ্রম, অফুরন্ত অশ্রু ও সর্বোচ্চ ত্যাগের মধ্য দিয়া জাতির মৌলিক সমস্যা এবং তাহাদের সমাধানসমূহ নির্দেশ করিয়াছেন। সমস্যাসমূহ ব্যক্তিগতভাবে অনুধাবনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে সাধু প্রয়াস পাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়। মূল সমস্যাদি সম্পর্কে জাতির সঙ্গে একাত্মবোধ প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি অকপটে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও প্রশংসার্হ।"

শেখ মুজিব বলেন ঃ "জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি ও সময়সীমা নিয়া প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্যের সুযোগ আছে। প্রশাসনযন্ত্র আরও গুরুত্ব দান করিলে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচন আরও শীঘ্র অনুষ্ঠান সম্ভব হইত। সে যাহাই হোক,

আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রেসিডেন্ট যে সব ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন সে সব প্রস্তাবের মধ্য দিয়া নির্বাচনে জয়ী ও জনগণের স্পষ্ট ম্যাণ্ডেটধারী জন-প্রতিনিধিরা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দেশে শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের উক্তি প্রশংসনীয়। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রশাসনযন্ত্রকেও অবশ্যই বিবেকসম্পন্ন ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কারণ, স্পর্শকাতর বিষয় ও বিতর্কমূলক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রশাসনযন্ত্রের অসতর্ক বা অতি উৎসাহমূলক ভূমিকা গণতন্ত্রের বিরোধী শক্তিসমূহের তৎপরতার চাইতেও ভয়াবহ বিভেদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। আমরা আশা করি, প্রেসিডেন্ট সেই আশঙ্কা প্রতি বিধানের জন্য পূর্বাহ্ণে ব্যবস্থাবলম্বন করিবেন।

প্রেসিডেন্ট কয়েকটি মূল সমস্যার সমাধান দিয়াছেন, কিন্তু কয়েকটি সমস্যার সমাধান তিনি দেন নাই। শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক বা অন্যবিধ মূল সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে আমাদের আগাগোড়া ভূমিকা হইল—মূলত আমরা বিশ্বাস করি যে, একমাত্র জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এই সব সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রসঙ্গে দেশের জন্য একটি সর্বমুখী শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন—যে শাসনতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক রূপরেখার মত মূল সমস্যাবলীর সমাধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবেন। শুধু তাহাই নহে, প্রেসিডেন্ট যে সব সমস্যার সমাধান দিয়াছেন সেগুলির চূড়ান্ত রূপদানের দায়িত্বও তাঁহাদের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে, ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন এবং সমাধান করা হয় নাই এমন অপরাপর মৌলিক শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলী নির্বাচনের সময় জনমতের সামনে উপস্থাপিত হইতে পারিবে এবং সেই সব সমস্যা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচনের বিতর্কাতীত ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সমাধান করিতে সক্ষম হইবেন। ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি জনগণ স্পষ্ট ভাষায় তাহাদের রায় ব্যক্ত করিবেন বলিয়া আমাদের আস্থা আছে। ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রতিরক্ষাবাহিনীসহ সর্বক্ষেত্রে চাকুরী-বাকুরীর বৈষম্যকে কেন্দ্র করিয়া কেন্দ্র ও ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ইউনিটসমূহের মধ্যে

বিশেষ করিয়া পূর্ব বাংলায় ভুল বুঝাবুঝির যে দুরারোগ্য ব্যাধি বিদ্যমান রহিয়াছে এক মাত্র ৬-দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়াই সেই ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাইয়া পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন যে, প্রেসিডেন্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অপরাপর অনেক সমস্যার অবতারণা করেছেন। ফি'বছর পূর্ব বাংলার অর্থনীতিকে নস্যাৎকারী বন্যা সমস্যার উল্লেখ করতে তিনি ভুলে গেছেন সে জন্য আমরা দুঃখবোধ করি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হ'তে বন্যা সমস্যার সামগ্রিক সমাধান নির্দেশ ক'রে প্রেসিডেন্ট বহু প্রতীক্ষিত একটি সঠিক প্রকল্প ঘোষণা করবেন, আমরা এই আশা পোষণ করেছিলাম। আশা করি, প্রেসিডেন্ট এই প্রশ্নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, নচেৎ এই অঞ্চলের মানুষের কাম্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব হবে না।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৯]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে শেখ মুজিব আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। শেখ মুজিব জানেন, ক্ষমতায় না গেলে পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর ক্ষমতায় যেতে হ'লে জনগণের সাহায্যেই তা' সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ৬-দফাকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালাতে লাগলেন।

১৯৬৯ সালের ২রা ডিসেম্বর ঢাকার রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক ইফতার পার্টিতে ভাষণ দান কালে শেখ মুজিব তাঁর প্রথম নির্বাচনী প্রচারাভিযানের ভাষণে বলেন যে, "আগামী সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণকে ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবীর সপক্ষে সুস্পষ্ট ভাষায় আনুষ্ঠানিক রায় ঘোষণা করিতে হইবে। ...... রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের জন্য অপরিহার্য স্বায়ত্তশাসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবী পূর্ব বাংলার গণ-মানুষের ঈমানের অঙ্গ—সার্বজনীন দাবী। নির্বাচনের মাধ্যমে এই সার্বজনীন দাবীটিকেই আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব বাংলার

শেখ মুজিবের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে প্রাথমিক পর্যায়ের ভাষণসমূহ

আপামর জনতার অপরিবর্তনীয় রায় হিসাবে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গঠিত ভবিষ্যৎ জাতীয় পরিষদের সামনে পেশ করিতে হইবে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৬৯]

উক্ত পার্টিতে শেখ মুজিব আরো বলেন যে, "আমাদের সংগ্রাম কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে।"

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯। এ দিন মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুদিবস।

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর থেকে প্রতি বৎসর তাঁর স্মরণে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হ'য়ে থাকে। বিশেষ ক'রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এই দীক্ষাগুরু ও পথপ্রদর্শককে বেদনার্ত চিত্তে স্মরণ ক'রে নেতার জীবনাদর্শকে জনগণের সামনে নতুন ক'রে প্রতিবছর তুলে ধরেন। এবারেও দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে নয়া আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পরিবেশে সোহরাওয়ার্দীর ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। প্রাদেশিক গভর্নরসহ দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিক তাঁর মাজারে জিয়ারত ও পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। বঙ্গবন্ধুও তাঁর নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন। অপরাহ্ণে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে অবস্থিত সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলার মাজারে (উভয় মাজারই পাশাপাশি অবস্থিত) সোহরাওয়ার্দী স্মরণে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "বাংলার এই দুই কৃতি সন্তানের সমাধির পাশে দাঁড়াইয়া আজ আমরা আবার এই শপথ ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা সত্যিকার পাকিস্তানী নাগরিক হিসাবে বাঁচিতে চাই—কাহারো গোলাম হইয়া থাকিতে চাই না।"

[ঐ, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯]

আলোচনা সভায় তিনি পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ' রাখার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। তিনি আবেগকম্পিত হৃদয়ে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, "এক সময় এদেশের বুক হইতে মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ...... একমাত্র "বঙ্গোপসাগর"

বাংলাদেশ শব্দের ব্যবহার

ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ...... বাংলা ও বাঙ্গালীর অবিসংবাদিত গণনায়ক শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলার প্রতিও অমার্জনীয় অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বক্তৃতা মঞ্চের অনতিদূরে চিরনিদ্রায় শায়িত নেতৃদ্বয়ের মাজারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া শেখ মুজিব বলেন, বাংলার এই দুই কৃতি সন্তান আজ অসহায়ের মত আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। এই দুই নেতার মাজারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি—আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু মাত্র 'বাংলাদেশ'।"

[পূর্বোক্ত]

বলা বাহুল্য শেখ মুজিবের এই ঘোষণা পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর কোন কোন রাজনৈতিক নেতা 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' শব্দের ব্যবহার করবার গৌরব নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেবার চেষ্টা করেছেন।

বাংলাদেশ কোন নতুন শব্দ নয়। এই শব্দের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন, "বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান (অর্থাৎ বাংলাদেশ) প্রাচীন গৌড় বা বরেন্দ্র এবং বঙ্গ বা বঙ্গাল দেশ লইয়া গঠিত।"

[আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ছ, ভূমিকা]

আমরা জানি, বাংলার আসল নাম বঙ্গ। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে বঙ্গ পূর্বে আল বা আড়াল দিয়ে ঘেরা ছিল বলে বঙ্গাল এই নাম। মতান্তরে বঙ্গ+আলয়=বঙ্গালয় অপভ্রংশ বাঙ্গালা। তাঞ্জোরে ১১ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে আছে 'বঙ্গলয়' এই শব্দ থেকে হয়েছে বাঙ্গালা। পূর্বে গঙ্গা ও করতোয়ার দ্বারা বিভক্ত হয়ে পশ্চিমাংশ গৌড় এবং পূর্বাংশ বঙ্গ এই নামে অভিহিত ছিল। মোগল শাসন কালে মিলিত গৌড়বঙ্গ বাঙ্গালা নাম প্রাপ্ত হয়েছিল। তা' থেকে হয়েছে বাংলাদেশ।

[দ্রষ্টব্য ঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১৫২৬]

এ সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য দেয়া যায়। কিন্তু আমাদের তা' উদ্দেশ্যে নয়। ব্রিটিশ ভারতে বাঙ্গালা বাংলাদেশ বলেই পরিচিত ছিল। ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর সমগ্র বাংলাদেশ তিনটি নামে পরিচিত হয়ঃ পশ্চিম বাংলা—ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য, পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান—পাকিস্তানের পূর্বাংশ। পূর্ব পাকিস্তানেও উনসত্তরের আন্দোলনের সময় থেকে এই প্রদেশের নাম বাংলাদেশ রাখা হোক এমন একটি গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে দেশবাসীর সামনে পূর্ব পাকিস্তানকে প্রথম ঐতিহ্য-সূত্রে পুরাতন সেই 'বাংলাদেশ' নামে চিহ্নিত করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এ গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। অনুরূপভাবে 'জয়বাংলা' শব্দটি, যতদূর মনে পড়ছে, উনসত্তরের আন্দোলনে ছাত্রলীগ প্রথম ব্যবহার করেন। কিন্তু শেখ মুজিব যখন এই শব্দকে গ্রহণ ক'রে সর্বত্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন, শব্দটি তখন বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করলো। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই শব্দ মন্ত্রের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পূর্বেই বলেছি, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় পূর্ব পাকিস্তানের নাম 'বাংলাদেশ' রাখা হোক এমন একটি গুঞ্জন উঠেছিল। যাঁরা গুঞ্জন তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে জনাব আতাউর রহমান খানের নাম উল্লেখ করা যায়। রাজনৈতিক জীবনে আতাউর রহমান খানের ভূমিকা কোনদিনও বলিষ্ঠ ছিল না—বিক্ষোচিত কিনা তাও জোর দিয়ে বলা যায় না। আমার মনে হয়েছে, তাঁর যথেষ্ট আন্তরিকতা, গভীর দেশপ্রেম এবং নেতৃত্বদানের ন্যায় ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হন নি, কারণ তিনি একটু মোটাবুদ্ধির লোক। যথাসময়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি সব সময়ই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণেই সমগ্র দেশ যখন বঙ্গবন্ধুর ৬-দফার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দান করেছে, তিনি তখন ৬-দফার বিরোধিতা করেছেন—সত্তরের নির্বাচনে ভরাডুবির পর যখন দেখলেন যে সমগ্র দেশ ৬-দফার সমর্থন জানিয়েছে এবং পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকার বোধে জাগ্রত, তখন তিনি স্বাধীনতার আহ্বান জানালেন। বলাই বাহুল্য, ঠিক এই মুহূর্তে পূর্ব বাংলার জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক সরকার চেয়েছিলেন, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেই

সরকারের জন্য তাঁরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন, স্বাধীনতার জন্য তখনো তাঁদের মানসিক পটভূমি প্রস্তুত হয় নি। সুতরাং তাঁর এই আহ্বান তখন বড় বেসুরো শোনালো। মওলানা ভাসানীও সারাজীবন এমনি বেসুরো সঙ্গীতে সুর ভেজেছেন—সার্থক সম্মোহন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অনুরূপভাবে 'বাংলাদেশ' শব্দটি জনাব আতাউর রহমান খান বা অন্য যে কেউ বঙ্গবন্ধুর পূর্বে হয়তো ব্যবহার ক'রে থাকতে পারেন, কিন্তু সময়োচিত হয় নি বলে এবং বজ্রনির্ঘোষ প্রত্যয়ে তা' অভিব্যক্ত হয় নি বলে শুধুমাত্র গুঞ্জনের মতই শুনিয়েছে, সার্থক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে নি। অবশ্য আতাউর রহমান অথবা এই জাতীয় কেউ আদৌ বঙ্গবন্ধুর পূর্বে শব্দটি ব্যবহার করেছেন কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত ক'রে কিছু বলা যায় না।

অন্যপক্ষে, বঙ্গবন্ধু এই শব্দটি এমন পরিবেশে, এমন ভঙ্গীতে, এমন কঠোর ভাষায় ও বলদৃপ্ত কণ্ঠে এবং এমন যথাসময়ে ঘোষণা করলেন যে, ঘোষণার পর তা' সাড়ে সাত কোটি মানুষের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হ'ল। শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের এই দুই মহান নেতার অমর স্মৃতিকে সাক্ষী রেখে তিনি এই নামটি ঘোষণা করেন।

এ কারণেই আমি বলেছি যে, 'বাংলাদেশ' শব্দটি সম্পর্কে একটি গুঞ্জন উঠেছিল, সে গুঞ্জন কোন ব্যক্তিবিশেষের মুখ থেকে আসে নি, সে গুঞ্জন ছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষের হৃদয়ের গুঞ্জন—সেই হৃদয়ের বাণীকে প্রথম সার্থক সিদ্ধান্তে ও সিদ্ধান্তকে ঘোষণায় রূপদান করলেন যিনি, তিনি এই সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এ কারণে বঙ্গবন্ধুই পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' শব্দে চিহ্নিতকরণের প্রথম সার্থক প্রবক্তা, যেমন তিনি এই দেশের এক মহান জন্মদাতা।

যাহোক, বাংলার স্বাধিকার দাবী অর্জনের জন্য শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুদিবসেও পুনরায় দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন। আগেই বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমেই তিনি তা' আদায় করতে চান, কিন্তু কোন কোন স্বার্থবাদী মহল নানা ছুতানাতা দেখিয়ে তা' বানচালের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে দেখে তিনি জনগণকে সে সম্পর্কে হুঁশিয়ার ক'রে

দিয়ে বলেন, "স্বার্থবাদী মহল আসন্ন সাধারণ নির্বাচন বানচালের যে চক্রান্ত চালাইতেছে, উহা প্রতিহত করিয়া ছয়-দফার স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ রায় ঘোষণা করিতে পারিলে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী ঠেকাইয়া রাখিতে পারে এমন সাধ্য পৃথিবীতে কাহারো নাই।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯]

পরদিন অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বরেও ঐ একই স্থানে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে জনগণকে সতর্ক ক'রে দিয়ে ঘোষণা করেন ঃ "আগামী সাধারণ নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে। তাই এই নির্বাচনকে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোট হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাঙালীদের ছয়-দফার স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ রায় দিতে হইবে।"

[ঐ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯]

শেখ মুজিব যখন বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনে জনগণের রায় কামনা ক'রে একের পর এক প্রচারাভিযান চালাচ্ছিলেন, ঠিক সে সময়ই মওলানা ভাসানী তাঁর স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ ক'রে নির্বাচন-বিরোধী ভূমিকা পালনের জন্য মাঠে নেমে পড়েন। ১৯৬৯ সালের ৬ই ডিসেম্বরেই তিনি যখন ইসলামিক একাডেমীতে দলীয় কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর কর্মীগণ 'ভোটের আগে ভাত চাই, নইলে এবার রক্ষা নাই', 'নির্বাচন নির্বাচন, বর্জন বর্জন', 'মোরা করেছি পণ, হ'তে দেবনা নির্বাচন' প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে চলছিলেন। আশ্চর্যের কথা, মওলানা সাহেব অনেক আগেই ছাত্রদের ১১-দফাকে তাঁদের দফা বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেই ১১-দফার অন্যতম শর্ত যে ছিল নির্বাচন, সে কথার কোন আমলই তিনি দিলেন না।

মোরা করেছি পণ, হ'তে দেবনা নির্বাচন

পূর্বেই বলা হয়েছে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইয়াহিয়া খান আইয়ুবের মতই চমক দেবার মত কিছু কিছু কাজ ক'রে জনচিত্তে আসন দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। হরহামেশাই তিনি বেতারভাষণ ও বিবৃতি দান ক'রে জনদরদী মনোভাবের পরিচয় দিতে কসুর করেন নি।

প্রতারণার পুরোন পদ্ধতিরই নতুন প্রয়োগ

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেই দুর্নীতি উচ্ছেদকল্পে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছিলেন এবং চাবুকের মুখে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, সেগুলো ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অবশ্য আইয়ুব খানের প্রাথমিক পদক্ষেপে তাঁর নগ্ন রূপটি তেমন প্রকাশমান ছিল না।

ইয়াহিয়া খানও সেটা জানেন। এবং তা' জানেন বলেই তিনিও আইয়ুবের অনুসরণে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে থাকেন।

এই উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি ইত্যাদি অভিযোগে ৩০৫ জন প্রথম শ্রেণীর অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাময়িকভাবে তাঁদেরকে পদচ্যুত করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়। পরে এই সংখ্যা ৩০৩-এ গিয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ওয়াদা করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করেছেন। ১৯৬৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর দুই সপ্তাহ-ব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসে তিনি তাঁর নির্বাচনী পদ্ধতির কথা ঘোষণা ক'রে বলেন যে, '১৯৬১ সালের আদমশুমারীর ভিত্তিতেই পরিষদের আসন বন্টন করা হইবে।' তিনি তাঁর পূর্বঘোষিত 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' কথাটির ব্যাখ্যাদান ক'রে আরো বলেন যে, এর অর্থ 'জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব' এবং এই ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা জাতীয় পরিষদে অধিকসংখ্যক আসন লাভ করবে। প্রেসিডেন্ট আরো ঘোষণা করেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট হওয়ার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী নন। ৩১শে ডিসেম্বর তিনি ঢাকায় প্রেসিডেন্ট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "দিগন্তে আশার আলো দেখিতেছি, গণমানসে শুভ চেতনার উন্মেষে আনন্দিতও হইয়াছি।" নির্বাচন-প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ ক'রে ৫ই জানুয়ারী ১৯৭০ তারিখে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন।

প্রেসিডেন্টের ঢাকা সফর

এর আগে ১৫ই ডিসেম্বর ('৬৯) শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষিত নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ক'রে শোষণহীন

সমাজব্যবস্থা কায়েমে আওয়ামী লীগকে সাহায্যের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সে দিন নিউমার্কেট আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা দান করতে গিয়ে তিনি বলেন, "গত ২২ বৎসরে এক শ্রেণীর লোক শোষণের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক বনিয়াছেন। অপর দিকে এক শ্রেণীর লোক ভিক্ষার ঝুলি লইয়া পথে নামিয়াছেন। ... ... সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯]

প্রদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে সাংস্কৃতিক বিকাশেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, নইলে জাতীয়জীবনে পূর্ণাঙ্গতা আসতে পারে না। সে কথা শেখ মুজিব ভালো করেই জানেন এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। আর এই বিশ্বাসের বলেই তিনি ১৬ই ডিসেম্বর ('৬৯) রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের জন্য 'বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে'র প্রতি আহ্বান জানান। সেদিন সন্ধ্যায় 'বাংলা একাডেমী'তে আয়োজিত একটি ঘরোয়া বৈঠকে 'গ্রামোফোন কোম্পানী অব ঈস্ট পাকিস্তান' কর্তৃক পাকিস্তানে প্রস্তুত রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথম মৌলিক রেকর্ডের সেট বঙ্গবন্ধুকে উপহার দেয়া হয়। খবরের কাগজে সংবাদটি এইভাবে পরিবেশিত হয়েছেঃ "তিনি পশ্চিম বঙ্গের বই পুস্তক পূর্ববঙ্গে প্রকাশের উপর বিধি নিষেধ তুলে নেয়ার জন্যও দাবী জানান।" বঙ্গবন্ধু বলেন, "যে জাতি তাহার কবি-সাহিত্যিককে সম্মান করে না, সে জাতি কখনও সমৃদ্ধ হইতে পারে না।" তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনাবলীতে কোটি কোটি বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাইয়াছেন।" শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, "বিগত ২২ বৎসর যাবৎ বাংলার সংস্কৃতি ও ভাষাকে দমাইয়া রাখার বহু ষড়যন্ত্র হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সে সব ষড়যন্ত্র রুখিয়াছে।"

বাঙ্গালী মানসিকতার বিকাশের প্রশ্নে শেখ মুজিব

তিনি আরো বলেন যে, "শোষকচক্র ভাবিয়াছিলেন যে, জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখিতে হইলে উহার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর বিভিন্ন পর্যায়ে হামলা নামিয়া আসে।" এ প্রসঙ্গে তিনি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা দান করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, সংস্কৃতির উপর হামলার কারণেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর হামলা আসে। রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়া বাংলা সঙ্গীত যে অসম্পূর্ণ এ কথাও তিনি উল্লেখ করেন। শেখ মুজিব আবেগজড়িত কণ্ঠে এ কথা বলেন যে, অন্যান্য বাঙ্গালীর জীবনে এবং বাংলা সাহিত্যের ন্যায় তাঁর জীবনেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপরিসীম। জেলখানার নির্জনে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' তাঁহাকে প্রেরণা যোগাইত বলিয়া শেখ মুজিব উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, জেলে 'সঞ্চয়িতা' হইতে 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা' কবিতা পাঠ করিয়া তিনি প্রেরণা লাভ করিতেন।

শাহজাদপুরে এবং শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ীর যথাযথ সংরক্ষণ না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। ... শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের নদ-নদী, আবহাওয়া, জলবায়ু, মানুষ ও প্রকৃতি এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করার জন্য শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান জানান। ... শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, আর বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির উপর কোন হামলা হইতে দেওয়া হইবে না এবং এখন হইতে পূর্ব পাকিস্তান অবশ্যই বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯]

৬-দফা ঃ শ্রমিক সমাজের সমর্থন

আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রদেশের শ্রমিক সমাজ সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন রায় ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে পল্টন ময়দানে জাতীয় শ্রমিক লীগ আহূত এক জনসভায় শ্রমিক সমাজ আওয়ামী লীগের পক্ষে তাদের রায় ঘোষণা করেন। এ সম্পর্কে পরদিন সংবাদপত্রে লেখা হয় ঃ "স্বাধীনতা পরবর্তী তেইশ বছরের প্রথম দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিলগ্নে অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর সর্বপ্রথম সুযোগে গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাজধানী ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে জাতীয় শ্রমিক লীগ আয়োজিত এক বিরাট শ্রমিক জনসমাবেশে বাংলার বঞ্চিত গণমানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির নির্ভুল উপায় হিসাবে ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও বন্যা সমস্যার সমাধানের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় ঘোষণা করা হয়।"

[ঐ, ২রা জানুয়ারী, ১৯৭০]

আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব জনসমর্থন লক্ষ্য ক'রে কোন কোন রাজনৈতিক দল হতাশ হয়ে পড়ে। নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই সব দলের কর্তাব্যক্তিগণ আওয়ামী লীগের নিকট নির্বাচনী ঐক্যের আহবান জানাতে থাকেন। রিকুইজিশনপন্থী ন্যাপ (ওয়ালী গ্রুপ) '১১-দফার' ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনাসহ গণদাবী আদায় ও আন্দোলনের স্বার্থে ভাসানী ন্যাপ, আওয়ামী লীগ ও অপরাপর গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য-জোট গঠনের আহবান জানান।

ঐক্যজোট ও শেখ মুজিব

শেখ মুজিব এই আহবানকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেন। ১৯৭০ সালের ৪ঠা জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ২২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রমনা পার্কে আয়োজিত এক পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দান কালে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'তাঁর দল নির্বাচনী ঐক্যে বিশ্বাসী নয়।'

পত্রিকার উদ্ধৃতি এইরূপ ঃ "কোন কোন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠনের নামে ধূম্রজাল সৃষ্টির প্রচেষ্টার জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, জগাখিঁচুড়ি যুক্তফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়ী হইয়া ক্ষমতাসীন হওয়া গেলেও জনসাধারণের কোন উপকার করা যায় না। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের পরিণতিই ইহার প্রমাণ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। শেখ সাহেব বলেন, তদানীন্তন সরকারের শিকার যুক্তফ্রন্টের কোন কোন দলের কতিপয় নেতার গণবিরোধী ভূমিকার দরুনই যুক্তফ্রন্ট জনগণের জন্য প্রত্যাশিত কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করিতে পারে নাই। তাই, তিনি বলেন, নিজস্ব কর্মসূচী লইয়া জনগণের সামনে হাজির হওয়াকেই আওয়ামী লীগ সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে বাছিয়া নিয়াছে। আওয়ামী লীগ চায়, জনগণের ঐক্য।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭০]

বক্তৃতাকালে বঙ্গবন্ধু ঐক্যজোটের বিরোধিতা ক'রে আরো বলেন, "১৯৬৬ সালে যখন ৬-দফার সংগ্রাম দুর্বার হয়ে উঠে, তখন এক শ্রেণীর অতিপ্রগতিবাদী ইহার মধ্যে 'বিদেশী হস্তের কারসাজী' আবিষ্কার করিয়াছিল। 'আমি প্রেসিডেন্ট হইলে শেখ মুজিবকে গুলী করিয়া

মারিতাম' বলিয়া তাহাদের কেহ কেহ ঘোষণা করিয়াছে, আর ৬-দফার জন্য যখন বাংলার মানুষ গুলী খাইয়া রাজপথে লুটাইয়া পড়িয়াছে, তখন ইহারা আইয়ুব খানের দালালী করিয়াছে।"

[ঐ]

৩রা জানুয়ারী ('৭০) নবাবজাদা নসরুল্লাহ শেখ মুজিবকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ও মওলানা ভাসানীকে 'হনুমান' বলে অভিহিত করেছিলেন। এর জবাবে শেখ মুজিব ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বলেন ঃ "ছয়-দফা আন্দোলনের দায়েই কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বন্দী থাকাকালে নবাবজাদা আমার কাছে ধরণা দিয়াছিলেন দেশের সমস্যা সমাধানে একজন 'দেশপ্রেমিকের' সাহায্যের জন্য। আজ সেদিনের সেই 'দেশপ্রেমিক' লোকটি নবাবজাদার কাছে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হইয়া গেলেন কেমন করিয়া ?"

[ঐ]

একই দিনে নারায়ণগঞ্জের এক বক্তৃতাসভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ নসরুল্লাহর কঠোর সমালোচনা ক'রে বলেন যে, "শোষিত মানুষের বিজয়ের সম্ভাবনায় নসরুল্লাহ প্রমাদ গণিতেছেন।"

[ঐ]

১৯৭০ সালে ১১ই জানুয়ারী তারিখে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্টনে গণসমাবেশের মহাসমুদ্রকে সাক্ষী রেখে শোষক, কুচক্রী ও ভাওতাবাজদের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। পরদিন দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছেন ঃ

"তদানীন্তন গভর্নর মোনেম খাঁ একদিন ঘোষণা করেছিলেন, ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবকে 'আর দিনের আলো দেখিতে দিব না। পল্টনে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আর ৬-দফার ব্যাখ্যাও করিতে হইবে না।' দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর পর মোনেমের সেই ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জবাব দিয়াছেন ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং। জবাব দিয়াছেন জাগ্রত বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ, আর জবাব দিয়াছে ঢাকার সেই ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের, মাতা-ভগিনী-শিশুর রক্তের বিনিময়ে

অর্জিত অধিকার বলে ৬-দফার প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমান সেই 'নিষিদ্ধ' পল্টনে দাঁড়াইয়াই গতকাল বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই 'নিষিদ্ধ' পল্টনে সমবেত হইয়াই সেদিনকার স্বৈরাচারী শাসকের অস্ত্রের ভাষার লক্ষ্য ছিল যে ৬-দফা, সে ৬-দফার বাণীই শুনিয়াছেন তাঁহারা শেখ মুজিবের কণ্ঠে। আর সেই পল্টনের অবাক-করা সর্বকালের বৃহত্তম জনসমাবেশকে উদ্দেশ করিয়া শোষক, কুচক্রী ও রাজনৈতিক ভাওতা-বাজদের মুখোশ এক এক করিয়া উন্মোচন করিয়াছেন বঙ্গবন্ধু। আগামী নির্বাচনকে উপলক্ষ করিয়া নিজ দলের কর্মসূচী, মত ও পথ সর্বসাধারণ্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন তিনি।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭০]

এই দিনের জনসমাবেশের একটি চমৎকার চিত্র অপর একটি দৈনিকে পরিবেশিত হয়েছে ঃ "জনতার পদভারে গর্বিত হওয়ার জন্য উন্মুখ পল্টন ময়দান গতকাল রোববার জনতাকে ঠাঁই দিতে গিয়ে হার মেনেছে। জনতার তুলনায় বৃহদায়তন পল্টনকেও মনে হচ্ছিল—ছোট সে মাঠ, আর ঠাঁই নেই। সামনে-পেছনে, ডাইনে-বামে তাকালে দেখা যায় সারির পর সারি। দূরে আরো দূরে ছেয়ে গেছে। বিন্দু বিন্দু মাথা—তারপরও ধূ ধূ বিন্দু—সেই বিন্দু মিলে মিশে প্রথমে অযুত, তারপর লক্ষ—নিযুত বিন্দু—ভৈরব গর্জনে মুখরিত জনতার উদ্বেল সমুদ্র গড়েছে।

পল্টন গতকাল মহাসমুদ্র সৃষ্টিতে নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মাঠ উপচে পড়েছে জনতায়। তারপর হাজারে হাজারে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে ঢাকা স্টেডিয়ামের দোতালায়, তেতালায়, জিন্নাহ্ এভেনিউর দেওয়ালে আর পার্শ্ববর্তী প্রাসাদগুলোর শীর্ষে।

তারা এসেছে কাতারে কাতারে। এসেছে অসংখ্য মিছিল ক'রে, 'জাগো জাগো—বাঙালী জাগো' ধ্বনি তুলে। জোয়ারের মত এসে মিলেছে। মিছিলের পর মিছিল এসেছে নারায়ণগঞ্জ, আদমজী, ডেমরা, কাঞ্চন, শ্রীপুর, কলাতিয়া, সুভড্যা, তেজগাঁ, মীরপুর থেকে। এসেছে ট্রাকে, এসেছে বাসে চেপে। এসেছে ড্রাম বাজিয়ে, বাজি পুড়িয়ে, বহু বিচিত্র ব্যানার-ফেস্টুন বহন ক'রে ঢাকা নগরীর প্রতি মহল্লা থেকে। ... "

[দৈনিক পাকিস্তান, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭০]

তুমুল করতালি, তোপধ্বনি ও পটকা আওয়াজের মধ্যে বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন ঃ "আওয়ামী লীগ চায় কৃষকের, শ্রমিকের রাজত্ব স্থাপন করতে। তাঁর দল দেশের সকল মূল শিল্পসহ ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসায় জাতীয়করণ করবে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত চাষীর জমির কোন খাজনা থাকবে না এবং দশ বছর পর্যন্ত কৃষকের জমির খাজনা মওকুফ করা হবে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭০]

শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন মাতা, ভ্রাতা ও শিশু হত্যাকারী আইয়ুব-মোনেম চক্র যে বাংলার জনগণের রক্ত শোষণ ক'রে কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে উপার্জন করেছেন, তার বিচার যদি ইয়াহিয়া সরকার না করেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে সে কাজ সম্পন্ন করবে। তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন, "হত্যাকারী কনভেনশনীদের আমরা ক্ষমা করব না, তাদের ক্ষমা করলে শহীদ আসাদ, জহুর, মতিউরসহ অসংখ্য শহীদের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭০]

শেখ মুজিবের ব্যাপক গণসংযোগ, সংগঠন ও বজ্রকণ্ঠের ভাষণ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। জানুয়ারীর ১৬ তারিখে ময়মনসিংহের সার্কিট হাউজ ময়দানে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, দেশে জনগণের সরকার কায়েম হ'লে মোনেন খাঁকে ক্ষমা করা হবে না, তাঁর সমস্ত সম্পত্তির যথাযথ হিসেব করা হবে।

বঙ্গবন্ধু সেদিন "দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া বাংলাকে শোষণ ও বাঙ্গালীকে শাসন করার ন্যাক্কারজনক কলঙ্ক আবদুল মোনেম খানের জন্মভূমির অধিকার-সচেতন লক্ষ লক্ষ মানুষকে সামনে রাখিয়া দেশময় এক শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭০]

তিনি বলেন, "আমাদের আদর্শ মস্কো হইতে আসিবে না, পিকিং হইতে আসিবে না, আমেরিকা হইতে আসিবে না, আমাদের আদর্শের উদ্ভব ঘটিবে আমার দেশের পলিমাটি হইতে।"

[ঐ]

এদিকে জামাতে ইসলামী নামে একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল জানুয়ারীর ১৮ তারিখে ('৭০) জনসভার নাম ক'রে পল্টন ময়দানে জেহাদ ঘোষণা করলো। ঐ দিন "রাজনৈতিক আচরণ সংক্রান্ত ৬০ নং সামরিক বিধির কতিপয় সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন করিয়া প্রকাশ্য জনসভায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষায় যথেচ্ছ আক্রমণ চালাইতে থাকিলে যখন সভায় আপত্তি উত্থাপিত হয়, তখন নিরীহ শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর লাঠিসোটা লইয়া জামাতে ইসলামীর তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ঊর্ধ্বশ্বাসে ঝাঁপাইয়া পড়িলে বিক্ষুব্ধ জনতার রোষানলে গত-কল্যকার পল্টন ময়দানের জামাতে ইসলামীর জনসভা লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় এবং জামাতের তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ক্রুদ্ধ জনতার মধ্যে দুই ঘন্টাব্যাপী খণ্ডযুদ্ধে অন্যূন সাড়ে চার শ'জন আহত হইয়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালে নীত হন।"

নির্বাচন বানচালের প্রচেষ্টায় জামাতে ইসলামের জেহাদ

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৭০]

জামাতের জনসভায় সুপরিকল্পিতভাবে গোলযোগ ও মারধোর করবার এই আয়োজন ছিল উদ্দেশ্যমূলক। আসন্ন নির্বাচন বানচালের জন্যই এমন একটি পরিস্থিতির অবতারণা করা হয়।

পূর্ব বাংলার গণমানসে আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র আধিপত্য দেখে উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলাম আঁতকে উঠেছিল। ধর্মের নামে এতকাল যে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী শোষণ ক'রে আসছিল, আগামী দিনগুলোতে তার পথ রুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম লীগ বিগত দিনগুলোতে শাসন কুক্ষিগত ক'রে রাখলেও তাদের তাঁবেদার হিসেবে যে সমস্ত ধর্মান্ধ রাজ-নৈতিক দল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের বিরুদ্ধে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে এসেছেন, জামাতে ইসলাম আসলে সেই সব দলের অন্যতম। ইস্কান্দার, আইয়ুব, ইয়াহিয়া বা সবুর-মোনেমের সঙ্গে মওলানা মওদুদী, মিয়া তোফায়েল আহমদ বা গোলাম আজম-আবদুর রহীমের কোন পার্থক্যই ছিল না। আর ছিল না বলেই জামাতের নেতারা ধর্মান্ধতায় উন্মত্ত হয়ে এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে ক্রীড়নক হিসেবে কাজ ক'রে

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের পথটি বারবার রুদ্ধ করতে চেয়েছে। ১৯৫৮ সালে আমরা দেখেছি যে, কি ভাবে আইনসভায় বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ সৃষ্টি ক'রে এঁরা আইয়ুবকে ডেকে এনেছেন।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতি হিসেবে গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি যখন প্রায় একরূপ সুনিশ্চিত, তখনই এঁরা চরম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সমগ্র সাফল্য বানচাল ক'রে ইয়াহিয়া খানকে ডেকে আনতে সাহায্য করেছেন। আজ আবার সুপরিকল্পিতভাবে জনসভা আহ্বান ক'রে আসন্ন নির্বাচন বানচালের চেষ্টা চালিয়েছেন।

জামাতে ইসলামী আহূত এই জনসভায় জামাত কর্মীদের ন্যক্কারজনক কার্যকলাপে জনগণ এতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যে, তারা সভামঞ্চ দখল ক'রে মঞ্চসহ সভার যাবতীয় সরঞ্জামে আগুন ধরিয়ে দেয়। জামাতের আমীর মওলানা মওদুদী সভার প্রধান বক্তা হলেও তাঁর পক্ষে সভাস্থলে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় নি। জামাতের হামলার ফলে আহতদের মধ্যে দুইজন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে।

এইভাবে নির্বাচনের পূর্বে একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে জনগণকে বিভ্রান্ত করার একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র কায়েমী স্বার্থবাদী দলগুলোর পক্ষ থেকে চলতে থাকে—জামাতের কার্যকলাপ তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। এই সব দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী তাঁদের মতলব হাসিলের সুযোগ সন্ধান করতে থাকলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ১৯৭০ সালের ২০শে জানুয়ারী বললেন ঃ "হাঙ্গামা সৃষ্টিকারিগণ জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে।" উক্ত ঘটনাসমূহকে কেন্দ্র ক'রে করাচীর দৈনিক 'মাশরিক' ঘোষণা করলো যে, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দুর্ঘটনাসমূহের মধ্যে হিন্দুদের হাত রয়েছে। শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র লাল রং দিয়ে ছাপিয়ে তাতে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন' লিখে তারা পূর্ব পাকিস্তানের ইন্তেকাল ঘোষণা করতেও দ্বিধাবোধ করে নি। এধারার উস্কানিমূলক কাজ ও আচরণ দ্বারা দেশের অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করাই যে শোষক মহলের উদ্দেশ্য ছিল সে বিষয়ে বিবেকবান কারো মনে কোন সন্দেহ রইলো না। কিন্তু জাগ্রত জনতাও এজন্য প্রস্তুত

ছিল। পল্টনের বিরাট জনসমাবেশে (২৫শে জানুয়ারী) ছাত্রনেতৃবৃন্দ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। ১১-দফা সপ্তাহের সমাপ্তি দিবসে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য, ডাকসু সহ-সভাপতি এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দান করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য—আবদুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য আ. স. ম. আবদুর রব, ছাত্র লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব খালেদ মোহম্মদ আলী ও জনাব আবদুর রাজ্জাক, ছাত্রলীগের সহ-সভানেত্রী ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যা রাফিয়া আখতার ডলি, ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান এবং সভাপতি স্বয়ং। সভাপতি তরুণ ছাত্রনেতা, উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের অগ্নিসারথি। তিনি তাঁর জ্বালাময়ী ভাষায় দেশের কুচক্রী ও কায়েমীস্বার্থবাদীদের সতর্ক ক'রে দেন। এই দিনের সকল বক্তার মূল কথা ছিলঃ "নির্বাচন বানচালের যে কোন চক্রান্ত এদেশের সংগ্রামী জনতা রুখিয়া দাঁড়াইবে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭০]

যা হোক, জামাতে ইসলামীর এই সুপরিকল্পিত ও কাপুরুষোচিত নৃশংস হামলার কঠোর নিন্দা ক'রে পরদিন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রে বিবৃতি দান করেন। ১৮ই জানুয়ারী তারিখে জামাতের গুণ্ডামীর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ১৯শে জানুয়ারী ('৭০) ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়। এ সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১-দফা সপ্তাহ পালন করছিল।

ঐ দিন মওলানা ভাসানী সন্তোষে এক বক্তৃতায় সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সারা দেশে লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের আহ্বান জানান।

শেখ মুজিব তখন তাঁর ভাগ্নের বিয়েতে যোগ দেওয়ার জন্য খুলনায় অবস্থান করছিলেন। ২১শে জানুয়ারী তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন এবং

২৩শে জানুয়ারী কুমিল্লার এক জনসভায় বক্তৃতা দান করতে গিয়ে বলেন, 'খাস মহলের জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে।'

[ঐ, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭০]

ছাত্র সমাজ ২৪শে জানুয়ারী গণ-অভ্যুত্থান দিবস পালন করে। ঐ দিন জাগ্রত ছাত্র সমাজ শহীদানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করে।

১৯৭০ সালের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচার অভিযান উপলক্ষে রাজশাহীতে গমন করেন। ঢাকা থেকে যাওয়ার পথে পাবনার নগরবাড়ীতে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "ধর্ম ও সংহতির জিগির তুলিয়া যাহারা পাকিস্তানে শোষণতন্ত্র কায়েম করিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম—দেশের কোন এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নাই।"

[ঐ, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৭০]

পরদিন ৩০শে জানুয়ারী রাজশাহীতে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় বঙ্গবন্ধু পুনরায় বলেন ঃ "আমার সংগ্রাম কায়েমী স্বার্থবাদী, শোষক ও জালেমদের বিরুদ্ধে। আপনারাও এ সংগ্রামে শরিক হউন—যে শোষক ও জায়গীরদারদের দল বাইশ বছর ধরিয়া আপনাদের রক্ত চুষিয়া খাইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।

[ঐ, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭০]

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় ঃ প্রথম ঘোষণা

উক্ত জনসভায় তিনি অবিলম্বে ইউনিয়ন কাউন্সিল বাতিল ক'রে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত বোর্ড গঠনের দাবী জানান। রাজশাহীর এই বিরাট জনসভায় বঙ্গবন্ধুকে রাজশাহীবাসীর পক্ষ থেকে যে মানপত্রটি প্রদান করা হয় সে'টি লিখবার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল আমার ওপর। এ জন্য বিশেষ কৃতিত্ব নেবার উদ্দেশ্যে আমি এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করছি তা' নয়, উল্লেখের মত ঘটনাও এ'টি নয়। যে কারণে আমি উল্লেখ করছি তা' হ'ল এই যে, উক্ত মানপত্রে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সার্থক সমন্বয়ের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এবং বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছিল। আমার এখনো মনে

আছে, লেখা হয়েছিল, সমাজতন্ত্রবিহীন গণতন্ত্র সমাজে স্বার্থবাদী শ্রেণী তৈরী করে এবং সে কারণেই এই গণতন্ত্র বুর্জোয়া শোষণতন্ত্রের নামান্তর—এর মাধ্যমে সমাজবাদী শক্তির পোষকতা করা হয়, অন্যপক্ষে গণতন্ত্রবিহীন সমাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর। এতে সত্যভাষণের অধিকার বিলুপ্ত হয় এবং স্বৈরাচারী শক্তিই প্রাধান্য বিস্তার করে। এই দুই কোটির সমন্বয়ের মাধ্যমেই একটি আদর্শ ব্যবস্থাপনার উদ্ভব সম্ভব।

কথাগুলো বঙ্গবন্ধুর হৃদয়স্পর্শ করেছিল। আসলে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-ধারাও সুদীর্ঘকাল হ'ল এই আদর্শেই উজ্জীবিত। জনসভায় তাই তিনি বলেছিলেন যে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সার্থক সমন্বয়ের মাধ্যমেই বিশ্বের অনুন্নত মানুষের, বিশেষ ক'রে আমাদের সমাজের বিপুল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। আমাদের আজ এই ধারায় চিন্তা করতে হবে। আমরা এই সমন্বিত আদর্শেই আমাদের সমাজকে গড়ে তুলতে চাই।

কতদূর সত্য জানি না, সম্ভবতঃ রাজশাহীর এই জনসভায়ই তিনি তাঁর এই মহৎ আদর্শের কথা প্রথম একটি ঘোষণার আকারে প্রকাশ করেন। এর পূর্বে কোথাও তিনি এমনভাবে এই আদর্শের কথা ঘোষণা করেছেন বলে আমার জানা নেই। এদিক থেকে জনসভাটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

অবশ্য খবরের কাগজে বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা বিশেষ গুরুত্বলাভ করে নি। কিন্তু সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নিশ্চয়ই ঘটনাটি স্মরণ থাকবার কথা। বঙ্গবন্ধুর এই আদর্শের সূত্র ধরে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় সম্পর্কে প্রায় পুরো এক ঘণ্টা আলোচনা করেন জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বস্তুতঃ সৈয়দ সাহেবের সেদিনকার আলোচনার মূল বিষয়বস্তুই ছিল গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়। আর তাঁর এই আলোচনা এতই জ্ঞান-গর্ভ হয়েছিল যে, পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় মহলে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ—এই দুটো বিষয়ই ছিল সকলের আলাপের বিষয়। উল্লেখ প্রয়োজন যে, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবও তাঁর আলোচনায় এই সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিন আহমদ আমার বাসায় এলেন—বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। আমি তখন বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও অধ্যক্ষ

এবং শাহ মখদুম ছাত্রাবাসের প্রাধ্যক্ষ। বঙ্গবন্ধু সহাস্যে আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন. "আমি বুঝতে পেরেছি, মানপত্রটি আপনি লিখেছেন —ঠিক বলিনি?"

অতঃপর আমাদের মধ্যে যে আলোচনা হ'ল তার মূল বিষয়ই ছিল গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমন্বয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অধ্যাপকও এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। যদিও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম বেশ কয়েকজনকে, কিন্তু উপস্থিতির সংখ্যা ছিল নগণ্য। সৎসাহসের অভাব। আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ খুব হিসেব ক'রে চলেন।

যাহোক, পরবর্তীকালে এই দুইটি আদর্শ স্বাধীন বাংলাদেশের চারটি মূলনীতির অঙ্গীভূত হয়েছে—বঙ্গবন্ধুর সুদীর্ঘকালের স্বপ্ন আমাদের শাসনতন্ত্রে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

একটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার যে, ইসলামপন্থী সকল রাজনৈতিক দলই স্বার্থের দ্বারা বা কায়েমী স্বার্থবাদীদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়েছিল একথা বলা যায় না। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ছিল এর ব্যতিক্রম। ১৯৭০ সালের ৩১শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে প্রগতিশীল ও উদারপন্থী মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের উদ্যোগে আয়োজিত এক জনসমাবেশে নিখিল পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মওলানা মুফ্‌তি মাহমুদ স্বার্থান্ধ ও ধর্মান্ধ একশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল আলেম কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী ৬-দফা এবং ১১-দফাকে ইসলামবিরোধী আখ্যাদান এবং ৬-দফা ও ১১-দফার উত্থাপক ও সমর্থকদের কাফের ফতোয়াদানকে দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইসলামের প্রতি বেইমানী করার শামিল বলে অভিহিত করেন।

মওলানা মুফ্‌তি মাহমদ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ন্যায্য দাবীর সংগ্রামে জমিয়ত অংশ গ্রহণ করবে বলে জনসভায় ঘোষণা করেন। জমিয়তের অন্যতম নেতা মওলানা মহিউদ্দীন তাঁর ভাষণে প্রতিক্রিয়াশীল আলেমগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে বলেন যে, 'ইসলাম পছন্দ' এবং 'ইসলাম দুশমন' এই দু'টি শ্রেণী তৈরী ক'রে তারা সংঘর্ষের প্রচারণা চালাচ্ছে। তাদের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ ক'রে তিনি বলেন যে,

'পুঁজিবাদ' এবং 'ব্যুরোক্রেসির আঁতাতের বিরুদ্ধে এটাই হবে জনগণের শেষ সংগ্রাম।

সভাপতির ভাষণে পীর মোহসেন উদ্দিন বলেনঃ "আলেম হয়ে যারা স্বার্থের পিছনে ছুটে, সেই সব তল্পিবাহকের সঙ্গে আপোষ নাই।" তিনি বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার কথা উঠলেই এই সব আলেমরা 'পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হইতে চায়', 'ভারতীয় চরেরা ভাষা আন্দোলন ক'রে', 'কাশ্মীর বিপন্ন' প্রভৃতি জিগির তুলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে।" তিনি জনগণকে তথাকথিত এই আলেমদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য এক সময়োচিত আহ্বান জানান।

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০]

১৯৭০ সালের ৩০শে জানুয়ারী রাজশাহীতে বিপুল জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ প্রদান করেন তা' নানাদিক থেকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে, একথা পূর্বেই বলেছি। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য তিনি কতকগুলো চমৎকার পথনির্দেশ এই সভায় দান করেন। তিনি বলেনঃ "আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সাফল্য লাভ করলে পাট ব্যবসা, ব্যাঙ্ক, ইন্সুরেন্স কোম্পানী ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহ জাতীয়করণ করবে। এছাড়া কৃষকেরা শিল্পপতিদের মত কর অবকাশ ভোগ করবে, ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত ভূমি-রাজস্ব মওকুফ করা হবে, দশ বছর কোন ভূমি-রাজস্ব নেওয়া হবে না, তামাক ও আখের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে এবং শ্রমিকরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ পাবে।"

৬-দফা ইসলাম বিরোধী বলে যারা অপপ্রচার চালাচ্ছে শেখ মুজিব উক্ত ভাষণে তাদেরকে হুঁশিয়ার ক'রে দেন। স্বায়ত্তশাসন, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে নির্বাচনে জয়ী হলে ৬-দফা ভিত্তিক ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন ক'রে এদেশের বঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে তিনি সক্ষম হবেন বলে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন।

[দৈনিক পাকিস্তান, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০]

নূরুল আমীন সারা জীবন কায়েমী স্বার্থবাদীদের মনোরঞ্জন করেছেন। তাঁর নিজস্ব নীতিবোধ বলে কিছু কোনদিনও ছিল না। নির্বাচনের সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো, পূর্ব বাংলার জনগণের জাগ্রত

চেতনা এবং শেখ মুজিবের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে তিনি ততই চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। সে কারণেই যন্ত্রতন্ত্র তিনি আওয়ামী লীগকে আক্রমণ ক'রে নিজের নেতৃত্বকে সক্রিয় করতে প্রয়াস পেলেন। ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৭০) পল্টনে আয়োজিত পি. ডি. পি.-র জনসভায় আওয়ামী লীগ কর্মীরা গোলযোগ সৃষ্টি করেছে বলে পি. ডি. পি. প্রধান নূরুল আমীন সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে এক অভিযোগ আনয়ন করেন। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এই মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বিবৃতিতে জানান যে, "নিজেদের দোষত্রুটি ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা আওয়ামী লীগের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। আওয়ামী লীগের কর্মীদের বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টির অভিযোগকে তিনি 'ভিত্তিহীন' এবং 'প্রতিহিংসাপরায়ণ' বলে মন্তব্য করেন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০]

১৯৭০-এর ৩রা ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব সিলেট স্টেডিয়ামের এক বিশাল জনসমুদ্রে ভাষণ দেন। সিলেট যাবার পথে তাঁর ট্রেনের গতিরোধ হয় প্রায় সর্বত্র। জনগণ তাঁর মুখ থেকে দুটো কথা শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ২রা ফেব্রুয়ারী পি. ডি. পি. কর্তৃক আনীত অভিযোগ সম্পর্কে সিলেটের জনসভায় বঙ্গবন্ধু একটি চমৎকার বিশ্লেষণ প্রদান করেন। আওয়ামী লীগ কর্মীগণ কর্তৃক গোলযোগ সৃষ্টি সম্পর্কে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, "আমার ও আমার দলের উপর দোষারোপ করা এদেশের পায়ের তলায় মাটিশূন্য এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে।"

[ঐ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০]

শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন যে, যাঁরা তাকে ভালবাসেন, তাঁর ৬-দফা এবং ছাত্রদের ১১-দফায় যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা কখনও অন্যের জনসভায় গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারেন না।

শেখ মুজিব তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো, ফজলুল কাদের চৌধুরী, নবাবজাদা নসরুল্লাহদের জনসভায় গোলযোগ হচ্ছে, শ্রমিক নেত্রী কানিজ ফাতিমার দলের উপর হামলা চালানো হয়েছে। এ সব ঘটনা কারা ঘটাচ্ছে তিনি

তা' জানতে চান। তিনি পল্টনে জামাতের জনসভায় গোলযোগ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকার রিপোর্টারদের অভিমতের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেন।

শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন, গণধিকৃত তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মুখে আসন্ন নির্বাচনে তাদের নিশ্চিত ভরাডুবি অনুভব ক'রে নিজেরাই নিজেদের জনসভায় ভাড়াটিয়া লোকের দ্বারা গোলযোগ সৃষ্টি ক'রে আওয়ামী লীগের উপর দোষ চাপাচ্ছে। তিনি জনসাধারণকে এই সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দেন। ১৯৭০-এর জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় শেখ মুজিবের ব্যাপক (ঝটিকা) সফর লক্ষ্য করা যায়। জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের মধ্য-সময় পর্যন্ত শেখ মুজিব রাজশাহী, টাঙ্গাইল, সিলেট, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালী, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, সুনামগঞ্জ, বগুড়া, নওগাঁও, রংপুর এবং দিনাজপুরে, বিভিন্ন জনসভায় ভাষণ দান করেন। এ সবই ছিল তাঁর নির্বাচনী প্রচার অভিযান এবং সাংগঠনিক তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র পূর্ব বাংলাকে তিনি স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ৬-দফাভিত্তিক অধিকার অর্জনের সপক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। এই শক্তি সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমবেত শক্তি—এই শক্তি গণতান্ত্রিক চেতনায় এক জাগ্রত শক্তি। শেখ মুজিব এই শক্তির পশ্চাতে এক মহানায়ক।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সমর্থন লাভের ওপরেও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে লাহোরে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে দলীয়-নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘোষণা করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান বলেন, "পল্লীবাসীর অধিকতর কল্যাণ সাধনকল্পে তাঁহার দল দেশের দুই অংশের দুইটি প্রধান অর্থকরী ফসল পাট ও তুলা-বাণিজ্যকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত করিয়াছে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০]

এ ছাড়া আওয়ামী লীগ যে সাড়ে ১২ একর জমির খাজনা (ভূমি-রাজস্ব) সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী সে-কথাও জনাব কামরুজ্জামান জোর দিয়ে ঘোষণা করেন।

পূর্ব বাংলার বর্ষীয়ান নেতা মওলানা ভাসানী কোন দিন কোন অবস্থাতেই তাঁর নিজস্ব পথে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে পশ্চাৎপদ হন নি। যখন তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, নির্বাচনে তাঁর দলের বিজয়ের সামান্য সম্ভাবনাও নেই, তখন তিনি তাঁর নিজস্ব পথেই যাত্রা শুরু করলেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সন্তোষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তাঁর বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার বাস্তবায়ন এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সরকারকে বাধ্য করার জন্য ১২ই এপ্রিল থেকে জেহাদ এবং মে থেকে গণবিপ্লব শুরু করবেন বলে সংকল্প ঘোষণা করেন। বিপ্লবের চেতনা মওলানা ভাসানীর সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে বিরাজমান —এই চেতনাই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রেণীসংগ্রাম এসবের কোন বৈজ্ঞানিক ধারণা তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি বলেই তাঁর সমস্ত সাধনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর জেহাদ, গণবিপ্লব সে কারণেই জনমনে এখন আর কোন রেখাপাত করে না। মওলানা ভাসানীর জেহাদ বা গণবিপ্লবের প্রতি কোন-রূপ ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আওয়ামী লীগের কার্যকলাপ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলতে থাকলো।

সকল চক্রান্ত সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি বিশেষ সতর্ক-তার সাথে অগ্রসর হতে থাকেন। ১৯৭০-এর ৬ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের পোলো গ্রাউণ্ডে আয়োজিত এক বিশাল জনসমুদ্রে শেখ মুজিব ভাষণ দেন। এই বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশে ভাষণদান কালে শেখ মুজিব নির্বাচন বানচালের প্রচেষ্টায় লিপ্ত কুচক্রী মহল, গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি এবং একশ্রেণীর আমলাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, "আইয়ুব-মোনেমের বুলেট-বেয়নেটকে যারা পরোয়া করে নাই, দা-কুড়াল আর ঢাল-তলোয়ারের ভয় দেখাইয়া বাংলার সংগ্রামী গণ-মানুষকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রাম হইতে বিচ্যুত করা যাইবে না। তিনি ঘোষণা করেন, 'আমরাও করেছি পণ, হতেই হবে নির্বাচন'।" [দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০]

পিকিংপন্থী ন্যাপ নেতা মওলানা ভাসানীর অনুরাগিগণ লাঠি-দা-কুড়ালের মহড়া প্রদর্শন ক'রে নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ ক'রে মওলানা ভাসানীর উদ্দেশে শেখ মুজিব বলেন, "আমি, আমার দল আর বাংলার গণমানুষ আইয়ুব-মোনেমের বুলেট-বেয়নেটকেও পরোয়া করে নাই—আপনার সাঙ্গপাঙ্গদের এই দা-কুড়াল-লাঠিও আমাদেরকে গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রাম হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।"

[ঐ]

জনগণের উদ্দেশে তাঁর সতর্কবাণীতে বঙ্গবন্ধু স্মিতহাস্যে উল্লেখ করেন যে একদল আমলা ২২ বছর থেকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, নির্বাচন বানচালের জন্য কুচক্রী মহলের শক্তি ও সহযোগিতা যোগাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি সাম্প্রতিক সন্তোষ সম্মেলনে ওয়াপদার বিজলী বাতির ব্যবস্থা, রাতারাতি কাঁচা রাস্তায় ইট বসানোর এবং একশত গরু ও আড়াই হাজার মণ চাউল প্রদান করার বিষয়টিও ঠাট্টাচ্ছলে উল্লেখ করেন।

উক্ত জনসমাবেশে শেখ মুজিব সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় লবণ প্রস্তুতের উপর কেন্দ্রীয় আবগারি কর বিলোপ এবং চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানার বার্ষিক চার কোটি টাকা লোকসানের কারণ অনুসন্ধানের জন্য হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত দাবী করেন।

চট্টগ্রাম থেকে খুলনায়। সমগ্র পূর্ব বাংলায় তিনি ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় জনমত সংগ্রহের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এবার তিনি খুলনার বিরাট জনসভায় ভাষণ দান করেন।

১৯৭০-এর ৮ই ফেব্রুয়ারী খুলনার সার্কিট হাউস ময়দানে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। খুলনার ইতিহাসের উক্ত সর্ববৃহৎ জনসমাবেশে শেখ মুজিব দেশের প্রতিরক্ষার জন্য ১৯৬৫ সালে সেপ্টেম্বরে গঠিত যুদ্ধ-তহবিলে সংগৃহীত কোটি কোটি টাকার হিসাব প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানান। এই সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সরকার কি করেছে তা' জানতে চেয়ে শেখ মুজিব বলেন, "মাতৃভূমি রক্ষার নামে সংগৃহীত জনসাধারণের এই অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলার অধিকার কাহারও

নাই। তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেন, আমি যুদ্ধ-তহবিলে সংগৃহীত অর্থের হিসাব চাই।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০]

এই জনসমাবেশে শেখ মুজিব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা ইসলামের একটি শিক্ষা বলে শেখ মুজিব অভিমত প্রকাশ করেন। দেশ ত্যাগ না ক'রে সংখ্যাগুরু ভাইদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি আকুল আবেদন জানান। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র যারা পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী শেখ মুজিব উক্ত জনসমাবেশে তাঁদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

খুলনা সার্কিট ময়দানে জনসমাবেশে ভাষণ দানের পর ৯ই ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব যশোর পৌঁছেন এবং ঐ দিন বিকালে স্থানীয় ঈদগাহ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের ষড়যন্ত্র ও তৎপরতা বন্ধ না করলে আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করবে বলে শেখ মুজিব সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানীরা সেনাবাহিনীতে শতকরা ১৫ ভাগের বেশী প্রতিনিধিত্ব পায় না বলে শেখ মুজিব জনসভায় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের জনৈক শিল্পপতি আওয়ামী লীগকে দুটো হেলিকপ্টার এবং দু'শো জীপ দেবে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদকে শেখ মুজিব 'উদ্দেশ্যমূলক' এবং 'মিথ্যা' বলে অভিহিত করেন। দায়িত্বহীন সাংবাদিকদের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ ক'রে তিনি বলেন, "যদি আপনারা বলতে না পারেন, মিথ্যা বলবেন না। অতীতে মিথ্যা রিপোর্ট করার পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আগুন নিয়ে খেলা করবেন না এবং সাংবাদিকসততা থেকে বিচ্যুত হবেন না।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০]

পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের কঠোর সমালোচনা ক'রে শেখ মুজিব বলেন, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর বিরোধী দলীয় বৈঠকে নবাবজাদা নসরুল্লাহ, মওলানা মওদুদী ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনরূপ আলোচনা করতেই অস্বীকার করেছিলেন। জামাতে ইসলামীর তীব্র সমালোচনা ক'রে শেখ মুজিব বলেন, আইয়ুব সরকারের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে জামাত নীরব থেকেছে। শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, তিনি চাইলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নিকট থেকে তিনিও সবচেয়ে অধিক সুযোগ-সুবিধা বা যে কোন পদ অর্জন করতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রীর গদি তাঁর জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি বাংলার জনগণের স্বার্থে পদের বদলে কারাগার বেছে নিয়েছিলেন। যে সব মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে, আসন্ন নির্বাচনে তাঁদেরকে বিতাড়িত করার জন্য শেখ মুজিব জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। ফারাক্কা সমস্যা সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, ভারত ফারাক্কা বাঁধের নির্মাণকার্য চালিয়ে যাচ্ছে অথচ তার প্রতিক্রিয়া থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য সরকার কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি।

পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু নদীর পানি বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নয়াদিল্লী গিয়েছিলেন এবং চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। শেখ মুজিব জানান, ফারাক্কা সমস্যা সম্পর্কে কিছু করা না হ'লে পূর্ব বাংলা মরুভূমিতে পরিণত হবে।

[দৈনিক পাকিস্তান, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০]

॥ এবার নোয়াখালীতে ॥

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব ভাষণ দেন। এই ভাষণে শেখ মুজিব ঘূর্ণিবাত্যা এবং জলোচ্ছ্বাসের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং ফসল রক্ষার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে বন-জঙ্গল সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

শেখ মুজিব বিকল্প ভূমির ব্যবস্থা না ক'রে সরকার কর্তৃক জনগণের জমি হুকুম দখলের রেওয়াজ বন্ধ ঘোষণা ক'রে অবিলম্বে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

বেগমগঞ্জের জনসমাবেশে শেখ মুজিব দেশবাসীর উদ্দেশে ঘোষণা করেন, "শোষক ও জালেমদের বিরুদ্ধেই আমার জেহাদ।" তিনি শুধু বঙ্গবন্ধু নন, তিনি শোষিত মানুষের বন্ধু—এ মানুষ বাংলার, এ মানুষ বিশ্বের।

দেশের সকল এলাকার জনগণের উদ্দেশে শেখ মুজিব তাঁর উক্ত ভাষণে সমবেদনা প্রকাশ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি উচ্চারণ করেন, "দেশের যে কোন অঞ্চলে যাহারাই শোষিত-বঞ্চিত হইতেছে তাহারাই আমার ভাই।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০]

১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিব ভাষণ দান করেন। এই জনসভায় তিনি প্রদেশের শিক্ষক সমাজের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে তাঁদের ভাতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ মুজিব চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী-দাওয়ার প্রতিও তাঁর অকুণ্ঠ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। শেখ মুজিব বলেন, দেশে বর্তমানে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। জনগণ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। তিনি অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে রেশনিং ব্যবস্থা, টেস্ট রিলিফ চালু এবং বকেয়া খাজনা ও ট্যাক্স আদায় বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে শেখ মুজিব এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন। এই সমাবেশে তিনি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দণ্ডাদেশ রহিত ক'রে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান। শেখ মুজিব ইউনিয়ন কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা কাউন্সিল বিলুপ্ত ক'রে অবিলম্বে 'লোকাল বডির নির্বাচন অনুষ্ঠান' দাবী করেন। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জে দুইদিন-ব্যাপী সফর শেষে শেখ মুজিব ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব লঞ্চযোগে ঢাকা থেকে চাঁদপুরে পৌঁছেন এবং চাঁদপুর কলেজ ময়দানে এক বিশাল জনসমুদ্রে ভাষণ দান করেন। এই জনসমাবেশে শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, ওয়ালীউল্লার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে বাংলাভাষাকে শুধু কাগজে কলমে নয়, প্রকৃতভাবে বাস্তব জীবনে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার ও তাঁদের আত্মত্যাগের আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। বিপুল করতালির মধ্যে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, "আগামীকালের শহীদ দিবসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বাংলার গণমানুষের পক্ষ হইতে আমি দাবী জানাইতেছি, মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যোগ্য মর্যাদা দিতে হইবে—বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোন হামলা বরদাস্ত করা হইবে না।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০]

২২শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব ঢাকা থেকে স্টীমারযোগে বরিশালে পৌঁছেন এবং স্থানীয় হেমায়েত উদ্দিন ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দান করেন।

স্বার্থবাদী রাজনৈতিক মহল সম্পর্কে জনগণের প্রতি এক সতর্কবাণীতে শেখ মুজিব বলেন, তারা লিয়াকত আলী ও ডঃ খানকে হত্যা করেছে, শেরে বাংলাকে 'অন্তরীণাবদ্ধ' রেখেছে, সোহরাওয়ার্দীকে জেলে পাঠিয়েছে, তাঁকে (শেখ মুজিব) মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্দশার কারণ ঘটিয়েছে। শেখ মুজিব তাদের প্রতি হুঁশিয়ার উচ্চারণ ক'রে বলেন, পুনরায় ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলে ফল মারাত্মক হবে! তাদের বিরুদ্ধে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে শেখ মুজিব পুনরায় ঘোষণা করেন। ঢাকা থেকে স্টীমারযোগে বরিশাল যাওয়ার পথে মুন্সীগঞ্জে ছাত্র ও জনতার অনুরোধে তাঁকে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করতে হয়।

২৩শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু পটুয়াখালীতে এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে

খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী এবং চট্টগ্রামের সমগ্র উপকূল-বর্তী এলাকা বরাবর বেড়ী-বাঁধ নির্মাণ ক'রে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন এবং ফসলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত লবণের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর আদায় বে-আইনী বলে অভিহিত ক'রে তিনি অবিলম্বে এই কর আদায় বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ফেব্রুয়ারী মাসের ২৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু সড়ক পথে ঢাকা থেকে ফরিদপুর গমন করেন। পথের মাঝে গোয়ালন্দে তিনি জনসাধারণের প্রাণঢালা সম্বর্ধনা লাভ করেন এবং সেখানে তাঁকে কিছুক্ষণ জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে হয়। পরে ফরিদপুর পৌঁছে রাজেন্দ্র কলেজ ময়দানে আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি পুনরায় বলেন যে, ক্ষমতায় গেলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হবে। পি. ডি. পি. প্রধান জনাব নূরুল আমীন জমির খাজনা মওকুফ করা হ'লে রাষ্ট্র অচল হয়ে পড়বে বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সে সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, এতে সরকারের যে ক্ষতি হবে তা' "যে সব ভুঁড়িওয়ালা বহুদিন হইতে ট্যাক্স হলিডে ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের উপর আরও বেশী কর ধার্য করিয়া" পূরণ করা হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি জনাব নূরুল আমীনকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, পৃথিবীর ১৩৭টি দেশের মধ্যে পাকিস্তান ও ভারতেই শুধু জমির খাজনা আদায় করা হয়। তিনি বলেন, রাষ্ট্র জনসাধারণের, তা' শুধু ভুঁড়ি-ওয়ালাদের নয়।

পরদিন বঙ্গবন্ধু মাদারীপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা ক'রে মার্চের ২ তারিখে ঢাকায় ফিরে আসেন। কিন্তু ঢাকায় ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু নিশ্চুপ হয়ে থাকেন নি। নির্বাচন প্রচার উপলক্ষে আবার তিনি ৫ দিন-ব্যাপী উত্তর-বঙ্গে ঝটিকা সফর করেন। মার্চের ৬ তারিখে (১৯৭০) সন্ধ্যায় শেখ মুজিব বিমানযোগে কুষ্টিয়ার পথে যশোর যাত্রা করেন। রাত্রে ঝিনাইদহে অবস্থানের পর ৭ তারিখে তিনি কুষ্টিয়ার ইউনাইটেড স্কুল ময়দানে এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা দেন। কুষ্টিয়া আসার পথে তাঁকে সর্বত্র বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এখানে তিনি

বলেন, "সংখ্যাগুরু প্রদেশের জনগণের আশা-আকাঙক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইলে ১২০ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভবপর হইবে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই মার্চ, ১৯৭০]

সভায় শেখ মুজিব কায়েমী স্বার্থবাদী গণদুশমনদের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রে বলেন যে, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করা হয়, তা' হ'লে তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।

পরদিন পাবনায় এক জনসভায় ভাষণ দানকালে তিনি আর কাল-বিলম্ব না ক'রে রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবী জানান। পাবনায় আসার পথে তিনি ভেড়ামারা ও পাকশীতে দুটো সভায় ভাষণ দান করেন। পাকশী ও পাবনার জনসভায় আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম।

৯ই মার্চ শেখ মুজিব বগুড়া আলতাফুন্নেসা ময়দানে ভাষণ দান করতে গিয়ে ইসলামে যার যা প্রাপ্য তার সেই ন্যায্য পাওনা আদায়ের অধিকার আছে কি-না তা' সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতা মওলানা মওদুদীর নিকট জানতে চান। পরদিন রংপুর কালেক্টরেট ময়দানে প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের এক বিশাল সমাবেশে উত্তর-বঙ্গের উন্নয়নের প্রতি অবহেলার সমালোচনা ক'রে শেখ মুজিব বলেন যে, "অর্থাভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন প্রকল্পই অবাস্তবায়িত থাকে নাই। অথচ যমুনা নদীতে ব্রীজ নির্মাণ, রূপপুর প্রকল্প, জামালগঞ্জ কয়লা প্রকল্প এবং তিস্তা বাঁধ প্রকল্প প্রসঙ্গ-গুলি অর্থাভাবের অজুহাত তুলিয়া বছরের পর বছর ধরিয়া শিকায় তুলিয়া রাখা হইয়াছে।"

[ঐ, ১১ই মার্চ, ১৯৭০]

জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি এই প্রদেশে আদায়কৃত মোহাজের ট্যাক্স এই প্রদেশেই ব্যয় করার দাবী জানান।

পরদিন শেখ মুজিব দিনাজপুর গোড়া-শহীদ ময়দানে ভাষণ দান করেন। সেখানে তিনি সরকারকে সীমান্ত চোরাচালান বন্ধ করবার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং ধর্মঘট পালনরত মাধ্যমিক শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া সমর্থন ক'রে বলেন যে, "পশ্চিম পাকিস্তানের

শিক্ষকরা এখানকার শিক্ষকদের তুলনায় দিগুণ বেতন পান। তাই বাংলার ৫০ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষকের দাবী-দাওয়াকে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই মার্চ, ১৯৭০]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত ৯ই মার্চ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষকরা তাদের ৭-দফা দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

মার্চের ১২ তারিখে শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ১৫ তারিখে আবার সিলেটের সুনামগঞ্জ জনসভায় বক্তৃতা ক'রে পরদিন ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৭০ সালের ২০শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল-হল ময়দানে ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছ' সহস্রাধিক ডেলিগেটের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ মুজিব ছাত্রদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেন ঃ "শোষণের চারণ ক্ষেত্র বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী নস্যাৎ ও নির্বাচন বানচালের জন্য গণ-বিরোধী আমলা, পেশাদার দালাল, কায়েমী স্বার্থবাদী, ধর্ম-ব্যবসায়ী এবং অতি-বিপ্লবীরা যে অশুভ পাঁয়তারা চালাইতেছে সর্বশক্তি দিয়া উহা প্রতিহত করা আর নির্বাচনোত্তরকালে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনার পথে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেশের আপামর মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার নিমিত্ত জনগণকে আন্দোলনমুখী করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে চরম ত্যাগের প্রস্তুতির বাণী লইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন। সাত কোটি শোষিত, বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষ অন্তহীন আশা লইয়া আপনাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। আঘাতের পর আঘাত হানিয়া গণ-দুশমনদের দুর্গ ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন। বহু রক্ত দিয়াছেন, আর শহীদ নয়, এবার গাজী হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।"

[ঐ, ২১শে মার্চ, ১৯৭০]

দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই বার্ষিক সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব কমরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে আমিও প্রধান

অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলাম। এই সভায় আরো যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বেগম সুফিয়া কামাল, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সে দিন অর্থাৎ ২১শে মার্চের শেষ রাত্রে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নয়া কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়। এতে সভাপতি হন বর্তমান সংসদ সদস্য জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন জনাব শাহজাহান সিরাজ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তনে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বের পরেই উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিল ছাত্র সমাজের যৌথ সংগ্রাম। ষাটের দশকের গোড়া থেকে সরকারী ছত্রছায়ায় লালিত এন.এস.এফ. (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন) বা উগ্র সাম্প্রদায়িক ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রভৃতি ছাত্র দলকে ধীরে ধীরে সমাজ-জীবন থেকে উৎখাত ক'রে যে দুটো ছাত্রদল এগিয়ে এসেছিল সেগুলো হ'ল আওয়ামী লীগ সমর্থিত 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' এবং মোজাফ্ফর ন্যাপ সমর্থিত 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন'। এই দুটো ছাত্র দলের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয় এবং প্রগতিমুখী। এই দুটো দলের মধ্যে আবার ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই জনগণের মধ্যে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার ন্যায় ছাত্রলীগও ছাত্র সমাজে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার আন্দোলনে, ৬-দফার আন্দোলনে, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে, শেখ মুজিবকে কারাগারের অন্তরাল থেকে মুক্তির আলোকে নিয়ে আসবার আন্দোলনে এবং সর্বশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠন ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধে ছাত্রলীগ যে ভূমিকা পালন করে তা' একটি পৃথক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রলীগের অবদান, নানাদিক বিবেচনায়, সত্যি অপরিসীম। এমন কি ঐতিহাসিক দিক থেকে এ কথাই সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রলীগ যা করেছে, আওয়ামী লীগ তা' সমর্থন করেছে। ছাত্রলীগ দুই পা অগ্রসর হ'লে সেই পথ ধরে আওয়ামী লীগ একপদ অগ্রসর হয়েছে। যেমন জয়বাংলা শ্লোগান, বাংলাদেশের নিজস্ব পতাকা, যার মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত, এই

সবই ছাত্রলীগ পূর্বে ব্যবহার করেছে—আওয়ামী লীগ তা' সমর্থন করেছে। সুতরাং, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের বহু সিদ্ধান্তকে বিছিন্ন ভাবে দেখা যায় না। দুটো প্রতিষ্ঠানই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ঃ

ষাটের দশকে ছাত্রলীগের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। এই দশকে যাঁদের ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁদের নাম এখানে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি ঃ

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	সভাপতি	১৯৬১-৬২
শেখ ফজলুল হক মনি	সাধারণ সম্পাদক	১৯৬১-৬২
এনায়েতুর রহমান	ডাকসু'র সহ-সভাপতি	১৯৬২
ওবায়দুর রহমান	সভাপতি	১৯৬৩-৬৪
সিরাজুল আলম খান	সাধারণ সম্পাদক	১৯৬৩-৬৪
সৈয়দ মজহারুল হক বাকী	সভাপতি	১৯৬৫-৬৬
আবদুর রাজ্জাক	সাধারণ সম্পাদক	১৯৬৫-৬৬
ফেরদৌস আহমদ কোরায়েসী	সভাপতি	১৯৬৬-৬৭
আবদুর রাজ্জাক	সাধারণ সম্পাদক	১৯৬৬-৬৭
আবদুর রউফ	সভাপতি	১৯৬৮-৬৯
খালেদ মোহাম্মদ আলী	সাধারণ সম্পাদক	১৯৬৮-৬৯
তোফায়েল আহমদ	সভাপতি	১৯৭০
তোফায়েল আহমদ	ডাকসু'র সহ-সভাপতি	১৯৬৯-৭০
নূরে আলম সিদ্দিকী	সাধারণ সম্পাদক	১৯৭০
নূরে আলম সিদ্দিকী	সভাপতি	১৯৭০-৭১
শাজাহান সিরাজ	সাধারণ সম্পাদক	১৯৭০-৭১
আ. শ. ম. আবদুর রব	ডাকসু'র সহ-সভাপতি	১৯৭০
আবদুল কুদ্দুস মাখন	ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদক	১৯৭০

ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নেতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং উত্তরাঞ্চলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে জনপ্রিয় করতে এবং দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে পরিচালিত করতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন! এঁদের মধ্যে আবু সাঈদ, আবদুর রহমান, সরদার আমজাদ হোসেন, মীর শওকত আলী, আবু সুফিয়ান (শহীদ) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দও সমগ্র প্রগতিবাদী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেন। এঁদের মধ্যে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের উষালগ্নে আসাদুজ্জামান শাহাদাৎ বরণ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে মতিয়া চৌধুরী, শামসুদ্দোহা, সাইফুদ্দীন আহমদ (মানিক), মাহবুবুল্লাহ, মুজাহেদুল ইসলাম সেলিম, রাশেদ খান মেনন (ভাসানী পন্থী) প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

এই দুটো ছাত্র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত লিখবার অবকাশ এখানে নেই। তবে তাঁদের সাহসী ভূমিকা ছাড়া এদেশের স্বাধীনতা আদৌ বাস্তবায়িত হোত কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা যায়। শেখ মুজিবের নেতৃত্ব থেকে এই দুটো দলই, বিশেষ করে ছাত্রলীগ অভূতপূর্ব প্রেরণা লাভ করেছে। ছাত্রলীগের শক্তি আর শেখ মুজিবের শক্তি আসলে একই প্রবাহের দুই রূপ—একটি বিশালকায় নদী, অপরটি সমুদ্র। নদী কখনো কখনো সমুদ্রে এসে মিলিত হয়ে সমুদ্রের শক্তি বৃদ্ধি করে, আবার কখনো কখনো সমুদ্র থেকেই প্রবাহ নিয়ে নদী তার গতিপথে জনপথ অভিমুখে যাত্রা করে। এই দুই শক্তি পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক। একটি থেকে আরেকটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

২৬শে মার্চ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নয়া শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। সরকারের নয়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ব্যাপারে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতে মোট ৮৯২ কোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সরকারের এই শিক্ষানীতিতে দুই অঞ্চলের শিক্ষকদের বৈষম্য দূরীকরণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। শিক্ষকদের নয়া বেতনের হার প্রবর্তনের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বাবদ ১০০ কোটি টাকা মাত্র ধার্য করা হয়েছিল। ধর্মঘটী শিক্ষকরা এর প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন ক'রে তাঁদের ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চ 'জাতির' উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আবার বেতার ভাষণ দিলেন। উক্ত ভাষণে তিনি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ঘোষণা করেন এবং আইনগত কাঠামো প্রকাশের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর এই বেতার ভাষণের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া হ'ল ঃ

"* জাতীয় পরিষদ ৩১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ১৩টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

* ১৯৬১ সালের আদমশুমারীর ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশে আসন বরাদ্দ করা হবে।

* চলতি সালের ২২শে অক্টোবরের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

* জাতীয় পরিষদ ভোট দান পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে।

* আইনগত কাঠামোতে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলোর উল্লেখ থাকবে।

* এতে অবশ্যই আজাদী, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতির নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

* পাকিস্তান একটি ফেডারেল ইউনিটে ঐক্যবদ্ধ হবে—একে পাকিস্তান ইসলামী সাধারণতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হবে।

* শাসনতন্ত্র অবশ্যই গণতান্ত্রিক হবে এবং গণতন্ত্রের মূল উপাদানগুলো ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার থাকবে।

* শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

* প্রদেশগুলোকে সর্বাধিক আইন, প্রশাসন, ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাসহ সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে।

* বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ে দায়িত্ব পালন এবং দেশের আজাদী ও সংহতি রক্ষার জন্য আইনগত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ পর্যাপ্ত ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে।

* বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দূর করার জন্য বিধিবদ্ধ ক্ষমতা অবশ্যই থাকবে।

* প্রেসিডেন্ট আবার ঘোষণা করছেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ১২০ দিনই যথেষ্ট।

* বৃহৎ-শক্তির সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও একে অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা বা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে।

* জনগণের মৌলিক ঐক্য নষ্ট করতে পারে এমন আদর্শ বা ধ্যান-ধারণা যারা পোষণ করে, প্রেসিডেন্ট তাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন।
* ১লা জুলাই থেকে পশ্চিম পাকিস্তান যতদূর সম্ভব এক ইউনিট গঠনপূর্ব-কালের অবস্থায় ফিরে যাবে।
* ১লা জুলাই থেকে চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ শুরু হবে।
* চতুর্থ পরিকল্পনা বহির্ভূত তহবিল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হবে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৯শে মার্চ, ১৯৭০]

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহে লক্ষণীয় যে, প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের পাঁচটি মূলনীতির কথাও ঘোষণা করেছেন। পরে ৩০শে মার্চ প্রেসিডেন্ট এই শাসনতন্ত্রের আইনগত কাঠামোর আদেশ (Legal Framework Order) জারি করেন, এটা হ'ল ১৯৭০ সালের প্রেসিডেন্টের ২নং আদেশ। এই আদেশে শাসনতন্ত্রের জন্য উল্লিখিত পাঁচটি মূলনীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ছাড়াও জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের ভাগবন্টন, সদস্যদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা এবং নির্বাচন ও পরিষদের কার্য পরিচালনার পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়। আইনগত কাঠামোর আদেশে প্রেসিডেন্ট ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের পাঁচটি মূলনীতি সম্পর্কে যা বলেছেন তা' নিম্নরূপ ঃ

(এক) এই আদেশ বলে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ইসলামী আদর্শ রক্ষা করা হবে, যা পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তি ছিল বলে আমরা জানি।

(দুই) শাসনতন্ত্রকে অবশ্যই পাকিস্তানের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক সংহতি এবং জাতীয় ঐক্য রক্ষা করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আইন কাঠামো নির্ধারিত ক'রে দিচ্ছে যে, পাকিস্তানের বর্তমান ভূখণ্ড-সমূহ এবং ভবিষ্যতে এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন ভূখণ্ডসমূহ একটা ফেডারেল ইউনিয়নে সীমাবদ্ধ থাকবে, যা অবশ্যই পাকিস্তান রাষ্ট্রের, যে রাষ্ট্র পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে অভিহিত হবে এবং আঞ্চলিক সংহতি রক্ষা করবে।

(তিন) পাকিস্তানের ভবিষৎ শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে

স্বাধীন ও সাময়িক নির্বাচনের মত গণতন্ত্রের মূল উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়া শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং নাগরিক-দের মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(চার) ভবিষৎ শাসনতন্ত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক নীতি হ'ল এই যে, তাকে প্রকৃত ফেডারেল শাসনতন্ত্র হতে হবে, যাতে ফেডারেল সরকার ও প্রদেশগুলোর মধ্যে আইন বিষয়ক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাসহ অন্যান্য ক্ষমতা এমনভাবে বিভক্ত থাকবে যেন প্রদেশগুলোর সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বোচ্চ আইন বিষয়ক, প্রশাসনিক, অর্থ-নৈতিক ও অন্যান্য ক্ষমতা থাকে এবং ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার দায়িত্ব পালনের এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক সংহতি রক্ষার উপযুক্ত আইন বিষয়ক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাসহ অন্যান্য ক্ষমতা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে।

(পাঁচ) শাসনতন্ত্রের পঞ্চম নীতিতে পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের জন-গণকে জাতীয় বিষয়সমূহে অংশ গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে যাতে জনগণ সমান ও সম্মানিত অংশীদার হিসেবে একত্রে বসবাস করতে পারে এবং জাতির পিতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর স্বপ্ন অনুসারে একটি শক্তিশালী ও মহান জাতিতে পরিণত হ'তে পারে।

[*Bangladesh Documents*, Vol. I, P. 47.]

আসন্ন নির্বাচন ও পরবর্তীকালে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট তাঁর বেতার ভাষণে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের জন্য যে ৩১৩টি আসনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আইনগত কাঠামো আদেশে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে তা' ভাগবণ্টন করা হয়। এতে বলা হয় যে, পূর্ব বাংলার জন্য মোট ১৬৯টি আসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশে ও কেন্দ্রীয় শাসিত উপজাতীয় এলাকাসমূহকে মোট ১৪৪টি আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি আসনের মধ্যে ৭টি পূর্ব বাংলাকে ও ৬টি পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে জাতীয় পরিষদের আসনগুলো এই ভাবে বণ্টন করা হয়ঃ

পূর্ব বাংলা ঃ সাধারণ—১৬২

পূর্ব বাংলা ঃ সংরক্ষিত (মহিলা)—৭

পাঞ্জাব ঃ সাধারণ—৮২

পাঞ্জাব ঃ সংরক্ষিত (মহিলা)—৩

সিন্ধু ঃ সাধারণ—২৭

সিন্ধু ঃ সংরক্ষিত (মহিলা)—১

বেলুচিস্তান ঃ সাধারণ—৪

বেলুচিস্তান ঃ সংরক্ষিত (মহিলা)—১

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ঃ সাধারণ—১৮

উপজাতীয় এলাকা ঃ সাধারণ—৭

শেষোক্ত দুটো প্রদেশ মিলে মহিলাদের জন্য শুধুমাত্র ১টি সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ করা হয়। আইনগত কাঠামো নির্দেশে প্রাদেশিক পরিষদের জন্যও নিম্নলিখিতভাবে সাধারণ ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন বণ্টন করা হয় ঃ

পূর্ব বাংলা ঃ সাধারণ—৩০০

পূর্ব বাংলা ঃ সংরক্ষিত (মহিলা)—১০

পাঞ্জাব ঃ সাধারণ—১৮০

পাঞ্জাব ঃ সংরক্ষিত (মহিলা)—৬

সিন্ধু ঃ সাধারণ—৬২

সিন্ধু ঃ সংরিক্ষত (মহিলা)—২

বেলুচিস্তান ঃ সাধারণ—২০

বেলুচিস্তান ঃ সংরক্ষিত (মহিলা)—১

সীমান্ত প্রদেশ ঃ সাধারণ—৪০

সীমান্ত প্রদেশ ঃ সংরক্ষিত (মহিলা)—২

মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকলেও জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদে সাধারণ আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন বাধা নেই। সংরক্ষিত আসনে মহিলারা সাধারণ আসনের সদস্যবৃন্দের দ্বারা মনোনীত হবেন। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হবে যথাক্রমে ৫ই অক্টোবর এবং ২২শে অক্টোবর। এ ছাড়াও আইনগত কাঠামো আদেশে সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা সম্পর্কেও কতকগুলো বিধি-নিষিধের কথা উল্লেখ করা হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ২৮শে মার্চ শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি ঘোষণা প্রগতিবাদী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই ঘোষণার পটভূমি পূর্বেই রচিত হয়েছিল। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এজেন্ট দলগুলো পূর্বাহ্নেই 'শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট' সম্পর্কে তারস্বরে চিৎকার ক'রে আসছিল। এবার তারা আশ্বস্ত হ'ল। প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে দেশের সকল গণতান্ত্রিকদল প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এ সম্পর্কে এক সংবাদে লেখা হয়ঃ

প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণে নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া

"১লা এপ্রিল, ১৯৭০ তারিখে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দু'দিনব্যাপী জরুরী বৈঠক শেষে গৃহীত এক প্রস্তাবে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বানচালের দরুন যে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা' এড়াবার জন্য প্রেসিডেন্টকে গণতন্ত্রের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য আইনগত কাঠামো নির্দেশ যথাযথভাবে সংশোধনের আহ্বান জানান হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে তাঁর বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২রা এপ্রিল, ১৯৭০]

অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে মওলানা ভাসানী, মোজাফ্ফর আহমদ, আতাউর রহমান খান, লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষে কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হ'ল তথাকথিত 'শক্তকেন্দ্র' ও 'ইসলামের ধারক বাহক' পাকিস্তানী শোষকগোষ্ঠীর এজেন্ট দলগুলো প্রেসিডেন্টকে এই ঘোষণার জন্য অভিনন্দন জানান। এদের ভিতর মওলানা মওদুদীর মতামত সম্পর্কে পত্রিকায় যা লেখা হয় এখানে তার উল্লেখ করছি।

"প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামো আদেশে উল্লেখিত পাঁচটি মূলনীতির উল্লেখ করিয়া জামাতে ইসলামী প্রধান বলেন, ইহাদের একটিরও পরিবর্তন করা যাইবে না।

কতিপয় মহল প্রেসিডেন্টের আইনগত কাঠামো আদেশের কোন কোন ধারাকে পরষিদের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের শামিল বলিয়া অভিহিত করায় মওদুদী বিস্ময় প্রকাশ করেন। ...... প্রস্তাবিত গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে মওদুদী বলেন, তাঁহার মতে, কোন গণপরিষদেরই

ইসলাম বিরোধী কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অথবা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকিতে পারে না। তিনি বলেন, ইসলাম এই ধরনের সার্বভৌমত্বকে অনুমোদন করে না।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই মে, ১৯৭০]

এ সবের দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সব প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর সঙ্গে পরিকল্পনা সাপেক্ষেই প্রেসিডেণ্ট অনুরূপ ঘোষণা করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় ধর্মের নামে ও কায়েমী স্বার্থের নানাবিধ অজুহাতে যারা পূর্ব বাংলাকে শাসন ও শোষণ করতে চায় তাদেরই সামগ্রিক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। যাহোক, শেখ মুজিব এ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। একদিকে তিনি জনসাধারণকে ৬-দফা প্রশ্নে ঐকবদ্ধ করবার প্রয়াস পেলেন, অন্যদিকে আবার এই উদ্ভূত আদেশনামার বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে তুলতে লাগলেন। সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে তিনি নির্বাচনে ৬-দফাকে 'ম্যাণ্ডেট' হিসেবে ঘোষণা করলেন।

২৮শে মার্চ প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ ও পরে আইনগত কাঠামো প্রকাশের পর যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, তার জবাব দেবার জন্য প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া ৩১শে মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন যে, পাঁচটি মূলনীতির যে কাঠামো নির্ধারণ ক'রে দেয়া হয়েছে তার আওতাভুক্ত একটি শাসনতন্ত্র হলে তিনি অবশ্যই তা' গ্রহণ করবেন এবং তাতে স্বাক্ষর দান করবেন।

আইনগত কাঠামো প্রশ্নে ইয়াহিয়া

এপ্রিল মাসের ১লা তারিখে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান '১৯৭০ সালের পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ (ভঙ্গকরণ) আদেশ' নামক একটি আদেশ জারী ক'রে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল ঘোষণা করেন। এই আদেশ জারীর পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান ৪টি প্রদেশে বিভক্ত হবে। প্রদেশগুলো হবে—পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু।

পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল

শেখ মুজিব এবং দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বহুদিন থেকে এই এক ইউনিট বাতিলের জন্য দাবী ক'রে আসছিলেন। সিন্ধুর যুক্তফ্রন্টের নেতা জি. এম. সৈয়দ এ নিয়ে আন্দোলন করতে

গিয়ে বহুবার নির্যাতনও ভোগ করেছেন। ১৯৫৬ সালে আগস্ট মাসে যখন শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন, তখন জি. এম. সৈয়দ এই এক ইউনিট বাতিলের দাবী সমর্থনের জন্য তাঁর প্রতি আহ্বান জানালে বঙ্গবন্ধু শুধু এই দাবী সমর্থনই করেন নি, এর স্বপক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যাবারও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ মুজিব সে দাবী মেনে নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি প্রায়ই আহ্বান জানিয়েছেন। অবশ্য তিনি যে শুধুমাত্র জি. এম. সৈয়দকে দেয় প্রতিশ্রুতির পরবর্তীকালেই এ দাবী তুলে ধরেছিলেন তা' নয়, এটা তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবীরই অঙ্গীভূত বিষয়। ছাত্রদের ১১-দফাতেও এই এক ইউনিট বাতিলের দাবী রয়েছে। আসলে যা ন্যায়সঙ্গত, তাকে শেখ মুজিব কখনোই এড়িয়ে যান নি। কেননা তিনি জানেন, উভয় প্রদেশের সাধারণ জনগণই শোষক শ্রেণীর যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে। শোষকের তাঁবেদার শাসকগোষ্ঠী সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ক'রে এই নিষ্পেষণ চালিয়ে যাচ্ছে। শেখ মুজিব এই নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত মানুষের মুক্তির জন্যই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন—তা' সে যে প্রদেশেরই হোক। আর সেই জন্যই পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের দাবী ৬-দফায় উল্লেখ করতেও তিনি ভুল করেন নি। যাহোক, অবশেষে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সে দাবী মেনে নিলেন। এবং প্রদেশসমূহে নয়া গভর্নরও নিযুক্ত করলেন।

কাইয়ুম খানের জেহাদ ও শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রলোভন

এ সময় মুসলিম লীগের নেতা আবদুল কাইয়ুম খান পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন। তিনি বিভিন্ন জেলায় বক্তৃতায় শেখ মুজিবের ৬-দফার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে থাকেন। কিন্তু তাতে যে বিশেষ সুবিধা হবে না, সে বিষয়ে তিনি ভালভাবেই অবগত হ'লেন। ৬-দফার আন্দোলন থেকে শেখ মুজিবকে নিবৃত্ত করার জন্য তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করলেন। কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গায় ৬ই এপ্রিলে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ৬-দফা ত্যাগ ক'রে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রিত্বের আসন গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু কোন প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে যে সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত হবার মত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নন, কাইয়ুম সাহেবরা

তা' জেনেশুনেও বারবার ভুল করেন। তাঁকে অনেকবারই প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখানো হয়েছে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান চলাকালীন আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকের অন্তরালে তাঁকে যে এই একই প্রলোভন দেখানো হয়েছিল এবং তা' যে ছিন্নপত্রের ন্যায় শেখ মুজিব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কাইয়ুম খানের তা' অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। কেননা গণ-অভ্যুত্থানের জোয়ারে ভেসে পূর্ব বাংলা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাতে কাইয়ুম খানদের সঙ্গে পরামর্শ করেই আইয়ুব খান সে রকম একটা অযাচিত প্রস্তাব করবার সাহসী হয়েছিলেন।

এবারো সেই একই প্রস্তাব। পার্থক্য এই যে, সেবারে দেয়া হয়েছিল গোপনে এবং তখন দিয়েছিলেন আইয়ুব খান, আর এবারে দেয়া হ'ল প্রকাশ্যে এবং তা' দিলেন কাইয়ুম খান স্বয়ং। আসলে সবই একই প্রবাহের স্রোতধারা। তার নাম কায়েমী স্বার্থবাদ। কিন্তু এবারেও সেই একই প্রত্যুত্তর। এপ্রিল মাসের ৯ তারিখে খুলনার বাগেরহাটে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে কাইয়ুম খানের প্রস্তাবের জবাবে শেখ মুজিব দ্ব্যর্থ-হীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, "প্রধানমন্ত্রিত্ব নয়—শোষণ ও অবিচারের শৃঙ্খল হইতে দেশের ১২ কোটি মানুষের বিশেষ ক'রে বাংলার মানুষকে মুক্ত করার জন্যই আমার সংগ্রাম।" তিনি আরো বলেন, "শুধু প্রধানমন্ত্রিত্ব কেন, সারা দুনিয়ার ঐশ্বর্য আর ক্ষমতা আমার পায়ের কাছে ঢালিয়া দিলেও আমি দেশের—বিশেষ করিয়া বাংলার বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে বেঈমানী করিতে পারিব না।" [দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই এপ্রিল, ১৯৭০]

কাইয়ুম খানের প্রলোভনের জবাবে শেখ মুজিব

এ সময় শেখ মুজিব প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এই পর্যায়ে তিনি বাগেরহাট, মোরেলগঞ্জ, মঠবাড়িয়া. ভাণ্ডারিয়া, পিরোজ-পুর ও গোপালগঞ্জে বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা ক'রে ৪ দিনব্যাপী সফরের পর ১৪ই এপ্রিল ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকায় ফিরে এসে শেখ মুজিব এপ্রিল মাসের শেষের দিকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সন্দ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি জায়গায় গমন করেন এবং জনসভায় তাঁর ভাষণ দান করেন।

এই সময় দলীয় তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ দলীয় কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দসহ ছাত্র নেতৃবৃন্দ

তীব্রভাবে গণ-সংযোগ অভিযান অব্যাহত রাখতে থাকেন। শেখ মুজিব যেখানেই সভাসমিতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে গমন করেন সেখানেই বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। এইভাবে জনগণ পাকিস্তানী শাসকচক্রের এবং তাদের এজেন্ট— রাজনৈতিক দলগুলোর সৃষ্ট মিথ্যা শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বুঝে উঠতে থাকে। যে কোন ধরনের 'শাসনতন্ত্র' হোকনা কেন—তা' যে কেবল নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিরাই তৈরী করতে পারেন—এ কথা জনগণ ক্রমে উপলব্ধি করল। সেই সংগে শেখ মুজিব বাংলাদেশের বাঁচার প্রশ্নে ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্য ম্যাণ্ডেট হিসেবে কেন এ নির্বাচনকে নিয়েছেন তাও জনগণ উপলব্ধি করতে পারছিল। এ সবের ফলেই পত্র-পত্রিকা মারফত উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক প্রমুখ সকল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ৬-দফার পক্ষে যেমন মতামত রাখছিলেন, তেমনি প্রাক্তন মুসলিম লীগ, ভাসানী ন্যাপ ও ওয়ালী ন্যাপের বহু রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারা আওয়ামী লীগে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করছিলেন। এঁদের মধ্যে ডঃ কামাল হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণের মনোভাব সম্পর্কে ১লা মে তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয়তে জনৈক ভাষ্যকার লেখেনঃ "পূর্ব পাকিস্তানে গণ-জাগরণ দেখা দিয়েছে। সবাই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। নিজেদের সত্যিকার প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে যাতে দেশের পর্বত প্রমাণ আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা হয় এবং দেশের সব অংশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ব্যাপারে তাঁরা ঐক্যমতে পৌঁছার চেষ্টা করছেন।"

আওয়ামী লীগ দলীয় তৎপরতা

৬-দফা ভিত্তিক নির্বাচনী অভিযান ও জনগণের প্রতিক্রিয়া

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা মে, ১৯৭০]

এই সমস্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এজেন্ট দলগুলোও শেখ মুজিব এবং ৬-দফার বিরুদ্ধে নতুন করে প্রচারণা চালাতে শুরু করে। তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একই নিবন্ধে ভাষ্যকার বলেছেন, "......পশ্চিমা কায়েমী স্বার্থের ধারক-বাহক রাজনৈতিক দলগুলো এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের পদলেহনকারী দলটি নতুন

স্ট্রাটেজী নিয়ে মাঠে নেমেছে। আইয়ুব খান বাঙালী স্বার্থের রক্ষাকবচ ছয়-দফার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন অস্ত্রের ভাষা, আর ঐ কোটারী মহলটি বাঙালী স্বার্থের বিপক্ষে ব্যবহার করছেন পাকিস্তান ও ইসলাম ধ্বংসের কাল্পনিক অভিযোগ। এই দলের ক্ষুদ্রকায় মৌলভী ফরিদ আহমদ থেকে শুরু ক'রে বিশালদেহী কাইয়ুম খান ও ফজলুল কাদের চৌধুরী পর্যন্ত যা যা বলেন তাতে মনে হয় যে, দেশে দুটোই সমস্যা আছে, এক পাকিস্তানকে রক্ষা করা, দুই ইসলামকে রক্ষা করা।"

নির্বাচনে কায়েমী স্বার্থবাদীদের নতুন স্ট্রাটেজী

উপরিউক্ত নিবন্ধের সমর্থনে আরেকটি উদ্ধৃতি দেয়া হ'লঃ "পশ্চিম পাকিস্তান পি. ডি. পি. প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ্ খান বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচন আদর্শের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এদেশে ইসলামী শাসন কায়েম হবে, না ইসলাম বিরোধী একনায়কত্ববাদী শক্তি কায়েম হবে আগামী নির্বাচনে জনগণকে তাই সাব্যস্ত করতে হবে।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ১২ই মে, ১৯৭০]

পাকিস্তানী শাসক-শোষকগোষ্ঠীর এজেন্ট দলগুলোর মনোভাব মূলতঃ একই খাতে প্রবাহিত। আজ নয়, বিগত দুটো দশক যাবত। এবারেও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি।

এই সব প্রচারণার জবাবে ১০ই মে, '৭০ তারিখে ঢাকা শহরে জিন্দাবাহার, পুরানা মোগলটুলী, সিদ্দিক বাজার, দেওয়ান বাজার ও নবাবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে বংশাল স্কোয়ারে আয়োজিত কর্মী-জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বৃটিশ সরকারের দুইশত বছর এবং বিগত বাইশ বছরের বাঙালী নির্যাতনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই শোষণ ও বঞ্চনার অবসান এবং বাংলার মানুষকে অর্থনৈতিক দাসত্বের জিঞ্জির হইতে মুক্ত করার জন্যই আমার সংগ্রাম—তার জন্য প্রণীত হইয়াছে ছয়-দফা দাবী। তিনি বলেন, ৬-দফা দাবীতে পশ্চিম পাকিস্তানের কাহারও বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় নাই —কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করাও ইহার উদ্দেশ্য নয়। ছয়-দফার মূল বক্তব্য হইতেছে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনে বাংলার সম্পদ বাঙালীরা

কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রচারণার জবাবে শেখ মুজিব

ভোগ করিবে। ব্যবসায়ের নামে লুটতরাজ ও শোষণ চলিবে না। এই কারণেই শোষক ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ৬-দফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইবার জন্য 'ভাড়াটিয়া আলেম ও সংহতি দরদীদের' মাঠে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মওলানা মওদুদী, নসরুল্লাহ, কাইয়ুম খান প্রমুখের তীব্র সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন, বাংলার মানুষের দাবী-দাওয়া বানচালই তাহাদের উদ্দেশ্য। 'সংহতি ও ইসলামের' অর্থ কি বাংলার মানুষের কলিজা ছিঁড়িয়া খাওয়া?"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ই মে, ১৯৭০]

এদিকে মওলানা ভাসানী সমর্থক ছাত্র সংগঠন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলো নির্বাচন বিরোধী বক্তব্য দিতেই থাকেন। ভাসানীর ন্যাপ দলীয় সংগঠনের এই সব বিভ্রান্তির সূত্রপাত আরম্ভ হয়েছিল ৭ই অক্টোবর, ১৯৬৯ সালে পাকশীতে অনুষ্ঠিত দলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানে।

দলীয় কিছু কর্মী এই সভায় 'ভোটের আগে ভাত চাই' এই শ্লোগান দিয়েছিল। এর পর অবশ্য মওলান ভাসানী এই বলে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, তিনি নির্বাচনের বিরুদ্ধে নন, বরং নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি দাবী করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে ভাসানী সমর্থকদের মধ্যে নির্বাচন বিরোধী একাধিক উপদলের সৃষ্টি হয়। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ পরবর্তী কালে মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ববাংলা ছাত্র ইউনিয়ন ও বিপ্লবী বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন এই দুই দলে বিভক্ত হয়। এঁরা নিজেদেরকে মাওসেতুং-এর অনুসারী বলে ঘোষণা করেন ও আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য ডাকসু (Dacca University Central Student's Union = DACSU) নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্তসহ দেশের সাধারণ নির্বাচন বয়কটেরও সিদ্ধান্ত নেন। [দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মে, ১৯৭০]

এই সময় ঢাকা ও খুলনায় নির্বাচন বিরোধী অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা 'বোমাবাজী' আরম্ভ করে। ৫ই মে ('৭০) তারিখে ঢাকার পাকিস্তান কাউন্সিলে একজন অজ্ঞাতনামা যুবক 'মলোটভ ককটেল' নিক্ষেপ করে।

[ঐ, ৬ই মে, ১৯৭০]

১০ই মে ১৯৬৯ তারিখে খুলনায় হাতবোমা বিস্ফোরণে দুইজন বালিকা আহত হয়। [ঐ, ১১ই মে, ১৯৭০]

এই দিনই ঢাকায় একটি যাত্রীবাহী বাসের মধ্যে এ্যাসিড-বাল্‌ব নিক্ষিপ্ত হবার ফলে কয়েকজন আহত হয়।

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই মে, ১৯৭০]

এই ভাবে এক সপ্তাহের মধ্যে ৬টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বেশ কয়েকজন ব্যক্তি মারা যায়।

[দৈনিক পূর্বদেশ, ১২ই মে, ১৯৭০]

এমনি উপায়ে নির্বাচন বিরোধীরা সন্ত্রাসবাদী কায়দায় নির্বাচন সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পায়। এ সম্পর্কে ৮ই মে ১৯৭০ তারিখে ঢাকার এক জনসভায় শেখ মুজিব জনগণকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে বলেন ঃ "বাংলার স্বায়ত্তশাসনসহ জনগণের দাবী-দাওয়া বানচালের উদ্দেশ্যে চারিদিকে যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে, নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত এবং বোমা নিক্ষেপ এই ষড়যন্ত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি আরও বলেন, আমেরিকা, চীন বা রাশিয়ার আদর্শ নয়—এ দেশের মাটি হইতে উদ্ভূত আদর্শের পতাকা সমুন্নত রাখা এবং বাঙালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি দিয়া এই ষড়যন্ত্র রুখিয়া দাঁড়ানোই আজ দেশবাসীর সামগ্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।"

শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারী

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই মে, ১৯৭০]

এ সময় জনগণ দ্বারা পরিত্যক্ত এদেশের হতাশ রাজনৈতিক নেতারা, যেমন আতাউর রহমান খান, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ, সর্বত্র ৬-দফা ও শেখ মুজিবের সমালোচনা ক'রে তাঁকে সংগ্রামবিমুখ বলে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এ সম্পর্কে হামিদুল হক চৌধুরীর পত্রিকা দৈনিক পূর্বদেশ-এ লেখা হয় ঃ "অন্যদিকে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ৫-দফা মূলনীতি মেনে নেবার পর ছয়-দফার প্রতিশ্রুতি যে ভুয়া প্রতিশ্রুতিরই নামান্তর হবে, সে কথা এমনকি আওয়ামী লীগের পুরনো কর্মীরাও উপলব্ধি করতে পারছেন। ... ... একইভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো যেখানে নির্বাচনের পূর্বেই স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি মীমাংসার পক্ষপাতী, সেখানে আওয়ামী লীগ এটিকেও নির্বাচনী ইস্যু

হতাশ রাজনীতিবিদদের শেখ মুজিব সম্পর্কে সংশয়

হিসেবে দাঁড় করিয়ে নিজেদের ক্ষমতার রাজনীতিকেই কার্যকরী করতে চেয়েছে। কিন্তু হালে পাঁচ-দফাকেও নির্বাচনী বৈতরণী পারের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ ক'রে সম্ভবতঃ আওয়ামী লীগ সকল গোমর অবশেষে ফাঁস ক'রে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আওয়ামী লীগের মতো একটি বিপুল জনসমর্থিত রাজনৈতিক দলের এই কৌশল অবলম্বনের কারণ কি? দলীয় রাজনীতিতে নেতৃত্বের ব্যর্থতা।''

[উপসম্পাদকীয়, দৈনিক পূর্বদেশ, ১৩ই মে, ১৯৭০]

এই বুদ্ধিজীবী নিবন্ধকার বাংলাদেশের হতাশ ও পরিত্যক্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেরই সহযাত্রী ছিলেন কিনা জানি না। কেননা বুদ্ধিজীবীদের নানান চেহারা, নানান ভঙ্গী। তা' না হ'লে উক্ত লেখকের স্মরণ থাকা উচিত ছিল যে, উনসত্তর সালে গণ-আন্দোলনের পর আইয়ুবের গোলটেবিলে বাংলা-দেশের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ৬-দফা ও ১১-দফা দাবী নিয়ে শেখ মুজিব নিদারুণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। নেতৃত্বের ঐক্য নয়, ৬-দফা ও ১১-দফা আদায়ের জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধতার একমাত্র প্রয়োজন ছিল— এ কথা এদেশীয় হতাশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষে যেমন, কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর পক্ষেও তেমনি উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। আবার ৬-দফার পক্ষে জনগণের 'ম্যাণ্ডেট' পেলেও ষড়যন্ত্র যে শেষ হবে না একথাও শেখ মুজিব ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই শুধু হতাশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বা কিছুসংখ্যক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বুদ্ধিজীবীদের সংশয় দূর করার জন্যই শুধু নয়, বরং জনগণকে সজাগ করার জন্যই ঢাকা শহরের এক জনসমাবেশে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন ঃ

'ভোটের দ্বারা করতে দেওয়া না হ'লে সংগ্রামের মাধ্যমে দাবী আদায় করবো।' বঙ্গবন্ধু কঠোর ভাষায় বলেন ঃ ''দেশের সকল এলাকার শোষিত বঞ্চিত মানুষ আমার ভাই। আমি চাই সকলের জন্য ইনসাফ। তিনি বলেন যে, বল্গাহীন শোষণ ও বঞ্চনার ফলে বাংলার গণমানুষের হাড়মাংসে দাগ লাগিয়া গিয়াছে, আজ তারা সর্বশান্ত। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ক্ষমতায় যাই বা না যাই, বাংলার মানুষকে আর শোষণ করিতে দিব না।''

শেখ মুজিবের ঘোষণা ঃ ভোটের দ্বারা, না হয় সংগ্রামের মাধ্যমে

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই মে, ১৯৭০]

১৭ই মে (১৯৭০) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ছাত্রলীগ, 'ডাকসু' সহ ৮টি হলের মধ্যে ৬টিতে বিজয়ী হয়। আ. স. ম. আবদুর রব এবং আবদুল কুদ্দুস মাখন যথাক্রমে ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবের পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়িত তথা বাংলাদেশের ভাগ্য নির্মাণে এই নির্বাচনের ফলাফল সুদূর-প্রসারী হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে একদিকে তোফায়েল আহমদ ও নূরে আলম সিদ্দিকী অন্যদিকে আ. স. ম. আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং শাজাহান সিরাজ যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন, আমাদের ইতিহাসে তা' স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এই নির্বাচনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে ইত্তেফাক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: "আগামী অক্‌টোবরের ভাগ্য নির্ধারণী সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিলগ্নে গতকাল অনুষ্ঠিত সংগ্রামী বাংলার গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল ছাত্র সংসদসমূহের নির্বাচনে বাংলার স্বাধিকার অর্জন সংগ্রামের অগ্রদূত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ঐতিহাসিক বিপুল বিজয় সূচিত হইয়াছে। ...... শোষিত বঞ্চিত বাঙালীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছাত্রলীগ ইতিপূর্বে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪২টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, হল ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ১৩২টিতে জয়লাভ করিয়া বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে ছাত্রলীগের এই অবিস্মরণীয় বিজয় আসলে এই সংগ্রামী সংগঠনের সকল সংগ্রাম ও প্রেরণার উৎস বাংলার মাটি ও মানুষ এবং বাংলার স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামেরই বিজয়।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন ও ফলাফল

[ঐ, ১৮ই মে, ১৯৭০]

৪ঠা জুন তারিখে প্রতিশ্রুত নির্বাচনকে সামনে রেখে মতিঝিল ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাউন্সিলরদের প্রতি নিজ দলের ভূমিকা বিশ্লেষণ ক'রে বলেন যে, দাবী আদায়ের জন্য যারা প্রাণ দিল তাদের রক্তের ডাক যেন কেউ ভুলে না যায়। 'মন্ত্রী, এম. এন. এ. বা

আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন

এম. পি. এ. হওয়ার খায়েশে যদি কেউ আওয়ামী লীগে থাকিয়া থাকেন, তবে এখনো সময় আছে, সসম্মানে তাঁহারা আওয়ামী লীগ ত্যাগ করিয়া অন্য দলে যোগ দিতে পারেন।' এই অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও বিশিষ্ট কয়েকজন নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন।

জুনের ৬ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নয়া কর্মকর্তা নির্বাচিত করা হয়। এতে শেখ মুজিবুর রহমান নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দলের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ হলেন ঃ

সহ-সভাপতি ঃ কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ, মাস্টার খান গুল ও জনাব বরকত আলী সালমী বার-এ্যাট-ল ;

যুগ্ম সম্পাদক ঃ জনাব মোহাম্মদ খান বহসানী ও জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক ;

সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সৈয়দ খলিল আহমদ তিরমিজী ;

প্রচার সম্পাদক ঃ জনাব আবদুল মান্নান ;

শ্রম সম্পাদক ঃ মালিক ফররুখশিয়ার আওয়াল ;

সমাজ সেবা ও সংস্কৃতি সম্পাদক ঃ জনাব জি. মোস্তফা সারোয়ার ;

দফতর সম্পাদক ঃ জনাব শফিউল আলম ;

কৃষি সম্পাদক ঃ সৈয়দ এমদাদ মোহাম্মদ শাহ ;

কোষাধ্যক্ষ ঃ অধ্যাপক হামিদুর রহমান এবং

মহিলা সম্পাদিকা ঃ বেগম নূরজাহান মোর্শেদ।

এই অনুষ্ঠানে "একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, জমিদারী, জায়গীরদারী, সরদারীর বিলোপ সাধন করিয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাম্যবাদী অর্থনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে মানুষের মর্যাদায় সমুন্নত করার কল্যাণময় প্রতিশ্রুতি বিবৃত করিয়া নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তার কর্মসূচী ঘোষণা করে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই জুন, ১৯৭০]

উক্ত অধিবেশনে নবনির্বাচিত সভাপতি হিসেবে ভাষণদান প্রসঙ্গে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, "আমরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার

মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত এবং শহীদের রক্তের মর্যাদা সমুন্নত রাখার শপথ গ্রহণ করিতেছি।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই জুন, ১৯৭০]

পরদিন বিক্ষুব্ধ ৭ই জুন, ঐতিহাসিক ৭ই জুন, মনুমিয়ার রক্তে রাঙানো শ্রমিকের দিন, মেহনতী মানুষের দিন ৭ই জুন। এক অর্থে ৬-দফার দিনও এই ৭ই জুন। ১৯৬৬ সালের এই রক্তঝরা দিনটিকে বঙ্গবন্ধু বিবৃতির মাধ্যমে জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ তখন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এবারে তিনি রেসকোর্সে 'নয়া ইতিহাস সৃষ্টিকারী উত্তাল জনসমুদ্রে' দাঁড়িয়ে শহীদদের স্মৃতি তর্পণ ক'রে পুনরায় ঘোষণা করলেন—'জেল-জুলুম, বেইমানী আর বে-ইনসাফীর যুগের যদি অবসান চান তা' হ'লে নির্বাচনের মাধ্যমে এবার ধোঁকাবাজ ও মীরজাফরদের খতম করুন।' জুন মাসের ১৮ তারিখে শেখ মুজিব আবার নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বের হন। এ পর্যায়ে তিনি উত্তর বঙ্গ সফর করেন। ২০শে জুন তিনি রংপুর জেলার নাগেশ্বরী ও ২১শে জুন কুড়িগ্রামে আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করেন। রংপুর যাবার পথে তিস্তামুখঘাট ও গাইবান্ধাতেও তিনি স্বল্পকালের জন্য ভাষণ দান করেন।

২২শে জুন তারিখে দলবলসহ তিনি আবার ঢাকায় ফিরে আসেন। আসন্ন নির্বচনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দলীয় বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হ'লেও নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করলেন। এই উদ্দেশ্যে কতিপয় বিশিষ্ট দলীয়কর্মী সহকারে শেখ মুজিব জুন মাসের ২৬ তারিখে প্রাদেশিক গভর্নর এস. এম. আহসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গবন্ধু সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিলগ্নে আস্থার মনোভাব ও শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ রাজবন্দী, সামরিক আইনে বিচারাধীন এবং দণ্ডপ্রাপ্ত ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ জানান।

গভর্নর আহসানের সাথে সাক্ষাৎ

এবারে তাঁর দৃষ্টি পশ্চিমমুখী। কেননা তিনি জানেন, পূর্ব বাংলার মত নির্যাতিত জনগণ সেখানেও রয়েছে; কিন্তু তাদের পক্ষ হয়ে কথা

বলবে কে? ১৯৬৯ সালে যখন শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে বের হয়ে গোলটেবিল বৈঠকে গমন করেছিলেন, তখনও এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। সে সময় তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'আমিই পশ্চিমী ভাইদের হয়ে কথা বলব।' আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতিলগ্নেও তিনি একই আশ্বাস দেবার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন।

বঙ্গবন্ধুর পশ্চিম পাকিস্তান গমন

২৭শে জুন (১৯৭০), করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্‌কালে শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বললেন, "দেশের উভয় অংশের দরিদ্র মানুষের হক আদায়ই আমার লক্ষ্য।" সেদিনই করাচীর মাটিতে পা দিয়ে সাংবাদিক-দের নিকট বলেছিলেন যে, পাকিস্তান বাইশ পরিবারের, না বারো কোটি মানুষের এবার সে প্রশ্নেরই চূড়ান্ত মীমাংসা হবে।

পশ্চিমী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বাঙালীদের সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের মনে যে একটি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিল—এ বিষয়ে শেখ মুজিব সচেতন ছিলেন। আর সেই জন্যই ২৮শে জুন করাচীর 'নিশ্‌তার পার্কে' আয়োজিত একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "বাঙালীরা দুশমন তো বটেই, তবে আপনাদের নয়—শোষকদের ঃ দুই অঞ্চলের এই অভিন্ন দুশমনদের উৎখাতে তাই বাঙালীরা আজ সঙ্কল্পবদ্ধ।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে জুন, ১৯৭০]

সেদিন নিশ্‌তার পার্কে 'করাচীর রাজনৈতিক জীবনের সর্বকালের বৃহত্তম' জনসমাগম ঘটেছিল। ইত্তেফাক লিখেছেন ঃ "গত ৭ই জুন ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানের যে অবিস্মরণীয় জনসমুদ্রের কাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানী মহলে রূপকথার মতই শোনাইয়াছে, অদ্য স্থানীয় নিশ্‌তার পার্কে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের সেই একই দৃশ্যের অবতারণা হয়। শেখ মুজিব উক্ত সভায় আরো বলে-ছিলেন যে, বাঙালীদের উর্দু ভাষার প্রতি কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ নাই—বিদ্বেষ আছে শোষকের কণ্ঠের বিরুদ্ধে।" [ঐ]

করাচীর নিশ্‌তার পার্কে জনসভা

পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকালে শেখ মুজিব ২৯শে জুন সোহরাওয়ার্দী একাডেমী আয়োজিত একটি সেমিনার উদ্বোধন করেন। পরদিন অর্থাৎ

৩০শে জুন, নওয়াবশাহে যান। সেখানে পৌঁছলে বিপুল জনতা উর্দু ও বাংলা ভাষায় লিখিত পোস্টার ও ব্যানার হাতে শেখ মুজিবকে নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে স্টেশন থেকে সার্কিট হাউজে গমন করেন। বিকালে আয়োজিত এক জনসভায় যেকোন মূল্যে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের কথা বঙ্গবন্ধু আবার দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন। পরদিন কোয়েটায় পৌঁছলে সেখানেও তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। কোয়েটার জনসভায় বক্তৃতা দানের পর জুলাইয়ের ৩ তারিখে শেখ মুজিব লাহোরে গমন করেন। সেদিন তিনি শুক্কুরে এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সিন্ধু, পূর্ব পাকিস্তান ও অন্যান্য স্থানে ধৃত ছাত্রদের মুক্তি দানের জন্য প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট আহবান জানান। পরদিন লাহোরে আইনজীবীদের প্রদত্ত এক সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর দল আগামী নির্বাচনে কোন জায়গীরদার বা পুঁজিপতিকে নির্বাচিত হতে দেবে না। সেদিন তিনি সাংবাদিকদেরকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, কাইয়ুম খান ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা যে স্বাধিকার আদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করছেন তার জবাব পাবেন ৫ই অক্টোবরে (৫ই অক্টোবর নির্বাচনের দিন ধার্য হয়েছিল, পরে পরিবর্তিত হয়ে ৭ই ডিসেম্বর ধার্য করা হয়)। জুলাই মাসের ৫ তারিখে লাহোরের গুলবাগে এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিব বক্তৃতা দেন। সভা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে না পারে তার জন্য জামাতপন্থী গুণ্ডারা গোলযোগ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু সচেতন জনগণ তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেয়। এই গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ ক'রে শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন: "পশ্চিম পাকিস্তানে আমি ভিক্ষা করিতে আসি নাই—ভোট সংগ্রহ করিতেও আসি নাই; আসিয়াছি পশ্চিম পাকিস্তানের আপামর মানুষের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী ভাইদের অকৃত্রিম শুভেচ্ছার বাণী পৌঁছাইয়া দিতে। এ ব্যাপারে যাঁরা বাধ সাধিতে চান তাঁহাদিগকে আমরা চিনি। অতএব, যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, গুটিকয় ভাড়াটিয়া পাঠাইয়া আওয়ামী লীগের

শুক্কুরে জনসভা

লাহোরে জনসভা

সভায় গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া অথবা অন্যবিধ চক্রান্তের মাধ্যমে আমার বা আমার দলের কণ্ঠ স্তব্ধ করিতে পারিবেন, তাহারা আহাম্মকের স্বর্গেই বসবাস করিতেছেন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই জুলাই, ১৯৭০]

সেদিন শেখ মুজিব একটি হোটেলে পাঞ্জাব ছাত্রলীগের এক সমাবেশেও ভাষণ দেন। পরদিন অর্থাৎ ৬ই জুলাই তিনি করাচী হয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। বিমানবন্দরে তাঁকে অবিস্মরণীয় সম্বর্ধনা জানানো হয়। ঢাকার মাটিতে পা দেওয়ার প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানের সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, "পশ্চিম পাকিস্তানের বঞ্চিত জনগণ সমস্ত শাসনের অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য দুর্বার বেগে সংগ্রামের পথে আগাইয়া চলিয়াছে এবং এই গতি অব্যাহত থাকিলে অচিরেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাত হইতে নেতৃত্ব ছিনাইয়া আনিতে সক্ষম হইবে।"

ঢাকা প্রত্যাবর্তন

[ঐ, ৭ই জুলাই, ১৯৭০]

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে শেখ মুজিব ৯ই জুলাই ও ১১ই জুলাই তারিখে যথাক্রমে ঢাকার কাওরান বাজার ও ধূপখোলা ময়দানে পরপর দুটো জনসভায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি যে সব সরকারী কর্মচারী নির্বাচন বানচালের জন্য ধর্মঘটের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এবং জনসাধারণকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকতে নির্দেশ দেন।

এরপর শেখ মুজিব জুলাই মাসের ১৪ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত আবার দক্ষিণ বঙ্গে নির্বাচন প্রচারাভিযান উপলক্ষে ঝটিকা সফর করেন। তিনি ১৪ই জুলাই ফরিদপুরের ভেদরগঞ্জে, ১৫ই জুলাই গলাচিপায় ও বরগুনায়, ১৮ই জুলাই মুলাদী ও কালাইয়াতে, ১৯শে জুলাই চাখার সহ কয়েকটি ছোটছোট জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে জুলাইয়ের ২০ তারিখে ঢাকায় ফিরে আসেন।

দক্ষিণ বঙ্গে নির্বাচনী প্রচারাভিযান

এদিকে জুলাই-এর শেষ সপ্তাহে পূর্ব বাংলার সর্বত্র বন্যা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটে। বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল থেকে বন্যাদুর্গতদের

উদ্ধারকার্য ও সাহায্য সামগ্রী প্রেরণের জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রদেশের সর্বত্র বন্যা পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে শেখ মুজিব গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বন্যাদুর্গতদের জন্য সরকারী তৎপরতা এবং সাহায্যকে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল বলে অভিযোগ করেন। [ঐ, ২রা আগস্ট, ১৯৭০]

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বন্যাদুর্গতদের জন্য প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া মাত্র ২০ লক্ষ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের এই সামান্য সাহায্যের উপর অভিমত প্রকাশ ক'রে শেখ মুজিব বলেন, "যেখানে অগণিত বন্যার্তের দুর্দশা লাঘবের জন্য কোটি কোটি টাকার দরকার, সেখানে এত অল্প টাকায় আমাদের প্রয়োজন মিটতে পারে না।"

সফরের শুরুতেই তিনি ২রা আগস্ট ঢাকা শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরে তিনি দলবলসহ ঢাকার বাইরে ব্যাপকভাবে বন্যাদুর্গত এলাকা সফর করেন। ৫ই আগস্ট সিরাজগঞ্জের চৌহালী, ৬ই আগস্ট মেঘাই, ৯ই এবং ১০ই আগস্ট চট্টগ্রাম, ২১শে আগস্ট টাঙ্গাইল প্রভৃতি বন্যা উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করার সময় তিনি অসহায় জনগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে সাহায্যের জন্য সরকারের প্রতি আকুল আবেদন জানান। এ সময় শেখ মুজিব বিভিন্ন জনসমাবেশে ভাষণ দান করেন। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য জেলা ও মহকুমার বিভিন্ন বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে শেখ মুজিবের বিভিন্ন ভাষণগুলো পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে একদিকে প্রদেশের বন্যা সমস্যা সমাধান ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্ত-বায়নে সরকারের অতীতের অক্ষমতা, বর্তমানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাহায্য দানের ব্যর্থতার সমালোচনা ক'রে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছেন, অপর দিকে দেশের নির্বাচন বানচালের জন্য শাসক শ্রেণীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রী মহলের স্বরূপ উদঘাটন ক'রে জনসাধারণকে সর্তক থাকার আহ্বান জানিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা অব্যাহত রেখেছেন।

শেখ মুজিবের বন্যা দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন

এদিকে দলগতভাবেও আওয়ামী লীগ প্রদেশের বন্যার্তদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় একমাত্র ঢাকা শহরেই ৯০টি সাহায্য শিবির খোলা হয়। প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বন্যার্তদের প্রতি সরকারের পর্যাপ্ত সাহায্য দানের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ ৯ই আগস্ট প্রদেশব্যাপী 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করে। একই সঙ্গে জাতীয় শ্রমিক লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ বিভিন্ন রাজনৈতিক বন্দী, কারাগারে আটক বিভিন্ন মামলার আসামী হিসেবে অভিযুক্ত অসংখ্য ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের আশু মুক্তি এবং দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদির জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানিয়ে ঐ দিন প্রদেশব্যাপী জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করে। সেদিন আওয়ামী লীগের ঘোষিত প্রতিবাদ দিবসে শেখ মুজিব চট্টগ্রাম প্যারেড গ্রাউণ্ডে এক বিশাল জনসমুদ্রে ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে তিনি কারাগারে আটক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র, শ্রমিক ও কর্মীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ক'রে অবিলম্বে মুক্তি দানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানান।

আওয়ামী লীগের তৎপরতা: প্রতিবাদ দিবস

প্রতিবাদ দিবসে শেখ মুজিব

এ সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বন্যা-দুর্গত এলাকা পরিদর্শনের জন্য পূর্ব বাংলায় সফর করছিলেন। কায়েমী স্বার্থবাদী ধিকৃত রাজনীতিবিদরা তখন 'মওকা' পেয়ে বন্যার অজুহাতে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার জন্য তাঁকে উস্কানি দেয়া শুরু করলেন। শেখ মুজিব এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি ইয়াহিয়ার মনোভাব সম্বন্ধে ভালোভাবেই ওয়াকিফহাল থেকেছেন। আর সেই জন্য উক্ত প্রতিবাদ দিবসে সে সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ ক'রে বলেন, "বন্যার অজুহাতে তারিখ পিছাইবার জন্য দেশের সাধারণ নির্বাচন বানচালের কোন চক্রান্ত বরদাশ্‌ত করিতে আওয়ামী লীগ রাজী নহে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই আগস্ট, ১৯৭০]

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে যোগসাজস ক'রে ১৯৭০ সালের ১৫ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক ঘোষণায় নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেন। ঘোষণায় ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ

এবং ১৯শে ডিসেম্বর অথবা তারো আগে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়। অথচ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এর আগে ২৮শে এপ্রিল এক বেতার ভাষণে জোরের সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে, নির্বাচনের তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে।

নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন

কায়েমী স্বার্থবাদীদের সঙ্গে চক্রান্ত করেই যে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার ঘোষণা করা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কেননা, প্রেসিডেন্টের ঘোষণার সাথে সাথে সেই সব তথাকথিত নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্তটিকে প্রাজ্ঞজনোচিত বলে মন্তব্য করেন। জনাব নূরুল আমীন, মাহমুদ আলী, কাউন্সিল লীগ নেতা খাজা খয়েরুদ্দিন, জামাত নেতা মওলানা মওদুদী, অধ্যাপক গোলাম আজম, নেজামে ইসলামের ফরিদ আহমদ, জাতীয় লীগের ফেরদৌস কোরেশী, জামাতে ওলামায়ে ইসলাম নেতা পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া), জনাব কাইয়ুম খান সেদিনই প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের প্রতি অভিনন্দন জানান।

কায়েমী স্বার্থবাদীদের অভিনন্দন

কিন্তু শেখ মুজিব এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। তিনি জানতেন যে, এমন একটি পরিস্থিতি হবেই। কায়েমী স্বার্থবাদীরা যে কোন অজুহাত তুলেই হোক, নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করবেই। তবু নির্বাচনের জন্য যখন একটি তারিখ নির্দিষ্ট ক'রে দেয়া হয়েছে, তখন আপাততঃ ভালোয় ভালোয় কাজটা সম্পন্ন হতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যই তিনি ২০শে আগস্ট টঙ্গীতে তাঁর সংক্ষিপ্ত সফরকালে এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন, নির্বাচন পিছানোয় আওয়ামী লীগের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ডিসেম্বরেও যদি নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচন হতে দেয়া না হয়, তা' হ'লে তিনি সারা প্রদেশে এক দুর্বার গণ-আন্দোলন শুরু ক'রে দেবেন বলে ঘোষণা করেন।

নির্বাচন বানচাল সম্পর্কে শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারী

১লা সেপ্টেম্বর (১৯৭০) কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা কালে বঙ্গবন্ধু গণ-দুশমনদের সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বলেন, "বন্যার দরুন নয়—গণ-দুশমনদের পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্তের দরুনই নির্বচানের তারিখ পিছাইয়া গিয়াছে।" সেদিন

তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেন যে, শোষক ও গণ-দুশমনদের চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার জনগণকে সবসময় বৃহত্তর সংগ্রাম ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখে নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "........এইবার আমরা ষড়যন্ত্রকারীদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, নির্বাচন হোক আর না হোক, আমরা আমাদের দাবী আদায় করিবই করিব এবং দাবী আদায়ের সংগ্রামে আমরা আর শহীদ হইব না, আমরা গাজী হইব।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০]

নির্বাচনী সম্ভাবনাকে বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করা হচ্ছে এ বিষয়ে তিনি মুসলমান ভাইদেরকেও সতর্ক ক'রে দেন।

ঢাকার নবাবগঞ্জে ২২শে সেপ্টেম্বরে ভাষণ দিতে গিয়েও তিনি অনুরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। সেদিন চক্রান্তকারীদেরকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে বলেন, "তোমরা মনে রেখ, বাংলার মানুষ আজ আর ঘুমাইয়া নাই। বাংলার মানুষ রক্ত দিতে শিখিয়াছে—যত চক্রান্তই কর, বাংলার মানুষকে আর তোমরা দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।"

[ঐ, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০]

ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য পদের প্রার্থী মনোনয়নের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেছিল। আসন সংখ্যার তুলনায় এত আবেদনপত্র পড়েছিল যে, প্রার্থী মনোনয়ন বোর্ডকে রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়তে হয়।

২৪শে সেপ্টেম্বর উভয় আসনের প্রতিটি কেন্দ্র থেকেই যোগ্যতার ভিত্তিতে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। শেখ মুজিব পুরাতন ঢাকার একটি এবং নতুন ঢাকার টঙ্গী ও তেজগাঁও এলাকা—এই দুটো জাতীয় পরিষদ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আওয়ামী লীগের সাথে সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। ভাসানী ন্যাপ বহুদিন থেকেই 'ভোটের আগে ভাত চাই' শ্লোগান দিতে দিতে নির্বাচনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ক'রে

আসছিল। 'ভোটের আগে ভাত চাই' এই দাবী উত্থাপন ক'রে মওলানা ভাসানী একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার সে পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করেন। মওলানা ভাসানী নিজেও বার বার বিপ্লবের হুমকি দিতে থাকেন। হাতিয়ার হিসেবে তিনি একটি বিপ্লবী দলও গঠন করেছিলেন—আগেই বলা হয়েছে, এরা 'লালটুপি বাহিনী' নামে পরিচিত। তাঁর সমর্থক সন্ত্রাসবাদীরা যে কিরূপে নির্বাচন বানচালের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, সে কথাও বলেছি। শেখ মুজিব বার বার এই অতিবিপ্লবীদেরকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পঞ্চমবার্ষিকী সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে শেখ মুজিব বাংলার জাগ্রত ছাত্র সমাজকে সতর্ক করে দেন যে, "একশ্রেণীর অতিবিপ্লবী দেশের কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সহিত হাত মিলাইয়া নির্বাচন বানচালের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে" (২রা অক্টোবর)।

অতিবিপ্লবীদের সম্পর্কে শেখ মুজিব

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা অক্টোবর, ১৯৭০]

ঐ একই দিনে মওলানা ভাসানী রেসকোর্স ময়দানে লালটুপি বাহিনীর এক বিরাট সমাবেশে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, বিপ্লব ও সংগ্রাম ছাড়া দাবী আদায় হয় না। তাঁর দলীয় কর্মীরা সে দিন বক্তৃতার সময় মুহুর্মুহু 'মুক্তির একই পথ, সশস্ত্র বিপ্লব' ধ্বনি দিতে থাকেন। পরদিন পিকিং ন্যাপের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সদস্য জনাব এম. এ. জলিলের বাসভবনের সম্মুখে বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের (পিকিংপন্থী ছাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান) কর্মীদের উদ্দেশে যখন ভাসানী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখনও কর্মীগণ 'নির্বাচন নির্বাচন, বর্জন বর্জন', 'মুক্তির একই পথ, সশস্ত্র বিপ্লব' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া কোন গত্যন্তর খুঁজে পায় নি। কেননা, নির্বাচন বর্জনের শ্লোগান দিয়ে তাঁদের পক্ষে জনগণকে নির্বাচনবিমুখ করা সম্ভব হয় নি। বরং অতিবিপ্লবীদের কার্যকলাপে জনমনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা' বঙ্গবন্ধুকে সাহায্য করেছে। নির্বাচনী কমিশনের নিকট প্রার্থীপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবেদনের সময় যতই ঘনিয়ে এসেছে, ভাসানীপন্থীরা ততই

নির্বাচন প্রশ্নে ভাসানী ন্যাপ

দোদুল্যমান হয়ে পড়েন। এমত অবস্থায় দ্বিধান্বিতচিত্তে ৪ঠা অক্টোবর ঢাকায় ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সপক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু মওলানা সাহেব উক্ত বৈঠকে উপস্থিত থাকেন নি। অক্টোবরের ১১ তারিখে এই দল মনোনীত প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করেন।

এদিকে জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও পি.ডি.পি. এক হয়ে 'ইসলাম-পছন্দ ঐক্যজোট' গঠন করেন। এঁদের সবারই

ইস্লাম পছন্দ ঐক্যজোট

ধারণা জন্মেছিল যে, একজোট হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে আওয়ামী লীগ বোধকরি হালে পানি পাবে না। পরে অবশ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে গিয়ে এই ঐক্যজোট ভেঙ্গে যায়। ঐক্যজোট না ভাঙ্গেলও অবস্থার বিশেষ হেরফের হ'ত না। পূর্ব বংলার মানুষ শেখ মুজিবের পার্শ্বে বিকল্প কোন নেতার কথা ভাবতেই পারেন নি। ইতিমধ্যে নির্বাচনী কমিশন আওয়ামী লীগের নির্বাচন প্রতীক হিসেবে নৌকা বরাদ্দ করেন। দেশের ১৯টি রাজনৈতিক দলের প্রতীক সম্পর্কে ইসলামাবাদ থেকে ৮ই অক্টোবর এই মর্মে এক ঘোষণা জারী করা হয়। দলভিত্তিক নির্বাচনী প্রতীকসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ

১। পাকিস্তান আওয়ামী লীগ—নৌকা।
২। পি. ডি. পি.—ছাতা।
৩। জামাতে ইসলামী—দাড়িপাল্লা।
৪। পিপলস্ পার্টি—তরবারি।
৫। কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগ—ব্যাঘ্র।
৬। কনভেনশন মুসলিম লীগ—বাইসাইকেল।
৭। ভাসানী ন্যাপ—ধানের শীষ।
৮। ওয়ালী ন্যাপ—কুঁড়েঘর।
৯। কাউন্সিল মুসলিম লীগ—হ্যারিকেন।
১০। জমিয়তে উলেমায়ে ইসলাম—খেজুর গাছ।
১১। কৃষক শ্রমিক পার্টি—হুকা।
১২। পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ—লাঙ্গল।
১৩। পাকিস্তান মসিহী লীগ—চশমা।

১৪। জামাতে আলিয়া মোজাহেদিন—পাগড়ী।

১৫। খাকছার তাহরিক—বেলচা।

১৬। মারকাজী জমিয়তে আহলে হাদিস পাকিস্তান—গোলাপ ফুল।

১৭। মারকাজী জমিয়তে উলেমায়ে পাকিস্তান—চাবি।

১৮। সিন্ধু যুক্তফ্রন্ট—ছড়ি।

১৯। নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমিয়তে উলেমায়ে ইসলাম এবং নেজামে ইসলাম—বই

নির্বাচনী কমিশন কর্তৃক দলভিত্তিক প্রতীক ঘোষিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য লাভের জন্য বিভিন্ন দলের যথাক্রমে ৮৭০ জন ও ২১২১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন দানের পর শেখ মুজিব তাঁর প্রার্থীদেরকে জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য আবার নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ঝটিকা সফর শুরু করেন। রাতদিন অমানুষিক পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি জনগণের আরো কাছের মানুষ হয়ে উঠলেন। ৬ই অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কুলিয়ারচর, ৭ই অক্টোবর সিলেটের আজমীরীগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ মহকুমার ইতনা, ৮ই অক্টোবর সিলেটের দিরাই প্রভৃতি কয়েকটি জায়গায় জনসভায় বক্তৃতা ক'রে অর্কটোবরের ১০ তারিখে ঢাকা ফিরে এসে আবার ১৪ই অক্টোবর ঢাকার অদূরে ধামরাই, ১৭ই অক্টোবর ধোলাইখাল ও ঢাকার কাঁঠাল বাগান, ১৮ই অক্টোবর কালিগঞ্জ, ২০শে অক্টোবর ডুমরীসহ ঢাকার কয়েকটি জনসভায় তিনি বক্তৃতা দেন। কোনরূপ বিশ্রাম না নিয়েই তিনি আবার উত্তর বঙ্গে চলে যান। সেখানে ২২ তারিখে দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ, ২৩ তারিখে রংপুর জেলার সৈয়দপুর, নীলফামারি, ডোমার প্রভৃতি স্থানে বিরাট জনসভায় তাঁর অগ্নিবর্ষী ভাষণ দান করেন। ইতিমধ্যে ঢাকাসহ প্রদেশের কয়েকটি উপকূলীয় অঞ্চলের উপর দিয়ে অকস্মাৎ এক অস্বাভাবিক ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ায় তিনি উত্তর বঙ্গে কয়েকটি অনুষ্ঠানের কর্মসূচী বাতিল ক'রে দিয়ে ২৬শে অক্টোবর ঢাকায় ফিরে আসেন। এসময় সরকার একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর 'ম্যানিফেস্টো

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রার্থী মনোনয়ন দান

জনগণের সম্মুখে প্রচারের সুযোগ দেবার জন্য 'বেতার এবং টেলিভিশনে' বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারের এই প্রচেষ্টা সর্বত্রই অভিনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, অনেক নেতাই দেশের অতিদরদী সেজে এমনভাবে ভাষণ দেয়া শুরু করলেন, যা অনেকেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। নেতৃবৃন্দের সবাই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দিকেই অধিক দৃষ্টি আরোপ করলেন। কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা এ. এস. এম. সুলায়মান লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানালেন। এমনকি জামাতে ইসলাম ও পি. ডি. পি'র নেতৃবৃন্দও তাঁদের বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করেন।

নেতৃবৃন্দকে বেতার টেলিভিশনের মাধ্যমে জনগণের নিকট তাঁদের আদর্শ উপস্থাপনের সুযোগ

যা হোক এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও আরো কয়েকজনের ভাষণ উল্লেখ করছি। এ থেকে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক তৎপরতা, রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য এবং তুলনামূলকভাবে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা, এসব সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করা যাবে। প্রথম বঙ্গবন্ধুর ভাষণ স্মরণ করি। ১৯৭০ সালের ২৮শে অক্টোবর তিনি এই ভাষণদান করেন। তিনি বলেন ঃ

"প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম!

জনগণের মুক্তির জন্য যে সব বীর শহীদান রক্ত দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন যে সব বীর সন্তান, তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা ক'রে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্বৈরাচারী শাসনের অত্যাচার, নির্যাতন উপেক্ষা ক'রে নিজেদের জীবন দিয়ে তাঁরা আন্দোলনের পর আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। অগণিত মানুষ সর্বপ্রকার নিষ্পেষণের মুখেও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সেই ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত আন্দোলন গত বছরের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিল। সেই একটানা আন্দোলন জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। বস্তুত ঃ আমি আজ জাতীয় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য পেশের যে সুযোগ পেয়েছি, তাকেও জনগণের সংগ্রামের

শেখ মুজিবের বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ

প্রাথমিক বিজয় বলে বিবেচনা করা যায়। কারণ, আজ পর্যন্ত এ সুযোগ ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া ছিল।

আমাদের সংগ্রাম চলবেই। কারণ, আমাদের মূল লক্ষ্যে এখনো আমরা পৌঁছিনি। জনগণকে ক্ষমতা অর্জন করতেই হবে। মানুষের উপর মানুষের শোষণ, অঞ্চলের উপর অঞ্চলের শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। যে শক্তিশালী চক্র গত বাইশ বছর পাকিস্তান শাসন করেছে, জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তারা সম্ভাব্য সকল রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এরা সেই সব গোষ্ঠী—যারা সাধারণ নির্বাচন বানচালের সক্রিয় ষড়যন্ত্র করছেন। এমনকি নির্বাচনের পরেও তারা শোষণের অবসান ঘটানোর প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা নস্যাৎ করার জন্য সক্রিয় থাকবে। এজন্য প্রয়োজন হ'লে তারা তাদের বিপুল সম্পদ নিয়জিত করবে। তাদের অর্থ আছে, প্রভাব আছে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাও তাদের রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ মানুষ আপোষহীনভাবে সাফল্যের সাথে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং শেষ পর্যন্ত জনতার জয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে, তারা জনগণের পাশে পাশেই থাকবে। স্বৈরাচারী ও শোষকগোষ্ঠীর মোকাবেলার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিবে। কোন জাতি কোন দিনই আত্মাহুতি না দিয়ে মুক্তি ও ন্যায়বিচার পায় নি। তাই আজ আওয়ামী লীগ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোকে জানিয়ে দিতে চায় যে, পাকিস্তানের জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের মোকাবেলা আওয়ামী লীগ অবশ্যই করবে। গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা বিঘ্নিত করা হ'লে আওয়ামী লীগ সব শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম। আর সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের বিকাশ। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দল সমগ্র দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, সে হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যই আমাদের মহান নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রাম

শুরু করি। আমাদের সে সংগ্রাম আজও শেষ হয় নি। ক্ষমতাসীনচক্র সংগ্রামী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য হামলার পর হামলা চালিয়েছে। আঘাতের পর আঘাত হেনেছে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের একের পর এক কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের জীবনের সম্ভাবনাময় দিনগুলো কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। সর্বপ্রকারের নির্যাতন, নিপীড়নকে আমরা পরাভূত করেছি। বিজয়ী হয়েছি। এ বিজয়ই আমাদেরকে গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবেলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। যে সঙ্কট আজ জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে, সে সঙ্কটের অবসান ঘটাতে হবে। আজকে জাতীয় সঙ্কটের প্রথম কারণ, দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়, জনগণের এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থনৈতিক বৈষম্যের কবলে পতিত। তৃতীয়, অঞ্চলে অঞ্চলে ক্রমবর্ধনান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যে সীমাহীন অবিচারের উপলব্ধি জন্মেছে। প্রধানতঃ এগুলোই বাঙালীদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলিত মানুষদেরও আজ একই উপলব্ধি। আওয়ামী লীগের 'ম্যানিফেস্টো'তে এসব মৌলিক সমস্যা সমাধানের একটা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করা হয়েছে। দেশে প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সেই গণতন্ত্রে মানুষের সকল মৌলিক স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। আমাদের ম্যানিফেস্টোতে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। সমাজে ক্যান্সারের মত যে দুর্নীতি বিদ্যমান তাকে নির্মূল করতে আমরা দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। জাতীয় শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ দু'ডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাঙ্কিং সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমা সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগ এ দু'ডজন পরিবারের কুক্ষিগত। ব্যাঙ্কের লগ্নীকৃত অর্থের শতকরা ৮২ ভাগ আজ মোট জমাকারীদের মাত্র শতকরা ৩ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশে যে কর প্রথা কায়েম রয়েছে তা' বিশ্বের সবচাইতে পশ্চাৎমুখী

ব্যবস্থা। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যখন প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ আদায় করা হয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ অর্থ আদায় হয়। অপর পক্ষে লবণের মত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উপরেও নিপীড়নমূলক পরোক্ষ কর বসানো হয়েছে। সংরক্ষিত বাজার, ট্যাক্স হলিডে, বোনাস ভাউচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে সাবসিডি প্রদান এবং কৃত্রিমভাবে নিম্নহারে বিদেশী মুদ্রার ঋণ অর্থবরাদ্দ প্রভৃতি ব্যবস্থা একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সুযোগ ক'রে দিয়েছে।

ছিটেফোঁটা ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও সীমান্ত প্রভুরা রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী রয়েছেন। তাঁরা সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। তাঁদের সমৃদ্ধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র কৃষকের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটেছে, কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে জনসাধারণ দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ আজ বেকার। জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধির সম্পূর্ণ চাপ এসে পড়েছে শিল্প-শ্রমিক ও মেহনতি সম্প্রদায়ের উপর। মুদ্রা-মুজরী যা বেড়েছে তার তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যয় বৃদ্ধির চাপ স্কুল-কলেজের শিক্ষক, স্বল্প বেতনভুক কর্মচারী, বিশেষ ক'রে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, গত বাইশ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের মাত্র ১৫ শ' কোটি টাকার মত (মোট ব্যয়ের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র) বাংলাদেশে খরচ করা হয়েছে, অথচ এর পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয়েছে সাত হাজার কোটি টাকারও বেশী। দেশের সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় খাতে বাংলাদেশে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশী। গত ২২ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান মাত্র ১৩ শ' কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। কিন্তু ৩ হাজার কোটি টাকার বিদেশী

দ্রব্য তারা আমদানী করেছে। বাংলাদেশের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে তিনগুণ বেশী বিদেশী দ্রব্য আমদানী করা হয়েছে। নিজস্ব বিদেশী মুদ্রা আয়ের চাইতেও পশ্চিম পাকিস্তান বাড়তি দু'হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিদেশী দ্রব্য আমদানী করতে পেরেছে, তার কারণ বাংলাদেশের অর্জিত পাঁচশ' কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে কুক্ষিগত হয়েছে। তার উপরেও সর্বপ্রকার বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান ব্যবহার করেছে। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রের পরিসংখ্যানও ঠিক একই রকমের মর্মান্তিক। স্বাধীনতার বাইশ বছর গত হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে বাঙালীর সংখ্যা আজও মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ। দেশরক্ষা সার্ভিসে বাঙালীর সংখ্যা মাত্র ১০ ভাগেরও কম। সার্বিক অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে এ প্রকট বৈষম্যের ফলে বাংলার অর্থনীতি আজ সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে। বাংলার বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণকে শুধুমাত্র অনাহারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ১৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হচ্ছে। দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে তার শিকারে পরিণত হয়ে চলেছে বাংলার অসহায় মানুষ।

পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশী। পশ্চিম পাকিস্তানে যে ক্ষেত্রে মোটা চাউলের দাম ২০ থেকে ২৫ টাকা, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মোটা চাউলের দাম গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাংলায় যে আটার দাম প্রতিমণ ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তা' ১৫ থেকে ২০ টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিসের সরিষার তেলের দাম মাত্র আড়াই টাকা, কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিসের তেলের দাম পাঁচ টাকা। করাচীতে যে সোনার দাম প্রতি ভরি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা, ঢাকায় সে সোনার মূল্য প্রতি ভরি ১৬০ থেকে ১৭০ টাকা। তারপরেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলায় সোনা আনার ব্যাপারে কাস্টমস্-এর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গত বাইশ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতির যে কাঠামো গড়ে তুলেছেন এসব অবিচার তারই পুঞ্জীভূত ফলশ্রুতি। এ অবিচার দূর করার সাধ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এ সত্যটি প্রমাণিত হয়েছে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায়। কেন্দ্রীয় সরকার যত

বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, অতীতের অন্যায় অবিচার দূরীকরণে সে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, চতুর্থ পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দে সে ব্যর্থতার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী, যে কর্মসূচীতে আছে ন্যায়বিচারের পথনির্দেশ, সে কর্মসূচী আঞ্চলিক অন্যায় অবিচারের বাস্তব সমাধানের পথনির্দেশ করেছে। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রে যেখানে বাংলার প্রতিনিধিত্ব মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ এবং দেশে যে ধরনের শাসন-ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে, তাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায় না। বাংলাদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা বৃহত্তর ব্যয় বরাদ্দ আদায়ের চেষ্টা করলে আঞ্চলিক উত্তেজনাই বৃদ্ধি পাবে এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এ অবস্থায় সমস্যাসমূহের একমাত্র সমাধান হতে পারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস ক'রে এবং ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ক'রে। প্রস্তাবিত এ স্বায়ত্তশাসনকে পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাও অবশ্যই নিতে হবে। এজন্যই মুদ্রা-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনের উপর ফেডারেশনের ইউনিটগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দানের ব্যাপারে আমরা সব সময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি। এ কারণে আমরা মনে করি যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও ঋণসমূহের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার ক্ষমতাও ফেডারেশনের ইউনিট সরকারগুলোর হাতে অর্পণ করা উচিত। এভাবে আমরা কেন্দ্রকে সন্দেহ, সংশয় ও বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগের আওতার ঊর্ধ্বে রাখতে চাই। ফেডারেশনের ইউনিটগুলিকে অর্থনৈতিক ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ফেডারেশন সরকারকে পররাষ্ট্র বিষয়, দেশরক্ষা বিষয় ও নিরাপত্তামূলক শর্ত সাপেক্ষে মুদ্রা ব্যবস্থার দায়িত্ব দিয়ে একটা ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যমূলক ফেডারেল রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের ফেডারেল সরকার পরিকল্পনায় নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হবে এবং ফেডারেল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চল থেকে ফেডারেল চাকুরীতে লোক নিয়োগ করা হবে। আমরা আরো বিশ্বাস

করি যে, ফেডারেশনের ইউনিটগুলি যদি মিলিশিয়া অথবা প্যারা মিলিটারী বাহিনী গঠন করে, তবে তারা কার্যকরীভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রস্তাবিত ফেডারেল পরিকল্পনা সংশয় ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করবে। যে অঞ্চলের মানুষ অপর অঞ্চলকে উপনিবেশ বা বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে চান, বোধগম্য কারণেই তাঁরা আমাদের এ প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করবেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের পরিকল্পনা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন পাবে। আমাদের বিশ্বাস, শাসনতান্ত্রিক এ কাঠামোর মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব এবং অন্যায়, অবিচার ও শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মিটানোর জন্য দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রম ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশবাসী তখনই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন যখন ত্যাগ স্বীকারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সকল শ্রেণী ও সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করার আশ্বাস আমরা দিতে পারবো। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অংশ নিশ্চিত করার জন্যে অর্থনৈতিক কাঠামোতে অবশ্যই আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলো সহ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি-গুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হবে সরকারী অর্থাৎ জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বেসরকারী পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সম্পূর্ণ-ভাবে বিলোপ সাধন করতে হবে। কর ব্যবস্থাকে সত্যিকারের গণমুখী করতে হবে। সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে সমর্থন ক'রে তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। এ সমর্থনের জন্যে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল

সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতীদের ন্যায্যমূল্যে সুতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্য অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা ক'রে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এ সব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প-সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এযাবৎ বাংলার সোনালী আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া-বেপারীরা পাটচাষীদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করেছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হ'লে জাতীয় অর্থনীতিতে পাটসম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। তুলার প্রতিও একই ধরনের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সেজন্য আমরা মনে করি, তুলা ব্যবসাও জাতীয়করণ করা অত্যাবশ্যক, তুলার মান ও উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সরকারগুলো আমাদের অন্যতম অর্থকরী ফসল চা, ইক্ষু ও তামাকের উৎপাদনের ব্যাপারেও যথেষ্ঠ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। এর ফলে এসব অর্থকরী ফসল উৎপাদন আশঙ্কা-জনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। একটা স্বল্প সম্পদের দেশে কৃষি পর্যায়ে অনবরত উৎপাদন হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষীদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্যের নিশ্চয়তা দিতে হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি-ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানে জায়গীরদারী, জমিদারী, সর্দারী প্রথার অবশ্যই বিলুপ্ত সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমি-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমি দখলের সর্বোচ্চ সীমা অবশ্যই নির্ধারণ ক'রে দিতে হবে। নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বন্টন করতে হবে। কৃষি-ব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকীকরণ করতে হবে। অবিলম্বে চাষীদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকার এজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ভূমি রাজস্বের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষককুলের ঋণভার লাঘবের জন্যে অবিলম্বে আমরা ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ এবং বকেয়া খাজনা মওকুফ করার প্রস্তাব করেছি। আমরা বর্তমান ভূমি রাজস্ব প্রথাও তুলে দেবার কথা ভাবছি।

প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক উন্নয়নের জন্যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চালাতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের বন-সম্পদ, ফলের চাষ, গো-সম্পদ, হাঁস-মুরগীর চাষ, দুগ্ধখামার, সর্বোপরি মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি-সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইন্সটিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক মৌল ভিত্তির যে প্রথম তিনটি স্তর সেগুলোকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বন্যানিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে একটা সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানে জলবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে দূরীভূত করতে হবে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বিজলী সরবরাহ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হতে পারে না। একটি সম্প্রসারিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত ক'রে গ্রামে গ্রামে বিজলী সরবরাহ করতে হবে। এর দ্বারা পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। পাঁচ বছরে আমরা বাংলাদেশে পঁচিশ শ' কিলোওয়াটস্ বিজলী উৎপাদন করতে চাই। রূপপুর আণবিক শক্তি এবং জামালগঞ্জের কয়লা প্রকল্প অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস অবিলম্বে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে হবে। তৃতীয় অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ ক'রে উত্তর বঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিব। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে সিন্ধুনদের উপর এবং বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও কর্ণফুলীর উপরেও সেতু নির্মাণ করতে হবে। আভ্যন্তরীণ নৌ ও সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সড়ক ও রেল ব্যবস্থার উপরও আমরা যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছি। সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের মত আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে

প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতি বছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশী শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল বিশেষ ক'রে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। পাঁচবছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটা 'ওয়ার্কস প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণীর জন্যে খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্যে মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ও উর্দু যাতে ইংরেজীর স্থান দখল করতে পারে সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

নাগরিক জীবনের সমস্যাবলীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব— নিম্নআয়ের লোকজন অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন। তথাকথিত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টগুলি বিত্তবানদের জন্যে বিলাসবহুল আবাসিক এলাকা নির্মাণে ব্যস্ত। আর এদিকে বাস্তুহারা ও বিত্তহীনদের দল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে মাথাকুটে ফিরছে। ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র নগরবাসীর সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অল্প খরচে শহরে বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা প্রয়োজন। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এক করুণ পরিবেশ বিদ্যমান। আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। প্রতি ইউনিয়নে একটি ক'রে পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র এবং প্রতি থানা সদরে একটি ক'রে হাসপাতাল অবিলম্বে স্থাপন করা প্রয়োজন। চিকিৎসা গ্রাজুয়েটদের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তনের প্রয়োজন।

পল্লী এলাকার জন্য বিপুলসংখ্যক প্যারা মেডিকেল পার্সনালদর ট্রেনিং দেয়া দরকার।

গণ-আন্দোলন যেমন, শিল্প শ্রমিকরা তেমনি অর্থনীতি ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে থাকেন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দর কষাকষি এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে তাদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের নিজেদের এবং সন্তানদের জন্যে বেঁচে থাকার মত মজুরী, বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার খর্বকারী সকল শ্রম-আইন বাতিল করতে হবে। শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যা দানের মাধ্যমেই তাদের কাছ থেকে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। সমাজের চাহিদা মেটাতে হ'লে অর্থনীতির সকল খাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনীতির সর্বত্র মজুরী-কাঠামোর ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্যে দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে।

সকল নাগরিকের সমান অধিকারে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আমরা সব সময়ই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা ক'রে আসছি। সংখ্যালঘুরাও অন্যান্য নাগরিকদের মতই সমান অধিকার ভোগ করবে। আইনের সমান রক্ষাকবচ সর্বক্ষেত্রেই পাবে। উপজাতীয় এলাকা যাতে অন্যান্য এলাকার সাথে পুরোপুরি সংযোজিত হতে পারে, তারা যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপর নাগরিকদের মতই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, এ জন্যে উপজাতীয় এলাকা উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, উপকূলীয় দ্বীপসমূহ এবং উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারীরা যাতে জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্যে তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনের সাথে মোহাজেরদের একাত্ম হয়ে যাওয়া উচিত। এর ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে তারা স্থানীয় জনগণের মতই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

৬-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ইসলামকে বিপন্ন ক'রে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে—সে মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্যে আমি শেষ বারের মত আহ্বান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোন কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এ শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কোরান ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামী নীতির পরিপন্থী কোন আইন এদেশে পাশ হতে বা চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না। পররাষ্ট্র নীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আজ বিশ্বজুড়ে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে, সে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমরা কোন মতেই জড়িয়ে পড়তে পারি না। এ জন্যে আমাদের অবশ্যই সত্যি-কারের স্বাধীন এবং জোটনিরেপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির অনুসরণ করতে হবে। আমরা ইতিমধ্যেই সিয়াটো, সেন্টো ও অন্যান্য সামরিক জোট থেকে সরে আসার দাবী জানিয়ে এসেছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কোন জোটে জড়িয়ে না পড়ার ব্যাপারে আমাদের বিঘোষিত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নির্যাতীত জনগণের যে সংগ্রাম চলছে—সে সংগ্রামে আমরা আমাদের সমর্থন জানিয়েছি।

কারোর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকলের প্রতি বন্ধুত্ব—এ নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের, বিশেষ ক'রে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী। আমরা মনে করি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত, এর মধ্যে আমাদের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সে জন্যে প্রতিবেশীদের মধ্যে বর্তমান বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি। জাতিসংঘের প্রস্তাব মোতাবেক কাশ্মীর সমস্যার একটি ন্যায়-সঙ্গত সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করছি।

ফারাক্কা বাঁধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ভয়ঙ্কর ও স্থায়ী সর্বনাশ করা হচ্ছে অনতিবিলম্বে সে সর্বনাশের মোকাবিলা করতে হবে। কালবিলম্ব না ক'রে এ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

দেশবাসী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেই এসব কর্মসূচী ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সম্ভবপর। আগামী নির্বাচনে জাতীয় মৌলিক সমস্যাসমূহ বিশেষ ক'রে ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণভোটরূপে আমরা গ্রহণ করেছি। একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে একটা শাসনতন্ত্র দিতে পারে—যে শাসনতন্ত্র জনগণের একত্রে বসবাসের স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে। এ কারণেই আমারা বার বার উল্লেখ করেছি যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। আইনগত কাঠামো আদেশের বিধিনিষেধ সম্পর্কিত ধারাসমূহ বাতিলের জন্যে পুনরায় প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র-শ্রমিকের বিরুদ্ধে ও বিগত গণ-অভ্যুত্থানকালীন দায়েরকৃত মামলা, গ্রেফতারকারী পরোয়ানা ও দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করা হ'লে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীকেও মুক্তি দিতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের গুরুভার বহন করা কোন প্রকারেই উচিত নয়। রাজনীতিতেও সশস্ত্র বাহিনীর জড়িয়ে পড়া একেবারেই অনুচিত। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সৈনিকদের জাতীয় সীমানা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এককভাবে পালন করা বাঞ্ছনীয়। পরিশেষে আমি বলতে চাই, জাতি হিসাবে আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে, আমরা সাফল্যের সাথে তার মোকাবেলা করবোই।

প্রকৃত প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। যাদের নিয়ে পাকিস্তান গঠিত, তারা শুধুমাত্র একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যেই একত্রে বসবাস করতে পারে।

গণতন্ত্র ধ্বংসের যে-কোন উদ্যোগ পরিণতিতে পাকিস্তানকেই ধ্বংস করবে। আমাদের ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ফেডারেশনের ইউনিটসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর ক'রে অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এই ধরনের ফেডারেল গণতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় দেশে সামাজিক বিপ্লবের সূচনার জন্যে প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আওয়ামী লীগ দেশবাসীর যে সমর্থন ও আস্থার অধিকারী হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি যে, ইন্‌শাল্লাহ্‌ আমরা সাফল্যের সাথে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হ'বো। পাকিস্তান জিন্দবাদ।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৯শে অক্‌টোবর, ১৯৭০]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মওলানা ভাসানী নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের দাবী আদায় সম্ভব নয়—সংগ্রামের মাধ্যমে তা' করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মত বদলান এবং ভাষণ দেন। ৫ই নভেম্বর তাঁর ভাষণ টেলিভিশন ও বেতারে প্রচার করা হয়। তাঁর ভাষণের পুরো বিবরণ তুলে দেয়া হ'ল ঃ

মাওলানা ভাসানীর বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ

"আগামী সাধারণ নির্বাচনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঃ পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর, সকল অঞ্চলের—পাঞ্জাবী হোক, সিন্ধি হোক, বেলুচী হোক অথবা বাঙালী হোক—সকল শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য একটি শোষণ-মুক্ত সমাজ কায়েমের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর প্রগতিশীল শাসনতন্ত্র রচনা করা। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দৈনন্দিন কলহ বৃদ্ধি পাচ্ছে—তার মূল কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, তাদের জন্যে আঞ্চলিক—পূর্ণ আঞ্চলিক—স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। আমি আশা করি, আগামী শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক—পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা যথাযথরূপে গৃহীত হবে। তৎসঙ্গে শতকরা ৮৫ জন কৃষক ও ১০ জন শ্রমিক—৯৫ জন নিপীড়িত নির্যাতিত অভুক্ত অনাহার-ক্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য সংখ্যানুপাতে আইনসভায় আসন সংখ্যা নির্ধারিত হবে। পূর্ব বাংলার ভয়াবহ সমস্যা বন্যা প্রতিরোধের জন্য কালবিলম্ব না ক'রে এখন হতে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। সেন্টো, সিটো, পাক্‌-আমেরিকান চুক্তি সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের স্বার্থে বাতিল করতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষা মজহাবের উন্নতির জন্য সরকারকে বিশেষভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। পাকিস্তানের সংহতি যাতে বিনাশ না হয়—'ভাগ কর এবং শাসন কর' পরিত্যাগ করার জন্য, পরিহার করার জন্য, বিদেশী শত্রুদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। পকিস্তান শুধু পাকিস্তানের নাগরিকদের

জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয় নি—পাকিস্তানের এমন একটি সুন্দর, এমন একটি প্রগতিশীল শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে—সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—যে সরকারের প্রতি সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষ আকৃষ্ট হবে। সূর্যের আলোর মত ইসলামী আদর্শ। ইসলাম শুধু মুসলমানের কল্যাণের জন্য আসে নি। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মজলুম মানুষের জন্য আল্লাহর অপূর্ব দান ইসলাম। ইসলামের প্রতি লক্ষ্য রেখে হযরত ওমরের আদর্শ অনুসরণ ক'রে—সাহাবা একরামদের আদর্শ অনুসরণ ক'রে এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে যা শুধু পাকিস্তানের জন্য মঙ্গলকর হবে না, সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মজলুম মানুষের মুক্তি আনয়ন করতে সক্ষম হবে। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র যাঁরা রচনা করবেন, তাঁরা যদি নিজেরাই চরিত্রবান না হন—মদখোর, ঘুষখোর, চোরাকারবারী, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী সদস্য নির্বাচিত হ'লে ঘুষের বিরুদ্ধে কোন আইন প্রণয়ন করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। তাই আমি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট সর্বপ্রথমেই অনুরোধ জানিয়েছিলাম, সমস্ত রাজনৈতিক দল, সংখ্যালঘু দলসমূহ, ছাত্র, মজদুর ফেডারেশন, সকল শ্রেণীর নেতৃবর্গকে একত্র ক'রে—পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের কল্যাণের জন্য কিরূপ শাসনতন্ত্র হওয়া উচিত—সকলের আলোচনার মাধ্যমে প্রেমপ্রীতি ভালবাসার সঙ্গে আলোচনা ক'রে ইত্তেফাক, এত্তেহাদের ভিতর দিয়ে অধিকাংশ সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে হবে। পরবর্তীকালে পরিষদ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করলেই চলবে। এখন নির্বাচন আমাদের সামনে প্রায় আগত।

আমি আশা করি, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল পরস্পরের প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ি না ক'রে, গোলাগুলি না ছুড়ে, মারামারি না ক'রে শান্তিপূর্ণভাবে যাতে নির্বাচন সমাধা হয় তজ্জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন, এই-ই আমার অনুরোধ। আমি আশা করি, সাধারণ মানুষ যেন দুর্নীতিপরায়ণ না হয়—আগামী নির্বাচনে যেন কোন ব্যক্তি টাকার মোহে অথবা কোন বস্তুর মোহে কাউকে ভোট না দেন। ভোট বিক্রি ক'রে খেলে সারাজীবন অতিবাহিত হবে না, কিন্তু যে দেশের মানুষ ভোট বিক্রি ক'রে খায়—ভোটের বিনিময়ে ঘুষ গ্রহণ করে, তাদের মত হতভাগ্য আর পৃথিবীতে কেউই নেই। শেষ

সম্বল আমাদের কৃষক মজুর গরীব ভাইদের নিকট আমার বিশেষ আরজ, ভোটের মাধ্যমে যেন কেউ কোন ঘুষ দিতে চাইলেও তা' গ্রহণ না করে। আমরা সর্বহারা—আপনারা সর্বহারা, পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, রোগে ঔষধ নেই, লেখাপড়া শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই, তবুও আমরা বেঁচে আছি। আগামী নির্বাচনে অর্থের বিনিময়ে ঘুষের বিনিময়ে যদি ভোট দেয়া হয়, শেষ সম্বল চরিত্রটুকুও যদি হারিয়ে ফেলেন, তবে ভবিষ্যতে আপনাদের মুক্তির আর কোন উপায় থাকবে না। যে জাতির চরিত্র নেই, যে সম্প্রদায়ের চরিত্র নেই—তার উন্নতি কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না।

সরকারের উচিত ছিল পাবলিসিটি জারিয়াতে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ক'রে এবং অন্যান্য উপায়ে প্রচার কার্যের দ্বারা ও সাধারণ মানুষকে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া—ভোট কেন দিতে হয়, ভোটের উপকারিতা কি, ভোট কিরূপ মানুষকে দিতে হবে, চরিত্রহারা মানুষকে ভোট দিলে তার পরিণাম ফল কি হবে ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব মোটেই কোন সরকার আজ পর্যন্ত পালন করে নাই। আমি আশা করি, যে সমস্ত রাজনৈতিক দল আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছেন, প্রত্যেকেই ইসলামের পবিত্র আদর্শ অনুযায়ী চরিত্রবান মানুষকে ভোট দানের ব্যবস্থা করবেন। চরিত্রহারা মানুষ, যে ব্যক্তি স্বার্থপর, মদখোর, চোরাকারবারী, ঘুষখোর অথবা আত্মগরিমায় মত্ত—এই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা পাকিস্তানের কল্যাণ কখনই হবে না। জনসাধারণের মুক্তি কখনও আসবে না। একমাত্র সমাজতন্ত্র ছাড়া পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষ, নিপীড়িত মানুষ, মজলুম মানুষের সামাজিক মুক্তি, আর্থিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি কোন কালেই আনা সম্ভবপর হবে না। ইহা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আমি আশা করি, সরকার এবং দেশের অন্যান্য ব্যক্তিরা যখন বার বার ঘোষণা করছেন—আগামী নির্বাচনের দ্বারা শিক্ষার সমস্যা, ভাত-কাপড়ের সমস্যা, ভয়াবহ বন্যা প্রতিরোধের সমস্যা, উভয় পাকিস্তানের সংহতি বৃদ্ধি পাবে, পাকিস্তানের জনগণের কল্যাণ হবে, পাকিস্তানের উভয় অংশের ভিতর প্রীতি ও ভালবাসা দৃঢ়তর হবে, পাকিস্তান বিদেশী শত্রুর কবল হতে সতর্ক

হবে—পাকিস্তান একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তাই আমি অপেক্ষা করতে চাই যে, যদি তা' সম্ভবপর হয়, যদি রাজনৈতিক নেতাদের কথা এবং কাজ একই হয়, তা' হ'লে সর্বপ্রথম আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো। আমি আশা করি, আগামীতে যারা বার্‌সারে এক্‌তেদার অর্থাৎ শাসন-কর্তারূপে নির্বাচিত হবেন, তাঁরা যদি এই সমস্ত দূর করতে না পারেন, তা' হ'লে পুনরায় দেশবাসীর বিক্ষোভ আরও দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

কৃষক-শ্রমিকদের, সর্বহারা মানুষের সংগ্রাম ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে—যার ফলে পুনরায় মিলিটারী ডাকতে হবে। আমি আশা করি যে, একটি গণতান্ত্রিক দেশে পুনঃ পুনঃ যেন মিলিটারী সৈন্যকে শাসন ব্যবস্থায় আনয়ন করতে না হয়—সৈন্যদের দায়িত্ব দেশরক্ষা করা। পাকিস্তানের সৈন্যরা শুধু পাকিস্তানের গৌরব নয়, সারা পৃথিবীর, বিশেষ ক'রে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার গৌরব; সংখ্যায় কম হলেও ১৯৬৫ সালে যে সাহস-বিক্রমের সাথে যুদ্ধ ক'রে তারা দেশের সার্বভৌমত্ব ও আজাদী রক্ষা করেছেন, সেজন্য পাকিস্তানের জনসাধারণ চিরকাল তাঁদেরকে স্মরণ করবে এবং ধন্যবাদ দিতে থাকবে। এই সম্পদকে কোনক্রমেই নষ্ট হতে দেয়া উচিত নয়। সৈন্যদের কাজ দেশরক্ষার জন্য দৈনন্দিন শক্তি বৃদ্ধি করা এবং উচ্চ সামরিক শিক্ষা লাভ করা, তা' না ক'রে যদি তারা পুনঃ পুনঃ দেশের সাধারণ ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তা' হ'লে আমাদের এই সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাতে বিদেশী শত্রুদের লাভ হবে। আমি আশা করি যেন আর ভবিষ্যতে কখনও সামরিক বাহিনীকে ডাকতে না হয়—সিভিল জনসাধারণের শাসন চিরকাল যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য সকল শ্রেণীর মানুষ এবং সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ চেষ্টা করবেন—ইহাই আমার আন্তরিক আশা। তা' না হ'লে আজ দুনিয়ার সমস্ত গরীব একত্র হয়ে শুধু মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি, সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট এবং সামন্তবাদীদের শাসন কিছুতেই তারা গ্রহণ করবে না। বাঁচতে হয় মানুষের মত বাঁচতে হবে, তা' ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমি একান্ত আশা করি যে, পাকিস্তানের সংহতি বৃদ্ধি পাবে যদি কৃষক-শ্রমিকদের, যাঁরা সংখ্যায় ৯৫ জন, তাঁদের সকল দাবী মেনে নেওয়া হয়, তাঁদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা হয়। যদি দেশ হতে দুর্নীতি এবং চোরাকারবারী, টাউটগিরী, শরাবখুরী,

জুয়াড়ীদের বিতাড়িত করা হয়, অথবা ধ্বংস করা হয়, তা' হ'লেই পাকিস্তানের কল্যাণ হবে। পাকিস্তান যদিও ছোট দেশ, তবু গত যুদ্ধের সময় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, যে জাতির ভিতর ঈমান থাকে, দেশপ্রেম থাকে—সে জাতিকে দমন করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সমস্ত আমেরিকার শক্তি রাশিয়ার শক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও আমার দেশের জনসাধারণ ও মোজাহিদ সৈন্যবাহিনী আত্মত্যাগের দ্বারা যে অপূর্ব গৌরব সাধন করেছে, সে জন্য আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পাকিস্তান জিন্দাবাদ। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৬ই নভেম্বর, ১৯৭০]

আতাউর রহমান খানের বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ

পাকিস্তান জাতীয় লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান দেশের আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্‌কালে ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭০, তাঁর দলের কর্মসূচী বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জনগণের নিকট তুলে ধরেন। জনাব খান বলেন ঃ..."আমাদের জাতীয় অগ্রগতির জন্য স্থায়ী শান্তি অপরিহার্য, তবে সে শান্তি হবে প্রকৃত ও সৃজনশীল—বাহ্যিক মেকী বা ভয়প্রসূত শান্তি নয়। আমাদের দল এও বিশ্বাস করে যে, গোটা সমাজ-জীবনে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি শাসন-ব্যবস্থা, যাতে একদিকে থাকবে প্রয়োজনীয় সকল রাজনৈতিক অধিকারের সুযোগ, অপরদিকে থাকবে আপামর মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। এছাড়া বামপন্থী, উগ্র দক্ষিণপন্থী ও ফ্যাসীবাদের প্রবক্তারা নানা কৌশলে ও নানা শ্লোগানের সাহায্যে পাকিস্তানে নিজ নিজ প্যাটার্নের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার যে অশুভ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গণতন্ত্র অর্থাৎ জনগণের শাসনকে রাহুমুক্ত করার জন্য অন্য কোন পন্থা আছে বলে আমার দল মনে করে না।"

[ঐ, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭০]

উক্ত ভাষণে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কতিপয় দলের ভ্রান্ত ধারণার তিনি প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, যারা সমাজতন্ত্রের অর্থ করেছে নাস্তিকতা, তাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর মতে, ইসলাম পাকিস্তানের বিশেষ কোন শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর মনোপলি নয়। একদল

আলেম আরেক দল আলেমকে কাফের বলে ঘোষণা ক'রে ফেলছেন— এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তাঁর দলের ঘোষণাপত্র সম্পর্কে জনাব খান বলেন যে, এটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ হচ্ছে মূলনীতিসমূহ এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে কর্ম-ধারাসমূহ বা পলিসি। তিনি বলেন যে, তাঁর দলের মূলনীতি হচ্ছে ৮টি। একটি পরিপূর্ণ উদারনৈতিক ও শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক কাঠামো সৃষ্টির কাজে তাঁর দল নিবেদিত রয়েছে এবং বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছতে তাঁর দল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এইভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক একদিকে যেমন বেতার ও টেলি-ভিশনের সাহায্যে, অপরদিকে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা দানের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা যখন জোরালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলো— ঠিক সেই সময় বাংলার ভাগ্যাকাশে নেমে এল এক করুণ মুহূর্ত—এক বিষণ্ণ কাল। ১২ই নভেম্বর, ১৯৭০, এক ভয়াবহ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দক্ষিণ বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রায় ১০ লাখ থেকে ১২ লাখ মানুষের জীবনাবসান ঘটলো এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদের ক্ষতি সাধন হ'ল। মানবেতিহাসে এরূপ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ খুব কমই সংঘটিত হয়েছে।

মানবেতিহাসের বৃহত্তম প্রাকৃতিক দুর্যোগ

শুধু বাংলার মানুষই নয়, বিশ্ববাসী জানেন যে, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানি ঘটলো, তার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সর-কারের ক্ষমাহীন উদাসীনতা বিশেষভাবে দায়ী ছিল। সরকার সদিচ্ছা নিয়ে উদ্যোগী হ'লে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সদিচ্ছার অভাব ছিল অচিন্তনীয়-প্রায়। স্বৈরাচারী সরকার পূর্ব বাংলাকে চিরদিন 'কলোনী' হিসেবে দেখে এসেছে। এদেশের মানুষের জীবনের মূল্য সম্বন্ধে সরকারী আমলা ও সরকার-সংশ্লিষ্ট অপর ব্যক্তিগণ কোন দিনও সচেতন ছিলেন না। তাই মার্কিন সরকারের আবহাওয়া দফতর এই ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার সপ্তাহখানেক আগে (৫ই নভেম্বর) তাঁদের আবহাওয়া উপগ্রহ মারফত প্রাপ্ত সংকেতের ভিত্তিতে তৎকালীন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদেরকে এই মহাবিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দেয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাতে কান দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। যদি এ বিষয়ে পূর্ব

থেকেই জনগণকে সতর্ক ক'রে দেয়া হত এবং জনগণকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ত, তা' হ'লে হয়তো লাখো লাখো লোককে এমন করুণভাবে অতর্কিতে ঘূর্ণি ও গোর্কীর শিকার হয়ে মরতে হ'ত না। লণ্ডনের 'নিউ স্টেটস্ম্যান' পত্রিকা এ বিষয়ে সরাসরি পাকিস্তান সরকারকে দায়ী করেছিলেন। তাঁরা স্পষ্ট বলেছেন, পাকিস্তান বেতার কর্তৃপক্ষ মার্কিন আবহাওয়া দফতর থেকে সংকেত পেয়ে উপকূলীয় ও দ্বীপাঞ্চলের জনসাধারণকে নিরাপদ স্থানে চলে যাবার সতর্কবাণী প্রচারের অনুমতি চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে—কিন্তু তা' পান নি।

১২ই নভেম্বরের এই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বেও অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে হ্যারিকেন নামীয় সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে পটুয়াখালী, চালনা বন্দর প্রভৃতি উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ থেকে রাজধানী ঢাকা এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ২১শে অক্টোবর চট্টগ্রাম আবহাওয়া দফতর কর্তৃক সর্বপ্রথম এই ঘূর্ণিঝড়ের আশাঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। অক্টোবরের ২৩ তারিখে এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রথম বারের মতো সংঘটিত হয়। পরদিন প্রকাশিত সংবাদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়ঃ "বিগত কিছুকালের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ মহাবিপদ সংকেতের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া গতকাল (শুক্রবার) রাত্রে প্রদেশের, বিশেষ করিয়া উপকূল অঞ্চলের কোথায় কি ঘটিয়া গিয়াছে—সর্বদিক দিয়া রাজধানী ঢাকায় একরূপ বিচ্ছিন্ন অবস্থার দরুন তাহার কোন কিছুরই সঠিক সংবাদ পাওয়া সম্ভব হয় নাই। ভাসা ভাসাভাবে যেটুকু জানা গিয়াছে বা আঁচ করা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, হ্যারিকেন নামীয় সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে পটুয়াখালীতে তো বটেই, চালনা বন্দরসহ খুলনার দক্ষিণাঞ্চলেও প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৭০]

আগেই বলা হয়েছে, এ সময় শেখ মুজিব উত্তর বঙ্গে তাঁর নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন। ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ পেয়ে তাঁর সমস্ত কর্মসূচী বাতিল ক'রে দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন এবং এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন ও পরে গভর্নর এস. এম. আহসান

ঘূর্ণিদুর্গত এলাকা পরিদর্শন ক'রে ঢাকায় ফিরে এসে ২৯শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ ক'রে দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত খাদ্য, নগদ অর্থ সাহায্য প্রেরণ, গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান এবং চাষীদের সকল খাজনা মওকুফের জন্য গভর্নরের প্রতি আহ্বান জানান। এই ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় আড়াই শতাধিক লোক নিহত হয় এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণী আশ্রয়চ্যুত হয়ে পড়ে।

এর কয়েকদিন পর ৯ই নভেম্বর চট্টগ্রাম আবহাওয়া দফতর থেকে আবার ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করা হয়। ১১ই নভেম্বর এই আশঙ্কা তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। পরদিন সত্যি সত্যি এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র আঘাত হানে। ১২ই নভেম্বর সন্ধ্যার পর পরই হ্যারিকেন নামক এই প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ের তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে যায়। ঐদিন মধ্যরাত্রির পর ঢাকার সঙ্গে খুলনা, বরিশাল পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার হ্যারিকেন কবলিত এলাকা-সমূহের সর্বপ্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মহাবিপর্যয়ের বিবরণ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকলে বাংলার মানুষ হতবাক হয়ে যায় ও শোকে মহ্যমান হয়ে পড়ে। ১৪ই নভেম্বর ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রসমূহ উপকূলীয় অঞ্চলের মহাপ্রলয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে জানায় যে, ১৫০ মাইল বেগে প্রবাহিত হ্যারিকেন নামীয় এই প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ের সঙ্গে ২০ থেকে ৩০ ফুট জলোচ্ছ্বাস তীব্রবেগে প্রবাহিত হবার ফলে বহু লোকালয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং খুলনা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল অঞ্চলে এক তুলনাবিহীন প্রলয়কাণ্ড ঘটেছে। ঢাকার সঙ্গে উপকূলীয় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাবার ফলে দুর্যোগের তিন দিন পরেও সঠিক বিবরণ জানা সম্ভব হয় নি। তবে বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত তথ্যাদির মারফত এই মহাপ্রলয়ের খবর যতই আসতে থাকে, ধ্বংসলীলার চিত্র ততই পরিস্ফুট হতে থাকে। ১২ই নভেম্বর রাত্রির ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা দিতে গিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক জানান: "সেই দুর্যোগময় রাত্রে উন্মত্ত

১৯৭০-এর ১২ই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিবরণ

দৈত্যরাজির তাথৈ-তাথৈ নৃত্যে প্রলয় বিষাণ বাজাইয়া সামনে যা কিছু পড়িয়াছে, দুমড়াইয়া, মুচড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া, ভাসাইয়া দিয়া ধ্বংসের সেই অপদেবতা সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এক সময় বিদায় নিয়াছে, কিন্তু খুলনা হতে কক্সবাজার পর্যন্ত সুবিস্তৃত উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপাঞ্চলের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে মৃত্যু আর ধ্বংসের বিভীষিকাময় স্বাক্ষর—বাংলার উপকূলে নামিয়া আসিয়াছে মৃত্যুর স্তব্ধতা।"

ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকের অভিমত

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭০]

শতাব্দীর প্রচণ্ডতম নজিরবিহীন এই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সর্ব-গ্রাসী তাণ্ডব সম্পর্কে দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকা 'বাংলার মানুষ কাঁদো' এই শিরোনামে এক হৃদয়বিদারক বিবরণে লিখেন ঃ

"পূর্ব-বাংলা, তুমি কাঁদো। কাঁদো বাংলার মানুষ। এখন কান্না ছাড়া আর তোমার জন্য কি বাকী আছে বলো? খড়কুটোর মত যারা নোনা পানির টানে সমুদ্রে হারিয়ে গেছে, তাঁদের জন্যে কাঁদো। লাখো মানুষের গলিত শব ছড়িয়ে আছে জনপদে, পানিতে কচুরীপানার মত ভাসছে অচেনা শবের মিছিল—তাঁদের জন্যে কাঁদো, বাংলা—কাঁদো।"

দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার মন্তব্য

[দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭০]

১৫ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ

"এই প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে যাঁহারা প্রাণ হারাইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করার মত ভাষা আমাদের জানা নাই। এই মুহূর্তে আমরা সকলেই শোকাভিভূত। যাহারা আজ আত্মীয়হারা, গৃহহারা তাহাদের আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি, আজিকার এই দুর্যোগ জাতীয় দুর্যোগ-রূপেই বিবেচিত হইবে। এই শোক জাতীয় শোক রূপেই অনুভূত হইবে।"

দৈঃ পাকিস্তানের সম্পাদকীয়

[দৈনিক পাকিস্তান, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭০]

এই প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী এবং চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চল এবং হাতিয়া, ভোলা, রামগতি, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী প্রভৃতি দ্বীপসমূহ দলিত মথিত হয়ে

একটি বিরাণ ভূমিতে পরিণত হয়। হাতিয়া, ভোলা, রামগতি, সন্দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপাঞ্চলের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আণবিক বোমা বিধ্বস্ত হিরোশিমা-নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞকেও ছাড়িয়ে যায়।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের রাত্রির পর নোয়াখালী জেলার উপকূলের কোলাহলময় হাতিয়া দ্বীপটিতে ভয়াবহ নীরবতা নেমে আসে। দৈর্ঘ্যে ৪২ মাইল এবং প্রস্থে ৭ মাইল আয়তন বিশিষ্ট হাতিয়া সে ভয়াল রাতে ২০ থেকে ৩০ ফুট পানির নীচে চলে যায়। ফলে হাজার হাজার নর-নারী-শিশুর মৃত্যু ঘটে, হাজার হাজার মানুষ ও প্রাণী ভেসে যায়।

বিধ্বস্ত হাতিয়া

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচাবার জন্য হাতিয়ার চার দিকে দৈর্ঘ্যে ৮২ মাইলব্যাপী ১৪ ফুট উঁচু বেড়ী-বাঁধ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু ২০ থেকে ৩০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস ১৪ ফুট উঁচু বেড়ী-বাঁধ ডিঙিয়ে সে ভয়ালরাতে হাতিয়াকে গ্রাস করে। ১৩ই নভেম্বর গভীর রাতে প্রাপ্ত খবরে পূর্বদেশ জানান: "হাতিয়ার জনসংখ্যার কমপক্ষে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নিহত হয়েছে।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭০]

বেসরকারী সূত্র থেকে প্রাপ্ত খবরে পূর্বদেশ পত্রিকায় আশঙ্কা প্রকাশ ক'রে বলা হয় যে, ১ লাখ ৭৯ হাজার জন-অধ্যুষিত এই দ্বীপের "প্রায় ৯০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন।"

[ঐ]

এই মহাপ্রলয়ের ভয়াল ছোবলে পটুয়াখালী জেলার ১৩টি দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অকল্পনীয় ধ্বংসযজ্ঞের ফলে কলকোলাহল মুখরিত ভোলা দ্বীপ নিস্তব্ধ মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। পুলিশ টেলিকম্যুনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ভোলার সংবাদ প্রথমে আসে ১৫ই নভেম্বর। জনৈক নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদের বরাত দিয়ে পূর্বদেশ পত্রিকায় খবর দেয়া হয়: "বৃহস্পতিবারের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসে বরিশাল উপকূলের জনবহুল দ্বীপ ভোলায় প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে। তিরিশ ফুট উঁচু প্লাবনের বিষাক্ত ফণা বিস্তার ক'রে রাক্ষুশী বঙ্গোপসাগর ভোলার সুষুপ্ত

পটুয়াখালী ও ভোলা

মানুষগুলোকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে গেছে। ভোলা থানার পূর্বাংশ, দৌলতখান ও তজমুদ্দী থানায় ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ লোক নেই।"

[ঐ, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭০]

পটুয়াখালী এবং ভোলায় মৃতের সংখ্যা ৪ লাখ বলে দৈনিক পাকিস্তান-এ ২১শে নভেম্বর প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়ঃ "কেবলমাত্র ভোলাতেই ২ লক্ষ লোকের প্রাণহানী ঘটে বলে বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত খবরে উল্লেখ করা হয়।" [দৈনিক পাকিস্তান, ২২ শে নভেম্বর, ১৯৭০]

সে ভয়াল রাতে বঙ্গোপসাগরের হিংস্র জলোচ্ছ্বাসে নোয়াখালী জেলার রামগতি দ্বীপের বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল "মৃত মানব সন্তানের বিরান জনপদে পরিণত হয়।" [দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭০]

সরকারী সূত্রে রামগতি দ্বীপে মৃতের সংখ্যা একুশ শত বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু রামগতি দ্বীপের চরকাদিরা ইউনিয়নের জনৈক চেয়ার-ম্যানের নিকট থেকে প্রাপ্ত খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বদেশ জানান ঃ "একটি একটি ক'রে গুণে এখন পর্যন্ত দশ হাজার মানুষের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এখনো কত মানুষ মরে হেজে পানির তলায় রয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই। প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী কমপক্ষে ১০ হাজার মানুষ হারিয়ে গেছে।"

[ঐ]

সন্দ্বীপ

চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে সব চাইতে ক্ষতির সম্মুখীন হয় সন্দ্বীপ। ১৬ ফুট উঁচু সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রায় দু'লাখ জন-অধ্যুষিত সমগ্র সন্দ্বীপকে গ্রাস করে। দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা কর্তৃক (১৫ই নভেম্বর) প্রেরিত সংবাদে সন্দ্বীপে ১৫ হাজার লোক মারা গেছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। সন্দ্বীপস্থ সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদের উল্লেখ করে পূর্বদেশ পত্রিকা জানান ঃ "সন্দ্বীপে পাঁচ হাজারের অধিক লোক মারা গেছে এবং প্রায় দশ সহস্রাধিক ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছে।"

[ঐ, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭০]

চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ দ্বীপ ছাড়াও কুতুবদিয়া, মহেশখালী, রামু উখিয়া, টেকনাফ প্রভৃতি অঞ্চল সর্বগ্রাসী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

খুলনা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ২ হাজার ৩৩৮ বর্গমাইলব্যাপী উপকূলীয় অঞ্চলের ৬ শতাধিক দ্বীপে প্রায় ৮ লাখ লোক মারা গেছে বলে ১৯৭০ সালের ১৯শে নভেম্বরের দৈনিক পাকিস্তান-এ খবর প্রকাশিত হয়। এই সময় ৯ দিনব্যাপী ঘূর্ণিবাত্যা ও জলোচ্ছ্বাস-উপদ্রুত সমগ্র এলাকা সফর শেষে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বেদনার্ত হৃদয়ে বলেন ঃ "সেই সর্বনাশা বৃহস্পতিবারের কালরাতে ঘূর্ণিঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে।"

শেখ মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলন

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭০]

খুলনা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলের উল্লেখিত প্রায় দশ লক্ষ আদম সন্তানের জীবনাবসান ছাড়াও অগণিত গবাদিপশু ভেসে যায়। সমস্ত উপকূলীয় অঞ্চলের ফসল বিনষ্ট হয়।

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচাবার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের ওয়াপদা নির্মিত বিস্তীর্ণ বেড়ী-বাঁধ বহু এলাকায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই বাঁধ কোন কোন এলাকায় ভেঙে পড়ে, আবার কোথাও কোথাও ফাটলের সৃষ্টি হয়ে মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রায় তিনশো কোটি টাকা ব্যয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এ. আই. ডি-র সহযোগিতায় পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় এই বাঁধ নির্মিত হয়েছিল।

২১শে নভেম্বর বি.বি.সি. সান্ধ্য অনুষ্ঠানে প্রচারিত এক বুলেটিনে "দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের এই সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবলীলাকে স্মরণকালের ভয়াবহ দুর্যোগ বলে আখ্যায়িত করে।" শেখ মুজিব এই সময় নির্বাচনী প্রচারণায় খুলনায় জনসংযোগে ব্যস্ত ছিলেন। ১৭ই নভেম্বর তিনি তাঁর সমস্ত কার্যক্রম বাতিল ক'রে দিয়ে উদ্বেগাকুল হৃদয়ে দুর্গত এলাকায় চলে গেলেন এবং ক্রমাগত ৯ দিন যাবৎ বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা ও নোয়াখালী জেলার ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি তাঁর দলের এবং ছাত্রলীগের সকল কর্মীকে সর্বশক্তি দিয়ে জনসেবার উদ্দেশ্যে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে নির্দেশ দিলেন।

বি. বি. সির মন্তব্য

বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রতি সকাতর অনুরোধ জানিয়েছিলেন, যেন যাবতীয় সাহায্য-সামগ্রী দ্রুত দুর্গত এলাকায় পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।

দুর্গত মানুষের সেবার জন্য বিদেশ থেকে যথেষ্ট সাহায্য-সামগ্রী পাকিস্তানে পৌঁছে। কিন্তু তা' যথাযথ কাজে লাগাতে সরকার উদাসীনতার পরিচয় দেন। একদিকে মানুষ যখন অন্ন চাই, বস্ত্র চাই বলে হাহাকার করছে, ঠিক এই সময়ে সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট কর্মচারী ও সাহায্য বন্টনকারীরা রিলিফ-সামগ্রী আত্মসাৎ-এ ব্যস্ত থাকে। এ নিয়ে সে সময় পত্র-পত্রিকায় অনেক অভিযোগ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে তার সদুত্তর পাওয়া যায় নি।

এই ঘটনার তিন বছর পরে জনৈক সুধী সাংবাদিক 'স্পষ্টভাষী' এই ছদ্মনামে ইত্তেফাকের 'মঞ্চে নেপথ্যে' শিরোনামে যে সব কথা বলেছেন তা' বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। [দ্রষ্টব্যঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৩]

ঘূর্ণিদুর্গত মানুষের সেবার জন্য সরকার সেনাবাহিনী নিয়োগ করে-ছিলেন। বিদেশী সৈন্যও সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু কতিপয় রাজনীতিবিদ এ নিয়ে বেশ হৈ চৈ শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও ঢাকায় এসে হেলিকপ্টারে চেপে ঘূর্ণিদুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের নিকট সেবা-কার্যের তৎপরতার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হয়ে পড়েন। এর পশ্চাতে তাঁর একটি মানসিক কারণ ছিল। কয়েকদিন পূর্বে এই প্রলয়কাণ্ডের পরেই ইয়াহিয়া চীন থেকে ফেরার পথে ঢাকায় অবতরণ করেন এবং এ দেশের জনগণ সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর নেবার প্রয়োজনবোধ না করেই পরবর্তী বিমানে তিনি পশ্চিমে চলে যান। দীর্ঘদিন কোন মন্ত্রী পাঠিয়ে খোঁজ নেবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি। এই দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই তিনি সোচ্চার হয়ে দেশবাসীকে ও বিশ্ববাসীকে জানাতে চাইলেন যে, আসলে তিনি বা তাঁর সরকার চুপ ক'রে নেই—সেবা-কার্য যথাযথ ভাবেই চলছে। কিন্তু জনগণ তাঁর নির্মম উদাসীনতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

শেখ মুজিবও বিধ্বস্ত এলাকা সফর শেষে ২৬শে নভেম্বর জনাকীর্ণ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। প্রায় ৭৫ জন বিদেশী ও অনুরূপ দেশীয় সাংবাদিকের উপস্থিতিতে ঢাকা আওয়ামী লীগ অফিসে আয়োজিত উক্ত

সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার বিবরণ দিয়ে সংবাদপত্রগুলোতে লেখা হ'ল ঃ "আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্কেত প্রদান থেকে শুরু ক'রে রিলিফ কার্যক্রম পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড়জনিত পরিস্থিতি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে সরকারের অবহেলা ও সম্পূর্ণ ব্যর্থতার অভিযোগ করেন।"

দুর্গত এলাকা সফর ঃ সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব

এ. পি. পি. পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ন'দিনব্যাপী উপদ্রুত এলাকা সফর শেষে ঢাকায় এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, "বিপর্যয়ের ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি ব্যাপকভাবে উদ্ধার ও রিলিফ কার্য শুরু হ'ত, তা' হ'লে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেয়েও অনাহার ও চিকিৎসার অভাবে যে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে, তাদের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হ'ত। তিনি বলেন, নৌ-বাহিনী যদি অবিলম্বে উপদ্রুত এলাকায় যেত, তা' হ'লে তারা সাগরে ভেসে যাওয়া হাজার হাজার লোককে বাঁচাতে পারতো।

শেখ মুজিব বলেন, এ ধরনের রিলিফ ও উদ্ধার কার্য শুরু করতে ব্যর্থ হওয়া ক্ষমাহীন অপরাধ। আওয়ামী লীগ প্রধান আরো বলেন, এই নিষ্ঠুর অবহেলার কাহিনী এখানেই শেষ নয়। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, তিনি যে সমস্ত উপদ্রুত এলাকায় গিয়েছেন, সে সমস্ত স্থানে ঘূর্ণিঝড়ের দশদিন পরেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এক কণা রিলিফও পৌঁছে নি। তিনি বলেন, উপদ্রুত জনগণ গাছের শিকড় খেয়ে প্রাণ ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ব্যাপক আকারে আমাশয় দেখা দিয়েছে এবং মহামারী আকারে কলেরা ছড়িয়ে পড়ছে। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, প্রদেশের জনগণ উচ্চৈস্বরে প্রতিবাদ জানানোর পরই রিলিফের কাজ শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, এখন কিছু তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু হেলিকপ্টারও চোখে পড়ে। বিমান থেকে সাহায্যদ্রব্য নিক্ষেপের যে কার্যক্রম ইতিপূর্বে কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল এখন তা' শুরু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

উপদ্রুত জনগণের জন্য রিলিফ দ্রব্যের পরিমাণ সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে রিলিফ দ্রব্য না আসলে রিলিফ দ্রব্যের পরিমাণ নিতান্তই অপ্রতুল হ'ত। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উপদ্রুত জনগণের

প্রাণ রক্ষার বিষয়টি কেবল বিশ্ববাসীর দয়ার উপর নির্ভর করছে। এটা আমাদের সরকারের জন্য দুঃখজনক দুর্নামস্বরূপ।

আওয়ামী লীগ প্রধান দুঃখ প্রকাশ করেন যে, ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত জনগণের জন্য পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের দশদিন সময় লেগেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের তুলনা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলাদের বিষয় উল্লেখ ক'রে শেখ মুজিব বলেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর অবহেলা ও বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকেই দায়ী করছি। এর পরিণামে আমরা আজ সহজেই সব রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারে পরিণত হচ্ছি। আমাদের দশ লাখ লোক মারা গেছে, আর উপদ্রুত এলাকায় তিরিশ লাখ লোক মৃত্যুর সাথে লড়ছে। তিনি বলেন, বিপর্যয়ের দু'দিন পূর্বে তথ্য সরবরাহ করা সত্ত্বেও উপদ্রুত জনগণকে আংশিক নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, সুষ্ঠুভাবে তাদের কোন হুঁশিয়ারী সঙ্কেতও দেয়া হয় নি।

শেখ মুজিব উপদ্রুত এলাকায় খাবার পানির সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় রাজনৈতিক নেতার নামোল্লেখ ক'রে শেখ মুজিব বলেন যে, জাতীয় সংহতির প্রবক্তা ও ইসলামের স্বনির্বাচিত ধ্বজাধারী মওলানা মওদুদী, খান আবদুল কাইয়ুম খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ—তাঁরা আজ কোথায়? উপদ্রুত জনগণের প্রতি সহানুভূতি জানানোর উদ্দেশ্যে একদিনের জন্যও তাঁরা বাংলাদেশে আসার সময় পান নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এটা ভাগ্যের পরিহাস যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যখন খুব ভাল শস্য ফলেছে তখন আমাদের কাছে প্রথম খাদ্যশস্যের চালান এসেছে বিদেশ থেকে। যখন পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রয়েছে, তখন পটুয়াখালীতে ঘূর্ণিঝড়ে নিহতদের লাশ কবর দিতে হচ্ছে বৃটিশ মেরিনদের। তিনি এটাকে আমাদের জন্য লজ্জাকর বলে উল্লেখ করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, রিলিফ কার্যের জন্য বিদেশী সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে এসেছে। তিনি বলেন, তাদের কাজ শেষ হ'লে তারা ফিরে যাবেন বলে আমরা আশা করি।

শেখ মুজিব অভিযোগ করেন যে, রিলিফ দ্রব্যের সুষ্ঠু বণ্টনে নোয়াখালীতে জেলা কর্তৃপক্ষ অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন যে, একজন ছাত্রনেতা রিলিফ কাজের জন্য পরিবহন দেওয়ার অনুরোধ জানাবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিকট গেলে ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে ছাত্রনেতাটিকে চড় মারা হয়। এর পর ছাত্রদের গ্রেফতার ও হয়রানী চলতে থাকে বলে তিনি জানান।

উপদ্রুত ব্যক্তিদের সব রকম রিলিফ প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে শেখ মুজিব বলেন যে, কয়েকদিন দেরী করলে রিলিফ নেওয়ার জন্য সেখানে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

শেখ মুজিব বলেন যে, দেশে জনগণের সরকার থাকলে সুষ্ঠু রিলিফ কাজের জন্য হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা সম্ভব হ'ত এবং জনগণের সরকারের কাছে জবাবদিহির ভয়ে আমলারাও এরূপ উদাসীন থাকতে পারতেন না।

পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যর্থতার জন্য দায়ী আমলাদের কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ ক'রে শেখ মুজিব বলেন যে, জনগণের সরকার ক্ষমতায় গেলে তারা প্রয়োজন হ'লে এ সমস্ত আমলার বিচার করবেন।

জনগণকে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করার জন্য উপদ্রুত এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিতে বাধ নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় থেকে জনগণকে রক্ষা করতে পারে এমন আশ্রয়স্থল নির্মাণ ও উন্নততর হুঁশিয়ারী সঙ্কেত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, উপদ্রুত এলাকায় বেঁচে থাকা জনগণকে সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত ক'রে নতুন জীবন গড়ে তোলার জন্য তাদের সব রকম কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।

শেখ মুজিব বলেন, আমরা স্বায়ত্তশাসন অর্জনে সক্ষম হলেই কেবল তা' সম্ভব হবে। আমরা আজ এই সংকল্প করছি যে, উপকূলীয় এলাকার আমাদের ভাইদের উপর যা ঘটেছে, ভবিষ্যতে তা' আর ঘটতে দেয়া হবে না। তিনি বলেন, এই ঐতিহাসিক বিপর্যয় বাংলাদেশের সাতকোটি মানুষের করুণ অবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছে।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অবর্ণনীয় বলে উল্লেখ ক'রে আওয়ামী

লীগ প্রধান বলেন যে, পটুয়াখালী, ভোলা ও নোয়াখালীর অনেক স্থানেই মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগের বেশী রক্ষা পায় নি। তিনি বলেন যে, বেঁচে যারা আছেন তাঁরাও আজ সম্পূর্ণ নিঃস্ব। আহতদের ক্ষতস্থানগুলোতে পচন ধরেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও প্রাণহানির সংখ্যা নিরূপণের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা চালানো হয় নি। তিনি বলেন যে, দুর্গত এলাকায় রিলিফ-কার্য পরিচালনাকারী বহুসংখ্যক আওয়ামী লীগ ও ছাত্র-লীগ কর্মী পরিবহনের অভাবে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

শেখ মুজিব বলেন যে, তথাকথিত দুর্গম এলাকায় রিলিফ দ্রব্য পৌঁছানোর জন্য সরকার বিশেষ কোন চেষ্টাই করেন নি। তিনি বলেন যে, একটা ছোট ভাঙ্গা লঞ্চে ক'রে তিনি উপদ্রুত এলাকায় প্রায় সবখানেই যখন যেতে পেরেছেন, তখন বিপর্যয়ের দশ দিন পরেও উপদ্রুত এলাকায় রিলিফ না পৌঁছানোর কোন যুক্তি নেই।

শেখ মুজিব বলেন যে, বিশ্বের যে সমস্ত দেশ এই বিপদের দিনে দুর্গতদের সাহায্য দিয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার থাকা সত্ত্বেও রিলিফ কাজের জন্য আমাদের যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্রের হেলিকপ্টারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। শেখ মুজিব বলেন যে, বিশ্ব-ব্যাপী বিভিন্ন ব্যক্তি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান উপদ্রুতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করলেও আমাদের জনগণের রক্ত শোষণ ক'রে ধনী হওয়া ২২-পরিবারের কেউ উল্লেখযোগ্য সাহায্য দেয় নি।

তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের বস্ত্র মিলগুলো বাংলাদেশকে প্রধান বাজার হিসেবে ব্যবহার করলেও তারা নিহতদের জন্য এক গজ কাফনের কাপড়ও দেয় নি।

তিনি প্রশ্ন করেন, এজন্যই কি আমরা গত দু'দশক যাবৎ আমাদের সম্পদের শতকরা ৭২ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করেছি? এ জন্যই কি আমরা আমাদের বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ দেশরক্ষা খাতে ব্যয় করেছি? এ জন্যই কি বাংলাদেশের পাটচাষীদের অনাহারের বিনিময়ে করাচী ও লায়ালপুরের পুঁজিপতিদের সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছে?

তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে আমরা বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বেঁচে আছি। আজ স্বাধীনতার ২৩ বছর পর বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রণীত হয় নি। দশ বছর আগে এমনি ঘূর্ণিঝড় হলেও, দশ বছর পর সেই একই এলাকার লোক ঘূর্ণিঝড়ে আরো হাজারগুণ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন যে, ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় নিরাপদ আশ্রয়স্থল নির্মাণের জন্য গত দশ বছরেও ২০ কোটি টাকা পাওয়া গেল না। অথচ ইসলামাবাদে বিলাসবহুল ভবন নির্মাণের জন্য দু'শো কোটি টাকারও বেশী পাওয়া গেছে। শেখ মুজিব বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বেই পশ্চিম পাকিস্তানে 'মঙ্গলা' ও 'তারবেলা' বাঁধ নির্মাণের জন্য শত কোটি ডলার মঞ্জুর করা সম্ভব হয়েছে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭০]

লক্ষ লক্ষ লোকের অকাল মৃত্যুতে মানব দরদী আর এক নেতা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় উপদ্রুত অঞ্চলে পাগলের মত ছুটে গিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী। দুর্গত এলাকা পরিদর্শনকালে পতেঙ্গার কাছে তাঁর জাহাজ আটকে রাখা হয়েছিল। সরকারী আমলাদের এই ষড়যন্ত্রে গণমনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সরকারী আমলারা ভাসানী সাহেবের পথরোধ করতে পারে নি। উপদ্রুত অঞ্চল থেকে ফিরে এসে ১৯৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর পল্টনের এক জনসভায় তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর এই ভাষণ নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এতে যেমন সমগ্র পরিস্থিতির একটি চিত্র পাওয়া যাবে, তেমনি এই ঘটনাকে মওলানা ভাসানী যে কিভাবে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তারও প্রমাণ মিলবে। তিনি পল্টনে এসেই নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর দ্বিধান্বিত মনোভাব ব্যক্ত করলেন। তাঁর সেই দরদমাখা ভাষণটি পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত হ'ল ঃ

"মওলানা ভাসানী মানব-ইতিহাসের বৃহত্তম দুর্যোগে বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের সহায়-সম্বলহীন লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষের সাহায্য ও পুনর্বাসনে সর্বশক্তি ও সম্পদ নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য প্রতিটি বাঙালীর প্রতি আকুল আবেদন জানান।

প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে বিরান বঙ্গোপসাগরীয় উপকূল এলাকা সফর শেষে গতকাল পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভায়

বক্তৃতাকালে মওলানা ভাসানী বলেন, বাঙালীর জীবনে আজ মহা দুঃখের দিন। আমাদের জীবনে নেমে এসেছে মহা দুর্যোগ। বিধ্বস্ত, বিরান, উন্মুক্ত আকাশের নীচে আমাদের অগণিত মা-বোন উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে। বিরান জনপদে কোথায়ও কাপড় নেই, এই শীতের দিনে ধনী-গরীব কারও মাথা গোঁজার ঘর নেই।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মওলানা ভাসানী বলেন, হজরত নূহের জামানার পর এতবড় প্রলয় কাণ্ড মানুষের ইতিহাসে ঘটে নি। পূর্ব বাংলার উপকূলের ১০ থেকে ১২ লক্ষ নর-নারী ও শিশু এই দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু মহা ধ্বংসযজ্ঞের ১০ দিন পরও প্রায় ৪ লক্ষ লাশ পড়ে আছে—এদের দাফনের কোন ব্যবস্থা নেই। গলিত লাশ ও মরা পশুর লাশের দুর্গন্ধের মধ্যে যারা এখনও আর্তনাদ করছে, আল্লাহর কুদরতেই তারা বেঁচে আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৭০]

দক্ষিণ বাংলার ঘূর্ণিঝড়ের সুযোগ গ্রহণ করলেন গণ-সমর্থন-বিচ্যুত রাজনীতিবিদগণ। এঁদের মধ্যে মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, আতাউর রহমান খান, ওয়ালী খান, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ প্রমুখ একবাক্যে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবী জানালেন। এই সমস্ত রাজনীতিবিদ গণস্বার্থের উর্ধ্বে স্থাপন করলেন দলীয় স্বার্থ। জনগণ হাতে ক্ষমতা গ্রহণ না করলে যে দেশের কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়—নির্বাচন যত বিলম্বিত হবে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনগণের সমবেত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগও যে ততই বিলম্বিত হবে, এই সত্যটিকে তাঁরা দলীয় স্বার্থে চাপা দিয়ে বসলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু যে বিশ্লেষণ প্রদান করলেন এবং যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করলেন তা' নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বললেন, "জনগণকে অবশ্যই সর্বময় ক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে। নির্বাচন হয় ভালো, আর যদি তা' না হয়—জাগ্রত জনগণের আত্মশক্তিতেই উহা আদায় করিতে হইবে।" নির্বাচন স্থগিত রাখা হ'লে তিনি কি করবেন, জানতে চাওয়া হ'লে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে তিনি তাঁর দলীয় সদস্যদের সাথে আলোচনা করবেন। তবে কোন কিছুকেই বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া হবে না বলেও তিনি জানান।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে এখনো এক ষড়যন্ত্র চলছে। আমলাতন্ত্রী, কায়েমী স্বার্থবাদী, ক্ষমতাসীন মহল আর সেই পুরানো চক্রই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু তারা জানে না, নির্বাচন নিয়ে যদি কোন খেলা শুরু হয়, তা' হ'লে তা' আগুন নিয়ে খেলারই সামিল হবে।

তিনি বলেন, যে সব রাজনৈতিক নেতা নির্বাচন স্থগিত রাখার কথা বলছেন, তাঁরা আসলে নিজেদের নেতৃত্ব রক্ষার জন্যে সামরিক সরকারকেই স্থায়ী করতে চায়। সাতই ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে এসব নেতা আর তাঁদের দলের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। এমনকি তাঁদের বিবৃতি দানের অধিকারও নস্যাৎ হয়ে যাবে। খারাপ ছাত্রেরা যেমন পরীক্ষা পিছানোর দাবী তোলে, এ-সব নেতাও তেমনি নির্বাচন পিছানোর ধুয়া তুলেছেন।"

নির্বাচনের মাধ্যেমে ৬-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করা সম্ভব হবে কি না জানতে চাওয়া হ'লে শেখ মুজিব বলেন, "জনগণ যদি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় দেয় তা' হ'লে তা' আদায় হবেই—আমি এই নির্বাচনকে ৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ব্যাপারে গণভোট বলেই মনে করি।" শেখ মুজিবুর রহমান অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি এবং সমস্ত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারেরও দাবী জানান।

৬-দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবী পূরণ না হ'লে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আন্দোলন করবেন কি না জানতে চাওয়া হ'লে শেখ সাহেব বলেন, "আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানিয়েছি, স্বাধীনতার নয়। আমরা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে চাই। তারা যদি তা' মেনে না নেয়, তা' হ'লে জনগণই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।"

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "বাঙালীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের লাখো লাখো ভাইকে বিসর্জন দিয়েছে। বাংলাদেশের সার্বিক মুক্তির জন্য আমরা আরো দশ লাখ প্রাণ বিসর্জন দিতে পারব।"

আরো দশ লাখ লোকের প্রাণ দেওয়ার কথা বলতে তিনি দৈহিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বোঝাতে চেয়েছেন কি না জানতে চাওয়া হ'লে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "আমি এখনই তা' বলছি না—ভবিষ্যৎই তা' বলবে। আমার দল একটি গঠনতান্ত্রিক দল। আমরা নিয়মতান্ত্রিক

আন্দোলনই শুরু করবো। কিন্তু তারা যদি অনিয়মতান্ত্রিক পথ বেছে নেয়, তা' হ'লে জনগণ তাদের নিজেদের পথই অনুসরণ করবে।"

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "আমরা এখন নিশ্চিত যে, প্রাকৃতিক ধ্বংস-লীলার হাত থেকে বাংলাদেশের জনগণকে বাঁচাতে হলে ৬-দফা আর ১১-দফার ভিত্তিতে আমাদের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতেই হবে। আমাদের অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের প্রাথমিক ক্ষমতা থাক-তেই হবে। সরকার যথাযথভাবে সাহায্য দানের কাজ পরিচালনা করতে না পারায় এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের শাসনের দায়িত্ব আমা-দেরই নিতে হবে, আমাদেরই নিতে হবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত—কি ভাবে আমাদের সম্পদ ব্যবহৃত হবে, তাও ঠিক করতে হবে আমাদেরই—কোথা থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, কি ভাবে সে অর্থ ব্যবহার করা হবে তাও আমরাই ঠিক করবো। পশ্চিম পাকিস্তানী আমলা, পুঁজিপতি আর সামন্ত-বাদী স্বার্থের স্বেচ্ছাচারী শাসনের দুর্ভোগ আমরা আর পোহাব না।'

শেখ মুজিবুর রহমান আরো বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমেই হোক, কিংবা নির্বাচন ব্যর্থ হ'লে জাগ্রত জনতার শক্তির মাধ্যমেই হোক, ক্ষমতা জনগণকে জয় করতেই হবে। শক্তিশালী কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা জনগণের যথেষ্ট হয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের দাবীকে আর অস্বীকার করা যাবে না। জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করা যায় বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সর্তক হোন—বাংলাদেশ আজ জেগেছে। নির্বাচন যদি বানচাল করা না হয় তা'হ'লে নির্বাচনের মাধ্যমেই বাংলাদেশ তার রায় জানিয়ে দেবে। আর নির্বাচন যদি বানচাল হয়, ঝড়ে নিহত দশ লাখ লোকের কাছে ঋণী বাংলাদেশের জনগণ তা' হ'লে, আমরা যাতে মুক্ত জনতা হিসেবে বাঁচতে পারি এবং বাংলাদেশ যাতে নিজের ভাগ্য নিজে নির্ধারণ করতে পারে, তার জন্যে প্রয়োজন হ'লে আরো দশ লাখ প্রাণ বিসর্জন দেবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান আরো বলেন, বর্তমানের অভিজ্ঞতায় প্রতিটি বাঙালী হাড়ে হাড়ে এই মৌলিক সত্যটিই উপলব্ধি করেছে যে, এযাবৎ আমাদের একটি উপনিবেশ, একটি বাজার হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। একটা স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিকের জন্মগত অধিকার থেকেও আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। সমস্ত কিছুর সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে রাওয়ালপিণ্ডি

আর ইসলামাবাদে। সমস্ত ক্ষমতাই ন্যস্ত করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার আর তার আমলাদের হাতে।"

একজন বিদেশী সাংবাদিক পাকিস্তানের অস্তিত্বের চেয়ে 'বাংলার' টিকে থাকাকেই তিনি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন কি না জানতে চাইলে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা পাকিস্তানী, সংখ্যাগরিষ্ঠকে উপেক্ষা করা যেতে পারে না।"

দেশের ঐক্য সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "সবার স্বার্থকে স্বীকৃতি দিলেই ঐক্য হতে পারে, তারা যদি আমাদের স্বার্থকে অবহেলা বা উপেক্ষা করে, আমাদের যদি একটি কলোনী আর একটি বাজার হিসেবে ব্যবহার করে তা' হ'লে আর ঐক্য থাকে কি করে? আমরা মনে করি, আমাদের একটি বাজার হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭০]

প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে রিক্ত ও নিঃস্ব জনগণকে বাঁচাবার জন্যে মোজাফ্ফর আহমদ দেশের জনগণের নিকট আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে, দেশের এই সঙ্কটজনক অবস্থায় নির্বাচনের কথা চিন্তাই করা যায় না। কারণ যেখানে লাখ লাখ লোক অকালে এই মহাভয় ঘূর্ণিঝড়ের শিকারে পরিণত হয়েছে—যেখানে অসংখ্য লোক অনাহারে, রোগে, শোকে মৃত্যু-পথযাত্রী, সেখানে এই আর্তের সেবাই প্রধানতম মানব-ধর্ম। তাই তিনি তাঁর পার্টির প্রধান হিসেবে সরকারের নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেন এই মুহূর্তে জাতীয় নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। ১৯৭০ সালের ২৯শে নভেম্বর তিনি এবং সৈয়দ আলতাফ হোসেন তাঁদের দলের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। বিবৃতিতে জনাব মোজাফ্ফর আহমদ বলেনঃ "গত ১২ই নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব বাংলার দশ লাখ নরনারী-শিশুর

ওয়ালী ন্যাপের সিদ্ধান্ত

মৃত্যু ও ২৫/৩০ লাখ মানুষের মরণোন্মুখ অবস্থার দরুন নির্বাচন কিছুদিন পিছাইয়া, এখন সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির সমস্ত শক্তি পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য ন্যাপের পক্ষ হইতে আমরা পূর্বে আহ্বান জানাইয়াছিলাম। কিন্তু সরকার তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। এই অযৌক্তিক ও

অমানবিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। এখনও লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, চিকিৎসাহীন হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে—এখনও তাহাদের নিকট রিলিফ পৌঁছে নাই। এমনকি, সরকার রিলিফের জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীকেও আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। তাই বর্তমান পরিস্থিতি কোন মতেই জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ ও সময় হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। অথচ এই অবস্থাতেও সরকার ৭ই ডিসেম্বর তারিখেই নির্বাচন দেশবাসীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মহাপ্রলয় বিধ্বস্ত এলাকাগুলির জাতীয় পরিষদে ৯টি আসনে নির্বাচন স্থগিত রাখা হইয়াছে। এই নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না বলিয়া প্রেসিডেন্ট নিজেই বলিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও কোন্ যুক্তিতে ও কি উদ্দেশ্যে সরকার ৭ই ডিসেম্বর তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর।

অতএব, আমরা পুনরায় দাবী করিতেছি যে, যেহেতু পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ দুর্গত জনগণকে রক্ষা করিবার কাজকে এখনই অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন এবং যেহেতু এখন নির্বাচন হইলে বিধ্বস্ত এলাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদকে বেকার বসিয়া থাকিতে হইবে—সেহেতু অন্ততঃ পূর্ব বাংলার নির্বাচন ৭ই ডিসেম্বরে না করিয়া পরে সকল আসনে একই সঙ্গে করা হউক। আমরা আশা করি, সরকার আমাদের আবেদনে সাড়া দিবেন। যদি আমাদের এই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া সরকার মহাপ্রলয়ে—পূর্ব বাংলার জনগণের এই বিপর্যয়ের সময়ে—সেই বিপর্যয়ের মাত্র তিন সপ্তাহ পরে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তাহা হইলে সরকারের গণবিরোধী চরিত্রই আবার জনগণের সামনে ফুটিয়া উঠিবে। যে সকল দল নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী তুলিয়া গণবিরোধী সরকারের ঐ অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত লইতে সাহায্য করিয়াছে তাহারাও যে পূর্ব বাংলার লাখ লাখ দুর্গত মানুষকে রক্ষা করার চাইতে মন্ত্রিত্বের গদিকে বড় মনে করে তাহাও তাহাদেরই দাবী হইতে জনগণের নিকট পরিষ্কার হইয়াছে।"

[দৈনিক সংবাদ, ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭০]

মানবেতিহাসের ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব বাংলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালো এবং এই পরিস্থিতিকে যে আন্তরিকতা নিয়ে মোকাবিলা করবার প্রয়োজন ছিল, পূর্বেই বলা হয়েছে, স্বৈরাচারী সরকারের তা' ছিল না। প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রতিহত করা সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু জনশক্তিকে উপেক্ষা করার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে, স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া সরকার তা' অনুধাবনে ব্যর্থ হ'ল। সরকারী এই নিদারুণ ব্যর্থতাকে সুকৌশলে বঙ্গবন্ধু ৬-দফার স্বপক্ষে ব্যবহার করলেন। তিনি ব্যাপকভাবে গণসংযোগ স্থাপন ক'রে প্রত্যেকটি জেলা-শহরে এবং অধিকাংশ মহকুমা-শহরে জনসভার আয়োজন ক'রে অগ্নিবর্ষী ভাষণ দিয়ে জনমত গঠন করলেন। তাঁর প্রত্যেকটি সভায় রেকর্ডসংখ্যক জনসমাগম ঘটতে লাগলো। বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তায় অন্য দলগুলো সাংঘাতিকভাবে স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করতে শুরু করলো।

এই সাথে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ৬-দফার অন্যতম বিষয় দুই প্রদেশের আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্রও তুলে ধরা হ'ল। আওয়ামী লীগ প্রচারিত বৈষম্যের একটি ছক এখানে তুলে ধরা যায়ঃ

সোনার বাংলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্বখাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী	শতকরা ১৫ ভাগ	শতকরা ৮৫ ভাগ
সামরিক বিভাগে চাকুরী	শতকরা ১০ ভাগ	শতকরা ৯০ ভাগ
চাউল মণপ্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণপ্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সেরপ্রতি	৫ টাকা	২·৫০ টাকা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই সব বৈষম্যমূলক তালিকা জনগণের মধ্যে অপূর্ব আলোড়ন ও সাড়া সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের

কায়েমী স্বার্থবাদীদের অনাচার, অত্যাচারের চিত্র এবং শোষণের ফলে উদ্ভূত বৈষম্য সম্পর্কে জনগণকে সজাগ ক'রে তুলতে আওয়ামী লীগ যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে তা' সর্বত্র অভিনন্দিত হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দল ঠিক এমনভাবে কার্যক্রম নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়। তাদের কোন কোন দলের উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল না একথা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যে সব দলের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল সেই দলগুলোও পূর্ব বাংলার স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিতে নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তা' ছাড়া বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা এমন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, অপর দল বা দলীয় নেতৃবৃন্দ সেই জনপ্রিয়তার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে বারবার পশ্চাদ্গামী হয়েছেন আর জনগণের নিকট থেকে ব্যর্থতার গ্লানি সঞ্চয় করেছেন।

আওয়ামী লীগ, বিশেষ ক'রে বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ইয়াহিয়া সরকার এবং তিনি নিজে এতদিনে একটি ধারণা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। সে কারণেই অপর দলসমূহ বা নেতৃবৃন্দ প্রাকৃতিক দুর্যোগের অজুহাত তুলে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবী বারবার উত্থাপন করলেও ইয়াহিয়া খান নির্বাচন পিছিয়ে দিতে সাহস পান নি। কেননা, শেখ মুজিব কঠোর ভাষায় সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, নির্বাচন পিছিয়ে দিলে তার পরিণাম সবার জন্যই অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠবে। অবশেষে স্থির হ'ল যে, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ই ও ১৭ই ডিসেম্বর যথানিয়মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং দুর্গত এলাকার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৩০টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী।

এই অত্যাসন্ন জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে যেন আইন-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এ সম্পর্কে দেশবাসীর উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক ভাষণদান করেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন: "...... নির্বাচন অনুষ্ঠিত হউক ইহাই সরকারের কাম্য। কাজেই শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কোন কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হইবে না।"

নির্বাচন প্রাক্‌কালে ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ

প্রেসিডেন্ট শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং সাধারণ মানুষের জীবন যাতে বিপর্যস্ত হয়ে না পড়ে তার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে নির্বাচনে বিজয়

লাভের পর বিনয় এবং পরাজয়ের পর ধৈর্য ও সমঝোতা প্রদর্শনের জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন ঃ "যেন আসন্ন নির্বাচনে তাঁরা আইনের সীমায় থাকেন এবং তাঁদের নিজস্ব প্রার্থীর পক্ষে প্রচারকার্য চালাইবার সময় সংশ্লিষ্ট বিধির শর্তের কথা সর্বদা স্মরণ রাখেন। তিনি আরও জানান যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা সরকারের নাই।

... ...

তিনি তাঁর ভাষণে আরও বলেন ঃ "বর্তমান পর্যায়ে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এ সকল নির্বাচন আইনগত কাঠামো আদেশ ও সামরিক শাসনের সার্বিক আওতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচন হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনার শুধুমাত্র প্রথম পর্যায়। পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং শেষ পর্যায়ে হচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর। এই শেষ পর্যায় সমাপ্ত হওয়ার এবং সামরিক শাসন তুলে নেয়ার পর সার্বভৌম ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের হাতে চলে যাবে।

আমি নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ, বিশেষ ক'রে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের নিকট সুপারিশ করতে চাই যে, তাঁদের নির্বাচন এবং জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের মধ্যকার সময়ে তাঁরা ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রধান বিধান সম্পর্কে মতৈক্যে পৌঁছার জন্য একত্রে মিলিত হতে পারেন। এর জন্য গ্রহণ-বর্জনের সহনশীল মনোভাব, পারস্পরিক আস্থা এবং আমাদের ইতিহাসে এই সন্ধিক্ষণের চরম গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধির প্রয়োজন হবে। পাঁচটি মূলনীতির উপর যে শাসনতন্ত্র রচিত হবে এ কথা ইয়াহিয়া বিশেষ জোরের সাথে ঘোষণা করেন। আরও বলেছিলেন যে, যদি শাসনতন্ত্রই এই নিয়মের বহির্ভূত হয়, তবে ধরে নিতে হবে যে, দেশে সামরিক শাসনই বলবৎ আছে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭০]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার শাসনতন্ত্র রচনার বিষয়টি ঘোষণার পর অনেক রাজনৈতিক দলই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ৬-দফার ভিত্তিভূমিতে স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। নির্বাচনী প্রচার অভিযানে

তিনি জনসাধারণকে তাঁর ৬-দফার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

শাসনতন্ত্র বিষয়ে প্রেসিডেন্টের একনিষ্ঠ মনোভাব যেমন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিচলিত করেছিল, তেমনি জনসাধারণও উপলব্ধি করেছিল যে, এ আর কিছুই নয়, ক্ষমতা হস্তান্তর না করার অজুহাত মাত্র। আর এর পরিণাম এক অশুভ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছে। দেশের জনগণ একটি কথাই বুঝতে পারেন যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশের শুভাশুভ বিচার ক'রে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ক'রে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সে নিয়মের বহির্ভূত কাজ হতে যাচ্ছে দেখে অনেকেই বিস্মিত ও হতবাক্ না হয়ে পারলেন না। যা হোক, এ বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে প্রথমদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল সত্যি, কিন্তু ক্রমশঃ তা' নিস্তেজ হয়ে গেল। কেননা সবার মনে নির্বাচনের প্রশ্নই তখন বড় ছিল। সবাই ধারণা করলেন, নির্বাচন হয়ে গেলে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি একসাথে বসলে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার অবসান ঘটবেই। সে কারণেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রতিনিধি ঠিক ক'রে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল। যদি সেই মুহূর্তে শাসনতন্ত্রের আইন কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলতে থাকত এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচন বয়কট করত তবে অবস্থা নিশ্চয়ই জটিলতার পথে মোড় নিত। যে ভয়াবহ পরিস্থিতি একাত্তরের ২৫শে মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল, তা' আরো পূর্বেই ঘটতে পারতো।

যা হোক, পূর্ব-বাংলার জনসাধারণ আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে শোষণ থেকে মুক্তি কামনা করেছিল। সে কারণেই আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের পূর্বে শাসকগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ মোকাবেলায় নামা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। অবশ্য কিছু কিছু দল উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তখন সংগ্রামী মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকেন। তাঁদের স্লোগানে তা' পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যেমন—'কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধর, —বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'পিণ্ডি না ঢাকা,—ঢাকা ঢাকা', 'পদ্মা যদি মেকং নয়, এস পদ্মা মেকং করি, এইখানেতেই ভিয়েৎনাম লড়ি' ইত্যাদি। কিন্তু এই সব পোস্টার, স্লোগান, হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতি দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত

নির্বাচনী স্লোগান

করা সম্ভব হয় নি। অতি সংগ্রামী ও অতি বিপ্লবীদের এটাই দোষ যে, তাঁরা সময় বুঝে চলতে শিখেন নাই এবং জনগণের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। বর্তমানেও তাঁদের ব্যর্থতার মূল উৎস এখানেই নিহিত আছে। যা হোক, এমনি

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন

পরিবেশের মধ্যে ৭ই ডিসেম্বর (১৯৭০) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। নির্বাচনের দিনে বিভিন্ন প্রভাতী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলামে এই দিনটির গুরুত্বের কথা জোর দিয়ে ঘোষণা ক'রে যে সব কথা লিখিত হয় তা' বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য ঃ

"অবশেষে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের নির্ধারিত দিবসটি সমুপস্থিত। ইহার পথে বাধা-বিপত্তি অনেক আসিয়াছে, দ্বিধা-সংশয় অনেক জাগিয়াছে, অনেক হুমকি ও উস্কানি প্রদত্ত হইয়াছে। বিভিন্ন অজুহাতে নির্বাচন অনির্দিষ্ট কাল বন্ধ রাখার জন্য প্রেসিডেন্টের উপরও প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হইয়াছে। নির্বাচন অনুষ্ঠান ও গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে গণতন্ত্র বিরোধী মহল, 'গণতন্ত্রবাদী' বলিয়া পরিচয় প্রদান-কারী কতিপয় বিশেষ মহল, কোন কোন অতি প্রগতিবাদী মহল এবং ধর্ম ব্যবসায়ী মহল যেন ঐক্যজোট গঠন করতঃ একটা বছর ধরিয়া কাঁদা ছড়াইয়াছে। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, শেখ মুজিব যদি নির্বা-চনের দাবীতে অনড় অটল না থাকিতেন, তবে হয়ত ৫ই অক্টোবরের পথেই ৭ই ডিসেম্বরও অতিক্রান্ত হইত, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইত না। জনগণের মৌলিক অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইত না। আর এবার নির্বাচন না হইলে এই দুর্ভাগা দেশে কবে নির্বাচন হইত, উহা আদৌ হইতে পারিত কিনা, সামরিক শাসন কত দিন দীর্ঘায়িত হইত, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রতরী কোন্ দিকে ধাবিত হইত এবং জাতীয় সংহতি অখণ্ডতার দশা কি দাঁড়াইত কে বলিতে পারে? তবে একটা জিনিস নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, আজিকার এই নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন না হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলই কাঁপিয়া উঠিত এবং জাতির গোটা ভবিষ্যতই এক মারাত্মক অনিশ্চয়তায় নিক্ষিপ্ত হইত।

……ভোটের ক্ষমতাই জনগণের ক্ষমতা। এবং সেই ক্ষমতাই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা। মহাপরীক্ষার এই দিনটিতে প্রতিটি দেশপ্রাণ নাগরিক বঞ্চিত-বিশীর্ণ পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের শাশ্বত দাবী সম্মুখে রাখিয়া এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজেদের সেই ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রতীতি লইয়াই আজিকার এই মঙ্গল প্রভাতকে আমরা অভিনন্দন জানাই।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, সম্পাদকীয়, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭০]

জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমেই তাঁদের সুনিশ্চিত রায় জানিয়েছিলেন। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ দুটো মাত্র আসন ছাড়া সবগুলো আসনেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। আওয়ামী লীগ যে দুটো আসন লাভ করতে পারে নি, সে দুটো আসনের একটিতে পি. ডি. পি. প্রধান নূরুল আমীন এবং অপরটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায় নির্বাচিত হন। জাতীয় পরিষদে নির্বাচন চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হ'লে নির্বাচনের যে ফলাফল পাওয়া যায় তাতে জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭, পিপলস্ পার্টি ৮৮, কাইয়ুম মুসলিম লীগ ৯. কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৭, জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (হাজারভি গ্রুপ) ৭, মারকাজি-জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (থানভি গ্রুপ) ৭, জামাতে ইসলাম ৪, ন্যাপ (ওয়ালীপন্থী) ৭, পি. ডি. পি. ১, নির্দল প্রার্থীরা ১৪ ও কনভেনশন মুসলিম লীগ ২টি আসন লাভ করে। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ যে ঐতিহাসিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তার তুলনা বিশ্বের নির্বাচনের ইতিহাসে বিরল।

নির্বাচনী ফলাফলঃ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়

অতঃপর ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, মোট ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮, পি. ডি. পি. ২, ন্যাপ (ওয়ালীপন্থী) ১, নেজামে ইসলাম ১, জামাতে ইসলাম ১ ও নির্দলীয় প্রার্থীরা ৭টি আসন লাভ করে। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের বিজয় শুধু ঐতিহাসিক বিজয়-গৌরবকেই প্রতিষ্ঠা করে না—তুলনামূলকভাবে প্রতিপক্ষের প্রার্থিগণ, এমন কি নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত এত কম সংখ্যক ভোট লাভ করেন যে, অনেকেরই জামানতের টাকা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান চারটি কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিটি কেন্দ্র থেকেই রেকর্ড-সংখ্যক ভোট পেয়ে তিনি জয়লাভ করেন। অথচ তাঁকে পরাজিত করবার জন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী প্রধান নেতারাও তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ওয়াহিদুজ্জামান বঙ্গবন্ধুকে চ্যালেঞ্জ দান করেছিলেন। শেখ মুজিব তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রে বলেছিলেন যে, "আপনার বিরুদ্ধে আমার দলের একজন সাধারণ কর্মী-প্রার্থীই যথেষ্ট।" তাঁর এই উক্তি বাস্তবে যে কত সত্য ছিল তা' আমরা সবাই অবগত আছি। আওয়ামী লীগের এই নিরঙ্কুশ বিজয়ের পশ্চাতে যাঁর একক প্রভাব ঐন্দ্রজালিক প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রকৃতপক্ষে এদেশের মানুষ কোন প্রার্থীর গুণ বিচার ক'রে ভোট দেন নি। বঙ্গবন্ধুর অনমনীয় এবং দেশনিবেদিত ব্যক্তিত্বই জনগণকে তাঁর সমর্থনের পক্ষে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দেশের অধিকাংশ মানুষ বঙ্গবন্ধুকেই ভোট দান করেন—তাঁর দলের প্রতীক নৌকায় ভোট দিয়েছেন, সর্বক্ষেত্রে প্রার্থীকে নয়।

আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ

৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ৯ই ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে বলেনঃ "আমাদের জনগণ এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করিয়াছে। তাহারা এক অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়া তাহাদের এই রায় প্রদানের অধিকার অর্জন করিয়াছে আর সেই অবিরাম সংগ্রামে হাজার হাজার মানুষ জীবন উৎসর্গ করিয়াছে এবং অগণিত মানুষ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে। জনগণের সংগ্রামকে উহার প্রথম বিরাট বিজয়ে মণ্ডিত করার জন্য আমরা সর্বশক্তিমান আল্লার নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা আমাদের শহীদদের স্মৃতির প্রতি সালাম জানাইতেছি যাহারা নির্মম নিপীড়নের মুখেও এই কারণে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছে যে, একদিন যেন আমরা প্রকৃত স্বাধীনতায় বসবাস করিতে পারি। আওয়ামী লীগের বিরাট বিজয় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের বিজয়। আমরা

আওয়ামী লীগের বিজয়লাভে জনগণের প্রতি শেখ মুজিবের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

আমাদের জনগণ, আমাদের ছাত্র, আমাদের শ্রমিক ও কৃষকদের ভালবাসায় অভিভূত হইয়াছি। তাহারা ইহা যথার্থভাবেই ব্যক্ত করিয়াছে যে, আওয়ামী লীগ তাহাদেরই পার্টি। আমরা নিশ্চিত যে, তাহারা ১৭ই ডিসেম্বরে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও ইহা করিবে। আমাদের দলীয় কর্মী, যাহারা দারুণ বৈষয়িক অসুবিধা সত্ত্বেও অবিরাম কাজ করিয়াছে, তাহারা নিজেদেরকে যথার্থ পুরস্কৃত মনে করিয়াছে। যে সাধারণ নির্বাচন সর্বোপরি ৬-দফা/১১-দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বাংলাদেশের মানুষের এক গণভোট, সেই নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে একটি পরিষ্কার রায় প্রদানের ব্যাপারে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে জনসাধারণ ঐক্য ও শৃঙ্খলার যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, উহা হইল তাহাদের পুরস্কার।

যাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য এখনও সম্মুখে বিদ্যমান, এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। ৬-দফা ফর্মুলাভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং উহার পূর্ণ বাস্তবায়ন করিতে হইবে এবং প্রকৃতির ধ্বংসলীলা ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাত হইতে বাংলাদেশ ও উহার মেহনতী জনতাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। হাজার সমস্যার মধ্যে ক্ষুধা, বেকারত্ব, রোগ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও নিরক্ষরতার সমস্যা আশু সমাধানের তাগিদ দিতেছে। ঘূর্ণিদুর্গত উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে যে দশ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়াছে এবং যে তিরিশ লক্ষ লোক টিকিয়া থাকার সংগ্রাম করিতেছে, উহাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে, অতীতে কিরূপ শোষণ ও অবহেলা চলিয়াছে এবং সম্মুখে আমাদের দায়িত্ব কত বিরাট।

আমরা মনে করি যে, কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ ও প্রকৃতির ধ্বংসলীলা হইতে আমাদের জনগণকে রক্ষার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করার শপথ হইবে জনগণ ও আমাদের জন্য উপযুক্তভাবে জনতার এই বিজয় উদযাপন করা। পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রথম ইশারাকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা তাহাদের বাঙালী ভাইদের অন্তরের অন্তঃস্থলের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে আমাদেরকে সমর্থন করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জাগ্রত জনতাকে আহ্বান জানাইতেছি। আমাদের পক্ষ হইতে আমরা তাহাদেরকে ভূস্বামী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ

হইতে মুক্তির সংগ্রামে আমাদের সমর্থন প্রদানের নিশ্চয়তা দিতেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, একমাত্র জনগণের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা আমাদের সম্মুখের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিতে পারি। আমরা এই সত্য হইতে আমাদের আশা ও শক্তি সঞ্চয় করি যে, আমাদের জনগণ তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। একমাত্র জনগণের ঐক্যের উপরই সমাজকে পুনর্গঠন এবং অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে অবিচার দূর করার কার্যকরী কর্মসূচীর ভিত্তি দাঁড়াইতে পারে। কাজেই আমরা সকলের প্রতি অতীতের মতানৈক্য ও বিদ্বেষ পরিহার করার আবেদন জানাইতেছি, যাহাতে আমাদের লক্ষ লক্ষ মেহনতী জনতার মুক্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে পারি! জয় বাংলা। জয় পাকিস্তান।"

[দৈনিক সংবাদ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭০]

আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ে মাওলানা ভাসানীর হৃদয়ে নানাবিধ চেতনার উদয় হয়েছিল। সেদিনই এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া দেশবাসীকে জানিয়ে দেন। পত্রিকায় এরূপ খবর প্রকাশ পায়ঃ

আওয়ামী লীগের বিজয়ে ভাসানীর প্রতিক্রিয়া

"লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানীদের রায় যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী গতকাল বুধবার দাবী জানিয়েছেন। 'মওলানা সাহেব গতকাল বিকেলে ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবী জানান। তিনি বলেন, দেশে যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল তার জয় কোন ব্যক্তি, পার্টি বা দফার জয় নয়, লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যই জনগণ ভোট দিয়েছে। গত তেইশ বছর যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর যে শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন চলেছে তা' থেকে মুক্তিলাভের আশায় জনগণ দিয়েছে ভোট। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এই নির্বাচনকে ৬-দফা ও ১১-দফার মাধ্যমে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায়ের গণভোট বলে ঘোষণা করেছিলেন।" সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'লে মওলানা তাঁর উপরিউক্ত দাবী জানান। তিনি বলেন,—"যাই হোক না কেন, জনগণ একে স্বাধীন

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য গণভোট হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কে যদি কোন বিতর্ক হয় তবে আবার গণভোট হোক।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭০]

মওলানা ভাসানীর বক্তব্য সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্যের প্রয়োজন করে না। তিনি কোথাও 'স্বাধীন বাংলাদেশ' ব্যবহার করেন নি, তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান। এর অর্থ কি, একমাত্র তিনিই জানেন।

নির্বাচনে জয় পরাজয় থাকবেই। পরাজয়কে সহজভাবে মেনে নেয়াই গণতন্ত্রের মহান শিক্ষা। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ এই সহনশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি একটি বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন : "জনগণের স্বার্থে এগার দফা ও নির্বাচনে প্রদত্ত ওয়াদাসমূহ বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগের গৃহীত কার্যক্রমকে সফল করার জন্য রিকুইজিশনপন্থী পূর্ব-পাকিস্তান ন্যাপ প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা ও সমর্থন দান করবে। দলের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন গতকাল শনিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে একথা বলেন। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের দলের পরাজয়ের উল্লেখ করে বিবৃতেতে তাঁরা বলেন যে, তাঁদের দল নির্বাচনকে দেশবাসীর সামগ্রিক সংগ্রামের একটি অংশ হিসাবেই বিবেচনা করছে। জনগণের দাবী এখনও আদায় হয় নি এবং তাদের সামনে রয়েছে বহু সমস্যা। একমাত্র জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমেই জনগণ আকাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও অর্থনৈতিক দাবীসমূহ আদায় করতে পারে। জনগণের স্বার্থে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের মুক্তি আন্দোলন তথা সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান রিকুাই-জিশনপন্থী ন্যাপের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বলে তাঁরা ঘোষণা করেন।

মোজাফ্ফর ন্যাপের প্রশংসনীয় মনোভাব

[ঐ, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭০]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি ১১ই ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন : "এই প্রথম বারের

মতো পাকিস্তানের জনগণ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অবাধ সুযোগ পেয়েছে। উত্তেজনা ছিল অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু জাতি যে সুশৃঙ্খলভাবে ভোট দিতে গেছে, নির্বাচনের সময় সবাই যে সুশৃঙ্খলা-বোধের পরিচয় দিয়েছে তা' নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় আর তাই তা' সর্ব মহলের প্রশংসাও লাভ করেছে। এতে জাতির রাজনৈতিক সচেতনতারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ইয়াহিয়ার অভিনন্দন

প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পরিকল্পনা সামরিক সরকারের রয়েছে, নির্বাচন হচ্ছে তার প্রথম পর্যায় মাত্র। দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। এই জন্যই নব নির্বাচিত প্রার্থীদের আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, জনগণ তাঁদের ভোট দিয়ে তাঁদের উপর বিরাট আস্থা স্থাপন করেছে। দেয়া নেয়া ও সহনশীলতার ভিত্তিতে এখনই তারা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে লেগে যান, জাতি এখন তাঁদের কাছে তাঁই চাচ্ছে। জাতি তাঁদের উপর যে আস্থা স্থাপন করেছে তাঁরা তা' রক্ষা করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হোক, এটাই আমার কামনা।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭০]

নির্বাচনের পর জুলফিকার আলী ভুট্টো দেশের বিবেকবান মানুষদের একের পর এক তাঁর বক্তব্য প্রতিবক্তব্যের দ্বারা পীড়ন করতে থাকেন। লাহোরে এক জনসভায় পিপলস্ পার্টির প্রধান ভুট্টো বলেন, "তাঁর দলের সহযোগিতা ছাড়া কোন কেন্দ্রীয় সরকারই কাজ চালাতে পারবে না। তিনি আরো বলেন যে, জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলে বসে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আরো পাঁচ বছর অপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তিনি যদি ক্ষমতায় না যান তা' হ'লে জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করার কেউ থাকবে না এবং ক্ষমতায় না গিয়ে জনগণের জন্য কাজ করা সম্ভব নয়। ··· ··· সর্বোপরি তিনি বলেন যে, পাঞ্জাব ও সিন্ধুই হ'ল পাকিস্তানের ক্ষমতার উৎস এবং কেন্দ্রস্থল আর এই দুই প্রদেশেই তাঁর দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা রয়েছে; অতএব তাঁকে ক্ষমতায় যেতেই হবে।"

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো

[মুক্তি সংগ্রাম, প্রথম পর্ব, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ১৬২-১৬৩]

ভুট্টোর অসমৃত উক্তির প্রতিবাদে সেদিন আওয়ামী লীগের গণনির্বাচিত প্রতিনিধিরা মুখর হয়ে ওঠেন। ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক সুচিন্তিত বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলেন, "ভুট্টোর দলের সহযোগিতা ছাড়া দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করা সম্ভব হবে না—এই উক্তি ঠিক নয় এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধুও আর ক্ষমতার উৎস থাকার আশা পোষণ করতে পারে না। এই ধরনের ক্ষমতার উৎসের বিরুদ্ধেই জনগণ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। তিনি বলেন যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ও কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের বেশ ভাল সুযোগ আওয়ামী লীগের রয়েছে। আওয়ামী লীগ তা' অন্য পার্টির সাহায্য নিয়েও করতে পারে, না নিয়েও করতে পারে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ অন্য কোন পার্টির সাহায্য নিবে কিনা, তা' নির্ভর করে কোন দল আওয়ামী লীগের কর্মসূচী সমর্থন করে কিনা তার উপর। জনাব তাজউদ্দিন বলেন যে, পাকিস্তানের জনগণ অতীতকে পরিহার করেছে এবং তারা এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে চায়। তিনি বলেন, শাসনতন্ত্র ও সরকার গঠনে জনতার রায় আওয়ামী লীগই পেয়েছে এবং আওয়ামী লীগ নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।"

[মুক্তি সংগ্রাম, প্রথম পর্ব, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
পৃঃ ১৬৩-১৬৪]

এর পরপরই জনাব ভুট্টো আর এর ধরনের কথা বলতে শুরু করেন। ২১শে ডিসেম্বর লাহোরে এক সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেন, "গত ২৩ বছর ধরে যদি পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারে তার ন্যায্য অধিকার না পেয়ে থাকে, তবে তার দ্বারা এই বুঝায় না যে, পরবর্তী ২৩ বছর পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে শাসন করবে। তিনি বলেন, অতীতে পূর্ব পাকিস্তান যদি ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্বের দাবী জানিয়ে থেকে থাকে তা' হ'লে সে একই ন্যায়বিচার বোধ থেকেই উভয় অংশের যৌথ দায়িত্বে দেশ পরিচালনা করতে হবে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭০]

পরদিন ২২শে ডিসেম্বর আর একটি সভায় তিনি বলেন, "জাতির সামনে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল জাতীয় সংহতির সীমায় থেকে স্বায়ত্ত-শাসনের পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করা। তিনি আরও বলেন যে, ... শাসনতন্ত্র প্রণয়ন আর শাসন পরিচালনায় দেশের সবারই অংশ গ্রহণ অপরিহার্য। এক প্রদেশ যদি অন্য সব প্রদেশের উপর শাসনতন্ত্র আর সরকার চাপিয়ে দিতে চায় তা' হ'লে তা' দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭০]

জনাব ভুট্টোর এলোমেলো ভাষণ থেকে এইটুকু উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি ঐ গদীতে বসতে চান যে গদীতে আইয়ুব খান বসে গিয়েছেন আর বর্তমানে বসে রয়েছেন ইয়াহিয়া খান। গদীর মোহ তাঁকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে, তাতে তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন। ভুট্টোর প্রধান লক্ষ্য ক্ষমতা লাভ করা, কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধি অনুসারে তাঁর পক্ষে বিরোধী দল গঠন করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের অশুভ শক্তির প্রতিভূ হিসেবে পায়ের জোরে সবকিছু অর্জন করবার প্রবণতা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। সুতরাং, বাক্-কলহে তিনি প্রথম অবতীর্ণ হলেন সামনে একটি রক্তক্ষয়ী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার ক'রে। এদিকে ভুট্টো-মুজিব বিরোধ যাতে আরও তীব্র হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কার্যতঃ অন্যরূপ কারণে ও মৌখিকভাবে দু'দলের নেতৃবৃন্দকেই এ বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য উপদেশ দিলেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে অটল ও অচল হয়ে রইলেন। তাঁর পশ্চাতে সাড়ে সাত কোটি মানুষ দণ্ডায়মান; অন্যদিকে ভাসানী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীতে বিভিন্ন জায়গায় জনসভায় বক্তৃতা দিতে থাকেন। পূর্ব বাংলার এমন একটি অবস্থায় ভুট্টো তাঁর রং বদলাতে বাধ্য হন। তিনি ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান না। সুতরাং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের বিষয়ে তিনি শেখ মুজিবকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দান করেন। ২৭শে ডিসেম্বর তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে

বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করেন এবং আওয়ামী লীগকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

পরদিন প্রকাশিত সংবাদপত্রে বলা হয়ঃ "শেখ মুজিব ৬-দফার ব্যাপারে অনড় থেকে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে হাতে দিলে তাঁর দলের ভূমিকা কি হবে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা সৃষ্টির চাইতে তাঁর দল সরে দাঁড়াবে এবং আওয়ামী লীগকে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সুযোগ দেবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, এর পরিণতির জন্য তিনি দায়ী হবেন না। জনাব ভুট্টো শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে সমঝোতা ও ৬-দফার ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়।

শেখ মুজিবের প্রশংসা ক'রে তিনি বলেন যে, কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনগণ তাঁকে 'ম্যাণ্ডেট' দিয়েছেন—সেই কর্মসূচী থেকে শেখ মুজিবের পক্ষে সামান্যতম বিচ্যুত হওয়া সম্ভব নয়।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৭০]

জনাব ভুট্টো দাবার চাল বদলাবার তালে ব্যস্ত ছিলেন। কি ভাবে সারা পাকিস্তানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়া যায়—সেই চিন্তায় তিনি বিভোর। ২৮শে ডিসেম্বর জনাব ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দীর্ঘ সময় কাল পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে গোপনে আলাপ হয়। এর ভিতরে যে একটা ষড়যন্ত্র লুকিয়ে ছিল ধীরে ধীরে তা' পূর্ব বাংলার মানুষের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। ইয়াহিয়া ও তাঁর সঙ্গীরা ভুট্টোর সাথে গোপন পরামর্শের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে থাকলেন। এই সব কাজকর্মে জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকবার ব্যাপারে ইয়াহিয়া অস্বাভাবিক নীরবতা অবলম্বন করতে থাকলেন। এই নীরবতা সবার মনেই সংশয়ের উদ্রেক করতে থাকে। এর পশ্চাতে যে কি এক গোপন রহস্য ছিল পরবর্তী কালে তা' ঘটনার মাধ্যমেই উদ্ঘাটিত হয়েছে।

যা হোক অবশেষে সরকারের নীরবতা ভঙ্গ হ'ল। ৩০শে ডিসেম্বর সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হ'ল যে, জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এবং উল্লেখযোগ্য যে, কোন্ তারিখে এই অধিবেশন বসতে যাচ্ছে তার সঠিক কোন সংবাদ পরিবেশন করা হ'ল না।

১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে আওয়ামী লীগ 'শপথ দিবস' উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। দু'দিন পূর্ব থেকেই সভামঞ্চ তৈরী করার কাজ শুরু হয়েছিল। প্রায় ১২০ ফুট দীর্ঘ নৌকাকৃতির এই মঞ্চের তিনটি অংশের মাঝেরটিতে আসন করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর জন্য। আর তার পাশের দুটো ভাগে স্থান করা হয়েছিল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের জন্য। এ ছাড়া সাংবাদিক, মহিলা ও বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের সদস্যদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ দিবস উদযাপন

রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। দলপতি শেখ মুজিবুর রহমান শপথ-অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি হাত ঊর্ধ্বে তুলে নিম্নোক্ত শপথ পাঠ করেন এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যগণ তা' উচ্চারণ করেন ঃ "আমরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করিতেছি, পরম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার নামে; আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি সেই সব বীর শহীদের ও সংগ্রামী মানুষের নামে, যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়া ও চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করিয়া আজ আমাদের প্রাথমিক বিজয়ের সূচনা করিয়াছেন; আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী মানুষ তথা সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণের নামে ঃ জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশের আপামর জনসাধারণ আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও নেতৃত্বের প্রতি যে বিপুল সমর্থন ও অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন, উহার মর্যাদা রক্ষাকল্পে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিব।

ছয়-দফা ও এগার-দফা কর্মসূচীর উপর প্রদত্ত সুস্পষ্ট গণরায়ের প্রতি আমরা একনিষ্ঠরূপে বিশ্বস্ত থাকিব এবং শাসনতন্ত্রে ও বাস্তব প্রয়োগে ৬-দফা কর্মসূচী ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন ও ১১-দফা কর্মসূচীর প্রতিফলন ঘটাইতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব। আওয়ামী লীগের নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য, ও কর্মসূচীর প্রতি অবিচল আনুগত্য জ্ঞাপন পূর্বক আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, অঞ্চলে-অঞ্চলে ও মানুষে-মানুষে বিরাজমান চরম রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের চির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত এক সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়িবার এবং অন্যায় অবিচার বিদূরীত করিয়া সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইব ; জনগণ অনুমোদিত আমাদের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াসী যে কোন মহল ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করতঃ আপোষহীন সংগ্রামের জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকিব। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা। জয় পাকিস্তান।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭১]

এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৫১ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং ২৬৮ জন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবের ডান পার্শ্বে জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ এবং বামপার্শ্বে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করেন। প্রত্যেকের বাম হাতে ছিল শপথনামা এবং ডান হাত শপথের ভঙ্গীতে উত্থিত ছিল।

এই দিনের ঘটনাবলী সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছেন ঃ "সে এক নয়া ইতিহাস—ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীর রেসকোর্স ময়দানে গতকাল (রবিবার) এক নয়া ইতিহাস সৃষ্টি হইয়াছে। সে ইতিহাস নির্বাচন বিজয়ী বীর নেতা এবং ডিসেম্বরের নিঃশব্দ বিপ্লবের নায়ক-জনতার মিলনের ইতিহাস ; বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান এবং জননন্দিত স্বাধিকার সৈনিকদের জনতার দরবারে শপথ গ্রহণের ইতিহাস। বন্দুকের নল নয়, জনগণই সকল শক্তির উৎস, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। আর তাই দেশবরেণ্য গণনায়ক, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মুক্তি আন্দোলনের সিপাহ্‌সালার শেখ মুজিব তার সূর্য-সৈনিকদের লইয়া হাজির হইয়াছেন জনতার আদালতে—উচ্চারণ করিয়াছেন অগ্নি শপথ, 'শহীদের রক্ত বৃথা যাইতে দেব না" 'তোমাদের ম্যাণ্ডেট আর ভালবাসার অমর্যাদা হইতে দিবনা'। প্রত্যুত্তরে সংগ্রামী বাংলার অপরাজেয় গণশক্তি ডিসেম্বরের দুই-দফা ব্যালটের রায়ের পর গতকাল আবার হাত তুলিয়া শ্লোগান দিয়া জানাইয়া দিয়াছে—নেতা আমাদের বঙ্গবন্ধু, নির্ভয়ে তুমি আগাইয়া চলো, আমরা আছি পিছনে।'

রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতার এক পর্যায়ে শেখ সাহেব আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলেন, "ভাইয়েরা আমার, মনে রাখিবেন, নির্বাচনে বিজয়ের অর্থই অধিকার আদায় নয়, এ বিজয় নস্যাতের ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এই ষড়যন্ত্রের কবলে পড়িয়া আমি যদি চিরতরে আপনাদের ছাড়িয়া যাই, আমার মৃত্যুর পর বঞ্চিতা দেশ-মাতৃকা আর গরীব-দুঃখী মানুষের মুখের দিকে চাহিয়া আপনারা কি পারিবেন আন্দোলন করিয়া দাবী আদায় করিতে?" বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো লক্ষ লক্ষ হস্ত উর্ধ্বে উত্থিত হয়—ধ্বনি ওঠে দিগন্ত কাঁপাইয়া,—'পারিব' 'পারিব'। আর বীর প্রসবিনী বাংলার মানুষের এই দীপ্ত শপথবাণী নেতার মুখে সঞ্চারিত করে অনাবিল স্বস্তির আভাস। সুকঠিন স্বাধিকার সংগ্রামের প্রাথমিক বিজয় শেষে বাংলার মানচিত্র, বাংলার-আকাশ-বাতাস আলোকে সাক্ষী রাখিয়া নেতা ও জনতার শপথ ও আস্থা, ভালবাসা বিনিময়ের সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে শীতের শান্তি-সূর্য রেণু-রেণু হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল রেসকোর্স ময়দানে—যেন বিধাতার আশীর্বাদ।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭১]

শেখ মুজিবুর রহমান শপথ অনুষ্ঠানে আবার দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন যে, ৬-দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচিত হবে এবং ১১-দফায় যে সব দাবী-দাওয়া সন্নিবেশিত রয়েছে সেগুলোও বাস্তবায়িত হবে। তাঁদের এই পরিকল্পনাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। তিনি আরো বলেন যে, আওয়ামী লীগ দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। শেষ কথা, জনতার দরবারে আওয়ামী লীগ যে-সব ওয়াদা করেছে তা' অবশ্যই পালন করবে। যদি জনগণ-নির্বাচিত প্রতিনিধি-দেরকে প্রতিনিধিত্ব করতে না দিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র চালানো হয়—তবে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালানোর জন্য তিনি এক উদাত্ত আহ্বান জানান। গণতান্ত্রিক বিজয়কে সুসংহত করার স্বার্থে দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক'রে শেখ মুজিব সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসবাদের দালালদের বাড়াবাড়ি দমনের জন্য দেশবাসীকে সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "ইউনিয়নে ইউনিয়নে, মহল্লায় মহল্লায় আওয়ামী লীগ গঠন করুন এবং

রাতের অন্ধকারে যারা ছোরা মারে, তাহাদের খতম করার জন্য প্রস্তুত হন।" রাতের অন্ধকারে যারা মানুষ হত্যা করে সেই সব বিপ্লবীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "চোরের মত রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করিয়া বিপ্লব হয় না। বিপ্লব চোরের কাজ নয়।" শেখ মুজিব সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়কে আশ্বাস দিয়ে বলেন, "হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, জৈন ভাইয়েরা শুনিয়া রাখুন, আপনারাও পাকিস্তানের সমান নাগরিক। আপনাদের উপর এ যাবত ক্ষেত্রবিশেষ অত্যাচার হইয়াছে, আমি জানি। আজ আমি এই আশ্বাস দিতেছি — আর আপনাদের উপর অত্যাচার হইবে না।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৭১]

শেখ মুজিব চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাক্সবন্দী ক'রে রাখার জন্যও আহ্বান জানান। পরদিন রমনা ময়দানে ছাত্রলীগের ২৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষি-কীতে প্রধান অতিথির ভাষণদান প্রসঙ্গে অতি বিপ্লবীদের কাপুরুষোচিত কার্যকলাপের সমালোচনা ক'রে পুনরায় বঙ্গবন্ধু বলেন, "অতি বিপ্লবী কয়েকটা শ্লোগান বা রাতের অন্ধকারে আকস্মিকভাবে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ কে হত্যা করার শিভালরির মধ্য দিয়া বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের উদ্ভব ঘটে দেশের মাটি হইতে এবং বিপ্লব উন্মেষের একটা নির্ধারিত কালও রয়েছে।"

[ঐ, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭১]

তিনি বলেন, "বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দিলে সে ডাক আমিই দেব। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আমিও কম বিপ্লবী নই। যদি ৬-দফা আদায়ের সংগ্রামকে ষড়যন্ত্র করিয়া ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়, তবে কয় দফা দিতে হয় তাহাও আমার জানা আছে।"

[ঐ]

শেখ মুজিব ছাত্র ও দেশবাসীকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বলেন যে, "আপনারা ভুলিয়া যাইবেন না যে, ষড়যন্ত্রকারীরা শক্তিশালী—তাহাদের শক্তি আছে, অস্ত্র আছে, এজেন্ট রাখার ক্ষমতা আছে। আপনারা মনে করিবেন না যে, নির্বাচনে জিতিয়াছেন বলিয়া তাহারা সহজে আপনাদের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবে আর একথাও ভাবিবেন না যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে তাহারা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে।"

[ঐ]

শেখ মুজিব যে কতকখানি দূরদর্শী ছিলেন এই ভাষণের মধ্যেই তা' ফুটে উঠেছে। আমরা জানি পরবর্তীকালে তাঁর এই আশঙ্কা কিভাবে সত্যে পরিণত হয়েছিল। ইয়াহিয়া খানকে তিনি ভাল-ভাবেই চিনেছিলেন। তিনি জানতেন, নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের ভাঁওতা দিলেও ভিতরে একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হচ্ছে। বহু বছরের সাধনা লব্ধ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠীর মানসিকতা সম্পর্কে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতাই তাঁকে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ক'রে দিয়েছে। সেইজন্য তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেও ক্ষমতা অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন নি। তাঁর মতে নির্বাচনের এই বিজয়ে 'বাঙালী সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে' মাত্র। তিনি বলেন, "নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়া আমরা শুধু এক পা আগাইয়াছি, শাসনতন্ত্র রচনা করিলে দুই পা আগাইব, সরকার গঠন করিলে তিন পা আগাইব, আর মানুষের কল্যাণ করিতে শুরু করিলে আমরা চার পা আগাইব।"

ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জনগণের প্রতি শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারী

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭১]

ছাত্রলীগ আয়োজিত এই সম্মেলনে শেখ মুজিব নতুন করে বাঙালীর ইতিহাস লেখার জন্য দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। একটি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতি গঠনে সেই জাতির নিজস্ব ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে তিনি বলেন, "বাংলার যে ছেলে তাহার অতীত বংশধরদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানিতে না পারে, তবে সেই ছেলে সত্যিকারের বাঙালী হইতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে বাংলার মানুষ যে সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে বাংলার ছেলেদের সেই ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে। এই ইতিহাস পাঠ করিয়া যেন বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাহাদের গৌরবময় অতীতের পরিচয় পাইয়া গর্ব অনুভব করিতে এবং উন্নত মস্তকে দাঁড়াইতে পারে।"

বাঙালী জাতির ইতিহাস লেখার আহবান

[ঐ]

স্বাধীনতার জন্য বাঙালীর আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাসের কথা উল্লেখ ক'রে সেই সব সূর্য-সৈনিকদের বীরত্ব ও ত্যাগ-তিতিক্ষার

গাথা ভিত্তিক ইতিহাস রচনার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "ইংরেজ ভারতবর্ষ দখলের সময় বাংলার মুসলমান ও বাঙালী শাসনকর্তা সিরাজ-উদ্দৌলার হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া নিয়াছিল, কিন্তু সেদিন পাঞ্জাব ও তৎসংলগ্ন এলাকায় কোন মুসলমান শাসকের হাত হইতে ইংরেজ ক্ষমতা নেয়নাই—নিয়াছিল অমুসলিম শাসনকর্তা রণজিৎ সিংহের হাত হইতে।

পরবর্তীকালে বংলার ব্যারাকপুর হইতেই সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল। সেদিন বাংলায় বেঈমানী করার কোন লোক পাওয়া যায় নাই বরং নেতাদের সঙ্গে দেশের লোকেরাই বেঈমানী করিয়াছিল।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭১]

প্রতিক্রিয়াশীলচক্র নির্বাচনে পরাজিত হয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকে নি। এবার শেষ অস্ত্র হিসেবে তারা শেখ মুজিবের প্রাণনাশের চেষ্টায় লিপ্ত হ'ল। ওদের ধারণা, শেখ মুজিবকে হত্যা করলেই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সহায়তা হবে। এটাকে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণও বলা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তারা গোলাম মোস্তফা ওরফে কবির নামে এক যুবককে ৭ই জানুয়ারীর দিবাগত রাত্রে শেখ মুজিবের বাসভবনে পাঠিয়ে দেয়। এই সংবাদের উল্লেখ ক'রে দৈনিক ইত্তেফাকে বলা হয়ঃ "গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের উপর হামলার চেষ্টা করার অভিযোগে গোলাম মোস্তফা ওরফে কবির নামে একজন যুবককে আটক করিয়া পুলিশে সোপর্দ করা হইয়াছে বলিয়া গতকাল (শুক্রবার) আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

শেখ মুজিবের প্রাণনাশের চেষ্টা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, গত বৃহস্পতিবার রাত্রে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে গোপনীয় কথা বলার অছিলায় তাঁহার (শেখ মুজিবুর) বাসভবনে বল-পূর্বক ঢোকার সময় যুবককে ধরিয়া ফেলা হয়। তাহার নিকট ধারালো ছোরা লুকানো ছিল। তাহাকে ধরিয়া ফেলার পর সে বলে যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার বাসনা লইয়াই সে সেখানে গিয়াছিল।

সে আরো প্রকাশ করে যে, একটি সুসংগঠিত দল এই কাজের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করে। উক্ত দলটি আওয়ামী লীগ প্রধানের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্য তাহাকে শিক্ষা ও নির্দেশাদি দেয়। তাহার বক্তব্য হইতে আরো প্রকাশ পায় যে, আওয়ামী লীগ প্রধানের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্য বিভিন্ন স্থানে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সুসংবদ্ধ দল সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে ......।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই জানুয়ারী, ১৯৭১]

শেখ মুজিবের জীবনের ওপর হামলার চেষ্টার চাঞ্চল্যকর সংবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর ঢাকা ও প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যুগপৎ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং এই ধরনের আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন।

এদিকে ৯ই জানুয়ারী, ১৯৭১ মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের সন্তোষে এক জাতীয় সম্মেলন আহবান করলেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন যে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান স্থাপনের সংগ্রামে তিনি তাঁর শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দান ক'রে যাবেন। মওলানা ভাসানীর স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবী নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচনের পূর্বেও যখন নির্বাচনে তাঁর ও তদীয় সমর্থকদের ভরাডুবি হবার সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন তখন পল্টনের একটি সভায় আতাউর রহমান খান, শাহ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ সোলায়মান ও মোহসেন উদ্দিন প্রমুখকে নিয়ে তিনি স্বাধীন বাংলা নয়, স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ডাক দিয়েছিলেন। আবার এ কথাও সত্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে গিয়ে তিনি কিছুদিন পূর্বে ঠিক উল্টো সুরে কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন যে, 'রোজকেয়ামত-তক পাকিস্তান অখণ্ড থাকবে —পাকিস্তানকে দ্বিধাবিভক্ত করবার সাধ্য কারো নেই।' আইয়ুব খানের সময় তিনি খান সাহেবকে মাঝে মাঝে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কখনো এক জাতীয় সাম্যবাদ, কখনো অন্য জাতীয় সাম্যবাদ এবং সর্বশেষে ইসলামী সাম্যবাদের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন।

মওলানা ভাসানীর স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবী

কিন্তু ১৯৭১ সালের ৯ই জানুয়ারী টাঙ্গাইলের সন্তোষে তিনি যে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দান ক'রে যাবার ওয়াদা প্রদান করেন তার উদ্দেশ্য ভিন্নরূপ ছিল। নির্বাচনের পর যখন নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশবাসী উদগ্রীব দৃষ্টিতে প্রতীক্ষিত, তখন এই হস্তান্তর যাতে না হতে পারে, 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' শ্লোগান সেই উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হয়েছিল। মওলানা ভাসানী সম্পর্কে এ কথা বলবার ধৃষ্টতা আমার নেই যে, তিনি কায়েমী স্বার্থবাদী-দের হাতের ক্রীড়নক হিসেবেই জনস্বার্থের বিরুদ্ধে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবী জানিয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি যে সমস্ত ব্যক্তির সাথে হাত মিলিয়ে এই শ্লোগান উচ্চারণ করেছিলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাঁদের কেউ কেউ ইয়াহিয়ার বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে কাজ করেছেন। মওলানা ভাসানী ইয়াহিয়ার প্ররোচনায় এমন একটি অবিমৃষ্যকারী শ্লোগান শুরু করবেন, এ কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিল—তাঁর সম্পর্কে এমন অনুমানও ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, সারাজীবন তিনি শ্লোগানসর্বস্ব রাজ-নীতি ক'রে এসেছেন সুতরাং এক শ্লোগান থেকে আরেক শ্লোগানে যাতায়াত তাঁর পক্ষে একটি অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। তাছাড়া, পূর্বেই বলেছি, সময়োচিত যথার্থ সিদ্ধান্ত নিতে তিনি সারা জীবন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এর একটি কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তিনি কোনদিন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন নি।

মওলানা ভাসানী সম্পর্কে বন্ধু খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন—এখানে তা' স্মরণ করা যায় ঃ "ইতিমধ্যে মওলানা ভাসানীও উত্থাপন করেছিলেন স্বাধীনতার প্রশ্ন। বাঙালী জাতীয়তাবাদ যখন নির্বাচন প্রাক্‌কালে সমগ্র দেশে গর্জন ক'রে ওঠে 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে, সেই ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসেই উত্থাপিত হয় মওলানা ভাসানীর কণ্ঠে স্বাধীনতার দাবী। কিন্তু মওলানা ভাসানীর দাবী স্বাধীন 'বাংলাদেশ' নয়, জয় বাংলা নয়, তাঁর দাবী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান। তাঁর দাবী সংগ্রামের দাবী নয়, সংগ্রাম ক'রে স্বাধীনতা অর্জন নয়। তাঁর দাবী ছিল তালাকের দাবী। ভাবখানা এরূপ যে, সাক্ষী সাবুদের সম্মুখে যথারীতি উচ্চকণ্ঠে তিনবার—এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক—ঘোষণা

শেষে পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে খোরপোষ ছাড়াই পরিত্যাগ। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন যে, স্বাধীন 'বাংলাদেশের' পরিবর্তে স্বাধীন 'পূর্ব পাকিস্তান' দাবী এবং সংগ্রামের বদলে তালাক প্রার্থনার মূলে তাঁর যে শুধু সাম্প্রদায়িক মনেরই পরিচয় বেরিয়ে এসেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে একটি গভীর চক্রান্তের আভাস।"

তালাকের দাবী উত্থিত হয় পল্টনের জনসভায়। উক্ত সভায় উদ্যোক্তা ছিলেন ভাসানীপন্থী 'ন্যাপ', আতাউর রহমান খানপন্থী 'জাতীয় লীগ', মোহাম্মদ সোলায়মানপন্থী 'কৃষক শ্রমিক দল' এবং পীর মোহসেন উদ্দীন ওরফে পীর দুদুমিয়াপন্থী 'জমিয়তুল ওলামায়ে ইসলাম'। স্বাধীন 'বাংলাদেশ' নয় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান এবং সংগ্রামে নয়, তালাকের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা—মওলানা ভাসানীর উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আর যাঁরা সভায় বক্তৃতা করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পীর দুদুমিয়া, আতাউর রহমান খান, শাহ্ আজিজুর রহমান, মশিউর রহমান ও মোহাম্মদ সোলায়মান।

বলাবাহুল্য ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর মওলানা ভাসানী আশ্রয় গ্রহণ করেন ভারতে, খান আতাউর রহমান আটক হন কুর্মিটোলা বন্দী শিবিরে, মোহাম্মদ সোলায়মান হানাদার সরকারের মন্ত্রীত্ব দখল করেন এবং শাহ আজিজুর রহমান গমন করেন জাতিসংঘে ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীদের গণহত্যার পক্ষে সাফাই গাইতে। আর টিক্কা খানের শান্তি কমিটির অন্যতম সংগঠকরূপে পীর দুদুমিয়া গ্রহণ করেন হানাদার বাহিনীর দালালী। জানা যায় যে, তিনি সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় বসবাস কালে উক্ত এলাকার কতিপয় মুক্তিযোদ্ধাকে ধরিয়ে দিতে তিনি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরেও উক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ঘরে ফিরে আসেন নি। তাঁদের পাগল-প্রায় মাতাপিতা আজো সন্তানদের আগমন-প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন—বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। আজো তাঁরা রাতের বেলায় পাখির পাখা ঝাপটায়, গাছের পাতা পড়ার শব্দে কিংবা দিনের বেলায় বাতাসে দরজা নড়ার সামান্য আওয়াজে ছুটে বেরিয়ে আসেন ঘরের বাইরে—'বুঝি সোনার মাণিকেরা তাঁদের ফিরে এলো।'

এই হ'ল স্বাধীন বাংলাদেশ বিরোধী ও স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবীদার-দের প্রকৃত স্বরূপ। ইতিহাস বড়োই নিষ্ঠুর—কাউকেও ক্ষমা করে না। সময় এলে সকলের প্রকৃত চরিত্র নগ্ন করেই দেখায়।

কাজেই মওলানা ভাসানীর তালাকের দাবীর বিরুদ্ধে চারিদিকে ধিক্-কার ওঠে। সে ধিক্কারের বাণী উত্থিত হয় আওয়ামী লীগের বজ্রকণ্ঠে। সে ধিক্কারের ধ্বনি ওঠে ছাত্রলীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র থেকেও। কমিউনিস্ট পার্টি তখনও বেআইনী সংগঠন—কাজেই তাঁদের প্রকাশ্য বিবৃতি ও বক্তৃতা কেউ ছাপাতে পারেন নি। কিন্তু তাঁদের ধিক্কারের সে ভাষা পেঁ'ছে যায় সংগ্রামী জনগণের কাছে।"

জনাব ইলিয়াস আরো বলেছেন ঃ "মওলানা ভাসানী একাকী হয়ে পড়েন অনেক আগেই। পাকিস্তানের রাজনীতি, বিশেষ ক'রে বাংলা-দেশের রাজনীতিতে ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আইয়ুব-ইয়াহিয়ার সামরিক চক্রের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর 'কথিত' ঘনিষ্ঠতার সংবাদে ন্যাপের প্রকৃত নেতা ও কর্মীবৃন্দ তাঁকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। চীনের মাও চক্র জাতীয় স্বাধীনতাকামী অন্যান্য সংগ্রামী দেশের ন্যায় বাংলাদেশেরও জাতীয় স্বাধীনতার বিরোধী। মাওবাদীদের সঙ্গে মওলানা ভাসানীও বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের বিরোধিতা করায় সমগ্র দেশের আন্দোলনের স্রোত থেকে তিনি হয়ে পড়েন বিচ্ছিন্ন। কিন্তু মাওবাদীরা বিভ্রান্ত হ'লেও তাঁরা এককালের কমিউনিস্ট। তাঁদের কেউ কেউ কাগজে কলমে অসাম্প্রদায়িক, কিন্তু ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক জীবনে ঘোরতর সাম্প্রদায়িক। তাঁদের সোহবতের গুণ কিনা বলা যায় না, তবে এককালের অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী মওলানা ভাসানীও হয়ে পড়েন সাম্প্রদায়িক ঘেঁষা। কমিউনিস্ট বিরোধী তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ। এমতাবস্থায় কি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, কি শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনীতি, কি আওয়ামী লীগ ন্যাপের রাজনীতি, কি কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি—মওলানা ভাসানীর সাংগঠনিক স্থান কোথায়? এদেশের রাজনীতিতে ভাসানীর অবদান অপরিমিত।

সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন অহেতুক চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয় এবং নগদ অর্থ, অস্ত্রপাতি ও খাদ্যের লোভ দেখিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতি বিষিয়ে তুলবার ষড়যন্ত্র করে, সাম্রাজ্যবাদ যখন পাকিস্তানে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে গোপনে বারবার চক্রান্ত করে, ১৯৫৪ সালের তদানীন্তন পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনগণের বিজয়কে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার কর্তৃপক্ষকেও যখন প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে দেখা যায়, তখন একমাত্র মওলানা ভাসানী ছাড়া আর কোন নেতাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বের দরবারে দরবারে প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারণ করতে। পাকিস্তানের মওলানা ভাসানীই একমাত্র গণতান্ত্রিক নেতা, যিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির মধ্যেই নিহিত আছে পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত মুক্তি। পাকিস্তানের মওলানা ভাসানীই একমাত্র গণতান্ত্রিক নেতা যিনি বরাবরই ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী, একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী এবং চিন্তায় ও কর্মে অসাম্প্রদায়িক। এ কারণে তাঁকে অনেকবার ভারত ও কমিউনিস্টদের দালালরূপে চিহ্নিত করার ষড়যন্ত্র হয়েছে। অথচ সামরিক শাসনের কারাগার থেকে চার বছর পর বেরিয়ে আসার পরই লক্ষ্য করা গেলো যে, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাঁর সেই মৌলিক পরিবর্তন দেশপ্রেমিকদেরকে যেমন করেছে বেদনার্ত, তেমনি দিনে দিনে তিনিও হয়ে পড়েছেন একাকী। প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী দলগুলি থেকে সরিয়ে এনে তাঁর এরূপ একাকীত্ব অবস্থার পশ্চাতে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং পাকিস্তানের স্বৈরাতন্ত্রী শাসকদের নায়ক আইয়ুব খাঁর ষড়যন্ত্র ছিলনা, সে কথা জোর করে বলা যায় না।

আজ দেখে বড়ই দুঃখ লাগে যে, তিনি রাজনীতির নেশায় শেষ পর্যন্ত জামাতে ইসলামী, পি. ডি. পি., মুসলিম লীগ, জাতীয় লীগ—এমনকি বাংলাদেশের শতচ্ছিন্ন মাওবাদীদের যে অংশকেই হাতের নাগালে পাচ্ছেন, তাঁদেরকে ধরেই কোকিল সেজে কাকের বাসায় ডিম পাড়ার তালে রয়েছেন।

তিনি জানেন সেগুলো তাঁর নিজের দল নয়, তাঁরা কেউ তাঁর আপনজনও নন। তাঁদের পরস্পরবিরোধী নীতির সঙ্গে কোন মিলও নেই তাঁর। তবুও রাজনীতির নেশা।

এসব তাঁর ভ্রান্ত রাজনীতির পরিণতি।"

[খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৯-২৩১]

যাহোক, মওলানা ভাসানী ও আরো কতিপয় নেতার স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবী যে নিঃসন্দেহে সময়োচিত ছিল না, তা' বলাই বাহুল্য। শেখ মুজিব যখন ৬-দফা দাবীর ভিত্তিতে জনগণের নিকট থেকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা প্রাপ্তির অধিকার অর্জন করেছেন, তখন স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবীর ধূয়া তোলা প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন মনোভাবেরই পরিচায়ক। মওলানা ভাসানী ৬-দফা দাবীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার গন্ধ পেয়ে এক সময় তার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। আতাউর রহমান খানও স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবীকে ৬-দফা দাবীর কাছাকাছি বা তার পরিপূরক বলে মন্তব্য করেছেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের মনোভাব পরিষ্কার থাকলে তাঁরা নিঃসন্দেহে অসময়ে এই অযাচিত দাবী করতেন না। তা' ছাড়া শেখ মুজিব যেখানে ক্ষমতা-হস্তান্তর সম্পর্কেই বারবার সন্দেহ প্রকাশ করছেন, সেখানে তাঁরা যে ভূমিকা পালন করছেন, তা' অত্যন্ত লজ্জাকর।

সন্তোষে আয়োজিত উক্ত জাতীয় সভায় মূল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য মওলানা ভাসানীকে আহ্বায়ক ক'রে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ ও জাতীয় ভাসানী ন্যাপের ৫ জন ক'রে প্রতিনিধির সমবায়ে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে ন্যাশনাল লীগের মেসার্স আতাউর রহমান খান, শাহ আজিজুর রহমান, আমেনা বেগম এবং ন্যাপের মশিউর রহমান, আবদুল জলিল, আবদুল জব্বার প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত হন।

এ সময় শেখ মুজিব বাত্যা-উপদ্রুত অঞ্চল সফর করছিলেন। ৭ই জানুয়ারী লঞ্চযোগে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং এই পর্যায়ে বরিশাল, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী জেলার দুর্গত-অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে তিনি বিভিন্ন জনসমাবেশে ভাষণও দেন। ভাষণে তিনি দেশবাসীকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ ক'রে দেন।

১১ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এসেছিলেন শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। এ সাক্ষাৎ পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল।

মুজিব-ইয়াহিয়া সাক্ষাৎকার

প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এলে বিমান বন্দরে সাংবাদিকগণ তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন। প্রেসিডেন্ট বাহ্যিক দৃষ্টিতে খোলা মনেই তাঁদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সাংবাদিকদের সাথে প্রেসিডেন্টের আলাপের সংবাদ পরিবেশন ক'রে সংবাদপত্রে যা লেখা হয়, তা' নিম্নরূপ ঃ

"প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খান শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অব্যবহিত পরেই জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃঢ় সংকল্প পুনরায় ঘোষণা করেন। সাধারণ নির্বাচনের পর এই প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে আগমনের পর প্রেসিডেন্ট আল্লার কাছে শুকরিয়া প্রকাশ ক'রে বলেন যে, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ এবং খুবই সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য আমি জাতিকে মোবারকবাদ জানাই। জনসাধারণ বিশ্বের দরবারে আদর্শ স্থাপন করেছে এবং অত্যন্ত পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

এই বছরের শেষ নাগাদ ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হ'লে প্রেসিডেন্ট বলেন, এত দীর্ঘ সময় কেন? যদিও আইনগত কাঠামোতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ১২০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা রয়েছে; তবু আমি আশা করি, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন দশ দিনেই সম্ভব। তিনি বলেন, এটা নির্ভর করে সদস্যদের উপর। তিনি এল. এফ. ও'র ব্যাপারে এখনও অটল রয়েছেন কিনা জানতে চাওয়া হ'লে প্রেসিডেন্ট বলেন, যদি আমি ক্ষমতা হস্তান্তর করবোনা বলে মত পালটাই তবে আর এল. এফ. ও. থাকে না।

আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের তারিখ সম্পর্কে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নি। যখন সিদ্ধান্ত নেব তখন আপনাদের জানাবো।

শেখ মুজিব ও জনাব ভুট্টোর সাথে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনার কথা তিনি অস্বীকার করেন।

ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর বৈঠক কখন হবে তা' ঠিক করা হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হ'লে প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা সময় ঠিক ক'রে নেব। আমি ব্যস্ত মানুষ, তিনিও (শেখ

মুজিব) ব্যস্ত মানুষ। যখনই আমার ও তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে তখনই আমরা মিলিত হবো।

মওলানা ভাসানীর স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবী সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক প্রেসিডেন্টের মত জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মওলানা ভাসানীকে প্রশ্ন করুন। আমি একজন মুসলমান ও পাকিস্তানী, বিরাট সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ যদি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে তা' যদি পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে কি তিনি সেই শাসনতন্ত্রে মঞ্জুরী দেবেন? প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি অনুমান নির্ভর প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না। এ ব্যাপারে আমার ধারণা সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে বিস্তারিত বলেছি। এ ধরনের কোন অবস্থা যখন হবে তখন কি করা হবে না হবে, তখন বলব।

প্রেসিডেন্টকে রাজবন্দীদের ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে প্রেসিডেন্ট বলেন, যারা আন্দোলনজনিত কাজের জন্য জেলে আটক হয়েছিল তাদের সাধারণ নির্বাচনের পর ক্ষমা প্রদর্শন ক'রে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি অপহরণকারী, খুনি প্রভৃতিদের ছেড়ে দিতে পারি না।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭১]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় তিন দিন ছিলেন। এই তিন দিনের মধ্যে শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের দুই-দফা বৈঠক বসে। ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারী এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের আলোচনায় শেখ মুজিব একাই উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের দু'জনের আলাপ-আলোচনা তাঁদের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে প্রায় ১১০ মিনিটকাল স্থায়ী আলোচনার শেষে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বলেন যে, আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে এবং জাতীয় সমস্যাবলী নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রেসিডেন্টের সাথে শেখ সাহেবের দ্বিতীয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ই জানুয়ারী। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক আহমদ। ক্যাপ্টেন মনসুর, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানও উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্টের সাথে শেখ সাহেবের দ্বিতীয় দফা বৈঠক তিন ঘন্টাকাল স্থায়ী হয়। শেখ মুজিব ও তাঁর দলের পূর্বোক্ত ৫ জন নেতা সকাল সাড়ে দশটায় প্রেসিডেন্ট ভবনে গমন করেন। প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বের হয়ে তিনি অপেক্ষমান সাংবাদিকদের নিজ বাসভবনে নিয়ে যান। ধানমণ্ডী বাসভবনে শেখ মুজিব সাংবাদিকদের বলেন যে, জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। ঢাকায় তিন দিন অবস্থানের পর প্রেসিডেন্ট ঢাকা ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেন যে, শেখ মুজিবের সাথে তাঁর আলোচনা সাফল্যজনক হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানই দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্টের সাথে সাংবাদিকদের যে আলোচনা হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে পত্রিকায় লেখা হয় ঃ

"প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁহার আলোচনা সন্তোষজনক হইয়াছে। তিনি বলেন, শীঘ্রই দেশে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার গঠিত হইবে এবং শেখ সাহেব দেশের প্রধানমন্ত্রী হইতে যাইতেছেন। ... ...

শেখ সাহেবকে দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্বৈব সঠিক।

... ...

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন কখন ডাকা হইবে জানিতে চাহিলে প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতীয় পরিষদ অধিবেশন ডাকার ব্যাপারে অনেক কিছু ফ্যাকড়া আছে এবং সেগুলো সম্পর্কে আমি শেখ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। ... ...

পাকিস্তান পিপল্স পার্টির নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি জনাব ভুট্টোর এলাকা সিন্ধুতে পাখী শিকার করিতে যাইতেছি, তিনি যদি সেখানে থাকেন তবে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭১]

অতঃপর প্রেসিডেন্ট পাখী শিকারের উদ্দেশ্যে লারকানা যাত্রা করেন। মহেঞ্জোদারো বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা কালে বলেন যে, শেখ মুজিবকে আমার খেয়াল-খুশীমত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় নি। পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকেই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করা হয় এবং এ অর্থেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৭ই জানুয়ারী ভুট্টোর বাসভবন 'আলমুরতজা'য় ভুট্টোর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বসেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, তাঁদের

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর আলোচনা

এই আলোচনা তাঁদের মধ্যেই সীমিত থাকে; তবে চীফ অব স্টাফ আবদুল হামিদ খান ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদাও সময় সময় এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। যা হোক, ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার আলাপ-আলোচনা বহির্জগতে প্রকাশের পথ পায় নি। তবে লারকানা ত্যাগের প্রাক্কালে সাংবাদিকদের সাথে প্রেসিডেন্টের যে আলোচনা হয়েছিল তা' এইরূপঃ

"বিমানে উঠার আগে সাংবাদিকদের সাথে বলেন যে, জনাব ভুট্টোর সাথে তাঁর ফলপ্রসূ মত বিনিময় হয়েছে—তাঁর শিকারও হয়েছে চিত্তাকর্ষক।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সত্য বলতে কি, আমি তাঁর সাথে কোন ব্যাপারে আপোষ করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করি নি। পরস্পর আপোষ আলোচনার দায়িত্ব তাঁর ও শেখ মুজিবুর রহমানের। আর এক জায়গায় আমি তৃতীয় সূত্র বলেই এ বিষয়ে কিছু কথা বলেছি। আমি কিছু করতে পারি কিনা, সেই চেষ্টাই করছি। তিনি (জনাব ভুট্টো) শীগগিরই মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। ... ...

জনাব ভুট্টোকে দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, শেখ মুজিব ও তিনি দুই প্রধান নেতা এবং তাঁদেরই প্রথম একমত হতে হবে। মুজিব ভুট্টোর সাথে আলোচনা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বর্তমানে এটা নাজুক অবস্থায় আছে। এ সম্পর্কে তিনি বেশী কিছু বলতে চান না। আগে এই দুই নেতা বৈঠকে মিলিত হোন। তারপর তাঁরা কি করতে চান, সেটা আপনাদের মতো আমিও তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাই।

[দৈনিক পাকিস্তান, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৭১]

ক্ষমতা হস্তান্তরের পেছনে যে একটা ষড়যন্ত্র চলছিল, তা' দিন দিন স্পষ্ট হতে থাকে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ধূর্তের মতো প্রথমে ভুট্টোর পরিকল্পনাটুকু আত্মস্থ করে পরে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসেছিলেন এবং শেখ সাহেবের মনোভাব জানা হয়ে গেলেই পাখী শিকারের নাম ক'রে জনাব ভুট্টোর সাথে দীর্ঘ আলোচনায় অংশ নেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ভুট্টোর সাথে আলোচনায় ইয়াহিয়া খানকে আবদুল হামিদ খান ও পীর-জাদাকে সঙ্গে রাখতে হয়েছে। পাকিস্তানের পরবর্তী ইতিহাসে এবং বাংলা-দেশের অভ্যুদয়ে এই ঘটনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, প্রেসিডেন্ট বাইরে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লেও তিনি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে যোগসাজসে লিপ্ত ছিলেন।

যা হোক, আওয়ামী লীগ ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার সুপারিশ করেন। তাঁরা গণতন্ত্র ও বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথমে একটি শাসনতন্ত্র রচনার পর সরকার গঠনের কথা উল্লেখ করেন। এ সংবাদ পরিবেশন ক'রে বলা হয় ঃ

"নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবার আগে দেশে নয়া সরকার গঠিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। দেশের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনগণ নিঃশব্দ ব্যালটের বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলার 'স্বাধিকারের স্বপক্ষে যে দ্ব্যর্থহীন রায় ঘোষণা করিয়াছে, উহার সফল বাস্তবায়ন ঘটাইয়া একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আগে ভিন্নভাবে সরকার গঠন করিয়া গদি দখলের কথা আওয়ামী লীগ চিন্তাও করিতে পারে না। তাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির পরমতম আস্থাভাজন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র আওয়ামী লীগ আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি পরামর্শ প্রদান করিয়া-ছেন। ইহার আগে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়াছে। ... ..."

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৭১]

উল্লেখযোগ্য যে, এ সময় কোন কোন পত্রিকা 'আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইবে' বলে প্রচারণা চালাচ্ছিল।

পূর্ব বাংলার সঙ্গীত-শিল্পী সমাজ ২৪শে জানুয়ারী তারিখে দেশবরেণ্য গণ-নায়ক শেখ মুজিবকে এক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্স-টিটিউটে আয়োজিত এই সম্বর্ধনা সভায় শিল্প-শিল্পী ও নিজস্ব সংস্কৃতির রূপরেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত ক'রে বঙ্গবন্ধু বলেন ঃ

সঙ্গীত শিল্পী সমাজ কর্তৃক শেখ মুজিবের সম্বর্ধনা

"বাংলার মাটিতে 'ভাড়াটিয়া তাহজিব তমদ্দুন' আমদানীর দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। বাংলার মানুষকে, বাংলার নিজস্ব সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশকে আর দাবাইয়া রাখা যাইবে না। ছয় দফা কর্মসূচী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকারের মতই বাঙালীর সাংস্কৃতিক মুক্তিরও নিশ্চয়তা প্রদান করিবে। আর জাতীয় সঙ্গীত ও ললিতকলা একাডেমী বাংলার মাটিতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সঙ্গীতসেবীদের উদ্দেশে আমি বলিতে চাই, বাংলার মাটি ও মানুষকে বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করিয়া নিজস্ব সাহিত্য-কৃষ্টি-সংস্কৃতির পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন। ভয় নাই—বাংলার সাত কোটি মানুষ আপনাদের সঙ্গে আছে।"

[ঐ, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭১]

জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকায় আগমন

এদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো উপলব্ধি করলেন যে, শেখ মুজিবের সাথে আপোষ না ক'রে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব হবে না। শেখ মুজিবও ইতিমধ্যে ভুট্টোর ক্ষমতার প্রতি দুর্বলতাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। তিনি জানালেন যে, ক্ষমতায় গেলে তিনি ভুট্টোর প্রতি সুবিচার করবেন। অতঃপর ভুট্টো সদলবলে ঢাকা আগমন করলেন। উদ্দেশ্য, বঙ্গবন্ধুর সাথে মোলাকাত। শেখ মুজিবের সাথে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ব্যাপারে এবং জাতীয় সমস্যাবলী সমাধানের জন্য জনাব ভুট্টো কিছুসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে ২৭শে জানুয়ারী ঢাকায় এসে পৌঁছলেন। ঢাকায় পৌঁছেই জনাব ভুট্টো বলেন যে, দু'পক্ষের একটা সমঝোতার সৃষ্টিকল্পেই তিনি ঢাকায় এসেছেন। এ সম্পর্কে একটি দৈনিকে সম্পাদকীয় লেখা হয় ঃ "......... নির্বাচনের পর হইতেই জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'শেখ সাহেব নির্বাচনে সার্বাপেক্ষা

গৌরবময় বিজয় অর্জন করিয়াছেন। তিনি জনগণের জন্য বহু নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁহার সহিত আমার কোন মতবৈষম্য নাই। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য একবার কেন, প্রয়োজন হইলে আমি দশবার ঢাকা যাইব।' জনাব ভুট্টোর পূর্বেকার কোন কোন উক্তি জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকিলেও তাঁহার এই সব সাম্প্রতিক আবেগপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক উক্তি বিভ্রান্তিকর নয় বলিয়াই অনেকে মনে করেন। ঢাকা রওয়ানা হইবার ৪ দিন পূর্বে স্বীয় বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে জনাব ভুট্টো তাঁহার এই সফরকে 'এ মিশন অব আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং' বা সমঝোতার উদ্দেশ্যে সফর বলিয়া অভিহিত করেন।

তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে, 'প্রয়োজন হইলে আমি সরিয়া দাঁড়াইতেও রাজী আছি, কিন্তু আওয়ামী লীগের পথে আমি কোন ক্রমেই বাধা হইয়া দাঁড়াইতে চাই না।' জনাব ভুট্টোর এই সমঝোতার মনোভাব প্রশংসার দাবী রাখে। পূর্ব পাকিস্তানে তথা সারা দেশে মানুষ তাই আজ তাঁহার এই 'সমঝোতার মিশনের' পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করে।...... ”

[ঐ, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৭১]

বঙ্গবন্ধু যথার্থ আন্তরিকতার সাথে জনাব ভুট্টোকে অভ্যর্থনা জানালেন। ২৭শে ও ২৮শে জানুয়ারী দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু আলোচনার ফলাফল অপ্রকাশিত থাকে। আলোচনার ফাঁকে একদিন বঙ্গবন্ধু জনাব ভুট্টোকে নিয়ে বুড়িগঙ্গায় নৌকা ভ্রমণ করলেন। অতঃপর ঘূর্ণিবিধ্বস্ত অধিবাসীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য ভুট্টো একদিন হেলিকপ্টারযোগে ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকার ওপর দিয়ে ঘুরে এলেন। আলোচনাচক্র কয়েকবার অনুষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু আলোচনার শেষ ফল খুব সন্তোষজনক হয়েছিল, একথা বলা যায় না। আলোচনা একরূপ অমীমাংসিত রেখেই ভুট্টো দলবল সহ পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি বলে গেলেন যে, আলোচনা আরও চলতে পারে—আলোচনার দরজা বন্ধ নয়।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের জন্য যে দাবী জানিয়েছিলেন তার প্রত্যুত্তরে ভুট্টো জানান যে, ঐ তারিখে অধিবেশন ডাকলে সময়ের ব্যবধানের দিক থেকে

খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়; ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে অধিবেশন ডাকাই তাঁর মতে সমীচীন বলে জনাব ভুট্টো উল্লেখ করেন। বলাই বাহুল্য, নানাছল-চাতুরীতে সময় অতিবাহিত করা এবং এই সময়ের মধ্যে আঘাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাই ভুট্টো ও তাঁর পশ্চিমা দোসরদের উদ্দেশ্য ছিল।

এদিকে কাশ্মিরী মুক্তিযোদ্ধা বলে কথিত দুই তরুণ ভারতের 'গঙ্গা' নামক একখানি বিমানকে 'হাইজ্যাক' ক'রে লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণে বাধ্য করে। ঘটনাটি ঘটে ৩০শে জানুয়ারী তারিখে। হাইজ্যাকারদের সাথে বোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদিও ছিল; বিমানটি লাহোরে অবতরণ কালে বিমানের যাত্রীদের চলে যেতে দেয়া হয়। বিমানে ৪ জন বৈমানিকসহ ৩২ জন যাত্রী ছিলেন। কিন্তু উক্ত দুই তরুণ বিমানটি ছেড়ে যেতে সম্মত হয় নি। তারা ভারতের নিকট দাবী জানাতে লাগলো যে, তাদের দলের যে সব কর্মীকে ভারত বন্দী ক'রে রেখেছেন, তাদেরকে মুক্তি না দিলে বিমানটি ফেরৎ দেয়া হবে না এবং যে কোন মুহূর্তে তা' উড়িয়ে দেয়া হবে। ভারত সরকার সরাসরি এ দাবী অস্বীকার করেন এবং পাকিস্তান সরকারের নিকট থেকে বিমানটি দাবী করেন। এর ফলে 'হাইজ্যাকার' দু'জন ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বিমানটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এটা যে পাকিস্তানেরই কূটনৈতিক চাল এ সম্বন্ধে ভারতের কোন সন্দেহই ছিল না। পাকিস্তানের এই ঘৃণ্য মনোভাবের প্রতিবাদ হিসেবে ভারত সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভারতীয় আকাশ-সীমার ওপর দিয়ে প্রথমে সামরিক বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ক'রে দেন এবং পাকিস্তান সরকারের নিকট বিমানটির ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। পাকিস্তান সরকার এ দাবী মানতে অস্বীকার করলে ভারত সরকার ভারতীয় আকাশ-সীমার ওপর দিয়ে যাত্রীবাহী বিমান চলাচলও বন্ধ ক'রে দেন।

ভারতীয় বিমান 'গঙ্গা' হাইজ্যাক

পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ও সরকার প্রথমে মুক্তিযোদ্ধা বলে কথিত তরুণ দুটির কার্যকলাপে খুব উৎসাহ প্রদান ক'রে চলেন এবং বিশ্বের কাছে কাশ্মীরের প্রতি তাদের দাবী যে কতখানি ন্যায়সঙ্গত তা' 'সপ্রমাণ' ক'রে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভারতের প্রতিশোধমূলক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁরা প্রায় চুপসে গেলেন। অতঃপর এদের কেউ কেউ প্রমাণ

করতে উঠেপড়ে লাগলেন যে, তরুণ দুটো আসলে ভারতেরই এজেন্ট। পরবর্তীকালে তাঁরা এই তরুণ দুটিকে বন্দী ক'রে আসামীর কাঠগড়াতেও দাঁড় করিয়েছিলেন।

ভারতের নেতৃবৃন্দের ন্যায় শেখ মুজিবও বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা পাকিস্তান সরকারের ঘৃণ্য কারসাজি। তিনি এই ঘটনার পশ্চাতে একটি অশুভ ইঙ্গিত দেখতে পেলেন। পাকিস্তানের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখনই জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় উপস্থিত হয়েছে তখনই একটি ঘটনার সৃষ্টি ক'রে তা' বানচালের ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। সুতরাং তিনি জোরালো ভাষায় এই ঘটনার নিন্দা করলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব এই ঘটনা তদন্ত করার দাবী জানান। তিনি আরও বললেন যে, শান্তিপূর্ণভাবে জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা দেওয়ার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদীরা যদি এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করে, তা' প্রতিরোধের জন্য জনগণকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। এই ঘটনাকে কেউ যাতে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করতে না পারে, তার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি পুনরায় সরকারকে আহ্বান জানান।

এদিকে পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মত জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোও হাইজ্যাকারদের কার্যকলাপের প্রশংসায় মেতে উঠলেন। একই দিনে লাহোর থেকে করাচী যাওয়ার প্রাক্‌কালে সাংবাদিকদের নিকট তিনি বললেন: "কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। দু'জন কাশ্মীরী মুক্তি-যোদ্ধাই ভারতীয় বিমানটি উড়িয়ে দিয়েছে। অতএব, এর জন্য পাকিস্তান সরকার বা পাকিস্তানী জনগণকে দায়ী করা যায় না।"

তিনি আরও বলেছিলেন যে, "কাশ্মীরী কমাণ্ডো দু'জনকে পাকিস্তানে রাজনৈতিক আশ্রয় দানেরও কোন প্রশ্ন ওঠে না। কেন না তারা ভারতীয় নাগরিক নয়। আর কাশ্মীরী হিসেবে পাকিস্তানে বসবাস করবারও তাদের অধিকার রয়েছে।" [দৈনিক পাকিস্তান, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১]

পাকিস্তানের ঘৃণ্য কারসাজীর বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের বিবৃতির নিন্দা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। অবশ্যই এতে বঙ্গবন্ধুর এবং বঙ্গবন্ধুর পশ্চাতে দণ্ডায়মান সাড়ে সাত কোটি মানুষের কিছু এসে যায় না।

যা হোক, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এহেন পরিস্থিতির ভেতরেও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার সঠিক তারিখ নির্ধারণ ও কতিপয় জরুরী বিষয়ে আলোচনার জন্য শেখ মুজিবকে তাঁর দলবলসহ ইসলামাবাদে আমন্ত্রণ জানান। শেখ মুজিব এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং প্রেসিডেন্টের জবাবে বলেন যে, তাঁর দলের মন্তব্য প্রেসিডেন্টের নিকট ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন তাঁর নতুন ক'রে আর কিছু বলার নেই।

ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধি-বেশনের তারিখ ঘোষণা

ইয়াহিয়া ভেবেছিলেন যে, মুজিব তাঁর দলবলসহ ইসলামাবাদে গেলে ৬-দফা সম্পর্কে একটি আপোষ সম্ভব হোত। কিন্তু ৬-দফা কোন আপোষের ব্যাপার নয়। সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে রায় দিয়েছে তার সম্পর্কে কোন আপোষ চলতে পারে না। সে কারণেই মুজিব এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এতে মুজিবের দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক পরিপক্কতাই প্রমাণিত হয়েছে। এবারেও ইয়াহিয়ার আর একটি ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হয়েছে। ইয়াহিয়া নির্বাচনের পর এইরূপ অনেক জাল বিস্তার করেছিলেন। অবশেষে সেই জালে তিনি নিজেই আবদ্ধ হয়েছেন। যা হোক, বেগতিক দেখে ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইয়াহিয়া খান ঘোষণায় জানালেন যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকার প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে ৩রা মার্চ বুধবার সকাল ন'টায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেছেন।

প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার পর বিশেষতঃ আতাউর রহমান খান ও মোজাফ্ফর আহমদ প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানান। ১৫ই ফেব্রুয়ারী

প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় নেতৃ-বৃন্দের প্রতিক্রিয়া

ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের এক যৌথ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। উক্ত বৈঠকে জনগণের অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষা

পূরণের উদ্দেশ্যে কোন কর্মপন্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় ক্ষমতা দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর অর্পণ করা হয়। উক্ত সভায় প্রদত্ত শেখ মুজিবের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে পরদিন দৈনিক পাকিস্তান লিখেছেন : "আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল সোমবার বলেন, তাঁর দল ছয়-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সে প্রশ্নে কোন ব্যক্তি বা দল তাঁদের বাধা দিতে পারবে না।

তিনি মনে করেন, ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হ'লে দেশের সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপকার হবে। তিনি আরও বলেন, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল ভিত্তি হিসেবে ছয়-দফা কর্মসূচীকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা যদি ছয়-দফা অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেন তবেই আমরা একসঙ্গে ভাইয়ের মত বসবাস করতে পারি। ... ...

শেখ সাহেব বলেন, ছয়-দফা আগে আওয়ামী লীগের সম্পত্তি ছিল। কিন্তু এখন এটা জনগণের সম্পত্তি, এর পরিবর্তন বা পরিবর্জন করা তাঁর বা আওয়ামী লীগের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ এককভাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম হ'লেও আমরা সবার সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব কামনা করি।

তিনি বলেন যে, গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছাই সবাই মেনে নেয়। কিন্তু পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি গত ২৩ বছর দেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তার জের এখনও শেষ হয় নি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অযথা বিলম্ব করার জন্য নানাভাবে এখনও ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে।

তিনি ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণই তাঁদের দিয়েছে, কারোর কাছ থেকে ভিক্ষা ক'রে আনতে হয় নি।

শেখ সাহেব বলেন, তাঁরা গণতন্ত্রে এবং আইন-শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী। কিন্তু কেউ যদি মনে ক'রে থাকেন তিনি আমাদের অন্য কিছু গ্রহণ করাতে পারবেন, তবে তিনি ভুল করেছেন। আমরা কামানের গুলীর মুখেও ছয়-দফার ভিত্তিতে ছাড়া শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবো না। তিনি দেশের কায়েমী স্বার্থবাদী ও ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ

ক'রে বলেন যে, জনগণের এই বিপুল সাফল্যের পরও তারা যেভাবে তা' বানচালের চেষ্টা করেছেন সেটা আগুন নিয়ে খেলারই সমতুল্য। তিনি সবরকম ষড়যন্ত্র সমূলে উৎপাটিত ক'রে ফেলার জন্য জনগণকে ও দলীয় কর্মীকে প্রস্তুত থাকার আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভূমিকার প্রশংসা ক'রে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, এখনও পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন ক'রে এসেছেন। তিনি বলেন যে, জনসাধারণ ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের দাবী আদায় করলেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আগমনেই জনগণের ভোটাধিকার স্বীকার ক'রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে—এক ইউনিট বাতিল করা হয়েছে।

শেখ সাহেব ষড়যন্ত্রকারীদের কথায় কর্ণপাত না ক'রে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যত শীঘ্র সম্ভব জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস ক'রে, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ক'রে সবাই তাঁর দলকে বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র করছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করা হচ্ছে।

শেখ সাহেব বলেন, ৬-দফার প্রশ্নে তাঁর এবং তাঁর দলের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য এক শ্রেণীর আমলা ও একচেটিয়া স্বার্থবাদী মহল পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, জনগণের লুপ্ত অধিকার আদায় করা। তারপর সম্ভব হ'লে ক্ষমতায় যাওয়া।

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন যে, পিপল্স পার্টির নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো বৈঠকের পর জানান যে, তিনি (ভুট্টো) আলোচনায় খুশীও নন, অখুশীও হন নি। শেখ সাহেব তুমুল হাস্যরোলের মধ্যে বলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে আলোচনা ক'রে সুখী বা অসুখী কোনটাই হই নি। তিনি জনাব ভুট্টোকে বলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সিদ্ধান্ত সবাইকে মানতে হবে। তিনি কাউন্সিল নেতা শওকত হায়াত খান, মওলানা নূরানী, বেলুচিস্তানের নওয়াব বুগতি ও বাহাওয়ালপুরের প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথাও উল্লেখ করেন

এবং বলেন যে, প্রয়োজন হ'লে তিনি অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে ৬-দফার ব্যাপারে কি আলোচনা করবো ? তাঁরা কি এত দিনেও ৬-দফা কর্মসূচী বুঝতে পারেন নি ? নাকি তাঁরা ৬-দফা বুঝতে চান না ? তিনি বলেন, এ সব নেতারা একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন যে, চাবিকাঠি এখন আমাদের হাতে এসে গেছে। আমরাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, তাঁর দল কোনদিন পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলেন নি। বরং তাঁরা জানিয়ে এসেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁরা সর্বদা সংগ্রাম ক'রে যাবেন। তিনি বলেন যে, অত্যাচারী, শোষক, জনস্বার্থবিরোধী আমলা এবং শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাঁরা আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শহীদ এবং অন্যান্য যে সব শহীদ জনগণের দাবী আদায়ের সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন, তাদের নামে শপথ ক'রে আওয়ামী লীগ নেতারা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, ৬-দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে।

আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, তিনি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁকে কোন কিছু জানানো প্রয়োজন মনে করেন নি।

সম্প্রতি ইসলামাবাদে বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের আহ্বান ক'রে লাহোরে ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বশেষ যে খবরাখবর জানানো হয়েছে, তার প্রতি ইঙ্গিত ক'রে শেখ সাহেব বলেন যে, এই ব্যাপারে তাঁকে কিছুই জানানো হয় নি। পররাষ্ট্র দফতরের একজন অফিসার পাঠিয়েও বর্তমান সরকার তাঁকে কিছু জানানো প্রয়োজন মনে করেন নি। তিনি প্রশ্ন করেন, আপনারা সরকার পরিচালনা করছেন ঠিকই কিন্তু কার প্রতিনিধি আপনারা ?"

[দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১]

সে দিনই পিপল্‌স পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো পেশোয়ারে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার

পরিপ্রেক্ষিতে হুমকি প্রদান ক'রে বলেন যে, আওয়ামী লীগ ৬-দফার প্রশ্নে আপোষ না করলে তাঁর দল ৩রা মার্চে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবেন না। ভুট্টোর এই হুমকি প্রদান প্রসঙ্গে এ. পি. পি-র বরাত দিয়ে দৈনিক পাকিস্তান এক সংবাদে লিখেছেন ঃ "পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি'র চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফার ব্যাপারে আপোষ বা পুনর্বিন্যাসের আশ্বাস পাওয়া না গেলে তাঁর দল জাতীয় পরিষদের আসন্ন ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করতে পারবে না। ... ...

ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ভুট্টোর যোগদানে অস্বীকার

তিনি বলেন যে, দেশের প্রয়োজনোপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ৬-দফার যতটুকু জানা সম্ভব তাঁর দল ততটুকু করেছে। কিন্তু এখন তো শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তাঁদের ঢাকা যেতে হচ্ছে না, যেতে হচ্ছে প্রণীত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করার জন্য। জনাব ভুট্টো বলেন, আমাকে যদি এটুকু বলা হয় যে, আপোষ ও পুনর্বিন্যাসের অবকাশ রয়েছে, তা' হ'লে আজই ঢাকা যেতে আমি তৈরী রয়েছি। পাকিস্তান গড়ে তোলার কোন উদ্দেশ্য যদি থেকে থাকে তা' হ'লে আজই আমরা পরিষদে যেতে রাজী আছি। তিনি জানান যে, তাঁর দল একটি দফা বাদে ছাত্রদের ১১-দফা মেনে নিয়েছে। আওয়ামী লীগের ৬-দফার প্রকৃত ফেডারেশন ও গণবাহিনী গঠন সম্পর্কিত দফা দুটিও তাঁরা মেনে নিয়েছেন। ৬-দফার বাকি দফাগুলোর প্রশ্নে তিনি জানান যে, সেগুলোর ব্যাপারে কোন একটি আপোষ মীমাংসায় পৌঁছা সম্ভব হতে পারে। কর আরোপের ক্ষমতা সংক্রান্ত দফাটি সম্পর্কে মীমাংসা হওয়ার আশা খুব কম। এমনকি এ-ব্যাপারেও তিনি একেবারে নিরাশ নন।

পিপল্‌স পার্টি'র প্রধান বলেন যে, তাঁরা ঢালের শেষ পর্যন্ত গেছেন, এর বেশী এগুলে তাঁদের খাদে পড়তে হবে। জনাব ভুট্টো আরো বলেন যে, তিনি সব সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার অবসানের কথা বলেছেন। এগুলোই দেশের মৌল সমস্যা। কিন্তু বর্তমানে শাসনতন্ত্র প্রণয়নই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শাসনতন্ত্র প্রণীত না হ'লে ঈপ্সিত সংস্কার করা যাবে না। তাই তিনি জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রতিই অখণ্ড মনোযোগ দিচ্ছেন।

তিনি জানান যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক, তাঁর দল তাই চায়। পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে তাঁদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তাঁরা সেখানকার সম্পদ জনসাধারণের কল্যাণে লাগাতে পারবে। পিপল্‌স পার্টি বিরোধী দল হয়ে থাকবে, না কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকারে শরিক হবে, তা' বড় কথা নয়—দলের বৃহত্তর স্বার্থেই তাঁরা সত্বর ক্ষমতা হস্তান্তর কামনা করেছে।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, নির্বাচনী প্রচার কালে তাঁর দল ৬-দফা সম্পর্কে কোন নীতি গ্রহণ করে নি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বহু নেতা ৬-দফার তীব্র সমালোচনা করেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, আজ সেই সব সমালোচনাকারীরাই ৬-দফার প্রশংসাকারী সেজেছে। এরা এতদিন ছিল শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রবক্তা। আর পিপল্‌স পার্টি বলে আসছে, কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যোপযোগী হতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্য পিপল্‌স পার্টির রয়েছে বিরাট শ্রদ্ধা। পূর্ব পাকিস্তানীরা শাসিত হয়েছে, তাদের ক্ষোভের কারণ আছে। পিপল্‌স পার্টির ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে, দেশে একটা আভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক কাঠামো আছে। সেই কাঠামোর মূলোচ্ছেদ করতে হবে।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, ৬-দফায় যতটুকু এগুনো সম্ভব তাঁর দল ততটুকু এগুনোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে বলে তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফা সম্পর্কে তিনি তাঁর নিজের দল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের সাথে আলোচনা করেছেন। তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ৬-দফার বিরোধী, আর কিছু সংখ্যক আছে যাঁরা ৬-দফা মেনে নেবার কথা বলেছেন। আগামী ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে তাঁর দলের যে বৈঠক হবে তাতে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, তিনি আশা করেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে আসলে ৬-দফা সম্পর্কে আরো আলোচনা করা যাবে। শেখ মুজিব মনে করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান পরিবেশ তাঁর সফরের পক্ষে অনুকূল নয়। আওয়ামী লীগের মধ্যে আদান-প্রদানের মনোভাব আছে কিনা তা' তিনি জানেন না। শেখ মুজিবের পক্ষে যদি

এখানে আসা সমীচীন না হয়, তা' হ'লে ভারতের সাথে পাকিস্তানের বর্তমান সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ঢাকা যাওয়া আরো বেশী কঠিন। ভারত সম্পর্কে পিপল্‌স পার্টির নীতি অত্যন্ত পরিস্কার। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বারবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিচ্ছেন। এ অবস্থায় জনসাধারণের পাশে থাকা তাঁর দায়িত্ব।

জনাব ভুট্টো বলেন, 'আমার জীবন আমি বিপন্ন করতে পারি কিন্তু আমি তো একা নই, দলের ৮৩ জন নেতার প্রশ্নও জড়িত। ভারতের শত্রুতা এবং ৬-দফা না মানার ফলে ঢাকায় তাঁদের অবস্থা হবে ডবল জিম্মীর শামিল। তিনি তাদের সেই অবস্থায় ফেলতে পারেন না'।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১]

ভুট্টোর এই ঘোষণায় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দেয়। ন্যাপ প্রধান ওয়ালী খান জানান যে, ভুট্টোর এই সিদ্ধান্তের ফলে গণমনে গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা সম্পর্কে প্রবল সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর দল পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবে।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর নেতা মুসলিম লীগের কাইয়ুম খান ভুট্টোর সাথে হাত মেলালেন। নির্বাচনে তাঁর দল পূর্ব বাংলায় একটি আসনও পায় নি; পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি চরম ভাবে উপেক্ষিত হয়েছেন। সামান্য ক'জন পরিষদ সদস্য তাঁর দলের মূলধন। ক্ষমতায় যাওয়া তাঁর পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, আর সম্ভব নয় বলেই তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টিকে বানচাল ক'রে দেবার জন্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন। ভুট্টোকে তিনি ঠিকই চিনেছিলেন, আর সে ভরসাতেই স্বচ্ছন্দে তিনি ভিড়ে গেলেন ভুট্টোর দলে—মাণিকে মাণিক চেনে।

অধিবেশনে যোগদানে কাইয়ুম খানের অস্বীকৃতি

১৬ই ডিসেম্বর তাঁরা উভয়েই আলোচনায় মিলিত হওয়ার পর অকস্মাৎ ভুট্টো ঘোষণা করেন, একটা তৈরী শাসনতন্ত্রে কেবল স্বাক্ষর দানের জন্য তিনি ৩রা মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে যোগদান করতে রাজী নন। তিনি হুমকি প্রদর্শন করে বলেন যে, যদি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেউ যায়, তা' হ'লে তিনি পেশোয়ার হতে খাইবার পর্যন্ত আগুন জ্বালিয়ে দেবেন।

ভুট্টোর হুমকির বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

ফেব্রুয়ারীর ১৭ তারিখে ওয়ালী ন্যাপের নির্বাচিত সদস্যগণ জাতীয় পরিষদে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই দিন বেলুচ নেতা আকবর খান বুগতি শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকের পর মন্তব্য করেন যে, অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্নে ভুট্টোর সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের দু' অংশকে আলাদা করার উদ্দেশ্য নিয়েই গ্রহণ করা হয়েছে। পরের দিন অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মাশাল নূর খান এবং সিন্ধি নেতা জি. এম. সৈয়দ শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এদিকে ঠিক সেই দিনই অকস্মাৎ ঢাকায় জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার অফিসে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত করা হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭১) ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারী পার্টির এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সহকারী নেতারূপে নির্বাচিত হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। জাতীয় পার্লামেন্টারী পার্টির অন্যান্য কর্মকর্তা হচ্ছেন: পার্টির সেক্রেটারী জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ও চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এছাড়াও হুইপ নির্বাচিত হন কুষ্টিয়ার জনাব আমিরুল ইসলাম ও জনাব এম. এ. মান্নান।

শেখ মুজিব দলীয় পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত

ঐ দিন বিকেলে একই স্থানে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের বৈঠকে পাবনার ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে দলের নেতা নির্বাচিত করা হয়। উভয় বৈঠকেই শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জরুরী আমন্ত্রণে করাচী থেকে রাওয়ালপিণ্ডি যান। সেদিন জনাব ভুট্টো করাচীতে এক দলীয় কর্মী সমাবেশে সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সশস্ত্রবাহিনী ছাড়া দেশে তিনি কোন চতুর্থ শক্তির কথা স্বীকার করেন না।

ভুট্টোর ঘোষণা

পরদিন অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীর ১৯ তারিখে পিণ্ডিতে ইয়াহিয়া-ভুট্টো ৫ ঘন্টাব্যাপী এক গোপন আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনা শেষে হোটেলে

ফিরে এসে জনাব ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁর জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত 'অনড় ও অপরিবর্তনীয়' রয়েছে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁর সমঝোতা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে জবাবে তিনি বলেন, "দরজা বন্ধ করিয়া দেই নাই। আলাপ-আলোচনার জন্য দরজা খোলা রাখার নীতিতেই আমরা বিশ্বাস করি। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা গ্রহণের অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১]

প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনার বিষয়বস্তু জানতে চাওয়া হ'লে তিনি বলেন যে, "প্রেসিডেন্টের সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় স্বার্থ এবং জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।"

একই দিনে কাউন্সিল লীগ নেতা অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল নূর খানও শেখ মুজিবের সঙ্গে দেড় ঘন্টা কাল ধরে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে নূর খান মন্তব্য করেন যে, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় পরিষদে উত্তম শাসনতন্ত্র রচিত হতে পারে।

পাকিস্তানের এই সঙ্কটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই এলো 'একুশে ফেব্রুয়ারী'। অন্যান্য বৎসরের চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যের সঙ্গে এবারের একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপিত হ'ল।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন করার সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলা একাডেমী ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে সপ্তাহব্যাপী এক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সে দিন তিনি বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, "যে দিন থেকে তাঁর দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে, সে দিন থেকেই অফিস আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হবে। যে বাঙালী জাতীয়তাবাদ এতদিন শুধু মুখে মুখে প্রচলিত ছিল কিন্তু আজ এটা বাস্তব সত্য এবং নিঃসন্দেহে বাঙালী আজ একটি জাতির নাম।

বাংলা একাডেমীতে শেখ মুজিবের ঘোষণা

একাডেমীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "এই সেই ভবন, যার অভ্যন্তর থেকে বাংলা ভাষা-সংগ্রামীদের গুলী করার আদেশ দেয়া হয়েছিল—এতে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকতেন। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, এই ভবনেই বাংলা একাডেমী স্থাপন করবো : সে প্রতিজ্ঞা আমাদের সফল হয়েছে। কিন্তু গণ-দুশমনদের জঘন্য চেষ্টায় এই একাডেমী তেমন কিছু করতে পারে নি। বার বার লোক বদল ক'রে এখানে বাংলার প্রকৃত চর্চাকে রুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলেছে। বাংলাকে ইসলামী-করণের চেষ্টা চলেছে—আরবী আর রোমান হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা হয়েছে আর এই একাডেমীর জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র তিন লক্ষ। দুষ্কৃতিকারীরা জানতো, কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হ'লে এর সাহিত্য আর সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হয় প্রথম। তিনি প্রশ্ন করেন, 'যারা এসব করেন, তাঁরা কারা?' তারাও কি আপনার আমার মত এই বাংলার মাটিতে জন্ম গ্রহণ করে নি?"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১]

শহীদ মিনারে শেখ মুজিব

২১শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ক'রে শপথ-বাণী উচ্চারণ ক'রে বলেন, "বাঙালীকে পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখার শক্তি পৃথিবীতে কারো নেই। যারা সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধিকারের দাবী বানচালের জন্য বাঙালীকে ভিখারী বানিয়ে ক্রীতদাস করে রাখছে, তাদের উদ্দেশ্য যে কোন মূল্যে ব্যর্থ ক'রে দেয়া হবে।" [ঐ]

সেদিন তিনি অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, "ভাইরা আমার, বোনেরা আমার—সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি হয়তো আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি। মানুষকে মরতেই হয়। জানিনা আবার কবে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারবো! তাই আজ আমি আপনাদের এবং বাংলার সকল মানুষকে ডেকে বলছি—চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোন বাংলার মানুষ যেন শোষিত না হয়, বঞ্চিত না হয়, লাঞ্ছিত-অপমানিত না হয়। দেখবেন শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। যতদিন বাংলার আকাশ, বাতাস, মাঠ, নদী থাকবে, ততদিন শহীদরা অমর হয়ে থাকবে। বীর শহীদদের অতৃপ্ত আত্মা আজ দুয়ারে দুয়ারে ফিরছে, বাঙালী তোমরা

কাপুরুষ হইও না, চরম ত্যাগের বিনিময়ে হ'লেও স্বাধিকার আদায় কর। বাংলার মানুষের প্রতি আমার আহ্বান—প্রস্তুত হোন স্বাধিকার আমরা আদায় করবই।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১]

ফেব্রুয়ারীর ২১ তারিখেই পিপলস পার্টির জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ভুট্টো সাহেবকে প্রয়োজন বোধে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমঝোতার জন্য তারা ৫-দফার একটি ফর্মুলাও প্রণয়ন করেন। এই ৫-দফা ফর্মুলা হ'ল ঃ

পিপল্‌স পার্টির ৫-দফা ফর্মুলা

"(১) ফেডারেল সরকার বলতে যা বোঝায় সত্যিকার সেই ধরনের একটা ফেডারেল সরকার গঠন।

(২) প্রতিটি অঙ্গ ইউনিট যাতে সমান প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে এবং তাদের নীতি ও পরিকল্পনার ব্যাপারে সমন্বয় সাধন করতে পারে তজ্জন্য কেন্দ্রে একটা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন-পরিষদ গঠন। তবে উচ্চ-পরিষদ বা সমন্বয় সাধন সংস্থাকে লর্ড সভার মত হতে হবে এমন কথা নেই।

(৩) আন্তঃ-আঞ্চলিক ও আন্তর-প্রাদেশিক শোষণ বন্ধ কল্পে মুদ্রা ও কর ধার্যের ব্যাপারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে হবে।

(৪) সর্বাধিক কর্মক্ষমতা অথচ একটা কার্যকর কেন্দ্রের জন্য ফেডারেল সরকারের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত রাজস্ব আদায়ে ফেডারেল সরকারকে ক্ষমতা প্রদান।

(৫) বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিদেশী সাহায্য বিষয় ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে থাকবে এবং শাসনতন্ত্রে প্রদেশসমূহের মধ্যে পাকিস্তানী নাগরিকদের তথা চাকরী-বাকরী ও বিভিন্ন পণ্যের অবাধ চলাচলের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।"

[ঐ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১]

২২শে ফেব্রুয়ারী ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করেন। তিনি প্রাদেশিক গভর্নর এবং সামরিক আইন প্রশাসকদের সঙ্গে

বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। ঐদিন কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আস্তে আস্তে ঘোলাটে হতে শুরু করল। শেখ সাহেবের কাছে জঙ্গী শাহীর মনোভাব আর অস্পষ্ট রইল না।

শেখ মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলন

২৪শে ফেব্রুয়ারী তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, "জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকে 'সাবোট্যাজ' করার উদ্দেশ্যে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের দায়িত্বের কথা স্মরণ ক'রে আওয়ামী লীগ ইচ্ছাকৃতভাবে নীরবতা পালন করেছে। কারণ আওয়ামী লীগ তীব্র বিরোধের দ্বারা রাজনৈতিক আবহাওয়া বিষাক্ত করতে চায় নি।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১]

বঙ্গবন্ধু বলেন, "অহেতুক দেরী করে পরিশেষে ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের নোটিশ দেওয়া হ'লো। তখন মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল যে, ষড়যন্ত্রকারী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিবাদী শক্তি জয়ী হয়েছে।"

[ঐ]

তিনি বলেন, "পাকিস্তানে যখনই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছে তখনই এই কৃষ্ণ শক্তি, ষড়যন্ত্রকারী শক্তি সক্রীয় হয়ে ওঠে। এই গণবিরোধী শক্তি, ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত ক'রে ১৯৫৫ সালে আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী করে এবং তারপর প্রতিটি গণআন্দোলন ব্যর্থ করার জন্য হস্তক্ষেপ করে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১]

তিনি বলেন যে, "জনাব ভুট্টো এবং পিপল্‌স পার্টি হঠাৎ ক'রে মনোযোগ আকর্ষণকারী ভাবভঙ্গী ও মত প্রদান শুরু করেন। এতে জাতীয় পরিষদের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি ক'রে শাসনতান্ত্রিক কার্যপ্রণালী নস্যাৎ করার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি জনগণের বিজয় সাবোট্যাজ করার ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার ন্য পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণ এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত জনতার প্রতি আহবান জানান। বঙ্গবন্ধু পিপলস্ পার্টি'র বর্তমান বক্তব্য প্রসঙ্গে পি.পি.পি-র জেনারেল সেক্রেটারী জনাব জে. এম. রহিমের লিখিত অভিমত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "জনাব রহিম স্বীকার করেছেন যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তব অবস্থার শিকার হয়ে পূর্ব পাকিস্তান সত্যই একটি উপনিবেশ (কলোনী) হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ৬-দফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত কয়েকটি মৌলিক আপত্তি সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এগুলো অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থবাদীদের কার্যক্রম বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক অবস্থাকে চিরস্থায়ী করার হিসেবী-পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

বঙ্গবন্ধু আরো বলেন যে, "কেন্দ্রের হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য না থাকলে বাঙালীকে শোষণ সম্ভব হত না। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের হাতে মুদ্রা ও বাণিজ্য রাখার চাপ দেওয়ার পরিষ্কার অর্থ জাতীয় সংহতির স্বার্থ নয়, বাংলাদেশকে ঔপনিবেশিক শোষণ করার উদ্দেশ্যে শোষকের প্রধান যন্ত্র কেন্দ্রের হাতে রাখা।"

তিনি আরো বিশ্লেষণ করেন, "পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির উপর ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন চাপিয়ে দেওয়ার কোন অভিপ্রায় আওয়ামী লীগের নেই। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলি বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন না চান এবং তারা নিজেরাই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা করেন, তা' হ'লে আওয়ামী লীগের কিছু বলার নেই। তবে এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব রয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলি যদি নিজেরা বিষয়টি মীমাংসা করতে না পারেন, তা' হ'লে আওয়ামী লীগ সে দায়িত্ব পালন করবে।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১]

আহসান-মুজিব সাক্ষাৎকার

২৬শে ফেব্রুয়ারী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসান শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে ৩০ মিনিট ব্যাপী এক আলোচনায় মিলিত হন। ইয়াহিয়ার কাছ থেকে শেখ সাহেবের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা বয়ে নিয়ে এসেছেন বলে গভর্নর মন্তব্য করেন।

পরদিন আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বৈঠকে ৬-দফা ভিত্তিক দলীয় খসড়া শাসনতন্ত্রটি বিবেচনা করা হয়। সেদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টারী পার্টির আর এক বৈঠকে জাতীয় পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনে সাতজন মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দান করা হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতি কর্তৃক প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে শেখ মুজিবকে এক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনার জবাবদান কালে বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, "তাঁর দল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তবে 'সে সমাজতন্ত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, বরং নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পন্থায় আস্তে আস্তে বিবর্তনের মাধ্যমে সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে' বলে তাঁর দল বিশ্বাস করে।"

আওয়ামী লীগের খসড়া শাসনতন্ত্র বিবেচনা

আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত সুপারিশ মেনে নেয়া হবে। "......আওয়ামী লীগ প্রধান পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের ঢাকায় এসে দেশের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে যোগদানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে জনগণ তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন। কাজেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সবার পক্ষেই পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করা উচিত। শেখ মুজিব আশা প্রকাশ করেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নির্ধারিত সময়ে পরিষদে দিনরাত আলোচনার মধ্যে সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, যদি একজন সদস্যও সুষ্ঠু ও ন্যায্য সুপারিশ করেন তা' মেনে নেয়া হবে।

ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব

জাতীয় পরিষদকে কসাইখানা এবং পূর্ব বাংলায় এসে 'জিম্মী' হওয়া সম্পর্কে জনাব ভুট্টোর উক্তিকে শেখ মুজিব বাঙালীদের প্রতি অপমানজনক বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ না দেয়া সম্পর্কে জনাব ভুট্টোর হুমকির কথা উল্লেখ ক'রে শেখ মুজিব বলেন যে, বাংলাদেশ বলে যদি তিনি মাত্র ৮৩ জন সদস্য নিয়ে আসতে না চান, তা' হ'লে আওয়ামী লীগ ১৬০ জন সদস্য নিয়ে বলতে পারে 'আমরাও যাব না।'

শেখ মুজিব জিজ্ঞেস করেন তা' হ'লে কি হবে? শেখ মুজিব এই প্রসঙ্গে আরো বলেন যে, এতদিন ধরে বাঙালীরা সামান্য ২শো টাকার পারমিট থেকে শুরু ক'রে সব কাজে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছে, কোন দিন আপত্তি করে নি।

পূর্বাহ্নে আশ্বাস দান সম্পর্কিত জনাব ভুট্টোর দাবীর কথা উল্লেখ ক'রে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি কোন আশ্বাস দিতে পারেন না। কারণ ৬-দফা বর্তমানে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

শেখ মুজিব সম্বর্ধনা সভায় বলেন যে, ৬-দফা শুধু বাংলার মানুষের জন্যে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত সাধারণ মানুষের জন্যও। তিনি বলেন, তা' সত্ত্বেও ৬-দফা সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের আপত্তির কারণ হচ্ছে, এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের সকল ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে তাঁরা ভোগ করেছেন। এখন তাঁদের সেই দিন ফুরিয়ে বাঙালীদের পালা এসেছে।

তাই তিনি অভিযোগ করেন যে, যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ডিকটেটরশীপের (একনায়কত্ব) কথা বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যালঘিষ্ঠের ডিকটেটরশীপ করছেন।

শেখ মুজিব আরও বলেন যে, সাধারণ মানুষের সাথে সাথে বড় শিল্প-পতিরা বাংলাদেশের ছোট ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের গ্রাস ক'রে ফেলেছে। তিনি বলেন, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী এই সব বড় শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে ছোট ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের গ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন যে, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী জাতীয়করণ ক'রে তা' দুঃখী মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে। এই প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে। কারণ সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা না হ'লে সাধারণ মানুষের কোন উন্নতি হবে না। তিনি বলেন, তবে এই সমাজতন্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা করা হবে। . ..."

[দৈনিক পূর্বদেশ, ১লা মার্চ, ১৯৭১]

সে দিনই লাহোরে এক জনসমাবেশে জনাব ভুট্টো বক্তৃতা দান কালে নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের

দাবী জানান। এ সংবাদ পরিবেশন ক'রে দৈনিক পূর্বদেশ লিখেছেন :

"পিপল্‌স পার্টি'র চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ এখানে ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের তারিখ স্থগিত করা অথবা ১২০ দিন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় সীমা তুলে দেয়া হ'লে তিনি ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে রাজী আছেন। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থায় তাঁর দল জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য ঢাকা যাবে না।

ভুট্টো কর্তৃক পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের দাবী

আজ বিকালে মিনা-এ-পাকিস্তানের কাছে ঐতিহাসিক 'ইকবাল পার্কে' এক বিরাট জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা করছিলেন। জনাব ভুট্টো হুমকি প্রদর্শন ক'রে বলেন যে, তাঁর দলের অংশগ্রহণ ছাড়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'লে তিনি খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত আন্দোলন শুরু করবেন।

তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, আগামী ২রা মার্চ জাতীয় পরিষদের মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে তাঁর দল ছাড়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ণ ধর্মঘট পালন করা হবে। এই প্রসঙ্গে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সেদিন যদি একটি দোকানও খোলা থাকে তা' হ'লে তিনি মনে করবেন যে ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছে।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা কালে তিনি ৬-দফার কয়েক দফা মেনেছেন। তিনি কার্যকরী কেন্দ্রসহ ফেডারেশন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মেনেছেন। তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে, মুদ্রা ও কর-এর ক্ষেত্রে সমঝোতায় আসা যেতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য কেন্দ্রের বহির্ভূত করা হ'লে তা' তাঁর দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি বলেন, বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কেন্দ্র বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে না।

পিপল্‌স পার্টি প্রধান বলেন, তিনি পাকিস্তানকে নামেমাত্র চান না। তিনি পাকিস্তানকে এমন একটি শক্তিশালী এশীয় দেশ হিসেবে দেখতে চান যে, ভারতীয় আক্রমণ নস্যাৎ ক'রে দিতে সক্ষম হবে। জনাব ভুট্টো

বলেন, দেশকে একটি কার্যকরী শাসনতন্ত্র দিতে প্রয়োজন হলে তাঁর দল পরিষদে পাঁচ সাত বছর থাকতেও রাজী আছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, দেশের প্রথম গণপরিষদ সাত বছরেও একটি শাসনতন্ত্র দিতে পারে নি। দ্বিতীয় পরিষদ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তিন বছর সময় নিয়েছে। তিনি বলেন, তা' হ'লে বর্তমান জটিল সমস্যায় জাতীয় পরিষদের কাছ থেকে কি ক'রে ১২০ দিনে একটি কার্যকরী শাসনতন্ত্র আশা করা যায়?

জনসমাবেশে ভুট্টো বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ৬-দফার বিরুদ্ধে তাদের রায় দিয়েছেন তা' নির্বাচনের ফলাফল থেকেই প্রতীয়মান হয়। ৬-দফার পক্ষে সমর্থন দানের জন্য যারা এখান থেকে নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। পিপল্‌স পার্টি প্রধান আওয়ামী লীগের ৬-দফার ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, তিনি এমন একটি কেন্দ্র চান যা দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করবে। তিনি বলেন, তিনি প্রমাণ ক'রে দিতে পারেন ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত হ'লে পাকিস্তানের গোড়া কেটে যাবে।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ১লা মার্চ, ১৯৭১]

ফারল্যাণ্ড-মুজিব সাক্ষাৎকার

অধিবেশনের দিন ঘনিয়ে এলো। বাংলার মানুষ উদ্বেগ সঙ্কুল আগ্রহে সময় গণনা করতে লাগলো। আসন্ন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য পাকিস্তানে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু সংখ্যক কূটনীতিকও ঢাকায় আসেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জোসেফ ফারল্যান্ড ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন।

ইয়াহিয়ার ঘোষণাঃ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত

পরদিন ১লা মার্চ ১৯৭১ সাল। অকস্মাৎ বেলা ১টা ৫ মিনিটে পাকিস্তান বেতারে পঠিত এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকবে। পাকিস্তানের দু-অংশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিরোধ দেখা দিয়েছে তার অবসানের অবকাশ সৃষ্টির জন্যই নাকি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরিস্থিতির উন্নতি হলেই তিনি পুনরায় সে পরিষদ ডাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ এইরূপ ঃ

"আজ পাকিস্তান চরম রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন। তাই বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের বর্তমান বাধা-বিপত্তি দূর করার জন্য আমি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাই সে সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করার প্রয়োজন বোধ করছি। তবে তা' করার আগে আমার উপর দেশের শাসনভার অর্পিত হওয়ার দিন থেকে শুরু ক'রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আমি যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি সে সবের পুনরুল্লেখ করতে চাই। জাতির প্রতি প্রদত্ত আমার প্রথম ভাষণেই আমি সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছিলাম। তখন থেকেই এই লক্ষ্য অর্জনের পথে আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছি। দেশে সামরিক আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও আমি রাজনৈতিক দলসমূহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করি নি, বরং ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে পূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর অনুমতি দিয়েছি।

ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ

অতঃপর ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে যথারীতি আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করা হয়। এই আদেশের অধীনেই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ এবং ভোটের তালিকা প্রণয়ন সহ অন্যান্য সকল কাজও দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

দীর্ঘ ও আয়াসসাধ্য নির্বাচনী অভিযান এমনভাবে শেষ হয় যাকে আমরা গর্বের সঙ্গে বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সর্বাধিক শান্তিপূর্ণ ও সুসংগঠিত সাধারণ নির্বাচন বলে দাবী করতে পারি। আপনারা জানেন, ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়। নির্বাচনের ঠিক আগে ১৯৭০ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে প্রদত্ত আমার ভাষণে আমি রাজনৈতিক নেতাদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, নির্বাচন এবং জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁরা যদি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন এবং আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রধান বিষয়গুলোর উপর সাধারণভাবে ঐক্যমতে পৌঁছান, তবে তা' তাঁদের জন্য ফলপ্রসূ হবে। ঐ সময়ে আমি এটাও আভাস দিয়েছিলাম যে, এ সব বৈঠকের সাফল্যের জন্য একটা দেয়া-নেয়ার মনোভাব, পারস্পরিক আস্থা এবং আমাদের ইতিহাসের

এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ের যথাযথ উপলব্ধির দরকার হবে। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এ ধরনের মত বিনিময়ের বিরাট গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রেই আমি তাঁদের মত বিনিময়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিয়ে কর্মপদ্ধতি সহজ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম। এ জন্যই আমি আমাদের জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের তারিখ ৩রা মার্চ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম।

বিগত কয়েক সপ্তাহে অবশ্য আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাকে দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, ঐক্যমতে পৌঁছিবার পরিবর্তে আমাদের কোন কোন নেতা অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনৈতিক মোকাবিলা একটি দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এতে সমগ্র জাতির উপর একটি বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অর্থাৎ পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি এবং আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া, ভারত কর্তৃক সৃষ্ট সাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সার্বিক অবস্থাকে আরও জটিল ক'রে তুলেছে। অতএব, আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান পরবর্তী কোন তারিখের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি বার বার উল্লেখ করেছি যে, শাসনতন্ত্র কোন সাধারণ আইন নয়, বরং এটা হচ্ছে একত্রে বসবাস করার একটি চুক্তি বিশেষ। অতএব, একটি সুষ্ঠু ও কার্যকরী শাসনতন্ত্রের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়ের পর্যাপ্ত অংশীদারত্ববোধ থাকা প্রয়োজন।

এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়েই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। অবশ্য এ সকল সমস্যার বাস্তব দিকসমূহ আপনাদের লক্ষ্য করতে হবে। আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, এত অধিক সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিনিধি পরিষদে যোগদান করছেন না যে, এ অবস্থায় আমরা যদি ৩রা মার্চ

জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠান করতে যাই তবে পরিষদ-টাই ভেঙ্গে পড়তে পারে এবং সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে সকল প্রচেষ্টার কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তা' সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সুতরাং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত সমঝোতায় উপনীত হবার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আরো কিছু সময় দেওয়া উচিত। এ সময় দেওয়ার পর আমি একান্তভাবে আশা করি যে, তারা একে কাজে লাগাবেন এবং সমস্যার একটি সমাধান বের করবেন। আমি পাকিস্তানী জনগণকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে, ইতিপূর্বে বর্ণিত পরিস্থিতি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে সহায়ক হওয়ার সাথে সাথেই আমি অনতিবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে কোনরূপ ইতস্ততঃ করবো না। আমার দিক থেকে আমি দেশবাসীকে আশ্বাস দিতে চাই যে, আমাদের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের কাজে আমি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সহায়তা করার জন্য আমার ক্ষমতার আওতায় যা কিছু সম্ভব সবই করবো এবং তা' নিষ্ঠার সাথে করবো যেমন এ যাবৎ ক'রে এসেছি।

পরিশেষে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করি, তিনি যেন আমাদের জাতির পিতার নির্দেশিত ঈমান, ঐক্য ও শৃঙ্খলার পথে পরি-চালিত করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং আমার দেশবাসীর কাছে আবেদন এই যে, আমাদের জীবনে এই সংকটময় মুহূর্তে তারা যেন পূর্ণ সংযমের পরিচয় দেন।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২রা মার্চ, ১৯৭১]

ইয়াহিয়া যে আসলে পাকিস্তানের চিরন্তন কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির জীবন্ত প্রতিভু এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে। নির্বাচনের পর পরিষদের বৈঠক ডাকতে সুদীর্ঘ গড়িমসি, মূলনীতির দাম্ভিক ঘোষণা, সংবিধান সংক্রান্ত হুমকি, মুজিব-ভুট্টোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যের এক জঘন্য নায়ক এই ইয়াহিয়া। সুতরাং, একটি বড় অজুহাতের সুযোগ নিয়ে জাতীয় পরি-ষদের বৈঠক বসবার আসন্নকালে ১লা মার্চে এই বৈঠক স্থগিত ঘোষণা ক'রে ইয়াহিয়া এক জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতার সূত্রপাত করলেন। এই বিশ্বাস-ঘাতকতা থেকেই জল্লাদ ইয়াহিয়া ধীরে ধীরে বাঙালীর রক্তপানের পথে এগিয়ে যেতে লাগলেন। রক্তপিপাসু জল্লাদ বিশ্বের নিষ্ঠুরতম গণহত্যায়

তাঁর দোসরদের নিয়ে আত্মনিয়োগ করলেন। ১লা মার্চের পর থেকে ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত সেই পথেই গড়িয়ে গেছে। সুতরাং, এই দিনটি ইয়াহিয়ার ঘোষণার জন্য এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়ার জন্য বিখ্যাত হয়ে রইল।

দৈনিক পাকিস্তান এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছেন :

"প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গতকাল (সোমবার) এক বিশেষ বিবৃতিতে ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বৃহৎ দল অর্থাৎ পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং সেই সঙ্গে অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার সঙ্কল্প প্রকাশ করায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রেসিডেন্ট তাঁহার বিবৃতিতে বলেন। এই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, ভারতীয় কার্যকলাপের দরুন উদ্ভূত উত্তেজনাকর ও জটিল পরিস্থিতির কথা।

সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া

প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণা জনসাধারণের নিকট অপ্রত্যাশিত মনে হইয়াছে। এই ঘটনা জনসাধারণের পক্ষে হতাশাব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। জনসাধারণ গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন। তাই সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রতি। ঠিক এই মুহূর্তে পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো হুমকি দিলেন যে, তাঁহার দলের অংশ গ্রহণ ব্যতীত যদি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাঁহার দল পশ্চিম পাকিস্তানে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু করিবে। তিনি একটি অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ শর্ত আরোপ করিতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করিলেন না। জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিত রাখা হইলে অথবা ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের শর্ত বাতিল করা হইলে তাঁহার দল পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে বলিয়া তিনি শর্ত আরোপ করেন। এই শর্ত যে একটি প্রবল চাপ তাহা অর্বাচীন বালকেরও বোধগম্য। বস্তুতঃ জনাব ভুট্টোর জেদের জন্যেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হইল। জনাব ভুট্টোর বর্তমান রাজনৈতিক কার্যক্রম যদি পাকিস্তানকে কোন বিপর্যয়ের

মুখে ঠেলিয়া দেয় তবে সে জন্য শুধুমাত্র তিনিই দায়ী থাকিবেন। ইতিহাস তাঁহাকে কোনদিন ক্ষমা করিবে না।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২রা মার্চ, ১৯৭১]

ঐদিন আর এক ঘোষণায় প্রাদেশিক গভর্নর ভাইস এডমিরাল আহ্সানকে পদচ্যুত করা হয় এবং তাঁর স্থলে 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ সাহেবজাদাকে নিয়োগ করা হয়। জনাব আহসানকে পদচ্যুত করার পিছনে কোন কারণ না দর্শান হ'লেও এ বিষয়ে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা যে, জনাব আহসান বাঙালীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং শেখ সাহেবের সাথে তাঁর বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল বিধায় তাঁর অপসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে জনাব আহসানের মত সহৃদয় ব্যক্তিকে গভর্নর পদে রেখে তা' সম্ভব নয়। তাই তাঁকে সরিয়ে সামরিক বাহিনীর একজন পদস্থ অফিসারের উপর নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পণ করা হয়।

গভর্নর আহসানের বিদায়

নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকে বঙ্গবন্ধু বলে আসছেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র চলছে। ছদ্মবেশী ইয়াহিয়ার প্রকৃত রূপকে আর তাঁর চিনতে বাকী নেই। তাই জনগণকে আসন্ন বিপদের মোকাবিলার জন্য বারবার তিনি প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বেতারে ইয়াহিয়া খানের বিবৃতি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। সে দিনের প্রতিবাদমুখর রাজধানীর বর্ণনা দিতে গিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছেন ঃ

"বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠানের মাত্র দুইদিন পূর্বে গতকাল (সোমবার) বেলা ১-05 মিনিটের সময় আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করিয়া পাকিস্তান বেতারে প্রেসিডেন্টের বিবৃতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ঢাকা প্রচণ্ড ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। প্রেসিডেন্টের এই বিবৃতি প্রচারে দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ বিক্ষোভে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরের সকল দোকানপাট

বিক্ষুব্ধ রাজধানী

বন্ধ হয়ে যায়। সরকারী বেসরকারী অফিস, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, কল-কারখানার শ্রমিক এবং আদালতের আইনজীবিগণ রাস্তায় নামিয়া আসেন। গোটা শহর বিগত ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের ন্যায় স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। শিল্প এলাকা, কল-কারখানা, অফিস-আদালত এবং বিভিন্ন মহল্লা হইতে অসংখ্য স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বাহির হয়।

ঢাকা ক্লাবের সদস্যগণও স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল বাহির করেন। রাজধানীতে টাউন সার্ভিস বাসও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মিছিলকারীদের চোখে-মুখে ক্ষোভানল পরিলক্ষিত হইতেছিল। বজ্রকণ্ঠে তাঁহারা সেদিন প্রকম্পিত করিয়া ভুট্টো ও শোষণ বিরোধী শ্লোগান দান করেন। এই সময় ঢাকা স্টেডিয়ামে বি. সি. সি. পি. টিম এবং ইন্টারন্যাশনাল একাদশ টিমের মধ্যে অনুষ্ঠানরত খেলা স্বতস্ফূর্তভাবে ভাঙ্গিয়া যায়।

স্টেডিয়াম হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বহির্গত ক্রীড়ামোদীগণও রণপ্রস্তুত সৈনিকের ন্যায় লাঠি-সোটাসহ মিছিলে সামিল হইয়া যান। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার মিছিলগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মুখ হইতে নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে মতিঝিলস্থ হোটেল পূর্বাণীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বেলা ৩টার দিকে হোটেল পূর্বাণীর সম্মুখভাগ লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়।

উল্লেখযোগ্য যে, বেলা সাড়ে তিনটায় হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি'র বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা ছিল। বৈঠক শুরু হইবার পূর্বেই পূর্বাণী হোটেল এলাকায় তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। এ সময় মতিঝিল এলাকার বিভিন্ন ভবনের ছাদে দাঁড়াইয়া হাজার হাজার মানুষ শেখ সাহেবের নির্দেশ লাভের আশায় প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। বৈঠক শেষে সংগ্রামের কর্মসূচী ঘোষণা না করা পর্যন্ত জনতা পূর্বাণী হোটেল এলাকায় দাঁড়াইয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে পল্টন ময়দান এক স্বতঃস্ফূর্ত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এ সময় রাজধানীর বিভিন্ন মহল্লা এবং শহরতলী এলাকা হইতে একের পর এক মিছিল পল্টনের দিকে আসিতে থাকে। পল্টনের স্বতঃস্ফূর্ত জনসমুদ্রের উদ্দেশে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী,

সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আ. শ. ম. আবদুর রব, সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন, আটষট্টি-উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের নায়ক জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব তোফায়েল আহমদ, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আবদুল মান্নান প্রমুখ ভাষণ দান করেন।

এই বিশাল জনসমুদ্র জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। বিশাল জনসমুদ্র জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য বজ্রশপথ গ্রহণ করেন।

... ... ইহার পূর্বে ঢাকা বারের আইনজীবিগণ মিছিল করিয়া বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমবেত হন। তাঁহারা বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে শাহ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠান করেন। ...”

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২রা মার্চ, ১৯৭১]

সংবাদে বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিবৃতি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার জাগ্রত শ্রমিক-মজুর-ছাত্র-জনতা দলে দলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ লাভের জন্য হোটেল পূর্বাণীর দিকে অগ্রসর হয়। বঙ্গবন্ধু তখন তাঁর দলের নির্বাচিত সদস্যদের সাথে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বা তাঁর দলীয় কেউ জানতেন না যে, ইয়াহিয়া তাঁর ভাষণে পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করেছেন। খবরটি জানবার সাথে সাথে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পূর্বাণী হোটেলের সামনে তখন জনসমুদ্র।

বঙ্গবন্ধু তাঁর পার্টির কাজ সংক্ষিপ্তভাবে শেষ ক'রে হোটেল পূর্বাণীতে আকস্মিকভাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান ক'রে ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার কঠোর প্রতিবাদ জানান। সেদিন বিকেল সাড়ে চারটায় আহূত এই সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবের ভাষণ তুলে ধরতে গিয়ে ইত্তেফাক লিখেছেনঃ

বঙ্গবন্ধুর সাংবাদিক সম্মেলন

“আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেনঃ শুধু সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সেন্টিমেন্টের জন্য পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছে এবং আমরা উহা নীরবে সহ্য করিতে পারি না। ইহার দ্বারা

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে। পরিষদ অধিবেশনের জন্য বাংলাদেশের সকল সদস্যই ঢাকায় ছিলেন। জনাব ভুট্টো এবং জনাব কাইয়ুম খানের দল ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানী সকল সদস্যই অধিবেশনে যোগ দিতে রাজী ছিলেন।

গতকাল (সোমবার) বিকালে পূর্বাণী হোটেলে আওয়ামী লীগ পার্টির সংক্ষিপ্ত সভাশেষে আকস্মিকভাবে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান আজ (মঙ্গলবার) ঢাকায় এবং আগামীকাল (বুধবার) ৩রা মার্চ সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালনের আহ্বান জানান।

সর্বাত্মক হরতাল পালনের পরবর্তী কর্মসূচী হিসাবে আগামী ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। শেখ মুজিব বলেন, এই জনসভায় তিনি পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করিবেন।

হিংসাত্মক পথে নয়

জনগণকে যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব হিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ হইতে বিরত থাকিতে পরামর্শ দেন। শেখ মুজিব বলেন ঃ আমরা গণতান্ত্রিক দল এবং গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী এবং আমরা শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালাইয়া যাইব।

আমার সহিত আলোচনা হয় নাই

জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার পূর্বে তাঁহার সঙ্গে কোন আলোচনা করা হইয়াছে কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন ঃ আমার সহিত আলোচনা হয় নাই।

ওদেরকেও চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে বলি

পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা চাইবেন কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, তিনি পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের জনগণকেও চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে আহ্বান জানাইবেন। তাঁহারা রুখিয়া দাঁড়াইবেন কি-না, তাহা তাঁহাদের উপরই নির্ভর করে।

অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করিব

অপরাপর রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করিবেন কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, পরিষদ অধিবেশন স্থগিত

রাখার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি মওলানা ভাসানী, জনাব নূরুল আমীন, জনাব আতাউর রহমান খান ও অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।

নিজ দলের সদস্যদেরকে গ্রেফতার করার আশঙ্কা করেন কিনা এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন : আমরা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে প্রস্তুত। জনগণ আমার সঙ্গে আছেন। আমরা ভালই আশা করি এবং চরম অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছি।

নূতন দিনের নূতন শপথ

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি ৭ই মার্চ পর্যন্ত কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমার দল আমাকে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়াছে। তিনি বলেন যে, পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যগণ গতকাল ৩রা জানুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন উহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন : ৩রা জানুয়ারী আওয়ামী লীগ সদস্যগণ ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার শপথ নিয়াছিলেন?

জবাবে শেখ মুজিব বলেন : আজ সদস্যগণ পাকিস্তানের জনগণের মুক্তির শপথ নিয়াছেন।

ওঁরা এ দেশেরই সন্তান

বাংলাদেশে বসবাসরত অবাঙালীদের কি হইবে এই মর্মে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন : তাঁহারা এই মাটিরই সন্তান। তাঁহাদিগকে এখানকার জনগণের সাথে মিশিয়া যাইতে হইবে।

শেখ মুজিব বলেন : আমরা গণতান্ত্রিক দল। আমরা গণতান্ত্রিক অহিংস-অসহযোগ নীতি অনুসরণ করিব। আমরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছি এবং শাসনতন্ত্র তৈরী করার জন্য আমরা তাদের নিকট দায়ী রহিয়াছি।

জনাব ভুট্টোর বিবৃতির উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, জনাব ভুট্টো আইন ও শৃঙ্খলা নিজের হাতে গ্রহণের হুমকি দিয়াছেন। শেখ মুজিব বলেন : আমরা সকলের সহযোগিতা চাহিয়াছিলাম। আমরা ৬-দফা ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলাম। গণতন্ত্রের বিধান হইতেছে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ কারতে হইবে এবং আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ভুট্টো একই নিয়মে

ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, যখন গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হইয়াছিল, জনাব ভুট্টো উহাতে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি নির্বাচন পিছাইবার দাবী তুলিয়াছিলেন এবং এক্ষণে পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবী তুলিয়াছেন।

এ কথার জবাব কি?

শেখ মুজিব বলেন ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা হিসাবে আমি ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহবান করিতে বলিয়াছিলাম। সংখ্যালঘিষ্ঠের নেতা জনাব ভুট্টো মার্চের প্রথম সপ্তাহে আহবান করিতে বলিয়াছিলেন। আমি উহার বিরোধিতা করিয়াছিলাম। আবার জনাব ভুট্টো অধিবেশন স্থগিত রাখিতে প্রস্তাব করেন এবং আমি উহার বিরোধিতা করি।

শেখ মুজিব প্রশ্ন করেন ঃ ইহা কি সত্য নয় যে, গণতান্ত্রিক রীতি ভঙ্গ করা হইয়াছে? এই সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২রা মার্চ, ১৯৭১]

বঙ্গবন্ধু উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনের ঘোষণা অনুযায়ী ঐ দিন রাতেই আতাউর রহমান খান ও মোজাফ্ফর আহমদের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনায় মিলিত হন। পরদিন ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়। প্রদেশের সংবাদপত্রগুলো বিক্ষুব্ধ বাংলার সচিত্র সংবাদ ফলাও ক'রে প্রকাশ করেন।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা

অন্যদিকে সাহেবজাদা ইয়াকুব সামরিক প্রশাসকের দায়িত্ব নেয়ার সাথে সাথে প্রথমে ভীতি প্রদর্শন ক'রে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেন। এই মর্মে তিনি এক সামরিক আদেশ জারী করেন—তাতে বলা হয় ঃ "পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ছবি, খবর ও অভিমত, বিবৃতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে সংবাদপত্রসমূহকে বারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ লঙ্ঘন করা হ'লে ২৫ নম্বর সামরিক শাসন বিধি প্রযোজ্য হবে। এর সর্বোচ্চ শাস্তি দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।" [দৈনিক পাকিস্তান, ২রা মার্চ, ১৯৭১]

কিন্তু তা' সত্ত্বেও প্রদেশের দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পত্রিকা জনগণের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সোচ্চারে সংবাদ পরিবেশন করেছেন। ২রা মার্চ হরতালের বিবরণ দিয়ে পূর্বদেশ লিখেছেন: "বিক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলা। পথে পথে মিছিলের প্রতিরোধ। জনতার ঐক্যকে দুর্জয় শপথে বলবান ক'রে বেঁধেছে। সূর্য-করের শাণিত উত্তাপে জীবনের রেণুকণা দিয়ে সারাটা তল্লাট ছেয়ে দিয়েছে। আগুনের হল্কায় ওরা মানবিকতার পতাকা উড়িয়েছে। স্ফুলিঙ্গকে আলিঙ্গন ক'রে সংগ্রামের যে মশাল দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, তারই প্রতিচ্ছবি বিম্বিত হয়েছে জনতার অগুণতি মিছিলে, মিছিলের বলিষ্ঠ মুখে মুখে, শপথদৃপ্ত মানুষের অগ্নিগর্ভ চোখে।

২রা মার্চের হরতাল

মিছিলের গর্জনে মুখরিত উত্তপ্ত মহানগরীর মহল্লায় মহল্লায় গড়েছে মানুষের ঐক্যফ্রন্ট। সোচ্চার কোটি কণ্ঠ নিঃসীমের নীলাম্বর ভেদ ক'রে যেন মানব প্রাণকে জাগিয়ে দিয়েছে প্রতিরোধের দুর্বার প্রবল প্রাণ-বন্যায়।

তাইতো মিছিলের রক্তিম মুখমণ্ডলে জীবনের প্রতিষ্ঠার শত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। ওরা ফেটে পড়েছে বিপুল গর্জনে বায়তুল মোকাররমের চত্বরে, পল্টনের বিশাল অঙ্গনে। আন্দোলনের দুর্জ্ঞেয় প্রাকার গড়ে ওরা গর্জে উঠেছে জনতার দারুণ রুদ্র রোষকে দমনের বিরুদ্ধে।

গতকাল শহরে হরতাল ছিল। কারখানার চিমনিতে ধোঁয়া ওঠেনি, ঘোরেনি রেলের চাকা, বিমান ডানা মেলেনি শূন্যে। কর্মবহুল এই রাজধানী নীরব ছিল, রাস্তা ছিল—যানবাহন ছিল না একেবারে। অথচ মানুষগুলো সরব আর ওদের মিলিত পদভারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল নির্বাক, অসাড় ঐ কালো পীচঢালা রাজপথ। তাইতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বটতলায় মানুষের ঢল নেমেছিল। বলিষ্ঠ বাহু তুলে ওরা শপথ নিয়েছে গতকাল—বাংলার স্বাধিকার, ওদের দাবী অস্থিমজ্জায়।

বাংলার মুখ আমি দেখেছি, রাত্রির কুটিল অন্ধকারকে ভেদ ক'রে আকাশটাকে চমকে দিয়ে ত্রাসিত মাটির বুক কাঁপিয়ে অন্ধকার ঘেরা শহরে মানুষ আর মানুষ রাজধানীর রাজপথ উচ্চকিত ক'রে তুললো গগনবিদারী স্লোগানে।

রাস্তায়, গলিতে মানুষের যেন ঢল নেমেছিল। অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যে কোন মূল্যে চালিয়ে যাওয়ার, সংগ্রামকে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে এগিয়ে নিয়ে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য যে কোন মূল্য প্রদান করতে ইস্পাত-দৃঢ়তা নিয়ে জনতা বিক্ষুব্ধ উর্মিমালার মত জন-তটে যেন আছড়ে পড়ছিল। জঙ্গী জনতার বিরামহীন ছোট বড় শোভাযাত্রা বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো মধ্য ফাগুনের খরতাপ উপেক্ষা ক'রে অন্যদেরও শপথের অগ্নিতে উজ্জীবিত ক'রে তোলে।

শুধু ঢাকায় গতকাল সর্বাত্মক হরতালের ডাক দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু ডাক ছাড়াই প্রদেশের বেশ কয়েকটি শহরে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সর্বত্রই জীবনযাত্রাকে অচল ক'রে দিয়ে অধিকার-সচেতন মানুষ বিক্ষোভে আর মিছিলে, শ্লোগানে আর সংরোষে প্রতিবাদ জানায়। ঢাকা শহরের শত হাজার সড়ক, গলিপথ আর রাজপথ গতকাল রবারের চাকার যানবাহনের ঘর্ষণ পায় নি। কোন বিমান ঢাকা আসে নি, ঢাকা থেকে যেতে পারে নি। কোন ট্রেন ঢাকা আসে নি, ঢাকা থেকে ছাড়ে নি। কোন দোকান খোলা ছিল না, কাঁচা বাজার বসে নি, চা আর ঔষধের দোকানও বন্ধ ছিল। অফিস বসে নি, সরকারী কর্মচারীরা দফতরে যায় নি, ব্যাঙ্ক ছিল বন্ধ। বন্ধ ছিল সরকারী ও বেসরকারী সব ক্রিয়াকর্ম। বিস্তীর্ণ এলাকার কারখানার চাকা বন্ধ ছিল, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়ে নি। কিন্তু জনতার মিছিল স্তব্ধ ছিল না। স্তব্ধ ছিল না জনতার কণ্ঠ। বিদ্যুৎ থেকে যেন শক্তি সঞ্চয় ক'রে লাখো জনতা বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বানচাল করার বিরুদ্ধে ধ্বনি তোলে। ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর সৃষ্টির শপথ নেয়। জনতার একটি অংশ জিন্নাহ্ এভিন্যু, বায়তুল মোকাররম, নবাবপুর, সদরঘাট এলাকার কয়েকটি দোকানে আক্রমণ চালায়। কেউ কেউ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যায়। বায়তুল মোকাররমের একটি অস্ত্রের দোকানে আক্রমণ চালিয়েও কিছুসংখ্যক লোক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যায়।

লুণ্ঠন এবং অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজ হতে বিরত থাকার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীরা গতকাল জীপে ক'রে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ ক'রে জনগণের কাছে আবেদন জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ

মুজিবের নামে এ আবেদন জানানো হয়। বেশ কিছু এলাকার দোকান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজনকে জনতা পাকড়াও করে।

একশ্রেণীর ক্রুদ্ধ জনতা অসংখ্য ইংরেজী সাইন বোর্ড ভেঙ্গে ফেলে এবং জিন্নাহ্ এভেন্যু এলাকায় একটি গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মানুষ ঘর ছেড়ে, বাড়ী ছেড়ে, স্ত্রী আর কচি সন্তানদের মায়ার বাঁধন ছেড়ে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে রাজপথে নেমে আসে। বিক্ষোভ, বিক্ষোভ ধ্বনিতে রাজপথ, জনপথ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এমন বিক্ষোভ ঢাকার মুক রাজপথ ঊনসত্তরে দেখেছে আর একাত্তর সালে দেখলো। ঊনসত্তরের সংগ্রামের চাইতে একাত্তর সালের সংগ্রামের তাপ যেন আরও বেশী লক্ষ্যে পৌঁছার দৃঢ়তায় যেন আরও বলিষ্ঠ বলীয়ান।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ৩রা মার্চ, ১৯৭১]

শেখ মুজিবের আহ্বানে আহূত এই ধর্মঘট বানচালের জন্য সামরিক সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কারফিউ জারী ক'রে সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হয় মিছিলে যোগদানকারী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য। কিন্তু জনতা সে কারফিউ মানে নি। ফলে তাদের ওপর চালানো হ'ল নির্বিচারে গুলী। সেদিন ঢাকায় গুলীতে দু'জন নিহত ও প্রচুর আহত হয়।

ঐদিন বিকেলে শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে ঢাকায় নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলী বর্ষণের কঠোর নিন্দা ক'রে শক্তির দ্বারা জনগণের মোকাবিলা করিতে ইচ্ছুক 'মহলকে' হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে বলেন, "বাংলাদেশে আগুন জ্বালাইবেন না। যদি জ্বালান, সে দাবানল হইতে আপনারাও রেহাই পাইবেন না।" [দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা মার্চ, ১৯৭১]

বিবৃতিতে শেখ মুজিব সুশৃঙ্খলভাবে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য জনগণের প্রতি নির্দেশ দান করেন। তাঁর নির্দেশ-সমূহ তুলে ধরে পরদিন ইত্তেফাক 'আমি শেখ মুজিব বলছি' শিরোনামায় লিখেছেন : "আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল মঙ্গল-বার এক বিবৃতিতে জনগণের উদ্দেশে বলেন, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন এবং যাতে লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের মত অপ্রীতি-কর ঘটনা না ঘটে তৎপ্রতি কড়া নজর রাখার জন্য আমি জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।

জনগণকে বিশেষ করিয়া ভাড়াটিয়া উস্কানীদাতাদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকিতে হইবে। জনগণের উদ্দেশে তিনি আরো বলেন : মনে রাখিতে হইবে, যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক, যে ভাষাতেই কথা বলুক, বাংলার প্রতিটি বাসিন্দাই আমাদের দৃষ্টিতে বাঙালী। তাদের জান-মাল-ইজ্জত আমাদের কাছে পবিত্র আমানত এবং উহা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।

জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ

জনগণের প্রতি আমার নির্দেশ

* ৩রা মার্চ হইতে ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা হইতে দুপুর ২টা পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশে হরতাল পালন করুন। সরকারী অফিসসমূহ, সেক্রেটারীয়েট, হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট-কাছারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পি-আই-এ, রেলওয়ে ও অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম—যানবাহন, কলকারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার সহ সর্বত্র এই হরতাল পালন করিতে হইবে। শুধু এম্বুলেন্স (হাসপাতালের গাড়ী), সাংবাদিকদের গাড়ী, হাসপাতাল, ঔষধের দোকান, বিজলী ও পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে হরতালের নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না।
* আজ ৩রা মার্চ, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল। এই দিনটিকে 'জাতীয় শোক দিবস' হিসাবে পালন করিতে হইবে। এই উপলক্ষে আমি (শেখ মুজিব) পল্টন ময়দান হইতে ছাত্রলীগের জনসভার অব্যবহিত পরেই একটি গণমিছিলের নেতৃত্ব দান করিব।
* রেডিও, টেলিভিশন, বা সংবাদপত্রে আমাদের কর্মতৎপরতার বিবরণী বা আমাদের বিবৃতি প্রকাশ করিতে দেওয়া না হইলে এই সব প্রতিষ্ঠানের বাঙালী কর্মচারীদের বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টাকে নাকচ করিয়া দিতে হইবে।
* আগামী ৭ই মার্চ বিকাল ২টায় রেসকোর্স ময়দানে আমি এক গণসমাবেশে ভাষণ দান করিব। সেখানে আমি পরবর্তী নির্দেশ প্রদান করিব।
* জনগণের প্রতি আমার আহবান, সংগ্রাম সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালাইতে হইবে। উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের আন্দোলনের স্বার্থ

ক্ষুণ্ণ করিবে এবং গণবিরোধী শক্তি ও তাদের ভাড়াটিয়া চরদের স্বার্থোদ্ধার করিবে।”

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা মার্চ, ১৯৭১]

রিকুইজিশনপন্থী ন্যাপের উদ্যোগে অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের সভাপতিত্বে সেদিন পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ক'রে জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থার দাবী জানান হয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে আহূত এই জনসভায় স্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার পেছনে এক বিরাট চক্রান্ত রয়েছে এবং সে চক্রান্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতও সক্রিয় রয়েছে।

রিকুইজিশন ন্যাপের প্রতিবাদ সভা

[দৈনিক পাকিস্তান, ৩রা মার্চ, ১৯৭১]

একই দিনে বায়তুল মোকাররমের সামনে জাতীয় লীগের উদ্যোগেও এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। “সভায় সুসংহত গণ-আন্দোলন শুরু করার জন্য আওয়ামী লীগ, ভাসানী ন্যাপ, ওয়ালী ন্যাপ ও ন্যাশনাল লীগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে কর্মপন্থা গ্রহণের আহ্বান জানান হয়।”

জাতীয় লীগের প্রতিবাদ সভা

ঐদিন ঢাকার ছাত্র-সমাজ একটি দুঃসাহসিক কাজ করে—যা ইতিহাসের পাতায় ভৌগোলিক সীমারেখার পটভূমিকা বদলিয়ে দিয়েছে। সেদিন সংগ্রামী ছাত্র-সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার দুর্জয় শপথ গ্রহণ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয়। পূর্ব বাংলার মানচিত্র খচিত এই পতাকাই বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় পতাকা হিসেবে উড্ডীন হয়েছিল। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু জল্লাদের বধ্যভূমি হতে মুক্তি পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হবার পর সে মানচিত্র পরিহার করা হয়। সেদিন ছাত্র-সমাজ যে দুঃসাহসিক কার্য-কলাপের পরিচয় দিয়েছিল তার বিবরণ দিতে গিয়ে দৈনিক পাকিস্তান লিখেছেনঃ “গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকার ছাত্র-সমাজ কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন

কলাভবনের সামনে স্মরণকালের বৃহত্তম ছাত্রসভায় বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। .... এই সভা বটতলায় হবার কথা থাকলেও বিপুল জনসমাগম হওয়াতে সভামঞ্চ কলাভবনের শেডে নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল থেকেই লাঠি-রড সজ্জিত ছোট বড় মিছিল বটতলায় এসে জড়ো হতে থাকে। বেলা দশটার পরই বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এলাকা ছাত্র-ছাত্রীর দৃপ্ত পদধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। সভাস্থলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এই সময় শেডের ওপর মঞ্চ থেকে মাইকে অবিরামভাবে শ্লোগান হতে থাকে। ১০-৪৫ মিনিটের সময় 'ডাকসু'র সহ-সভাপতি আ. শ. ম. আবদুর রব মঞ্চে এসে হাতে মাইক নিয়ে সভার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। শ্লোগানে রত উত্তেজিত ছাত্রেরা তখন আবদুর রবের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে শৃঙ্খলার সাথে শ্লোগান দেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী সভা শুরু করার সাথে সাথেই সমবেত ছাত্রদের হাত তুলে শপথ পাঠ করান। সমবেত ছাত্ররা শপথ নেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ ক'রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন। তাঁরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমেরও শপথ গ্রহণ করেন।

জনাব শাজাহান সিরাজ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বাইশ বছর ধরে আমরা আন্দোলন করেছি। দেশে যথারীতি নির্বাচনও হয়েছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনও হতে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন আন্দোলনের ধারা পাল্টাতে হবে। তিনি কিছুদিন আগে রেসকোর্সে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পুনরাবৃত্তি ক'রে বলেন, আমাদের সকলকে এক একজন সৈনিক হতে হবে। সভায় সবুজ জমিনের ওপর লাল বৃত্তের মাঝে পূর্ব বাংলার মানচিত্র আঁকা একটি পতাকা উত্তোলন করা হয়।

'ডাকসু'র সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় শাহজাহান সিরাজের বক্তব্যকেই দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানান। তিনি স্বাধিকার আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাবারও আবেদন জানান।

১২-২৫ মিনিটের সময় প্রাক্তন ছাত্রনেতা জাতীয় পরিষদ সদস্য তোফায়েল আহমদ মঞ্চে আসেন এবং শ্লোগানমুখর ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার

সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। আর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের নির্দেশ পালন করার শপথ নেয়া হয়। সভাশেষে লাঠি, রড ও বাঁশসহ এক বিরাট জঙ্গী মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়। ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দসহ প্রাক্তন 'ডাকসু' সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ এই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন। শোভাযাত্রাটি বায়তুল মোকাররমের দিকে এসে শেষ হয়।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৩রা মার্চ, ১৯৭১]

পরদিন ৩রা মার্চ। ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনার সূচনার দিন আজ। এই দিন বঙ্গবন্ধু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

ভারত উপমহাদেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম দান করেন মহাত্মা গান্ধী। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর গান্ধীজী দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন এবং যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন তিনি আফ্রিকার অধিকার-বিহীন ভারতীয়দের জন্য শুরু করেছিলেন, ভারতে তিনি তাঁর সূত্রপাত করেন। প্রথমে বিহারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চম্পারণের নীল চাষীদের সংগ্রামে, ১৯১৭ সালে[1] দ্বিতীয়বার গুজরাটে, নিঃস্ব চাষীদের রাজস্ব বন্ধের আন্দোলনে[2]। দু'বারই ব্রিটিশ সরকারকে এই আন্দোলনের সামনে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। অতঃপর কংগ্রেস আন্দোলনে সত্যাগ্রহ আন্দোলন একটি পন্থা হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই পন্থা বহু ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করেছিল। কিন্তু সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার গ্লানিও এই পন্থার ললাটে কম লিখিত হয় নি। কারণ সর্বক্ষেত্রে এই আন্দোলনকে অহিংসার চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হয় নি। 'মন্টেগু সংস্কার' এবং 'রাওলাত আইনে'র বিরুদ্ধে এই পন্থা প্রয়োগ করতে গিয়ে জনগণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এবং হিংস্রতার পথ অনুসরণ করে। ফলে বহুলোক হতাহত হয়। গান্ধীজী বহুবার হিংস্রতার বাড়াবাড়ি দেখে নিজে থেকেই বাধ্য হয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পরিহার করেছেন। সে সব বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনঃ শেখ মুজিব ও মহাত্মা গান্ধী

[1] ধরণী গোস্বামী, ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, পৃঃ ৪

[2] Ahmed Muktar, *Tradeunionism and Labour Dispute in India*, P.10-16.

কিন্তু গান্ধীজীর জীবনে যা বহুলাংশে সম্ভব হয় নি, শেখ মুজিব বাংলাদেশের মাটিতে তা' সম্ভব ক'রে তুলেছিলেন। ৩রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যে সাফল্য অর্জন করে, সত্যাগ্রহের ইতিহাসে তা' একান্তভাবেই দুর্লভ। ন্যাপ নেতা খান ওয়ালী খান এই আন্দোলনের সাফল্য দেখে বিস্ময়ে মন্তব্য করেছিলেন : Ever Gandhi would have marvelled. এ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস বলেছেন :

"On 3 March Mujibur Rahman called a provincewide strike and launched a non-violent non-co-operation movement....... Everywhere the people responded to Sheikh Mujib's appeal and the movement became more orderly and effective ;....Restoration of order in Dacca was assisted by the withdrawal of troops after it was found they could not enforce the curfew. The troops also began to feel the pinch of hunger as supplies, including foodstuffs, were denied on the orders of the Awami League."

[এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস, দি রেপ অব বাংলাদেশ, পৃঃ ৯০]

ম্যাসকারেনহাস অন্যত্র বলেছেন : "অসহযোগ আন্দোলন বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের মনোভাবও কঠোর হতে লাগলো এবং উপর্যুপরি কয়েকবার হরতালের ফলে প্রদেশের কর্ম-প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। ৩রা মার্চ মুজিবুর রহমান অবিরাম হরতাল পালনের নির্দেশ দেন—প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে অপরাহ্ণ ২টা পর্যন্ত সবকিছু বন্ধ থাকবে। তদনুযায়ী এই কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রদেশের সবকিছুর কাজকর্ম বন্ধ রইল। সরকারী অফিসগুলো বন্ধ হয়ে গেল, ব্যাঙ্কগুলোর দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হ'ল; এমনকি ডাক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বিমান ও রেল চলাচল ব্যবস্থা পর্যন্ত অচল হয়ে গেল। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোহর ও অন্যান্য স্থানের সেনানিবাসগুলো খাদ্যদ্রব্য হিসাবে যে স্বল্প পরিমাণ রেশন পেত, অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাঙালীরা তা-ও সরবরাহ করতে অস্বীকার করল।"

বঙ্গবন্ধুর এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে শুধু পূর্ব বাংলার কাগজগুলো নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকাতেও বিস্ময় প্রকাশ করা হ'ল।

[দ্রষ্টব্য ঃ দি ডন (করাচী), ৪, ৫, ৬, ৭, এবং ৮ই মার্চ, ১৯৭১; দি মর্নিং নিউজ (করাচী), ৭ই মার্চ, ১৯৭১]

এই সাফল্য সম্পর্কে একজন পণ্ডিত আইনজীবী বলেছেন ঃ

"The response of the entire people in East Bengal to the call of their leader was spontaneous, complete and overwhelming. Since in contemporary international law the effectiveness of an authority is to be measured by the popular support it commands, the authority of Mujib and his Awami League in East Bengal was conclusively proved by the success of the movement between 1 and 25 of March."

সুতরাং এই অচিন্তনীয় সাফল্যই প্রমাণ করে যে, শেখ মুজিব শুধু নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছিলেন তা' নয়—পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁর নির্দেশেই পথ চলতে উদগ্রীব, ইয়াহিয়া বা অন্য কোন কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যক্তির আদেশে নয়। দেশের সাধারণ পথচারী ও পিওন থেকে শুরু ক'রে হাইকোর্টের বিচারপতি সবাই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশকেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশ বলে মেনে নিয়েছিলেন। পূর্বের ঘটনা পরম্পরায় যেমন, এই ঘটনায়ও তেমনি প্রমাণিত হ'ল যে, দেশ শাসনের অধিকার ইয়াহিয়া খানের নেই, অপর কারো নেই, একমাত্র যাঁর আছে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

এই প্রসঙ্গে আবার ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চৌধুরীর একটি মূল্যবান উক্তি স্মরণ করি ঃ

"By admitting the tolal success of the non-co-operation movement, Yahya had admitted the forfeiture of his lawful authority to administer the country. It was the writ of Mujib alone which ran throughout East Bengal during the three weeks of peaceful non-co-operation movement. There was no one to carry out the

orders of the military janta. If Mujib could run a parallel Government in East Bengal, it was only because he had the unstinted lawalty of seventyfive million people. If Yahya's authority was ignored during the three weeks of March, 1971, it only proved the truth of the immortal Lincoln concept that bullets can never successfully replace ballots. The minimum right of the people in East Bengal to launch a peaceful non-co-operation movement for achieving self-determination can never be in dispute. This is an acknowledged right of the people."

[সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২ ৭৩]

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তবে কি মুজিব শুধু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্জনে আস্থাবান ছিলেন? সহজ উত্তর, —না, তা' নয়। মুজিব অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে একান্ত বিশ্বাসী। গান্ধীবাদে নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু শান্তি যে শুধু অহিংস ও অসহযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রয়োজন আছে—তবে শান্তির জন্য প্রয়োজন হ'লে অস্ত্রের আশ্রয় নিতে হবে। হিংস্রতাকে অস্ত্র দিয়েও দমন করতে হয়। যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়, তখন হিংস্রতাকে বৃহত্তর হিংস্রতা দিয়েই ধ্বংস করতে হয়। এ কারণেই ৩রা মার্চ থেকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেও এবং অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাসে এই পদক্ষেপ উজ্জ্বলতম সাফল্য অর্জন করলেও মুজিব জনগণকে অন্যভাবে আহবান করতেও ভুল করলেন না। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করলেন যে, যদি এই অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয় তবে জনগণ যেন যার যা আছে তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করে—তখন যেন তারা সশস্ত্র সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ক'রে দেশকে স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রে পরিণত করে। সুতরাং মুজিব শান্তিকামী, আবার মুজিব সংগ্রামী। সমুদ্রের মতই কখনো তিনি স্থির এবং শান্ত, আবার কখনো তিনি উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ। শান্তি ও প্রগতির জন্যই তাঁর সকল পথযাত্রা, সকল প্রয়াস—কখনো অহিংসার বাণীকে আবার কখনো শাণিত তরবারিকে তিনি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আসলে অস্ত্রেরই এই দুই রূপ।

বাঙালীর জাতীয় জীবনে একাত্তরের মার্চ মাসটি নানা কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। চব্বিশ বছরের একটি নাটক, চব্বিশ বছরেরই বা বলি কেন, প্রায় দু'শো চব্বিশ বছরের একটি মহানাটক যেন চূড়ান্ত পরিণতির জন্য এই মাসটিতে এসে অস্বাভাবিক দ্রুতগতি ও দুর্বারতা লাভ করেছে। মহানাটকের কাহিনী যেন একটি প্রান্তসীমার পথে এসে জটিলতায় ও সচলতায়, দ্বান্দ্বিক ঋজুতায় ও খর প্রবাহতায় অলঙ্ঘনীয় পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। গঙ্গা যেন বহু পথ পরিক্রমা শেষ ক'রে এসে সমুদ্র মোহনায় মিলিত হয়েছে। মার্চ মাসটি এই মোহনার পূর্ব-পথ নির্মাণ করেছে। এবার সামনে শুধুই সমুদ্র—আর কোন পথ নেই। সমুদ্র স্বাধীনতা, স্বাধীনতা সমুদ্র। সেই মার্চ মাসের বর্ণনায় আমরা এখন সমুপস্থিত। আমরা ৩রা মার্চের কথা বলছিলাম।

শেখ মুজিবের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এই দিন সারা প্রদেশব্যাপী পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। ঢাকায় পালিত হরতালের বর্ণনা দিয়ে সংবাদপত্রে বলা হয়ঃ "সকাল থেকেই আন্দোলনের ধারা এবং জঙ্গী জনতার মনোভাব দেখে মনে হতে থাকে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন। গত মঙ্গবার রাতে সান্ধ্য-আইন ভঙ্গ ক'রে মিছিল করার পর শহরের যে রূপ দেখা যায়, গতকাল সকাল থেকেই সর্বত্র তার প্রভাব প্রতিফলিত হতে থাকে। জনতা আগের রাতের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন এলাকায় নতুন ক'রে শক্তিশালী ব্যারিকেড সৃষ্টি করার কাজে নিয়োজিত হয়। গত রাতে যেসব ব্যারিকেড পরিষ্কার ক'রে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়, সেগুলি নতুন ক'রে এবং যথাসম্ভব দুর্ভেদ্য ক'রে নির্মাণের চেষ্টা চলতে থাকে। রামপুরায় গতকাল অপরাহ্ণে এই ধরনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে গুলী বর্ষণের ফলে ফারুক ইকবাল নামে ১৮ বছরের একজন জঙ্গী ছাত্রনেতা নিহত এবং ৬ জন আহত হয়।

ঢাকায় হরতাল

মঙ্গলবার রাতের সান্ধ্য আইন ভঙ্গের সময় যাঁরা শহীদ হন তাঁদের লাশ নিয়ে গতকাল কয়েকটি খণ্ড মিছিল বের করা হয়। ঐ রাতে গুলীতে নিহত ৫ জনের লাশ নিয়ে ইকবাল হল থেকে শোকযাত্রা সহকারে বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ ক'রে ইকবাল হলে রাখা হয়। পরে মেডিকেল কলেজ

হাসপাতাল থেকে আরও তিনটি লাশ নিয়ে মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। সেখানে শহীদদের প্রতি শিক্ষক ছাত্রগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে লাশ তিনটি সেখান থেকে ইকবাল হলে নিয়ে যাওয়া হয়।

গতকাল সকাল সাড়ে দশটার দিকে নওয়াবপুরে গুলী বর্ষিত হয়। এখান থেকে একজনকে গুরুতররূপে আহত অবস্থায় সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১]

ঢাকার মত প্রদেশের অন্যান্য স্থানেও এই দিন পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। কয়েকটি জেলায় মিছিলকারী জনতার ওপর সেনাবাহিনী গুলী বর্ষণ করে। প্রথম দিনের হরতালে একমাত্র চট্টগ্রামেই ৭৫ জন শহীদ হয়েছেন বলে পরদিন সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়। আন্দোলন বানচালকারীদের উস্কানিতে চট্টগ্রামে সে দিন বাঙালী অবাঙালীর মধ্যে এক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়।

চট্টগ্রামে দাঙ্গা

এই হাঙ্গামার বিবরণ দিয়ে সংবাদে বলা হয়ঃ "ফিরোজ শাহ কলোনী, আমবাগান, পাহাড়তলি, জুট ফ্যাক্টরী এবং সন্নিহিত অন্যান্য এলাকায় আজ সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ড, হামলা, প্রতি-হামলা, প্রাইভেট বন্দুকের গুলী বর্ষণ, সংঘর্ষ এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা-বাহিনীর গুলী বর্ষণ ইত্যাদি ঘটনায় অন্যূন অর্ধ-শতাধিক ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছেন এবং কয়েক-শত লোক আহত হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় আড়াই শতাধিক হতাহতকে আনয়ন করা হয়। তন্মধ্যে নিহতের সংখ্যা ৪৭ বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ জনৈক প্রশাসনিক কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে একটি ট্রাকে করিয়া ২০টি মৃতদেহ আনয়ন করা হইলে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ মৃতদেহগুলি ট্রাকে সরাসরি মর্গে পাঠাইয়া দেন।

নিহত আঘাত প্রায়ই বুলেট ও বন্দুকের গুলীজনিত বলিয়া জানা যায়। অধিকাংশ মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ সনাক্ত করা না গেলেও উহাদের মধ্যে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক, পথচারী, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক এবং পলি-টেক্‌নিক ইন্সটিটিউট সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন ছাত্র রহিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১]

ঐ দিন ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও সিলেটে কারফিউ জারী করা হয়। রাজশাহীতে বেলা দু'টোর পর কারফিউ জারী ক'রে আন্দোলন রোধের চেষ্টা করা হয়।

এদিকে ৩রা মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে চরম উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। সংবাদে বলা হয়ঃ "গতকাল বুধবার ভোর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে চরম উত্তেজনা ও বিক্ষোভ বিরাজ করতে থাকে। গত পরশু রাত্রে রাইফেলের গুলীতে নিহত অনেক অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ বিভিন্ন আবাসিক হলে নিয়ে আসা হ'লে গত পরশু রাত থেকেই এই উত্তেজনা শুরু হয়। প্রায়ই ঘন্টাখানেক পর পর আবাসিক হলের করিডোরে দলবেঁধে ছাত্ররা সংগ্রামী শ্লোগান দিতে থাকে। ছাত্ররা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনির্ধারিত সভা ক'রে গণহত্যার প্রতিবাদ জানায়। সকাল ৯টার দিকে পাঁচটি লাশ নিয়ে ছাত্র-জনতার এক বিরাট শোক মিছিল নীলক্ষেত এলাকায় এক মর্মবিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

শহীদদের লাশগুলো গতকাল দুপুর পর্যন্ত ইকবাল হল মিলনায়তনে রাখা হয়। দুপুর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, জনসাধারণ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা শ্রদ্ধাবনতভাবে লাইন ক'রে শহীদদের দেখতে ভীড় করে। অনেককে লাশের কাছে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায়। ইকবাল হলে এই সময় সর্বক্ষণ এক থমথমে পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে।

বেলা সাড়ে এগারটার দিকে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মিছিল শহীদ মিনারের কাছাকাছি আসে তখন কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী মেডিকেল হাসপাতাল থেকে তিনজন যুবকের লাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে নিয়ে আসে। ... ... বেলা বারোটা পর্যন্ত এই তিনজনের লাশ বটতলায় রাখা হয়। এই সময় রোকেয়া হল থেকে একদল ছাত্রী খালি পায়ে বটতলায় আসেন। সমবেত ছাত্র-ছাত্রীরা শহীদদের ঘিরে শ্লোগান দিতে থাকে। এই শ্লোগান-গুলো তখন কান্নাভেজা বিলাপের মত ধ্বনি তোলে এবং বটতলার সকলকে অশ্রুসজল ক'রে তুলেছিল। এই পরিবেশে সাড়ে এগারটার সময় একজন ছাত্র বটতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। পরে লাশগুলোকে ইকবাল হলে নিয়ে রাখা হয়। পরে পল্টন ময়দানে ৯টি লাশ নিয়ে যাওয়া হয়।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১]

আর ঠিক এই দিনই ছাত্রলীগ ও জাতীয় শ্রমিক লীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পল্টন ময়দানে এক জনসমাবেশে শেখ মুজিব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত জনতা—'চল চল পল্টনে চল' শ্লোগান দিতে দিতে পল্টনের দিকে এগিয়ে যায়। এক বিরাট জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের শীর্ষে দাঁড়িয়ে বজ্রনির্ঘোষে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন, সে সংবাদ পরিবেশন ক'রে ইত্তেফাক লিখেছেন: "জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে ঘোষিত কর্মসূচী পালনের দ্বিতীয় দিবসে গতকল্য (বুধবার) ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানের উত্তাল-উদ্দাম, বিশাল জন-সমুদ্রের উদ্দেশে ভাষণদান কালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বিগত দিনের ঘটনাবলীর পট-ভূমিতে বিচার করিয়া তুমুল করতালির মধ্যে সামরিক সরকারকে অবিলম্বে গণ-প্রতিনিধিদের হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া ব্যারাকে ফিরিয়া যাওয়ার আহ্বান জানাইয়া জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন: 'বাংলার গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া ব্যারাকে ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সরকারের সহিত স্বাধিকার-কামী বাংলার মানুষ আর সহযোগিতা করিবে না, কোনও কর-খাজনাও দিবে না।'

পল্টনে শেখ মুজিবের ঘোষণা: অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন

ছাত্রলীগ ও জাতীয় শ্রমিক লীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মহতী সমাবেশে আগ্রহ-ব্যাকুল অযুত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সাক্ষী রাখিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান সর্বাত্মক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়া সরকারী, বে-সরকারী চাকুরিজীবীদের প্রতি নির্দেশ দেন: 'পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপনারা অফিস-আদালতে যাওয়া বন্ধ রাখুন।'

বেতার, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকার প্রতি নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন: 'যদি আমাদের বক্তব্য, বিবৃতি, আমাদের আন্দোলনের খবরাখবর প্রকাশ-প্রচারের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, সে নির্দেশ আপনারা লঙ্ঘন করুন।'

ভুট্টো গং-এর উদ্দেশে তিনি বলেন: 'গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত এক শাসনতন্ত্র যদি চান, আপনাদের শাসনতন্ত্র আপনারা রচনা করুন। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করিব।'

গণ-অধিকার আন্দোলনের সূতিকাগার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জীবনের সর্বস্তরের মানুষের এই মহতী সমাবেশে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করিয়া এবারকার আন্দোলনের সূচনাপর্বে স্বাধিকারকামী 'যে বীর বন্ধুরা আত্মাহুতি দিলেন' তাহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে সাত কোটি বাঙালীর বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরকে নিজের কণ্ঠে তুলিয়া লইয়া জলদগম্ভীর স্বরে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন : 'বাংলার মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয় রাষ্ট্র চালানোর জন্য—গুলী খাওয়ার জন্য নয়। তাই গরীব বাঙালীর পয়সায় কেনা বুলেটের দ্বারা কাপুরুষের মত গণহত্যার পরিবর্তে অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নিন, বাংলার শাসনভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলিয়া দিন।'

পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী শেখ সাহেবের এই সভাশেষে পল্টন ময়দান হইতে একটি গণ-মিছিলের নেতৃত্ব করার কথা ছিল। কিন্তু পরে এই কর্মসূচী পরিবর্তন করিয়া তিনি সমাবেশে ভাষণদান করেন এবং জনগণের আশুকর্তব্য নির্দেশ করেন। মুহুর্মুহু 'জয় বাংলা' শ্লোগানে মুখরিত পল্টনের সেই বিশাল জনসমুদ্র আর বসন্তের বৈকালিক সূর্যকে সাক্ষী রাখিয়া শেখ মুজিব দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন : 'প্রস্তুত, আমরা প্রস্তুত। দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যে কোন পরিণতি মাথা পাতিয়া বরণের জন্য আমরা প্রস্তুত। তেইশ বছর ধরিয়া রক্ত দিয়া আসিয়াছি, প্রয়োজনবোধে বুকের রক্তে গঙ্গা বহাইয়া দিব। তবু সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও বাংলার বীর শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করিব না।'

নিন্দার ভাষা জানা নাই

বক্তৃতার শুরুতেই শেখ মুজিব বলেন : দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে আজ আমি এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। তিনি বলেন, গতরাত্রে—গত দুই দিনে 'বহু লোক' হত্যা করা হইয়াছে। আমি নিজে মেশিনগানের গুলীর আওয়াজ শুনিয়াছি। এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নাই। তিনি বলেন, গরীব মানুষের পয়সায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর ভরণ-পোষণ চলে। তাদের দায়িত্ব দেশরক্ষা—সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি বলেন, নিরস্ত্র জনতাকে গুলী করিয়া হত্যা করা

কাপুরুষতারই সামিল। তিনি অবিলম্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া লইয়া গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দেয়ার দাবী জানান।

আমরা দায়ী নহি

দেশের বর্তমান সঙ্কট পরিস্থিতির পটভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন ঃ 'এ জন্য আমরা দায়ী নই—এ জন্য দায়ী গণ-প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর বানচাল প্রয়াসী ষড়যন্ত্রকারী দল। তিনি বলেন, মেজরিটি জনগণ আমার পেছনে। কিন্তু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করা হয় নাই। তিনি বলেন, ভুট্টো পরিষদের অধিবেশন স্থগিত দাবী করিয়া অচলাবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা হয় নাই—অস্ত্র ধরা হইয়াছে বাংলার নিরস্ত্র শান্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে। শেখ সাহেব বলেন, আমি আবার বলি, আগুন লইয়া খেলা করিবেন না। যদি করেন, পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবেন।

মৃত্যুর ভয় দেখাইবেন না

সংশ্লিষ্ট মহলের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া শেখ মুজিব বলেন ঃ বাংলার মানুষকে মৃত্যুর ভয় দেখাইবেন না। শত্রুর সঙ্গে, দুর্দৈবের সঙ্গে, দুর্যোগের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরিয়া, মৃত্যুকে বুক পাতিয়া বরণ করিয়াই আমরা স্বাধিকার আদায় করিব। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন পরিচালনার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, উচ্ছৃঙ্খলতা আন্দোলনকে বিপথগামী করিতে পারে।

পল্টনের জনসভায় ভাষণদান কালে শেখ মুজিব তাঁর অনুপস্থিতিতেও আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য জনগণের প্রতি নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, বাংলার ভাইয়েরা আমার—আমি বলছি, আমি থাকি আর না থাকি, বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন যেন না থামে, বাঙালীর রক্ত যেন বৃথা না যায়। আমি যদি নাও থাকি, আমার সহকর্মীরা আছেন, তাঁরাই নেতৃত্ব দেবেন। আর যদি কেউই না থাকেন, তবু আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি বাঙালীকে নেতা হইয়া নির্ভয়ে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে—যে কোন মূল্যে স্বাধিকার ছিনাইয়া আনিতে হইবে।

এই স্বাধিকার আন্দোলন বানচাল করার জন্য একশ্রেণীর লোক যে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও উচ্ছৃঙ্খল ঘটনার সৃষ্টি করছে, তার তীব্র নিন্দা ক'রে জনসাধারণকে সতর্ক ক'রে দিয়ে তিনি বলেন, "মনে রাখবেন, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হানাহানি, আত্মকোলাহল আন্দোলনের লক্ষ্যকেই বানচাল করিয়া দিবে। আর সাবধান, মুখচেনা মহলের ভাড়াটিয়া উস্কানি-দাতাদের ফাঁদে পা দিবেন না। ইহারা এই আন্দোলন বানচালের জন্য ষড়যন্ত্র চালাইতেছে। স্বাধিকার আন্দোলনের স্বার্থে এই অশুভ তৎপরতা প্রতিহত করিতেই হইবে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১]

স্বাধিকার আন্দোলনের যে-সব সংগ্রামী বীর বুলেট ও অন্যান্য আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালসমূহে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁদের জীবন রক্ষার জন্য শেখ মুজিব অকাতরে রক্তদানের আহ্বান জানান।

পরদিন প্রকাশিত সংবাদপত্রের খবর থেকে জানা যায় যে, ঢাকায় আগের রাত্রি থেকে এই দিন পর্যন্ত সেনাবাহিনীর গুলীতে কমপক্ষে ১৫ জন নিহত এবং বহু লোক হতাহত হয়। নিহত ও আহতদের অনেকেরই নাম-ঠিকানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আত্মীয়-প্রিয়জনদের লাশের খোঁজে বহু লোক সেদিন 'ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে' ভীড় জমায়। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে দৈনিক পাকিস্তান লিখেছেন ঃ

"কালকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এক দিকে লাশের সারি। অন্য দিকে কান্নার মিছিল। বাবা-ভাই-সন্তানহারা মানুষ ছুটে এসেছিলেন তাদের প্রিয়জনের খোঁজে। শতশত লোক মর্গে গিয়ে ভীড় জমানোর পর গুলীবিদ্ধ শহীদদের লাশের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। কয়েকজন ছাত্রী মর্গের মাঝেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। এরপর হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের খোঁজ করতে ছুটে আসতে শুরু করেন নারী-পুরুষেরা। যাত্রাবাড়ীর জনৈক বৃদ্ধ তাঁর পুত্রের বিকৃত লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মাত্র ১৫-১৬ বছরের ছেলেটির বুকে আর চোয়ালে গুলী লাগায় লাশ বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। সমবেত ছাত্র-ছাত্রীরা এই বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা হারিয়ে ফেলে। এরপর ছুটে

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দৃশ্য

আসেন জনৈক বৃদ্ধা। এই বিধবার ছোট্ট ছেলেটি বুলেটের গুলীতে চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। পাগলিনীর মত এই মা বিলাপ শুরু করেন তার ছেলের জন্য। এছাড়া আরও অনেক লোক খোঁজ করতে শুরু করেন তাদের খোঁজ না-পাওয়া ছেলেমেয়ে পরিজনদের। বস্তুতঃ এই পরিবেশে মেডিকেল কলেজ এক শোকপুরীতে পরিণত হয়। এরপর বহু ছাত্র-জনতা বিভিন্ন দিক থেকে মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে শুরু করে এবং নিহতদের লাশ নিয়ে ইকবাল হল অভিমুখে এগিয়ে যায়। কলেজ প্রাঙ্গণের মর্গের মত ইমার্জেন্সীতেও অনুরূপ করুণ দৃশ্যের সূচনা হয়। আবুজর গিফারী কলেজের ফারুকের লাশকে নিয়ে বলিষ্ঠ সংগ্রামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বহু ছাত্র নতুন জঙ্গী সংগ্রামের রায় ঘোষণা করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে আনীত শহীদদের লাশগুলো হাজারো মানুষের মনে দুরপনেয় সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এনে দেয়।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১]

বঙ্গবন্ধু সন্ধ্যা সাড়ে ৮টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎ-সাধীন স্বাধিকার আন্দোলনের আহত বীর সৈনিকদের দেখতে যান। তিনি আহত ব্যক্তিদেরকে সান্ত্বনা দান করেন ও আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহিয়া খান ঘাবড়ে গেলেন। তিনি ১০ই মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনের আমন্ত্রণ জানালেন। ৩রা মার্চ রাওয়ালপিণ্ডির প্রেসিডেণ্ট ভবন থেকে ঘোষিত এই আমন্ত্রণের সংবাদ প্রচার ক'রে খবরে বলা হয়ঃ

ইয়াহিয়া কর্তৃক নেতৃ সম্মেলনের বৈঠক আহ্বান

"একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সাহায্য করিতে প্রেসিডেণ্ট তাঁহার সাধ্যানুযায়ী সবকিছু করিবেন বলিয়া গত ১লা মার্চের ঘোষণায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী তিনি ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য জাতীয় পরিষদে সকল পার্লামেন্টারী গ্রুপের নির্বাচিত নেতাদের নিকট জরুরী ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ-লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। আগামী ৮ই মার্চ পবিত্র আশুরার দিন পড়ায় আগামী ১০ই মার্চ এই সম্মেলনের দিন ধার্য করা হইয়াছে। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর দুই সপ্তাহের মধ্যে কেন জাতীয়



একটি বিশেষ ভঙ্গিতে বঙ্গবন্ধু

পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না; প্রেসিডেন্ট উহার কোন কারণ দেখিতেছেন না।"

সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত নেতারা হইলেন: আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান, পি. পি. পি. প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো, কাইয়ুমপন্থী পাকিস্তান মুসলিম লীগের খান আবদুল কাইয়ুম খান, কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মোহাম্মদ মমতাজ দৌলতানা, হাজারভী পন্থী জমিয়তুল উলেমা-ই-ইসলামের মওলানা মুফতী মাহমুদ, ন্যাপের খান আবদুল ওয়ালী খান, জমিয়তুল উলেমা-ই-পাকিস্তানের মওলানা শাহ আহমদ নূরানী, জামাতে ইসলামের জনাব গফুর আহমদ, কনভেনশন মুসলিম লীগের জনাব মোহাম্মদ জামান কোরিফা, পি. ডি. পি-র জনাব নূরুল আমীন এবং উপজাতীয় অঞ্চল হতে জাতীয় পরিষদ সদস্য-দের প্রতিনিধি মেজর জেনারেল জামালদার ও মালিক জাহাঙ্গীর খান।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১]

৩রা মার্চ রাতেই এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের এই আমন্ত্রণকে 'বন্দুকের নলের মাথায়' আমন্ত্রণের নামে 'নিষ্ঠুর তামাসা' বলে উল্লেখ ক'রে তা' প্রত্যাখ্যান করেন। পরদিন প্রকাশিত খবরে বলা হয়: "গতকাল (বুধবার) রাত্রে এক বিবৃতিতে শেখ সাহেব বলেন, 'বেতারে প্রচারিত এই আমন্ত্রণের পটভূমিতে রহিয়াছে ঢাকা চট্টগ্রাম সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের পাইকারী হারে হত্যার বেদনাদায়ক অধ্যায়।' তিনি বলেন, 'যে মুহূর্তে এই সব বীর শহীদের রক্তের দাগ রাজপথের বুক হইতে শুকাইয়া যায় নাই, যখন বহু শহীদের নশ্বরদেহ দাফনের প্রতীক্ষায় পড়িয়া আছে, যখন শত শত বুলেটবিদ্ধ মানুষ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা করিয়া চলিয়াছে সেই মুহূর্তে এই সম্মেলন আমন্ত্রণ নিষ্ঠুর তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা আরেক নির্মম পরিহাসস্বরূপ এইজন্য যে, এমন কিছু লোকের সঙ্গে আমাদের বসিতে বলা হইয়াছে, যাহাদের হীন চক্রান্তই নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতার মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

শেখ মুজিব কর্তৃক ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান

শেখ মুজিব বলেন, যখন সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত, যখন আমাদের কানে বাজিতেছে অস্ত্রের ভাষায় সুতীব্র হুংকার, সেই মুহূর্তে এই আমন্ত্রণ

বন্দুকের নলের মাথায় আমন্ত্রণেরই সামিল। আর এই পরিস্থিতিতেই এ ধরনের কোন আমন্ত্রণ গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমি ইহা প্রত্যাখ্যান করিতেছি।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১]

একই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮ জন শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপক সংবাদে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দেশের উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শোষক-শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহলকে দায়ী করেন। সে দিন মওলানা ভাসানী এক তারবাতায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সরোজমিনে তদন্ত ক'রে যাবার জন্য আহ্বান জানান।

পরদিন ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১। পদচ্যুত প্রাদেশিক গভর্নর জনাব এস. এম. আহসান সপরিবারে ঢাকা থেকে বিমানযোগে করাচী গমন করেন। যাবার পথে তিনি বিমান বন্দরে বাংলাদেশের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানান।

আসগর খানের দাবী

করাচী থেকে এয়ার মার্শাল আসগর খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট দাবী জানান। তিনি বলেন যে, ঘটনা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট যদি অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর না করেন, তা' হ'লে তিনি পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণের সমর্থনে আন্দোলন শুরু করবেন। পরদিন শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ঢাকায় আসার সিদ্ধান্তও তিনি জ্ঞাপন করেন।

৪ঠা মার্চের হরতাল

এ দিনের ঘটনাবলী প্রকাশ করতে গিয়ে ৫ই মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক সংবাদ-শিরোনামায় লেখেন 'জয় বাংলা'র জয়। ইত্তেফাকের রাজনৈতিক ভাষ্যকার লিখেছেন ঃ "ক্ষমতার দুর্গ নয়, জনগণই যে দেশের সত্যিকার শক্তির উৎস, বাংলাদেশের বিগত তিনদিনের ঘটনাবলী তাহাই নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত করিয়াছে। 'অস্ত্রের ভাষায়' মোকাবিলায় স্বাধিকারকামী নিরস্ত্রের সংগ্রাম প্রথম পর্বে জয়যুক্ত হইয়াছে। বাংলার মানুষের দুর্জয় প্রত্যয়ের মুখে দেশের পশ্চিমাঞ্চলেও মনে হয় নতুন করিয়া চিন্তা-ভাবনা শুরু হইয়াছে। প্রেসিডেন্টের নেতৃসম্মেলনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বাধিকার

সংগ্রামের মহানায়ক শেখ মুজিবের কণ্ঠে যে প্রত্যয় ঘোষিত হইয়াছে দলমত নির্বিশেষে বাংলার মানুষ তা' অভিনন্দিত করিয়াছে। ......অস্ত্রের ঝংকার, শক্তির আস্ফালন সব কিছুরই মুখে বাংলার মানুষের হইয়া শেখ মুজিবের কণ্ঠে পর্যায়ে পর্যায়ে যে সঘন গর্জন ধ্বনিত হইয়াছে ; এ দেশের আপামর মানুষকে তা' এমনই প্রত্যয়ী করিয়া তুলিয়াছে যে, অফিস-আদালত, কল-কারখানা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, কুত্রাপি বড় সাহেব ছোট সাহেব হতে শুরু করিয়া মায় পিওন পর্যন্ত একটি প্রাণীও হাজিরা দিতে যান নাই। দিন-মজুর তার কাজে যায় নাই। রিক্সা, অটো-রিক্সা, বাস-ট্যাক্সীর চাকা ঘোরে নাই। একটি মাত্র ব্যক্তিত্বকে ঘিরিয়া বাঙালীর চিত্তে আজ এমনই আলোড়ন জাগিয়াছে যে, তাঁর নির্দেশ ব্যতীত বাংলার প্রকৃতির একটি স্তবকও যেন আর আন্দোলিত হইতে জানে না। সংগ্রামী বাংলার আপামর মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনীর বাঙালী জওয়ানদের কণ্ঠও উচ্চকিত হইয়াছে 'জয় বাংলা' শ্লোগানে। আর সে সুরের অনুরন জাগিয়াছে সরকারী প্রচার মাধ্যমেও। এককালে যে বেতার ও টেলিভিশন ছিল জনগণের নাগালের বাহিরে, গত বুধবার হইতে সে দুইটি মাধ্যমও জয় বাংলার জয়গানে মুখরিত। গতকাল হইতে রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা, কেবল 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' আর 'পাকিস্তান টেলিভিশন' কেবল 'ঢাকা টেলিভিশন' বলিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর খেদমতে হাজির হইতেছে। বাংলা ও বাঙালীর বর্ণনা গীতিই এখন তাদের উপজীব্য। সবকিছু মিলাইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, গত তিন দিনের আন্দোলন রাজনৈতিক অঙ্গনে বাংলার মন ও মানসকে এতদিন একসূত্রে গ্রথিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। 'জুজুর ভয়' বা 'অস্ত্রের ভাষায়' অতীতে যে কণ্ঠ দাবাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে ; সে কণ্ঠ এবার একটি মাত্র শ্লোগানে মুখরিত—'জয় বাংলা'।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই মার্চ, ১৯৭১]

এ দিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্চের ৫ তারিখে দৈনিক পাকিস্তানে বলা হয় : "কল-কারখানায় বাজছে না বাঁশী। মানুষ নেই অফিস-আদালতে। অগ্নিগর্ভ দেশ আজ পথে নেমেছে। এক-দুই ক'রে কাল কেটে গেছে চারদিন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় দেশ অগ্নিগর্ভ। বে-সামরিক শাসন-ব্যবস্থা

ঢাকার পরিস্থিতি

যেন ভেঙে পড়েছে। স্বাধিকার আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছে মানুষ—রংপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকায়—বিক্ষুব্ধ এই বাংলাদেশে—।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৫ই মার্চ, ১৯৭১]

গত দু'দিনে ক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষে প্রায় তিনশত জন নিহত ও কয়েক হাজার আহত হয়েছেন বলে সংবাদপত্রের তথ্যে জানা যায়। রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা প্রভৃতি জেলায় সান্ধ্য-আইন জারী করা হ'লেও আন্দোলনকারীরা তা' লঙ্ঘন করে। ঢাকায় এদিন সান্ধ্য-আইন তুলে নেয়া হয়। কারণ সান্ধ্য-আইনের কোন কার্যকারিতাই ছিল না। গণ-মিছিলের দুর্বার স্রোতে আইনের শাসন কোন বাধাই মানে নি। জনগণ ব্যারিকেড সৃষ্টি ক'রে সর্বপ্রকার যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ রুদ্ধ ক'রে দিয়েছিল।

চট্টগ্রামের পরিস্থিতি

৪ঠা মার্চ তারিখেও চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ভয়াবহভাবেই বিরাজ করে। বাঙালী অবাঙালীদের মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ফলে ৯ ব্যক্তি নিহত ও ৫০ ব্যক্তি আহত হয়। এ সংবাদ পরিবেশন ক'রে দৈনিক পাকিস্তান লিখেছেন ঃ "আজ (অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ) দু'দলের নতুন ক'রে গোলযোগের ফলে চট্টগ্রামে ৯ ব্যক্তি নিহত ও ৫০ ব্যক্তি আহত হয়। গতকালের গোলযোগে নিহতের সংখ্যা ছিল ১১১ ও আহতের সংখ্যা প্রায় ৩ শত। ফলে গত দু'দিনে এখানে নিহতের সংখ্যা ১২০ ও আহতের সংখ্যা সাড়ে তিন শ'তে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে ১০০ জন ধারালো ছুরি ও গুলীর আঘাতে এবং ২০ জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৫ই মার্চ, ১৯৭১]

৪ঠা মার্চের হরতালে প্রায় প্রতিটি সভার শুরুতেই পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত একটি নতুন পতাকা উড়ানো হয়। এই পতাকাই বাংলাদেশের নিজস্ব পতাকারূপে চিহ্নিত হয়।

সংগ্রামী জনতার প্রতি শেখ মুজিবের অভিনন্দন

এই তারিখে সংগ্রামী জনতার প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে ও কতিপয় ক্ষেত্রে হরতালের আওতা শিথিল ক'রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন ঃ "শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য আমাদের আহ্বানে বাংলাদেশের প্রতিটি

নারী, পুরুষ ও শিশু যে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছেন, তার জন্য আমি আপনাদের বীর জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণ—যথা শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্ররা তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে বুলেটের সামনে যে সাহস ও দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, বিশ্বের জনগণের তা' জানা দরকার।

ক্রমাগত হরতালের ফলে জনগণকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং আত্মত্যাগ করতে হয়েছে. তা' সহ্য করার জন্যও আমি আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাদের অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, চরম আত্মত্যাগ ব্যতীত কোন জনগণই মুক্তি পায় নি। কাজেই জনগণকে যে কোন মূল্যে মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"

[ঐ]

বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, পূর্ব ঘোষণামত ৫ই ও ৬ই মার্চ সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল অব্যাহত থাকবে। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে হরতালের আওতা শিথিল করা হয়। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান ক'রে বিবৃতিতে তিনি বলেন ঃ

(১) যে সব সরকারী ও বেসরকারী অফিসে কর্মচারীরা এখনও বেতন পান নাই, শুধু বেতন দানের জন্য সেগুলি বিকাল আড়াইটা হইতে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে। শুধু বাংলাদেশের মধ্যে অনূর্ধ্ব ১৫শত টাকার বেতন চেক ভাঙানোর জন্য উল্লেখিত সময়ে ব্যাঙ্কসমূহও চালু থাকিবে। স্টেট ব্যাঙ্ককে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। স্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে বাংলাদেশের বাহিরে টাকা পাঠানো যাইবে না। রেশন দোকান এবং খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলিও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারে।

(২) আরও যাহা হরতালের আওতায় আসিবে না, সেগুলি হইতেছে হাসপাতাল ও ঔষধের দোকান, হাসপাতালের গাড়ী (এ্যাম্বুলেন্স), ডাক্তারের গাড়ী, সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের গাড়ী, ওয়াটার সাপ্লাই, গ্যাস সাপ্লাই, ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই, স্থানীয় টেলিফোন এবং বাংলাদেশের

বিভিন্ন জেলার মধ্যে ট্রাঙ্ক-টেলিফোন, দমকল বাহিনী, ঝাড়ুদার, ময়লার আবর্জনা গাড়ী।" [দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ই মার্চ, ১৯৭১]

মওলানা ভাসানী এই তারিখে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি পুনরায় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাঙালীর সার্বভৌমত্বের দাবী জানান। এই দাবীর প্রশ্নে যাতে কোন আপোষ করা না হয়, সে বিষয়েও তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। গণহত্যার নিন্দা ক'রে মওলানা ভাসানী বলেন,

মওলানা ভাসানীর বিবৃতি

"আমি কংগ্রেস, খিলাফত, মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মাধ্যমে আন্দোলন করেছি। কিন্তু আমার ৮৯ বছর বয়সে এবারকার মত গণজাগরণ এবং সরকারের অগণতান্ত্রিক ঘোষণার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ আর দেখি নি। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত ও নজীরবিহীন আত্মচেতনা এবং পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্পের জন্য তিনি জনসাধারণের প্রতি মোবারকবাদ জানান।" [দৈনিক পাকিস্তান, ৫ই মার্চ, ১৯৭১]

একই দিনে নূরুল আমীনও এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি ইয়াহিয়া কর্তৃক আহূত নেতৃ-সম্মেলনে যোগদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং অবিলম্বে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহবানের জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি আবেদন জানান। এ ছাড়া পূর্ব বাংলার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দও ইয়াহিয়ার কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। এই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ জনসাধারণ ও ছাত্রদের প্রতি নিম্নোক্ত আবেদন জানানঃ

জনসাধারণের প্রতি

১। ব্যারিকেডগুলিতে সকাল ৭ টার পরে গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা বা রাত সাড়ে ন'টায় পুনরায় বন্ধ ক'রে দেয়া।

২। রিক্সা ও বেবী ট্যাক্সী ড্রাইভারদের বেশী পয়সা দেয়া এবং মালিক-দের প্রাপ্য টাকার এক-চতুর্থাংশ নেয়া।

ছাত্রদের প্রতি

১। পাড়া, অঞ্চল, থানা, মহকুমা ও জেলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন। ঢাকা শহরে ৬ই মার্চের মধ্যে এবং সমগ্র বাংলাদেশে ৭ই মার্চের মধ্যে শেষ করতে হবে।

২। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

একজন আহ্বায়ক, দশজন সদস্য নিয়ে মোট এগারজনের কমিটি।

৩। প্রত্যেক পাড়া, অঞ্চল ও থানা সংগ্রাম পরিষদের এক কপি মহকুমা এবং এক কপি জেলায় পাঠাতে হবে। প্রত্যেক জেলা ও মহকুমার এক কপি কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৫ই মার্চ, ১৯৭১]

কতিপয় বিশিষ্ট শিল্পীর ঘোষণা

বেতার ও টেলিভিশনের বিশিষ্ট ২০ জন শিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে জানান যে, গত ২রা মার্চ থেকে বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পী বেতার ও টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করছেন না। বিবৃতিতে তাঁরা ঘোষণা করেন, "যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত আমরা বেতার ও টেলিভিশনে অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ৫ই মার্চ, ১৯৭১]

সামরিক বিজ্ঞপ্তি

পরদিন ৫ তারিখে এমনকি সামরিক কর্তৃপক্ষের এক সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় যে, "জনগণকে শান্ত করার জন্য শেখ মুজিবের আবেদনে ঢাকার পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।" পরিস্থিতির সত্যি উন্নতি ঘটে। সেনাবাহিনী উস্কানীমূলক আচরণ না করলে জনগণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই অসহযোগ আন্দোলন চালাতে থাকে। এদিকে ঢাকা ও তার আশেপাশে গত কয়েক দিনে সামরিক বাহিনীর গুলীতে প্রায় তিন শত জন নিহত ও ২০০০ জন আহত হয়। এসবই ঘটে সেনাবাহিনীর উস্কানীমূলক আঘাতের ফলে।

তাজউদ্দিনের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এই সময় এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বাংলার বুকে এই গণহত্যা বন্ধ করার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, "ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে মিলিটারীর বুলেটে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ—শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের ধরাশায়ী করা

হইতেছে। অবিলম্বে এই নরহত্যা বন্ধ করিতে হইবে। যাহারা এই ঘটনার জন্য দায়ী, তাহাদের জানা উচিত যে, নির্বিচারে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে এভাবে হত্যা করা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই মার্চ ১৯৭১]

গণ-আন্দোলনের প্রবাহে এই সময় অনেক রাজনৈতিক দলই গণ-কাতারে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। ভাসানী বা পিকিং ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব মশিহুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, "ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেছেন যে, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তি বা দলের সাথে তিনি ও তাঁর দল এক কাতারে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত।" [দৈনিক পূর্বদেশ, ৬ই মার্চ, ১৯৭১]

সেনাবাহিনীর উস্কানীমূলক আক্রমণ ও হত্যা কয়েক জায়গায় চলতেই থাকে। ঢাকার টঙ্গী এলাকায় সেনাবাহিনী কয়েক দফা গুলী চালিয়ে ৪ জনকে নিহত এবং ২৫ জনকে আহত করে। সংবাদে বলা হয়ঃ "শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত সশস্ত্র বাহিনীর গুলীতে গতকাল (শুক্রবার) টঙ্গী এলাকায় ৪ ব্যক্তির মৃত্যু ও ২৫ ব্যক্তি আহত হইয়াছে। বর্তমানে সমগ্র টঙ্গী এলাকায় প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তির মতে সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা দফায় দফায় মোট ৬২ রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে এবং এই গুলী-বর্ষণের শব্দে সমগ্র টঙ্গী শিল্প এলাকা প্রকম্পিত হইতে থাকে। বেসরকারী সূত্রে হতাহতের সংখ্যা বহু বেশী বলিয়া দাবী করা হয়। টঙ্গী থানার অফিসার ইন-চার্জ সহ ৩ জন পুলিশ কর্মচারীও আহত হয়।"

টঙ্গীতে গুলী বর্ষণ

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই মার্চ, ১৯৭১]

এই গুলীবর্ষণের ফলে সমগ্র টঙ্গী এলাকার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা টঙ্গীর কংক্রীট ব্রীজের পার্শ্ববর্তী কাঠের ব্রীজে আগুন লাগিয়ে দেয়। সংবাদে বলা হয়। "গুলী বর্ষণের পর সমগ্র টঙ্গী এলাকা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা টঙ্গীর কংক্রীট ব্রীজের পার্শ্ববর্তী কাঠের ব্রীজে আগুন লাগিয়ে দেয়। রাস্তার পাশের বড় বড় গাছ কেটে ফেলে তারা কংক্রীটের পুলের দিকে টঙ্গী অভিমুখে গমন পথে ব্যারিকেড রচনা করে। আরও নানাভাবে তারা ব্যারিকেড রচনা করে।" [দৈনিক পাকিস্তান, ৬ই মার্চ, ১৯৭১]

ঢাকার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। শেখ মুজিবের নির্দেশে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শৃঙ্খলার সাথে জনগণ আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা একেবারে বিকল হয়ে পড়ে। খবরে বলা হয় ঃ "বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত স্টেট ব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য ব্যাঙ্ক খোলা ছিল। বেতনের ব্যাপারে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাও কার্যকরী করা হয়। প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট ও পদস্থ কর্মচারীরা বেলা আড়াইটায় অফিসে এসেছিলেন। এ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিস দু' ঘন্টা পর্যন্ত খোলা ছিল। অন্যান্য অফিসেও দু' ঘন্টা কাজ চলে—বিকল প্রশাসনযন্ত্র বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আবার সচল হয়ে ওঠে দু' ঘন্টার জন্য। গতকালের হরতালে এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে যে সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা' হ'ল বর্তমান বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ মোতাবেক জনগণ কাজ করেছে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৬ই মার্চ, ১৯৭১]

চট্টগ্রামের পোর্ট কলোনীতেও সে দিন মিলিটারী গুলীবর্ষণ করে। ফলে একজন মহিলা সহ তিনজন নিহত ও একজন আহত হয়। গত কয়েকদিনে সেখানে ১৮৮ জন নিহত হয় বলে পরদিন প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়,

লেখক-শিল্পী সমাজের ঘোষণা

ঐ দিন পূর্ব বাংলার লেখক-শিল্পীবৃন্দ 'পূর্ব বাংলাকে জাগ্রত বাঙালীর প্রার্থিত দেশ' হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামে শপথ ও সংগ্রামী জনগণের সাথে তাঁদের একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাঁরা ঢাকার তোপখানা রোডে লেখক সংঘের অফিস থেকে মিছিলে শামিল হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হন এবং হাত তুলে শপথ গ্রহণ করেন। সমবেত সভায় যাঁরা বক্তৃতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডক্টর আহমদ শরীফ, শামসুর রহমান, শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, শিল্পী মহিউদ্দীন। আমি নিজেও এই মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম এবং শহীদ মিনারে ভষাণ দিয়েছিলাম। সভায় বক্তাগণ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিগণকে অতীতের সকল মতানৈক্য ও তিক্ততা ভুলে গিয়ে স্বাধিকার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করার জন্য আহবান জানান। সভায় কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সম্পর্কে

খবরে বলা হয়ঃ "......দেশের এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময় বাংলা-দেশের লেখকরা নিশ্চুপ থাকিতে পারে না। যে কারণে দেশের সর্বত্র গণ-আন্দোলনে সাধারণ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ প্রাণ দিচ্ছে, লেখক-শিল্পীরাও তার সাথে একাত্ম অনুভব করছেন। দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে প্রস্তাবে বলা হয়, যে সার্বিক স্বাধিকারের জন্য দেশবাসী রক্ত দিচ্ছে তার প্রশ্নে নেতৃবৃন্দ যেন আপোষ না করেন। এই সংগ্রামের বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাজনীতিবিদ, লেখক, শ্রমিক, কৃষক তথা জনগণের প্রতি প্রস্তাবে আহ্বান জানান হয়।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৬ই মার্চ, ১৯৭১]

৫ই মার্চের আর একটি উল্লেখযোগ্য মিছিল ছিল ছাত্রদের। ছাত্রলীগের উদ্যোগে একটি 'লাঠি মিছিল' বের করা হয়।

মার্চের ৬ তারিখে অকস্মাৎ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদ আহ্বান করলেন। ভাষণে তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য তিনি ন্যূনতম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন মাত্র। দুই অঞ্চলের সংহতি রক্ষার জন্য তিনি যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর। পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রেসিডেন্টের ভাষণ নিম্নে দেয়া হলঃ

"প্রিয় দেশবাসিগণ,

প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ

আস্‌সলামু আলায়কুম। আমার ১লা মার্চের ভাষণে আমি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আমার পদক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছি। সেই ভাষণে আমি একথাও বলিয়াছি যে, গণতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য আমি আমাদের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে আমার সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিব।

আপনারা জানেন, এ ব্যাপারে আমার সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে আমি সকল পার্লামেন্টারী দলের নেতৃবৃন্দকে ১০ই মার্চ আমার সহিত এক সম্মেলনে মিলিত হইবার আহ্বান জানাইয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মতানৈক্য নিরসনের ব্যাপারে আমার আন্তরিক প্রয়াসকে সম্পূর্ণভাবে ভুল বোঝা

হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, যিনি বেতারে সম্মেলনের তারিখ ঘোষণার পূর্বে এই ধরনের সম্মেলনের প্রতি কোন বিমুখ মনোভাব পোষণ করেন না বলিয়া আভাস দিয়াছিলেন। তিনি সেই আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার সরাসরি প্রত্যাখ্যান বিস্ময়কর ও হতাশাব্যঞ্জক। আপনারা জানেন, জনাব নূরুল আমিনও সম্মেলনে যোগদান করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন। ইহার ফলে বোঝা যাইতেছে যে, প্রস্তাবিত সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান হইতে কোন প্রতিনিধি থাকিবে না।

... ...

বিশাল সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিনিধি ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে অসম্মতি জানান। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ঐ তারিখে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠান ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হইবে। এমন কি, ইহার পরিণতিতে পরিষদ ভাঙিয়া পর্যন্ত যাইতে পারে। কাজেই আমি অধিবেশনের তারিখ স্থগিত রাখিয়া পরিস্থিতিকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হই। এই পন্থায় আমি দুইটি লক্ষ্য অর্জনের আশা করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ, পরিষদ ও ইহার জন্মলগ্ন হইতে যে সকল জাতীয় প্রচেষ্টা চালান হইয়াছে সে সমস্ত রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়তঃ পরিস্থিতিকে শান্ত করার জন্য ও ফলপ্রসূ আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য সময় দেওয়া। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত সেই মনোভাব লইয়া গ্রহণের পরিবর্তে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ ইহাকে এমনভাবে দেখিয়াছেন, যাহার পরিণতিতে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিরা রাস্তায় নামিয়া আসিয়াছে এবং জান-মালের ক্ষতিসাধন করিয়াছে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে কোন সরকারই নীরব দর্শক হিসাবে থাকিতে পারেন না।

... ...

পরস্পর ভুল বুঝাবুঝির সুযোগে অরাজকতা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিরা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। যখন এই ধরনের ব্যক্তিরা তৎপর হইয়া উঠে, তখন নিরীহ নাগরিকদেরই প্রধানতঃ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিতে হয়। কেননা এইরূপ অবস্থায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবন দারুণভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রাণ বিপন্ন এমন কি মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে

হয়। পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এটা জানা থাকা সত্ত্বেও আইনভঙ্গকারীদের লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়াছি। দেখা যাইতেছে যে, পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার ব্যাপারে আমার অন্যতম উদ্দেশ্য, যথা খোদ পরিষদ বজায় রাখার লক্ষ্য অর্জিত হইতেছে। আমার অপর ও সমান গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ঃ একটি ফলপ্রসূ আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এদিকে নিরীহ মানুষের প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমার পূর্ণ সমবেদনা রহিয়াছে। এই পরিস্থিতি আমার সৃষ্ট নয় এবং এ ধরনের পরিস্থিতি আমি কখনও সৃষ্টি করিতে পারি না।

আগেই বলিয়াছি, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের উদ্বোধনী তারিখ নির্ধারণের জন্য আমি যে প্রচেষ্টা চালাই, উহা ব্যর্থ হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, এই দেশের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন পরিচালক হিসাবে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এই দুর্ভাগ্যজনক অচলাবস্থার নিরসন করা আমার কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করিতে পারি না। এই হেতু আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সকল রাজনৈতিক নেতার নিকট হইতে দেশপ্রেমিক-জনোচিত ও গঠনমূলক সাড়া পাওয়া যাইবে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে সকলের উদ্দেশে আমি বলিতে চাই যে, আইনগত কাঠামো আদেশের চাইতে বড় আশ্বাসের প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে আমি সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, যাহাই ঘটুক না কেন, যতদিন আমি পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক ও রাষ্ট্র-প্রধান পদে নিযুক্ত রহিয়াছি, ততদিন পাকিস্তানের পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক সংহতি বজায় রাখিব। এই প্রশ্নে কোন সন্দেহ বা ভুল করা সঙ্গত নয়। এই দেশের অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের প্রতি আমার একটি দায়িত্ব রহিয়াছে।

তারা আমার কাছে এই আশাই করে এবং আমিও তাদের বিফল-মনোরথ করিব না। আমি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে কখনও কোটি কোটি নিরীহ পাকিস্তানীর মাতৃভূমি ধ্বংস করিতে দিব না। পাকিস্তানের সংহতি, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্য-বিশেষ এবং এ দায়িত্বে তারা কখনও ব্যর্থ হয় নাই।

পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসুন আমরা আমাদের লক্ষ্য গণতন্ত্র অর্জনের পথে আগাইয়া যাই এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে জাতির প্রত্যাশিত দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেই।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মার্চ, ১৯৭১]

সকাল থেকে প্রেসিডেন্টের এই বেতার ভাষণ দানের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর থেকে পূর্ব বাংলার জনতা আকুল আগ্রহে তা' শোনার জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে বেতারের কাছে প্রচুর জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইয়াহিয়ার ভাষণ শোনার পর জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা সঙ্গে সঙ্গে মিছিলে সামিল হয়ে ইয়াহিয়া-ভুট্টো বিরোধী নানাবিধি শ্লোগান দিতে থাকে।

প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান—জুলফিকার আলী ভুট্টো, কাইয়ুম খান, নসরুল্লাহ, মওলানা নূরানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সহ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ নেতার কাছেই অভিনন্দিত হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো সে অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আগের দিন অর্থাৎ ৫ই মার্চ-এ ইয়াহিয়া-ভুট্টো রাওয়ালপিণ্ডি প্রেসিডেন্ট ভবনে ৫ ঘন্টারও অধিককাল ধরে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভুট্টোর সঙ্গে পরামর্শ করেই ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। সে দিনই কাউন্সিল মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল নূর খান লাহোরের এক জনসমাবেশে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলেন, "আইনতঃ শেখ মুজিবই দেশের শাসন পরিচালনার অধিকারী। শেখ মুজিবের উপর দোষারোপ ক'রে প্রেসিডেন্ট

যে বেতার ভাষণ দেন তার জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে জনাব নূর খান অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিবন্ধকতা দূর করার আহ্বান জানান।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মার্চ, ১৯৭১]

নূর খানের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশের মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে একটি সত্য চিত্র দেবার প্রয়াস আছে, যা কিনা প্রায়শঃই পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। নূর খান একজন বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ না হতে পারেন—কিন্তু একথা বুঝতে তাঁর কষ্ট হয় নি যে, আসলে কায়েমী স্বার্থবাদীদের পাওয়া না পাওয়ার হিসাব মিলিয়েই পাকিস্তানী শাসন-ব্যবস্থার গতিপথ নির্ণীত হয়। জনগণের রায় আর আমলা-সৈনিক-রাজনীতিবিদ, যাদের পশ্চাতে আছে বাইশ পরিবারের অগাধ সহানুভূতি, প্রভূতির বখরা, এ দুইয়ের মাঝে সে কারণেই আকাশ-পাতাল ফারাক সব সময় বিদ্যমান। পাকিস্তানের চব্বিশ বছর কাল পরমায়ুর ইতিহাস আসলে এই নির্মম ও দুর্ভাগ্যজনক পার্থক্যের ইতিহাস। শেখ মুজিব এই পার্থক্য ঘুচিয়ে দেশে জনগণের রায় বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন—কায়েমী স্বার্থবাদীদের অপসারণ ক'রে জনগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এখানেই তিনি অপরাধী—তিনি একজন দেশদ্রোহী। তবে ইতিহাস তাঁর অমোঘ নিয়মে জনগণের ইচ্ছাকেই পূরণ করেছে। জনগণের ইচ্ছার একচ্ছত্র প্রতিভূ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই ইতিহাস নির্মাণের মহানায়ক। সুদীর্ঘ এবং ভয়ঙ্করভাবে স্থিতিশীল ষড়যন্ত্রের সমগ্র জাল ছিন্ন ক'রে তিনি বাংলাদেশের নবজন্মের পথ নির্মাণ করেছেন।

যা হোক, আবার নাটকীয় ঘটনাসমূহের মূল আখ্যানভাগে ফিরে আসা যাক। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ সমাপ্ত হওয়ার পর পরই শেখ

আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া

মুজিবের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও বাংলাদেশ শাখার ওয়ার্কিং কমিটির এক যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের আলোকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানা যায়।

কার্যকরী কমিটির বৈঠক চলাকালে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা অবসর-প্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

তাঁদের আলোচনা ৩০ মিনিট কাল স্থায়ী হয়। পরে আলোচনার বিষয়-বস্তু জানতে চাওয়া হ'লে আসগর খান তা' জানাতে অস্বীকার ক'রে বলেন যে, ৭ই মার্চের জনসভায় শেখ মুজিবই এর জবাব দেবেন।

এদিকে ঢাকার রাজপথ স্বাধিকারকামী জনতার দৃপ্ত পদচারণায় বারবার কম্পিত হতে থাকে। সংবাদে বলা হয় ঃ

"গতকালও বেলা আড়াইটা হইতে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ব্যাঙ্কসমূহ এবং যে সব সরকারী-বেসরকারী অফিসের কর্মচারী এখনও বেতন পান নাই, সেগুলি চালু থাকে। গতকালও সকাল হইতেই রাজপথে জনতার স্রোত নামিয়া আসে। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে সভা, সমাবেশ, মিছিল।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই মার্চ, ১৯৭১]

"সেদিন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেট ভেঙে ৩২৫ জন কয়েদী ও বিচারাধীন আসামী পলায়ন করে। গেট-ভেঙে পালানোর সময় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলীতে তাদের মধ্যে ৭ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ৭ই মার্চ, ১৯৭১]

অলী আহাদের আবেদন

বাংলা জাতীয় লীগের উদ্যোগে এই দিন রমনা রেসকোর্সে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব অলী আহাদ বাংলার স্বাধিকার ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর সাথে একাত্মতা ঘোষণা ক'রে তিনি বলেন, "মুজিব ভাই, আপনি আন্দোলনকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এখন আপনার একমাত্র কাজ হচ্ছে আগামী কাল দৃঢ়চিত্ত হয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করা, আমরা আপনার পেছনে আছি।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ৭ই মার্চ, ১৯৭১]

জয় বাংলা শ্লোগান

মার্চ মাসের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে 'জয় বাংলা' শ্লোগান এবং বাংলাদেশের পতাকা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। একথা উল্লেখ করেছি যে, ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে 'জয় বাংলা' শ্লোগানটি প্রথম উদ্ভাবিত হ'লেও বঙ্গবন্ধু যখন এই শ্লোগানকে একটি শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করলেন মাত্র তখন থেকেই তা' সমগ্র দেশে, এমন কি ভারতবর্ষে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। ১৯৭০ সালে ১১ই জানুয়ারী তারিখে পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিব এই শ্লোগানটিকে

নিজের শ্লোগান এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্তরের শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর জনৈক জীবনীকার লিখেছেন ঃ

"১৯৭০ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে নির্মিত মঞ্চের দেবদারু পাতার পশ্চাৎপটের ওপর ফুল দিয়ে প্রথম 'জয় বাংলা' শব্দ দুটি লেখা হয়। তারপর 'জয় বাংলা' লেখাটি নিয়ে ছাত্রলীগের ছেলেদের মিছিলও বের হয়। কিন্তু সাধারণের মধ্যে ধ্বনিটির প্রচার ঘটে ১৯৭০ সালের ১১ই জানুয়ারী থেকে। ১৯৭০ সালের জানুয়ারীর গোড়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে ইয়াহিয়া আরোপিত বাধা নিষেধ তুলে নেওয়া হ'ল। রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠানের উপর থেকে বাধা-নিষেধ তুলে নেওয়ার পর ১১ই জানুয়ারী শেখ সাহেব পল্টন ময়দানে প্রথম জনসভা করলেন। ওই দিনই প্রথম প্রকাশ্যে সভা মঞ্চের সামনে হার্ড-বোর্ডে বড়ো বড়ো হরফে ছাত্ররা লিখেছিলেন 'জয় বাংলা' শব্দ দু'টি।

'জয় বাংলা' ধ্বনি আজ এপার বাংলা ওপার বাংলার হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে রণিত হচ্ছে। বাংলাদেশের রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের বীজমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এই 'জয় বাংলা'। গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব জয়ের পিছনে 'জয় বাংলা' শ্লোগানটি একটি 'ফ্যাক্টর'। শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ঢাকায় দেখা গেছে, একজন রিক্‌সাওয়ালা আর একজন রিক্‌সাওয়ালাকে দেখলেই 'জয় বাংলা' বলে কুশল বিনিময় করছে। ক্রমশঃ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এটা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে যায়।"

[জয় বাংলা মুক্তিফৌজ, ও শেখ মুজিব, কল্‌হন, পৃঃ ২৮৫-২৮৬]

পতাকা সম্পর্কেও কল্‌হন যে তথ্য দিয়েছেন তা' প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ

স্বাধীন বাংলার পতাকা

"২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্‌ বিল্ডিং-এর প্রাঙ্গণে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আয়োজনে ছাত্রদের একটি বিরাট সভা হ'ল। ছাত্রদের সভা সাধারণতঃ বটতলাতেই হয়। কিন্তু ওই দিন অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীতে সারা অঙ্গন ছয়লাপ হয়ে গেল। ছাত্রনেতারা তখন ছাদের ওপর উঠে ভাষণ দিলেন। ওই দিনের সভাপতি ছিলেন ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী। ছাত্রনেতা

আ. স. ম. আবদুর রব জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে 'উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা' পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করার ডাক দিলেন।

পোড়ানো হ'ল পাকিস্তানী পতাকা। যে দিয়াশলাই দিয়ে প্রথমে পাকিস্তানী পতাকা পোড়ানো হয়, ঢাকায় একজন ছাত্রনেতা আজও পরম যত্নে সেই দিয়াশলাইটা রেখে দিয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের মিউজিয়ামে তা' সংরক্ষিত হবে ভাবীকালের ছেলেমেয়েদের জন্য।

পাকিস্তানী পতাকা তো পোড়ানো হ'ল। কিন্তু জাতীয় পতাকা কোথায়? ছাত্রলীগের জঙ্গী বাহিনীর (রেজিমেন্টাল) পতাকাটাই এগিয়ে দিল একজন। ছাত্রনেতা আবদুর রব সেই পতাকা হাতে তুলে নিয়ে ঘোষণা করলেন, এই আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। পতাকার জমিন সবুজ। মাঝে সিঁদুর রাঙা গোলাকার সূর্য। তারই মাঝে সোনালিতে আঁকা পূর্ব বাংলার মানচিত্র। ছাত্র-ছাত্রীরা বিপুল করতালি আর হর্ষধ্বনিতে বরণ ক'রে নিল সেই পতাকা। তারপর সেই পতাকা সামনে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল বের করলেন। রমনা এলাকায় ঘুরল সেই মিছিল। বাংলাদেশের মানুষ সেই প্রথম দেখল তাদের জাতীয় পতাকা। সকলে সশ্রদ্ধচিত্তে সম্মান জানাল সেই পতাকাকে। পরের দিন ছাত্রলীগ আয়োজিত প্রকাশ্য জনসভায় ১নং ইস্তাহার বিলি করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হিসাবে সে পতাকাও তোলা হ'ল।

১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে ছাত্রলীগের জঙ্গী বাহিনীর পতাকারূপে এই পতাকার পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনাও সিরাজুল আলম খানের। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সার্জেন্ট জহুরুল হকের স্মৃতি স্মরণে ছাত্রলীগের জঙ্গী বাহিনীর কুচকাওয়াজ হয়। তাতে ওই পতাকার প্রথম বাস্তব রূপ দেখা যায়। কিন্তু প্রকাশ্যে পতাকাটি ব্যবহৃত হয় ৭ই জুন সকাল সাড়ে আটটায়। ৬-দফা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ছাত্রলীগের স্বেচ্ছাবাহিনীর কুচকাওয়াজ হয় পল্টন ময়দানে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল সে দিন। তার মধ্যেই শেখ সাহেব ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন। গোল ক'রে মোড়ানো ছাত্রলীগের পতাকাটা একজন শেখ সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। শেখ সাহেব তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে

ওই পতাকা খুলে ছাত্রনেতা আ. স. ম. আবদুর রবের হাতে তুলে দিলেন, কুচকাওয়াজ শুরু হবার ঠিক আগে।

'স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশ' ঘোষণা নিয়েও ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। ১২ই আগস্ট ১৯৭০ সালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভা হয় ইকবাল হলে। সভায় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এবং নির্বাচন নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা এবং বিতর্ক হয়। ছাত্রনেতাদের গরিষ্ঠ দলের বক্তব্য ছিল, পূর্ব বাংলা পাকিস্তান সরকারের একটি উপনিবেশ। তাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তীব্র করতে হবে। তাঁদের লক্ষ্য হবে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা। নির্বাচনে জয়ী হ'লেই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া খান গণ-প্রতিনিধিদের হাতে আপসে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এ তাঁরা বিশ্বাস করেন না। নির্বাচনে যোগ দেওয়ার পিছনে তাঁদের উদ্দেশ্য, জনমত গঠন করা। নির্বাচনে যোগ না দিলে আওয়ামী লীগ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন তো হয়ে পড়বেই তদুপরি আওয়ামী লীগ নির্বাচন বয়কট করলে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, জমিয়তে ওলামা প্রভৃতি দলের একটা প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ক্ষমতায় চলে আসবে অনায়াসেই। তার ফলে শোষণ-মুক্তির বাস্তবায়নের স্বপ্ন হবে সুদূর পরাহত। তাঁদের মতে, নির্বাচন জনমত গঠনের একটি মাধ্যম মাত্র। সেই ঐক্যবদ্ধ জনতার আন্দোলনকে একদিন সশস্ত্র রূপ ধারণ করতেই হবে।

ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ' ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কিন্তু ছাত্রদের একাংশ প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। তাঁরা যে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ' গঠনের বিরোধী ছিলেন তা' নয়। তবে ওই মুহূর্তে তাঁরা 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ' ঘোষণার বিরোধী ছিলেন। অর্থাৎ মতবিরোধ ছিল সময় নিয়ে।

সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্রনেতারা গেলেন শেখ মুজিবের কাছে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেই প্রয়োজনে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদনে দলের গুরুত্বপূর্ণ সব নীতি নির্ধারিত হয়। শেখ মুজিব কিন্তু কখনই চাইতেন না, ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগ এমন কোন প্রস্তাব পাশ করুক যার প্রতি

একাংশের অনুমোদন নেই। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে প্রস্তাব পাশ করা যায় ঠিকই, কিন্তু তাতে দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়। তিনি ছাত্রনেতাদের বললেন, 'তোমরা যা খুশী প্রস্তাব পাশ করতে পারো। সে অধিকার তোমাদের আছে। তবে শুধু প্রস্তাব পাশ করেই বিপ্লব হয় না। বাস্তব দিকটাও বিচার করতে হবে। সরকার ভালই জানেন, আমরা কী করছি বা করতে যাচ্ছি। কিন্তু প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তারা আমাদের কিছু করতে পারছেন না। 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ' গঠনের প্রস্তাবটি এই মুহূর্তে লিখিতভাবে পাশ হলেই জঙ্গী-সরকার তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা প্রস্তুত হওয়ার আগেই সব কিছু বানচাল হয়ে যাবে। প্রস্তাবটা লিখিত না থাকলেও হয়ত বিশেষ কিছু হবে না। ছাত্রনেতারা শেখ সাহেবের কথা মেনে নিল।" [কলহন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৬-২৯০]

১লা মার্চ সিরাজুল আলম খান এবং তাঁর সহযোগী ছাত্রনেতারা পরবর্তী গণ-আন্দোলনের রূপ এবং কর্মপন্থা নির্ধারণ ক'রে একটি ইস্তাহারের খসড়া করেন। এটা প্রকাশ করা হয় ৩রা মার্চ পল্টনে ছাত্রলীগের সভায়। শেখ মুজিব সেই সভায় ভাষণ দেন। ইস্তাহারটি আজ একটি ঐতিহাসিক দলিল। মার্চের সমস্ত গণ-আন্দোলন পরিচালনা, স্বাধীনতা ঘোষণা, শেখ মুজিবুর রহমানকে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের' সর্বাধিনায়ক ঘোষণা সব কিছুই ওই ইস্তাহারের নির্দেশ মতোই হয়েছে। আমি এখানে ইস্তাহারটি হুবহু তুলে ধরছি ঃ

জয় বাংলা

এশ্‌তেহার নং/এক

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা ও কর্মসূচী ঃ

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা হয়েছে। গত তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালীকে গোলামে পরিণত করবার জন্য বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, তা' থেকে বাঙালীর মুক্তির পথ স্বাধীন জাতি হিসাবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। গত নির্বাচনের গণ-রায়কে বানচাল ক'রে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করেছে।

৫৪ হাজার ৫ শত ৭৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাসভূমি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন ক'রে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন ক'রে অঞ্চলে অঞ্চলে ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন ক'রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু ক'রে কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েম করতে হবে।

৩। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ গঠন' ক'রে ব্যক্তি, বাক্ ও সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা সহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে। বাংলার স্বাধীনতা অন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ক) বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে।

(খ) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত ক'রে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায়, 'মুক্তি বাহিনী' গঠন করতে হবে।

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

(ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

স্বাধীনতা-আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবে :

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য ক'রে এ বিদেশী সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনী বিবেচনা করতে হবে।

(আ) তথাকথিত পাকিস্তানের তল্পীবাহী পশ্চিমা অবাঙালী মিলিটারীদের বিদেশী ও হামলাকারী সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং হামলাকারী শত্রু সৈন্যকে খতম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণরত যে কোন প্রতিরোধ প্রতিহত, পাল্টা আক্রমণ এবং খতম করার জন্য সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

(উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঊ) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি' সংগীতটি ব্যবহৃত হবে।

(ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(এ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

(ঐ) স্বাধীনতা সংগ্রামে রত বীর সেনানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান ক'রে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহৃত হবে—

* স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'—দীর্ঘজীবী হউক।
* স্বাধীন কর স্বাধীন কর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
* স্বাধীন বাংলার মহান নেতা—'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিব।
* গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়—মুক্তি বাহিনী গঠন কর।
* বীর বাঙালী অস্ত্র ধর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
* মুক্তি যদি পেতে চাও—বাঙালীরা এক হও।

বাংলা ও বাঙালীর জয় হোক্। জয় বাংলা

স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

কেন এই বাংলাদেশ গঠন, কি তার লক্ষ্য, স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে; কী হবে আন্দোলনের ধারা; আন্দোলনের শ্লোগানই বা কী কী হবে—সব কিছুর স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে ইস্তাহারে।

বাংলাদেশ গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে; পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি গঠন, অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন ক'রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু ক'রে কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েম করা, গণতন্ত্র মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদী এবং সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের আন্দোলন। দেখা যাচ্ছে, এই স্বাধীনতা আন্দোলন পশ্চিমা শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে; সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়। পশ্চিমা শোষকশ্রেণীকেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 'বিদেশী' এবং 'উপনিবেশবাদী' আখ্যা দিয়েছেন। পশ্চিমা এই শোষকশ্রেণীর মধ্যে আছে ইয়াহিয়া সরকার এবং পুঁজিপতিরা। স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য তারা জনসাধারণের সহযোগিতা এবং ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছেন, শ্রমিকদের এবং কৃষকদের সংগঠিত ক'রে 'মুক্তি বাহিনী' গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাকসৈন্য খতম করা এবং সশস্ত্র প্রস্তুতির ডাকও দেয়া হয়েছে। এই আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল যে হিন্দু-মুসলমান এবং বাঙালী অবাঙালীতে দাঙ্গা লাগাতে পারেন সে সম্পর্কেও জনসাধারণকে আগেই সতর্ক ক'রে দেয়া হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশিকা এই ইস্তাহারেই রয়েছে। পরবর্তী সমস্ত আন্দোলন এই ইস্তাহারের নির্দেশ মতোই পরিচালিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের যে একাংশ এতদিন 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ' ঘোষণা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, ইয়াহিয়ার অগণতান্ত্রিক মনোভাবের দরুন তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার পর। পূর্ব বঙ্গের নির্বিচার গণহত্যা চালানর পর তাদের পক্ষে ইস্তাহারের নির্দেশ সমর্থন না ক'রে আর কোন উপায়ই রইল না।

২৮শে ফেব্রুয়ারী আর ১লা মার্চের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ঘটে গেল। পূর্ব বঙ্গের রাজনীতিতে, গণ-আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়ে গেল ১লা মার্চ দুপুরের পর।

৩রা মার্চ পল্টনে ছাত্রলীগ আয়োজিত জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হ'ল। 'স্বাধীন বাংলাদেশ' গঠনের কথা ঘোষণা ক'রে ইস্তাহার বিলি করা হ'ল। শেখ মুজিব ওই জনসভায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহ্বান জানালেন। শেখ মুজিব বললেন, হিংস্রতা আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।"

[কল্‌হন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯১-২৯৬]

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের পটভূমিকা হিসেবে 'জয় বাংলা'-শ্লোগান, বাংলাদেশের পতাকা ও স্বাধীনতা ঘোষণার পরিকল্পনা ইত্যাদির আলোচনা করা গেল। আশা করি এ থেকে ৭ই মার্চের ঘোষণা আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ হবে।

৭ই মার্চের বক্তৃতা সম্পর্কে আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আছে। ৬ই মার্চ সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমি বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে উপস্থিত ছিলাম। ছাত্রদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর ওপর স্বাধীনতা ঘোষণার এক বিরাট চাপ এসেছিল। এক সময় বঙ্গবন্ধু হাসতে হাসতে ঠাট্টাচ্ছলে আমাকে বললেনঃ 'অধ্যাপক, আপনার এই গুণধর ছাত্রদের সামলান। এদের নিয়ে আমি আর পারছি না।' তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন প্রখ্যাত সংগ্রামী ছাত্রনেতা আবদুর রউফ এবং আরো কয়েকজনকে। রউফ তখন নির্বাচিত পরিষদ সদস্য। সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অত্যন্ত স্নেহ-ভাজন প্রাক্তন ছাত্র ছিল। আমি আব্দুর রউফ এবং আরো কয়েকজন ছাত্রনেতাকে নিয়ে নিকটস্থ সাংহাই চীনা রেঁস্তোরায় গেলাম এবং সেখানে আহারের সময় তাদের সাথে সুদীর্ঘ আলোচনায় তারা সবাই সম্মত হ'ল যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আগামীকল্য অর্থাৎ ৭ই মার্চ তারিখে ঘোষণা করা হবে কি না হবে তা' সম্পূর্ণভাবে বঙ্গবন্ধুর ওপর ছেড়ে দেয়া হোক। রাত্রি প্রায় বারোটার দিকে ছাত্রনেতাদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সামনে গিয়ে আমাদের আলোচনার ফলাফল তাঁকে জানানো হ'ল। তিনি আনন্দে গদগদ হয়ে আমাকে ও ছাত্রনেতাদের জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। ছাত্র-নেতৃবৃন্দের এইআচরণের জন্য আমি তাদের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ।

এলো ৭ই মার্চ, ১৯৭১। বাঙালী জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। এই দিন বাঙালী জাতির ভাগ্য নিয়ন্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক

রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ, বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ চারিদিকে। সে দৃশ্য যারা না দেখেছে তাদের নিকট যেন বর্ণনা করা যায় না। বাঁধ ভাঙা মানুষ 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর,' 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়—বাংলাদেশ স্বাধীন কর' 'তোমার দেশ আমার দেশ—বাংলাদেশ বাংলাদেশ,' 'তোমার আমার ঠিকানা—পদ্মা, মেঘনা, যমুনা' ইত্যাদি শ্লোগানে ঢাকার আকাশ-বাতাস-মাটি সে দিন কাঁপিয়ে তুলেছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। অথচ লাখো লাখো জনতা গ্রাম-বন্দর-অলিগলি থেকে ছুটে চলেছে রেসকোর্স ময়দানের দিকে। তাদের হাতে রয়েছে লাঠি, রড, বাঁশ ইত্যাদি। এই দিনের রেসকোর্স ময়দানের ঘটনাবলীর চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে ৮ই মার্চের দৈনিক পাকিস্তান লিখেছেনঃ "মুহুর্মুহু গর্জনে ফেটে পড়ছে জনসমুদ্রের উত্তাল কণ্ঠ। শ্লোগানের ঢেউ একের পর এক আছড়ে পড়ছে। লক্ষ কণ্ঠে এক আওয়াজ। বাঁধ না মানা দামাল হাওয়ায় সওয়ার লক্ষ কণ্ঠের বজ্র শপথ। হাওয়ায় পত পত করে উড়ছে পূর্ব বাংলার মানচিত্র অঙ্কিত সবুজ জমিনের উপর লাল সূর্যের পতাকা। লক্ষ হস্তে শপথের বজ্র-মুষ্ঠি মুহুর্মুহু উত্থিত হচ্ছে আকাশে। জাগ্রত বীর বাঙালীর সার্বিক সংগ্রামের প্রত্যয়ের প্রতীক শতকোটি মানুষের সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রতীক বাঁশের লাঠি মুহুর্মুহু শ্লোগানের সাথে সাথে উত্থিত হচ্ছে আকাশের দিকে। এই ছিল গতকাল রোববার রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সভার দৃশ্য।"

'৭১-এর ৭ই মার্চ

[দৈনিক পাকিস্তান, ৮ই মার্চ, ১৯৭১]

দেশ-বিদেশ থেকে সাংবাদিকরাও এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা শুনতে; তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা দেখে। স্বাধীনতার জন্য একটি জাতি যে কিরূপ উদ্বেল রূপ ধারণ করতে পারে তা' দেখে সে দিন দেশ-বিদেশের সবাই অবাক না হয়ে পারলেন না।

বঙ্গবন্ধু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন সবাই উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে তাঁর নির্দেশ শুনবার জন্য। দেখলেন বাংলার মানুষ শুধু

তাঁর কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি। তারপর জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন তাঁর নির্দেশাবলী। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি এখানে সম্পূর্ণ তুলে ধরা হল ঃ

"ভাইয়েরা আমার!

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বুঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও যশোরের রাজপথ আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়—তারা বাঁচতে চায়। তারা অধিকার পেতে চায়। নির্বাচনে আপনারা ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়ী করিয়েছিলেন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ বসবে— আমরা শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের মুমূর্ষু আর্তনাদের ইতিহাস, রক্তদানের করুণ ইতিহাস, নির্যাতিত মানুষের কান্নার ইতিহাস।

ঐতিহাসিক
৭ই মার্চের ভাষণ

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও গদীতে বসতে পারি নি। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারী ক'রে আইয়ুব খান দশ বছর আমাদের গোলাম ক'রে রাখল। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা দেয়া হ'ল এবং এরপর এ অপরাধে আমার বহু ভাইকে হত্যা করা হ'ল। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান এলেন। তিনি বললেন, তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবেন, শাসনতন্ত্র দেবেন—আমরা মেনে নিলাম। তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা হ'ল—আমরা তাঁকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার অনুরোধ করলাম। কিন্তু মেজরিটি পার্টির নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কথা শুনলেন না। শুনলেন সংখ্যালঘু দলের ভুট্টো সাহেবের কথা। আমি শুধু বাংলার মেজরিটি পার্টির নেতা নই—সমগ্র পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা। ভুট্টো সাহেব বললেন মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন ডাকতে। তিনি মার্চের তিন তারিখে অধিবেশন ডাকলেন।

আমি বললাম, তবুও আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে আমরা তা' মেনে নেব, এমনকি তিনি যদি একজনও হন।

জনাব ভুট্টো ঢাকা এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা হ'ল। ভুট্টো সাহেব বলে গেছেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। মওলানা নূরানী, মওলানা মুফতি মাহমুদ সহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য পার্লামেন্টারী নেতা এলেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হ'ল—উদ্দেশ্য ছিল আলাপ-আলোচনা ক'রে শাসনতন্ত্র রচনা করবো। তবে তাঁদের আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, ৬-দফা পরিবর্তনের কোন অধিকার আমার নেই, এটা জনগণের সম্পদ।

কিন্তু ভুট্টো হুমকি দিলেন। তিনি বললেন, এখানে এসে ডবল জিম্মী হতে পারবেন না। পরিষদ কসাইখানায় পরিণত হবে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের প্রতি হুমকি দিলেন যে, পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলে রক্তপাত করা হবে, তাদের মাথা ভেঙ্গে দেয়া হবে। হত্যা করা হবে। আন্দোলন শুরু হবে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত। একটি দোকানও খুলতে দেয়া হবে না।

তা' সত্ত্বেও পঁয়ত্রিশজন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য এলেন। কিন্তু পয়লা মার্চ ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন বন্ধ ক'রে দিলেন। দোষ দেওয়া হ'ল বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হ'ল আমাকে, বলা হ'ল আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্যই কিছু করা হয় নি।

এরপর বাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো। আমি শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য হরতাল ডাকলাম। জনগণ আপন ইচ্ছায় পথে নেমে এলো।

কিন্তু কি পেলাম আমরা? বাংলার নিরস্ত্র জনগণের উপর অস্ত্র ব্যবহার করা হ'ল। আমাদের হাতে অস্ত্র নাই। কিন্তু আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনে দিয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সে অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার নিরীহ মানুষদের হত্যা করার জন্যে। আমার দুঃখী জনতার উপর চলছে গুলী। আমরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যখনই দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে চেয়েছি, তখনই ষড়যন্ত্র চলেছে,—আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ইয়াহিয়া খান বলেছেন, আমি নাকি দশই মার্চ তারিখে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে চেয়েছি—তাঁর সাথে টেলিফোনে আমার আলাপ হয়েছে। আমি তাঁকে বলেছি—আপনি দেশের প্রেসিডেন্ট। ঢাকায় আসুন, দেখুন, আমার গরীব জনসাধারণকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে; আমার মায়ের কোল কিভাবে খালি করা হয়েছে। আমি আগেই ব'লে দিয়েছি, 'কোন গোলটেবিল বৈঠক হবে না, কিসের গোলটেবিল বৈঠক, কার গোলটেবিল বৈঠক? যারা আমার মা-বোনের কোল শূন্য করেছে, তাদের সাথে বসবো আমি গোলটেবিল বৈঠকে?'

তেসরা তারিখে পল্টনে আমি অসহযোগের আহ্বান জানালাম। বললাম, 'অফিস-আদালত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করুন। আপনারা মেনে নিলেন।'

হঠাৎ আমার সঙ্গে বা আমার দলের সঙ্গে আলোচনা না ক'রে এক জনের সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টা বৈঠকের পর ইয়াহিয়া খান যে বক্তৃতা করেছেন, তাতে সমস্ত দোষ আমার ও বাংলার মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। দোষ করলেন ভুট্টো, কিন্তু গুলী করা হ'ল আমার বাংলার মানুষকে—আমরা গুলী খাই, দোষ আমাদের, আমরা বুলেট খাই, দোষ আমাদের।

ইয়াহিয়া সাহেব অধিবেশন ডেকেছেন কিন্তু আমার দাবী, সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, হত্যার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা ক'রে দেখবো পরিষদে বসবো কি বসবো না। এ দাবী মানার আগে পরিষদে বসার কোন প্রশ্নই ওঠে না, জনগণ আমাকে সে অধিকার দেয় নি। রক্তের দাগ এখনো শুকায় নি, শহীদের রক্ত মাড়িয়ে ২৫ তারিখে পরিষদে যোগ দিতে যাব না।

ভাইয়েরা আমার, 'আমার উপর বিশ্বাস আছে?' (লাখো জনতা হাত উঠিয়ে 'হ্যাঁ' বলে)। 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না; মানুষের অধিকার চাই। প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারে নি। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিতে পারে নি।' আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত ক'রে এনেছিলেন। সে দিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম, রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করবো; মনে আছে? আজো আমি রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে প্রস্তুত।

আমি বলে দিতে চাই, আজ থেকে কোর্ট-কাচারী, হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোন কর্মচারী অফিসে যাবেন না—এ আমার নির্দেশ।

গরীবের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য রিক্সা চলবে, ট্রেন চলবে আর সব চলবে। ট্রেন চলবে তবে সেনাবাহিনী আনা-নেওয়া করা যাবে না। করলে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য আমি দায়ী থাকব না।

সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট সহ সরকারী-আধা সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো বন্ধ থাকবে। শুধু পূর্ব বাংলার আদান-প্রদানের জন্য ব্যাঙ্কগুলো দু' ঘন্টার জন্য খোলা থাকবে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা যেতে পারবে না। বাঙালীরা বুঝে শুনে চলবেন। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বাংলাদেশের মধ্যে চালু থাকবে, তবে সাংবাদিকরা বহির্বিশ্বে সংবাদ পাঠাতে পারবেন।

এদেশের মানুষকে খতম করা হচ্ছে, বুঝে শুনে চলবেন, দরকার হ'লে সমস্ত চাকা বন্ধ ক'রে দেয়া হবে। আপনারা নির্ধারিত সময়ে বেতন নিয়ে আসবেন। বেতন যদি না দেয়া হয়, যদি একটিও গুলী চলে, তা' হ'লে বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল—যার যা আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। রাস্তাঘাট বন্ধ ক'রে দিতে হবে। আমরা তাদের ভাতে মারবো—পানিতে মারবো। আমি যদি হুকুম দেবার জন্য না থাকি, যদি আমার সহকর্মীরা না থাকেন. আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ কিছু বলবে না। গুলী চালালে আর ভালো হবে না। সাতকোটি মানুষকে আর দাবাতে পারবা না। বাঙালীরা যখন মরতে শিখেছে—তখন কেউ তাদের দাবাতে পারবে না।

শহীদের ও আহতদের পরিবারের জন্য আওয়ামী লীগ সাহায্য কমিটি করেছে। আমরা সাহায্যের চেষ্টা করবো। আপনারা যে যা পারেন দিয়ে যাবেন।

সাত দিনের হরতালে যে সব শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেছেন, কারফিউর জন্য কাজ করতে পারেন নি—শিল্প মালিকেরা তাদের পুরো বেতন দিয়ে দেবেন।

সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা' মানতে হবে। কাউকে যেন অফিসে দেখা না যায়। এদেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ থাকবে। আপনারা আমার উপর ছেড়ে দেন—আন্দোলন কি ভাবে করতে হয়, তা' আমি জানি।

কিন্তু হুঁশিয়ার, একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের মধ্যে শত্রু ঢুকেছে, ছদ্মবেশে তারা আত্মকলহের সৃষ্টি করতে চায়। বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।

রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যদি আমাদের আন্দোলনের খবর প্রচার না করে তবে কোন বাঙালী রেডিও এবং টেলিভিশনে যাবেন না।

শান্তিপূর্ণভাবে ফয়সালা করতে পারলে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে, তা' না হ'লে নেই। বাড়াবাড়ি করবেন না, মুখ দেখা-দেখিও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আমার অনুরোধ প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায়, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেব, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়াবো ইনশাআল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। প্রস্তুত থাকবেন, ঠাণ্ডা হ'লে চলবে না। আন্দোলন ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন, আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। কারণ শৃঙ্খলা ছাড়া কোন জাতি সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না। জয় বাংলা।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ৮ই মার্চ, ১৯৭১]

বঙ্গবন্ধুর এই বক্তৃতা ঢাকা বেতার থেকে রীলে করার কথা ছিল। জনগণ উন্মুখ হয়ে বেতারের নিকট অপেক্ষা করছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ শোনার জন্য। কিন্তু সামরিক কর্তাব্যক্তির হস্তক্ষেপের ফলে সে দিন তা' করতে দেয়া হয় নি। এর প্রতিবাদে ঢাকা বেতারের প্রায় পাঁচশ বাঙালী কর্মচারী কাজ বন্ধ রেখে অফিসভবন থেকে বেরিয়ে আসেন। এমনকি অনুষ্ঠানের শেষে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর যে রেওয়াজ প্রচলিত ছিল, তাও বাজানো হয় নি। ২৫শে মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের

অধিবেশন বসবে—এই আহ্বান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৬ই মার্চ তারিখে যে বেতার ভাষণ দেন, তার জবাবে শেখ মুজিব ৭ই তারিখ সকালে এক দীর্ঘ প্রেস বিবৃতি দান করেন। এই প্রেস বিবৃতিতে তিনি বলেন ঃ

৭ই মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রেস-বিবৃতি

"১লা মার্চ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট-কালের জন্য স্থগিত ঘোষণার পর থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসাধারণকে সামরিক বাহিনীর মোকাবেলা করতে হচ্ছে। নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণ (শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র) যারা জাতীয় পরিষদ স্থগিত রাখার আকস্মিক ও অনভিপ্রেত ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ওপর বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করা হয়েছে। গত সপ্তাহে যারা প্রাণ দিয়েছেন, তারা শহীদ হয়েছেন। অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার স্বেচ্ছাচারমূলক ও অযাচিত কাজের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে যেয়েই তাঁরা শহীদ হয়েছেন। এই শহীদদের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তি বলে চিত্রিত করা সত্যের অপলাপ মাত্র। বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে এক সত্যিকারের ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের জন্য যারা দায়ী বস্তুতঃপক্ষে তারাই হচ্ছে আসল দুষ্কৃতিকারী। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গত সপ্তাহে যে ভয়াবহ অবস্থার অবতারণা করা হয়েছে, তা' দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট ঢাকা আসার একটু সময় করতেও সক্ষম হন নি। প্রেসিডেন্ট যাকে ক্ষমতার 'ন্যূনতম' প্রয়োগ বলে অভিহিত করেছেন তার ফলেই যদি হাজার হাজার লোক হতাহত হয়ে থাকে, তা' হ'লে আমাদের কি এটাই বুঝতে হবে যে, তিনি যাকে 'পর্যাপ্ত পরিমাণ' ক্ষমতার প্রয়োগ বলবেন তার লক্ষ্য হবে কি সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়া? বাংলাদেশের নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষমতার এই নগ্ন হুমকির আমি নিন্দা করছি। জাতি অনেক অর্থ ব্যয়ে সশস্ত্র বাহিনীকে অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত করেছে বিদেশী হামলা প্রতিহত করার জন্য। বেসামরিক নাগরিকদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়ার জন্য নয়। অপর অঞ্চলের উর্দিপরা সৈনিকরা যে বাড়াবাড়ি করছে, তারা দখলকারী

বাহিনীর মতো যে ভূমিকা পালন করছে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের আজ রক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন।

বলা হয়েছে যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখাকে ভুল বোঝা হয়েছে। আমি প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করতে চাই, পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য এবং একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ঘোষিত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে একটি সংখ্যালঘু দলের একক খেয়ালের প্রতি সাড়া দিয়েই কি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয় নি? আমরা ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের সুপারিশ করেছিলাম। অপর দিকে উক্ত সংখ্যালঘু গ্রুপটি চেয়েছিল মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন হোক। এই সংখ্যালঘু গ্রুপটির মতের কাছেই নতি স্বীকার করা হয়েছে এবং ৩রা মার্চ পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়েছে। কিন্তু এর পরেও সেই একই সংখ্যালঘু গ্রুপটি পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে আপত্তি উত্থাপন করেছে। প্রথমতঃ, এই সংখ্যালঘু গ্রুপ একটা অত্যন্ত আপত্তিকর বক্তব্য উত্থাপন ক'রে বলেছে যে, ঢাকা এলে এর সদস্যরা বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং তারা ডাবল জিম্মী হয়ে যাবে। এর পর এই দল থেকে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে, তারা যে সব শর্ত আরোপ করবে তা' মেনে নিলেই শুধু তারা পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে। এরপর আর এক পর্যায়ে এই সংখ্যালঘু গ্রুপের সদস্যরা জাতীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগেরও সিদ্ধান্ত নেয়। সবচেয়ে যা বিস্ময়কর তা' হ'ল এই যে, উক্ত গ্রুপের সদস্যরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়ার সাথে সাথেই আইনগত কাঠামো আদেশে আনা হ'ল একটি সংশোধনী। এতে বলা হ'ল পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই সদস্যরা ইচ্ছা করলে পদত্যাগ করতে পারবেন। কিন্তু এরপর উক্ত সংখ্যালঘু গ্রুপ সিদ্ধান্ত নিলেন পদত্যাগ না করার। এই দলের এলোপাথাড়ী ইচ্ছা অনিচ্ছা চরমে পৌঁছালো ২৭শে ফেব্রুয়ারী। সে দিন এই দল থেকে ঘোষণা করা হ'ল যে, এই দলটির অংশগ্রহণ ছাড়া যদি পরিষদের অধিবেশন বসে, তা' হ'লে এই দল এক গণ-আন্দোলন শুরু করবে। এই দল এতদূর পর্যন্ত বলতে পারল যে, পরিষদের অধিবেশনে যারা যোগদান করবে, তাদের ওপর জনগণ পূর্ণ প্রতিশোধ নেবে এবং জনগণ

যদি প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হয়, তা' হ'লে এই দলটিই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই দলটি থেকে আরও হুমকি দেয়া হয় যে, এই দলের কোন সদস্য যদি পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করে তা' হ'লে দলীয় কর্মীরাই তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের পার্লামেন্টারী পার্টি ঢাকায় সমবেত হন এবং পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও পরিষদ সদস্যরা ঢাকায় আসতে শুরু করেন।

প্রধান নির্বাচনী কমিশনারও ঢাকা এসে পৌঁছান এবং ২রা মার্চ পরিষদের মহিলা সদস্যদের নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের জন্য প্রেসিডেন্টের নিজেরও ১লা মার্চ ঢাকা আসার সম্ভাবনা ছিল। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী আমরা এ পর্যন্তও বলেছিলাম যে, কোন সদস্য ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কিছু পরিষদে উত্থাপন করলে আমরা তা' মেনে নেবো। কিন্তু সে প্রস্তাবও উপেক্ষা করা হয় এবং তা' করা হয় সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত-ভাবেই। পয়লা মার্চ এক বেতার বিবৃতিতে আকস্মিক ও অহেতুকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এ জন্য অজুহাত দেখানো হয়, সমঝোতা সৃষ্টির জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। এ কথাও বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ চলছে। বাংলাদেশের মানুষ কি এর থেকে মনে করতে পারে না যে, একটি অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘু দলের নির্দেশে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে? তারা কি যুক্তি-সঙ্গত ভাবেই ভাবতে পারে না যে, একটি সংখ্যালঘু গ্রুপ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিকে ব্যাহত করা এবং সংখ্যাগুরু জনসাধারণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে? দ্রুত সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে এ সব সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। এতে প্রমাণ হয়, 'রাজনৈতিক বিরোধ' অচিরেই 'সামরিক বিরোধের' রূপ নিচ্ছে, যদি না সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু নির্দেশের কাছে মাথা নত করে।

আওয়ামী লীগ কোনভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করছে এ অভিযোগের জবাবেই আমি এ সব কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করলাম। এ ধরনের বাধা সৃষ্টি থেকে যাদের ফায়েদা হতে পারে, সংখ্যাগুরু দল তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। দেশের জনসাধারণ এবং কার্যতঃ সারা

বিশ্বের কাছেই আজ একথা পরিষ্কার যে, পশ্চিমাঞ্চলের একটি সংখ্যালঘু গ্রুপ ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং ক'রে চলেছে। দেখা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট নিজে এই সংখ্যালঘু চক্রটির নির্দেশে নতি স্বীকার করাকেই তাঁর নৈতিক কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন। একটি সংখ্যালঘু চক্র যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে বানচাল করার জন্য কায়েমী স্বার্থের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়, তবে গণতান্ত্রিক জীবন-ব্যবস্থা কায়েম কিংবা জন-সাধারণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত যদি গণতান্ত্রিক জীবন-ব্যবস্থাই বানচাল এবং প্রস্তাবিত ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ হয় তবে তার দায়িত্ব এই সংখ্যলঘু চক্র এবং তার সাথে চক্রান্তকারীদেরই বইতে হবে।

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা এটা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি, বাংলাদেশে আমরাই ক্ষমতার বৈধ উৎস। গত সাত দিনের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের সর্বত্র সরকারের সমস্ত শাখা আমাদেরকে বৈধ ক্ষমতার উৎস হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং আমাদের নির্দেশাবলী মেনে চলেছে। প্রেসিডেন্ট ও ইসলামা-বাদস্থ সরকারকে এই মূল সত্য মেনে নিতে হবে। কাজেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ না করা বাংলাদেশের জনগণের ঘোষিত ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

এরপর আমাদের আসতে হয় আগামী ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের ঘোষণা সংক্রান্ত প্রশ্নে। আমরা নিজেরাই বারবার শীঘ্র অধিবেশন আহবানের জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলেছি। কিন্তু আজ এক অস্বাভাবিক ও মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশের বেসামরিক জনগণকে সামরিক শক্তির সাহায্যে মোকাবিলা করার নীতির অনুসরণে প্রকৃতপক্ষে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ হতাহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ও বিশ্বের সর্বত্র সুবিবেচক জনগণসহ সবদিক থেকেই এই গণহত্যা বন্ধ করতে হবে বলে আওয়াজ তোলা হচ্ছে।

জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ভীতিপ্রদ পরিবেশে কাজ করবেন, এটা আশা করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও

অস্ত্র আমদানী সহ এই মোকাবিলাজনিত অবস্থা বজায় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই নির্যাতনের পরিবেশ অব্যাহত থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে বেসামরিক জনতার ওপর প্রতিদিন সামরিক বাহিনীর গুলীবর্ষণের খবর আসতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত সদস্যরা বন্দুকের মুখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের বিষয় বিবেচনা করবেন, এটি আশা করা যায় না।

যদি প্রেসিডেন্ট আন্তরিকভাবে কামনা করেন যে, জাতীয় পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সার্বভৌম পরিষদ হিসেবে কাজ করবে, তা' হ'লে অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাটি গ্রহণ করতে হবে ঃ

(ক) অবিলম্বে সকল সৈন্যকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে।

(খ) বেসামরিক জনগণের ওপর গুলীবর্ষণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, যাতে এখন থেকে একটা বুলেটও ছোড়া না হয়।

(গ) সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং দেশের পশ্চিম অংশ থেকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য আমদানী অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

(ঘ) বাংলাদেশে সরকারের বিভিন্ন শাখায় সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চলবে না এবং সরকারী অফিসার ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আক্রোশজনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হবে।

(ঙ) আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ কেবলমাত্র পুলিশ ও বাঙালী ই. পি. আর. বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করতে হবে। যখনই প্রয়োজন হবে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের উক্ত কাজে সহায়তা করবেন।

(চ) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

(ছ) অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

যদি সামরিক মোকাবিলা চলতে থাকে এবং যদি আমাদের নিরস্ত্র জনগণের ওপর বুলেট নিক্ষেপ অব্যাহত থাকে, তবে সন্দেহের কোন অবকাশ না রেখে আমি বলতে চাই যে, সে অবস্থায় কোন জাতীয় পরিষদই কাজ করতে পারে না।

আমাদের জনগণ ইতিমধ্যেই বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদেরকে আর উপনিবেশ অথবা বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেবেন না। তাঁরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেছেন। আমাদের অর্থনীতিকে অবশ্যই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের মেহনতী জনগণকে অনাহার, রোগ ও বেকারত্ব থেকে বাঁচাতে হবে। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার লাখ লাখ লোককে পুনর্বাসনের কাজ এখনো বাকী রয়েছে। যদি শাসকগোষ্ঠী এ সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করে, তা' হ'লে মুক্তির জন্য দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে জনগণও প্রস্তুত। যে মুক্তির জন্য অনেক শহীদের রক্ত ঝরেছে এবং যার জন্য বহুলোক চরম আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন, জনগণের মুক্তির সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছার সংগ্রামকে নেতৃত্ব দিতে আমরা প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। শহীদদের রক্ত কখনও বৃথা যাবে না।

আমাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমাদের বীর জনগণ অদম্য সাহস ও সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বীরত্বের সাথে বুলেটের মোকাবিলা করেছেন এবং সুপরিকল্পিতভাবে সান্ধ্য-আইন ভঙ্গ করেছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং বাঙালী ও তথাকথিত অবাঙালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দালাল উস্কানি-দাতা ও সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার জন্য আমি আমাদের জনগণ ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিও অভি-নন্দন জানাচ্ছি। আমি আবার বলছি যে, বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রতিটি লোকই বাঙালী এবং তার শারীরিক নিরাপত্তা, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব এবং যে কোন মূল্যে তা' রক্ষা করতে হবে। আমরা গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, যখন থেকে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা সতর্ক দৃষ্টি রাখার ও পাহারা দেওয়ার কাজ হাতে নিয়েছেন, তখন থেকে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি।

আমাদের সংগ্রাম অবশ্যই চলবে। সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানো এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই লক্ষ্য অর্জিত না হয়, আমাদের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। ১৯৭১

সালের ৮ই মার্চ থেকে এক সপ্তাহের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ঃ (১) খাজনা-ট্যাক্স বর্জন আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। (২) সেক্রেটারিয়েট, সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, হাইকোর্ট ও বাংলাদেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। মাঝে মাঝে প্রয়োজন বোধে এ ব্যাপারে কোন কোন অংশকে হরতালের আওতামুক্ত ঘোষণা করা হবে। (৩) রেলওয়ে ও বন্দরগুলো চালু থাকতে পারে। কিন্তু যদি জনগণের উপর নির্যাতন চালানোর উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশের জন্য রেলওয়ে ও বন্দরগুলোকে ব্যবহার করা হয় তা' হ'লে রেলওয়ে শ্রমিক ও বন্দর শ্রমিকরা সহযোগিতা করবেন না। (৪) বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলোকে আমাদের বিবৃতিসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রচার করতে হবে এবং তারা জনগণের আন্দোলন সম্পর্কে খবর গোপন করতে পারবে না, অন্যথায় এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে বাঙালীরা সহযোগিতা করবেন না। (৫) কেবল স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাঙ্ক টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে। (৬) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। (৭) ব্যাঙ্কগুলো স্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে দেশের পশ্চিম অংশে অর্থ পাচার করতে পারবে না। (৮) প্রতিদিন সকল ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করতে হবে। (৯) অন্য সকল ক্ষেত্র থেকে হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে যে কোন সময় উপরোক্ত ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক হরতাল ঘোষণা করা হতে পারে। (১০) প্রতি ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা ও জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি ক'রে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ৮ই মার্চ, ১৯৭১]

টিক্কা খানের ঢাকা আগমন

সে দিন অপরাহ্ণেই পূর্ব পাকিস্তানের নয়া গভর্নর হয়ে টিক্কা খান এসেছিলেন। আগের দিন অর্থাৎ ৬ই মার্চ তাঁর নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর অফিসার ছাড়া কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তাঁকে বিমান বন্দরে সম্বর্ধনা জানান নি। অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান তখন ঢাকায় ছিলেন। তিনি মুজিবের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। ৭ই মার্চের সন্ধ্যায় তিনি শেখ সাহেবের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সামরিক

শাসন প্রত্যাহার ক'রে অনতিবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "যখনই দেশের জনসাধারণ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়, তখনই কায়েমী স্বার্থবাদীরা জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে তৎপর হয়।" জনাব আসগর খান আরো বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসন করিবার অধিকার আছে। আমি বুঝিতে পারি না কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকট ক্ষমতা দেওয়া হইবে না।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই মার্চ ১৯৭১]

ঐ দিন গভীর রাতে প্রকাশিত এক সরকারী প্রেসনোটে স্বীকার করা হয় যে, গত কয়েকদিন প্রদেশব্যাপী হাঙ্গামায় ১৭২ জন নিহত ও ৩৫৮ জন আহত হয়েছেন। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ এর জন্য আন্দোলনকারীদের উপরই দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন। প্রেসনোটে বলা হয়ঃ

সরকারী প্রেসনোট

"পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক দুঃখজনক গোলযোগের সময় আইন কার্যকরীকরণ এজেন্সিগুলি শত শত ও সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে নিহত করেছে বলে সাধারণ মনে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা' দূর করার জন্যে জনগণের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বাস্তব ঘটনা ও অবস্থাটি তুলে ধরা প্রয়োজন। গুজব, ভীতিপ্রদ, গালগল্প ও অপপ্রচারের সহজ শিকারে পরিণত জনসাধারণের অবগতি ও সন্তুষ্টির জন্যে প্রকৃত অবস্থাটি তুলে ধরা প্রয়োজন। এ ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

গত ১লা মার্চে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্বঃতস্ফূর্তভাবে প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং মানুষ রাস্তায় নেমে আসে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের ইচ্ছানুযায়ী ২রা মার্চ সকাল থেকে হরতাল শুরু হয়। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতা সমাজ-বিরোধী কাজ, যেমন লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও ছুরিকাঘাত চালাতে থাকে। এতে সমাজ-বিরোধী দুষ্কৃতিকারীরা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। তারাও ব্যাপকহারে অরাজকতার সৃষ্টি করে। এইসব সমাজ-বিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম যেমন লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হত্যার আশঙ্কায় পাহারারত সামরিক বাহিনীর ইউনিটগুলো ছাড়াও ২রা মার্চ ব্যারাকে অবস্থানরত

সৈন্যবাহিনীকে অবস্থা মোকাবিলার জন্য ডাকা হয়। বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অনুরোধেই তারা দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে। জিন্নাহ্ এভিনিউ, নবাবপুর রোড, ঠাটারী বাজার ও ঢাকার অন্যান্য এলাকার অবস্থা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার প্রেক্ষিতেই তারা সৈন্যবাহিনীকে অনুরোধ জানান।

ঐ সন্ধ্যায় সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। সান্ধ্য আইন রাত ৯টা থেকে পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত বলবৎ ছিল। সান্ধ্য আইন কার্যকরী করার ব্যাপারে পুলিশ এবং ই. পি. আর-কে সহযোগিতা করার জন্য সৈন্যবাহিনী রাত ৯টার আগে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয় নি।

প্রদেশব্যাপী সপ্তাহব্যাপী গোলযোগের জন্য ১৭২ জন লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং ৩৫৮ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী, ফিরোঘাট কলোনী এবং অয়ারলেস কলোনী থেকে দাঙ্গাকারীদের মধ্যে ৭৮ জন মারা যায় এবং ২০৫ জন আহত হয়।……”

[দৈনিক পূর্বদেশ, ৮ই মার্চ, ১৯৭১]

পরদিন এই বিবৃতির কঠোর নিন্দা করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ। বিবৃতিতে তিনি বলেন: “সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ তাদের প্রেসনোটে যে কথা বলেছেন, আমি তার নিন্দে করছি। প্রেসনোটে হতাহতের সংখ্যা যে কেবল একেবারে নগণ্য ক'রে দেখানো হয়েছে তা' নয়, বরং কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো বলা হয়েছে যে, নিহতের সংখ্যা ১৭২ এবং আহতের সংখ্যা ৩৫৮ এবং এই হত্যাকাণ্ড ভীতি ও নিন্দা প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সরকারী প্রেসনোটের প্রতিবাদে তাজউদ্দিন

নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর ব্যাপক গুলী চালানোর ফলে কেবল মাত্র বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেই যে অপরিমেয় ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে তা' নয়, বরং সর্বত্রই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষের মধ্যেই তা' ব্যাপক ক্ষোভের উদ্রেক করেছে। কেবল মাত্র লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ ক্ষেত্রেই গুলী চালানো হয়েছে বলে প্রেসনোটে যে কথা বলা হয়েছে, তা' জানা ঘটনাসমূহের বা প্রকৃত ঘটনাসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বাধিকারের দাবীতে শান্তিপূর্ণভাবে যারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল, তাদেরই মিছিলের উপর গুলী চালানো

হয়েছে। প্রেসনোটে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজের জন্য পুলিশ যথেষ্ট ছিলনা বলে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা' যে কতখানি মিথ্যে, তা' প্রমাণিত হয়েছে সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর, পুলিশ ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার মাধ্যমে। এছাড়া আজ মহররমের মিছিলে আওয়ামী লীগের সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার দায়িত্ব পালনের যে নজির সৃষ্টি করেছেন তা' থেকেই প্রমাণিত হয় যে, জনগণকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে কিভাবে নিয়োজিত করতে হয়। পুলিশ ও ই. পি. আর. বাহিনীই গুলী চালিয়েছে বলে প্রেসনোটে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে কথা বলা হয়েছে আমি তার তীব্র নিন্দা করছি। বাঙালীর বিরুদ্ধে বাঙালীকে লেলিয়ে দেবার জন্য এবং বাঙালীদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টির জন্যই গুলী চালানোর অপবাদ পুলিশ ও ই.পি.আর-এর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। বাঙালীরা আজ সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ও একক শক্তিতে বলীয়ান হয়েছে এবং এ ধরনের ভুল বুঝাবুঝি ও সন্দেহ সৃষ্টির কোন প্রচেষ্টাই আজ আর সফল হবে না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য যে, পুলিশ যে সব এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সে এলাকার কোথাও একটিও গুলী হয় নি। এক্ষেত্রে আমি একথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি যে, জওয়ানদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে ঘোষণা করার পরও এখনও বিভিন্ন এলাকায় তাদেরকে দেখা যাচ্ছে। অবিলম্বে সকল সৈন্যকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে আবার আমরা দাবী জানাচ্ছি।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ৯ই মার্চ, ১৯৭১]

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু রমনার মাঠে যে নির্দেশ ঘোষণা করেছেন ৮ই মার্চে তাজউদ্দিন আহমদ তা' ব্যাখ্যা ক'রে বিভিন্ন অফিস, ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠানে কি ভাবে ও কত সময় ধরে হরতাল পালিত হবে এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠান হরতালের আওতায় পড়বে না পড়বে তার পূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। জনাব তাজ-উদ্দিন আহমদ প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও কর্মসূচীর বিশ্লেষণ নিম্নে দেয়া হ'ল :

তাজউদ্দিনের ব্যাখ্যা

(১) ব্যাঙ্ক : ব্যাঙ্কের কার্যপরিচালনার জন্য সকাল ৯টা থেকে সাড়ে বারটা পর্যন্ত ব্যাঙ্কগুলো খোলা থাকবে এবং প্রশাসনিক কাজের

জন্য বিকেল তিনটা পর্যন্ত চালু থাকবে। অর্থ-কড়ি জমা, বাংলাদেশের মধ্যে আন্তঃব্যাঙ্ক ক্লিয়ারেন্স এবং নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে অর্থ আদান-প্রদান চলবে ঃ

(ক) পূর্ববর্তী সপ্তাহের ভাতা ও বেতন প্রদান।

(খ) যাঁরা এক হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন।

(গ) মিল-ফ্যাক্টরীগুলো পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কেনার জন্য অর্থ প্রদান করা যাবে। চিনি কলগুলো চালানোর ইক্ষু ক্রয় আর চটকল ইত্যাদির পরিচালনার জন্য পাট কেনা এর অন্তর্ভুক্ত। স্টেট ব্যাঙ্কের মারফৎ বা অন্য কোনভাবে বাংলাদেশের বাইরে টাকা-পয়সা পাঠানো যাবে না।

(২) শুধু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর কাজ চালানোর সুবিধার জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

(৩) শুধু বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ই. পি. ওয়াপদার প্রয়োজনীয় দফতরগুলো খোলা থাকবে।

(৪) শুধু সার ও শক্তিচালিত পাম্পগুলোর ডিজেল সরবরাহের নিশ্চয়তার জন্য ই.পি.এ.ডি.সি. চালু রাখা হবে।

(৫) ব্রিকফিল্ডের জন্য কয়লা ও পাটবীজ ও ধানবীজ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু থাকবে।

(৬) খাদ্য আনা-নেয়ার কাজ অব্যাহত রাখা হবে।

(৭) উপরে উল্লিখিত যে কোন উদ্দেশ্যে চালান পাশ করার জন্য ট্রেজারী ও এজি অফিস খোলা রাখা হবে।

(৮) ঘূর্ণিদুর্গত এলাকাসমূহে সাহায্য, পুনর্বাসন কাজ অব্যাহত থাকবে।

(৯) চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, ও বাংলাদেশে যে কোন স্থানে টাকা-পয়সা পাঠানোর জন্য পোস্ট ও টেলিগ্রাম অফিস খোলা রাখা হবে। বাংলাদেশের বাইরে প্রেস টেলিগ্রাম পাঠানো যাবে। পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে।

(১০) বাংলাদেশের সর্বত্র ই.পি.আর.টি.সি-র কাজ চালিয়ে যাবে।

(১১) পানি ও গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা হবে।

(১২) স্বাস্থ্য ও নিষ্কাশণের কাজ চলবে।

(১৩) শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে পুলিশ তাদের কর্তব্য পালন ক'রে যাবে। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবীদের প্রয়োজনে তাদের সহায়তা দান করতে হবে।

(১৪) আধা-সরকারী সংস্থার মধ্যে যেগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে, সেগুলি ছাড়া অন্যান্য আধা-সরকারী সংস্থাগুলোতে হরতাল পালন করা হবে।

(১৫) যে সকল প্রতিষ্ঠান ধর্মঘট থেকে অব্যাহতি পাবে বলে ঘোষিত হয়েছিল, সেগুলো সম্পর্কে আগের নির্দেশই কার্যকরী থাকবে।

[দৈনিক পূর্বদেশ, ৯ই মার্চ, ১৯৭১]

ঐ দিন পি. ডি. পি. প্রধান জনাব নূরুল আমীন এক বিবৃতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে শেখ মুজিবের সাথে বসার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান। খবরে বলা হয়ঃ "পি. ডি. পি. প্রধান জনাব নূরুল আমীন আজ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতির ব্যাপারে একটা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলাপ-আলোচনা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আবেদন জানান।

নূরুল আমীনের বিবৃতি

তিনি বলেন, একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অকস্মাৎ স্থগিত ঘোষণার ফলেই এই গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়। অথচ এই জাতীয় পরিষদের অধিবেশনই ছিল নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম পর্যায়।

জনাব নূরুল আমীন দুঃখ ক'রে বলেন যে, ৬ই মার্চের ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যা বর্তমান অবস্থার অনুকূল নয়। সারা প্রদেশে রাজপথ যখন মানুষের রক্তে রঞ্জিত ঠিক তখন প্রেসিডেন্ট এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক তথ্যপূর্ণ নয়।"

[ঐ]

বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরদিন নূরুল আমীনের নাম ঘৃণার সাথেই উচ্চারিত হবে। বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ডে এই ঘৃণিত ব্যক্তির হাত ছিল। উনসত্তরের গণ-আন্দোলনে তিনি তাঁর অতীত

শোধরানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে একেবারেই সাময়িক পরিবর্তন। সত্তরের নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু জনগণের সাথে তাঁর যোগ কোনদিন ঘনিষ্ঠ হ'তে পারে নি। তাঁর উপরের ভাষণে তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের আচরণে অস্থিরতা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে। কিন্তু ইয়াহিয়া বা পশ্চিমা কায়েমী স্বার্থবাদীদের আচরণে কোনদিন তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে নি। এ কারণেই যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তখন নুরুল আমীন ও তদীয় কয়েকজন অনুসারী ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে হাত মিলিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে রাজত্ব কায়েমের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। বাংলার মানুষ ও মাটি ঘৃণার সাথেই এইসব পরগাছাকে বর্জন করেছে।

৮ই মার্চে ঢাকার পরিস্থিতি

যা হোক, শেখ মুজিবের নির্দেশানুযায়ী ৮ই মার্চ থেকে প্রতিটি গৃহশীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রতিটি শহর ও গ্রামে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। সরকারী, আধাসরকারী, অফিস-আদালত, কোর্ট-কাচারী বন্ধ থাকে। তবে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাংলাদেশের ভেতর টেলিফোন ও ট্রাঙ্ককল ব্যবস্থা, বিদেশে সংবাদ পাঠাবার বিশেষ ব্যবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে চালু থাকে। ব্যাঙ্কও চালু থাকে, তবে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাচার বন্ধ রাখা হয়। প্রদেশের সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, সব রকম কর প্রদানও স্থগিত রাখা হয়। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যে কোন প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসহযোগিতা দেখান হয়।

বিচারপতি কর্তৃক টিক্কা খানের শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি

এই দিন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে। লেঃ জেঃ টিক্কা খান প্রাদেশিক গভর্নর হিসাবে শপথ নেবেন, কিন্তু পূর্ব বাংলার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। কোন বিচারপতিই টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে রাজী হলেন না। এ এক চরম অবমাননা। বাধ্য হয়ে এই ঘৃণিত সেনানায়ককে কেবল মাত্র 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসকের দায়িত্ব পালনেই তৃপ্ত থাকতে হয়েছে—গভর্নর হবার দুর্বার লোভ তাঁর আপাততঃ চরিতার্থ হ'ল না।

পরদিন ৯ তারিখে পল্টনে মাওলানা ভাসানী একটি ভাষণ দেন। তাঁর পাশে ছিলেন জাতীয় লীগের প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে পল্টন ময়দানে এই বৃদ্ধ জননেতা ঘোষণা করেন, "শেখ মুজিবের নির্দেশিত ২৫শে মার্চের মধ্যে কোন কিছু করা না হইলে আমি শেখ মুজিবের সহিত মিলিয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল গণ-আন্দোলন শুরু করিব।"

ভাসানী একথা উপলব্ধি করলেন যে, দেশ আজ এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন। বাংলাদেশকে বাঁচাতে হ'লে নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজন। ঐক্যবদ্ধভাবেই পশ্চিমা শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেনঃ 'মুজিব আমার ছেলের মত। আর ছেলে যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, পিতৃতুল্য হয়ে তিনি কি নিশ্চুপ থাকতে পারেন?'

ভাসানী সেদিন শেখ মুজিবের আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করে জনগণকে তাঁর নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানান। ন্যাপ প্রধান সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে পুনরায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন। তিনি ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য।

মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন সহ তাঁর প্রশংসা ক'রে বলেন, "আপনারা শেখ মুজিবকে কেউ অবিশ্বাস করবেন না। মুজিবকে আমি ভালো ক'রে চিনি। তাঁকে আমি রাজনীতিতে হাতেখড়ি দিয়েছি। তিনি ছিলেন আমার সবচেয়ে সুদক্ষ প্রাইভেট সেক্রেটারী।"

তুমুল করতালির মধ্যে তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, "পূর্ব বাংলা স্বাধীন হবেই, পাকিস্তান আর অখণ্ড রাখবো না। ইয়াহিয়ার বাপেরও ক্ষমতা নাই এই স্বাধীনতাকে ঠেকায়।"

এই সভায় জাতীয় লীগের প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান অবিলম্বে শেখ মুজিবকে জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, "বাংলার মানুষ শুধু সেই জাতীয় সরকারের হুকুমই মেনে চলবে, অপর কারো হুকুম নয়।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ই মার্চ, ১৯৭১]

ঐদিন অর্থাৎ ৯ই মার্চ ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ক্যান্টিনে ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এক জরুরী সভায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ' ঘোষণার একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক জনাব শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহ-সভাপতি জনাব আ. শ. ম. আবদুর রব এবং সাধরণ সম্পাদক জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখনকে নিয়ে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সভায় আরেকটি প্রস্তাবে বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশ জাতীয় সরকার গঠনের জন্যেও অনুরোধ করা হয়।

এদিকে জাতিসঙ্ঘের সেক্রটারী জেনারেল এবং অন্যান্য দেশের সরকার ঢাকায় এবং পূর্ব বাংলার অপরাপর অঞ্চলে অবস্থিত নাগরিকদের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাদেরকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা চালাতে থাকেন।

১০ই মার্চে বঙ্গবন্ধু সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি ঢাকাস্থ জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধিদের বাংলাদেশ থেকে অপসারণ সংক্রান্ত নির্দেশের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন ঃ "জাতিসঙ্ঘ সেক্রেটারী জেনা-

জাতিসঙ্ঘের আচরণ ও বঙ্গবন্ধু

রেল উথান্ট জাতিসঙ্ঘ কর্মচারীদের অপসারণের অনুমতি দিয়েছেন এবং এতে ক'রে বাংলাদেশে বসবাসকারীদের জান ও মাল সামরিক শক্তি যে বিপজ্জনক ক'রে তুলেছে তা' তিনি স্বীকার ক'রে নিলেন। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর অনুধাবন করা উচিত যে, শুধুমাত্র জাতি-সঙ্ঘ কর্মচারীদের সরিয়ে নিলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কারণ আজকে যে হুমকি দেখা দিয়েছে, তা' হচ্ছে গণহত্যার হুমকি ; জাতিসঙ্ঘ সনদ অনুযায়ী স্বীকৃত বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের হুমকি।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ১১ই মার্চ, ১৯৭১]

যাঁরা বলেন যে, শেখ মুজিব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব সজাগ ছিলেন না, তাঁদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে এই সব বিবৃতির উল্লেখ করা যায়। দেশে যে একটি ব্যাপক গণহত্যার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর একাধিক ভাষণে

তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এই সময়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং সমগ্র ঘটনাপঞ্জী এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায়। এই সময়ের পরিস্থিতি কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকের চোখে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এ সম্পর্কে কি বলেন আমার নিজস্ব বঙ্গানুবাদ থেকে তার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি : ..."লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আকস্মিকভাবে বরখাস্তকৃত গভর্নর আহসানের কাছ থেকে প্রদেশের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য ঢাকায় আগমন করে। গোলযোগ দমনের কাজে টিক্কা খানের পাকা হাত ছিল। কয়েক বছর আগে বেলুচিস্তানের বিশৃঙ্খলা দমনে এই লোকটি যে ভাবে কঠোর হস্ত ব্যবহার করেছিল, তার জন্য সে ইতিপূর্বে 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে আখ্যায়িত হয়েছিল। এখন তাকে পূর্ব বাংলায় সেই একই কাজ করার জন্য বলা হয়েছে এবং বিনা বাধায় এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার উপর একই সঙ্গে প্রদেশের গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে।

যা হোক, টিক্কা খানের উপস্থিতির ফলে সরকারের অনুকূলে পরিস্থিতির কোন উন্নতিই লক্ষিত হ'ল না। বরং অবস্থার আরো অবনতি ঘটল। বাঙালীদের আইন অমান্য আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠল।

সরকারী পরোয়ানা প্রদেশের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ ক'রে সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল ঢাকায় কার্যকর হয় নি। সরকারী অফিসগুলোতে ও অন্যান্য ভবনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার স্থলে কালো পতাকা উত্তোলিত হ'ল। শেখ মুজিবের নির্দেশক্রমে ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তে বাংলাদেশের স্তুতিগান প্রচারিত হতে লাগলো। এ সমস্ত সরকারী অফিসের কর্মচারিগণ প্রকাশ্যভাবে তাঁদের উর্ধ্বতন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের অবাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগ নেতার আদেশ পালন করতে লাগলেন। প্রত্যহ ঢাকায় হরতাল শেষ হওয়ার পর অপরাহ্ণ দু'টায় স্টেডিয়ামে ও অন্যান্য স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। এ সমস্ত সভায় ছাত্রনেতা ও আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাগণ বক্তৃতা করতেন। তাঁরা বক্তৃতামঞ্চ থেকে শেখ মুজিবের আদেশাবলীর ঘোষক হিসেবে কাজ করলেন। এক সুযোগে ৩৪১ জন কয়েদী আকস্মিকভাবে ঢাকা জেল থেকে পালিয়ে

এসে স্টেডিয়ামের সভায় যোগদান করে। পরে কর্তৃপক্ষের অসহায় দৃষ্টির সম্মুখেই ধৃষ্টতার সঙ্গে কয়েদখানার উর্দি পরিহিত অবস্থায় তারা রাস্তায় প্রদক্ষিণরত শোভাযাত্রায় সামিল হয়।

আন্দোলনের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা দাবীর ব্যাপকতাও বেড়ে চলল। শীঘ্রই সকলের দৃষ্টি ঢাকা ঘোড়দৌড় ময়দানের দিকে নিবদ্ধ হ'ল, যেখানে ৭ই মার্চ তারিখে শেখ মুজিব স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করবেন বলে সবাই আশা করেছিল।

নিঃসন্দেহে এমন একটা সঙ্কটকাল এগিয়ে এলো, যা ছিল সমস্ত প্রত্যাশার অতীত। প্রেসিডেন্ট দ্রুত কঠোর কর্মব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। যে ক্ষেত্রে এককালে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বিস্ফোরণ দমন এবং এর উর্ধ্ব নেতৃবৃন্দকে শক্তি দেখিয়ে সহজে বশীভূত করা, সে ক্ষেত্রে এখনকার উদ্দেশ্য হবে নির্মমভাবে বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করা। রাজনৈতিক বিকল্প ব্যবস্থার কথা প্রেসিডেন্টের মনকে অযথা ভারাক্রান্ত করে নি। রাজনৈতিক বিকল্প ব্যবস্থাগুলোতে জড়িত ছিল বিনা সংগ্রামে পরাজয় স্বীকারজনিত মনোভাবের গন্ধ এবং ইয়াহিয়া খানের পক্ষে পশ্চাদপসরণের উপায় ছিল না।

গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আরেকবার তাঁকে জোরের সঙ্গে সমর্থন জানালেন। অকুস্থল ঢাকায় যে লোকটি ছিল, সেই টিক্কা খানের কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া গেল। 'আমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সামরিক বাহিনীর লোক ও রণসম্ভার দেওয়া হ'লে আমি ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বাঙালীদেরকে ঠাণ্ডা ক'রে দেব।' প্রেসিডেন্ট এই যুক্তিতে কোন ত্রুটি দেখতে পেলেন না। এ কথা প্রেসিডেন্টের ধারণার অতীত ছিল যে, বাঙালীরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মরণ ছোবলকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে। তাই তাদের ভাগ্যে রয়েছে মৃত্যু। ঘটনার পরিণতি যাই হোক, সেনাবাহিনীকে তার নিজের অধিকার বজায় রাখতেই হবে। পূর্ব বাংলার মানুষকে আচ্ছা ক'রে শিক্ষা দিতেই হবে।

ইয়াহিয়া খান কি করবেন তা' ৫ই মার্চের অপরাহ্নে তাঁর মনে স্পষ্ট হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল হবে প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তির যোগান দেওয়া, প্রস্তুতির জন্য সময় নেওয়া এবং যথোপযুক্ত মুহূর্তে মরণ

আঘাত হানা। সেই অনুসারে তিনি আকাশ-পথে ব্যাপকভাবে সমরোপকরণ পাঠাবার আদেশ দিলেন। সম্ভাব্য যুদ্ধ আইন আদেশ বলবৎ করা হ'ল। পরদিন তিনি বেতারে ঘোষণাও করলেন যে, যেহেতু পরিষদের অধিবেশন মুলতবী সম্পর্কে 'ভুল বুঝাবুঝি' হাঙ্গামাকারী শক্তিগুলোর সমবেত চীৎকারে পরিণত হয়েছে, সেইহেতু প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে তিনি এই দুর্ভাগ্যজনক অচলাবস্থার মীমাংসা করাকে তাঁর অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করেন এবং ২৫শে মার্চকে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের নতুন তারিখ রূপে নির্ধারিত করেন।

স্পষ্টতঃ ইয়াহিয়া খান কেবল ঘোড়দৌড় ময়দানে সভার প্রাক্‌কালে শেখ মুজিবের অস্ত্রকে ভোঁতা ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যেখানে শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন বলে সবাই আশা করেছিল। এটা ছিল সুপরিকল্পিত জুয়াখেলা। অন্ততঃ এই সময়ে তিনি হিসাবে ভুল করেন নি।

মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগ ও ওয়ার্কিং কমিটি এবং এই দলের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ ফাঁদে আটকা পড়লেন। ঘোড়দৌড় ময়দানের সভায় সম্মিলিত জনগণের অনেককে হতাশ ক'রে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা স্পষ্টতঃ ঘোষিত হয় নি। তার পরিবর্তে শেখ মুজিব 'স্বাধিকার অর্জন'-এর জন্য আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যে, 'এবারের সংগ্রাম—মুক্তির সংগ্রাম' এবং 'এবারের সংগ্রাম—স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই আন্দোলন ইয়াহিয়া খানের শাসন-ব্যবস্থার কাছে যতই ধ্বংসাত্মক ও অপ্রীতিকর মনে হোক না কেন, এটা পূর্ব বাংলার সামরিক প্রস্তুতির জন্য আকাঙ্ক্ষিত সময় দিয়েছিল।

জনগণের একজন বিপ্লবী নেতা হিসাবে আওয়ামী লীগ প্রধান যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, তার প্রতি তাঁর আস্থা থাকলে তিনি টিক্‌কা খানের আত্মসমর্পণের দাবী ক'রে তাঁকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার জন্য দৃঢ় মনোভাবাপন্ন লাখ লাখ বাঙালীকে চার মাইল দূরে অবস্থিত পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনানিবাসে পাঠাতেন। বাঙালীরা তা' করার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করার জন্য সানন্দে কয়েকশো লোক জীবন বিসর্জন দিত। তখন ন্যূনতম রক্তপাতে বাংলাদেশ বাস্তবে রূপ লাভ করত—

পরবর্তীকালে কিছুতেই লাখ লাখ লোক নিহত হত না এবং সেনাবাহিনীর বর্বরতার শিকার হয়ে অগণিত লোক দেশত্যাগ করত না।"

[বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা, পৃঃ ১০৯-১১৩]

ম্যাসকারেনহাস আরো বলেছেন ঃ "৩রা ও ২৫শে মার্চের মধ্যে সেনা-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বাঙালী সদস্যগণ পৃথকভাবে তিনবার শেখ মুজিবের নির্দেশ লাভের জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কেননা যা ঘটতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে তাঁদের কোন সংশয় ছিল না। প্রতিবারই শেখ মুজিব তাঁদের সঙ্গে সময়োচিত ব্যবহার করেছেন কিংবা মামুলি কথা শুনিয়ে বিদায় ক'রে দিয়েছেন। আমার তো মনে হয় না, এই সাহসী ও আত্মত্যাগকারী লোক-গুলো, যাঁরা এখন মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করছেন, কখনও এই অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাবেন। রাজনীতিবিদগণ যতই তাঁদের পেছনের দিকে চলুন না কেন, এই লোকগুলো এবং তাঁদের মত সাহসী যে সব ছাত্র তাঁদের পাশে থেকে সংগ্রাম ক'রে যাচ্ছেন তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধী-নতা সংগ্রামে প্রকৃত বীর হিসাবে পরিচিত হবেন এবং পরিশেষে তাঁরাই নতুন প্রজাতন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক হবেন।" [ঐ, পৃঃ ১১৪]

৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে ম্যাসকারেনহাস বলেছেন ঃ "এবার ৭ই মার্চের কথায় ফিরে আসা যাক। সেদিনকার ময়দানের সভায় বাঙালীদের সংগ্রামের একটি নাটকীয় মোড় লক্ষিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জনগণ যা আশা করেছিল তা' হয় নি। শেখ মুজিবুর রহমান 'স্বায়ত্তশাসন' অর্জনের পথে ব্যবস্থা গ্রহণের একটি কর্মসূচী দেওয়ার ওয়াদা করেন। কিন্তু সভায় সমবেত দশ লক্ষাধিক লোক শুনতে চেয়েছিল আর কিছু—স্বাধীনতার ঘোষণা। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সারা পূর্ব বাংলা ক্রোধে ফেটে পড়ছিল। ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, বাঙালীরা পরিস্থিতির এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে ; যেখানে থেকে আর ফিরে আসা যায় না। ছাত্রনেতাগণ, যাঁরা ছিলেন বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি স্পন্দনশীল, প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারকার্য চালালেন। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এবং অবশিষ্ট সকলের সঙ্গে সামিল হওয়ার জন্য চরমপত্র দিলেন। এহেন পরিস্থিতিতে জনসাধারণ ঘোড়দৌড় ময়দানে সমবেত হয় এবং

তাদের দৃঢ় সংকল্পের অবলম্বনরূপে তারা তাদের সঙ্গে শর্টগান, তরবারি, ঘরের-তৈরী বর্শা, বাঁশের লাঠি প্রভৃতি বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে। মাঠে একটি পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর একটি লোকও দেখা যায় নি।

সেনাদলের উপস্থিতির একটি মাত্র সাক্ষ্য দেখা গিয়েছিল, একটি সবুজ পিঙ্গল বর্ণের হেলিকপ্টার, যা গাছের উপর দিয়ে অবিরামভাবে উড়ছিল। সেনাবাহিনীর আবির্ভাব কিছু লোককে বিচলিত করতে পারে এই আশায় হেলিকপ্টারটি উড়লেও জনগণকে মোটেই বিচলিত হতে দেখা যায় নি। সম্ভবতঃ সেদিনের জন্য একবার হেলিকপ্টারটির আরোহীরা জনগণের চেয়ে অধিক ভীত হয়ে পড়েছিল। নিরাপদ দূরত্ব থেকে সেদিন জনসমুদ্রে যে দৃঢ় প্রতিবাদ তারা স্বচক্ষে দেখেছিল, তা' তাদের মারাত্মক দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। যদি এই জন সমুদ্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান করত, তা' হলে ট্যাঙ্ক কিংবা কামান-বন্দুক নিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করা সম্ভব হ'ত না। এই বিপদের কথা টিক্কা খানকে জানানো হয়। হেলিকপ্টারটির আবির্ভাবের কারণ ছিল তাই।

ময়দানে সমবেত জনসমুদ্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সভামঞ্চের উপর, যেখানে যে কোন মুহূর্তে শেখ মুজিবের উপস্থিতি আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু 'বঙ্গবন্ধু', যাকে সবাই আদরের সাথে এ নামে ডেকে থাকে, সভায় উপস্থিত হতে বিলম্ব করছিলেন।

সভায় দাঁড়িয়ে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে ৪-দফা দাবী পেশ করবেন এবং প্রদেশব্যাপী 'অহিংস আন্দোলনের' নেতৃত্ব দান করবেন, যা নিশ্চিতভাবে বাঙালীদের দৃঢ় সংকল্পের কথা প্রকাশ করবে। এই চার দফা দাবী হ'ল ঃ

(১) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

(২) সামরিক বাহিনীর সমস্ত লোককে অবিলম্বে ছাউনিতে ফেরত নিয়ে যেতে হবে।

(৩) জীবনহানির তদন্ত করতে হবে এবং

(৪) অবিলম্বে অর্থাৎ ২৫শে মার্চ পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

দাবীগুলো ছিল আপোষ জাতীয়। এগুলোর লক্ষ্য অপরিবর্তনীয়

থাকবে—যেমন, জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার—কিন্তু এর পদ্ধতি হবে অহিংস।

অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে শেখ মুজিবের বিশ্বাসের কারণ, তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, তাঁর হাতে জনগণের ক্ষমতারূপ শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে। তাঁর ভুল ছিল এই যে, তিনি প্রেসিডেন্টের অভি-প্রায়কে সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি এবং সেইজন্যই তিনি সেই চরম অস্ত্রের সবচেয়ে বাস্তব ব্যবহার করতে সামগ্রিকভাবে সফল হন নি।

আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটি শেখ মুজিবের পরিকল্পনাকে অনু-মোদন করতে দ্বিধা করেন নি। স্পষ্টতঃ এই ব্যবস্থা আরেকটি মধ্যপন্থা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু বাইরে অপেক্ষমান ছাত্রনেতাগণ এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে স্পষ্টতঃ নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। ঘোড়দৌড় ময়দানে যাওয়ার আগে শেখ মুজিব তাঁদের শান্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি।

শেখ মুজিব একজন শক্তিশালী বক্তা। সেদিন ঘোড়দৌড় ময়দানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি সব কিছুই ব্যবহার করেছেন—যথার্থ শব্দ, প্রজ্ঞা এবং বজ্রধ্বনি। কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তার সঙ্গে জনগণের প্রত্যাশার মিল ছিল না। বক্তৃতার সময় যদিও তারা মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছিল এবং যথার্থ স্থানে প্রশংসাধ্বনি উচ্চারণ করছিল, তথাপি একথা স্পষ্ট যে, তিনি জন-গণের কাছ থেকে দূরেই রয়ে গেলেন। জনগণের যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, তা' নিশ্চয়ই ঘটনার উপযোগী হয় নি। পূর্ব থেকে সুচিন্তিত বক্তৃতা শেষ করার পর তিনি কিছুক্ষণের জন্য নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বিরাট জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে এর হতাশার ভাব উপলব্ধি করলেন। তখন তিনি আবার বঙ্গবন্ধু হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর দৃষ্টি উত্তোলন ক'রে সর্বোচ্চ কণ্ঠে বললেন: "আমাদের এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। আমাদের এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা যে জন্য এসেছিল, তা' তারা পায় নি; কিন্তু শেখ মুজিব তো মুক্তি এবং স্বাধী-নতার কথা বলেছেন। এই মনোভাব নিয়েই তারা ময়দান থেকে চলে গেল এবং আওয়ামী লীগের আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচীতে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

পরদিন সেনাবাহিনীর ছাউনিগুলো ছাড়া পূর্ব বাংলার সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেল, 'জনগণের শাসন প্রবর্তিত হ'ল। জনগণ ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগে কর পরিশোধ করা বন্ধ করে দিল। ৩রা মার্চে প্রদত্ত শেখ মুজিবের নির্দেশে বাঙালী মালিকানাধীন দুটি ব্যাঙ্কে যাবতীয় অর্থ জমা হতে লাগল। তখন সরকারী কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি অবাধ্যতা লক্ষণীয়ভাবে বিস্তার লাভ করল। এই ব্যাপারে বাঙালীরা ছিল পুরোমাত্রায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ও উৎসর্গীকৃত; প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশু কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করাকে ব্যক্তিগত সম্মানের প্রশ্ন হিসেবে ধরে নিয়েছিল এবং অত্যন্ত যত্নের সাথে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশাবলী পালন করছিল। এ জাতীয় শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যের দৃশ্য আর কখন দেখা যায় নি। এ কারণেই অহিংস আন্দোলনের আজীবন ভক্ত খান ওয়ালী খান বলেছেন, ... এমনকি গান্ধীও অভিভূত হতেন।"

[প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫-১১৯]

৭ই মার্চের ঘটনাবলী ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে ম্যাসকারেনহাস পরবর্তী কালের, বিশেষ ক'রে ৮ই মার্চের ঘটনাবলীরও একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"৮ই মার্চ তারিখে যখন এই সমস্ত নির্দেশ পালিত হয়, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে দারুণ ভীতি দেখা দিল। করাচীর স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার; বিশেষ ক'রে যে সমস্ত কোম্পানির ভিত্তিকেন্দ্র পূর্ব বাংলায় অবস্থিত ছিল, সেগুলোর কাগজপত্রের মূল্য দ্রুতগতিতে নেমে এল। প্রধান শেঠেরা (ব্যবসায়ী মোগলেরা) কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিলেন—তারা কি তাদের মিলগুলো দেখাশোনার জন্য তাদের লোক পাঠিয়ে বিপদের মুখে ফেলবেন, নাকি পরিস্থিতির উন্নতির আশায় করাচীতেই অপেক্ষা করবেন। মাত্র দু'একজন লোক সাময়িকভাবে পূর্ব বাংলায় গেলেন। বাকী সবই করাচীতে রয়ে গেলেন এবং রাওয়ালপিণ্ডির সরকারকে 'তাড়াতাড়ি কিছু একটা করার' জন্য আবেদন ও বিরক্ত করতে লাগলেন।

সরকারী অফিস ও ব্যাঙ্কের প্রতি 'নির্দেশাবলী' বোধগম্যভাবেই জনসাধারণের জন্য খুব অসুবিধার কারণ হ'ল এবং খাদ্যদ্রব্য ও অতি

প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হ'ল। প্রাদেশিক অর্থনীতির পক্ষে যা অপরিহার্য, সেই রপ্তানী বন্ধ হয়ে গেল। তাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা তাজউদ্দিন আহমদ জনসাধারণের অসুবিধা দূর করবার জন্য এবং পূর্ব বাংলার অর্থনীতির ক্ষতিরোধ করার জন্য কতিপয় 'ব্যাখ্যা' ও 'অব্যাহতির' কথা প্রচার করেন। তাজউদ্দিনের 'ব্যাখ্যা' ও 'অব্যাহতিকে' বাইবেলের বাণীর মত পবিত্র বলে মনে করা হ'ল।

এ সমস্ত কর্মসূচীর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পূর্ব-বাংলার একটি সমান্তরাল আওয়ামী লীগ সরকার চালু হয়ে গেল। পাকিস্তানে এমন ঘটনা আর কখনও দেখা যায় নি।"

[প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০-১২১]

আমার অনূদিত গ্রন্থ 'বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা'র ভূমিকায় আমি বলেছি যে, ম্যাসকারেনহাসের অনেক অভিমতের সাথেই আমরা একমত হতে পারি না, যদিও বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে প্রথম ব্যাপক বর্ণনা তুলে ধরে তিনি বিশ্বে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর প্রথম প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ ও পরবর্তীকালে 'The Rape of Bangladesh' গ্রন্থটি বিশ্বের জনমত গঠনে ব্যাপক সাহায্য করেছিল। তিনি মনে করেন যে, ৭ই মার্চে শেখ মুজিব যদি স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে টিক্কা খানকে আবদ্ধ করতেন তা' হ'লে তখনই দেশ স্বাধীন হয়ে যেত এবং পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনাবসান হোত না। তাঁর এই মত সমর্থন করা যায় না। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ লোক গভর্নরের বাসবভন আক্রমণ ক'রে হয়ত দখল ক'রে নিতে পারতো—কিন্তু তার পরিণতি হোত ভয়াবহ। সাথে সাথেই কয়েক ডিভিশন সৈন্য, যারা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অপেক্ষা করছিল, তারা নিশ্চয়ই চুপ ক'রে বসে থাকতো না। তারা আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শেখ মুজিব ও অপর একটি নেতাকেও রেহাই দিত না। নেতৃস্থানীয় প্রত্যেকটি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার পূর্বেই একেবারে নির্মূল করে দিত। প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অনুসারী সমগ্র নেতা ও ছাত্রনেতাদের সেনাবাহিনী ন্যায়সঙ্গতভাবেই হত্যা করবার একটি অজুহাত পেত। বিশ্ববিবেক

এতে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে চলে যেত এবং ভারতের পক্ষেও তখন প্রকাশ্যে প্রকৃত এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অসুবিধা হোত। মনে রাখতে হবে যে, ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন, প্রশিক্ষণ দান করেছেন—কিন্তু সবই ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়েছে। ৭ই মার্চে প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে ভারত সাথে সাথেই আমাদের জন্য যুদ্ধে নামতে পারতেন না—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সুনাম ব্যাহত হোত। ৩রা ডিসেম্বরে ('৭১) ভারত যে যুদ্ধে নেমেছিলেন, সেতো আত্মরক্ষার জন্য, আক্রমণের জন্য নয়। পাকিস্তানই প্রথম আক্রমণ করে — শ্রীনগর, আম্বালা, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে বিমান আক্রমণ শুরু করেছিল। সুতরাং ৭ই মার্চ যুদ্ধ ঘোষণা করলে অবস্থা যা হয়েছিল তার চেয়ে আরো বহুগুণ ও ভয়াবহ হোত এবং স্বাধীনতা আদৌ সম্ভব হোত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ উত্থাপন করা যায়।

এ কথা ঠিক যে, ছাত্র-সমাজ ও জনগণের একটি বিরাট অংশ যুদ্ধ ঘোষণাই আশা করেছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব এমন একজন নেতা যিনি জনগণের কল্যাণেই জনগণকে পথনির্দেশ দিতে পারেন। ৭ই মার্চে তিনি তা' দিয়েছিলেন। তিনি শান্তির পথটিকে শেষ অবধি পরীক্ষা করেছেন—যখন অপর পক্ষ চরম আঘাত হেনেছে তখনই কেবল তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ইতিহাসের গতিধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বঙ্গবন্ধু যথাসময়ে ঠিক যথোচিত সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। অন্যরূপ করলে ইতিহাস অন্যরূপ হোত—স্বাধীনতা সম্ভব নাও হ'তে পারতো।

তা' ছাড়া ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু একেবারেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি এ কথা ঠিক নয়। তিনি সুপরিপক্ক রাজনীতিবিদের ন্যায় এমনভাবে ঘোষণাটি করলেন যে, শাসকপক্ষ বুঝতে পারলো যে এ ঘোষণা সংগ্রামের ঘোষণা, যুদ্ধের নয়—অন্যপক্ষে জনগণ ঠিকই বুঝলেন যে, এ ঘোষণায় যুদ্ধেরই আহ্বান জানানো হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকা-বিলা করতে হবে—ওদেরকে ভাতে মারতে হবে; পানিতে মারতে হবে—এবং এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বস্তুতঃ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ-এর বক্তৃতা, মনে হয়, এক ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবজাত বক্তৃতা। এমন যথাযথ, সংযত, শাণিত এবং প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ঘোষণা বাংলাদেশের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং জনগণ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মোতাবেক অবিলম্বে ৪-দফা মেনে নেবার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবী জানাতে থাকেন।

৪-দফার প্রতি সমর্থন

অসহযোগ আন্দোলনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে চলে। প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণই সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। শেখ মুজিবের নির্দেশেই বাংলাদেশের সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে।

অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান তখন ঢাকায় ছিলেন। তিনি সব প্রত্যক্ষ করলেন। দূরদর্শী নেতা এ-সত্যও অনুধাবন করতে পারলেন যে, পাকিস্তানের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা শেষ ক'রে ১১ই মার্চ করাচীতে ফিরে গিয়ে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর সে আশঙ্কার কথা প্রকাশ না ক'রে পারলেন না। তিনি বললেন, "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্রুত ক্ষীয়মান সম্পর্কের শেষ সংযোগ হচ্ছেন শেখ মুজিব। জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে।"

সম্পর্কের শেষ সংযোগ

[দৈনিক পূর্বদেশ, ১২ই মার্চ, ১৯৭১]

১৩ তারিখে ভাসানী রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য জেল ভাঙার আন্দোলনের ডাক দেন। অপর দিকে এক ঘোষণায় শেখ মুজিব জানান যে, ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলে তিনি তাঁর সাথে আলোচনায় বসতে রাজী আছেন।

ঐ দিন 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক এক সামরিক আদেশ জারী করেন—যাতে বলা হয়ঃ "যে সকল কর্মচারী প্রতিরক্ষা খাত হইতে বেতন পাইয়া থাকেন তাঁহাদের সোমবার হইতে কাজে যোগ-দানের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। অন্যথায় তাঁহাদের চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হইতে পারে। যে সকল বেসামরিক কর্মচারী প্রতিরক্ষা খাত হইতে বেতন পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ বেলা ১০ টায় নিজ নিজ বিভাগের কাজে যোগদান করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত সময়ে তাঁহাদের কর্মস্থলে

নতুন সামরিক আদেশ জারী

যোগদান করিতে না পারেন তবে তাঁহাদের চাকরী হইতে বরখাস্ত ও পলাতক বলিয়া গণ্য করা হইবে। সামরিক আইনের ২৫ নং বিধি অনুসারে এই নির্দেশ অমান্যকারীদের ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ই মার্চ, ১৯৭১]

নতুন সামরিক আদেশ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব

এই আইন আদেশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, এটা সম্পূর্ণ উস্কানীমূলক। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, "যেক্ষেত্রে আমরা জনগণের পক্ষ হইতে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছি, সে ক্ষেত্রে এই ধরনের আদেশ জারী জনগণকে উস্কানী দান ছাড়া আর কিছুই নহে। বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি এ ধরনের উস্কানীমূলক তৎপরতা হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

[ঐ]

মুজিব-ওয়ালী আলোচনা

মার্চের ১৩ তারিখেই ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির (মস্কোপন্থী) প্রধান জনাব ওয়ালী খান ঢাকা আগমন করেন। বিমান বন্দরে তিনি অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য শেখ মুজিবের দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। পর দিন রোববার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রায় ৮৫ মিনিট ধরে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পর জনাব ওয়ালী খান পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তি পূর্ব বাংলার জনগণের ন্যায্য দাবীর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

ভুট্টোর আবদার

একই দিনে জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচীতে এক জনসভায় তাঁর মতলব প্রকাশ ক'রে ফেলেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁকে যেন ক্ষমতা ভাগাভাগি ক'রে দেয়া হয়।

এই একটি মাত্র উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই আসলে জনাব ভুট্টো এতদিন ধরে পাঁয়তারা করছিলেন। অধিবেশন বর্জনের হুমকি দিয়ে শত শত লোকের প্রাণহানির কারণ সৃষ্টি করেছিলেন।

পরদিন ১৫ই মার্চ। ঐ দিন বাংলার জনগণ ও প্রগতিশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের দাবীতে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এক ঘোষণায় তিনি বলেন যে, 'বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে।' তিনি সুস্পষ্টভাবে দেশবাসীকে জানান যে, 'এই শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করার অর্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা। জনগণ যেন তা' রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে।' এক বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, "বাংলাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না। কারণ, প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকে মরণ বরণ করতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে আর আত্মমর্যাদার সাথে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আমি জনগণকে যে কোন ত্যাগের জন্য এবং সম্ভাব্য সব কিছু নিয়ে যে কোন শক্তির মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানাই।"

শেখ মুজিবের বাংলাদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ

[দৈনিক পূর্বদেশ, ১৫ই মার্চ, ১৯৭১]

বঙ্গবন্ধু দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ৩৫টি বিধি জারী করেন। এই বিধিগুলো হ'ল ঃ

১নং নির্দেশ ঃ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট, সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ, হাইকোর্ট ও সমগ্র বাংলাদেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। নিচে যে বিশেষ নির্দেশাবলী হরতালের আওতামুক্ত তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হ'ল, তার এবং বিভিন্ন সময়ে যে সব নির্দেশাবলী ও ব্যাখ্যা দেওয়া হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই হরতাল পালন করতে হবে।

২নং নির্দেশ ঃ বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

৩নং নির্দেশ ঃ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা—(ক) ডিপুটি কমিশনার ও সাবডিভিশনাল অফিসারগণ অফিস না খুলে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা' পালন করবেন এবং উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ

বর্ণিত নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের জন্য যা যা দরকার, সে সব দায়িত্ব পালন করবেন।

নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করবেন ও পরিষদের সহযোগিতায় কাজ করবেন।

(খ) পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজন হ'লে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করবে।

(গ) জেল ওয়ার্ডার ও জেলের অফিসসমূহে কাজ চলবে।

(ঘ) আনসার বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবে।

৪নং নির্দেশ ঃ বন্দরসমূহ ঃ (আভ্যন্তরীণ নৌ বন্দর সহ) নৌযান চলাচল অব্যাহত রাখা সহ বন্দর কর্তৃপক্ষ সকল পর্যায়েই কাজ চালু রাখবে, তবে জনগণের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এমন সব দ্রব্যাদি বা সেনাবাহিনী মোতায়েনের কাজে সহযোগিতা সম্প্রসারণ ব্যতীত জাহাজসমূহের বন্দরে ভেড়া ও বন্দর ছাড়ার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন,—বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিসের শুধুমাত্র তেমন বিভাগই চালু থাকবে। সকল জাহাজ বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য যে সকল জাহাজ খাদ্যশস্য বহন ক'রে আনছে, সে সব দ্রুত খালাস করতে সার্বিক চেষ্টা রাখতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের ন্যায্য পাওনা ও মাল খালাস চার্জ করবে। আভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহও অপরাপর চার্জ আদায় করবে।

৫নং নির্দেশ ঃ মাল আমদানী ঃ আমদানীকৃত সকল মাল খালাস করতে হবে। সকল বিভাগের প্রয়োজনীয় সেকশনসমূহ কাজ চালু রাখবে এবং নিরূপিত শুল্কের পুরা অর্থ জমা দেয়া হ'লে তার ভিত্তিতে মাল খালাসের অনুমোদন দান করবে। এতদুদ্দেশ্যে ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডে শুল্ক কালেক্টর কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ একাউন্টে উক্ত অর্থ জমা দিতে হবে। শুল্ক কালেক্টর আওয়ামী লীগের নির্দেশ মোতাবেক এসব একাউন্টস্ পরিচালনা করবে। আওয়ামী লীগ সময়ে সময়ে এ সম্পর্কে নির্দেশ দেবে। এভাবে সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে জমা হবে না।

৬ নং নির্দেশ ঃ রেলওয়ে ঃ রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেলওয়ে চালু রাখার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের যে যে সেকশন খোলা থাকা দরকার কেবল মাত্র সেই সেকশনই কাজ করবে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ওপর নির্যাতন চালানোর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন সব ক্ষেত্রে সৈন্য মোতায়েন কিংবা রসদ পরিবহনের কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দরসমূহ থেকে অভ্যন্তরে খাদ্যশস্য পরিবহনের বেলায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ওয়াগনসমূহ বরাদ্দ করতে হবে।

৭ নং নির্দেশ ঃ সড়ক পরিবহন ঃ বাংলাদেশের সর্বত্র ই. পি. আর. টি. সি. চলাচল করবে।

৮ নং নির্দেশ ঃ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ঃ আভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর সঠিকভাবে কাজ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় আই. ডব্লিউ. টি. এ-র স্বল্পসংখ্যক কর্মচারী, ই. পি. এস. সি. এবং আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কাজ করবে। কিন্তু জনগণের ওপর নির্যাতন চালানোর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এরূপ বাহিনী অথবা সরঞ্জামাদি সমাবেশ করার ব্যাপারে কোনরূপ সহযোগিতা করা যাবে না।

৯ নং নির্দেশ ঃ ডাক ও টেলিগ্রাফ ঃ বাংলাদেশের মধ্যে চিঠি, টেলিগ্রাম ও মানি অডার পাঠানোর জন্যই কেবল ডাক ও টেলিগ্রাফ অফিস কাজ করবে। তবে সকল শ্রেণীর বিদেশী মেল সার্ভিস ও বিদেশী টেলিগ্রাফ সরাসরি সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে প্রেরণ করা যেতে পারে। ২৫ নং নির্দেশে যে সমস্ত বার্তা আদান-প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্কগুলোকে কেবল সে ধরনের বার্তা টেলিপ্রিন্টারে আদান-প্রদান করতে দেওয়ার জন্য সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এক ঘণ্টার জন্য আন্তঃ প্রাদেশিক টেলিপ্রিন্টার চ্যানেল খোলা থাকবে।

পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও জীবন বীমা চালু থাকবে।

১০ নং নির্দেশ ঃ টেলিফোন ঃ বাংলাদেশের মধ্যে কেবল স্থানীয় ও আন্তঃ জেলা ট্রাঙ্ক টেলিফোন চালু থাকবে। টেলিফোন ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সেকশনগুলো কাজ করবে।

১১ নং নির্দেশ : বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্র : বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্র চালু থাকবে এবং এগুলোতে জনগণের আন্দোলন সংক্রান্ত সকল খবর ও বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ প্রচার করতে হবে। অন্যথায় এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না।

১২ নং নির্দেশ : স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সার্ভিসেস : জেলা হাসপাতাল, যক্ষা ক্লিনিক ও কলেরা গবেষণা কেন্দ্র সহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এবং স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সার্ভিস চালু থাকবে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স চালু থাকবে এবং সকল হাসপাতাল, মফঃস্বল শহরের হাসপাতাল, গ্রামাঞ্চলের হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঔষধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৩ নং নির্দেশ : বিজলী সরবরাহ : মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ সহ বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখার কাজের সাথে সম্পর্কিত ইপি ওয়াপদার সমস্ত বিভাগ কাজ করবে।

১৪ নং নির্দেশ : পানি ও গ্যাস : গ্যাস ও পানি সরবরাহ চালু থাকবে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাও চালু থাকবে।

১৫ নং নির্দেশ : কয়লা : ইটের ভাটা এবং অন্যান্য কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৬ নং নির্দেশ : খাদ্য সরবরাহ : খাদ্য সরবরাহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের আমদানী বণ্টন, গুদামজাতকরণ ও স্থানান্তরে চালান অব্যাহত থাকবে। এ কাজের জন্য ওয়াগন, বার্জ, ট্রাক ইত্যাদি সহ সব রকম যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৭ নং নির্দেশ : কৃষি তৎপরতা—(ক) ধান ও পাটের বীজ, সার এবং কীটনাশক ঔষধ সংগ্রহ, চলাচল এবং বণ্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার, চাল গবেষণা ইনসটিটিউট এবং এগুলোর সকল প্রকল্পের কাজ চলবে।

(খ) পাওয়ার পাম্প এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের চলাচল, বণ্টন, স্থাপন (ফিল্ডিং) এবং চালানোর কাজ চলবে। এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় তেল, জ্বালানী, যন্ত্রপাতির সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

(গ) নলকূপ খনন, পরিচালনা এবং খালের সেচসহ সব রকম পানিসেচ ব্যবস্থা চালু থাকবে।

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাঙ্ক, সেণ্ট্রাল সমবায় ব্যাঙ্ক ও এদের অনুমোদিত সংস্থা, থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সব সমবায় প্রতিষ্ঠান চালু থাকবে।

(ঙ) এতদুদ্দেশ্যে ই. পি. এ. ডি. সি-র প্রয়োজনীয় সেকশন চালু থাকতে পারে।

(চ) কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকাসমূহে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান অব্যাহত থাকবে।

(ছ) গুদামে রাখাব উদ্দেশ্যে গোল আলু কেনার জন্য এ. ডি. বি. পি. দ্রুত অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

১৮নং নির্দেশঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপন সহ ইপি ওয়াপদা ও অন্যান্য সংস্থার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাস ও চলাচল এবং সংশ্লিণ্ট অন্যান্য জরুরী কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারী সংস্থা বা সংশ্লিণ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা স্বাভাবিক নিয়মে কণ্ট্রাকটবদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

১৯নং নির্দেশ ঃ উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ ঃ বৈদেশিক সাহায্যে তৈরী সড়ক ও সেতু প্রকল্পসহ সবকারী স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধা-সরকারী সংস্থার সব উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন সুচারুরূপে চলবে। সরকারী সংস্থা বা সংশ্লিণ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যথারীতি কণ্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মাল-মসলা সরবরাহের নিশ্চয়তাও বিধান করবে।

২০নং নির্দেশঃ সাহায্য ও পুনর্বাসন ঃ ঘূর্ণিবাত্যা দুর্গত এলাকাগুলোতে বাঁধ নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ সহ সব রকম সাহায্য পুনর্বাসন ও পুনঃ নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারী সংস্থা কন্ট্রাক্টরদের পাওনা যথারীতি মিটিয়ে দেবে।

২১নং নির্দেশ ঃ ই. পি. আই. ডি. সি., ইপসিক কারখানা ও ইস্টার্ন রিফাইনারী ঃ ই. পি. আই. ডি. সি. ও ইপসিকের সব কারখানায় [illegible]

চলবে এবং যত বেশী সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করবে। এসব কারখানা চালু রাখার জন্য অর্থ সরবরাহ ও ক্রয়ের জন্য ই. পি. আই. ডি. সি. ও ইপসিকের যে সব বিভাগ খোলা রাখা দরকার হবে সে গুলোতে কাজ চলবে। ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেডেও যথারীতি কাজ চলবে।

২২নং নির্দেশঃ বেতন দান ঃ সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থার কর্মচারী ও শ্রমিক এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতন তা' দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক যে ভিত্তিতেই দেওয়া হোক না কেন, তা' তাদের পাওনা হ'লে সেভাবেই দিতে হবে। যে সব সরকারী কর্মচারীর বন্যা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বকেয়া বেতন রয়েছে তা' দিতে হবে। বেতনের বিল তৈরী ও বেতন দানের জন্য সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে কাজ চলবে।

২৩নং নির্দেশঃ পেনসন ঃ সামরিক বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সহ সব পেনসনপ্রাপ্তদের নির্ধারিত তারিখে পেনসন দিতে হবে।

২৪নং নির্দেশঃ এজিইপি ও ট্রেজারী ঃ বেতনের বিল তৈরী এবং এসব নির্দেশ অনুমোদিত লেনদেনের জন্য এজিইপি ও ট্রেজারীতে সামান্য-সংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন।

২৫নং নির্দেশঃ ব্যাঙ্ক—(ক) ব্যাঙ্কিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য বিকেল ৪টা পর্যন্ত (বিরতির সময় সহ) সব ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে। তবে শুক্র ও শনিবার দিন ব্যাঙ্কগুলো ব্যাঙ্কিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক ব্যালেন্সিং ও সব স্বাভাবিক কাজ নিয়মিতভাবে চলবে।

(খ) নিম্নলিখিত বিধি-নিষেধ ছাড়া ব্যাঙ্কগুলো যে কোন পরিমাণ জমা গ্রহণ, বাংলাদেশের ভেতর যে কোন পরিমাণ আন্তঃব্যাঙ্ক ক্লিয়ারেন্স, বাংলাদেশের ভেতর আন্তঃব্যাঙ্ক ট্রান্সফার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টিটি বা মেল ট্রান্সফার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ ড্র করার কাজ চালিয়ে যাবে।

বিধি-নিষেধগুলো হচ্ছে ঃ

(১) চেকের সাথে যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধির বা বেতন রেজিষ্ট্রারের সার্টিফিকেট থাকে তা' হ'লে বেতন ও মজুরী পরিশোধ করা।

(২) সপ্তাহে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত বোনাফাইড ব্যক্তিগত ড্রইংস।

(৩) চিনিকল, পাটকল ইত্যাদির জন্য আঁখ ও পাট সহ শিল্পের কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য অর্থদান।

(৪) বাংলাদেশের শিল্পগুলোর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় সহ যে কোন বোনাফাইড প্রয়োজনে সপ্তাহে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান। এই অর্থ নগদ অর্থে বা ক্যাশ ড্রাফট মারফত উঠানো যাবে। তবে উপরে উল্লিখিত ৩ ও ৪ নম্বর শর্তে কোন অর্থ দেওয়ার পূর্বে অতীত রেকর্ড দেখে ব্যাঙ্কের সন্তুষ্ট হ'তে হবে যে, অর্থগ্রহণকারী একজন বোনাফাইড শিল্প অথবা বাণিজ্যিক সংস্থা বা ব্যবসায়ী এবং যে পরিমাণ অর্থ উঠানো হচ্ছে তা' গত এক বছরে সপ্তাহে গড়ে উঠানো অর্থের চেয়ে বেশী নয়।

(৫) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে নিযুক্ত তালিকাভুক্ত কন্ট্রাক্টরদের অর্থদান। তবে যে কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কাছ থেকে চেক একটি সার্টিফিকেট আনতে হবে যে, যে টাকা উঠানো হচ্ছে তা' উল্লিখিত কাজের জন্য প্রয়োজন।

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কোন একাউন্টে ক্রস চেক ও ক্রস ডিমান্ড ড্রাফট প্রদান করা ও জমা নেয়া যাবে।

(ঘ) স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে অর্থপ্রদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চিঠি পাঠাতে পারবে। যেসব ব্যাঙ্কের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সেগুলো ঢাকাস্থ ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পাওনা গ্রহণ করবে।

(ঙ) অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত আন্তঃ শাখা টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস চালু থাকবে।

(১) প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সোমবার ও বুধবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি খবর পাঠাতে পারে।

(২) প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক অর্থ পাঠানোর ব্যাপারে মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে খবর পেতে পারে।

(চ) বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাঙ্ক পদ্ধতির জন্য টেলিপ্রিন্টার সার্ভিসের কাজ অব্যাহত থাকবে।

(ছ) বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিল সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্রস চেক বা ক্রস ড্রাফ্‌টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে।

(জ) অনুমোদিত ডিলারের মাধ্যমে ফরেন ট্রাভেলার্স চেক ভাঙ্গানো যাবে।

(ঝ) কূটনীতিকরা অবাধে তাদের একাউন্টের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন এবং বিদেশী নাগরিকরা বৈদেশিক মুদ্রা। একাউন্ট পরিচালনা করতে পারবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঞ) লকার্স পরিচালনার কাজ বন্ধ থাকবে।

(ট) স্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না।

(ঠ) বিদেশী রাষ্ট্র থেকে লাইসেন্সের মাধ্যমে দ্রব্যাদি আমদানীর জন্য ঋণপত্র খোলা যাবে।

(ড) পণ্য বিনিময়ের চুক্তি (যে সব দ্রব্যাদি ইতিপূর্বে পাঠানো হয়েছে) অনুযায়ী প্রেরিত দ্রব্যাদি ছাড় করাতে হবে।

(ঢ) ইস্টার্ন মার্কেনটাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন-এর মারফত বকেয়া রফতানী বিল সংগ্রহ করতে হবে। এ ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলোর প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ পরিচালিত হবে।

২৬নং নির্দেশ ঃ স্টেট ব্যাঙ্ক—স্টেট ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের মতই কাজ করবে এবং সেখানে একই অফিস সময় চলবে। বাংলাদেশের ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি কাজ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও অনুরূপ ভাবে খোলা থাকবে। উল্লিখিত কাঠামো ও বিধি-নিষেধ এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। 'পি' ফর্ম বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্য বিদেশে প্রেরণের টাকাও গৃহীত হতে পারবে।

২৭নং নির্দেশ ঃ আমদানী ও রফতানী কন্ট্রোলার ঃ বাংলাদেশের জন্য আমদানী লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানীকৃত দ্রব্যাদি চলাচলের বিধিব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানী-রফতানী কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।

২৮নং নির্দেশ ঃ ট্রাভেল এজেন্ট ও বিদেশী এয়ার লাইন্স ঃ সব ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহন অফিস চালু থাকতে পারে। তবে টিকেট বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে।

২৯নং নির্দেশ ঃ ফায়ার সার্ভিস ঃ বাংলাদেশের সব অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩০নং নির্দেশ ঃ পৌরসভা ঃ পৌরসভা, ময়লাবাহী ট্রাক, রাস্তায় বাতি জ্বালানো, সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩১নং নির্দেশ ঃ করদান বন্ধ রাখা অভিযান ঃ (ক) পুনরায় নির্দেশ দেওয়া না পর্যন্ত —(১) সব ভূমি রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে, (২) বাংলাদেশের কোথাও কোন লবণ কর আদায় করা যাবে না, (৩) বাংলাদেশের কোথাও কোন তামাক কর আদায় হবে না এবং (৪) তাঁতীরা আবগারী শুল্ক ছাড়াই বাংলার সূতা কিনবেন। মিল মালিক ও ডিলাররা তাদের কাছ থেকে কোন আবগারী শুল্ক আদায় করতে পারবে না।

(খ) এ ছাড়া প্রাদেশিক সরকারের সব কর যেমন—প্রমোদ কর, হাট-বাজর, সেতু ও পুকুরের ওপর ধার্যকৃত কর আদায় করা যাবে এবং বাংলাদেশের সরকারের একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(গ) অকট্রয়সহ সব স্থানীয় কর আদায় করা যাবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের সব পরোক্ষ কর যেমন—আবগারী শুল্ক কর, বিক্রয় কর এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আদায় হবে। তবে তা' কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা যাবে না বা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে হস্তান্তর করা যাবে না। এ সব আদায়কৃত কর ইস্টার্ন মার্কেন-টাইল ব্যাঙ্ক বা ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে 'বিশেষ একাউন্ট' খুলে

জমা রাখতে হবে এবং ব্যাঙ্ক দুটিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবে। আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ ও বিভিন্ন সময় তাদের প্রতি যে নির্দেশ দেওয়া হবে তা' মানতে হবে।

(৬) কেন্দ্রীয় সরকারের সব প্রত্যক্ষ কর যেমন আয়কর, আদায়কর ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া না পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৩২ নং নির্দেশ ঃ পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন চালু থাকবে এবং পোস্টাল লাইফ ইনসুরেন্স সহ সব বীমা কোম্পানীতে কাজ চলবে।

৩৩ নং নির্দেশ ঃ সব ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দোকানপাট নিয়মিত-ভাবে চলবে।

৩৪ নং নির্দেশ ঃ সব বাড়ীর উপর কালো পতাকা উড়া অব্যাহত থাকবে।

৩৫ নং নির্দেশ ঃ সংগ্রাম পরিষদগুলো সবস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এসব নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে যাবে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ই মার্চ, ১৯৭১]

দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করার পর জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বঙ্গবন্ধুকে সাহায্য করতে লাগলো। ২রা মার্চের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর জনসাধারণ সাময়িকভাবে বেশ কিছুটা অসুবিধায় পড়েছিল। যোগা-যোগের অচলাবস্থার দরুন খাদ্যদ্রব্য ও অতি প্রয়ো-জনীয় ভোগ্যপণ্যের আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বিদেশী সাংবা-দিকের দৃষ্টিতে অসহযোগ আন্দোলন

তারপর ৮ই মার্চ তাজউদ্দিন আহমদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশাবলীর কতি-পয় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও 'অব্যাহতির' কথা প্রচারিত হওয়ার পর জন-জীবনের অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। তবে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা পুর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। সেনাবাহিনীর লোকেরা যাতে যথাযথভাবে চলতে না পারে সে জন্য তাদের প্রতি পদক্ষেপে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছিল। তাদের খাদ্য-পানি সরবরাহের ক্ষেত্রেও বাঙালীরা অসহযোগিতা করে। এ সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে সাংবাদিক ম্যাসকারেনহাস লিখেছেন ঃ "......পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলো চরম দুঃখ-কষ্ট ও অবমাননার শিকারে পরিণত হ'ল। স্থানীয় বাজার থেকে সেনাদলকে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে অস্বীকার

করা হ'ল। তারা বাজারে জিনিসপত্র কিনতে গেলে তাদের ব্যঙ্গ করা হ'ত ও তাদের উপর থুথু ফেলা হ'ত। কোন দোকানদারই তাদের কাছে কোন কিছু বিক্রি করত না। শীঘ্রই তাদের খাদ্যের মান অতি সস্তার ডাল-রুটির পর্যায়ে নেমে এল এবং কোন কোন সময় তা-ও আসত করাচী থেকে, মাংস ও শাক সব্জি [illegible] বিমান বাহিনীর মালবাহী বিমানে ক'রে।

ঐ সব [illegible] কুমিল্লাস্থ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীতে [illegible] সৈনিক পাঠান আমাকে বলেছে যে, তাদের একটি দলকে কি ভাবে একদল বিক্ষোভকারী ছাত্র রাস্তায় পাকড়াও করেছিল। 'আমাদের [illegible] ক'রে তারা আমাদেরকে ক্যান্টনমেন্টের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল।' সে আরো বলল, 'সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অনেকেরই [illegible] জানা ছিল। নতুবা আমাদের লজ্জাকর অবস্থা হ'ত আরো ভয়ানক।' [প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩]

আসলে বঙ্গবন্ধুর 'নির্দেশাবলী' বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছিল 'বাইবেলের বাণীর মতই পবিত্র'। কারণ জনগণের কাছে এ বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ ছিল না যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র সংগ্রামের, আর বর্তমান অসহযোগ আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামেরই প্রস্তুতিপর্ব। অসহযোগ আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তেই ১৫ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন। কয়েকদিন আগেই সরকারী সূত্রে, 'রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে' তাঁর এই আগমনের কথা জানানো হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমন

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই 'মহৎ উদ্দেশ্য' সম্পর্কে নতুন ক'রে আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা বিশ্ববাসী জানেন, তাঁর এই আগমনের মূলে কি জঘন্য উদ্দেশ্য এবং হীন মনোবৃত্তি নিহিত ছিল।

২৫শে মার্চের সেই কালোরাত্রির পর পুরো নয়টা মাস ধরে যে বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে ৩০ লাখ নিরীহ লোককে হত্যা করা হয়েছে, তারই প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন তিনি এই সময়ের মধ্যে। আলোচনার নামে কালক্ষেপণ ক'রে সাদা পোশাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও ভারী

ভারী অস্ত্র এনেছেন তিনি। হানাদার পশুদেরকে উপযুক্তভাবে তালিম দিয়েছেন এই সময়ে। এই সুপরিকল্পিত অভিযান চালানোর নির্দিষ্ট সময়ও তিনি স্থির করে রেখেছেন—২৫শে মার্চ, ১৯৭১। প্রকাশ্যে যে দিন-টিতে তিনি বেতার ভাষণ দেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন।

শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে কথা বলতে রাজী হয়েছিলেন, কেননা আকস্মিকভাবে মারাত্মক ঝুঁকি নিতে তিনি চাননি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মতলব সম্বন্ধে তিনি যে অসচেতন ছিলেন, তা নয়। তবুও চরম একটি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁরো প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। ৭ই মার্চের বক্তৃতায় তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতি গ্রামে মহল্লায় স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড তৈরী করা হয়েছে। বাঙালী সেনারা তাঁর নির্দে-শের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেডে প্রশিক্ষণ নিয়ে চলেছেন। চরম মুহূর্তের মোকাবিলার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তার জন্য বঙ্গবন্ধু যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাছাড়া শেষ মুহূর্তেও যদি ইয়াহিয়ার সুমতি হয়, সে আশাতেও তিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পরদিন ১৬ই মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা শুরু হয়। বৈঠক বসবার পূর্বে সকালে বঙ্গবন্ধু নিজ বাসভবনে দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনা প্রথম বৈঠকে প্রায় ১৫০ মিনিট ধরে অনুষ্ঠিত হয়। পরে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পুনরায় নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মিলিত হন।

মুজিব-ইয়াহিয়া প্রথম বৈঠক

মুজিব-ইয়াহিয়ার বৈঠকের প্রতি সারা বাংলাদেশ তথা বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। দেশী-বিদেশী শত শত সাংবাদিক এ খবর সংগ্রহের জন্য প্রেসিডেন্ট ভবনের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বৈঠক শেষে সবাইকে নিরাশ ক'রে শেখ মুজিব তাঁদের আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য জানাতে অস্বীকৃতি জানান। প্রথম দিনের বৈঠক সম্পর্কে খবরে বলা হয়ঃ

"সাড়ে সাত কোটি মুক্তি-সংগ্রামী বাঙালীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গতকাল

মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় নীতি ও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন সম্পর্কে দেড়শ' মিনিট কাল স্থায়ী এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন।.........

আলোচনা শেষে বাংলার নায়ক প্রেসিডেন্ট ভবন ত্যাগ করলে বহির্দ্বারে অপেক্ষমান দেশী-বিদেশী সাংবাদিক বাহিনীকে জানান যে, রাজনৈতিক ও অন্যান্য পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা উভয়ে আলোচনা করেছেন। জনৈক বিদেশী সাংবাদিক আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে কিনা জানতে চাইলে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, আলোচনা চলছে এবং আরো চলবে। এর বেশী তাঁর কিছু বলার নেই। আরেক বিদেশী সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, উভয়ের আলোচনা কি পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ পবিবেশ বলা চলে কি-না? শেখ সাহেব মুহূর্তকাল থেমে স্পষ্ট জবাবে বলেন যে, সাংবাদিকদের কাছে যতটুকু তিনি বলেছেন তার বেশী কিছু আব বলার নেই। এ সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করবেন না। পরে তিনিবলেন যে, আলোচনা অব্যাহত থাকবে এবং এ ব্যাপারে বেশ সময়ের প্রয়োজন। বিষয়টি এক-দুই মিনিটের নয়। আরেক সাংবাদিক তাঁর ৪-দফা শর্ত ছাড়াও আলোচনায় অন্য কোন প্রশ্নও তিনি তুলেছেন কি-না এই প্রশ্ন করলে শেখ সাহেব আর কোন মন্তব্য করতে অসম্মতি জানান।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ই মার্চ, ১৯৭১]

ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক কর্তৃক কেন্দ্রীয় কর আদায়

এ সময় শেখ মুজিবের নির্দেশ মোতাবেক ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের সকল শাখা কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ট্যাক্স আদায় করার জন্য বিশেষ একাউন্ট খুলেছিল। এ ট্যাক্সের মধ্যে ছিল শুল্ক কর, আবগারী কর, বিক্রয় কর ইত্যাদি। পরদিন প্রকাশিত সংবাদপত্রে জানা যায় যে, এ সকল কর স্টেট ব্যাঙ্কে জমা দেয়া হয় নি। ঐদিন একটি অস্ত্র বোঝাই জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছলে ডক কর্মীরা জাহাজটি খালাস করতে অস্বীকার করেন। অন্যদিকে প্রায় ৮০ হাজার বাঙালী সৈন্যকে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান দেবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশন সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেয়।

পরদিন বুধবার, ১৭ই মার্চ। ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উভয়ের মধ্যে আলোচনা এক ঘণ্টা ধরে স্থায়ী

হয়। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদেরকে বলেন যে, লক্ষ্য উপনীত না হওয়া পর্যন্ত বাঙালীর সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

ঐদিন ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫২তম জন্মদিন। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সাংবাদিকরা তাঁকে যখন তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান, তখন তিনি দুঃখ-ভারাকান্ত কণ্ঠে বলেন, "আমি আমার জন্মদিনের এ সব করি না, এই দুঃখিনী বাংলায় আমার জন্মদিনই বা কি, আর মৃত্যুদিনই বা কি? আপনারা বাংলাদেশের অবস্থা জানেন। এ-দেশের জনগণের কাছে জন্মের আজ নেই কোন মহিমা। পশ্চিমাদের ইচ্ছা মত আমাদের প্রাণ দিতে হয়। বাংলাদেশের জনগণের জীবনের কোন নিরাপত্তা তারা রাখেনি। জনগণ আজ মৃতপ্রায়। আমার আবার জন্মদিন কি? আমার জীবন নিবেদিত আমার জনগণের জন্যে। আমি যে তাদেরই লোক ....।" [পাকিস্তান, ১৮ই মার্চ, ১৯৭১]

শেখ মুজিবের জন্ম দিবস

দুঃখিনী বাংলাকে যে তিনি কতখানি ভালবাসেন এই উক্তি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঐ দিন লেঃ জেঃ টিক্কা খান এক ঘোষণায় জানান যে, ২রা মার্চ থেকে ৯ই মার্চ পর্যন্ত কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সামরিক বাহিনী তলব করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ একটি কমিশন গঠন করেছেন। ঘোষণানুযায়ী চেয়ারম্যান হবেন পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের একজন বিচারপতি। পরদিন এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব এই তদন্ত কমিশন মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, "এ ধরনের কমিশন দিয়ে কোন ফায়দা পাওয়া যাবে না। এ ধরনের তদন্ত আদৌ কোন প্রকৃত তদন্ত হবে না, সত্যেও উপনীত হওয়া যাবে না। বরং এটা হবে জনগণকে বিভ্রান্ত করার একটা কৌশল মাত্র।"

তদন্ত কমিশন গঠন : শেখ মুজিব কর্তৃক প্রত্যাখ্যান

[ঐ ১৯শে মার্চ, ১৯৭১]

তিনি আরো বলেন যে, "বাংলাদেশের মানুষ এ জাতীয় কমিশনের সাথে কোন প্রকারেই সহযোগিতা করবে না। কারো পক্ষে এই কমিশনের সদস্য মনোনীত করা বা সদস্যরূপে কাজ করা উচিত হবে না।" [ঐ]

উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে যে চার-দফা দাবীর কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল—অবাধ, নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্তের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সরকার জনগণকে ভাঁওতা দেয়ার জন্যই কতিপয় তাঁবেদারকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর একটি দাবী পূরণ করার অপচেষ্টা চালান। এই তদন্ত কমিশন যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ হতে পারে না, তা' এর পূর্বে প্রকাশিত সরকারী প্রেসনোটেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যা হোক, শেখ মুজিব নিজেই একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। মওলানা ভাসানীর অনুরোধক্রমে চট্টগ্রামে গুলীবর্ষণ ও অন্যান্য ঘটনা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য তিনি ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও জাতীয় পরিষদ সদস্য আবেদুর রেজা খানকে সেখানে পাঠান। ঐদিন শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে বৈঠকের বিরতি ছিল। ইতিমধ্যে সংক্ষুব্ধ জনতা শেখ মুজিবের বাসভবনে গিয়ে তাঁকে বৈঠক পরিত্যাগ ক'রে রাজপথে নেমে আসার জন্য আহ্বান জানায়।

জয়দেবপুরে গুলীবর্ষণ

পরদিন শুক্রবার ১৯শে মার্চ। ঢাকা শহর থেকে বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত জয়দেবপুরে চীন নির্মিত অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর একটি দলকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করলে মারাত্মক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় জনগণও এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। বাধা-প্রাপ্ত হয়ে পাকসৈন্যগণ নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করে। ফলে কমপক্ষে ২০ জন নিহত ও ১৬ জন আহত হয়। সরকারী হিসেব মতে ২ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করা হয়। পরদিন প্রকাশিত সংবাদপত্রে কমপক্ষে ৩ ব্যক্তি নিহত হওয়ার খবর প্রচারিত হয়। 'দৈনিক পূর্বদেশ' এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন: "ঢাকা থেকে বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত জয়দেবপুর বাজারে গতকাল শুক্রবার অপরাহ্নে সেনাবাহিনী ও জনতার মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। অপরাহ্ন পৌনে চারটা থেকে সোয়া ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর গুলীতে জনতার ৩ জন নিহত এবং ১৬ জন আহত এবং সেনাবাহিনীর ৩ জন আহত হয়েছে বলে জয়দেবপুর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। বেসরকারী-ভাবে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী সেনাবাহিনীর গুলীতে দশ/বারজন নিহত

এবং বহু আহত হয়েছেন। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে জয়দেবপুরে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, গতকাল দুপুর বারটার দিকে ঢাকা থেকে পাঁচটি ভ্যানে একদল সেনা জয়দেবপুরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর ছাউনিতে পেঁৗছায়।

অপরাহ্ণ পৌনে চারটার দিকে সেনাবাহিনীর দলটি উক্ত ছাউনি থেকে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করলে জনতা জয়দেবপুর বাজারে ব্যারিকেড সৃষ্টি ক'রে তাদের বাধাদান করে। এতে সেনাবাহিনী গুলীবর্ষণ করে। জনতার পক্ষ থেকেও পাল্টা গুলীবর্ষণ করা হয়। তবে জনতার অধিকাংশই লাঠি-সোটা নিয়ে সজ্জিত ছিল।

গুলীবর্ষণের সময় থানাতেও গুলী এসে লাগতে থাকে। এতে থানার পুলিশকে নিরাপত্তার জন্য দরজা বন্ধ ক'রে থাকতে হয়েছে।

সেনাবাহিনীর গুলীবর্ষণে নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ সেনাবাহিনী নিয়ে গেছে। এছাড়া পুলিশ ও এ্যাম্বুলেন্সকে ঘটনাস্থলে যেতে দেয়া হয় নি বলে জানা গেছে। বিক্ষুব্ধ জনতা জয়দেবপুর রেল স্টেশনের নিকট রেল লাইন তুলে ফেলেছেন।..."

[দৈনিক পূর্বদেশ, ২০শে মার্চ, ১৯৭১]

বঙ্গবন্ধুর ক্ষোভ

এই সংবাদে শেখ মুজিব ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তাঁর বাসভবনে আগত বিক্ষুব্ধ বিজ্ঞান কর্মচারীদের সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সরকারের এই উস্কানিমূলক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে বললেন, "বাঙালীর ফিনকি দেয়া রক্তের দাগ শহরে বন্দরে ছড়িয়ে আছে। জয়দেবপুরের মাটিও আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে বাঙালীর মুক্তির আন্দোলন স্তব্ধ করা কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।" তিনি আরো বলেন যে, "যাঁরা এ ধরনের দুরাশা মনে মনে পোষণ করেন, তাঁরা 'বেওকুফের স্বর্গেই বাস করছেন'।"

[ঐ]

১৯শে মার্চ উপদেষ্টাসহ শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে ৯০ মিনিটব্যাপী ৩য় দফা বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধুর উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ, কামরুজ্জামান, খোন্দকার মোশতাক অহমদ ও ডঃ কামাল হোসেন।

মুজিব-ইয়াহিয়া ৩য় দফা বৈঠক

বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কালে বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "আমি সর্বদা ভালোটা আশা করি, কিন্তু আবার খারাপের জন্য প্রস্তুত হয়েই থাকি। আমার ভূমিকা বিশ্ববাসীর কাছে সুস্পষ্ট রয়েছে।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২০শে মার্চ, ১৯৭১]

একই দিনে শেখ মুজিবের ৩ জন উপদেষ্টার সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের ৩ জন উপদেষ্টারও দুই ঘন্টাব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইতি-

অধিবেশনে যোগদানের জন্য ভুট্টোর নিকট প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ

মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জুলফিকার আলী ভুট্টো ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমানকে ঢাকায় আসার জন্য এক জরুরী তারবার্তা করেছিলেন। তার জবাবে ১৮ই মার্চ করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে জানান। তিনি বলেন যে, তিনি ১৬ই মার্চে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে গোপন আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট কয়েকটি বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়ার দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা না পাওয়ায় তিনি ঢাকা যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবশেষে মার্চের ২০ তারিখে প্রেসিডেন্টের আরেকটি আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব ভুট্টো সদলবলে ঢাকায় যাবার কথা ঘোষণা করেন।

তাড়াহুড়ার মধ্যে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ইয়াহিয়ার কাছ থেকে তিনি 'সন্তোষজনক' জবাব পেয়েছেন।

ভুট্টো এবং ইয়াহিয়ার সওয়াল-জবাবের বিষয় অজ্ঞাত থাকলেও তা' অনুমান করতে আমাদের কষ্ট হয় না। পরবর্তীকালে তাঁদের কার্যকলাপ থেকে আমরা একথা খুব জোরের সঙ্গেই বলতে পারি যে, ২৫শে মার্চের ঘটনার বীজ ঐ 'সন্তোষজনক' জবাবের মধ্যেই নিহিত ছিল। ইয়াহিয়ার সাথে পূর্বে একবার পাঁচঘন্টা বৈঠকে দু'জন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

প্রায় একরূপ ঠিকঠাক করেই রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে এ সম্পর্কে আভাস দিয়েছিলেন। এখন সেই কর্মপন্থার পাকাপাকি বাস্তবায়ন হবে। সুতরাং ভুট্টোর নিকট ইয়াহিয়ার জবাব সন্তোষজনকই হবার কথা।

যা হোক, মার্চের ২১ তারিখে ভুট্টো সাহেব ১৩ জনের এক প্রতিনিধি দল সহ ঢাকায় এলেন। ঢাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কড়া সামরিক নিরাপত্তায় তিনি হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল পৌঁছেন। এ সম্পর্কে সচিত্র সংবাদ পরিবেশন ক'রে দৈনিক পাকিস্তান বলেছেন, "কড়া সামরিক প্রহরাধীনে জনাব ভুট্টোকে বিমান বন্দর হ'তে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে নিয়ে আসা হয়।

ভুট্টোর ঢাকা আগমন

হোটেল প্রাঙ্গণে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশ' লোক ভুট্টো-বিরোধী শ্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

সামরিক বাহিনীর লোকজন জনাব ভুট্টোকে চারিদিক ঘিরে হোটেলের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। হোটেলের অভ্যন্তরেও একটি ক্ষুদ্র দল প্লাকার্ডসহ তাঁকে বিক্ষোভ জানায়। এসময় সামরিক বাহিনী সাংবাদিকদেরও জনাব ভুট্টোর কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। জনাব ভুট্টোর গাড়ীর সামনে ও পিছনে সাব মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কয়েকখানা সামরিক বাহিনীর গাড়ী ছিল। জনাব ভুট্টোর গাড়ীতেও তাঁর দু'পাশে সাদা পোশাক পরিহিত স্বয়ংক্রিয় রাইফেলধারী দু'ব্যক্তি আসীন ছিলেন। তাঁরা গাড়ীর জানালা দিয়ে দু'দিকে রাইফেল তাক ক'রে বসে ছিলেন। জনাব ভুট্টোকে এ সময় অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

[দৈনিক পাকিস্তান, ২২শে মার্চ, ১৯৭১]

ভুট্টো সাহেব বরাবর নিজেকে 'জাতীয় নেতা' হিসেবে জাহির ক'রে এসেছেন। অথচ সেই জাতির শতকরা প্রায় ষাটজন মানুষ যাঁরা বাঙালী তাঁদেরকে এবং এই বৃহত্তর জনগণের যিনি একচ্ছত্র নায়ক তাঁকে তিনি নিদারুণ ভয় করেন। ভয় করেন, কেননা তাঁর আশা যে বড়ই গগনচুম্বী। তিনি প্রধানমন্ত্রী হ'তে চান, অথচ শতকরা ষাটজন লোক তাঁকে সমর্থন করেন না। সে কারণেই সেই জনগণের শক্তিকে এবং জনগণের মহানায়কের

গণশক্তি'র গর্বকে তিনি নির্মূল করতে চান। তার জন্যই ইতিহাসের এক জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের জাল তাঁকে বিস্তার করতে হয়।

ঢাকায় পেঁ ীছেই প্রথমে ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা ক'রে উভয়ে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে তিনি বলেন যে, 'সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে।'

ঠিক হয়ে যাবে, কেননা ইয়াহিয়া খানের রক্তাক্ত পরিকল্পনায় তাঁর সমর্থন আছে, আর ভুট্টোর ক্ষমতা হস্তগত করার সকল কারসাজিতেও ইয়াহিয়ার সমর্থন আছে। দু'জন দু'জনকে প্রয়োজনের তাগিদেই আবিষ্কার করেছেন, উভয়ে সুহৃদ হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করবে যে, ভুট্টোকে ইয়াহিয়া অধিকদিন ব্যবহার করতে পারেন নি। তিনিই ব্যবহৃত এবং অন্তিমে পরাজিত হয়েছেন।

যা হোক, ঐদিন মুজিব-ইয়াহিয়ার মধ্যেও ৭০ মিনিটব্যাপী এক অনির্ধারিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সমাপনান্তে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিক-দেরকে বলেন, 'বাংলাদেশের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।' ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর আলোচনার ফলাফল জানাতে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

এর আগের দিন অর্থাৎ ২০শে মার্চ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রায় সওয়া দুই ঘণ্টা ধরে আলোচনার পর বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদেরকে বলেছিলেন যে, আলো-চনায় অগ্রগতি হয়েছে। তবে বঙ্গবন্ধুর উক্তিতে ও হাবভাবে একথা সুস্পষ্ট হয়েছিল যে, ধূম্রজাল কাটে নাই—কাটবার সম্ভাবনও খুব উজ্জ্বল নয়।

ইয়াহিয়া সুচতুর পন্থায় সময় যাপন করে যাচ্ছিলেন। আঘাত হানবার প্রস্তুতিপর্ব তখনো শেষ হয় নি। কিন্তু বাইরের দিক থেকে তিনি তা' বুঝতে দেন নি। বাহ্যতঃ ইয়াহিয়ার কথার মধ্যে কোন অসঙ্গতি ধরা না পড়লেও ভুট্টোর আগমনের পর প্রেসি-ডেন্টের সঙ্গে তাঁর যে গোপন বৈঠক হয়, সে সম্পর্কে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মনে যাতে কোনরূপ সংশয়ের উদয় না হতে পারে একারণেই ২১ তারিখে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের নিকট ইয়াহিয়ার এই দুরভিসন্ধি খুব সুস্পষ্টভাবে তখনো ধরা পড়ে নি।

মুজিব-ইয়াহিয়ার অনির্ধারিত বৈঠক

২২শে মার্চ ভুট্টো-ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের ৭৫ মিনিটব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর এই প্রথম তিনজনের মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় আলোচনা বৈঠক বসে। বৈঠক শেষে বাসভবনে ফিরে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'আলোচনায় অগ্রগতি সাধিত না হ'লে আমি আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি কেন?' অবশ্য তিনি একথাও বলেন, বাংলাদেশে এখনো বিপজ্জনক পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে। এদেশবাসীকে সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে।

মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়ার বৈঠক

একই দিনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মতৈক্যে উপনীত হবার সুযোগ দানের জন্য পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ২৫শে মার্চ এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। এই অধিবেশন আবার যে কবে বসবে তা' জানানো হয় নি। প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে একটি সংক্ষিপ্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়ঃ

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় স্থগিত ঘোষণা

"In consultation with leaders of both the wings of Pakistan and with a view to facilitating the process of enlarging areas of agreement among the political parties, the President has decided to postpone the meeting of the National Assembly called on March 25.

[*The Pakistan Times*, Lahore, March 23, 1971]

মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে বৈঠকের পর সকলেই এর সফলতা সম্পর্কে আশা পোষণ করতে লাগলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র এইদিন 'বাংলার স্বাধিকার' শীর্ষক এক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করলেন। পরদিন ইত্তেফাক এক সম্পাদকীয়তে লিখলেনঃ

"সংকট নিরসনের পথে"

সোমবার ঢাকায় এই মর্মে আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, রাজনৈতিক সংকট নিরসনের পন্থা চূড়ান্ত করার পদক্ষেপ হিসাবে প্রেসিডেন্ট দুই একদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের এক যৌথ বৈঠকে মিলিত করার চেষ্টা করিতে পারেন। সম্ভবতঃ সেই উদ্দেশ্যেই

তিনি কাইয়ুম খানকে তলব করিয়া আনেন। অন্য পশ্চিমাঞ্চলীয় গণ-প্রতিনিধিত্বশীল নেতারা বর্তমানে ঢাকায় রহিয়াছেন। এদিকে গতকাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জনাব ভুট্টো আলোচনায় অগ্রগতি হইতেছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। চারি দফা পূর্ব শর্ত পূরণ করা না হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে যোগ দিবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়া এ ব্যাপারে শেখ সাহেব যে আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, ইয়াহিয়া ও ভুট্টো উহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াছেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই অর্থাৎ সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরসহ বঙ্গবন্ধুর দাবী পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তই ভুট্টোর উপস্থিতিতে শেখ সাহেবের সঙ্গে বৈঠক চলাকালেই সোমবার প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার স্থগিত ঘোষণা করিয়াছেন। যদি শেষ মুহূর্তে ব্যক্তি-বিশেষের কারণে অতিনাটকীয় কিছু না ঘটে তবে অচিরেই সামরিক আইন প্রত্যাহৃত এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর ব্যবস্থা গৃহীত হইতে যাইতেছে। আরো জানা গিয়াছে যে, শেখ মুজিবের দাবী অনুসারে সামরিক আইন প্রত্যাহারের পরই নয়া সরকারের রূপরেখা নির্দিষ্ট হইবে। ইতিমধ্যে শেখ সাহেব সোমবার দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, আমাদের আন্দোলন চলিতেছে। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে। তিনি আরো বলিয়াছেন, বাংলার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান চায়। কিন্তু উহা না হইলে সংগ্রামের মাধ্যমেই তাঁহারা লক্ষ্যে গিয়া পেঁীছিবে।

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে মার্চ, ১৯৭১]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে পূর্ব বাংলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এমন কি ২২শে মার্চ তারিখেও তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন ঃ

That the stage is now set for our elected representatives to work together for the common goal which would accommodate both East and West wings in a smoothly working harmonious system. ... ... I have no doubt that we shall succeed in dissolving the current political crisis.

[*The Pakistan Times*, Lahore, March 23, 1971]

প্রেসিডেন্টের সাথে ভুট্টোর যে একটি গভীর সংযোগ ছিল, সে কথাও আজ বিশ্ববাসীর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। ২২শে মার্চ তারিখে জনাব ভুট্টো বললেন যে, তিনি শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছে তা' পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন এবং তিনি অত্যন্ত আশাবাদী। তিনি বললেন :

I had a fruitful and satisfactory meeting with Sheikh Mujibur Rahman this morning. I would welcome another meeting.

[*Dawn*, Karachi, March 23, 1971]

২৪ তারিখে ভুট্টো ইয়াহিয়ার সাথে সুদীর্ঘ আলাপ করেন এবং বলেন : We are making some progress.

[ডন, করাচী, ২৫শে মার্চ, '৭১]

২৫শে মার্চে জনাব ভুট্টো একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন :

"While I supported in principle the four point preconditions of Sheikh Mujibur Rahman, my party is trying to come close to six points."

[*The Pakistan Times*, March 26, 1971]

শুধু জনাব ভুট্টোই নন, পশ্চিমা স্বার্থবাদী মহলের আর এক নায়ক মিয়া মমতাজ দৌলতানাও এক উজ্জ্বল আশার কথা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন :

I am hopeful about the talk.

[*The Morning News*, March 25, 1971]

মুজিব এবং ইয়াহিয়ার আলোচনায় যে একটি আপোষ হতে যাচ্ছে, এ সম্পর্কে লাহোরের পাকিস্তান টাইমস্ লিখলেন :

To Mujib he (President) indicated that there were no serious objections to the four point proposals and that an interim constitution could be worked out by the respective advisers accordingly. The basic points on which an agreement was reached were: (i) lifting of martial law and transfer of power to a civilian government by a presidential proclamation, (ii) transfer of power in the provinces to the majority parties, (iii) Yahya to remain the President and in control of the Central Government

and (iv) separate sitting of the National Assembly members from East and West Pakistan preparatory to a joint session of the house to finalise the constitution. The last suggestion in fact came from Yahya to accommodate Bhutto.

[*The Pakistan Times*, March 23, 1971]

সুতরাং, এ কথা স্পষ্ট যে, চারটি স্বীকৃতির ভিত্তিতে মুজিব ও ইয়াহিয়ার আলোচনা রাজনৈতিক অচলাবস্থা অবসানের পথে এগোতে থাকেঃ (১) সামরিক শাসন তুলে নিয়ে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, (২) প্রদেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেয়া হবে, (৩) কেন্দ্রীয় সরকার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার হাতেই আপাততঃ থাকবে, (৪) প্রদেশ দু'টোতে পৃথক পৃথকভাবে গণপরিষদের সদস্যগণ বসবেন এবং পরবর্তীকালে যাতে দুই প্রদেশ থেকে সমগ্র সদস্যগণ একত্রে বসে অনুমোদন করতে পারেন এমন একটি সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করবেন।

দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে বঙ্গবন্ধু এই শর্তগুলোতে সম্মত হয়েছিলেন। তা' ছাড়া তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এভাবে শান্তিপূর্ণ পথে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই বাংলাদেশের স্বাধীনতা একদিন না একদিন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে। সারাজীবন তিনি নিয়মতান্ত্রিক পথে সংগ্রাম ক'রে এসেছেন—সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি সহজেই যেতে চান নি। কিন্তু আসলে ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র সব নিয়মতান্ত্রিক পথকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ঠেলে দিয়েছিল। মুজিব শেষ পর্যন্ত সেই পথে দৃপ্ত পদবিক্ষেপেই যাত্রা করেছেন।

শেখ মুজিব শেষ অবধি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের পথে বিশ্বস্ত ছিলেন। এদিকে ভেতরে ভেতরে যা নির্দেশ দেবার তা' তিনি সবাইকেই দিয়েছিলেন। একদিকে যদিও ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ-এর ভাষণে তিনি প্রকাশ্যেই বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', তথাপি শেষ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক পথই এই শান্তিকামী, মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মহানায়কের কাঙ্খিত পথই ছিল।

এমন কি প্রেসিডেন্ট ও শেখ মুজিবের মধ্যে চারটি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে সমঝোতা হয়েছিল তার বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্ব দেখে বঙ্গবন্ধুর মনে সন্দেহের উদ্রেক হলেও তিনি আশা হারিয়েছিলেন না। সামরিক বাহিনীর বর্বরগুলো এদেশবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্ব পর্যন্ত প্রদত্ত তাঁর সর্বশেষ বিবৃতিতে তিনি দুঃখ ক'রে একথার উল্লেখ করেছেন। 'ডন' পত্রিকা থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ উদ্ধৃত হ'ল ঃ

The arrival of the President in Dacca and his subsequent talks led the people to expect that there was a realisation that this grave crisis engulfing the country could only be resolved politically. It was for this reason that I met the President. The President affirmed that there could only be a political solution of the crisis. Upon that promise, certain fundamental principles on which such a solution would be based were accepted by the President. Subsequently my colleagues sat with the President's advisers to work out those principles. We have thus done our duty and contributed our utmost efforts towards the attainment of a political solution. There is no reason or justification for any delay. If a political solution is desired by those concerned, they should realise that it is for them to take matters immediately to a conclusion, and that to delay this would expose the country and its people to grave hazards. It is, therefore, unfortunate that there is a regrettable delay in resolving the crisis politically. Indeed, the critical situation already prevailing is being aggravated by renewed military activities, the pace of which, according to reports from different parts of Bangladesh, is being stepped up. This is all the more regrettable at a time when the President is in Dacca for the declared purpose of resolving the crisis politically. After last week's firing at Joydevpur, reports of atrocities are pouring in from Rangpur, Saidpur, where curfew has been imposed. From Chittagong, there are reports of heavy firing on the civilian population (emphasis added).

[*Dawn*, Karachi, March 26,1971]

এ সম্পর্কে একজন প্রখ্যাত লেখক লিখেছেন ঃ "While Awami Leage ledears were anxiously awaiting a call from General Peerzada for the final session, which never materialized, it was learnt that Ahmed had suddenly left for Karachi on the morning of 25 March without any warning to the Awami League. No one knew what transpired in the private meetings between Yahya and Bhutto at Dacca, but a consensus between the two must have been reached.

[সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯]

দুইজনের এই মতৈক্য বা consensus between the two যে কি ব্যাপারে তা' বিশ্ববাসীর কাছে অবিদিত নেই। গণহত্যা, রক্তপাত, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ধ্বংস এ সবই সেই মতৈক্যের ফসল—এক কোটি মানুষের স্বদেশ ত্যাগ, ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবনাবসান, অসংখ্য নির্যাতন সবই সেই ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি। বিখ্যাত সাংবাদিক Peter Hazelhurst এ সম্পর্কে চমৎকার তথ্য প্রদান করেছেন ঃ

Yahya and Mujib had agreed to an interim settlement providing (i) immediate withdrawal of martial law by a presidential proclamation, (ii) immediate restoration of power at the provincial level, and (iii) the interim Central Government to be administered by the President until the constitution was framed. Bhutto opposed the scheme stating that if martial law was withdrawn, and power transferred to the provinces, Pakistan would be broken up into five sovereign states. 'It was Bhutto who finally brought the President to take the decision which set East Bengal on fire ... ... Taking events to their logical conclusion there is no doubt that the present holocaust was precipitated by President Yahya Khan when he postponed the Assembly without consulting the Bengalis, but even more so by Mr. Bhutto's deliberate decision to boycoott the Assembly on 3 March.

[*The Manila Chronicle*, July 5, 1971]

সুতরাং ঘটনার ঐকান্তিক বিশ্লেষণে একথা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, ভুট্টো এবং ইয়াহিয়ার যৌথ ষড়যন্ত্রে ও সম্মতিতে পূর্ব বাংলার ওপর গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ আরোপিত হয় এবং পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকে বাংলার মাটিতে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধু সুদক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যে অবহিত ছিলেন না, তা' নয়। তাঁর গণনায় যে ভুল হয়েছিল, এমন কথাও সত্য নয়। তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন বলেই ৭ই মার্চ তারিখের ঐতিহাসিক ভাষণে মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে জনগণকে সজাগ ক'রে দিয়েছিলেন—জনমনকে তিনি সম্পূর্ণ তৈরী থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর প্রায় প্রত্যেক দিনই তিনি জনগণকে সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন, প্রস্তুতির ডাক দিয়েছেন। ২৩শে মার্চ তিনি বলেছেন যে, বাংলার মানুষ কারো করুণার পাত্র নয়—আপন শক্তির দুর্জয় ক্ষমতার বলেই তারা মুক্তি ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। আজীবন তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রনায়ক—বহু ভাষণে ও বিবৃতিতে তিনি একথা বলেছেন যে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি বিশ্বাসী নন। তিনি তাই বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিয়মতান্ত্রিক পথেই অগ্রসর হতে সর্বশক্তি ও সাধনা নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু যখন বর্বর পশুশক্তি আঘাত হেনেছে—যখন নিয়মতান্ত্রিক পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়েছে, তখনই তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ২৫শে মার্চ রাত্রি বারোটার পর তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন এবং দেশবাসীকে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানান। তাঁর সে আহ্বানে সাড়ে সাত কোটি মানুষ বাঁধভাঙা সমুদ্র কল্লোলের ন্যায় ছুটে এসেছে, যুদ্ধ করেছে, জীবন দিয়েছে এবং দেশকে স্বাধীন ক'রে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর গণনায় ভুল হয় নি। তিনি যে ইয়াহিয়ার ওপর আস্থা রেখে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তার অর্থ এই নয় যে, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ষড়যন্ত্র এবং এর পরিণতি তিনি ধরতে পারেন নি—এর কারণ এই যে, তিনি নিয়মতান্ত্রিক পথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত ছিলেন—সে পথে বিপদ ও বাধা যত বড় ও গুরুতরই হোক না

ঘটনার ঐকান্তিক বিশ্লেষণ

কেন। তিনি তা' পেরেছেন, কেননা তাঁর প্রত্যয় ছিল জনগণের শক্তির ওপর এবং ন্যায়ের সুনিশ্চিত বিজয় সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ আস্থা ছিল। এই ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করতে হ'লে শেখ মুজিবের সারা জীবনের অটল আত্মবিশ্বাস, অপরিসীম মনোবল এবং গণতান্ত্রিক অদম্য চেতনার সাথে একাত্ম হওয়া দরকার। অন্যথায়, যাঁরা বলবেন যে, শেখ মুজিবের গণনায় ভুল ছিল, তাঁদের নিজেদেরই গণনায় ভুল হবার সম্ভাবনা থাকবে বলে আমার আশঙ্কা হয়। আমার উল্লেখিত বিশ্লেষণের প্রমাণ বহু ঘটনায়, বহু বিবৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে। বেশী দূরে যেতে হবে না—২৩শে মার্চ-এ তিনি যে সব কথা বলেছেন তার মধ্যেই এই সত্য জাজ্বল্যমান হতে দেখা যায়। তিনি বলেছেন, 'মনে রাখবেন সর্বাপেক্ষা কম রক্তপাতের মাধ্যমে যিনি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন, তিনিই সেরা সিপাহসালার।' আবার বলেছেন, 'মুক্তির লক্ষ্যে আমরা পৌঁছিবই, বাংলার মানুষকে আর পরাধীন করিয়া রাখা যাইবে না।'

বস্তুতঃ ঘটনাগুলো ভাসাভাসাভাবে বিচার করলে মনে হতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু সংগ্রামের প্রস্তুতি না নিয়েই সমগ্র দেশকে সংগ্রামের পথে ঠেলে দিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, দু'জন জাঁদরেল সেনানায়কের শাসনামলেই বাংলাদেশের সমগ্র সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব ও সাফল্যের পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে। আর দু'জন সেনানায়কেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই একজন গণনায়কের ওপর। তাঁর পক্ষে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়া সহজ ছিল না। নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম করেই তাঁকে বারবার কারাগার বরণ করতে হয়েছে এবং পরিণামে দেশদ্রোহী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শিকার হতে হয়েছে। সুতরাং যে পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তার চেয়ে প্রকৃষ্টতর অন্য কোন পথ বোধ করি বেছে নেয়া সমীচীন ছিল না, সমীচীন হ'তও না।

অবশ্য একাত্তরের মার্চ মাসের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধুর যাত্রাপথে দুটো প্রধান গতি সঞ্চারিত হয়েছে। একদিকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, অন্যদিকে ভেতরে ভেতরে সংগ্রামের প্রস্তুতি। পঁচিশ দিনের ঘটনাপঞ্জী বিচার করলে দেখা যাবে যে, তিনি সমগ্র দেশকে একটি পুঞ্জীভূত আগ্নেয়গিরিতে রূপান্তরিত করেছেন—যে কোন সময় যেন আহ্বান

করলেই অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে পারে। তাঁর সুদীর্ঘ কালের নিয়মতান্ত্রিক অথচ সংগ্রাম-সচেতন সাধনার ফলশ্রুতি ঘটেছে সত্তরের নির্বাচনের পর থেকে সামগ্রিক ঘটনারাশিতে—বিশেষ ক'রে মার্চ মাসের পঁচিশ দিনে। তাঁর এই সাফল্যের ফলেই ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রির পর তিনি যখন স্বাধীনতার ও সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন, সে ডাক বৃথা যায় নি। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল—এই ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে মুজিবের অবদান বিস্ময়কর। আগ্নেয়-গিরি তিনিই নির্মাণ করেছিলেন—অগ্ন্যুৎপাতও ঘটিয়েছেন তিনিই।

যা হোক, আবার ঘটনার বিবরণে ফিরে আসা যাক। ঘটনার পূর্বাপর বিবরণই আমার বিশ্লেষণের সত্যতা প্রমাণ করবে।

ইতিমধ্যে ঘটনার নানারূপ নাটকীয় পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। বাংলার মীরজাফরেরা তাদের পোশাক বদল করতে আরম্ভ ক'রে দেয়। তারা তাদের পূর্ববর্তী কার্যকলাপের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ ক'রে বাংলাকে মুক্ত করার সংকল্প জ্ঞাপন করতে লেগে যায়।

মীরজাফরদের পোশাক বদল

এলো ২৩শে মার্চ। এই দিনটি বরাবর পাকিস্তানের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়ে এসেছে। কিন্তু এবারের ২৩শে মার্চ নতুন এক তাৎপর্যমণ্ডিত। বঙ্গবন্ধু আগে এক ঘোষণায় এই দিনটিতে ছুটি ঘোষণা করেছিলেন এবং প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের ডাকে এ-দিনটি বাংলাদেশ-ব্যাপী 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

প্রতিরোধ দিবস

এই দিন বাংলাদেশের সর্বত্র সরকারী ও বেসরকারী অফিস-ভবনসমূহে, বাড়ীঘরে, ও যানবাহনে কালো পতাকার পাশাপাশি স্বাধীন বাংলার পতাকা উড্ডীন করা হয়।

ঢাকার পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের সদস্যরা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' রবীন্দ্রনাথের এই গানটি গাইবার পরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়। এ সম্পর্কে পরদিন প্রকাশিত খবরে বলা হয়ঃ "গতকাল প্রতিরোধ

দিবস পালন উপলক্ষে রাজধানী ঢাকায় গণজীবনে গণআন্দোলনের সাগরে ভরা কোটালের জোয়ার দেখা দেয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আউটার স্টেডিয়ামে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ছাত্র-ছাত্রীরা যে বীরোচিত কুচকাওয়াজ পরিবেশন করেন, স্বাধিকারপিপাসু হাজার হাজার নরনারী আনন্দ উজ্জ্বল কিন্তু বজ্রকঠোর দ্যুতিতে দীপ্ত এক অপূর্ব পরিবেশে তা' অবলোকন করেন। বাংলার তরুণদের এই কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়া গতকাল আকাশে বাতাসে বাঙালীর মানুষের মত মরিবার ও বাঁচিবার আত্ম-প্রত্যয়ের যে অনির্বাণ স্বাক্ষর রচনা করা হইয়াছে তাহা অতুলীয়, অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব। সকাল হইতে রাত পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় বীর বাঙালীর অগণিত মিছিল শুধু কামনা বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করিয়া গিয়াছে অবিশ্রান্ত জলধারার মত। মিছিলে মিছিলে সভা-সমিতিতে জনতার কণ্ঠ যেন কেবলি বলিতে চাহিয়াছে ঃ

শুকনো গাঙ্গে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক
ভাঙ্গনের জয়গান গাও
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক
আমরা শুনেছি ঐ, মাভৈঃ মাভৈঃ

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে মার্চ, ১৯৭১]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনের প্রাঙ্গণেও আনুষ্ঠানিকভাবে সকাল বেলায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। সন্ধ্যায় তা' আবার আনুষ্ঠানিকভাবে নামিয়ে ফেলা হয়। পতাকা উত্তোলনের সময় গান গাওয়া হয়—'জয় বাংলা জয় বাংলা মাতৃভূমি বাংলার জয়'।

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে ছাত্রলীগ বাহিনী তাঁকে অভিবাদন জানায়। অভিবাদন গ্রহণকালে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'মূল সমস্যার প্রশ্নে কোন আপোষ নেই।' সংবাদে বলা হয় ঃ "বিক্ষুব্ধ বাংলার দশদিগন্তে সর্বাত্মক মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় নয়া আঙ্গিকে আবির্ভূত তেইশে মার্চের অবিস্মরণীয় দিনে (মঙ্গলবার) বন্যার স্রোতের মত সমাগত জনতার উদ্দেশে স্বীয় বাসভবনে ভাষণ দান কালে স্বাধিকার আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় বলেন ঃ 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার

সংগ্রাম', 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'। যতদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সার্বিক মুক্তি অর্জিত না হইবে, যতদিন একজন বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, এই সংগ্রাম আমাদের চলিবেই চলিবে। মনে রাখিবেন, সর্বাপেক্ষা কম রক্তপাতের মাধ্যমে যিনি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করিতে পারেন, তিনিই সেরা সিপাহসালার। তাই বাংলার জনগণের প্রতি আমার নির্দেশ, সংগ্রাম চালাইয়া যান। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংগ্রামের কর্মপন্থা নির্ধারণের ভার আমার উপরই ছাড়িয়া দিন।' শেখ সাহেব তাঁহার ভাষণে বলেন, 'বাংলার দাবীর প্রশ্নে কোন আপোষ নাই। বহু রক্ত দিয়াছি, প্রয়োজনবোধে আরও রক্ত দিব, কিন্তু মুক্তির লক্ষ্যে আমরা পৌঁছিবই, বাংলার মানুষকে আর পরাধীন করিয়া রাখা যাইবে না।' তিনি বলেন, 'আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। কিন্তু যদি তা' সম্ভব না হয়, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচিয়া থাকার লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম আমাদের চলিতেই থাকিবে। এই সংগ্রামের পন্থা কি হইবে উহা আমিই ঠিক করিয়া দিব, সে ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিন। শোষক কায়েমী স্বার্থবাদীদের কিভাবে পর্যুদস্ত করিতে হয়, আমি জানি।' তিনি বলেন, 'অতুলনীয় ঐক্য, নজিরবিহীন সংগ্রামী চেতনা আর প্রশংসনীয় শৃঙ্খলা-বোধের পরিচয় দিয়া বাংলার মানুষ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, শক্তির জোরে তাঁহাদের আর দাবাইয়া রাখা যাইবে না।'

কাকডাকা ভোর হইতে রাজপথ, জনপথ প্লাবিত করিয়া শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন দিক হইতে দশ ঘণ্টা সময়ে ৬টি মহিলা মিছিল সহ অন্ততঃ ৫৫টি ছোট-বড় মিছিল গতকাল শেখ সাহেবের বাসভবনে আগমন করিয়া মহান জাতির মহান নেতার প্রতি অকুণ্ঠ আস্থার পুনরাবৃত্তি ও সংগ্রামের দুর্জয় শপথের স্বাক্ষর রাখিয়া যায়। সেই মিছিল-সমুদ্রের হাতে হাতে লাঠি, বল্লম, বন্দুক; চোখে মুখে মুক্তির দীপ্ত তারুণ্য আর কণ্ঠে কণ্ঠে নয়া দিনের, নব জাতির, নতুন দেশের বিজয় গাথা, কোটি প্রাণের অমোঘ সঙ্গীত 'জয় বাংলার' সাধন মন্ত্রে গর্জিয়া উঠিতে থাকে। তেইশ বৎসর ধরিয়া বাংলার দশদিগন্তে যে পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়াছে, যে পাকিস্তান দিবস পালিত হইয়াছে, যে ভাবে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সভা সমিতি হইয়াছে, আর সেই সব অনুষ্ঠানে রাজপথে, জনপথে অধিকার বঞ্চিত গণমানুষ ক্ষ্যাপা

পাগলের মত পাকিস্তানে তাদের স্বাধীনতা খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, গত কালের দিনটি তাহার তমসাবসানের সূচনা করিয়া জনতাকে নব সূর্যের নব আলোকে নয়া পতাকার দিকনির্দেশে প্রাণের টানে টানিয়া নিয়াছে জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। আর বাম হাতে বাংলাদেশের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ডান হাত জনতার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বাংলার মুকুটহীন সম্রাট সাড়ে সাত কোটি মানুষের আত্মার স্পন্দনকে একত্রে জড়ো করিয়া গর্জিয়া উঠিয়াছেন: 'বাংলার মানুষ কাহারো করুণার পাত্র নয়। আপন শক্তির দুর্জয় ক্ষমতার বলেই তাহারা মুক্তি ছিনাইয়া আনিবে। জয় বাংলা, বাংলার জয় অনিবার্য।"

[দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩শে মার্চ, ১৯৭১]

প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চেই আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের সমাধি রচিত হয়। পাকিস্তান দিবস-এর নাম ইতিহাসের পাতা থেকে চিরদিনের জন্য মুছে যায়। বাংলার জনগণ নিজেদের অস্তিত্বের স্পন্দন অনুভব করে। উপলব্ধি করে, এ আরেক দেশ—পাকিস্তানের কবরের ওপর নতুন দেশের উত্থান ঘটেছে, এ দেশের নাম বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু তখনো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন নি; কিন্তু তাঁর বক্তব্যে একথা কারো আর বুঝতে বাকি ছিল না। বাংলার মানুষ যে শোষক ও প্রবঞ্চক-শক্তিচালিত দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে পারে না, একথা তিনি প্রকারান্তরে শাসক-গোষ্ঠীকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর সেই জন্যই তিনি বলেছেন যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যদি ক্ষমতা হস্তান্তর না করা হয়, তা' হ'লে বাংলাদেশের মুক্তি কিভাবে আনতে হয় তা' তিনি দেখিয়ে দেবেন।

বঙ্গবন্ধু তা' সত্যি দেখিয়ে দিয়েছেন। বিশ্ববাসীই জানেন যে, তিনি নিজে হানাদারের হাতে ধরা দিয়েও শুধু ব্যক্তিত্বের অসাধারণ শক্তিতে কিভাবে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে পরিচালিত ক'রে পশুদের কবল থেকে বাংলাদেশের শোষিত মানুষকে মুক্ত করেছেন।

২৩শে মার্চের 'পাকিস্তান দিবস' উপলক্ষে ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ দেবার কথা ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণবশতঃ তা' বাতিল হয়ে যায়। তবে তিনি এক বাণীতে বলেন যে, শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর করার

জন্যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক সঙ্গে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, ঐ দিন আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের মধ্যে দু' দফা বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানেও সমঝোতার কথাই বিশেষভাবে বলা হয়। সমঝোতার নামে যে ভাওতা একথা বুঝতে দেয়া হয় না। জনাব ভুট্টোও পুরোপুরি দাবার চাল চেলে যাচ্ছিলেন। ইয়াহিয়াকে কাজে লাগাতে হবে এবং তিনি সার্থকভাবে সে কাজে এগোচ্ছিলেন। জনাব ভুট্টো আরো কিছু সময় অতিবাহিত করছিলেন। তাঁর বক্তব্যে বুঝা যায়, অভিষ্ট সময় এখনো আসে নি। ইয়াহিয়াও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা ক'রে আলোচনার পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছেন। লোক দেখানো এই চাওয়ার পশ্চাতে ছিল বিরাট ষড়যন্ত্র। আমরা জানি, সে প্রশস্ত পথ বেয়ে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কর্মসূচী আসে নি, এসেছে ট্যাঙ্ক আর কামানের গর্জন। সে চাওয়ার পথে কামনার স্নিগ্ধ পুষ্প ঝরে নি—ঝরেছে রক্তের প্রবাহ, অশ্রুর বন্যা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আসন্ন ২৫শে মার্চের ঘটনার প্রতি ভুট্টোর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। ভুট্টো তাঁর এই সমর্থনকে নীরবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি ; তিনি কূটবুদ্ধির আশ্রয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ইয়াহিয়ার কার্য-কলাপকে উৎসাহ দিতে থাকেন। আর সেজন্যই দেখা যায় যে, এক মহানায়কের প্রকাশ্য নির্দেশে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাংলার জনগণের মরণ-পণ সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেও তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপোষে অনীহা প্রকাশের স্পর্ধা দেখান। শেখ মুজিব ৬-দফার একটি দফাও যে ছেড়ে দেবেন না, তা' জনাব ভুট্টো ভাল করেই জানতেন, তবু আলো-চনার অজুহাত দেখিয়ে রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। ইয়াহিয়া সৈনিক, তাঁর পক্ষে এমন আচরণ অপ্রত্যাশিত ছিল না—কিন্তু রাজনীতিবিদ ভুট্টো যা করলেন তা' সত্যি অচিন্ত্যনীয়। এদিকে সেনাবাহিনী প্রস্তুতির যথেষ্ট সময় পেয়েছিল। উপযুক্ত সময় আঘাত হানার পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য তারা তাদের অনুচরদেরকে উস্কানি দিতে থাকে। এতে বিভিন্ন জায়গায় বাঙালী-অবাঙালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়।

চট্টগ্রামের সংঘর্ষের কথা আগেই বলা হয়েছে। সেখানে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অবস্থা স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

২৩শে মার্চ রাতের বেলায় রংপুর জেলার সৈয়দপুর ও ঢাকার মীরপুরে বাঙালী-অবাঙালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেধে যায়।

সেনাবাহিনীর উস্কানি

সামরিক সরকারের অনুচরেরা মীরপুরে লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ড চালায়। সৈয়দপুরে অবাঙালীরা নিরীহ বাঙালীদের ওপর আক্রমণ চালায়। বাঙালীরা রুখে দাঁড়ালে নেপথ্য থেকে বিনা তলবে সেনাবাহিনী এগিয়ে আসে এবং গুলীবর্ষণ করে। এতে কমপক্ষে ৫০ জন নিহত এবং কয়েক শ' জন আহত হয়।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এর তীব্র নিন্দা ক'রে এক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে, এইসব ঘটনা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনাকে বিপন্ন ক'রে তুলছে। তিনি বলেনঃ It is unfortunate that while a political solution is being pursued in talks with President Yahya, the atmosphere is being vitiated by these untoward incidents."

[*The Morning News*, March 25, 1971]

বঙ্গবন্ধুও জনগণকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে বলেন যে, আন্দোলন নস্যাতের চক্রান্ত চলছে। সেদিন তাঁর বাসভবনের সামনে আগত মিছিল-

শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারী

কারীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, কিছুসংখ্যক লোক আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে। বঙ্গবন্ধু এসব ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে বলেন, "তাঁদের বহু কিছু আছে এবং তাঁরা বানরের পিঠা ভাগের মত আবার এসে বসার জন্য বাংলাদেশে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করছে।" বঙ্গবন্ধু সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং বারবার সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি সৈয়দপুরের ঘটনার উল্লেখ করেন। এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য বঙ্গবন্ধু বাংলার জনগণের প্রতি নির্দেশ দেন। তিনি জনগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আমার মাথা কেনার

শক্তি কারো নেই। বাংলার মানুষের সাথে, শহীদদের রক্তের সাথে আমি বেঈমানী করতে পারবো না।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৪শে মার্চ, ১৯৭১]

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন—'জয় বাংলা-ই থাকবে, আর কেউ ক্ষয় বাংলা করতে পারবে না।' ঐ দিনই আওয়ামী লীগের তিনজন নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ এবং ডক্টর কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদেষ্টাদের সাথে দু'ঘণ্টা স্থায়ী এক বৈঠকে মিলিত হন। 'রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে মূলনীতি সংক্রান্ত যে সমঝোতা হয়েছে তদনুযায়ী বিশদ পরিকল্পনা' তাঁরা সমবেতভাবে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে পেশ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি মিঃ কর্নেলিয়াস, লেঃ জেঃ পীরজাদা, কর্নেল হাসান ও পরিকল্পনাবিদ কুখ্যাত এম. এম. আহমদ।

শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠক

ঐদিন ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকে। টেলিভিশন কেন্দ্রে প্রহরারত কর্মচারীদের সাথে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে কর্মচারীরা একযোগে কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অসহযোগ আন্দোলনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্রও শেখ মুজিবের নির্দেশাবলী পালন করতে থাকে। আন্দোলনের সমর্থনে অনুষ্ঠান-সূচী প্রচার করা হয়। এমনকি 'রেডিও পাকিস্তান' ঢাকা এর পরিবর্তে তা' 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' বলেও ঘোষণা করা হতে থাকে।

যা হোক, পরদিন ২৫শে মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্টের 'জাতির' উদ্দেশে বেতার ভাষণ দেবার কথা। বাংলাদেশের জনগণের মনে এরকম একটা আশাও উঁকি মারলো যে, হয়তো ইয়াহিয়া তাঁর ওয়াদা পালন করবেন—সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন। বিশেষ ক'রে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের উক্তি সে ধারণাকে উজ্জীবিত করল। ২৪শে মার্চে মিয়া মমতাজ দৌলতানা নেতৃবৃন্দের বৈঠকের ফলাফলে আশাবাদ প্রকাশ করলেন। একই দিনে জনাব ভুট্টোও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার

পর বলেছেন, 'We are making some progress.' ফলে সেদিনকার মত আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় নেতৃবৃন্দ খান আবদুল ওয়ালী খান, খান আবদুল কাইয়ুম খান, সর্দার শওকত হায়াৎ খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, মওলানা মুফতী মাহমুদ প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করতে লাগলেন। এই নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের পন্থা উদ্ভাবনে সহায়তার জন্য ঢাকায় এসেছিলেন। এঁদের কেউ কেউ দফায় দফায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনাতেও মিলিত হয়েছিলেন, ভুট্টো-ইয়াহিয়ার কার্যকলাপের সমালোচনা ক'রে, এঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা প্রদানের জন্য জোর সুপারিশও করেছিলেন। তথাপি আসল কাজ সমাধা হবার পূর্বেই আকস্মিকভাবে তাঁদের ঢাকা ত্যাগকে জনগণ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারল না।

পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের ঢাকা ত্যাগ

পরদিন ২৫শে মার্চ। ভোর থেকেই মিছিলের পর মিছিল সারা শহর প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। প্রত্যেকটি মিছিলেই জনতা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। শ্লোগানে তারা প্রত্যেক বাঙালী নেতাকে বারবার হুঁশিয়ার ক'রে দিতে লাগলো। এইদিন বঙ্গবন্ধু জনগণকে ষড়যন্ত্রকারীদের স ম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়, সেদিকে সকলকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

২৫শে মার্চ

সেদিনও সকালে জনাব ভুট্টো ইয়াহিয়ার সঙ্গে ৪৫ মিনিট ধরে কথা বলনে। পরে তিনি সাংবাদিকদেরকে বলেন, 'শেখ মুজিবের ৪-দফা দাবীর ব্যাপারে তাঁর দলের নীতিগতভাবে কোন আপত্তি নেই। দেশের উভয় অংশেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক, এটাই তাঁদের কাম্য।' তিনি আরো বলেন যে, শেখ মুজিব যে স্বাধিকার দাবী তুলেছেন, তা' স্বাধীনতারই নামান্তর। তিনি সরাসরি শেখ সাহেবের সাথে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন, অথচ শেখ মুজিব তাতে রাজী হন নি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ক্ষমতালোভী ভুট্টো নির্লজ্জভাবে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক আইনে পৃথিবীতে কোথাও সংখ্যালঘিষ্ঠ দল ক্ষমতার অধিকারী হয়—এ ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু ভুট্টো অবৈধভাবেই তা' পাওয়ার জন্য যে অস্বাভাবিক অস্থিরতা প্রকাশ করেন, তার ফল দেশের

জন্য ভয়াবহ হয়েছে। শেখ মুজিব তাঁর ৬-দফা দাবী থেকে একচুলও নড়বেন না এবং তাতে ব্যর্থ হ'লে যে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হবে সে কথা জেনেও জনাব ভুট্টো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতার লোভে শেখ মুজিবের নিকট থেকে অন্যরূপ বিবেচনার প্রত্যাশা করতে থাকেন। সে কথা আবার নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি।

ভুট্টোর উক্তিতে অশুভ ইঙ্গিত

যা হোক, প্রেসিডেন্ট তাঁর বেতার ভাষণে এ ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করবেন—এ আশায় সবাই প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, সামরিক বাহিনী আবার বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। বিশেষ ক'রে রংপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তারা নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করে। এতে কমপক্ষে ১১০ জন নিহত হবার সংবাদ পাওয়া যায়। এই সংবাদে বঙ্গবন্ধু ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি এর প্রতিবাদে ২৭শে মার্চ সারা দেশে হরতাল আহ্বান করেন। কিন্তু সে হরতাল আর পালন করা সম্ভব হয় নি। তার আগেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। যে ২৫শে মার্চে ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণ দিতে চেয়েছিলেন, সে তারিখেই তিনি ঘোষণা করলেন বাঙালীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ। বাংলার নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষের ওপর চালানো হ'ল মানবেতিহাসের নিষ্ঠুরতম ও ভয়াবহতম গণহত্যা। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের আকস্মিক ঢাকা ত্যাগের কারণ এখন আর কারো নিকট অজ্ঞাত থাকলো না। ২৫শে মার্চের কালো রাত্রি নেমে এলো। এই রাত্রির বারোটার পর অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম লগ্নেই বাঙালীর অবিসম্বাদিত প্রাণপ্রিয় মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন। তাঁর সেই ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য বাংলার ঘরে ঘরে জ্বলে উঠলো রক্তলাল মশালের লেলিহান শিখা।

সামরিক বাহিনীর তৎপরতা

॥ মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক তৎপরতা ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ॥

২৫শে মার্চের রাত্রিতে তাঁর ধানমণ্ডীস্থ বাসভবন আক্রান্ত হবার পূর্বে রাত্রি বারটার পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা

ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সহকর্মীদের ও দেশবাসীর উদ্দেশে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার আহ্বান জানান। তিনি ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রিতে সহকর্মী ও দেশবাসীর নিকট ঘোষণা করেনঃ 'আজ থেকে (অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম লগ্ন) বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। একে যেমন করেই হোক শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে।"

বঙ্গবন্ধু এই ঘোষণা বাংলার বীর জনগণের নিকট পৌঁছিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। প্রথমে ঢাকা বেতারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কিন্তু বেতার কেন্দ্র পাক হানাদারগণ অবরুদ্ধ ক'রে রাখায় তা' সম্ভব হয় নি। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম বেতারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শেষ পর্যন্ত ওয়ারলেসে তিনি খবরটি পৌঁছে দিতে সমর্থ হন। বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘোষণা জারী করেছিলেন তা' চট্টগ্রামের বেতারের নিকট এবং জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তাঁরই বিশিষ্ট সহকর্মী জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ও জনাব এম. আর. খানের সাথেও তিনি টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জারীকৃত তাঁর এই স্বাধীনতা ঘোষণা-বার্তার অনুলিপি গণভবনে রক্ষিত দলিল থেকে নিম্নে উৎকলিত হ'ল ঃ

Declaration of War of Independence

Pak Army suddenly attacked E.P.R. Base at Pilkhana, Rajarbag Police Line and killing citizens. Street battle are going on in every street of Dacca-Chittagong. I appeal to the Nations of the World for help. Our freedom fighters are gallantly fighting with the enemies to free the motherland. I appeal and order you all in the name of Almighty Allah to fight to the last drop of blood to liberate the country. Ask Police, E. P. R., Bengal Regiment and Ansar to stand by you and to fight. No compromise. Victory is ours. Drive out the last enemy from the holy soil of motherland. Convey this message to all Awami League leaders, workers and other patriots and lovers of freedom. My Allah bless you.

Joy Bangla. SK. MUJIBUR RAHMAN

সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরবার জন্য ওয়ারলেসের মাধ্যমে যাঁদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া

হয় তাঁদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল। গণভবনে রক্ষিত ইংরেজীতে লিখিত উক্ত ঘোষণাপত্রে যেভাবে তাঁদের নাম ও ঠিকানা লিখিত আছে তার অনুলিপি নিম্নে দে'য়া গেল :

1. Management and guidence by :
   A. K. S. M. A. Hakim, A. E. W.
2. Received and transmitted by :
   Md. Jalal Ahmed, (T. T. R.) E. S. W.
3. Aided by: Gulhashuddin, Ex. E. P. R. T. T. R.
4. Aided by: Md. Shafiqul Islam, E. S. W.
5. Aided by: Abul Kashem Khan, T. T. R.
6. Aided by: Abul Fazal, Cashiar.

এই ছ'য় জনের কোন ব্যক্তি কি ব্যবস্থা করেছেন, কে ঘোষণাটি গ্রহণ ক'রে ট্র্যান্সমিট করেছেন, কে কে সাহায্য করেছেন উক্ত দলিলে তা' কালের সাক্ষী হিসেবে লিখিত রয়েছে।

জনৈক রাজনৈতিক সহকর্মী যিনি প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শেখ মুজিবের সাথে ছিলেন, তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে আমি যে তথ্য পেয়েছি তাও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা ঘোষণার একটি খসড়া তৈরী ক'রে সেটি সুন্দর ক'রে লিখে শেখ মুজিবের হাতে দে'য়া হ'লে প্রথমে তিনি সেই ঘোষণায় সই করতে মৃদু আপত্তি করেন—কারণ তখনো পর্যন্ত তাঁর সহকর্মীরা তাঁর বাসভবন থেকে চলে গেছেন কিনা এ সম্পর্কে তাঁকে নিশ্চিত হতে হবে। যখন তিনি জানলেন যে, এখন প্রায় সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছেন তখন তিনি সেই ঘোষণাপত্রে সই করলেন। সই করার পর সেটি সর্বত্র প্রচারের যথাযোগ্য ব্যবস্থাও তিনি সম্পন্ন করলেন।

"বাংলাদেশ—সার্বভৌম স্বাধীন-পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের কথা তাদের বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন।

রাজারবাগে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ ও পুলিশ বাহিনীর উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়। বহু নিরস্ত্র মানুষ নিহত। ঢাকা শহরে এবং ঢাকার অন্যান্য অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশের সঙ্গে পিণ্ডির সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাঙালী শত্রুর সঙ্গে বীরের মত যুদ্ধ করছে।

আমি মুজিব বলছি ঃ বাংলাদেশের কোণায় কোণায় দুশমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন, শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করুন।

জয় বাংলা।"

[অমিতাভ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১]

বঙ্গবন্ধুকে কখন কিভাবে গ্রেফতার করা হয় তার বিবরণ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা সহধর্মিনী বেগম মুজিবের একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যাবে। সাক্ষাৎকারটি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল ঃ

"বেগম মুজিব বলেন, প্রথম থেকেই ইয়াহিয়া পশুটাকে আমি বিশ্বাস করতাম না। গত বছরের এই দিনের স্মৃতি চারণ করতে গেলে প্রথমেই আমার মন কেঁদে উঠে। সেই ভয়াল ২৫শে মার্চের কালো রাত থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এ দেশের পরিজনহারা লাখো লাখো পরিবারের কথা ভেবে অশান্ত হয়ে ওঠে মন। তাই পৃথক ক'রে হিংস্র ঐ রাতটার কোন কথা বলতে বা ভাবতে আমার মন সায় দেয় না—বল্লেন শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।....গত বছর ২৫শে মার্চের সকাল থেকে বাড়ীর অবস্থা ভার ভার লাগছিল। দুপুর তখন প্রায় সাড়ে ১২টা, আমাদের বাসার সামনে দিয়ে সৈন্য বোঝাই দু'টো ট্রাক চলে গেল। দোতলা থেকেই ট্রাকগুলো দেখে আমি নীচে চলে এলাম। শেখ সাহেব তখনও আগত লোকদের সাথে কথাবার্তায় ব্যস্ত। তাঁকে ভেতরে ডেকে মিলিটারী বোঝাই গাড়ী সম্বন্ধে বলতেই দেখলাম পলকের তরে মুখটা তাঁর গম্ভীর হয়ে গেল। পরক্ষণেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত দিনটা কেটে গেল থমথমে ভাবে। এলো রাত—সেই অশুভ রাত! রাত সাড়ে আটটায় তিনি সাংবাদিকদেরকে বিদায় দিলেন। আওয়ামী লীগ সহকর্মীদেরও কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে দ্রুত বিদায় দিলেন।

রাত প্রায় ১০টার কাছাকাছি। কলাবাগান থেক এক ভদ্রলোক এসে শেখ সাহেবের সামনে একেবারে আছড়ে পড়লেন। তাঁর মুখে শুধু এক কথা—"আপনি পালান, বঙ্গবন্ধু পালান।" ভেতর থেকে তাঁর কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো আমারও মন। বড় মেয়েকে তার ছোট বোনটা সহ তার স্বামীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। যাবার মুহূর্তে কি ভেবে যেন ছোট মেয়েটা আমাকে আর তার আব্বাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো। শেখ সাহেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে শুধু বললেন, 'বিপদে কাঁদতে নেই মা'। শেখ সাহেব তখন ভীষণ ব্যস্ত। স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারেই সম্ভবতঃ তিনি সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তখন চারিদিকে সৈন্যরা নেমে পড়েছে। ট্যাঙ্ক বের করেছে পথে। তখন অনেকেই ছুটে এসেছিল ৩২নং রোডের এই বাড়ীতে। বলেছিলো, বঙ্গবন্ধু আপনি সরে যান। উত্তরে দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে তিনি বলেছিলেন, না, কোথাও যাব না। সাড়ে সাত কোটি মানুষকে রেখে কোথাও যাব না আমি। রাত ১১টা থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দূর থেকে তখন গুলির শব্দ ভেসে আস্‌ছিল। দেখলাম প্রতিটি শব্দ-তরঙ্গের সাথে সাথে শেখ সাহেব সমস্ত ঘরটার মাঝে পায়চারী করছিলেন। অস্ফুটভাবে তিনি বলছিলেন, এভাবে বাঙালীকে মারা যাবে না। বাঙালী মরবে না।

আনুমানিক রাত বারটা সাড়ে বারটার পর থেকেই গুলীর শব্দ এগিয়ে এলো। ছেলেমেয়েদের জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম পাশের বাড়ীতে সৈন্যরা ঢুকে পড়েছে। স্পষ্ট মনে আছে, এ সময় আমি বাজের মতই ক্রুদ্ধ গর্জন শুনেছিলাম, গো অন চার্জ। সেই সাথে সাথেই শুরু হ'ল অঝোরে গোলা বর্ষণ। এই তীব্র গোলাগুলির শব্দের মধ্যেও অনুভব করলাম সৈন্যরা এবার আমার বাড়ীতে ঢুকেছে। নিরুপায় হয়ে বসেছিলাম আমার শোবার ঘরটাতে। বাইরে থেকে মুষলধারে গোলাবর্ষণ হ'তে থাকলো এই বাড়ীটা লক্ষ্য ক'রে। ওরা হয়ত এই ঘরটার মাঝেই এমনিভাবে গোলা বর্ষণ ক'রে হত্যা করতে চেয়েছিল আমাদেরকে। এমনভাবে গোলাবর্ষণ হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল সমস্ত বাড়ীটা বোধহয় ধ্বসে পড়বে। বারুদের গন্ধে মুখ চোখ জ্বলছিল। আর ঠিক সেই দুরন্ত মুহূর্তটাতে দেখছিলাম ক্রুদ্ধ সিংহের মত সমস্ত ঘরটার মাঝে অবিশ্রান্তভাবে পায়চারী করছিলেন শেখ সাহেব। তাঁকে এভাবে রেগে যেতে কখনো আর দেখি নি আমি।

আনুমানিক রাত প্রায় সাড়ে বারোটা একটার দিকে ওরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে উপরে উঠে এলো। এতক্ষণ শেখ সাহেব ওদের কিছু বলেন নি। কিন্তু এবার অস্থিরভাবে বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সামনে। পরে শুনেছি সৈন্যরা সে সময় তাঁকে হত্যা ক'রে ফেলত যদি না কর্নেল দু'হাত দিয়ে তাঁকে আড়াল করতো। ধীর স্বরে শেখ সাহেব হুকুম দিলেন গুলী থামাবার জন্য। তারপর মাথাটা উঁচু রেখেই তিনি নীচের তলায় গেলেন। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। আবার তিনি উঠে এলেন উপরে। মেজো ছেলে জামাল এগিয়ে দিল তাঁর হাতঘড়ি ও মানিব্যাগ। স্বল্প কাপড় গোছানো সুটকেস আর বেডিং তুলে নিল সৈন্যরা। যাবার মুহূর্তে একবার শুধু তিনি তাকালেন আমাদের দিকে। পাইপ আর তামাক হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সাথে। সোফার নীচ থেকে, খাটের নীচ থেকে, আলমারীর পাশ থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন দলকর্মী। ওরা আস্তে আস্তে বল্লো, মাগো, আমরা আছি—আমরা আছি। ওদের সকলের মাঝে দাঁড়িয়ে সে রাতে কেঁদে ফেলেছিলেন বেগম মুজিব। বলেছিলেন, খোদার কাছে হাজার শুকুর, তোদের অন্ততঃ ফেরত পেয়েছি। তোরা অন্ততঃ ধরা পড়িস নি।" এ পর্যন্ত বলেই তিনি শেষ করলেন সেই রাতটার কথা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন

সামরিক বাহিনীর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে এবং জীবন রক্ষার্থে লক্ষ লক্ষ লোক নিজের বাসভূমি ত্যাগ ক'রে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণের প্রায় সবাই ভারতে আশ্রয় নেন। অতঃপর ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের গণপ্রতিনিধিগণ বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা তথা মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও ত্বরান্বিত এবং রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার জন্যে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠন করেন। ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগরে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্যূন ৫০ জন বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে এক বিপুল জনসমাবেশে প্রকাশ্যে এই নবজাত রাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদের নাম ঘোষণা করা হয়।

[সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২]

এতে সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত করা হয়। উপ-রাষ্ট্রপ্রধানরূপে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীরূপে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ সরকারের কার্যভার পরিচালনার দায়িত্ব পান। তবে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও তাঁদেরকে সাহায্যের জন্য জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ (আইন, সংসদীয় ও পররাষ্ট্র দফতর), জনাব কামরুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র দফতর) এবং জনাব মনসুর আলী (অর্থ দফতর) অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে মনোনীত হন। বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চের পূর্বেই কর্নেল এ. জি. এম. ওসমানীকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি তাঁর স্বপদেই বহাল থাকলেন।

ঐ দিন বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের পক্ষে অধ্যাপক ইউসুফ আলী (তৎকালীন জাতীয় পরিষদের চীফ হুইপ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। উক্ত ঘোষণাপত্রটি ছিল এইরূপ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র

"যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল; যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ উক্ত অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭টি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিলেন; যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন; যেহেতু আহূত এই পরিষদ স্বেচ্ছাচার এবং বে-আইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন; যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করার পরিবর্তে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সাথে পারস্পরিক আলোচনাকালে ন্যায়নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন; যেহেতু উল্লেখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার

অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান; যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নশংস যুদ্ধ পরিচালনা করছে এবং এখনো বাংলাদেশের বে-সামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজির-বিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছে; যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা এবং নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলা-দেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ক'রে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ক'রে তুলেছে; যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে সেই হেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যাণ্ডেট দিয়েছেন সেই ম্যাণ্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন ক'রে বাংলাদেশের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ গঠনের কথা ঘোষণা করছি এবং এই ঘোষণা দ্বারা আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বে যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, সেই পবিত্র ঘোষণাকে অনুমোদন করছি এবং এতদ্বারা আমরা আরও অনুমোদন করছি ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কাজ করবেন; রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকবেন; রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন, তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করতে পারবেন।

তাঁর কর ধার্য ও অর্থ ব্যয়ে এবং গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মুলতবী ঘোষণার ক্ষমতা থাকবে। তিনি বাংলাদেশের জনসাধারণের

জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর কর্তব্য ও প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালনে যদি তিনি অক্ষম হন তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তেছে তা' যথাযথভাবে আমরা পালন করব।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে। আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য আমরা অধ্যাপক মুহম্মদ ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে ও নিয়মানুগ উপায়ে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপরাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ ক'রে তাঁকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করলাম।"

স্বাক্ষর—

এম. ইউসুফ আলী

বাংলাদেশ গণপরিষদের পক্ষ থেকে।

(অনূদিত এবং সংক্ষেপিত)

[(ক) বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, পররাষ্ট্র দফতর, নয়াদিল্লী, সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, পৃঃ ২৮১-৮২।

(খ) The Sunday Standard, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১।

(গ) সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৯-৫১।]

স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র পাঠের পর অধ্যাপক ইউসুফ আলী নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের উপ-রাষ্ট্রপ্রধান এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। দেশী-বিদেশী শত শত সাংবাদিক

সেদিন এ দৃশ্য উপভোগ করেন। বিভিন্ন বেতারকেন্দ্র থেকেও এই বর্ণনা প্রচার করা হয়।

আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ বৈধ; কেননা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের মতানুসারে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকট যদি ক্ষমতা হস্তান্তর না করা হয় এবং গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বাধার সৃষ্টি করা হয় তা' হ'লে সে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জনগণের ইচ্ছানুসারে ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারে।

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও সরকার গঠনের বৈধতা

[সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩]

জাতিসংঘের ১৯৬০ সালের ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর-এ গৃহীত ১৫১৪ (XV), ১৫৪১ (XV) নং প্রস্তাবে উপনিবেশবাদকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে স্বীকার ক'রে নে'য়া হয়েছে; প্রস্তাবের ৫নং অনুচ্ছেদে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের নিকট বিনা শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে।

প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনজীবী কুইন্‌সি রাইট (Quincy Wright)-এর মতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের আশ্রয় নিতে পারে এবং জাতিসংঘের সনদেও এর যাথার্থ্য স্বীকৃতি হয়েছে। গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারী আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট জেফারস্‌ন (Jafferson) ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে তাঁর ঐতিহাসিক স্বাধীনতা ঘোষণায় যে কথা বলেছিলেন তা' থেকে আমরা আলোকপ্রাপ্ত হ'তে পারি ঃ

"When in the course of events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bonds which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the seperate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them, a decent respect to

the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the seperation."

[Henry Steele Commager, ed , *Living Ideas in America*, N. Y., 1951, p. 125]

জেফারসনের এ ঘোষণার আলোকে এবং যে কোন গণতান্ত্রিক সংজ্ঞায় ও মানবাধিকারের স্বীকৃত নীতিতে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ও এই দেশের সরকার গঠন সম্পূর্ণরূপে বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত। মনে রাখতে হবে, আমেরিকার জনগণ ব্রিটেনের সম্রাট তৃতীয় জর্জের স্বৈরাচারী শাসনের নির্যাতন মাত্র ১৬ বছর সহ্য করেছিলেন। আমরা পূর্ব বাংলার জনগণ দীর্ঘ ২৪ বছর পর্যন্ত স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করেছি। আমাদের সহনশীলতা কম ছিল না। সহ্যশক্তির সব সীমা শেষ হ'লে পর আমরা যখন আমাদের ন্যায্য মানবাধিকার পাওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হতে দেখেছি, এমন কি সামরিকচক্র তাদের নির্মম পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ যখন আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, তখনই আমরা পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করতে বাধ্য হয়েছি। এই পথ যে কোন নিরপেক্ষ বিচারে যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত পথ।

স্পষ্টভাবে একথা তাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গণপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক সামরিক শাসকচক্র তথা ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা, প্রেসিডেন্ট জেফারসনের ঘোষণা, প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের রাজনৈতিক দর্শন, কুইনসি রাইটের মন্তব্য ও আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘের সনদের সাথে অথবা অপর সকল মানবতাবাদী নীতিসমূহের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করার পর বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের সপক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলা এবং মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিবৃতি-বক্তৃতার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। বাংলাদেশ

সরকার গঠন করার অব্যবহিত পরেই প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, "বাংলা দেশ আজ এক মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। বর্বর পাক বাহিনী বাংলাদেশে যে নিষ্ঠুর গণহত্যা চলিয়েছে, তার ফলে বাংলাদেশের জনগণের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইয়াহিয়া খানের বোঝা উচিত, বাংলাদেশে সুপরিকল্পিতভাবে গণহত্যা চালিয়ে তিনি পাকিস্তানেরই কবর খুঁড়েছেন। তাঁর এ হত্যাযজ্ঞ একটি জাতির একতা ও সংহতি রক্ষার্থে চালানো হয় নি; বরং এটা ছিল মানবতার বিরুদ্ধে এক জঘন্যতম অপরাধ, বাঙালী জাতিকে ধ্বংস ক'রে দেওয়াই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। সেনাবাহিনী তাদের চিরাচরিত রীতিনীতি ভঙ্গ ক'রে যে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও ধ্বংসলীলায় লিপ্ত রয়েছে তা' বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে বিরল। যে সমস্ত বৃহৎ শক্তিবর্গ এ গণহত্যার প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করেছে, তাদের উপলব্ধি করা দরকার, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকে ইয়াহিয়া খান হত্যা করেছে, পাকিস্তান আজ মৃত এবং স্বাধীন বাংলাদেশ আজ এক বাস্তব সত্য; কেননা সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রত্যহ তাদের তাজা রক্ত দিয়ে এই শিশু রাষ্ট্রকে সঞ্জীবিত করছে। পৃথিবীর কোন শক্তিই এই নতুন রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং আজ হোক কাল হোক বিশ্বের ছোট বড় সমস্ত রাষ্ট্রকে বাংলাদেশের এ বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবেই। সুতরাং, বিশ্বরাজনীতি এবং মানবতার স্বার্থে বৃহৎ শক্তিবর্গের উচিত ইয়াহিয়া খানের উপর প্রভাব বিস্তার করা, যেন তিনি তাঁর হত্যাকারীদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আমাদের এ নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি এবং মুক্তি সংগ্রামে বৈষয়িক ও নৈতিক সাহায্য দানের জন্য বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে প্রতিটি দিনের বিলম্ব ডেকে আনছে সহস্র মানুষের অকাল মৃত্যু ও বাংলাদেশের সম্পদের বিরাট ধ্বংস। তাই বিশ্ববাসীর প্রতি আমাদের আবেদন, কালবিলম্ব না ক'রে এই মুহূর্তে এগিয়ে আসুন এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের

তাজউদ্দিন আহমদের ঘোষণা

চিরন্তন বন্ধুত্ব অর্জন করুন। বিশ্ববাসীর নিকট আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম। বিশ্বের আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশী দাবীদার হ'তে পারে না, কেননা আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে কঠোরতর সংগ্রাম করে নি, অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করে নি।"

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১-৯৮]

সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ

ঐদিন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামও এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "আজ এই মুজিব নগরে একটি নতুন স্বাধীন জাতি জন্ম নিল। বিগত ২৪ বছর যাবৎ বাংলার মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব নেতাদের নিয়ে এগুতে চেয়েছেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীরা কখনই তা' হ'তে দেয় নি। তারা আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে এগুতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও তারা বাধার সৃষ্টি ক'রে আমাদের উপর চালালো বর্বর আক্রমণ। তাই আমরা আজ মরণপণ যুদ্ধে নেমেছি। এ যুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য। আমরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করবোই। আজ না জিতি, কাল জিতবো ; কাল না জিতি পরশু জিতবোই। বাংলাদেশে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার ঘটনা দেখেও বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রবর্গ আজ যে নীরবতা অবলম্বন করছেন, তার জন্য তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ ক'রে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন—লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে বিনা কারণে হত্যা করাকে ইসলাম অনুমোদন করে ? মস্‌জিদ, মন্দির বা গীর্জা ধ্বংস করার কোন বিধান কি ইসলামে আছে ? তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের মাটিতে আর কোন সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। হিন্দু, মুস্‌লিম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের মাতৃভুমিকে মুক্ত করতে যুদ্ধ করছে। নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা ক'রে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যাবে না। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নতুন রাষ্ট্রের সংযোজন হ'ল, তা' চিরদিন থাকবে। এমন কোন শক্তি নেই যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্বকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে পারে।"

[আবদুল গফুর, 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়বাংলা', ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ১৮৫-৮৬]

১১ই এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা এবং বিশ্বজনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে সকলের নিকট আবেদন জানানঃ "বাংলাদেশে যুদ্ধরত বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা যে বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত করেছে তা' পরিদর্শনের জন্য বিদেশী সাংবাদিক, কূটনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা আমাদের বন্ধুদেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে আবেদন জানাচ্ছি। মানবিক সাহায্য ছাড়াও আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হ'ল অস্ত্রের। আমরা বৃহৎ শক্তিবর্গকে হানাদার বাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্যে আবেদন করছি। যে সমস্ত দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আমরা তাঁদের কাছে অস্ত্র সাহায্য চাচ্ছি। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারত সরকার ইতিপূর্বেই গণহত্যার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে পাকিস্তানকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন। গ্রেট ব্রিটেন আগ্রহের সাথে বাংলাদেশের ঘটনাসমূহ লক্ষ্য করছেন। বার্মা ও সিংহল বিশ্বজনমতের ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানী বিমানে (planes) জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বেশীদিন চালিয়ে যেতে হবে না, কেননা দিন দিন আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্বজনমত আমাদের অনুকূলে আসছে। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।"

তাজউদ্দিনের ভাষণ

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২-৮৬]

বাংলাদেশ-সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এটাই একমাত্র আইনানুগ সরকার। তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষ থেকে বিশ্বের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রের কাছে নবজাত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি এবং বৈষয়িক ও নৈতিক সাহায্য দেওয়ার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান। তিনি জাতির এই ক্রান্তিকালে

অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহ্মদের ঘোষণা

সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিবর্গকে ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং এ ব্যাপারে তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও বাংলাদেশ সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানান। ভারত এবং রাশিয়াসহ যে সমস্ত শান্তিকামী গণতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়েছেন, তিনি তাঁদের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।"

[ঐ, পৃঃ ২৯৮-৯৯]

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আবেদন

১৯৭১ সালের ২১শে এপ্রিল চীনপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ উ থান্ট-এর কাছে এক আবেদনে বাংলাদেশে স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া খানের হানাদার বাহিনী নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের ওপর যে নির্মম হত্যালীলা চালাচ্ছে তা' বন্ধ করার জন্য পাক সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তারের আহবান জানান। বাংলাদেশের জনগণ যাতে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারে, সেজন্য পাক সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেও তিনি উ থান্টকে অনুরোধ করেন। এ ছাড়া উক্ত আবেদনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে লুণ্ঠন, প্রজ্জ্বলন ও গণহত্যা প্রভৃতি চালান হচ্ছে তা' দেখার জন্য পর্যবেক্ষকদল পাঠানোরও অনুরোধ করা হয়। এছাড়া, চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং ও প্রধান মন্ত্রী চো-এন-লাই এর কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় মওলানা ভাসানী বলেন যে, "সমাজতন্ত্রের আদর্শ হ'ল অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। কিন্তু আপনারা যে সমস্ত আধুনিক মারণাস্ত্র পাকিস্তানকে দিচ্ছেন, সে সমস্ত অস্ত্রের সাহায্যে পাক সেনারা বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করছে এবং এই দুর্দিনে আপনারা যদি আমাদের পাশে এসে না দাঁড়ান তবে বিশ্ববাসী ভাববে যে, আপনারা নির্যাতিত জনগণের বন্ধু নন।" অন্য একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ব্রেজনেভ, প্রেসিডেণ্ট পদগর্নী এবং চেয়ারম্যান কোসিগিনের কাছে মওলানা ভাসানী এক আবেদন বার্তা পাঠান। আবেদনে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে মিঃ ব্রেজনেভ যে বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রশংসা ক'রে এই

রক্তক্ষয়ী ধ্বংসলীলা বন্ধ করার জন্যে এবং পাক সামরিক সরকারকে সর্ব প্রকার সাহায্য বন্ধ ক'রে দেওয়ার জন্য তিনি তাঁদের নিকট অনুরোধ জানান। তা' ছাড়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্যও তিনি তাঁদেরকে আহ্বান জানান।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ নিক্সনের কাছে এক আবেদনে ভাসানী বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন যে সমস্ত সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানকে দিচ্ছে সে সমস্ত অস্ত্র দ্বারা ইয়াহিয়া-চক্র বাংলাদেশে জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে হত্যা করছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য ও পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ ক'রে দেওয়ার জন্য তিনি আকুল আবেদন জানান। তিনি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিঃ পম্পিডু, যুক্তরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এডওয়ার্ড হীথ, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো এবং মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এর কাছেও অনুরূপ আবেদন জানান। আরব লীগের সেক্রেটারী জনাব আবদুল খালেক হাসুনিয়া ও আফ্রিকার ঐক্য সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ডিয়ালো টেলীর কাছে পাঠানো এক বার্তায় বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ সৃষ্টি এবং বাংলাদেশকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য দানের জন্যও মওলানা ভাসানী একটি আবেদন প্রেরণ করেন।

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯-৩০৩]

মুসলিম রাষ্ট্রবর্গের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামিক সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক জনাব টেঙ্কু আবদুর রহমানের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ জানান। সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে পাকবাহিনী ইসলামের নামে বাংলাদেশে যে নৃশংস গণ-হত্যা, নারী ধর্ষণ, মস্‌জিদ ধ্বংস, ইমাম হত্যা ও পবিত্র কোরানের অবমাননা করছে সে সম্পর্কেও তিনি অবহিত করেন। [ঐ, পৃঃ ৩৩০]

সৈয়দ নজরুল ইসলামের আবেদন

পূর্ব-পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী জনাব আবদুস সালাম ১৯৭১ সালের ৩রা মে বিশ্বের সমস্ত কম্যুনিস্ট এবং

ওয়ার্কারস্ পার্টি'র কাছে এক আবেদনে বলেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী মহলের সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদগণকে হত্যা করছে। বাংলাদেশের জনগণ বাধ্য হয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভাড়াটে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করছে। প্রতিক্রিয়াশীল-চক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলন এবং বিশ্বের সমস্ত কম্যুনিস্ট পার্টি'র সমর্থন পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। জনাব সালাম দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দানের জন্য বিশ্বের কম্যুনিস্ট পার্টি'র কাছে আকুল আবেদন জানান। আবেদন বার্তায় তিনি উল্লেখ করেন যে, সাম্রাজ্যবাদী এবং মাওবাদী চীনের সমর্থনপুষ্ট বর্বর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেই বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধ চলছে।

আবদুস সালামের আবেদন

[পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৭-১৭]

১৯৭১ সালের ২রা জুন মওলানা ভাসানী কয়েকজন স্থানীয় ও বিদেশী সাংবাদিকের সাথে বংলাদেশের কোন এক মুক্ত এলাকায় এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের সাথে কোনরকম রাজনৈতিক সমঝোতার প্রস্তাব নাকচ করে দেন। পূর্ববাংলার জনগণের মতামত যাঁচাই করার জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পূর্ববাংলায় গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য জনাব ভাসানী দাবী জানান। খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়াতে তিনি ভারত সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সামরিক জান্তার সাথে চীনের দহরম-মহরমের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে,—এটা এক অদ্ভুত রাজনীতি। তিনি অবশ্য বলেন যে, অচিরেই চীন তার ভুল বুঝতে পারবে। এ সময় কেউ কেউ জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছিলেন। মওলানা ভাসানী এর বিরোধিতা ক'রে বলেন যে, এটা করা হলে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হবে ও ফলে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আর কোনদিন এক হ'তে পারবে না।

রাজনৈতিক সমঝোতার প্রশ্নে ভাসানী

[ঐ, পৃঃ ৩২৩-২৪]

বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহ্‌মদ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে বংলাদেশকে স্বীকৃতি ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান। আরব দেশগুলোকে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বলেন যে, এককালে আরবরা তাঁদের স্বাধীনতার জন্য তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতির যুদ্ধও অনুরূপ। তিনি আরব দেশগুলোকে বাংলাদেশকে স্বীকার করে নেওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য ও সমর্থন করার জন্য আবেদন জানান। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহকেও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে জনাব তাজউদ্দিন বলেন যে, তারাই সামরিক অস্ত্র ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে পাকিস্তানে আমলাতন্ত্র, পুঁজিবাদ এবং সামরিক চক্রকে শক্তিশালীক রছে। ভারতীয় সরকার ও জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইয়াহিয়া খানের সমর্থনপুষ্ট হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, এই দুরভিসন্ধি কোনদিন সাফল্যমণ্ডিত হবে না এবং বাংলাদেশের জনগণ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

তাজউদ্দিন আহমেদের আবেদন

[পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৫—২৮]

বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ নিক্সনের কাছে এক তারবার্তায় দুঃখ ক'রে বলেন যে, আমেরিকা নতুনভাবে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ শুরু করছে। পাক সরকার ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশে গণহত্যার কাজে ব্যবহার করছে। তিনি পাকিস্তানের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেবার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি আবেদন জানান।

নিক্সনের নকট সৈয়দ নজরুলের আবেদন

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে তখন ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলার অবস্থার স্বাভাবিকতা প্রমাণের জন্য বেসামরিক সরকার গঠনের এক প্রহসন চালাতে থাকেন। ডাক্তার এ, এম. মালিককে পূর্ব পাকিস্তানের (তাঁদের

ভাষায়) গভর্নর পদে বসিয়ে এবং তাঁর সাহায্যে একটি অস্থায়ী পুতুল মন্ত্রিপরিষদ গঠন ক'রে এই প্রহসনের অভিনয় চালানো হয়। এই অভিনয়কে আরো জমকালো করার জন্য প্রেসিডেন্ট পূর্বাঞ্চলে উপ-নির্বাচনেরও ব্যবস্থা করেন। বলা বহুল্য যে, এই উপ-নির্বাচনের সব ক'টি আসনই ছিল আওয়ামী লীগের সদস্যদের। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আওয়ামী লীগ বে-আইনী ঘোষিত হলে কতিপয় পরিষদ-সদস্য (আওয়ামী লীগ দলীয়) হানাদারদের সঙ্গে হাত মিলানোর ফলে স্বপদেই বহাল থাকলেন এবং অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলোতে উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হ'ল।

স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী জনাব ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব কামরুজ্জামান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খোন্দকার মুশতাক আহমেদ বিভিন্ন সময়ে তাঁদের ভাষণে দৃঢ়তা প্রকাশ করেন এবং এই ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে বাঙালীর বিজয় সুনিশ্চিত বলে মন্তব্য করেন।

এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ইয়াহিয়া খান বিচার করার কথা ঘোষণা করেন। এতে বিশ্ব-বিবেক প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠে। ৯ই আগস্ট বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে এই বিচার-প্রহসন সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন যে, এর পরিণতি মারাত্মক আকার ধারণ করবে। তিনি বিশ্বের সকল দেশের কাছে এই বিচার-প্রহসন বন্ধ করার জন্যও আবেদন জানান। [পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪২]

১৩ই আগস্ট জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, যদি তাঁকে হত্যা করা হয় তা' হলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এক মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হবে। তিনি জানান যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচার করার ক্ষমতা স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নেই। তিনি এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র থেকে ইয়াহিয়াকে নিবৃত্ত করবার জন্য বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে আকুল আবেদন জানান। [ঐ, পৃঃ ৩৪৩-৪৪]

১৯৭১ সালের ২২শে অক্টোবর সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহ কমিটির এক জরুরী বৈঠকে ইয়াহিয়া-চক্র কর্তৃক পূর্ব বাংলায় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রহসনের ধৃষ্টতাকে

সমুচিত জবাব দেয়ার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করা হয়। এক প্রস্তাবে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বিশ্বজনমতের প্রতি ধোঁকাবাজি বলে বর্ণনা করা হয়। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ বরদাশ্‌ত করা হবে না।

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্‌, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯]

পাকিস্তান বর্বর বাহিনীর ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে মুক্তি-বাহিনীর প্রতি বাংলাদেশের জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। যুদ্ধের শুরুতেই বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ সরকার এবং মুক্তি-বাহিনীকে সার্বিক সমর্থন দিয়ে আসছিলেন। এ পরি-প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর মুক্তিযুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের সর্ব-মতের জনগণের অংশ গ্রহণকে নিশ্চিত করার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদ-ক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজা-ফফর), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস দল নিয়ে সর্বদলীয় এক উপদেষ্টা পরি-ষদ গঠন করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে দল-মত-নির্বিশেষে সর্বস্তরের জন-গণের যে একতা ও সহযোগিতা ছিল, এই পদক্ষেপ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

[সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩]

বাংলাদেশের মুক্তি-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও জাতীয় পরিষদ সদস্য কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ৬ মাস পূর্তি উপলক্ষে বেতার থেকে এক ভাষণে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের জনগণ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা ও সার্ব-ভৌমত্ব রক্ষা এবং জাতীয় পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য জনগণ যুদ্ধ করছে। বাংলাদেশের পবিত্র ভুমি থেকে শেষ হানাদার সৈন্যটিকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত বাঙালীদের এই যুদ্ধ ক্ষান্ত হবে না। সুযোগ্য বাঙালী সাম-রিক অফিসারগণ মুক্তি-বাহিনীকে দ্রুত সুসংগঠিত ক'রে নিয়মিত সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের সমন্বয়ে একটি সুসংগঠিত বাহিনীতে পরিণত করেছেন। এ জন্যই বাংলাদেশ বাহিনীকে "মুক্তি ফৌজের" পরিবর্তে

'মুক্তি-বাহিনী' বলা হয়ে থাকে। প্রধান সেনাপতি বলেন যে, শত্রুর ওপর মুক্তি-বাহিনীর আঘাত দিন দিনই তীব্রতর হচ্ছে। অন্যদিকে দিশেহারা শত্রু বাহিনী নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা ক'রে বীরত্ব দেখাচ্ছে। প্রধান সেনাপতি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, জনগণের জয় অবধারিত।

[অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৮-৫৯]

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

রাজনীতিবিদ ছাড়াও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। বাংলাদেশে যুব সমাজ, বিশেষ করে ছাত্র-সমাজকে মুক্তি যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করে তুলতে তাঁরা অনেকেই বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শনও তাঁরা শরণার্থীদের নিকট ও মুক্তি-বাহিনীর নিকট বারবার বিশ্লেষণ করেছেন। যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, ডঃ সারোয়ার মোর্শেদ, সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, ডঃ রেহমান সোবহান, ডঃ মোশাররফ হোসেন, ডঃ আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, ডঃ অজয় রায় প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের একজন নগণ্য সেবক হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনে আমার নিজেরও যৎসামান্য ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশের কয়েকটি মুক্তিযুদ্ধ শিবিরে ও অপারেশন ক্যাম্পে আমাকে নিয়মিত থাকতে হয়েছে এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'দৃষ্টিপাত' নামক কথিকা প্রচার করতে হয়েছে। এছাড়া ভারতের মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, কেরালা, পশ্চিম বাংলা প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যে জনমত গঠনে আমাকে নিরলস পরিশ্রম করতে হয়। এই সমস্ত কারণে বর্বর সরকার আমাকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য—অন্যথায় অনুপস্থিতিতে বিচারের হুমকি প্রদর্শন করে। আমার সঙ্গে যে সব বুদ্ধিজীবীর প্রতি এই হুমকি প্রদর্শন করা হয় তাঁরা হলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক,

ডঃ সারোয়ার মোর্শেদ ও জনাব আবু জাফর শামসুদ্দিন। আমার অনুপস্থিতিতে আমাকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং আমার অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

১৯৭১ সালের ৮ই জুন রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটিতে সুধীসমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যে ভাষণ দান করেন তা' নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই ভাষণ বিশ্ব-জনমত গঠনে ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিপদগ্রস্ত হাজার হাজার মানুষকে প্রেরণা দানে সাহায্য করে।

[ফজলুল কাদের কাদেরী, বাংলাদেশ জেনোসাইড ও ওয়ার্লড্‌ প্রেস, পৃঃ ১০৬-১২]

১৯৭১ সালের ২১শে জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য জনাব আজিজুর রহমান মল্লিক কোলকাতার রবীন্দ্র সদনে সমবেত বুদ্ধি-জীবী ও শিল্পীদের উদ্দেশে এক ভাষণে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এবং জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানান।

[সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ছাত্র-সমাজের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ১০ বছর যাবৎ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের পথ প্রস্তুত করেছিলেন এই ছাত্র-সমাজ। এবারেও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তাঁরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আঃ সঃ মঃ আবদুর রব, সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ ছাত্র নেতা যুব-শক্তিকে একত্র ক'রে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা বিবৃতি-বক্তৃতার মাধ্যমেও বাংলার জনগণকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ রাখতে প্রচেষ্টা চালান। এ সময় উক্ত ছাত্রনেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে মাতৃভূমির মুক্তি ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিকে

ত্বরান্বিত করার জন্য জনগণের রায় মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারের পেছনে কাতারবন্দী হওয়ার উদ্দেশ্যে দেশের ছাত্র ও তরুণ সমাজের প্রতি আকুল আবেদন জানান। তাঁরা বলেন, "বাঙালী জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নির্দেশে পরিচালিত মুক্তি-সংগ্রামে আমাদের যোদ্ধারা শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত। মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য পাকিস্তানের চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ব্যাপারে বাংলাদেশের বীর ছাত্র-সমাজের একটা মহান ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে দেশের ছাত্র ও তরুণ সমাজকে আজ এগিয়ে এসে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বর্বর ইয়াহিয়া-চক্রকে চীন সরকার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মদদ দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, আমাদের প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে হবে। তাঁরা আরো বলেন, 'মাতৃভূমির মুক্তি অর্জনে প্রাণ দেওয়ার মত গৌরবজনক কাজ আর পৃথিবীতে কিছুই নাই। আমাদের বিজয় অবধারিত।"

[অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৮-৯৯]

তাছাড়া, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিব-বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুজিব-বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রখ্যাত ছাত্র নেতা তোফায়েল আহ্‌মদ, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান এবং আবদুর রাজ্জাক। দেশপ্রেমিক যুবক ও ছাত্রদের দিয়ে মুজিব-বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই সমস্ত তরুণরা নিজেদের অমূল্য জীবনকে আত্মোৎসর্গ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। শেখ মুজিব তাঁদের কাছে শুধু একজন ব্যক্তিই নন, একটা জীবন্ত রাজনৈতিক দর্শন, যে দর্শনকে পরবর্তীকালে তাঁরা 'মুজিববাদ' বলে আখ্যায়িত করেন। ছাত্র লীগের সংগ্রামী অংশ মুজিব-বাহিনীতে যোগ দেয়। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে যে 'বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট' গঠন করা হয়েছিল মুজিব-বাহিনী তার উত্তরসূরী ছিল।

[সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫-৫৬]

বাংলাদেশে পাক-বাহিনীর নৃশংসতা বিদেশে পাকিস্তানের দূতাবাসের বাঙালী কূটনীতিক ও কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন দেশে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালী কর্মচারীদের অনেকেই বাংলাদেশের সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকেন। বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলা ও বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনাবলীকে ঐ সমস্ত দেশের সরকার ও জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, লণ্ডন, সুইডেন, হংকং, দিল্লী এবং কলকাতায় বাংলাদেশ-মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তান দূতাবাসের ১৩০ জন বাঙালী কূটনীতিবিদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। এই সমস্ত বাঙালী কূটনীতিবিদরা পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ বন্ধ ক'রে দেয়ার ব্যাপারে এবং বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

[সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০-৭১]

॥ বাঙালীর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ॥

২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে পাক সেনাবাহিনীর বর্বর তৎপরতা শুরু হয়। আওয়ামী লীগ কর্মী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এবং শ্রমিকসহ হিন্দু জনগণকে হত্যা করাই ছিল এই তৎপরতার প্রাথমিক লক্ষ্য। একই সঙ্গে বাঙালী সৈন্য, ই, পি, আর ও পুলিশ বাহিনীর তরফ থেকে প্রতিরোধ আসতে পারে ভেবে পাক বাহিনী তাদেরকে নির্মূল করার জন্য হামলা চালায়। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে তারা নির্বিচারে বেসামরিক লোকজনের উপরও হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে, তবে সামরিক লোকদের ক্ষেত্রে তার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে। সেখান থেকে প্রচণ্ড বাধা আসে। সেনানিবাস, সীমান্ত ফাঁড়ি ও পুলিশ লাইনগুলোতে কোথাও সরাসরি হামলা চালিয়ে পাক বাহিনী বাঙালীকে নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করে, অস্ত্রাগারগুলো দখল ক'রে নেয় এবং বাঙালী সশস্ত্র লোকদেরকে গুলী করে হত্যা করতে থাকে। কোথাও আবার আক্রমণের শিকার হয়ে বাঙালীরা পাল্টা আক্রমণ

চালায়। ২৫ তারিখ রাত্রি থেকেই সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রথম মুক্তি-যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে এবং সকল বাঙালী সশস্ত্র সেনাই এই প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে সেনাবাহিনী ই, পি, আর এবং পুলিশ বাহিনীর প্রায় সমস্ত বাঙালী আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এই সমস্ত লোক তাদের পাকিস্তানী সহকর্মীদের সঙ্গে বাঙালী-স্বার্থ সম্পর্কিত প্রশ্নে প্রকাশ্যে বাক্‌বিতণ্ডার সূত্রপাত করতেন। ১৯৭১ সালে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রান্ত যখন জনগণের কাছে ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং জনগণ সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করছিল যে, স্বাধীন বাংলাদেশ ভিন্ন বাঙা-লীদের স্বার্থ সংরক্ষণের অন্য কোন বিকল্প পথ নেই, তখন সশস্ত্র ব্যক্তিদের মধ্যেও এই উপলব্ধির ব্যতিক্রম ঘটে নি। এই সময় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই, পি, আর বাহিনীর অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্য থেকে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধু, বিভিন্ন ছাত্রনেতা ও আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করতেন।

[ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৩৭৯৫ সিগন্যাল মুহম্মদ আশরাফ আলী সর্দার, বাংলাদেশ রাইফেল্‌স্‌]

অসহযোগ আন্দোলনের সেই দিনগুলোতে জনগণ পাকিস্তানী শাসক-চক্রের প্রতি যে সীমাহীন বিদ্বেষ ও ঘৃণায় ফেটে পড়েছিল আর বঙ্গবন্ধুর অগ্নিবর্ষী জলদগম্ভীর প্রত্যয়ী বাণীগুলো যে ভাবে অক্ষরে অক্ষরে প্রতি-পালিত হচ্ছিল, তার অভিঘাত পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত ব্যারাকের অভ্যন্তরে অবস্থিত বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ই, পি, আর-এর বাঙালীদের ভীষণভাবে আলোড়িত করে। একাত্তরের ২৩শে মার্চ তারিখে স্বাধীন-বাংলা ছাত্র-সংগ্রাম-কমিটি আহূত 'প্রতিরোধ' দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ই, পি, আর সাব সেক্টর হেড কোয়ার্টারগুলোতে ছাত্র-জনতা মিলে বাংলাদেশের মানচিত্র অংকিত পতাকা তুলে দিলে সেই সব স্থানে অবস্থানরত বাঙালী জোয়ান ও অফিসাররা বাধা না দিয়ে বরং শঙ্কামিশ্রিত আনন্দ অনুভব করেন।

[ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ঐ]

এমনকি ২৩শে মার্চ তারিখে পিলখানাস্থ প্যারেড গ্রাউণ্ডের বটবৃক্ষের শীর্ষে বাঙালী ই, পি, আর-এর লোকেরা এই পতাকা উত্তোলন করেন।

[ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত]

অবশ্য পাকিস্তানীরা এই পতাকা নামিয়ে ফেলে। ২৫শে মার্চের পূর্বেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী সমস্ত সশস্ত্র ছাউনিগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের আয়ত্তে আনবার প্রয়াস পায়। দেশের বিভিন্ন ই পি, আর, সাব সেক্টর কোয়ার্টার-গুলোতে বাঙালীর পরিবর্তে পাকিস্তানী কম্যাণ্ডিং অফিসার নিয়োগ, বিভিন্ন পদস্থ বাঙালী সেনাবাহিনীর লোকদেরকে পাকিস্তানে বদলী ইত্যাদি কার্য-ক্রম ছিল এই প্রয়াসের অংশ। ২৫শে মার্চের পূর্বেই সামরিক বাহিনীর লোকেরা ঢাকা বিমান বন্দরের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

[ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খোন্দকার]

পিলখানা, ই, পি, আর, হেড কোয়ার্টারে ২৫শে মার্চের পূর্বে ২২ বেলুচ রেজিমেন্টের এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য এনে রাখা হয়েছিল। ২৫শে মার্চ রাত্রে এরাই প্রথম বাঙালী ই, পি, আর-দের উপর হামলা চালায়।

[ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, মোঃ আশরাফ আলী সর্দার]

আগেই বলেছি, মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার অজুহাতে ইয়াহিয়া খান যে কালক্ষয় করেন তার উদ্দেশ্য ছিল প্রচুর সৈন্য নিয়ে এসে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। ঢাকা বিমান বন্দরকে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবার পর মার্চের প্রথম থেকেই যাত্রীবাহী ও সামরিক বিমানের মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে ঢাকা বিমান বন্দরের আকাশ-সেতু রচনা করা হয়। এই সব বিমানে শুধু সৈন্য আনা হয়। মার্চের প্রথম থেকে জলপথেও সৈন্য এবং সমর-উপকরণ আনার কাজ চলতে থাকে। ২৫ শে মার্চের রাত থেকে যে বর্বর হামলা শুরু হয় তখন বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৮ ব্যাটেলিয়ান সমন্বিত ১ ডিভিশন। এর মধ্যে শুধু মার্চ মাসে পাকিস্তান থেকে নতুন আনা সৈন্যের পরিমাণ ছিল ১২ ব্যাটেলিয়ন। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেই এই তথ্য পরিবেশিত হ'ল।

২৫শে মার্চের রাত্রে ঢাকায় রাজারবাগ পুলিশের লোকেরা ও পিলখানার ই. পি. আর.-এর জোয়ানরা অতর্কিত ট্যাঙ্ক ও ভারী সমরাস্ত্রের মুখে

সার্থক প্রতিরোধ দিতে ব্যর্থ হন। এঁদের মধ্যে অনেকে নিহত এবং বন্দী হন। অবশিষ্টদের মধ্যে কেউ অস্ত্রসহ কেউবা বিনা অস্ত্রেই ঢাকার বাইরে ছিটকে পড়ে সংগ্রামী জনতার সঙ্গে মিশে যান। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের বাঙালী সৈন্য ও অফিসারদেরকেও নিরস্ত্র করবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রবল হামলার মুখে তৎকালীন মেজর খালেদ মুশাররফ তাঁর ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদেরকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে থেকে পাক-সেনাদের প্রতি অবরোধ-ব্যূহ রচনা করেন। কুমিল্লা শহর মুক্ত হয়। একইভাবে চট্টগ্রামের ষোলশহর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করবার চক্রান্ত চলে। কিন্তু তৎকালীন মেজর (বর্তমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উপ-প্রধান মেজর জেনারেল) জিয়া ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল সৈন্যসহ ক্যান্টনমেন্ট দখল করতে সক্ষম হন এবং বন্দরে অবস্থিত পাক-সেনাদেরকে অবরোধ ক'রে পাল্টা আক্রমণ চালাতে থাকেন।

[মঞ্জুর আহমদ, 'যে ঘোষণায় হানাদারদের বুক কেঁপে উঠেছিল',

জয়দেবপুর সেনানিবাসে ২নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন তৎকালীন মেজর (বর্তমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী-প্রধান মেজর জেনারেল) সফিউল্লাহ্। ঢাকায় পাক-সেনাবাহিনীর বর্বরতার সংবাদ জানতে পেরে তাঁর সমস্ত সৈন্য রসদপত্র এবং যানবাহন নিয়ে ছাউনি থেকে ময়মনসিংহের পথে বেরিয়ে পড়েন। ময়মনসিংহে অবস্থানরত পুলিশ ও ই. পি. আর-এর লোকজন ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের পক্ষে ছাত্র-জনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। ঢাকার ঘটনা দ্রুত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বাংলাদেশের সকল জেলা-শহর ও মহকুমা-শহরগুলোতেও বিচ্ছিন্নভাবে বাঙালী ই. পি. আর. ও পুলিশ বাহিনী জনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাঁরা স্থানীয় এম. এন. এ. ও এম. পি. এ-দের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলা প্রশাসন চালু করেন এবং সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ২৬শে মার্চ সকালেই নওগাঁর ই. পি. আর. উইং কম্যাণ্ডার শহীদ মেজর নজমুল হক ও তৎকালীন ক্যাপ্টেন (বর্তমান মেজর) গিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে

বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্যের শপথ নিয়ে বগুড়া ও রাজশাহী মুক্ত করবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ২৫শে মার্চ রাত্রে রাজশাহী থেকে ঢাকার পথে পলায়নরত সেনাবাহিনী ২৬শে মার্চ সকাল থেকে পাবনা শহর আক্রমণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে পাবনার পুলিশ বাহিনী ও জনগণ প্রতিরোধ করে। এই সম্মিলিত শক্তি একজন ক্যাপ্টেন সহ প্রায় এক রেজিমেন্ট সৈন্য খতম করে। ২৭ তারিখ পাবনা শহর ও সমগ্র জেলাকে মুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে পাবনার এই বিজয় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

চাঁপাই নবাবগঞ্জে ই. পি. আর. বাহিনীকে পাকিস্তানী কম্যাণ্ডিং মেজর নিরস্ত্র করতে চাইলে তাঁরা প্রতিরোধ ক'রে ২৮শে মার্চ পাক ছাউনী দখল করেন। ওদিকে ২৬ তারিখেই বরিশাল মুক্ত ঘোষণা করা হয়। এরপর বাংলাদেশের পক্ষে মেজর জলিল প্রতিরক্ষা এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এম. পি. বরিশালের প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এমনিভাবে আক্রমণ ও পাল্টা প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই. পি. আর. ও পুলিশের সশস্ত্র ব্যক্তিদের সঙ্গে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতার সম্মিলিত ঐক্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়।

২৭শে মার্চ তারিখে তৎকালীন মেজর জিয়া চট্টগ্রাম বেতার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা প্রচার করেন। এই বেতার কেন্দ্র থেকে ৩০শে মার্চ তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বয়ং এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধের এমন সম্ভাবনাময় মুহূর্তে এই ঘোষণা সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামকে একই লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণায় সংহত সুদৃঢ় করে। এপ্রিলের প্রথম থেকে মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ঢাকা শহর, চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা ও কয়েকটি সেনানিবাস ছাড়া সমস্ত বাংলাদেশ মুক্ত ছিল।

[*The Sunday Statesman*, New Delhi, April 18, 1971]

এপ্রিল মাসের মধ্যবর্তী সময় থেকে হানাদার বাহিনী ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর সেনানিবাসগুলোর মধ্যে আকাশপথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয় এবং এই সমস্ত সেনানিবাস থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন ক'রে হামলা পরিচালিত করতে থাকে। সেনাবাহিনীর এই কাজে

বিমান বাহিনী পূর্ণরূপে ব্যবহার করা হয়। পদাতিক বাহিনী ভারী কামান ও ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে। স্বাভাবিকভাবেই এই অসম যুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিরোধ ব্যূহগুলো একের পর এক ভেঙে পড়ে। এইভাবে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে পাক-বাহিনী বাংলাদেশের জেলা ও মহকুমা-শহরগুলো দখল ক'রে নিতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ বাহিনী এর ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চল-গুলোতে পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু তথাপি একথা সত্য যে, জেলা ও মহকুমা-শহর এবং কিছু কিছু থানা-শহর ছাড়া মধ্যবর্তী গ্রামাঞ্চল, অনেক থানা এবং ব্যাপক সীমান্ত এলাকায় হানাদার বাহিনী কখনই তাদের কর্তৃত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। ৩৭০টি সীমান্ত চৌকির ভিতর অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাত্র ৯০টি চৌকিতে পাক-বাহিনী অবস্থান করতে পেরেছিল।

[*The Liberation War*, Mohammed Ayoob
K. Subramanyam, p. 155]

১০ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠন ক'রে ২৬শে মার্চে ঘোষিত স্বাধীনতাকে সমর্থন করা হয় এবং মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হয়।

১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুর থানার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করেন। এই সময় এই স্থানটির নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। একই অনুষ্ঠানে জেনারেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনী হিসেবে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। এবং জেনারেল ওসমানীর অধিনায়কত্বে তাঁরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

[দৈনিক পূর্বদেশ, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১]

বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান এবং মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়।

এর পূর্বে ৪ঠা এপ্রিল, প্রতিরোধ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কুমিল্লার তেলিয়াপাড়ায় অবস্থিত মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ্‌র হেডকোয়ার্টারে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী শীর্ষস্থানীয় সামরিক অফিসারদের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে তৎকালীন মেজর সফিউল্লাহ্‌ সহ যাঁরা উপস্থিত ছিলেন

তাঁরা হলেন কর্নেল ওসমানী, তৎকালীন মেজর জিয়া, তৎকালীন মেজর খালেদ মুশাররফ, তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রাজা (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল), তৎকালীন মেজর নূরুল ইসলাম, তৎকালীন মেজর মইনুল হাসান চৌধুরী, তৎকালীন লেঃ কঃ আবদুর রব (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ও গণপরিষদ সদস্য), পাক-সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর কাজী নুরুজ্জামান (বর্তমানে অবসর-প্রাপ্ত লেঃ কর্নেল)। এই বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। পাকিস্তানী হামলার মুখে বিচ্ছিন্নভাবে যে মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল এবং যে অবিন্যস্তভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিল, সে পরি-স্থিতিতে এই সমর-বিশেষজ্ঞরা একটি সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। একই সঙ্গে তাঁরা এমন একজন সিনিয়র অফিসারের অভাব অনুভব কবেছিলেন, যাঁর নেতৃত্বে সার্মগ্রিক যুদ্ধ পরিচালিত হতে পারে। এই বৈঠকেই সমবেত সামরিক অফিসারবৃন্দ কর্নেল ওসমানীকে সমগ্র যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেবার অনুরোধ করেন।

[ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাব, মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ্]

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে অবস্থান কালে কর্নেল ওসমানী সমগ্র সেনা-বাহিনীতে নিজেকে একজন যোগ্য অফিসার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অপরদিকে সামরিক বাহিনীতে কার্যরত বাঙালী সৈন্যদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এবং বাঙালী সৈন্যদের প্রতি পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের বিমাতাসুলভ আচরণের প্রতিবাদে তিনি সব সময় ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। ফলে, যোগ্যতা সত্ত্বেও তাঁকে মাত্র কর্নেল পদ থেকেই অবসর গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু অবসর গ্রহণ করলেও কর্মরত বাঙালী সৈন্যদের মাঝে তাঁর যে ইমেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল তা' তাঁকে একক সম্মান ও গৌরব দান করে। ধীরে ধীরে তিনি আও-য়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য হিসেবে তিনি এম. এন. এ. নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, যা একটি রাজনীতি-সম্পৃক্ত জনযুদ্ধ, সেনাপতি এমন এক ব্যক্তির হওয়া প্রয়োজন ছিল, যিনি একাধারে সৈন্য ও জনগণের আস্থাভাজন হতে পারেন। সুতরাং, সেনাবাহিনী-প্রধান হিসেবে তাঁর এই নির্বাচন সর্বত্র অভিনন্দিত হয়েছিল।

বাংলাদেশ সরকার গঠন ও প্রধান সেনাপতি নিয়োগের পর মুক্তিবাহিনী দ্রুত সুসংগঠিত করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধ সুসংগঠনের প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজন ছিল প্রথমতঃ, যে সমস্ত সশস্ত্র বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই. পি. আর., পুলিশ, মোজাহিদ, আনসার বাহিনী বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে একক কম্যাণ্ডে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়তঃ, হানাদার বাহিনীর মনোভাব, শক্তি ও প্রকৃতি লক্ষ্য সাপেক্ষে যুদ্ধ স্ট্র্যাটেজী তৈরী করা। তৃতীয়তঃ, মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী বিভিন্ন সামরিক অফিসারকে যথোপযুক্ত দায়িত্বে নিয়োগ করা এবং যুদ্ধ এলাকা নির্ধারণ করা। চতুর্থতঃ, যে বিপুলসংখ্যক ছাত্র ও কৃষক-শ্রমিকের মধ্য থেকে যুবকরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে আসছিল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধে নিয়োগ করা। পঞ্চমতঃ, অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ-উপকরণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সজ্জিত করা।

এই সমস্ত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়। নিয়মিত সৈনিক ছাড়াও যারা মুক্তিবাহিনীর প্রধান অঙ্গ এবং অতি বীরত্বের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহুসংখ্যক অনিয়মিত বাহিনী। বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক (গণবাহিনী), বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এবং ছাত্র থেকে শুরু ক'রে শিল্প-কারখানার শ্রমিক ও কৃষক যুবক সহ সকল স্তরের ফৌজদের নিয়ে এই বাহিনী গঠন করা হয়।

[মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'জয়বাংলা', ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৭১]

মুক্তিবাহিনী সরকারী পর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল : (১) নিয়মিত সেনাবাহিনী ও (২) গণবাহিনী। (১) বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই. পি. আর., পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ বাহিনীর লোকদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। সরকারী পর্যায়ে এদের নামকরণ করা হয়েছিল এম. এফ. (মুক্তি ফৌজ)। এই সৈন্যের পরিমাণ ছিল প্রায় দশ হাজার।

[Khushwant Singh, '*The Freedom Fighters of Bangladesh*', *Illustrated Weekly of India*, 19th December, 1971, pp. 21-22]

এই বাহিনী নিয়মিত যুদ্ধ কায়দায় কখনো সম্মুখ যুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা ও প্রতিহত করত। কখনো বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে

দলখদার বাহিনীর রক্ষণব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে রেড বা অ্যামবুশ ধরনের কম্যাণ্ডো তৎপরতা চালিয়ে নিজেদের ঘাটিতে ফিরে আসতো। আগস্ট মাসের শেষ দিকে শুধু নিয়মিত কায়দায় আক্রমণ পরিচালনা করবার জন্য 'S' ফোর্স, 'K' ফোর্স ও 'Z' ফোর্স গঠন করা হয়।

[ব্যক্তিগত সাঃ, মেঃ জেঃ সফিউল্লাহ্]

নৌবাহিনীর লোকদের নিয়ে একাত্তরের নভেম্বর মাসে নিয়মিত বাহিনীর অধীন নৌবাহিনী গঠন করা হয়। ৯ই নভেম্বর পাক-বাহিনীর নিকট থেকে দখল করা ছোট আকারের ৬টি নৌযান নিয়ে প্রথম 'বঙ্গবন্ধু' নৌবহরের উদ্বোধন করা হয়। এই বাহিনী দখলকৃত অঞ্চলের জলপথে কম্যাণ্ডো তৎপরতা চালাতে থাকে।

[বাংলার বাণী, মুজিবনগর, ১২ই নভেম্বর, ১৯৭১]

বিমান বাহিনীর লোকদেরকে নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে 'বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স'ও গঠন করা হয়। তৎকালীন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (এয়ার ভাইস মার্শাল) এ. কে. খোন্দকারের ওপর এই বাহিনীর দায়িত্ব ছিল। ৩রা ডিসেম্বরের পর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ কম্যাণ্ডের নির্দেশে এই বাহিনীর বিমান ঢাকায় ও চট্টগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা চালায়।

[ব্যক্তিগত সাঃ, এয়ার ভাঃ মাঃ এ. কে. খোন্দকার]

(২) এফ. এফ. বা গণবাহিনী। এই বাহিনীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু ক'রে চাকুরে শ্রেণীর লোক, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর,—এক কথায় দেশের সর্বস্তরের কিশোর ও যুব শ্রেণীর লোকেরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে এঁরাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এঁরা মূলতঃ দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের অধীন সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব ছাড়াই আরো কতিপয় গেরিলা বাহিনী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট (B. L. F.) যা 'মুজিব বাহিনী' নামে পরিচিত ছিল। শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ এই চারজন নেতা যৌথভাবে ছিলেন উক্ত বাহিনীর হাই কম্যাণ্ড। মুক্তিযুদ্ধে এই বাহিনীর নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, আদর্শপ্রীতি এবং কর্তৃত্ব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে এই বাহিনী যে সাফল্য অর্জন করে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ স্থানাভাবে এই গ্রন্থে দে'য়া সম্ভব নয়।

মুজিব বাহিনী মূলতঃ ছাত্রলীগের জঙ্গী মনোভাবাপন্ন সদস্যদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশে পাকিস্তানী শাসকচক্রের দীর্ঘ দিনের চক্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে এই ছাত্র-সমাজ বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে এসেছিল তার গৌর-বোজ্জ্বল বিবরণ আমি ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছি। এই আন্দো-লনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-সমাজ পূর্বেই ধারণা করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের মত একটি মানবতা বিবর্জিত ও হিংস্র ঔপনিবেশিক শক্তির মোকাবিলা ক'রে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে হ'লে অবশ্যই দেশের জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তা' লাভ করতে হবে। তাই '৭০ সালের নির্বাচনের পর পাক শাসকচক্রের চক্রান্ত সুস্পষ্ট ও পরিণত লক্ষ্যে প্রাগ্রসর হবার সাথে সাথে ছাত্রলীগের তরফ থেকেও 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর—বাংলাদেশ স্বাধীন কর' এই শ্লোগান উত্থাপিত হয়। এই শ্লোগানের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিরোধ ও যুদ্ধ সম্পর্কে জনগণের মনকে পূর্বে থেকে প্রস্তুত করা ও নিজেদেরকে সেভাবে গঠন করা।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সত্তরের মার্চ-এ অসহযোগ আন্দোলনের সময় ছাত্রলীগ কর্তৃক 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়েছিল। এবং ২৩শে মার্চ তারিখে এই পরিষদের দ্বারা প্রতিরোধ দিবস উদযাপনের সময় রেসকোর্স ময়দানে প্রাক্তন সৈনিক ও ছাত্রদের এক সম্মিলিত কুচ-কাওয়াজ ও যুদ্ধ-মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগের এই কার্যক্রমেরই পরিণতি হ'ল মুজিব বাহিনী। B. L. F.-এর সর্বাধিনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। সম্ভবতঃ এই কারণেই তা' মুজিব বাহিনী নামে পরিচিত ছিল।

মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ ছিল মূলতঃ গেরিলা যুদ্ধের। তবে এই বাহিনীকে যানবাহন ছাড়া বহনযোগ্য ভারী অস্ত্রেও সজ্জিত করা হয়েছিল।

মুজিব বাহিনী ছাড়াও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে আরেকটি গেরিলা বাহিনী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিল।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় বাহিনীর ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্বে এফ. এফ. গেরিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

হয়। এই এফ. এফ-দের সংখ্যাতালিকা প্রকাশিত হয় নি, তাই নিশ্চিত ক'রে এর সংখ্যা বলা যায় না। এই প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় থেকে পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে মুক্ত অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর শিবিরগুলোতে এসে বহু যুবক বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ও ই পি আর-এর লোকদের নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে দেশের হানাদার কবলিত অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আবার যে সব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করত তারা তাদের সহযোগীদেরকেও প্রশিক্ষণ প্রদান ক'রে রীতিমত দক্ষতার সাথে কাজ করেছিল। কাদের সিদ্দিকী ও আবদুল লতিফ মীর্জার বাহিনী যে বিস্ময়কর তৎপরতা প্রদর্শন করেন তা' আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। আনুমানিকভাবে বলা হয়ে থাকে যে, প্রায় এক লাখ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করেছিল। সমগ্র দেশ ১১টি সেক্টরে বিভক্ত ছিল এবং শুধুমাত্র সেক্টর কম্যাণ্ডার তৎকালীন মেজর সফিউল্লাহ্‌র অধীনেই নভেম্বর মাসে ২৫ থেকে ২৬ হাজার গেরিলা যুদ্ধরত ছিল। [ব্যক্তিগত সাঃ, মেঃ জেঃ সফিউল্লাহ্]

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সরাসরি নিয়ন্ত্রিত গেরিলা বাহিনী ও অন্যান্য গেরিলারা সবাই জনগণের নিকট মুক্তিফৌজ নামেই পরিচিত ছিল।

প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় নিয়মিত সেনাবাহিনীর লোকেরা বিপুল পরিমাণ হাল্কা অস্ত্র, গুলী ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ হস্তগত করতে সক্ষম হয়। দেশের প্রায় সমস্ত পুলিশ লাইন ও ই পি. আর. সাব-হেডকোয়ার্টার-গুলোরও সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়। প্রাথমিকভাবে এই সবের দ্বারাই মুক্তিবাহিনীকে সজ্জিত করা হয়েছিল। কিন্তু পাক বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য ক্রমবর্ধমান এক বিরাট সুসংগঠিত মুক্তি বাহিনীর জন্য এই অস্ত্র নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। এ ব্যাপারে ভারত সরকার পূর্ণ মাত্রায় সহযোগিতা করেন। তদুপরি মুক্তিবাহিনী যুদ্ধের বিভিন্ন সময় দখলদার বাহিনীর নিকট থেকেও প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাগুলী দখল ক'রে যুদ্ধে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়।

২৫শে মার্চ তারিখের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিহত করবার জন্য দখলদার বাহিনী নতুন নতুন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটায়। এর একটি হ'ল দেশের সকল ক্ষমতাই যে সরকারের হাতে এ সম্পর্কে সর্বপ্রকার

অপপ্রচারণা। এপ্রিল মাসে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ও যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের প্রচার সম্পর্কে প্রখ্যাত সাংবাদিক এ্যান্থনী ম্যাসকারেন্‌হাস যথার্থই বলেছেন ঃ তখন ঢাকা ও চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের ফলে যে ইতিমধ্যেই ৫০,০০০ জীবন বিনষ্ট হয়েছে, সে কথার উল্লেখ থাকত না কিম্বা সংবাদপত্রগুলোতে একথারও উল্লেখ থাকত না যে, কেবল মাত্র এই দু'টো শহরেই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাজ্ঞা প্রতিপালিত হচ্ছে, প্রদেশের বাকী অংশ বিদ্রোহী বাঙালীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গেছে। বাইরের প্রভাব থেকে সাফল্যের সঙ্গে জনসাধারণের চোখ ও কানকে মুক্ত ক'রে সরকার একটি উদ্ভাবনক্ষম প্রচারণা অভিযান শুরু করে। পূর্ব বাংলার প্রকৃত ঘটনাকে বিবৃত করে এবং ভারতের আসন্ন হুমকিকে সবচেয়ে বড় ক'রে দেখানোর কাজে সরকার প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। গোয়েবলস্‌ও একাজ ভাল ক'রে করতে পারত না। [বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা, পৃঃ ১৪৩-৪৬]

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় অবাঙালী ও এদেশীয় দালালদের সমন্বয়ে খাজা খয়েরুদ্দিনের নেতৃত্বে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। এদেরই আনুকূল্যে জুলাই মাসের প্রথম দিকে তৈরী হয় রাজাকার বাহিনী।

[১১ই জুলাই '৭১ তারিখে দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে, ১১ই, ১৮ই ও ২০শে জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রাজাকারদের চাঁদমারী অনুষ্ঠিত হবে।]

মূলতঃ গ্রামের অশিক্ষিত চাষী-মজুর শ্রেণীর লোকদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল এই বাহিনী। দু'এক সপ্তাহের হাল্কা দু'একটি অস্ত্রের ট্রেনিং দিয়ে গ্রামাঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদেরকে প্রতিরোধের জন্য এদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

এদের কোন রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল না। তাই যুদ্ধের শেষ পর্যায়ের দিকে অনেকেই মুক্তিবাহিনীর নিকট অস্ত্রসমেত আত্মসমর্পণ করেছিল। বিগত পঁচিশ বছর ধরে রাজনীতির নাম ক'রে যে সব এদেশীয় ব্যক্তি বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা ক'রে এসেছিল, সেই সব রাজনৈতিক দলের উদ্যোগেই শান্তি কমিটি তৈরী হয়। এরা গ্রাম ও শহরের বাংলাদেশপন্থী লোকের উপর সেনাবাহিনীর সাহায্যে নির্যাতন করতো। মুক্তিবাহিনীর লোকদের সংবাদ পাক-বাহিনীর নিকট সরবরাহ করতো।

শুধু জামাতে ইসলাম ও ইসলামী ছাত্র সংঘের লোকদের উদ্যোগে গঠন করা হয়েছিল আলবদর ও আলশামস্ বাহিনী। এদেরকে হাল্কা অস্ত্র শিক্ষা দে'য়া হয়েছিল। এরা মুক্তিবাহিনীর সংবাদ সেনাবাহিনীকে সরবরাহ করতো। দেশ মুক্ত হবার পূর্ব-মুহূর্তে বুদ্ধিজীবীদের মূলতঃ এরাই হত্যা করেছিল।

দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে, এটা প্রচার করার জন্য দেশে ও বিদেশে দখলদার বাহিনী তাদের পদলেহী কতিপয় বুদ্ধিজীবীকে ব্যবহার করেছিল।

[দেশের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক আছে এবং বাঙালীদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই একথা ভিত্তিহীন, এই মর্মে ডঃ সাজ্জাদ হোসেন, ডঃ মোহর আলী কর্তৃক লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় লেখা চিঠি সম্পর্কিত সংবাদ ৯ই জুলাই, '৭১ তারিখের 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।]

ক্রমবর্ধমান আক্রমণের মুখে দখলদার বাহিনী মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের গ্রেফতারের ব্যাপারে যে পুরস্কার ঘোষণা করে সেটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

দুষ্কৃতিকারীদের ব্যাপারে নিম্নহারে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়ঃ

(ক) দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতার অথবা দুষ্কৃতিকারীদের সাথে সফল মোকাবেলার খবর দেওয়ার জন্য ৫০০'০০ টাকা।

(খ) ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুষ্কৃতিকারী গ্রেফতারের জন্য ৭৫০'০০ টাকা।

(গ) রাইফেল, বোমা বা ডুপ্লিকেটিং মেশিন বা অপরাধ করে এমন অথবা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতারের জন্য ১০০০'০০ টাকা।

(ঘ) দুষ্কৃতি দলের নেতা গ্রেফতারের জন্য ২০০০'০০ টাকা। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার অথবা দুষ্কৃতি দলের নেতা গ্রেফতারের জন্য দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বড় অঙ্কের পুরস্কার দেবার বিষয় বিবেচিত হতে পারে।

জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট এক হাজার টাকা পর্যন্ত মঞ্জুর করতে পারবেন। দুষ্কৃতিকারীদের কার্যকলাপ ও ব্যক্তিত্বের বিচারে শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ হবে ঃ

(ক) তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত সদস্য, তথাকথিত মুক্তিবাহিনী ভর্তিতে সাহায্যকারী।

(খ) স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের খাদ্য, যানবাহন ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ-কারী।

(গ) স্বেচ্ছায় বিদ্রোহীদের আশ্রয়-দানকারী।

(ঘ) বিদ্রোহীদের বার্তাবাহক (Informer) রূপে যারা কাজ করে।

(চ) তথাকথিত মুক্তিবাহিনী সম্পর্কিত নাশকতামূলক লিফলেট, প্যাম্পলেট প্রভৃতির লেখক বা প্রকাশক।"

[দৈনিক পাকিস্তান, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৭১]

এইভাবে দখলদার বাহিনী বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এদেশীয় দালাল সহযোগী সৃষ্টিতে তৎপর ছিল। বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের বীর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা এই সমস্ত দালাল সহযোগীদেরকে প্রতিরোধ ক'রে পাক-বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে বিজয়কে ছিনিয়ে এনেছেন।

সময়ানুক্রমিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা চার পর্যায়ে ভাগ ক'রে বর্ণনা করা যেতে পারে:

প্রথম পর্যায়: মে ও জুন মাস। গেরিলা তৎপরতার সূত্রপাত।

দ্বিতীয় পর্যায়: জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর। ঢাকা সহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধের বিস্তৃতি।

তৃতীয় পর্যায়: অক্টোবর থেকে ৩রা ডিসেম্বর। অভ্যন্তরভাগে গেরিলা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি ও নিয়মিত সেনাবাহিনীর আক্রমণ।

চতুর্থ পর্যায়: ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর। মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর যৌথ আক্রমণ। বিজয় লাভ।

[ব্যক্তিগত সাঃ, মেঃ জেঃ সফিউল্লাহ্]

প্রথম পর্যায়: মে মাস থেকেই গেরিলা অপারেশন শুরু হয়

দখলদার বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনী যে একটি অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই তা' উপলব্ধ হয়। কেননা দখলদার বাহিনী বিমান, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য ভারী অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। পক্ষান্তরে মুক্তিবাহিনীর এসমস্ত যুদ্ধোপকরণ ছিল না। এমনকি কোন কোন মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর বেপরোয়াভাবে বিমানের সাহায্যে মেশিনগানের গুলী ও বোমা ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ মুক্তি-

বাহিনীর নিকট বাধা দেবার মতো একটি বিমান বিধ্বংসী কামানও ছিল না। এসব ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, দারুণ ক্ষোভ ও উত্তেজনায় দাঁতে দাঁত চেপে কোন কোন যুবক, যে মাত্র দু'এক দিন পূর্বে একটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল হাতে পেয়েছে, সে বারবার বৈরী বিমানের দিকে নিস্ফল গুলী ছুঁড়েছে। সব প্রতিকূল পরিবেশে দাঁড়িয়েই তারা যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। সামনে বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধুর বাণী, এই দুই প্রেরণাই ছিল তাদের শক্তির উৎস। তাদের বিশ্বাস ছিল, প্রতি ঘরে ঘরেই তো মুজিব আছে। আর আছে মুজিবের উদাত্ত বাণী, 'আমরা তোমাদেরকে ভাতে মারবো, আমরা তোমাদেরকে পানিতে মারবো।' সুতরাং, সেভাবেই মারতে হবে।

হাজার হাজার তরুণ প্রশিক্ষণ নিয়ে দখলদার বাহিনীর যোগাযোগ পথ বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগ পথে মাইন পুঁতে রেখে দখলদার বাহিনীকে হত্যা করার নীতি গ্রহণ করে।

যুদ্ধে গেরিলা কৌশল গ্রহণ করা প্রসঙ্গে মুক্তিবাহিনী প্রধান কর্নেল ওসমানী বলেন ঃ "যুদ্ধের প্রথম দিকে আমি আমার লোকদেরকে প্রথাগত পদ্ধতিতে খণ্ডযুদ্ধে নিয়োগ করেছিলাম। আমাদের আশা ছিল, বিদেশী শক্তিসমূহ এই অসম যুদ্ধে হস্তক্ষেপ ক'রে পাকিস্তানীদেরকে বাংলাদেশ থেকে পাততাড়ি গুটাতে বলবে। কিন্তু তা' যখন হ'ল না এবং পাকিস্তানীরা ট্যাঙ্ক, ভারী অস্ত্র এবং বোমারু বিমান সজ্জিত সাড়ে চার ডিভিশন (৪০,০০০) সৈন্য আনল, তখন আমি যুদ্ধ-কৌশল পরিবর্তন করলাম। গত মে মাসের প্রথম দিকে আমি আমার সৈন্যদেরকে পুনর্গঠিত করলাম এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলা দলে বিভক্ত ক'রে খণ্ডযুদ্ধের পরিবর্তে 'গেরিলা পদ্ধতির' অতর্কিত আক্রমণ পন্থা অবলম্বন করলাম। এতে ক'রে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা হারালেও শত্রু বাহিনীকে বিস্তৃত ও বিক্ষুব্ধ গ্রাম এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করেছিলাম। আমরা তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে সব সময়ই তাদের বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত রেখেছিলাম। প্রতিদিনই আমরা শ'খানেক ক'রে সৈন্য মারতাম আর তাদের কফিনে বিমান ভর্তি হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান যেত।"

[খোশওয়াক্ত সিং, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০]

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর

জুলাই মাসের প্রথম দিকে মুজিবনগরে সেক্টর কমান্ডারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ। এই সভায় কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে যুদ্ধ সম্পর্কে এক নতুনতর পরিকল্পনায় ব্যাপকভাবে গেরিলা ওয়ারফেয়ার চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১। সেক্টরের সীমানা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়।

২। গেরিলা তৎপরতা সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য ভেতরে গেরিলা বেস তৈরী করতে হবে।

৩। ভেতরের গেরিলাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। নিয়মিত বাহিনীর লোকজন পরিচালনায় থাকবে।

৪। খবরাখবর আনা-নেওয়ার জন্য ইন্টেলিজেন্স্-চেইন তৈরী করতে হবে।

৫। প্রত্যেক গেরিলা বেস্-এ একজন ক'রে রাজনৈতিক উপদেষ্টা থাকবে যার উপদেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিত হবে।

৬। প্রত্যেক বেস্-এ একটি ক'রে মেডিক্যাল টিম থাকবে।

৭। গেরিলা ওয়ারফেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে Psychological warfare-ও চালিয়ে যেতে হবে।

৮। আমাদের সামরিক পরিকল্পনা (Tactical plan) এরকম হওয়া উচিত যাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৯। এটা করবার পর তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

১০। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি যাতে ক'রে ঠিকভাবে চলাফেরা করতে না পারে সেজন্য যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে হবে।

১১। পাকিস্তান যেন বাংলাদেশ থেকে কাঁচামাল বা Finished products রফতানী ক'রে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন না করতে পারে সেজন্য দ্রব্যসামগ্রী ও সরকারী গুদাম ধ্বংস করতে হবে।

১২। কলকারখানা যেন চলতে না পারে সেজন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পেট্রোল ইত্যাদির সরবরাহ বিধ্বস্ত করতে হবে।

১৩। গাড়ী, রেল, বিমান, জলযান, ঠিকভাবে যেন চলতে না পারে। এক কথায় যোগাযোগ এবং যাতায়াত-ব্যবস্থা বিকল ক'রে দিতে হবে।

১৪। পাক সেনাবাহিনীর সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জনমত গড়ে তুলতে হবে।

১৫। বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে, বিদেশের নিকট এ ধরনের পাক প্রচারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করবার জন্য বিশেষ ক'রে ঢাকা শহরে অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

[ব্যক্তিগত সাঃ, মেঃ জেঃ সফিউল্লাহ্]

এই যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত মেইন বেস্-ক্যাম্প-গুলো থেকে দখলদার বাহিনী অধিকৃত বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগে ছড়িয়ে পড়ে। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে গড়ে ওঠে স্থায়ী ঘাঁটি। এইভাবে মহকুমা শহর থেকে জেলা শহরের অভ্যন্তর ভাগেও তাদের ঘাঁটি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী সবাই তৎপর হয়ে ওঠে।

দেশে শান্ত অবস্থা বিরাজ করছে এ কথা দেশে ও বিদেশে প্রচারণার জন্য পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এবার 'মরিয়া হয়ে ওঠে'। কারণ পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্যকারী দেশগুলি বাংলাদেশের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সাহায্য দান বন্ধ করবার কথা ঘোষণা করেছিল।

৩১শে জুলাই তারিখে করাচীর এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পুনরায় বাংলাদেশের ওপর নিয়ন্ত্রণের দাবী ক'রে বক্তৃতায় বলেন যে, সীমান্ত এলাকা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে।

[*দৈনিক পূর্বদেশ, ৫ই আগস্ট, ১৯৭১*]

কিন্তু পাক কর্তৃপক্ষের এই মিথ্যা প্রচারণা দেশী ও বিদেশী সবার নিকট বেফাস হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধা গেরিলাদের গুলী আর বিস্ফোরণের তাণ্ডব কার্যকলাপে। মুক্তিযুদ্ধ চলছে—বিদেশীরা এ সম্পর্কে যাতে ক'রে জানতে না পারে তার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামেই সব চাইতে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিয়েছিল হানাদার বাহিনী। তাই মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ পরিকল্পনায় অন্যতম লক্ষ্যস্থান নির্বাচিত হয়েছিল ঢাকা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, জুন মাস

থেকেই ঢাকা শহরে গেরিলাদের তৎপরতা আরম্ভ হয়েছিল। এবং একই উদ্দেশ্যে এই মাসে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সম্মুখে একই সঙ্গে তিনটি হ্যাণ্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল।

[হেদায়েত হোসাইন মোর্শেদ লিখিত নিবন্ধঃ "মার্চ থেকে ডিসেম্বর। ১৯৭১। কাবারুদ্ধ সংবাদ", বিচিত্রা, জাতীয় দিবস সংখ্যা, ১৯৭৩।]

সেই সময় হোটেলে অবস্থান করছিলেন বিশ্বব্যাঙ্কের একটি দল এবং পাকিস্তানকে সাহায্য দানকারী কনসোর্টিয়ামের চেয়ারম্যান মিঃ কারগিল।

১১ই আগস্ট শেখ মুজিবের বিচার আরম্ভ করবার কথা প্রচারিত হবার প্রতিবাদে সেই দিনই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চারিদিক কেঁপে ওঠে। এই সংবাদ হানাদার কবলিত সমস্ত পত্রিকায় ১২ই আগস্ট প্রকাশিত হয়। বলা হয়ঃ 'গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ল্যাভেটরীতে তিনটি বিস্ফোরণে তিনজন বিদেশী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।'

[দৈনিক পাকিস্তান, ১২ই আগস্ট, ১৯৭১]

দখলদার বাহিনী ও তার দালাল সহযোগীরা ঢাকঢোল পিটিয়ে ২০শে আগস্ট তারিখে ৭১ সালের এস. এস. সি. পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। আর ১৯শে আগস্ট তারিখে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে মুক্তিযোদ্ধারা একই সঙ্গে উলাম পাওয়ার স্টেশন এবং খিলগাঁও পাওয়ার সাব স্টেশনটি সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেয়।

[হেঃ হোঃ মোর্শেদ, ঐ]

পাক-বাহিনী দালাল সহযোগীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া সম্পর্কিত কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় ১০ই আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, নিখিল পাকিস্তান মারকাজে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর সদস্য পাক দালাল মওলানা সাদানীকে ঢাকার মীরকাদিমে গেরিলারা গুলী ক'রে হত্যা করে। [হেঃ হোঃ মোর্শেদ, ঐ]

এইসব সাফল্য ছাড়াও এই সময়ে অপর একটি বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধারা অসীম সাফল্য অর্জন করে। আগস্ট মাসের দিকে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর এলাকায় সমুদ্রগামী জাহাজগুলো ধ্বংস করবার জন্য মুক্তিবাহিনীর মধ্য

থেকে একদল গেরিলা ফ্রগম্যান তৈরী করা হয়। ১৬ই আগস্ট এই মুক্তি-সেনারা চট্টগ্রাম বন্দরে নঙ্গর করা এম. ভি. আরমাদ ও এম. ভি. আল আব্বাস নামক করাচী থেকে আগত অস্ত্রবাহী দু'টো জাহাজ 'লিমপিট' মাইনের সাহায্যে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয়।

[বাংলার বাণী, ১৬ই ডিসেম্বর, '৭২ সাল, মেজর রফিকুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত) লিখিত "নিমজ্জনের সঙ্গীত" নিবন্ধ দ্রষ্টব্য]।

মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ফ্রগম্যানদের এটাই ছিল প্রথম তৎপরতা, এরপর থেকে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিক পর্যন্ত সময়ে এঁরা প্রায় ২১টি পাকিস্তানী ও বিদেশী জাহাজ বিনষ্ট করে ও ডুবিয়ে দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশে তাদের ৬টি জাহাজ মুক্তিবাহিনী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ও ডুবিয়ে দেওয়ার কথা স্বীকার করে। [বাংলার বাণী, মুঃ নগর, ১২ই নভেম্বর, ১৯৭১]

হানাদার কবলিত ঢাকার কাগজেও স্বীকৃতি দেখা যায় ঃ

"..........এ. পি. পি'র এই খবরে প্রকাশ, সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন যে ইউ. এস. এস. লাইটনিং নামের একটি খাদ্যশস্যবাহী মার্কিন জাহাজ সম্প্রতি চালনা বন্দরে লিমপিড মাইন বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

[দৈনিক পূর্বদেশ, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

মুক্তিবাহিনীর এই সমস্ত সাফল্যের দাবী করতে গিয়ে কর্নেল ওসমানী অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে বলেন ঃ "সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত আমরা হাজার পাকিস্তানী সৈন্য খতম করেছি, ২১টি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছি, ধ্বংস ক'রে দিয়েছি প্রায় ৬ শো'র মত ব্রিজ ও কালভার্ট এবং রেল লাইন, সড়ক ও নৌপথে তৎপরতা চালিয়ে সমস্ত যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়েছি। এর সত্যতা আপনারা যে কেউ যাচাই করতে পারেন। বাংলাদেশে এখন খুব অল্প ট্রেনই চলে এবং চালনায় কোন জাহাজ ভিড়তে পারে না। খুব শীঘ্রই চট্টগ্রাম বন্দরকেও আমরা ব্যবহার অনুপযোগী ক'রে দেব।"

[খোশওয়ান্ত সিং, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০]

জুলাই মাসের শেষ ও আগস্ট মাসের এই সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর সাফল্য সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন আইন, সংসদীয় ও পররাষ্ট্র

মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ বলেন, "......পাকিস্তানী সৈন্যরা যে সব স্থানে অবস্থান করে সে স্থানটুকুই তাদের দখলে থাকে। বাকী সমস্তই আমাদের। রাত্রে যেখানে তারা ঘুমায় সেই ব্যারাকগুলোই তাদের দখলে থাকে। আমাদের ছেলেরা (মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা) সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে। কেননা তাদের আছে ট্যাঙ্ক ও বিমান, আর আমাদের ছেলেরা শুধুমাত্র স্টেনগান, হ্যাণ্ডগ্রেনেড, রাইফেল আর মেশিনগান নিয়ে লড়ছে।"

[খোঃ সিঃ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১]

মুক্তিবাহিনীর এই ক্রমবর্ধমান সাফল্য বিদেশী সংবাদপত্রগুলোও স্বীকার করতে থাকে। Peter R. Cam ২৩শে জুলাই, '৭১ তারিখে প্রকাশিত নিউইয়র্কের Wall Street Journal-এ লেখেন : An Army rule is being challanged by Bangali Garrilla forces (Mukti Bahini or Liberation army) that seem to have massive support among the Bangali population.

৩১শে জুলাই তারিখে Christian Science Monitor পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লেখা হয় : Today, four months later the Pakistani Army controls the main cities of Bangla but not the countryside. Resistance is increasing. The Garrillas have been able twice to knock out the power stations serving Dacca, the capital. They frequently cut the rail links from Dacca to the other cities.

২রা আগস্ট News Week পত্রিকায় বলা হয় : All over the country, the resistance is rapidly taking the earmarks of a classical garrilla warfare.

একই তারিখে প্রকাশিত Time Magazine-এ বলা হয় : Resistance fighters already control the countryside at night and much of the day time.

এইসব পত্রিকায় ভিয়েতনামের সঙ্গে তুলনা ক'রে বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধের অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা ও বিপুল জনসমর্থনের কথা বর্ণনা করা হয়। বাংলাদেশের ধানপাটের ক্ষেতে এবং গাছপালা, ঝাড়-জঙ্গলের মাঝে গেরিলারা পাক-বাহিনীকে আক্রমণ করবার চমৎকার সুযোগ পেয়েছে—এসবের এবং জনগণ কিরূপ যত্নের সাথে তাদেরকে আশ্রয় ও খাবার সামগ্রী

দিয়ে সাহায্য করছে তার নিখুঁত বর্ণনাও এই বিদেশী সাংবাদিকরা তুলে ধরেন। [সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১]

স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দেশের অভ্যন্তরে জনগণের মনোবলকে জাগ্রত রাখতে এবং নতুন নতুন প্রেরণার খোরাক জোগাতে এই কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণার একটি মহৎ উৎস ছিল এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতর থেকে এবং যুদ্ধ-মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত অসংখ্য বুলেটিন জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রভূত উপকার সাধন করে। জনগণের উদ্দেশ্যে বেসরকারী উদ্যোগে 'বাংলার বাণী' 'জয়বাংলা' পত্রিকা ছাড়াও বহু পত্রিকা সীমান্ত অঞ্চলবর্তী ভারতীয় প্রেসে ছাপানো হ'ত। মুক্তিযোদ্ধারা এগুলো হানাদার কবলিত জনগণের মধ্যে গোপনে পৌঁছে দিত। বাংলাদেশের যুদ্ধ যে একটা জনযুদ্ধ এবং দুই অসম শক্তির মধ্যে লড়াই চললেও বিলম্বের মধ্য দিয়ে জনগণের জয়ই যে নিশ্চিত, একথা জনগণকে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল। অন্যপক্ষে মুক্তি-যোদ্ধাদের আত্মপ্রত্যয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও দেশাত্মবোধের প্রেরণা জাগ্রত করা। এই কারণেই যুদ্ধ-পরিকল্পনায় প্রতিটি গেরিলা বেস্-এ একজন ক'রে রাজনৈতিক কর্মী রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এম. এন. এ. ও এম. পি. সহ অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ এবং বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী সরকারী নির্দেশে এইসব গেরিলা বেস্-এ অবস্থান ক'রে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নানা ব্যাপারে প্রজ্ঞাবান ক'রে তুলবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমি নিজেও জুলাই ও আগস্ট মাসে জলঙ্গী, কেচুয়াডাঙ্গা, শিকারপুর, করিমপুর এবং বালুরঘাট ক্যাম্পগুলোতে অবস্থান করি এবং প্রশিক্ষণলিপ্ত যোদ্ধাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে নিরলসভাবে কাজ করি। জলঙ্গী অপারেশন ক্যাম্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠাতে নানাভাবে আমি সাহায্য করি। একবার এদের সাথে জুলাই মাসের শেষ দিকে নৌকাতে ক'রে আমি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিশ-পঁচিশ মাইল পর্যন্ত গিয়ে গেরিলা যুদ্ধের কয়েকটি স্থান নির্দেশ ক'রে এসেছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধকে দুর্বার ক'রে তুলবার প্রচারণার ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতারের যে ভূমিকা ছিল, অনন্তকাল ধরে বাংলার মানুষের মুখে মুখে তা' হয়ত কিংবদন্তি হিসেবে বিরাজ করবে। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম শহর হানাদার কবলিত হবার পূর্ব মুহূর্তে চট্টগ্রাম বেতারের টেকনিশিয়ান জনাব বেলাল, ইঞ্জিনিয়ার জনাব শাকের, স্টাফ ফারুক এবং আবদুল কাশেম নামক জনৈক অধ্যাপক মিলে এক কিলোয়াট শক্তি সম্পন্ন একটি ট্রান্সমিটার উক্ত বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়ে আগরতলায় আসেন। এই ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ১২ই এপ্রিল থেকে সট ওয়েভে প্রথম অনুষ্ঠান প্রচার আরম্ভ হয়েছিল। ২৫শে মে থেকে মিডিয়াম ওয়েভে অনুষ্ঠান প্রচার আরম্ভ হয়। যুদ্ধ-পরিকল্পনা আওতায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে বিন্যস্ত ও পরিচালনা করা হয়।

[স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে প্রথম থেকে জড়িত জনাব আমিনুল হক বাদশা এই তথ্য জানিয়েছেন।]

এই বেতার কেন্দ্র থেকেই বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি বার বার প্রচার করা হ'ত। উক্ত ভাষণের অংশবিশেষ বজ্রকণ্ঠ' নামে প্রচার করা হ'ত।

বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের অগণিত জনগণ জীবনপণ লড়াই করেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার কারার অন্তরালে থেকেও তিনিই এ স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। বন্দী অবস্থায় থেকেও তিনি পথ দেখিয়েছেন তাঁর বজ্রকণ্ঠের মাধ্যমে। তাঁর সে নির্দেশ বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় কিছু দালাল, ধর্মান্ধ ইসলাম ভক্ত, আলবদর, আলশামস্ ও রাজাকারের দল ছাড়া সৈনিক-অসৈনিক, যোদ্ধা-অযোদ্ধা, সবাই প্রতিপালনের চেষ্টা করেছে। তাঁর বজ্রকণ্ঠই ছিল সকল শক্তির উৎস। প্রত্যক্ষ সংগ্রামীদের ওপর সেই বজ্রকণ্ঠের প্রতিক্রিয়া কিরূপ জ্বলন্ত ছিল নীচের উদ্ধৃতি থেকে তা' জানা যায়ঃ

মেজর আমিন আহমদ চৌধুরী বলেন, "আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু জেলে। বাইরের সাথে তাঁর কোন যোগসূত্রই থাকা সম্ভব নয়। তবু স্বাধীন বাংলা বেতারে তাঁর রেকর্ড করা ভাষণ বজ্রকণ্ঠ নাম দিয়ে আমাদের শোনানো হ'ত।

এই ভাষণটা শোনার পর মনে হ'ত যে বেতারে যেন কম্যাণ্ডারের আদেশ শুনছি। ইচ্ছা হ'ত এই মুহূর্তে ছুটে যাই রণাঙ্গনে। কয়েক দিন দৌড়ে বেরিয়েও এসেছি। হাতে একটা স্টেন, দেখতাম পিছন নিয়েছে অনেকে। পর মুহূর্তে মনে পড়তো, যেদিকে যাচ্ছি সেখানে তো বর্বরগুলোকে কালই খতম করেছি। আজ তো ওদিকে।"

বজ্রকণ্ঠ সম্পর্কে অপর একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা বলেন: "ওটা শোনার পর মনে হতো, শিরা ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসবে। রাইফেল নিয়ে ছুটতে চাইতাম তক্ষুণি। নিরস্ত করতেন অফিসারেরা। সেখানেও বঙ্গবন্ধুর একটি কথা, 'শৃঙ্খলা ছাড়া কোন সংগ্রামে জয়লাভ করা যায় না।' দাঁতে দাঁত চেপে শুধু ভাবতাম, রাইফেলটা পরিষ্কার করতে করতেই যেন 'রেড্' করার আদেশটি আসে।"

এমনিভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা ক'রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল দৃঢ় করেছে, অপর দিকে দখলকৃত এলাকায় জনগণের মাঝে এনেছে প্রত্যয়। একই সঙ্গে হানাদার বাহিনীর সহযোগী দালালদের মনোবল এতে দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়ে। এই বেতার কেন্দ্রের অনেকগুলো অনুষ্ঠান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তার মধ্যে চরমপত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি নিজেও 'দৃষ্টিপাত' নামে একটি কথিকা পাঠ করতাম। কথিকাটি বুদ্ধিজীবী মহলে সমাদৃত হয়।

তৃতীয় পর্যায়: অক্‌টোবর থেকে ৩রা ডিসেম্বর

অক্‌টোবর ও নভেম্বর মাসে ঢাকা ও চট্টগ্রামের গেরিলা তৎপরতা কেমন তীব্র আকার ধারণ করেছিল নীচের বিবরণ থেকে তা' সহজেই অনুমান করা যাবে। অক্‌টোবর মাসের ১৩ তারিখে মোনায়েম খান আহত হন এবং পরে তিনি মারা যান। ১৪ তারিখে টঙ্গী ও ধীরাশ্রমের মধ্যবর্তী রেল লাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৫ তারিখে ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার বান্দুরিয়ায় একটি সামরিক স্পীডবোট ছিনতাই করা হয়। ১৯ তারিখে মতিঝিলের ই.পি.আই.ডি.সি. ও হাবিব ব্যাঙ্ক ভবনের সামনে এক বিস্ফোরণে ৪টি গাড়ী বিধ্বস্ত ও দু'টি গাড়ীর ক্ষতি হয়। এই তারিখেই ডেমরার কাজলার পাড়ে এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স লিমিটেডের প্যাকেজিং কারখানাটি বিস্ফোরণের

সাহায্যে বিধ্বস্ত হয়। ২১ তারিখে মালিবাগ চৌধুরী পাড়ার কাছে রেল লাইনে বিস্ফোরণ হয়। একই তারিখে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা মোজাফফর আহমদ মোখতারকে গুলী ক'রে মারা হয়।

২৪ তারিখে পোস্তাগোলার একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ২৫ তারিখে নারায়ণগঞ্জ কালির বাজারে বোমা বিস্ফোরণ হয়।

২৬ তারিখ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম শহরস্থ চীনা রেঁস্তোরায় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। একই তারিখ দিবাগত রাত্রে মতিঝিল সেন্ট্রাল গভঃ গার্লস্ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বাসভবনে বিরাট এক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ২৭ তারিখে চট্টগ্রাম শহরের কনভেনশন মুসলিম লীগের সম্পাদক ও দখলদার বাহিনী কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য উপনির্বাচন প্রার্থী মোহাম্মদ বখতিয়ারকে গুলী করা হয়। একই দিনে চট্টগ্রামের চকবাজারে রাওজান থানার উরকির চর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাহের চৌধুরীকে হত্যা করা হয়। ২৭ তারিখে ঢাকা রেল স্টেশনের অদূরে রেল লাইন উড়িয়ে দেওয়া হয়। ২৮ তারিখে ডি.আই.টি. ভবনের ৬ষ্ঠ তলার উপর একটি কক্ষে বিস্ফোরণ ঘটনো হয়। ২৯ তারিখে 'মর্নিং নিউজ'-এর প্রবেশ দ্বারে গ্রেনেড ফেলা হয়। ৩০ তারিখে অভয়দাশ লেনে অবস্থিত সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। একই তারিখে ঢাকা শহর কাঁঠাল বাগান শান্তি কমিটির সভাপতি আসাদুল্লাহ্ ও নারায়ণগঞ্জ শান্তি কমিটির সদস্য জনাব শাহজাহানকে হত্যা করা হয়। একই তারিখে চট্টগ্রামের জুবিলি রোডস্থ দাউদ পেট্রোলিয়ামের 'এ্যাপোলো' ১১ পেট্রোল পাম্পে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ৩১ তারিখে কাকরাইল পেট্রোল পাম্পে বিস্ফোরণ ঘটে। একই তারিখে পশ্চিম দেওঘর শান্তি কমিটির সদস্য ডাঃ হাবিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়।

নভেম্বর মাসের ১লা তারিখে আজিমপুরস্থ আর্মি রিক্রুটিং কেন্দ্রে গ্রেনেড নিয়ে আক্রমণ করা হয়। ২ তারিখে চট্টগ্রাম নিউমার্কেটে পুলিশ সার্জেন্ট আতিককে প্রকাশ্যভাবে গুলী ক'রে হত্যা করা হয়।

৩ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দরের গুপ্তখালি জেটিতে বার্মা ইস্টার্নের তেলবাহী জাহাজ মাহ্তাব জাবেদ ২নং-কে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। একই তারিখে সিদ্ধির-গঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের ৪টি জেনারেটর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ৪ তারিখে সবুর

খানের ধানমণ্ডিস্থ বাসভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ৫ তারিখে নটরডাম কলেজের সম্মুখে বিস্ফোরণের সাহায্যে টেলিফোন ক্যাবলের ক্ষতি করা হয়। ৭ তারিখে নারায়ণগঞ্জের (পি. ই. ১৯২, ঢাকা—২২ আসনে) দখলদার বাহিনীর কর্তৃত্বে প্রহসন-নির্বাচনে নির্বাচিত সুলতান উদ্দিন খান ও বন্দর থানার সোনাকান্দা শান্তি কমিটির আহবায়ক হাজী সাহেব আলীকে হত্যা করা হয়। একই দিনে বন্দর থানার নবীগঞ্জে শান্তি কমিটির সদস্য হাজী আবদুল লতিফ সহ দুইজন দালালকে হত্যা করা হয়। একই তারিখে চট্টগ্রাম দেব পাহাড়ে ই. পি. ওয়াপদার একটি ভবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। ৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জের নবীগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়।

৯ তারিখে ঢাকার বাওয়ানী একাডেমীতে বিস্ফোরণ ঘটে। ১০ তারিখে নারায়ণগঞ্জ জে. এম. সি'র একটি পাটের গুদাম ভস্মীভূত করা হয়। একই তারিখে আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এবং হলিক্রস কলেজে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ১১ তারিখ বিকেলে বায়তুল মোকার-রমের নিকট গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হয়। একই তারিখে সেন্ট ফ্রান্সিস্ স্কুলে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ঐ দিন খুলনা আপেল জুট মিলে অগ্নিসংযোগ ক'রে কয়েক লক্ষ টাকার পাট পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ১০ তারিখে গ্রীন রোডে রেডিও ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের সামনে খুলনা কেন্দ্রের আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ার বজলে হালিমকে হত্যা এবং রেডিও পাকিস্তানের ইঞ্জিনিয়ার জিয়াউর রহমান, মীর্জা নাসির উদ্দিন নামক দুই ব্যক্তিকে আহত করা হয়। ১৭ তারিখে চট্টগ্রাম বেতারের আঞ্চলিক সহকারী পরিচালক জনাব আবদুল কাহারকে হত্যা করা হয়। ১৯ তারিখে ঢাকার শান্তিনগরে অবস্থিত পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের (ডি. এফ. পি.) স্থানীয় অফিস বিধ্বস্ত করা হয়। ২৫ তারিখে নারায়ণগঞ্জের দু'টো পাটের গুদাম ও ময়মনসিংহ জেলার নান্দিনায় জুট মার্কেটিং কর্পোরেশনের একটি গুদাম আগুন দিয়ে সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সংঘটিত এইসব তৎপরতার খবর সেই সময়ে প্রকাশিত দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত

সংবাদপত্র থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। এইসব খবরে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রেই কম দেখানো হয়েছে, কোন কোন সংবাদপত্রে খবর বেমালুম চাপা দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রামের সংবাদই মূলতঃ ছাপা হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত খবর থেকে সমগ্র দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুমান করা মোটেই অসম্ভব নয়। সমগ্র দেশেই অনুরূপ অথবা আরো ব্যাপক তৎপরতা পরিচালিত হয়েছিল।

আগস্ট মাসের শেষের দিকেই মুক্তিবাহিনীর হাই কম্যাণ্ড থেকে নিয়মিত বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এবং এই কার্যক্রমের অধীনে 'S' ফোর্স, 'K' ফোর্স ও 'Z' ফোর্সের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

তদুপরি এই কার্যক্রম অনুযায়ী ৯ই অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত সেনায় কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারবৃন্দের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ তনয় শেখ কামাল এই অফিসারবৃন্দের একজন ছিলেন। শেখ কামাল একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

এর পূর্বে ২৫শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ৬ মাস পূর্তি উপলক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বলেন ঃ "পদাতিক বাহিনী ছাড়াও আমাদের নৌ ও বিমান বাহিনীর বীর সৈনিকরা শত্রুর উপর আঘাত হানবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।"

[জয়বাংলা, মুজিব নগর, ২৩শ সংখ্যা, ১৫ই অকটোবর, '৭১]

বস্তুতঃ হানাদার কবলিত অভ্যন্তর ভাগে গেরিলা তৎপরতা তীব্রতর করবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখ যুদ্ধে সীমান্ত অঞ্চল থেকে মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত সৈন্যেরা চাপ সৃষ্টি ক'রে চলেছিল। এই চাপ নভেম্বরের প্রথম থেকে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এর ফলে নভেম্বরের প্রথম দিকে কুষ্টিয়া জেলার প্রায় ৮০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ওপর মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মুক্তিবাহিনী জীবননগর পুলিশ স্টেশনটি দখল ক'রে নেয় এবং মহকুমা শহর মেহেরপুর দখল করবার জন্য যুদ্ধ চালাতে থাকে। যশোর খণ্ডে হরিনগর এবং মাজিয়াখালি এলাকায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়। এই সময়ে দিনাজপুরের পঞ্চগড় দখল ক'রে বেসামরিক প্রশাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছিল। রংপুর-দিনাজপুর খণ্ডে প্রায় ৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার স্থান মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে।

সিলেটের শমসেরনগর বিমান বন্দরসহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়। ময়মনসিংহের কমলপুরে পাক-বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। এই সময় সিলেট, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, যশোর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি খণ্ডে পাক-বাহিনীর ওপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই আক্রমণের মুখে হানাদার বাহিনীর পক্ষে ব্যাপকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

মুক্তিবাহিনীর দুর্বার আক্রমণে বাংলাদেশে পাক-বাহিনী দিশেহারা হয়ে ওঠে। একের পর এক সীমান্ত এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে যেতে থাকে। ৩রা ডিসেম্বরের মধ্যে পঞ্চগড়, জীবননগর, চৌগাছা, কমলপুর, শমসেরনগর, সাতক্ষীরা প্রভৃতি এলাকা মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই সমস্ত এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা চালু করা হয়।

একদিকে বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর হাতে যখন পাক-সেনাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, তখন ভারতের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সমরনায়কেরা ৩রা ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় পশ্চিম খণ্ডে ভারতীয় বিমান ঘাঁটি অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর ও আগ্রার ওপর অতর্কিতে বিমান হামলা চালায় এবং বোমাবর্ষণ করে। ৩রা ডিসেম্বর শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যখন কোলকাতায় ভিক্টোরিয়া পার্ক ময়দানে স্মরণকালের সর্বাধিক সংখ্যক লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় এই আক্রমণ করা হয়। বক্তৃতা শেষে দ্রুত দিল্লী ফিরে গিয়ে সেদিনই গভীর রাতে তিনি এক বেতার ভাষণে বাংলাদেশের যুদ্ধকে ভারতের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন এবং পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

চতুর্থ পর্যায়ঃ মুক্তিবাহিনী ও মিত্র-বাহিনীর যৌথ আক্রমণ ও হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ

৪ঠা ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পাক-সেনাদের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করে। ভারতীয় বিমান বাহিনী মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে বাংলাদেশের

বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালাতে থাকে। বাংলাদেশের সাথে তখন পাকিস্তানের যোগাযোগ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পাড়। ঢাকার আকাশে বিমান যুদ্ধে দু'টি পাক স্যাবর জেট ধ্বংস হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভারতীয় বিমান বাহিনী মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ ক'রে ঢাকা, লালমনিরহাট, সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় হামলা চালিয়ে পাক-সেনাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে। যুদ্ধে যৌথ বাহিনী বীর-বিক্রমে বাংলাদেশের একের পর এক শহর-বন্দর দখল ক'রে মুক্ত করতে থাকে। ৫ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহের নিকট কমলপুরে ৩১তম বেলুচ রেজিমেন্টের ১৬০ জন সৈন্য তাদের কম্যাণ্ডার সহ যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এই দিনই প্রথম নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের পাক-ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়। আখাউড়া এবং আকশাম এলাকা মুক্তিবাহিনীর দখলে আসে। এখানে পাক-বাহিনীর ২৫তম রেজিমেন্টের লেঃ কর্নেল বেগ সহ মোট ১২০ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করে।

৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তান-বিমান বাহিনী তাদের সবগুলো বিমান হারায়। ফলে পাক-বাহিনী তাদের আক্রমণে কোন বিমান সাহায্য পায় না। মুক্তিবাহিনী ৬ই ডিসেম্বর সাতক্ষীরা দখল ক'রে খুলনার দিকে এগোতে থাকে। অপর দিকে নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, টঙ্গী এবং জামালপুর মুক্ত ক'রে যৌথ বাহিনী ঢাকাকে অবরোধ করার চেষ্টা করতে থাকে। চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ দখল ক'রে মুক্তিবাহিনী যশোরের দিকে অগ্রসর হয়।

৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষের এক আনন্দের দিন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম ভারত এই দিনটিতে স্বীকৃতি প্রদান করে। সকাল ১১টায় ভারতীয় লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এই স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার অভিযোগে পাকিস্তান ঐদিন দুপুর ২টায় ভারতের সাথে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

৭ই ডিসেম্বর মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর দুর্বার আক্রমণের মুখে পাক-বাহিনীর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি বলে পরিচিত যশোহর ক্যান্টনমেন্টের পতন ঘটে।

এ ছাড়া সিলেট শহরটিও মুক্ত হয়। যশোর বিমান বন্দর এবং সিলেটের শালুটিকর বিমান বন্দরটিও যৌথ বাহিনীর দখলে আসে। বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই দিন বিকাল চারটায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে দেওয়া এক ভাষণে বাংলাদেশের মানুষকে চরম বিজয় মুহূর্তে শেষবারের মত সংগ্রামের আহ্বান জানান।

৮ই ডিসেম্বর ভুটান বাংলাদেশ-সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ আক্রমণে কুমিল্লা শহরটি মুক্ত হয়। ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টটি চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ ক'রে ফেলা হয়। চাঁদপুর ও দাউদকান্দি দখল ক'রে যৌথ বাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাংলাদেশে অবরুদ্ধ পাক-বাহিনীকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেয়ার জন্য সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ম্যানেকশ পাক-সেনাদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান।

৯ই ডিসেম্বরের মধ্যে পাক-বিমান বাহিনীর মোট ২৩টি বিমানের ২২টি বাংলাদেশের আকাশে বিধ্বস্ত হয়। ফলে পাক-সেনাদের প্রতিরোধ দুর্গ একেবারে বিধ্বস্ত হয়। বাংলাদেশ-বিমান বাহিনী ও ভারতীয় বিমান বাহিনী বিনা বাধায় বিমান হামলা চালিয়ে শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে থাকে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণে ঝিনাইদহ ও মাগুরা মুক্ত হয়। এই বাহিনী কুষ্টিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। অপর একদল বগুড়া-রংপুর রাস্তার মাঝখানে কালিগঞ্জ দখল করে।

১০ই ডিসেম্বর পাক-বাহিনী পিছু হটবার প্রাক্কালে ভৈরব সেতুটি ধ্বংস ক'রে দিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ভৈরব শহরটি মুক্ত করে। হেলিকপ্টারের সাহায্যে মেঘনা নদী অতিক্রম ক'রে তারা মেঘনার পশ্চিম তীরে অবস্থান করতে থাকে। এখান থেকে ঢাকা শহরটি আক্রমণের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঢাকায় আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থা হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টাল এবং হলি ফ্যামিলী হাসপাতালকে নিরাপদ এলাকা বলে ঘোষণা করে। বিদেশীদের এখানে নিরাপত্তা দেয়া হয়। বিদেশীদের ঢাকা থেকে সরিয়ে নেবার জন্য এই দিন সারাদিন ধরে ঢাকায় কোন বিমান হামলা চালানো বন্ধ রাখা হয়।

১১ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহ এবং কুষ্টিয়া মুক্ত হয়। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী পাকিস্তানে জেঃ ইয়াহিয়ার নিকট এবং জাতিসংঘের নিকট বাংলাদেশস্থ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জীবন রক্ষা করার জন্য আবেদন জানায়। ১২ই ডিসেম্বর যৌথ বাহিনী ঢাকার মাত্র ৩০ মাইলের মধ্যে এসে পড়ে।

১৩ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইল মুক্ত হয়। ১৪ই ডিসেম্বর যৌথ বাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে পাক-বাহিনী থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করতে থাকে।

এ দিকে ঐদিন জয়দেবপুরে অবস্থিত একজন ব্রিগেডিয়ারসহ এক দল পাক-সেনা আত্মসমর্পণ করে।

১৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ম্যানেকশ-এর জবাবে বাংলাদেশে হানাদার বাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ নিয়াজী আত্মসমর্পণের স্বীকৃতির কথা জানায় এবং ১৬ই ডিসেম্বর সকাল নয়টায় আনুষ্ঠানিক-ভাবে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করেন। ১৬ই ডিসেম্বর রেস্‌কোর্স মাঠে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ৯মাস যুদ্ধের অবসান হয়।

হানাদার পাক-বাহিনী যৌথ কম্যাণ্ড মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ শত্রুর নিষ্ঠুর কবল থেকে মুক্তিলাভ করে।

॥ স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় রাজনৈতিক তৎপরতা ও জনগণের সাহায্য ॥

রাজনৈতিক তৎপরতা ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় রাজনীতিবিদগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যে রাজ-নৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা নিয়ে সমগ্র পরিস্থিতির মোকা-বেলা করেছেন তা' খুবই প্রশংসনীয়। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বাংলাদেশের ঘটনাবলী লক্ষ্য করেছেন এবং ধীরে সুস্থে ও সাহসের সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করে-ছেন। সামরিক বাহিনীর অমানুষিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে লক্ষ লক্ষ

বাংলাদেশের স্বাধী-নতা আন্দোলনে ভারতীয় রাজনীতি-বিদদের ভূমিকা

শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। এটা ভারত সরকারের জন্য বিভিন্ন রকমের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

এই বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হবার পর ভারতের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কি ছিল তা' প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৪শে ও ২৬শে মে এবং ১৫ই জুন তিনটি বক্তৃতায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের মানবাধিকারকে পদদলিত করা হচ্ছে এবং তারা বাধ্য হয়ে নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে অসহায় অবস্থায় ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গ এ-ব্যাপারে চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সুপরিকল্পিত গণহত্যাজনিত উদ্ভূত শরণার্থী সমস্যা ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি এক মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আগমনে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। কারণ এ সমস্যার সাথে ভারতের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গ এ-সমস্যা সমাধানের কোন গঠনমূলক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন না। এমতাবস্থায় ভারতের দায়িত্ব হ'ল শরণার্থীদের অস্থায়ীভাবে সাহায্য ও আশ্রয় দেয়া। যে পর্যন্ত বাংলা-দেশে শরণার্থীদের জীবনের নিরাপত্তা, মান-সম্মানের নিশ্চয়তা এবং তাদের ফিরে যাবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হয়, ততদিন এই উপ-মহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ভারত সরকার মানবিক কারণে শরণার্থীদের তাদের নিজের দেশে চলে যেতে দিতে পারে না। এই সমস্যার কোন সামরিক সমাধান সম্ভব নয়। এর একটা রাজ-নৈতিক সমাধান করতে হবে। রাজনৈতিক সমাধানের অর্থই হ'ল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের সাথে আলাপ-আলোচনা করা। শ্রীমতি গান্ধী পুনরায় জোর দিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশে শরণার্থী ফিরে যাবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে নিজ বাসভূমিতে ফিরে যেতে বাধ্য করা যেতে পারে না।

[সুঃ রাঃ চৌঃ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৪-২৮]

সমগ্র সমস্যার পর্যালোচনা ক'রে ভারত সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা' আন্তর্জাতিক আইন এবং শরণার্থী সংক্রান্ত আইনের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, যখন রুমানিয়া সরকার তার ইহুদী নাগরিকদের বিরুদ্ধে কতকগুলো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদেরকে আমেরিকায় যেতে বাধ্য করেছিলেন তখন আমেরিকার স্টেট সেক্রেটারী মিঃ হে মানবতার খাতিরে রুমানিয়া সরকারের জঘন্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ কমিটিতে ব্রিটেনের প্রতিনিধি মিঃ ফিট্‌জ্‌মরিস বলেছিলেন যে, যদি 'ক' রাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ লোককে প্রতিবেশী 'খ' রাষ্ট্রে পাঠিয়ে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে, তা' হ'লে 'খ' রাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তার জন্য 'ক' রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

[সুঃ রাঃ চৌঃ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩০]

ভারত সরকার লক্ষ লক্ষ আতঙ্কগ্রস্ত শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া ছাড়াও স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছিলেন। ভারতের এই মহান নীতি জাতিসংঘের সনদ ও সমসাময়িক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বলিত আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে তথা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত হস্তক্ষেপ করেন নি—ভারত যা করেছেন, মানবতার খাতিরে তা' যে কোন দেশের পক্ষেই করা অপরিহার্য কর্তব্য। ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ 'লোকসভায়' ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, "পূর্ব বাংলায় যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ভারত সরকার সম্পূর্ণরূপে সচেতন। আজ পূর্ব বাংলায় এক নতুন ঘটনা-প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে জনগণ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জেগে উঠেছে। আমরা জনগণের এই জাগরণকে সমর্থন জানাচ্ছি। কিন্তু এটার অর্থ এই নয় যে, আমরা অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছি। কেননা, ভারত সরকার সব সময় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা

করে থাকে। ভারত আশা করেছিল যে, পূর্ব বাংলার ঘটনাবলী ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এক নতুন পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যার ফলে দু' দেশ আরো কাছাকাছি আসবে; কিন্তু এটা আর হ'ল না। অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে পাকিস্তান নিজেকে আরো শক্তিশালী করার এক সুবর্ণ সুযোগ হারাল। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, যাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

পূর্ব বাংলায় শুধু একটা আন্দোলনকে দমন করা হচ্ছে না, সেখানে নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের ওপর ট্যাঙ্ক চালানো হচ্ছে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় সদস্যদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, অত্যন্ত সচেতনভাবে পূর্ব বাংলার ঘটনা-প্রবাহের সাথে সব সময় সংযোগ রাখা হবে এবং ঠিক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। পূর্ব বাংলায় যে ব্যাপক গণহত্যা চলছে সে ব্যাপারে বিরোধী দলের সদস্যদের সাথেও তিনি আলাপ-আলোচনা করেছেন। ভবিষ্যতেও আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবেন। ভারত সব সময় অত্যাচারিত ও নিপীড়িত জনগণকে সমর্থন করেছে; কিন্তু এই মারাত্মক পরিস্থিতিতে বেশী কথা না বলাই ভালো।

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬৯-৭০]

ঐদিনই পার্লামেন্টে এক ভাষণে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং পূর্ব বাংলার ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ ক'রে ভারতের জনগণকে আশ্বাস প্রদান করেন যে, ভারত এই মানবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ।

১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে এক প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই সংসদ (হাউস) পূর্ব বাংলার ঘটনাবলীতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। পাকিস্তান সরকার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না ক'রে একতরফাভাবে জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করেছে। পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর বেয়নেট, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, আর্টিলারী ও বিমান বাহিনী দ্বারা নির্যাতন চালানো হচ্ছে। ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি এই সমস্ত ঘটনাবলীতে ভারত সরকার

ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক পার্লামেন্টে প্রস্তাব পেশ

নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারে না। ভারতের জনগণ পূর্ব বাংলার নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের ওপর এই অমানুষিক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করছে। এই সংসদ পবিত্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্য সংগ্রামরত পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে। এবং তাদের দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করছে। এই সংসদ সেখানে নিরীহ জনগণকে হত্যা বন্ধ করার দাবী জানাচ্ছে। তাছাড়া এই সংসদ সমগ্র বিশ্বের জনগণ এবং সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে, তাঁরা যেন পূর্ব বাংলায় এই সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। এই সংসদ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এরূপ বিশ্বাস করে যে, পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ মহান সংগ্রামে জয়লাভ ক'রে তাদের ন্যায্য সংগ্রামে তারা ভারতের জনগণের সাহায্য এবং সহানুভূতি লাভ করবে।

[পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭২]

১৯৭১ সালের ২৪শে মে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে লোকসভায় আরেকবার ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন যে, শরণার্থী সমস্যা ভারতের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। গত ২৩ বছর ভারত পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নি। আজ যেটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে দাবী করা হচ্ছে, সেটা ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং, আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে পাকিস্তানের যে সমস্ত কার্যকলাপ ভারতের শান্তিকামী লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন ক'রে তুলেছে, সে সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য পাকিস্তানকে বলার অধিকার ভারতের আছে। যদি বিশ্ব এ-ব্যাপারে উদাসীন থাকে, তা' হ'লে ভারত তার নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

[ঐ, পৃঃ ৬৭২-৭৫]

১৭ই জুন ওয়াশিংটন প্রেস ক্লাবে এক ভাষণে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং বলেন যে, বাংলাদেশের দুঃখজনক ঘটনা এই অঞ্চলের শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি এক বিরাট হুমকি স্বরূপ। শেখ মুজিবের

জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে সর্দার শরণ সিং বলেন যে, তিনি শুধু একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনীতিবিদই নন, অধিকন্তু তিনি জনগণের অফুরন্ত ভালোবাসা লাভ করেছিলেন। তাঁর মুক্তির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত। পাকিস্তানের সামরিক সরকারের কার্যকলাপে উদ্ভূত পরিস্থিতি ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তাই ভারত আশা করে যে, সমস্যার এমন একটি রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে যেটা পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

শেখ মুজিব সম্পর্কে শরণ সিং-এর উদ্বেগ

[পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮৬-৮৯]

১০ই আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে এক বার্তায় বলেন যে, ইয়াহিয়া খান কর্তৃক গোপন সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের তথাকথিত বিচারের খবর শুনে ভারত সরকার ও জনগণ খুবই উদ্বিগ্ন। এই তথাকথিত বিচার-প্রহসন পূর্ব বাংলার পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে ক'রে তুলবে এবং ভারতে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। সুতরাং, এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণের ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত, যাতে এই বিচার বন্ধ করা হয়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং মহাশয়ও অনুরূপ এক বাণী জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের কাছে পাঠান।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট শ্রীমতি গান্ধীর বার্তা

[ঐ, পৃঃ ৭১২]

৩০শে আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ব শান্তি কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী রমেশচন্দ্রের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের সংগ্রামকে নীতিগতভাবে সমর্থন করেন। অতঃপর শ্রীমতি গান্ধী বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাতে আলোচনার জন্য পাশ্চাত্য দেশগুলোর পথে রওয়ানা হয়ে যান।

২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন কর্তৃক তাঁর সম্মানে প্রদত্ত এক ভোজসভায় বলেন যে, পূর্ব

বাংলার জনগণ পাকিস্তান সরকারের সাথে এক মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত।

সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রীমতী গান্ধী

সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। পূর্ব বাংলার ঘটনাবলীকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে কিছুতেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। সেখানকার জনগণের কি তাদের নিজের দেশে বসবাস করার অধিকার নেই? বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এই সমস্ত লোককে আশ্রয় ও খাবার দেয়ার ক্ষমতা ভারতের নেই। শ্রীমতী গান্ধী জোর দিয়ে বলেন যে, এটা ভারত-পাকিস্তান সমস্যা নয়। এটা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা। কিন্তু এই সমস্যার প্রতি আন্তর্জাতিক সাড়া অত্যন্ত তুচ্ছ। শরণার্থীরা যাতে তাদের দেশে ফিরে যেতে পারে, সে ব্যাপারে সাহায্য করা বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের একান্ত দায়িত্ব বলে ভারত মনে করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান করার জন্য পাকিস্তানকে যে পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে ভারত খুবই আনন্দিত। ভারত আশা করেন যে, এই সব প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে।

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭-৩৮]

১৯শে অক্টোবর 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স' পত্রিকার প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে এক

'নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধী

মারাত্মক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তিনি বলেন, ভারত কখনো যুদ্ধের জন্য উস্কানি দেবে না; কিন্তু সে তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। ভারত বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে, এই অভিযোগ শ্রীমতী গান্ধী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করেন। নিক্সন প্রশাসনের সমালোচনা ক'রে তিনি বলেন যে, আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ ক'রে চলছে।

[ঐ, পৃঃ ২৪৮-৪৯]

২৫শে অক্টোবর ব্রাসেলসে 'রয়েল ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স'-এ এক ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, পূর্ব বাংলার নব্বই লক্ষেরও বেশী লোক সামরিক সরকারের অমানুষিক

নির্যাতনে টিকতে না পেরে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এতে ভারতের জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে। যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোট দিয়েছিল, সামরিক জান্তা তাদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে। ভারতের জনগণ ও সরকার চরম ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ভারতের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার প্রতি এই সমস্ত ঘটনা এক বিরাট হুমকীস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সঙ্কটের মূল কারণ বের করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধান সমস্যার মূল কারণ দূরীভূত করতে পারবে বলে ভারতের বিশ্বাস। যাঁরা বিশ্ব-শান্তিতে বিশ্বাস করেন, তাঁদের উচিত শরণার্থীরা যেন তাদের দেশে নিরাপদে এবং সসম্মানে বসবাস করতে পারে, সে ব্যাপারে চেষ্টা চালানো।

ব্রাসেলসে শ্রীমতী গান্ধী

[পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৩]

২৬শে অক্টোবর পশ্চিম জার্মান টেলিভিশনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বলেন যে, ভারত কখনো যুদ্ধ চায় না। কিন্তু যুদ্ধ যদি চাপিয়ে দেয়া হয়, তা' হ'লে সেই যুদ্ধ পাকিস্তানী ভু-খণ্ডে পরিচালিত হবে। মুক্তিযোদ্ধারা যদি কোন এলাকা মুক্ত করে, সে জন্য ভারতকে দোষারোপ করা যায় না। ভারত ও পাকিস্তান দু'দেশই সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছে। স্পষ্টতঃই সীমান্ত পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাকর।

[ঐ, পৃঃ ২৫৩-৫৪]

২৭শে অক্টোবর জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন বিশ্ব নিরাপত্তা সম্পর্কে জাতিসংঘের প্রথম কমিটিতে ভারতের তরফ থেকে বাংলাদেশে যে সব ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটেই চলেছে তার বিশদ বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, ব্যাপারটি এখন আর পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। জেনোসাইডজনিত পরিস্থিতির ফলে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পাঠিয়ে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই পরিস্থিতিকে বিশ্বসংস্থা এড়িয়ে যেতে পারে না।

জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীসমর সেনের ভূমিকা

[অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯২-৯৩]

২৭শে অক্টোবর অস্ট্রিয়ান রেডিওর সাথে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান পূর্ব বাংলা সঙ্কট নিরসনের একমাত্র উপায় বলে ভারত বিশ্বাস করে। আজ ভারতের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা এক মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে। ভারত যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চায় না। কিন্তু ভারত তার জাতীয় স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষা করতে সব সময় সতর্ক থাকবে।

অস্ট্রিয়ান রেডিওর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধী

[বাংলাদেশ ডকুমেণ্টস্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৪-৫৫]

৫ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে এক ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণ সামরিক সরকারের অধীনে থেকেও আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছে। আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার অজুহাতে সামরিক জান্তা বাংলাদেশে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে। যে দিন আওয়ামী লীগ একটা আপোষের আশা করছিল, সেদিনই সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শ্রীমতী গান্ধী

পূর্ব বাংলায় আজ প্রকৃত অর্থে গৃহযুদ্ধ চলছে না, সেখানে সেনাবাহিনী বেসামরিক লোকজনকে নির্বিচারে হত্যা করছে। লক্ষ লক্ষ লোক ঘর-বাড়ী ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আগমন ভারতের অর্থনীতির ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। এটা একটা আন্ত-র্জাতিক বিরোধও নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটা ভারত-পাকিস্তান বিরোধও নয়। ভারতকে বলা হচ্ছে যে, দু'দেশের সৈন্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা শান্তির প্রতি হুমকীস্বরূপ। কিন্তু যেখানে একটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে, সেটা কি শান্তির প্রতি হুমকীস্বরূপ নয়? ভারত সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। ভারত সেজন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দকে জানিয়েছে যে, পূর্ব বাংলা সঙ্কটের সমাধানের একমাত্র উপায় হ'ল—শেখ মুজিব যদি বেঁচে থাকেন, তা' হ'লে তাঁকে মুক্তি দেয়া এবং গণপ্রতিনিধিদের সাথে তাঁদের গ্রহণযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়া।

[ঐ, পৃঃ ২৬৫-৬৭]

৬ই নভেম্বর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু ভারতের শান্তি ও স্থিতিশীলতা যদি হুমকীর সম্মুখীন হয়, তা' হ'লে পাকিস্তানের কোন অংশে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা আসতে পারে না। আজ কোন কোন দেশ একজন সামরিক একনায়ককে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একজন লোকের সম্মানকে বাঁচাতে গিয়ে তারা সারা উপমহাদেশের শান্তিকে বিঘ্নিত করছে।

যে ব্যক্তিকে জনগণ নির্বাচিত করে নি, তাকে বাঁচাতে গিয়ে তারা পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। সীমান্ত এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে গেলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এ কথা যাঁরা ভাবছেন, তাঁরা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। সমস্যার মূল কারণ-গুলোকে দূরীভূত করতে হবে। ভারত কখনো যুদ্ধ চায় না। কিন্তু সে তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

[পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৩-৭৬]

পার্লামেণ্টের অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী

সোভিয়েট ইউনিয়ন, বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী সফর শেষ ক'রে এসে মিসেস গান্ধী ১৫ই নভেম্বর পার্লামেণ্টে এক ভাষণে বলেন যে, এই সমস্ত দেশের সরকার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। এই আলাপ-আলোচনা অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়েছে এবং সমস্যার মূল কারণগুলো তাঁরা বুঝতে পেরেছেন।

অনেক দেশ এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধান এই সঙ্কট নিরসন করতে পারবে। অনেক দেশ শেখ মুজিবের মুক্তি দেয়া খুবই প্রয়োজনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই সফরের ফলে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন দেশ বাংলাদেশের জনগণের ওপর কোন সমাধান চাপিয়ে দিতে পারবে না এবং কোন শক্তিই তাদের স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবোধকে দমন করতে পারবে না। কিন্তু ভারতকে এই সমস্ত দেশের ওপর নির্ভর ক'রে থাকলে চলবে না। ভারত এই সমস্ত দেশের সহানুভূতি, নৈতিক এবং

রাজনৈতিক সমর্থনের প্রশংসা করে। ভারত ও বাংলাদেশের জনগণকে সম্মিলিতভাবে এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। ভারতকে তার নিরাপত্তার ব্যাপারে সব সময় সজাগ থাকতে হবে। যে পর্যন্ত না বাংলাদেশ পরিস্থিতির একটা সন্তোষজনক সমাধান হচ্ছে, সে পর্যন্ত ভারত তার সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার ঝুঁকি নিতে পারে না।

[পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৩-৯৪]

ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান

ডিসেম্বরের ৩ তারিখে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতও তার জবাব দানের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন। তিনটি কারণের ওপর ভিত্তি ক'রে এই স্বীকৃতি দেয়া হয়ঃ

১। বাংলাদেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং সাফল্য এটাই প্রমাণ করেছিল যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে তার নিয়ন্ত্রণে আনতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

২। বাংলাদেশ সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেছে। প্রেসিডেন্ট জেফারসনের মতানুযায়ী বাংলাদেশ সরকার জনগণের সমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৩। ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের জনগণ তাদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভারতের জনগণ তাদের ওপর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ চালাচ্ছে। সুতরাং, একই কারণে ভারত ও বাংলাদেশের জনগণ যুদ্ধে লিপ্ত।

আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফরের সময় বিভিন্ন দেশের সরকার এবং নেতৃবৃন্দের কাছে বাংলাদেশ সঙ্কটের একটা সুস্পষ্ট চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন। তিনি বিশ্বের ছোটবড় শক্তিসমূহকে একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া এবং বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা দরকার। কিন্তু বিশ্ব এ-ব্যাপারে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয় নি। ফলে ভারতকে তার নিরাপত্তা ও

স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। যুদ্ধে পাকিস্তান সেনা-বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কম্যাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। অভ্যুদয় ঘটে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ রাষ্ট্র স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা-দেশের। জয় বাংলা, জয় সোনার বাংলা।

জনগণের সাহায্য :

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতীয় জনগণের ভূমিকা তুলনা-বিহীন। পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ যে সাহায্য-সহানুভূতি, আন্তরিকতা-আতিথেয়তার হাত বাড়িয়ে বাংলার জনগণের জন্য এগিয়ে এসেছেন, তার সার্বিক চিত্র এই পুস্তকে স্থানাভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, মধ্যবিত্ত, কেরানী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার—এক কথায় আপামর জনসাধারণ আমাদের সাথে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যা করেছেন, বাংলার মানুষ তা' শ্রদ্ধার সাথে চিরকাল স্মরণ করবে।

২৫শে মার্চের গণহত্যা আরম্ভ হবার পর থেকে সাড়ে সাত কোটি মানুষ যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে বাস করতে থাকে। প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে ওঠে সর্বত্র। এই আন্দোলন প্রায় সর্বত্রই সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু পশ্চিম-পাক-সৈন্যদের অত্যাচারের ও আক্রমণের দুর্বারতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিরোধ-আন্দোলন ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। দলে দলে লোক শরণার্থী হিসেবে ভারত সীমান্তে আশ্রয়ের জন্য ছুটতে থাকে। প্রতিরোধ-আন্দোলনের সাথে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁরাও ভারত সীমান্তে অস্ত্রের জন্য ভীড় জমাতে থাকেন। ভারতীয় জনগণ এবং জোয়ানরাও মুক্ত হস্তে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। যতই দিন যেতে থাকে, বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশার কারুণ্য যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, ভারতীয় সাহায্যের পরিমাণ, সহানুভূতির উষ্ণতা ততই বৃদ্ধি পায়। এই সহানু-ভূতিতে ভারতীয় জনগণ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর একান্ত বিরল। সংক্ষেপে সরকারী পর্যায়ে রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। জনগণের পর্যায়েও তৎপরতা ছিল ব্যাপক এবং সর্বতোমুখী।

প্রথম পর্যায়ে ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষ এগিয়ে আসেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। প্রতিটি ব্যক্তি তার বাড়ির শোবার ঘর, বাইরের ঘর শরণার্থীদের জন্য ছেড়ে দেন। ক্রমে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, আশ্রম ইত্যাদি স্থানে তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। ঐ সব অঞ্চলের ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবী, বুদ্ধিজীবী পথে নেমে নানা সাহায্য-সামগ্রী সংগ্রহ ক'রে দুস্থ শরণার্থীদের আহারের ও থাকবার ব্যবস্থা করলেন। সেই সাথে শরণার্থী-শিবিরও গড়ে উঠতে দেখা গেল। প্রথম দিকে সীমান্তের নিকটবর্তী বেশ কিছু শরণার্থী-শিবির গড়ে ওঠে।

শরণার্থীদের জন্য স্থানীয় অঞ্চলের প্রত্যেকটি নাগরিক ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে আসেন। শিবিরগুলোর জন্য সেই সব অঞ্চলের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল, ডাল, তেল, নুন, নগদ অর্থ, বস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করে। শরণার্থী-শিবিরগুলো পরি-চালনা করতে প্রতিদিন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হ'ত এবং প্রাথমিক-ভাবে এই অর্থ সবই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমাজসেবী, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র-ছাত্রীরা সংগ্রহ করেছেন। ক্রমশঃ শিবিরগুলোতে জনতার ভীড় বাড়তে থাকে। এই ভীড়ের মোকাবিলা করা স্থানীয় লোকজনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবী, ছাত্রনেতা ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন শরণার্থীদের সাহায্য করবার জন্য। পরবর্তী পর্যায়ে ভারত সরকার সমস্ত শরণার্থী-শিবির সরকারী সাহায্যের আওতায় নিয়ে আসেন। লাঞ্ছিত, নিরাশ্রয় ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ক্রন্দনে ভারত সরকার ও ভারতের জনগণের সাড়া প্রমাণ করেছে যে, মানবতাকে অবমাননা থেকে রক্ষার জন্য এই দেশ তার যথার্থ দায়িত্ব পালন করেছে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে বেঙ্গল রেজিমেণ্ট, ই. পি. আর. (বর্তমানে বি. ডি. আর.), আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ, কিছু ছাত্র এক একজন সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তে আশ্রয় নেন। এই সমস্ত সেনাবাহিনীর তখন না ছিল আশ্রয়, না ছিল আহার-সামগ্রী। স্থানীয় লোকজন সবাই মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। জনগণই প্রথম স্থানীয় সাহায্যে বিশেষ বিশেষ এলাকায় যুব-শিবির গড়ে তোলেন। এই

সমস্ত শিবিরে বাংলাদেশ থেকে আগত সব সৈনিক এবং যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক যুবকরা থাকতেন। যুব-শিবিরের যাবতীয় ব্যয় স্থানীয় লোকেরাই বহন করতেন। এই যুব-শিবিরগুলো পরে ভারত সরকার সরাসরি নিজেদের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে এই ক্যাম্পগুলোই 'ইয়োথ ক্যাম্প' 'মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প' 'অপারেশন ক্যাম্প' নামে পরিচিত হয়। যুব-শিবিরগুলো গঠনে জনগণের সাহায্য ও আন্তরিকতা সত্যি তুলনাবিহীন।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারী পর্যায়ে নানা সাহায্য-সংস্থা গড়ে ওঠে। এই বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

এই সংস্থা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। বাংলাদেশ থেকে আগত ছিন্নমূল প্রাইমারী, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষককে বাচানো এবং তাঁদেরকে কাজে লাগানো, বাংলার সোনার ছেলেরা যারা জীবনকে বাজী রেখে মরণপণ লড়ছে, তাদেরকে সক্রিয় সাহায্য করা এবং বাংলাদেশে গণহত্যা তথা ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ বিশ্বের সকল দরবারে পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা—এই ত্রিবিধ কাজেই মূলতঃ সহায়ক সমিতি আত্মনিয়োগ করে।

ছিন্নমূল শিক্ষকদের সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্য দেবার চেষ্টা এই সমিতি থেকে করা হয়েছে। আশ্রয়, অর্থ সাহায্য, জামা-কাপড় এবং তৎসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কিছু শিক্ষকের নিয়োগের ব্যবস্থা করতেও এই সমিতির ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

এ ছাড়া সমিতি থেকে প্রকাশ করা হ'ল 'Bangladesh the Truth,' 'মুক্তি যুদ্ধে বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ', মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি', 'Bleeding Bangladesh', 'Bangladesh through its Lens'—ইত্যাদি পুস্তক-পুস্তিকা। এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলো সমগ্র ভারতে ও বিশ্বে জনমত গঠনে অত্যন্ত সাহায্য করেছে।

সহায়ক সমিতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিত্র প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেছিল। এই চিত্রগুলোতে ছিল বাংলাদেশের গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, ধ্বংস ইত্যাদির বাস্তব ছবি।

সমিতি মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন যুব-শিবিরগুলোতে নানা খাদ্য, অর্থ, ওষুধ প্রভৃতি পাঠানো এবং আহত ও অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি সমিতির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সমিতি যাঁর একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতায় সাফল্য অর্জন করেছিল, তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ঃ অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেশ পত্রনবীশ, অধ্যাপক শ্রীঅনিল সরকার, অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রিয়দর্শন সেনশর্মা, ডঃ অনুরুদ্ধ রায়, ডঃ ধ্রুবজ্যোতি লাহিড়ী, শ্রীসৌরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীঅমিয় চৌধুরী, শ্রীমতী মৃন্ময়ী বসু, মানস হালদার প্রমুখ ব্যক্তি। এঁদের নিকট আমরা নানাভাবে ঋণী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি' নামে অপর একটি সমিতির সাহায্যের কথাও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়। এই সমিতি বাংলাদেশের জনগণের জন্য, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য, বুদ্ধিজীবীদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। সহায়ক সমিতির সভাপতি তৎকালীন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ ক'রে কাজ শুরু করেন। এই সমিতি মুখ্যতঃ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যই গঠিত হয়েছিল। সমিতির পক্ষ থেকে যুদ্ধরত বাংলাদেশের প্রত্যেকটি যোদ্ধাকে সাহায্য করবার ব্যবস্থা করা হয়।

মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি বাংলাদেশের সাধারণ জনমনে বিশেষ আসন দখল করেছিল। সমিতির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নাগরিকদের একটি ক'রে প্রশংসাপত্র দেয়া হয়েছিল। যে প্রশংসাপত্রের বলে কপর্দক-শূন্য নিরাশ্রয় ছিন্নমূল মানুষ বাসে, ট্রামে, রেলগাড়ীতে সর্বত্র বিনা ভাড়াতে ভ্রমণ করতে পেরেছে। মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য বেশ কিছু পুস্তক এবং পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং তা' বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। পুস্তিকাগুলির মধ্যে 'Birth of a Nation' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির প্রতিটি কর্মী দিনরাত যে নিরলস শ্রম স্বীকার করেন, তার জন্য বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অধিকাংশ শিল্পী ভারতের পশ্চিম বাংলাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শিল্পীদের বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসেন ভারতের বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত 'শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সহায়ক সমিতি'। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন অমর কথাশিল্পী প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এর একজন নিরলস কর্মী ছিলেন কবি শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সমিতি ছিন্নমূল শিল্পীদের একত্র ক'রে বিভিন্ন স্থানে থাকবার ব্যবস্থা করেন। সমিতি শিল্পীদের ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে-ছিলেন। তা' ছাড়া শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধা, সবার মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বাংলাদেশের শিল্পীদেরকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়।

'ক্যালকাটা ইয়োথ কয়ার' ভারতের সাংস্কৃতিক জগতে একটি বিশেষ নাম। এই কয়ারের সভাপতি বিশ্ববরেণ্য চিত্রপরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়। সম্পাদিকা বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী সুগায়িকা শ্রীমতী রুমা গুহ ঠাকু-রতা। ইয়োথ কয়ারের কার্যকলাপ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকে নানাভাবে প্রেরণা দান করে।

এই প্রসঙ্গে 'বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী গোষ্ঠীর' কথা কিছু বলা প্রয়োজন। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং খুলনা বেতার কেন্দ্রের বেশ কিছু সঙ্গীতশিল্পী পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁদেরকে একত্র করলেন কলকাতার কিছু সমাজসেবী যুবক। ২৫/৩০ জন শিল্পীকে আশ্রয় এবং আহারের ব্যবস্থা করলেন। এঁদের সাহায্যেই বাংলাদেশ শিল্পী-গোষ্ঠীর শিল্পীরা বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠানের সুযোগ লাভ করেন। কলামন্দির, রবীন্দ্র সদন, মহাজাতি সদন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়াম এবং আরো অসংখ্য স্থানে এই শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। বর্ধমান, দুর্গাপুর, টাটা, জামশেদপুর, চিত্তরঞ্জন সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে এঁরা জনমত গঠনে বাংলাদেশভিত্তিক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমন্বয় কমিটি' একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় সমন্বয় কমিটি কেবল একাত্তরের স্বাধী-নতা যুদ্ধ থেকেই কাজ শুরু করে নি—এর সদস্যগণ অনেক আগে থেকেই বাঙালীদের জাতীয়তাবাদ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য চেষ্টা ক'রে

আসছিলেন। এই কমিটি নানাভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল।

ভারতীয় জনগণের কথা বলতে গেলে 'পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সম্প্রীতি সমিতি' সর্ম্পকে দু'টো কথা একান্তভাবে বলা দরকার। এই সংস্থা ১৯৬৫ সাল থেকে বস্তুতঃ কাজ করেছে। সংস্থার মুখপত্র ছিল 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'—সম্পাদক ছিলেন ডঃ দুলাল চৌধুরী। তখন থেকেই পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের লেখা সংগ্রহ ক'রে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' পত্রিকাটিতে ছাপা হ'ত। তখন থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি, পত্রিকাটি বাঙালী জাতীয়তাবোধ উজ্জীবনে বিশেষ সচেষ্ট। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভবনের শ্রীবিনয় সরকার মহাশয়ের তৎপরতার কথাও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়। ১৯৭১ সালের মার্চে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হ'লে এই সংস্থার সদস্যগণ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ ক'রে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সংস্থার নিরলস কর্মী অজিত রায় মহাশয়ের দান বাংলার জন্য অপরিশোধ্য।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কথাও স্মরণ করতে হয়। সমিতি ব্যাপকভাবে বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহলে বাংলাদেশের বাস্তব রূপটি তুলে ধরতে বিশেষ যত্নবান হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা বলতে গেলে 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি'র কথাও বলা প্রয়োজন। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রচুর পরিমাণ অর্থদান করেছিল। তা' ছাড়া দিল্লী সহ বিভিন্ন শহরে জনমত গঠনেও সংস্থার কর্মিগণ তৎপর ছিলেন। তাঁদের নিরলস সহযোগিতা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়। এই সঙ্গে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকেও স্মরণ করি। তিনি বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ।

এখানে শুধু পশ্চিম বাংলার কয়েকটি সমিতি বা সংস্থার বা কিছু মহান ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের সকল অঙ্গরাজ্যে এমনি অসংখ্য সমিতি ও সংস্থা বাংলাদেশের জন্য গড়ে উঠেছিল। এই সমস্ত সংস্থার ভূমিকাও ছিল উজ্জ্বল ও প্রশংসনীয়। সংস্থাসমূহের কার্যকলাপের বিবরণ এতই ব্যাপক যে, এখানে তা' উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

॥ পাকিস্তানের প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ ॥

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান থেকে শুরু ক'রে সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসার এবং বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের উস্কানিমূলক বক্তৃতা, বিবৃতি ও কার্যকলাপ থেকে এটাই স্পষ্ট হয়েছিল যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান তাঁদের কাম্য নয়, বরঞ্চ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু ক'রে বিশ্বের নিকট তাঁরা যে জঘন্যভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন তা' ঢাকবার জন্য বিশ্বজনমতকে তাঁরা ধোঁকা দেবার চেষ্টায় ব্রতী হলেন এবং বাংলাদেশের ঘটনাবলী থেকে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতের সাথে যুদ্ধ শুরু করার হুমকী দিতে থাকেন। বাঙালী জাতির অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন এবং সামরিক আদালতে তাঁর বিচার করা হবে বলেও হুমকী দেন।

১৯৭১ সালের ৩রা আগস্ট পাকিস্তান টেলিভিশন করপোরেশন থেকে প্রচারিত এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন,

পাকিস্তান টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান

অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পূর্ববর্তী নির্বাচনী ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হয়ে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক ও বিদ্রোহীভাবাপন্ন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের কার্যকলাপে দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেন যে, একজন রাষ্ট্রদ্রোহীর যেভাবে সাজা হওয়া উচিত, শেখ মুজিবুর রহমানেরও সেভাবেই সাজা হবে।

১৭ই অক্টোবর ফ্রান্সের 'লি মণ্ডে' পত্রিকার প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান বলেন যে, যে পর্যন্ত না সামরিক আদালত শেখ মুজিবকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করবে, সে পর্যন্ত তিনি বিদ্রোহী শেখ মুজিবের সাথে কোন আলাপ-আলোচনা করতে পারেন না।

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১-৩২]

পূর্বে ২রা আগস্ট তারিখে 'পাকিস্তান টাইম্‌স'-এ প্রকাশিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বি. বি. সি. প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে ভারতের

সাথে যুদ্ধ শুরু হবে বলে একবার আভাস দেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে যুদ্ধ যদি অব্যাহত থাকে তা' হ'লে ভারতের সাথে যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। আমেরিকার 'কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিসটেম'-এর জনৈক মুখপাত্রের সাথেও এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ অত্যাসন্ন। ১লা অক্টোবর ফ্রান্সের 'লি ফিগারো'তে-প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বলেন যে, ভারত যদি পাকিস্তানের এক ইঞ্চি ভূমি দখল করার চেষ্টা করে, তা' হ'লে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পিছপা হবে না।

বি. বি. সি'র সাথে সাক্ষাৎকার

[পর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৬-৩৭]

১৮ই সেপ্টেম্বর সিন্ধুর গভর্নর লেঃ জেঃ রহমান গুল এক ভাষণে বলেন যে, ভারতের যে কোন প্রকার আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির মোকাবিলা করতে পাকিস্তান প্রস্তুত এবং ভারত যদি পাকিস্তানের কোন ক্ষুদ্র এলাকাও দখল করার চেষ্টা করে, তা' হ'লে ভারতের সে আক্রমণকে নস্যাৎ ক'রে দেয়া হবে। ৭ই অক্টোবর পূর্ব বাংলার তৎকালীন সামরিক প্রশাসক লেঃ জেঃ নিয়াজী সৈয়দপুরে এক ভাষণে বলেন যে, ভারত যদি পাকিস্তানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তা' হ'লে ভারতের ভূখণ্ডেই এ যুদ্ধ পরিচালিত হবে।

রহমান গুল ও নিয়াজী

[ঐ, পৃঃ ১৩৭-৩৮]

একাত্তরের ১২ই অক্টোবর জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান বলেন যে, যারা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল, তারা একে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। গত ২৪ বছর যাবৎ পাকিস্তান ভারতের সাথে শান্তিতে বাস করতে চেয়েছে, কিন্তু ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করার কোন সুযোগই নষ্ট করে নি।

ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ

৮ই নভেম্বর 'নিউজ উইক' ম্যাগাজিনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ভারত যদি পূর্ব বাংলা দখল ক'রে সেখানে পুতুল বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা' হ'লে পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু করবে।

[ঐ, পৃঃ ১৩৮]

পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইয়ুম খান ২৮শে আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন যে, পাকিস্তান ভারতের ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণবাদী নীতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ক'রে দিতে বদ্ধপরিকর। জমিয়তুল উলেমায়ে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মওলানা মুফতি মাহমুদ ২৯শে আগস্ট লাহোরে এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের পক্ষে তাঁর নিজের স্বার্থেই এখন ভারতকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন।

কাইয়ুম খান ও মুফতি মাহমুদ

[পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৮-৩৯]

৭ই নভেম্বর করাচীর 'ডন' পত্রিকার এক সংবাদে পি. ডি. পি'র সভাপতি জনাব নূরুল আমীনের বরাতে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের ও অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাজাকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। তাদেরকে আরো অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হবে। প্রেসিডেন্টের সাথে ৯০ মিনিটব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর জনাব নূরুল আমীন সাংবাদিকদের বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট তাঁর সাথে একমত হয়েছেন যে, রাজাকাররা খুব ভালো কাজ করছে, তাদের কার্যকলাপ প্রশংসনীয়।

নূরুল আমীন ও অধ্যাপক গোলাম আযম

২৮শে নভেম্বর 'পাকিস্তান টাইম্‌স'-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জামাতে ইসলামের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম দেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তিনটি প্রস্তাব দেন—ভারতকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আক্রমণ করা, পূর্ব পাকিস্তানে দেশপ্রেমিকদের যথাযথভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা এবং সে প্রদেশের দেশপ্রেমিকদের ওপর আস্থা রাখা।

[ঐ, পৃঃ ১৪০-৪১]

একাত্তরের ২৩শে সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তান টাইম্‌স'-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ভারতের আক্রমণকে নস্যাৎ করার ব্যাপারে পিপলস্ পার্টির সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন। অন্যপক্ষে পাকিস্তানের

ভূ-খণ্ডে বসবাস করেও ফ্যাসিস্ট সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করার সৎসাহস যিনি প্রকাশ করেন তিনি খোদাই খিদ্‌মৎগার নেতা ও সীমান্ত-গান্ধী খান আবদুল গাফ্‌ফার খান। তিনি বাংলাদেশে গণহত্যার তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এই বছরের ২২শে মে এক বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে বাংলাদেশে পাঞ্জাবী সেনাবাহিনীর গণহত্যা বন্ধ করার দাবী জানান। জনাব খান বলেন যে, বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলছে তা' আসলে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য নয়, বরং পাঞ্জাবী স্বার্থ রক্ষার জন্যই চালানো হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেন যে, পাঞ্জাবের কয়েকজন সমরনায়ক ও পুঁজিপতির স্বার্থে এ যুদ্ধ চালানো হচ্ছে। বাঙালী জনগণের একমাত্র অপরাধ তারা বিগত নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল এবং গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার দাবী করেছিল। বাঙালীরা পাকিস্তান ধ্বংসের জন্য দায়ী নয়; এ জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে, তাঁরা হলেন ভুট্টো, কাইয়ুম ও পাঞ্জাবী চক্র। পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা ক'রে খান সাহেব বলেন যে, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে যখন মুসলিম লীগ সরকার গঠন হ'তে পারে নি, তখন বাংলাদেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগ সরকার। বাংলাদেশের মুসলমানরা সেদিন পাকিস্তানের দাবী সমর্থন না করলে, পাকিস্তানের জন্মই হ'ত না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, আজ সেই বাঙালীদের বিরুদ্ধেই তোলা হয়েছে পাকিস্তান ভঙ্গের অভিযোগ। তিনি আরো দুঃখ করেন যে, বাঙালী মুসলমানরা মনেপ্রাণে মুসলমান, আজ তাদেরই বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, তারা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়।

ভুট্টো ও খান আবদুল গাফ্‌ফার খান

আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী পাকিস্তানের সংহতির পরিপন্থী বলে স্বার্থবাদী মহল যে বাজে অজুহাত খাড়া করেছে তার জবাবে জনাব খান বলেন, ছয়-দফা যদি পাকিস্তানের সংহতির পরিপন্থী হয়ে থাকে, তা' হ'লে পূর্বাহ্ণে তা' নিষিদ্ধ করা হ'ল না কেন? অথবা আওয়ামী লীগকে ছয়-দফা ভিত্তিতে নির্বাচনে অবতীর্ণ হ'তে দেয়া হ'ল কেন? তিনি আরো জিজ্ঞাসা করেন, ছয়-দফা যদি পাকিস্তানের সংহতির পরিপন্থী হয়ে থাকে, তা' হ'লে ছয়-দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়লাভের পর শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইয়াহিয়া

খান অভিহিত করেছিলেন কেন? অথবা ছয়-দফা যদি পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী বা শেখ মুজিব যদি দেশদ্রোহী হয়ে থাকেন, তা' হ'লে ইয়াহিয়া খান নির্বাচনে জয়লাভের পর শেখ মুজিব ও তাঁর দলকে অভিনন্দনই বা জানিয়েছিলেন কেন? এ প্রসঙ্গে খান আবদুল গাফ্ফার খান বলেন যে, জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগুরু হয়েও বাংলাদেশের যদি এ অবস্থা হয়ে থাকে, তা' হ'লে সিন্ধু, সীমান্তের মত সংখ্যালঘুদের ভাগ্যে যে কি ঘটতে পারে তা' সহজেই অনুমেয়। সীমান্ত-গান্ধী জানান যে, বাংলাদেশে যা ঘটছে সে ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে তিনি রাজী আছেন বলে ইয়াহিয়া খানকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সে প্রস্তাবে সাড়া দেন নি। সেজন্যেই বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে বলে তিনি জানান। তিনি একথাও বলেন যে, তিনি তাঁর প্রস্তাবে অটল রয়েছেন এবং পাকিস্তান সরকার সম্মত থাকলে তিনি পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে বাংলাদেশে যেতে রাজী আছেন। বাংলাদেশের মানুষ এ-ব্যাপারে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে বলে তাঁর বিশ্বাস। উপসংহারে সীমান্ত-গান্ধী বলেন, বাংলাদেশে যা কিছু ঘটছে তা' পাঞ্জাবের সেনাবাহিনী ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে ও নির্দেশেই ঘটছে। এই সাথে বর্ষীয়ান নেতা ভুট্টোর যথার্থ পরিবর্তনশীল ও বিপরীতমুখী চরিত্রের বিশ্লেষণ করেন। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তান একটি অনিষ্টকারী শিশু। তাকে একটা চড় না মারা পর্যন্ত সে ঠিক হবে না। বিশ্বরাষ্ট্রসমূহ এ-ব্যাপারটাকে একটা তামাসা ভেবে মজা দেখছেন। নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাদের কোন সহানুভূতি নেই। তিনি আরো বলেন, এ পৃথিবীটা পাপী আর স্বার্থান্বেষীতে ভরা। কিন্তু নিপীড়িত মানুষের জয় সুনিশ্চিত।

[অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৮-৯, ২১৯-২০, ২২২]

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন এয়ার কমোডোর কে. জাঞ্জুয়া লণ্ডনে একটি বিবৃতিতে বলেন যে, ভারতের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ যুদ্ধ করার ব্যাপারে ইয়াহিয়া জান্তার দু'টো উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ, এর ফলে বাংলাদেশ সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক রূপ নেবে এবং সামরিক জান্তা বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছে ও মুক্তিবাহিনীর হাতে যে বিপুল

সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য হতাহত হয়েছে তা' চাপা দেয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ, তদ্দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও দমন করা যাবে।

[প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৭-৮৮]

৬ই অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতা জনাব মাহমুদ আলী এক ভাষণে ভারত-সীমান্তে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে বলে হুমকী প্রদান করেন।

৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের আক্রমণের জবাবে ভারত পাল্টা আক্রমণ করলে জুলফিকার আলী ভুট্টো সদলবলে জাতিসংঘের বৈঠকে গমন করেন। যখন তাঁর চীৎকারে বিশেষ কোন ফল হ'ল না, তখন তিনি কাগজপত্র ছিঁড়ে একটি হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা ক'রে জাতিসংঘের বৈঠক ত্যাগ করেন।

পাকিস্তানের বহু কান্নাকাটি, বহু চীৎকার এবং অপপ্রচার সত্ত্বেও বিশ্ব-বিবেক বাংলাদেশের পক্ষেই সহানুভূতি জানিয়েছে। জাতিসংঘের অধিক-সংখ্যক রাষ্ট্রের ভোট সত্ত্বেও ভারত যুদ্ধ বন্ধ করে নি। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর বাংলাদেশ শত্রু-কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে। অতঃপর ভারত যুদ্ধ বন্ধ করেছে—বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে।

।। বাংলাদেশ ঃ বৃহৎ শক্তিবর্গের কার্যকলাপ ।।

বাংলাদেশ সমস্যার মূল কারণ কি এবং কি ভাবে এই সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান করা যেতে পারে, এই ব্যাপারে প্রথম দিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোন সুস্পষ্ট মতামত ছিল না।

কোন কোন দেশ এই সমস্যাকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে তাদের দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছে। আবার কোন কোন দেশ বাংলা-দেশের জনগনের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু এই রাজনৈতিক সমাধানের কাঠামো যে কি রকম হবে, এ-ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মতদ্বৈধতা ছিল। জাতিসংঘের সনদে মানবাধিকার ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু স্বৈরাচারী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রাম

জাতিসংঘ উপেক্ষিত হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট (ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী) আদম মালিক বাংলাদেশ পরিস্থিতিকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের অজুহাতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আলোচনার অযোগ্য ব'লে ঘোষণা করেন।

['দি হিন্দুস্তান স্টাণ্ডার্ড', ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

অন্যদিকে পূর্ব বাংলার সমস্যা যে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, এ-ব্যাপারে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন মতৈক্যে পৌঁছেছিল। ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ভারত-সোভিয়েট যৌথ বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে উল্লেখ করা হয়।

অকটোবর মাসের শেষের দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আমেরিকা সফরে বের হন। বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দকে তিনি উপমহাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করেন। সংবাদ প্রতিষ্ঠানের খবর অনুযায়ী বেলজিয়াম ভারতের সাথে একমত ছিল যে, বাংলাদেশের সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান করা উচিত, যাতে শরণার্থীরা নিরাপদে তাদের দেশে ফিরে যেতে পারে।

['দি স্টেটস্‌ম্যান', কলিকাতা, ২৬শে অকটোবর, ১৯৭১]

ব্রিটেন পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে এক রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে ছিল। [ঐ, ১লা নভেম্বর ১৯৭১] ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিঃ জর্জেস পম্পিডু পূর্ব বাংলা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। [ঐ, ৯ই নভেম্বর, ১৯৭১] পশ্চিম জার্মানীও রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে ছিল। বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তি আমেরিকা ও চীন পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে শুধু যে সমর্থন জানিয়েছিল তা' নয়, অস্ত্র দিয়ে ঐ গণহত্যার মদদ জুগিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন শেষলগ্নে, পাক-ভারত-বাংলাদেশ

ভারতীয় ভূমিকা

যুদ্ধ যখন সমাপ্ত প্রায়, সেই সময় ১৫ই ডিসেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ নিক্সনের কাছে প্রেরিত এক পত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি বিশ্বের নেতৃবৃন্দ উপমহাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি

উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন এবং বাংলাদেশের জনগণের জাগরণের কারণ খুঁজে বের করার প্রয়াস পেতেন তা' হ'লে দুঃখজনক পাক-ভারত যুদ্ধ এড়ানো যেত।

[পবোক্ত, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১]

নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে বাংলাদেশ সমস্যার প্রতি ঐ সমস্ত দেশের মনোভাব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।

রাশিয়ার ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২রা এপ্রিল রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট নিকোলাই পদগর্নী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে বলেন যে, ঢাকাতে রাজনৈতিক আলোচনা ভেঙে গেছে এবং সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই ঘটনাবলীতে সোভিয়েট ইউনিয়ন খুবই উদ্বিগ্ন। সাধারণ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য রাজনীতিবিদের গ্রেফতারের খবরে সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ খুবই মর্মাহত। সোভিয়েট ইউনিয়ন সব সময় পাকিস্তানের সুখ ও সমৃদ্ধি চায়। পাকিস্তান আজ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তা' কেবল রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা যায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা ও রক্তপাত সমস্যাকে আরো জটিল ক'রে তুলবে, যা পাকিস্তানের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি করবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে দমননীতি ও রক্তপাত বন্ধ ক'রে সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের জন্য যেন জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় মানবিক নীতি-সমূহে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন এই আবেদন জানাচ্ছে।

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১০-১১]

১০ই জুন সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'প্রাভদা'-তে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ কসিগিন বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে উত্তেজনা বিরাজ করছে, তাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন খুবই উদ্বিগ্ন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে

লক্ষ লক্ষ লোক তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। তারা সেখানে নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছে।

যাঁরা মানবিক রীতি-নীতিসমূহে বিশ্বাস করেন, তাঁরা অবশ্যই আশা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে এমন এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক যেখানে শরণার্থীরা তাদের জীবনের নিরাপত্তা ও মান-সম্মানের নিশ্চয়তা পাবে। আমরা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এ-ব্যাপারে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এবং এই উপ-মহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সমস্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া উচিত বলে সোভিয়েট ইউনিয়ন মনে করে।

[পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১২]

পশ্চিম জার্মানীর ভূমিকা

২৩শে জুলাই পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর উইলী ব্রান্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং-এর সাথে আলাপ-আলোচনার পর তিনি পূর্ব বাংলা সমস্যা সম্বন্ধে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেলের সাথে আলাপ করেছেন। এই আলোচনার ফলাফল এবং তাঁর নিজস্ব মত তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথেও তিনি যোগাযোগ করেছেন ও চিঠি লিখছেন। তিনি এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

[ঐ, পৃঃ ৫১৫]

১৭ই জুন যুগোস্লাভিয়ার একজন সরকারী মুখপাত্র এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, যুগোস্লাভ সরকার ও জনগণ লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর দুঃখ-দুর্দশা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে। পাকিস্তানের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এই সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান যুগোস্লাভ সরকারের একান্ত কাম্য।

[ঐ, পৃঃ ৫১৯-২০]

১লা এপ্রিল আমেরিকার সিনেটে এক ভাষণে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে নির্বিচারে রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র

ও নিরীহ জনগণকে হত্যা করার খবর পাওয়া গেছে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। আমেরিকা যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানকে দিয়েছে, সেগুলো দিয়ে জনগণের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন যে, আকেরিকান সরকারের এই হত্যাকাণ্ডকে নিন্দা করা কি উচিত নয়? তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আমেরিকান সরকার এ-ব্যাপারে সক্রিয় মানবতাবাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সিনেটব এডওয়ার্ড কেনেডীব ভূমিকা

[পূর্বোক্ত পৃঃ, ৫২০-৫২১]

এমন কি যে ইসরাইল আগ্রাসন নীতির মাধ্যমে ও সাম্রাজ্যবাদ শক্তির সমর্থনে মধ্যপ্রাচ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে ও জোরপূর্বক অন্য-দেশ দখল ক'রে রেখেছে, সেই ইসরাইলও চুপ ক'রে থাকে নি। ২৩শে জুন পার্লামেন্টে এক বিবৃতিতে ইসরা-ইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবা ইবান পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কার্যকলাপে ইসরাইল যে খুবই মর্মাহত একথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বেসামরিক লোকদের হত্যা করছে, মেয়েদের ধর্ষণ করছে, বৃদ্ধ এবং শিশুদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে—লক্ষ লক্ষ লোক অসহায় অবস্থায় ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। ভারত তার সীমিত সম্পদ দিয়ে শরণার্থীদের দেখাশুনা করছে। সমগ্র বিশ্বের এখন এই সব শরণার্থীর সাহায্যে এগিয়ে আসা উচিত।

ইসরাইলের ভূমিকা

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, ২য় খণ্ড, ১৫৪-৫৫]

১৫ই আগস্ট ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং-এর ইন্দো-নেশিয়া সফর শেষে প্রকাশিত দুই দেশের এক যুক্ত ইশ্‌তেহারে বলা হয় যে, দু'দেশই শরণার্থী সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে। দু'দেশই মনে করে যে, শরণার্থীদের তাদের নিজের দেশে ফিরে যাবার মত একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়।

[ঐ, পৃঃ ১৫৮]

৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ভারত-নেপাল এক যুক্ত ইশ্‌তেহারে বলা হয় যে, দু'দেশই আশা করে যে, শরণার্থীরা যেন তাদের দেশে অতি সত্বর

ফিরে যেতে পারে এবং সেজন্য সেখানে স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার।

১৪ই সেপ্টেম্বর মস্কোতে আফগানিস্তানের রাজার সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় এক ভাষণে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিঃ পদগর্নী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার একটা ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক সমাধানের ওপর দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি বহুলাংশে নির্ভর করছে। ভারত-সোভিয়েট বন্ধুত্বমূলক ও সহযোগিতামূলক চুক্তির কথা উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন যে, এই চুক্তি কোন দেশের বিরুদ্ধে করা হয় নি। এশিয়া তথা সারা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আফগানরাজ এই বক্তব্য সমর্থন করেন।

[পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১]

২৯শে সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর শেষে প্রকাশিত এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয় যে, দু'দেশ বাংলাদেশের ঘটনাবলী থেকে উদ্ভূত ভারতীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

১৮ই অক্টোবর হাউস অব কমন্স -এ এক ভাষণে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে একটা রাজনৈতিক সমাধানের দায়িত্ব পাকিস্তান সরকারের ওপর। সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট ও প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানের আবেদনে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ সরকার শরণার্থীদের জন্য সাহায্য পাঠাচ্ছে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

২০শে অক্টোবর যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর ভারত সফর শেষে প্রকাশিত এক যুক্ত ইশ্‌তেহারে ঘোষণা করা হয় যে, দু'দেশই মতৈক্যে পৌঁছেছে যে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধানই এ এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। দু'দেশ এ-ব্যাপারে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায়। জনগণের ইচ্ছাকে পদদলিত করা হ'লে পরিস্থিতি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করবে বলে দু'দেশ বিশ্বাস করে। প্রেসিডেন্ট টিটো উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা' প্রতিষ্ঠার

জন্য শেখ মুজিবের মুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শেখ মজিবের শর্তহীন মুক্তির কথা পুনরায় উল্লেখ করেন।

[পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৬]

২৭শে অকটোবর অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ব্রুনো ক্রিসকি (Bruno Kriesky) এক বিবৃতিতে বলেন যে, বাংলাদেশ সঙ্কটের ওপর তাঁর নিজস্ব মতামত তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে জানাবেন। তিনি আরো বলেন যে, ভারতে আগত শরণার্থীদের তাদের নিজেদের দেশে নিরাপদে ফিরে যাবার নিশ্চয়তা থাকা উচিত। তিনি স্বীকার করেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে তিনি যে জবাব পেয়েছেন, তাতে সমস্যাকে ভ্রান্তিমূলকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

৩রা নভেম্বর ওয়াশিংটন প্রেসক্লাবে এক বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমোহন (Mac Mohon) বলেন যে, শীঘ্রই পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের পক্ষে সমগ্র পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

৪ঠা নভেম্বর হাউস অব কমন্‌স-এ এক ভাষণে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম পুনরায় বাংলাদেশ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটা রাজনৈতিক সমাধান তিনি কামনা করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে একজন বেসামরিক গভর্নর নিযুক্ত করেছেন, উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেছেন এবং সাধারণ ক্ষমাও ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও শরণার্থীদের মনে আস্থা ফিরে আসবে বলে মনে হচ্ছে না।

১৯শে নভেম্বর জাতিসংঘের তৃতীয় কমিটিতে এক ভাষণে চীনের প্রতিনিধি মিঃ ফুহাও যে সব উক্তি করেন তা' প্রমাণ করে যে, বিশ্বের নিষ্ঠুরতম গণহত্যায় মানবতার ধ্বজাধারী চীনের কোন উদ্বেগ নেই। বরঞ্চ এই গণহত্যায় তাদের সক্রিয় সাহায্য রয়েছে। তিনি গলা ফুলিয়ে বলেন যে, চীনদেশের সরকার ও জনগণ সব সময় বিশ্বাস করে যে, কোন দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সে দেশের জনগণই সমাধান করবে।

তথাকথিত শরণার্থী প্রশ্ন পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং পাকিস্তানই তা' সমাধান করবে। কোন কোন দেশ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাতে উপমহাদেশে বর্তমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ-সঙ্কট নিরসনের জন্য প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশের জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার জন্য তাঁদের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

১লা এপ্রিল মার্কিন সিনেটর হ্যারিস সিনেটে এক ভাষণে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখজনক ঘটনাবলী বিশ্ববাসী জেনে ফেলবে এই ভয়ে পাকিস্তান বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার করেছে। সাংবাদিকদের বহিষ্কার এটাই প্রমাণ করে যে, পূর্ব বাংলায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা চলছে। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে বিশ্বের এগিয়ে আসা উচিত। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের আশু কর্তব্য হ'ল, পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধ ক'রে দেয়া। ৪ঠা এপ্রিল ব্রিটেনের হাউস অব লর্ডসের সদস্য মিঃ লর্ড ফেনার ব্রক ওয়াজ এক জনসমাবেশে অবিলম্বে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড বন্ধের দাবী জানান। এ ছাড়াও তিনি সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি, পূর্ব বাংলা থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং গণপরিষদের বৈঠক আহ্বানের দাবী জানান।

১৮ই এপ্রিল 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স' পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মিঃ চেস্টার বার্ডল্‌স বলেন যে, আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্রে সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ-নিরস্ত্র জনগণের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের লোকজনকেও পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না এবং বিদেশী সাংবাদিকদের সেখান থেকে বের ক'রে দেয়া হয়েছে। আমেরিকার কনস্যুলেট জেনারেল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপের কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এখনও আমেরিকান সরকার বলছেন যে, পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁরা কিছু জানেন না। এই সংঘর্ষ বন্ধ করতে বিশ্বজনমত গঠন করার

ব্যাপারে আমেরিকার নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত। আমেরিকা কর্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্রের অপব্যবহার সম্বন্ধেও পাকিস্তানকে অবিলম্বে সতর্ক ক'রে দেয়া আমেরিকার কর্তব্য।

['নিউইয়র্ক টাইম্‌স', ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭১]

২৭শে এপ্রিল বি. বি. সি'র সাথে এক সাক্ষাৎকারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য জন স্টোনহাউস বলেন যে, পূর্ব বাংলায় যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে, তার সাথে তুলনা করলে ভিয়েতনামের ঘটনাবলীকে "টি-পার্টি" বলে মনে হয়। ২৫শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন স্টাফ ও ছাত্রকে অত্যন্ত সুস্থ মস্তিষ্কে হত্যা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলকে বানচাল করার জন্য সামরিক জান্তা কঠোর দমননীতি গ্রহণ করেছে। ব্রিটেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এই ব্যাপারে উদাসীন থাকা উচিত নয়।

১১ই জুলাই 'দি সান্‌ডে টাইম্‌স'-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দলের সদস্য মিঃ রেগন্যাল্ড প্রেনটিস বলেন যে, শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা রাজনৈতিক সমাধান পূর্ব বাংলার বর্তমান সঙ্কট নিরসনের একমাত্র উপায়। ইয়াহিয়া খানকে এ কথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে।

['দি সানডে টাইম্‌স', ১১ই জুলাই, ১৯৭১]

১৫ই সেপ্টেম্বর কলকাতার 'দি স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক এবং এককালীন ভারতবর্ষে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত জে. কে. গলব্রেথ বলেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকারকে স্বীকার ক'রে নিয়ে একটা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের মধ্যেই রয়েছে সকল উত্তেজনার নিরসন এবং বিবাদের মীমাংসা। জনগণের অধিকার বলতে বুঝায়, তারা নিজেরা নিজেদেরকে শাসন করবে এবং নিজেদের সরকার গঠন করবে। বাংলাদেশের জনগণ তাদের ভাগ্য, জীবন-ব্যবস্থা ও রাজনীতির সম্পূর্ণ নিয়ন্তা হবে। এই সহজ সত্যকে আজ বিশ্ববাসীর এবং বিশেষ ক'রে আমেরিকাবাসীর স্বীকার করতে হবে।

['দি স্টেট্‌সম্যান', কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

১৮ই মে মার্কিন সিনেটর মিঃ চার্চ সিনেটে এক ভাষণে বলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক, অধ্যাপক, নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ, সরকারী কর্মচারী, ডাক্তার, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, নারী ও শিশুকে হত্যা করছে। উপমহাদেশে বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আমেরিকার উচিত অবিলম্বে পাকিস্তানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ ক'রে দেয়া।

১৮ই জুন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী পুনরায় সিনেটে এক ভাষণে বলেন যে, আমেরিকা কর্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তান সামরিক জান্তা পূর্ব বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। কিন্তু আমেরিকান সরকার এই ব্যাপারে নিশ্চুপ এবং উদাসীন রয়েছেন। তিনি আরো বলেন যে, সামরিক বাহিনীকে সংযত করা না হ'লে শরণার্থীদের ভীড় আরো বেড়ে যাবে। এই ব্যাপারে নীরব থেকে আমেরিকান সরকার ও প্রেসিডেন্ট নিক্সন বিবেকহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

২৯শে জুলাই কানাডিয়ান পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ এক বিবৃতিতে পূর্ব বাংলার সমস্যা সমাধানের নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন ঃ

১। কানাডার সরকার ও জনগণের শরণার্থীদের জন্য আরো বেশী সাহায্য দেয়া উচিত।

২। কানাডার সরকারের অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় এই প্রশ্নকে জাতিসংঘে আনা উচিত।

৩। পাকিস্তান সরকার এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাজনৈতিক সমাধান করা উচিত।

২৮শে জুলাই সিনেটর ফুলব্রাইট সিনেটে এক বিবৃতিতে বলেন যে, আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়েছিল কম্যুনিজমকে প্রতিহত করার জন্য। কিন্তু এই অস্ত্র বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন আবার পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ক্ষীণ প্রচেষ্টাকে ঐ অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। আমেরিকা পাকিস্তানকে যে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে, পাকিস্তান সেই অর্থনৈতিক সাহায্যের অপব্যবহার করেছে এবং

অধিকাংশ অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করেছে। পাকিস্তান সরকার নির্বিচারে সামরিক অভিযান চালিয়ে পূর্ব বাংলায় হিন্দু, বুদ্ধিজীবী ও বাঙালী নেতাদের হত্যা করেছে। হাজার হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু এখানো আমেরিকা পাকিস্তানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্কসহ অন্যান্য সাহায্য প্রদানকারী দেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও আমেরিকা পাকিস্তানকে সমর্থন করছে। যুক্তরাষ্ট্র যে নীতিতে বিশ্বাস করে সেই সমস্ত নীতির বরখেলাপ ক'রে পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সমর্থন ক'রে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের উচিত যে পর্যন্ত না পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একটা সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হয়, সে পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোনরূপ অস্ত্র বা অর্থ দিয়ে সাহায্য না করা। তিনি আরো বলেন, যদি নিক্সন-প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তা' হ'লে তিনি কংগ্রেসের সাহায্য নিতে বাধ্য হবেন।

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪০-৪২]

২৬শে আগস্ট ওয়াশিংটন প্রেসক্লাবে এক ভাষণে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী পুনরায় বাংলাদেশের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন যে, গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পর পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে চলে এসেছে। হাজার হাজার লোক সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক ভয়ভীতি, রোগ ও অনাহারের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব এই দুঃখজনক ঘটনা এখনো বুঝতে পারে নি। কি কি কারণে এই ব্যাপক দুর্দশার উৎপত্তি হয়েছে, তা' আমেরিকার জনগণের উপলব্ধি করা উচিত। অতঃপর তিনি সমস্ত ঘটনার একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, আমেরিকান সরকার পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সামরিক জান্তাকে সমর্থন দিচ্ছে। আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র এই হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংসলীলায় ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এখনো সামরিক সাহায্য অব্যাহত রয়েছে। মানবতার খাতিরে আমেরিকা ও জাতিসঙ্ঘের উচিত, শরণার্থীদের সাহায্য করা। কিন্তু এ-ব্যাপারে তাদের সাড়া নিতান্তই নগণ্য। অবিলম্বে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য প্রেরণ বন্ধ করা আমেরিকার এখন নৈতিক দায়িত্ব।

১৩ই এপ্রিল যুগোশ্লাভ লীগ এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থন করেন। লীগের মতে, বাংলাদেশে নরহত্যা একটি বাস্তব ঘটনা এবং এর নিরসন একান্ত কাম্য। যুগোশ্লাভ লীগের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, এই লীগ পূর্ব বাংলার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে সমর্থন করে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমস্যার সমাধানের জন্য সামরিক শক্তি যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, লীগের মতে তা' বিশ্বশান্তির প্রতি মারাত্মক হুমকি স্বরূপ।

২২শে এপ্রিল রয়টার পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, একদল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ এক বিবৃতিতে বলেন যে, ২৫শে ও ২৬শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক, তাঁদের পরিবার ও অনেক ছাত্রকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। এই কমিটির মধ্যে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, জাপান, নেদারল্যাণ্ড, সুইডেন এবং ব্রিটেনের অধ্যাপকরা ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ছিলেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন যে, যদিও তাঁদের দেশের সরকার এ-ব্যাপারে কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিচ্ছেন না, তবুও সারা বিশ্বের মানুষ এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করছে। তাঁদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অতর্কিত আক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়া।

১০ই মে বিশ্বশান্তি পরিষদ উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের ওপর এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণের ওপর যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে বা চালাচ্ছে, তা' সমকালীন বিশ্বের এক ভয়াবহ দুঃখজনক ঘটনা। পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অন্যায়, অবিচার, অর্থনৈতিক শোষণ, সামরিক একনায়কত্ব এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে আসছে। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এই রক্তপাত বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

বিশ্ব-শান্তি পরিষদের ভূমিকা

২৭শে মে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে পাকিস্তানের দুঃখজনক ঘটনাবলীতে গভীর

উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য রাজবন্দীর জীবনের জন্য আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল তার সদস্য রাষ্ট্রদের কাছে পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে আবেদন জানায়। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর, সুইডেন, নরওয়ে ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীরা, পশ্চিম ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রীরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সম্মেলন

২৩-২৪ শে জুন দামেস্কে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়ান গণ-সংহতি সংস্থার সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, সাম্রাজ্যবাদের ও শোষণের বিরুদ্ধে আফ্রো-এশিয়ান জনগণের সংগ্রামের ওপর এই সংস্থা গুরুত্ব আরোপ করে। তৃতীয় বিশ্বের জনগণের ওপর উপনিবেশবাদ নব্য-উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বিরুদ্ধে এই সংস্থা তীব্র নিন্দা জানায়।

১৪ই এপ্রিল আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশন জেনেভা থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন যে, জুরিস্ট কমিশন রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুন্যালে বিচারের বিরোধিতা করে। যদি শেখ মুজিবুর রহমান অথবা অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা পাকিস্তানের আইনের আওতায় কোন অপরাধ ক'রে থাকেন, তা' হ'লে তাঁদেরকে বেসামরিক আদালতের সামনে হাজির করা উচিত।

আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশন

১৯-২১শে আগস্ট কানাডার টরেন্টোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা উচিত। ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের ওপর জোর দেয়া হয়। ঘোষণায় বিভিন্ন দেশের কাছে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধ ক'রে দেয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। এই সম্মেলনে ৩০ জন পণ্ডিত, সম্পাদক, পার্লামেন্টারিয়ান এবং প্রাক্তন কূটনীতিবিদ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি এম. আর. সিদ্দিকী

টরেন্টোতে বিশ্ব সম্মেলন

এবং ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম. এ. মুহিত এখানে উপস্থিত ছিলেন।

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭-৭৯]

১১ই সেপ্টেম্বর ব্যুরো অব সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল লণ্ডন থেকে এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক নির্যাতন বন্ধের আবেদন জানান। সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অবিলম্বে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের শর্তহীন মুক্তি দাবী করেন। যে পর্যন্ত না সমস্যার একটা সন্তোষজনক রাজনৈতিক সমাধান হচ্ছে, সে পর্যন্ত সাহায্যদানকারী কনসর্টিয়াম-এর নিকট পাকিস্তানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধের আবেদন জানানো হয়।

[ঐ, পৃঃ ১৮১]

১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিশ্ব সম্মেলনের এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। প্রস্তাবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক মীমাংসার ওপর জোর দেয়া হয়। আর এক প্রস্তাবে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে আবেদন জানানো হয়।

[ঐ, পৃঃ ১৮৪-৮৫]

১২ই নভেম্বর আমেরিকান একাডেমিক কমিউনিটি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে এক আবেদনে বলেন, যে পযন্ত না পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের সাথে একটা রাজনৈতিক সমাধান হচ্ছে, সে পর্যন্ত পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ ক'রে দেয়া দরকার।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে বর্বর সেনাবাহিনীর অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য পাকিস্তান সামরিক জান্তা সমস্ত বিদেশী সাংবাদিককে পূর্ব বাংলা থেকে বহিষ্কার ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। সমস্ত বিশ্বের সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষ সামরিক বাহিনীর জঘন্য

কার্যকলাপের কথা জানতে পারে। এই সমস্ত সংবাদপত্রের তালিকা এত বড় যে, তার উল্লেখ থেকে এখানে বিরত থাকা ছাড়া গত্যন্তর দেখছি না। বস্তুতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পশ্চাতে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকার চেয়ে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনেক মানবতামুখী, আর তাই সাংবাদিকদের নিকট আমরা সত্যি নানাভাবে ঋণী। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশের যৌথ কম্যাণ্ডের প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হ'লে সারা বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সংবাদ-সংস্থা এ-খবর ফলাও ক'রে প্রকাশ করতে থাকেন।

পাক-ভারত যুদ্ধঃ বিশ্ব-প্রতিক্রিয়া

১৯৭১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর 'দি ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকায় এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র মিঃ চার্লস ব্রে বলেন যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় অনুপ্রবেশের ফলে আমেরিকা ভারতে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ ক'রে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৫ই ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত 'দি সান বাল্টিমোর' পত্রিকায় এক বিবৃতিতে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী মুখপাত্র ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবার জন্য ভারতের তীব্র নিন্দা ক'রে বলেন যে, সঙ্কট শুরু হবার প্রথম থেকেই ভারতীয় নীতির ফলেই সঙ্কট আরো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সীমান্তে সংঘর্ষ শুরু করার জন্য ভারতই অধিকাংশে দায়ী।

['দি সান বাল্টিমোর', ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১]

ঐ দিনই অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ নিগেল এইচ. বোয়েন 'দি ক্যানবেরা টাইম্‌স'-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ভাবত-পাকিস্তান সংঘর্ষে অস্ট্রেলিয়ার নিরপেক্ষ ভূমিকার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সঙ্কটের গোড়া থেকেই অস্ট্রেলিয়া উত্তেজনা প্রশমন ও রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে আসছে। অস্ট্রেলিয়া যুদ্ধরত কোন দেশকেই অস্ত্র সরবরাহ করবে না বলে তিনি ঘোষণা করেন। ['দি ক্যানবেরা টাইম্‌স', সিডনী, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১]

৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত 'আ.ল্ আইয়্যাম' পত্রিকায় এক বিরতিতেও সুদানের পররাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে ভারত ও পাকিস্তানকে সৈন্য প্রত্যাহার এবং যুদ্ধবিরতি কার্যকরী করার আবেদন জানান হয়। উক্ত বিবৃতিতে বলা হয়

যে, সুদান পাকিস্তানের একতা এবং সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করেন। সুদান মনে করেন যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ও জনগণের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তা' পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

['আল আইয়্যাম', খার্তুম, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১]

৬ই ডিসেম্বর ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম হাউস অব কমন্‌স-এ এক ভাষণে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তাঁর সরকারের গভীর উদ্বেগের কথা জানান। তিনি বলেন যে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ৪ঠা ও ৫ই ডিসেম্বর বৈঠকে মিলিত হয়েছে। কিন্তু গোড়া থেকেই এটা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের যে-কোন প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেটো প্রয়োগ করবে। ব্রিটেন এই সমস্ত অসুবিধা মোকাবেলা করার এবং যুদ্ধের অন্তর্নিহিত কারণের সমাধান খুঁজে দেখার চেষ্টা চালাচ্ছে।

['দি টাইম্‌স', লণ্ডন, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১]

৭ই ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো এক বিবৃতিতে বলেন যে, যদি ভারত ও পাকিস্তান দুই যুদ্ধরত দেশ অনুরোধ করে, তা' হ'লে ইন্দোনেশিয়া এই সংঘর্ষে মধ্যস্থতা করতে রাজী আছে।

['দি জাকার্তা টাইম্‌স', ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১]

ঐ দিন ওয়ারশতে পোল্যাণ্ডের কম্যুনিস্ট পার্টি'র ৬ষ্ঠ কংগ্রেসে ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তানের উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে এক ভাষণে মিঃ লিউনিদ ব্রেজনেভ আশা প্রকাশ ক'রে বলেন যে, বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে বলে সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশ্বাস করে। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টাতেই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে।

['দি টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া', নিউ দিল্লী, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১]

৮ই ডিসেম্বর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুর রাজ্জাক ভারত ও পাকিস্তানের কাছে মানবিক কারণে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার আবেদন জানান।

৯ই ডিসেম্বর চীনের অস্থায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ চি পেং ফি এক ভাষণে বলেন যে, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ শুরু করেছে এবং

'তথাকথিত' বাংলাদেশকে 'তথাকথিত' স্বীকৃতি দিয়েছে। এই কাজে ভারত সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য লাভ করেছে। চীনের সরকার ও জনগণ ভারতের এই সম্প্রসারণবাদী নীতির এবং সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতার রাজনীতি ও স্বৈরাচারী নীতির তীব্র নিন্দা করছে। ভারতকে অবশ্যই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ করতে হবে এবং শর্তহীনভাবে পাকিস্তানের ভূমি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার ক'রে নিতে হবে। প্রতি-আক্রমণের জন্য যে সমস্ত সৈন্য ভারতে প্রবেশ করেছে পাকিস্তান সে সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করবে বলে চীন বিশ্বাস করে।

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮]

১০ই ডিসেম্বর সোভিয়েটের 'ইজভেস্তিয়া'-তে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয় যে, পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে মৌলিক অধিকার-সমূহ থেকে বঞ্চিত করার জন্যে চরম দমননীতি গ্রহণ করেছে। তারা সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। এই সমস্ত ঘটনা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের জন্য দায়ী।

['ইজভেস্তিয়া', ইউ. এস. এস. আর., ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭১]

১২ই ডিসেম্বর 'দি নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকার প্রতিনিধি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার শরণ সিং-এর এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

পাক-ভারত যুদ্ধে জাতিসংঘের তৎপরতা

সাক্ষাৎকারে শরণ সিং বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কোন ভূমি দখলের লোভ ভারতের নেই। ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায় না। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন ঘিরে রাখার জন্য ভারতকে ব্যবহার করছে'—নিরাপত্তা পরিষদে চীনের প্রতি-নিধির এ অভিযোগ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হ'লে শরণ সিং বলেন যে, ভারত 'সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর নির্ভরশীল নয়। পূর্ব পাকিস্তান যদি স্বাধীন হয়, তা' হ'লে চীন হস্তক্ষেপ করবে কি না, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তাঁরা চীনের হস্তক্ষেপের কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। কারণ এই সমস্যা হ'ল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের মধ্যে। আমেরিকার ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে বলা হ'লে শরণ সিং বলেন যে, বাংলাদেশের জনগণ ও পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ

প্রয়োগ করলে এই সঙ্কট এড়ানো যেত। পরিশেষে বাংলাদেশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হ'লে কি করা কর্তব্য,এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সেখান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রত্যাহার ক'রে নিতে হবে, যাতে করে বাংলাদেশের জনগণ নিজেরা তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার সুযোগ পায়।

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০০-৩০২]

১২ই ডিসেম্বর যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো বেলগ্রেডে এক ভাষণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমালোচনা ক'রে বলেন যে, পাক-ভারত সংঘর্ষ শুরু হবার পূর্বে ভারত যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল, তাঁরা তা' অনুধাবন করেন নি। যদি জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহ এবং অন্যান্য দেশ এই যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা না চালায়, তা' হ'লে উপমহাদেশের ঘটনাবলী মারাত্মক পরিণতি লাভ করবে।

['Reuter Despatch, datelined Belgrade', ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭১]

১২ই ডিসেম্বর লিবিয়ার প্রেসিডেণ্ট কর্নেল গাদাফী বলেন যে, জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহ পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। এটা উপমহাদেশে বৃহৎ শক্তিবর্গের ঔপনিবেশিক স্বার্থকে চরিতার্থ করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

['দি হিন্দুস্থান টাইমস্', নিউদিল্লী, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১]

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সারা বিশ্বে তার বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ'লে জাতিসংঘ তৎপর হয়ে ওঠে। বিশেষ ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে এ যুদ্ধ বন্ধের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এ-বিষয়ে ১৯৭১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্র-সদস্য এক খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহ-লড়াই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকীস্বরূপ—অবিলম্বে এ যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাবে ভারত ও পাকিস্তানের নিকট আবেদন জানানো হয়। শরণার্থীরা যাতে স্বেচ্ছায় স্বদেশে ফিরে যেতে পারে, সে বিষয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য ভারত-পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, বিশ্বশান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, এ-রকম কার্য-কলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য প্রতিটি দেশের দৃষ্টি রাখা উচিত। ভারত ও পাকিস্তানকে সৈন্য প্রত্যাহার ক'রে নিজ নিজ সীমান্ত এলাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আহ্বান করা হয়। উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে জাতি-সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের মধ্যস্থতার প্রতি সাড়া দে'য়ার জন্য ভারত ও পাকিস্তানকে আবেদন জানানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে খসড়া প্রস্তাব উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রও বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ৪ঠা ডিসেম্বর বেলজিয়াম, ইটালী এবং জাপান নিরাপত্তা পরিষদে নিম্নলিখিত খসড়া প্রস্তাব আনয়ন করে। উক্ত প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের কাছে আহ্বান জানানো হয়। জাতিসঙ্ঘ সনদ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশসমূহকে শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরে যাবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জোর প্রচেষ্টা চালানোর জন্যও আহ্বান জানানো হয়।

৪ঠা ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবে তাঁরা বলেন, যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধান আশু প্রয়োজন। পূর্ব পাকি-স্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হিংস্র কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। ঐ দিনই আর্জেন্টিনা, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিওন ও সোমালিয়া নিরাপত্তা পরিষদে একটি খসড়া প্রস্তাবে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে লড়াই শুরু হওয়াতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং যুদ্ধ-বিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য ভারত ও পাকিস্তানকে আহ্বান জানান।

৫ই ডিসেম্বর আর্জেন্টিনা, বুরুণ্ডি, ইটালী, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরা-লিওন এবং সোমালিয়া নিরাপত্তা পরিষদে আরেকটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ও পূর্ব পাকিস্তানে শরণার্থীদের ফিরে যাবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

৫ই ডিসেম্বর চীন নিরাপত্তা পরিষদে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ক'রে বলা হয়, 'ভারত

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে এবং পাক-ভারত উপমহাদেশের শান্তি বিঘ্নিত করেছে।'

৬ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট ইউনিয়ন আরেকটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাবে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশ-গুলোর মধ্যে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও লড়াই বন্ধ করার আহ্বান জানান হয়। একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধান এবং সেখানকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় পাকিস্তান সরকারকে আহ্বান জানানো হয়।

৭ই ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে আলজিরিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বুরুণ্ডি, ক্যামেরুন, চাদ, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ইকুয়েডর, ঘানা, গুয়াতেমালা, হাইতি, হণ্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, ইটালী, আইভরী কোস্ট, জাপান, জর্দান, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, মরক্কো, নেদারল্যাণ্ড, নিকারাগুয়া, পানামা, প্যারাগুয়ে, সিয়েরালিওন, সোমালিয়া, স্পেন, সুদান, তিউনিসিয়া, উরুগুয়ে, ইয়েমেন, জেয়ারে এবং জাম্বিয়া পূর্ববর্ণিত খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ঐ দিনই সোভিয়েট ইউনিয়ন সাধারণ পরিষদে পূর্বোল্লিখিত নিরাপত্তা পরিষদের খসড়া প্রস্তাবের অনুরূপ আরেকটি প্রস্তাব পেশ করেন। একই দিনে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে। উক্ত প্রস্তাবে 'ভারত ও পাকিস্তানকে অতি সত্বর যুদ্ধবিরতি কার্যকর ও সৈন্য প্রত্যাহার' এবং 'শরণার্থীদের পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাবার স্বাভাবিক ও অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়'। প্রস্তাবে 'বেসামরিক জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও আবেদন জানানো হয়'।

১৪ই ডিসেম্বর পোল্যাণ্ড নিরাপত্তা পরিষদে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করেন : 'পূর্বাঞ্চলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচিত গণপ্রতি-নিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত'।

'ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পরেই সমস্ত এলাকায় সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে এবং ৭২ ঘণ্টার জন্য যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে হবে'।

যুদ্ধবিরতির প্রাথমিক পর্যায় শুরু হবার পর পরই পাকিস্তানকে তার সৈন্য প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে যেতে হবে।

'৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানী সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হবার পর পরই যুদ্ধ-বিরতি স্থায়ীভাবে কার্যকর করতে হবে। পাকিস্তানী সৈন্য অপসারণ শুরু হবার পর পরই ভারতকে পূর্বাঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করতে হবে'।

'অবশ্য এই সৈন্য অপসারণ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করেই করতে হবে'।

১৫ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স নিম্নলিখিত খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন।

প্রস্তাবে 'ভারত ও পাকিস্তানকে অবিলম্বে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার' ও 'সংশ্লিষ্ট জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের সাথে রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানানো হয়'।

'উপমহাদেশে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে পারে এইরূপ কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্যও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আবেদন জানানো হয়'।

১৬ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে বলা হয়ঃ 'স্থায়ী যুদ্ধবিরতি পালন করতে হবে। উপমহাদেশের তথা বিশ্ব-শান্তির প্রতি হুমকীস্বরূপ কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে তৎপর থাকতে হবে; এবং আহত, রুগ্ন যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক জনগণের জীবন রক্ষার্থে ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনে গৃহীত নীতিসমূহ পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা চালাতে হবে'।

অতঃপর ১৬ই ডিসেম্বর পাক-বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয় এবং ভারত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। বিশ্ব-শক্তিসমূহকে আর প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব পেশ করতে হয় না।

।। বিশেষ সামরিক আদালতে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার-প্রসঙ্গ ও বিচার-সম্পর্কিত বিশ্ব-প্রতিক্রিয়া ।।

ইয়াহিয়া খান ২৬শে মার্চ '৭১ তারিখে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করলেন যে, শেখ মুজিব একজন দেশদ্রোহী। তাঁর এ ঘোষণার পেছনে অবাস্তর যুক্তি উপস্থাপিত ক'রে তিনি বললেন, শেখ

মুজিব এবং তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু এবং তারা চায় পূর্ব পাকিস্তানকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। প্রেসিডেণ্ট আরো বলেন যে, শেখ মুজিব পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে আক্রমণ করেছেন—এই অপরাধকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দে'য়া যায় না। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করবার পেছনে ইয়াহিয়া খান অন্যতম যুক্তি দেখান এই যে, এই দল অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল এবং শেখ মুজিব দেশে একটি বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খানের আরো একটি বড় অভিযোগ ছিল যে, তিনি দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত হেনেছেন। তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সার্বিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন উপস্থাপন নিশ্চয়ই কোন অপরাধ নয় এবং বিশ্বের কোন প্রচলিত নীতিও এই কাজকে কোন অপরাধ বলে স্বীকার করে না। এটা জনগণের সাধারণ অধিকার। আর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৬২৫ নং ধারাবিবরণীতে লিপিবদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের নীতিতে এটা স্বীকৃত যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কখনই বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়।

[সুঃ রাঃ চৌঃ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬]

এই গ্রন্থে ইয়াহিয়া খানের কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ দে'য়া হয়েছে। তিনি কিভাবে ক্ষমতায় এসেছিলেন, জনগণকে কিভাবে ভাওতার মাধ্যমে আশ্বাস দিয়েছিলেন, এ সব আমাদের জানা রয়েছে। তাঁকে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন দিতে হয়েছিল ; না দিয়ে উপায় ছিল না। নির্বাচনের ফলাফল তাঁকে হতাশ করলো। দাবার ছকে ভুল হয়ে গেল। গণনায় তাঁর সাংঘাতিক গরমিল হয়ে গেল। হিসাব মিলাতে পারলেন না তিনি। তাই শুরু হ'ল ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে ভানুমতির খেল। একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর মতামতই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেতে থাকলো।

পূর্বেই বলেছি, লারকানায় পাখি শিকার করতে প্রেসিডেণ্টকে তাঁর সেনা-বাহিনী-প্রধান আবদুল হামিদ খান ও অপর জাঁদরেল প্রধান স্টাফ অফিসার পীরজাদাকে সঙ্গে নিতে হয়েছিল। আসলে পাখি শিকারের নাম ক'রে

মানুষ শিকারের ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয় এই লারকানায়। ইয়াহিয়া, ভুট্টো, হামিদ খান ও পীরজাদা শিকারী হিসেবে কারো হাতই কম দক্ষ নয়। পরবর্তী ঘটনা তা' প্রমাণ করেছে। প্রমাণ করেছে, ওরা পাখি নয়, ত্রিশ লক্ষ নিরীহ নিরপরাধ বাঙালী। ছলনার আশ্রয়ে ইয়াহিয়া খান সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন।

প্রস্তুতিপর্ব শেষ হ'লে বাঙালীর স্বাধিকার আর স্বায়ত্তশাসনের ইচ্ছাকে চিরতরে উৎপাটিত করবার মানসে, বাঙালীর মেরুদণ্ডকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেবার প্রয়াসে একাত্তরের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে তিনি তাঁর সেনা-বাহিনীকে নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালী জনগণের ওপর লেলিয়ে দিলেন। বন্দী ক'রে নিয়ে গেলেন বাংলার অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিবকে। সূত্রপাত ঘটলো জগতের জঘন্যতম গণহত্যার। হাজার হাজার 'মাইলাই' সংঘটিত হ'ল বাংলার শহর-বন্দর-গ্রামগুলোতে।

ষড়যন্ত্রের শেষ এখানেই নয়। নরঘাতক ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে বন্দী করেই ক্ষান্ত হলেন না। তাঁকে সুপরিকল্পিত উপায়ে হত্যা করবার পথও প্রশস্ত করতে প্রস্তুতি নিলেন।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের ৩ তারিখে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান অধুনা বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবের বিচারের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে আটক করা হয়েছে এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে তাঁর বিচার করা হবে।

['দি ডন', করাচী, ৫ই আগস্ট, ১৯৭১]

এই সময়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, শেখ মুজিব কখনই তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন না। তিনি শুধু দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের ভার নিয়েছিলেন। কাজেই প্রথমাবস্থায়, রাজনীতিক শেখ মুজিবের কার্যক্রমে বাধা প্রদান করবার তাঁর কিছুই ছিল না।

ইয়াহিয়া খানের এই বিবৃতি অবশ্যই তাঁর পূর্ববর্তী ব্যবস্থাসমূহ এবং কথাবার্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বরং পরস্পরবিরোধী। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই যে এর অবতারণা করা হয়েছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের ৯ তারিখে এক সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে 'দেশদ্রোহিতার' অভিযোগের সঙ্গে 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার' এক নতুন অভিযোগ আনয়ন করা হয়। এতে বলা হয়ঃ 'অধুনা বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা' এবং অন্যান্য অপরাধের জন্যে বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার করা হবে। আগস্ট মাসের ১১ তারিখ থেকে গোপনে এ বিচার অনুষ্ঠিত হবে এবং বিচার সম্পর্কিত সবকিছু গোপন রাখা হবে।'

['দি ডন', করাচী, ১০ই আগস্ট, ১৯৭১]

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতেই সর্বপ্রথম শেখ মুজিব সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন ক'রে বলা হয়, তাঁকে মার্চ মাসের ২৬ তারিখ ভোরে তাঁর ধানমণ্ডীস্থিত বাসভবন থেকে বন্দী করা হয়। পরে, তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু, কোথায় তাঁকে রাখা হয়েছে. সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা হয় নি। বরং সব সময়ই শেখ মুজিব সম্পর্কিত খবরাখবর সযতনে গোপন রাখা হয়েছিল।

শেখ মুজিবের বিচারের কথা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে বিশ্বজনমত।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের ৮ তারিখে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট শেখ মুজিবের বিচার-প্রহসন বন্ধ করবার জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তিনি বলেনঃ 'ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনগণ, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পার্লিয়ামেণ্টও ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবের বিচার-সম্পর্কিত বিবৃতিতে বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন। ইয়াহিয়া খান এক গোপন সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার শুরু করতে যাচ্ছেন এবং (এই বিচারে শেখ মুজিবকে) কোন বৈদেশিক আইনজ্ঞের সহায়তা থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমরা ধারণা করছি যে, তথাকথিত এই বিচার শেখ মুজিবকে হত্যা করবার একটা আবরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮]

আগস্ট মাসের ৯ তারিখে ভারতীয় বৈদেশিক মন্ত্রী সরদার শরন সিং ভারতীয় লোকসভায় শেখ মুজিব ও তাঁর বিচার-সম্পর্কিত বিবৃতির

সমালোচনা ক'রে বলেন যে, "তাঁর বিচার সম্পর্কে আমরা বিদেশের সরকারগুলোকে আমাদের অভিমত জানিয়েছি এবং এ-সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের ওপর তাঁদের প্রভাবকে কার্যকর করতে অনুরোধও করেছি। যদি শেখ মুজিব, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সহকর্মীদের কোন ক্ষতি করবার চেষ্টা করা হয়, তবে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে এবং এর জন্যে বর্তমান পাকিস্তানী সরকারই পুরোপুরি দায়ী থাকবেন।"

[পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮]

শেখ মুজিবের বিচারানুষ্ঠানের সংবাদ বহির্বিশ্বে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ঝড় বয়ে যায়। আগস্ট মাসের ১৪ তারিখে জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়ে বলেনঃ "শেখ মুজিবের গোপন সামরিক বিচারালয়ে বিচার অনুষ্ঠানের উদ্ধৃতি দিয়ে এই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে (এখানকার) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতার জীবন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। কাজেই জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনগণ পাকিস্তান সরকারের কাছে মানবিক সহানুভূতি প্রদর্শন করতে এবং শেখ মুজিবকে তাঁর জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে সম্মান প্রদর্শন করতে আবেদন জানাচ্ছে।

['দি মর্নিং নিউজ', ২৬শে নভেম্বর, ১৯৭১]

শেখ মুজিবের বিচার বন্ধ করবার অনুরোধ জানিয়ে আগস্ট মাসের ১৭ তারিখে জেনেভায় অবস্থানরত আন্তর্জাতিক জুরী-কমিশনের সদস্যরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে এক তারবার্তায় বলেছেনঃ "বিশ্ব জনমত ধরে নিয়েছে যে, সামরিক আদালত শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে। এ ধারণা যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে আন্তর্জাতিক জুরী-কমিশন আপনার কাছে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে নিবেদন করছে, এ দণ্ডাদেশকে বাতিল ক'রে দিয়ে আপনার মহানুভবতা ও বিজ্ঞতা প্রদর্শনের মাধ্যমে জিঘাংসা, সন্ত্রাস আর দুঃখ-কষ্টকে ব্যাপকতর আকার ধারণ করতে না দে'য়া।"

[বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯-৩০]

অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাও শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে নিশ্চুপ ছিল না। আগস্ট মাসের ২০ তারিখে হেলসিংকি থেকে 'বিশ্ব শান্তি সংস্থা'

পাকিস্তান সরকারের কাছে শেখ মুজিবের গোপন বিচার বন্ধ ক'রে মুক্তি দেবার আবেদন জানান। আবেদনে বলা হয়ঃ মানবিকতার স্বাভাবিক ধর্মকে পুরোপুরি অস্বীকার ক'রে এবং বিশ্বজনমতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের মাধ্যমে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করছে। এই মনোভাব ব্যক্ত ক'রে বিশ্বশান্তি পরিষদ তার সদস্যভুক্ত প্রতিটি জাতীয় সংসদকে শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে দাবী জানাতে আহ্বান জানান এবং এ-সম্পর্কে এক তারবার্তার মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানকে (বিশ্ব-শান্তি পরিষদের সিদ্ধান্ত) অবহিত করেন।

সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখে যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ আর্থার বটমলি কুয়ালালামপুরে কমনওয়েলথ পার্লিয়ামেণ্টারী এসোসিয়েশনের অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতায় কমনওয়েলথ দেশভুক্ত রাষ্ট্রসমূহকে শেখ মুজিবের মুক্তি'র জন্যে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উপদেশ দেন। এখানে তিনি শেখ মুজিবকে সমর্থন ক'রে বলেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের পক্ষে একমাত্র শেখ মুজিবই কথা বলবার অধিকারী।'

['দি গার্ডিয়ান', লণ্ডন, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

কিন্তু শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করবার ধৃষ্টতার অভাব প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খানের ভিতর পরিলক্ষিত হয় নি; বরং পাকিস্তান সরকার জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে এক প্রতিবাদলিপিতে বলেছিলেন, সেক্রেটারী জেনারেলের আগস্ট মাসের ১০ তারিখে প্রদত্ত শেখ মুজিবের বিচার-সম্পর্কিত বিবৃতি জাতিসঙ্ঘ চার্টারের নির্ধারিত নীতিমালা বহির্ভূত।

['দি ডন', করাচী, ১৬ই আগস্ট, ১৯৭১]

আগস্ট মাসের ৩১ তারিখে জাতিসঙ্ঘে অবস্থানরত পাকিস্তানী প্রতিনিধি নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের কাছে নিজেদের অপকর্মের সমর্থনে নির্লজ্জের মত বলেছিলেন: "পাকিস্তানী প্রেসিডেণ্ট জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে অনেকগুলো সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, বিচার আগস্ট মাসের ১১ তারিখে শুরু হয়েছে এবং আগামী দু'সপ্তাহের ভিতরই তা' সমাপ্ত হবে।"

তবে উক্ত সাক্ষাৎকারের সময় সাংবাদিকদের কাছে বিচারের স্থান প্রকাশ করতে তিনি অসম্মত হলেও একথা স্বীকার করেছিলেন যে, শেখ মুজিবকে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে পাকিস্তানের 'সর্বশ্রেষ্ঠ' সাংবিধানিক আইনজ্ঞ মিঃ এ. কে. ব্রোহীকে নিযুক্তির অনুমতি দে'য়া হয়েছে।

['ডেইলী নিউজ', করাচী, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা ক'রে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের বিচারের প্রহসনই শুধু চালিয়ে যাচ্ছিলেন না, এই বিচারানুষ্ঠানকালে শেখ মুজিব সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করতেও তিনি সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেন নি। সেপ্টেম্বর মাসের ১লা তারিখে ফরাসী পত্রিকা 'লা ফিগারো'তে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারে তিনি শেখ মুজিবকে পাকিস্তানী জনগণের শত্রু বলে অভিহিত করেছিলেন। অক্টোবর মাসে ফরাসী দৈনিক 'লি মণ্ডি'র সাংবাদিকের কাছে তিনি মুজিব সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে বলেছিলেন, "আমি একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে কথা বলতে পারি না।" উক্ত সাংবাদিক শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে এই শক্তিমদমত্ত স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন যে, শেখ মুজিব একজন দুষ্কৃতিকারী। তাঁর দেশে এরকম অনেক দুষ্কৃতিকারী আছে, তাঁদের আইনানুসারে বিচারও হয়ে থাকে।

['দি ডন', করাচী, ২রা অক্টোবর, ১৯৭১]

অর্থাৎ দেশের কর্ণধার হয়ে তিনি এমন একজন মহাপুরুষ হয়েছেনযে, শেখ মুজিব ও তাঁর সম্পর্কিত সংবাদ মাত্রই তুচ্ছ এবং এইসব সাধারণ খবরাখবর প্রেসিডেন্টের রাখবার কথা নয়। এমন ধৃষ্টতার নজীর মানবেতিহাসে বিরল।

যাহোক, ১১ই আগস্ট তারিখে বিচার শুরু হলেও সেদিনই তা' মুলতবী হয়ে যায়। সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখ থেকে বিচার পুনরায় শুরু হয়। গোপন সামরিক আদালতে বিচার চলতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বজনমতের চাপে মিঃ এ.কে. ব্রোহীকে ও তাঁর সহকারী হিসেবে মিঃ গোলাম আলী মেনন, মিঃ আকবর মীর্জা এবং মিঃ গোলাম হোসেনকে শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা চালানোর অনুমতি দে'য়া হয়। বিচারের কার্যবিবরণী সম্পর্কে এক সামরিক বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবের বিপক্ষে এ-পর্যন্ত ২০ জন সাক্ষীর জেরা করা

বিচার শুরু হবার পর প্রতিবাদমুখর বিশ্ব-বিবেক

হয়েছে এবং সময়মত জনগণকে বিচারের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করান হবে। ইতিমধ্যে সরকার পক্ষ থেকে হুঁশিয়ার ক'রে দেয়া হয় যে, জনগণ যেন তাঁদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে যত্নবান হয়ে অপ্রাসঙ্গিক কোন কিছু না বলেন এবং এমন কোন কিছু ক'রে না বসেন যা আদালত অবমাননার পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং বিচারের অগ্রগতিকে বিঘ্নিত ক'রে বসে অথবা বাদী বা বিবাদী পক্ষের প্রভাব বিস্তার ক'রে (ন্যায়) বিচারকে বাধা দেয়।

['দি ডন', করাচী, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

কিন্তু দিন দিন মুজিবের পক্ষে প্রবলতর হয়ে ওঠে বিশ্বজনমত। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র মুজিবকে মুক্তি দেবার জন্যে ইয়াহিয়া সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকেন। এমন কি পাকিস্তানের (পশ্চিম) জনগণ ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী উত্থাপন করতে শুরু করেছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখে ন্যাশনাল আওয়ামী দলের এক অধিবেশনে দলের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানীও শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

নভেম্বরের ৫ তারিখে লাহোর থেকে পাঠানো রয়টারের সংবাদে জানা যায় যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন স্তরের ৪২ ব্যক্তি এক সম্মিলিত আবেদন-পত্রে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে শেখ মুজিবের আশু মুক্তির আবেদন জানিয়েছিলেন। এঁদের ভিতর ছিলেন রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবী, সাংবাদিক, লেখক, ছাত্রনেতা, সমাজকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। [বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬-২৭]

শেখ মুজিবের বিচার-সম্পর্কে বাইরের চাপ এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও মুজিবের অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানের দাম্ভিক মনোভাবকেও অবনমিত করেছিল। এর প্রমাণ বহণ করছে নভেম্বরের ৮ তারিখে প্রদত্ত তাঁর 'নিউজ উইক' ম্যাগাজিনের সাংবাদিকের সঙ্গে এক 'সাক্ষাৎকার-বিবৃতি।' এতে তিনি বলেছিলেন যে, "আমাকে অনেকেই বিশ্বাস নাও করতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, যদি তিনি (শেখ মুজিব) পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যান, তবে তাঁর নিজের জনগণই তাঁকে হত্যা করবে। (কেননা) তারা তাঁকেই (মুজিব) তাদের দুঃখ-দুর্দশার

ক্রমবর্ধমান বিশ্ব-জনমত, আভ্যন্তরীণ জনমত ঃ ইয়াহিয়ার মানসিক ভীতি

জন্যে দায়ী করেছে। .... আমি খামখেয়ালীপনার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে মুক্তি দিতে পারি না। এটা একটা বিরাট দায়িত্ব। কিন্তু, জাতি যদি তাঁর মুক্তি চায়, আমি তা' হ'লে তাঁকে মুক্তি দিতে পারি।"

['নিউজ উইক' ম্যাগাজিন, ৮ই নভেম্বর, ১৯৭১]

ডিসেম্বরের ১৮ তারিখে ইসলামাবাদ থেকে ইউ. পি. আই-এর দেয়া সংবাদে জানা যায় যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শেষ হয়েছে। তবে, এখনো কোন 'রায়' দে'য়া হয় নি। তাঁকে (এখন পর্যন্তও) ইসলামাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লায়ালপুর জেলার বন্দীশালায় আটক রাখা হয়েছে।

আগস্ট মাসের ১১ তারিখ থেকে শেখ মুজিবের বিচার শুরু হলেও এবং ডিসেম্বরে এ বিচার সমাপ্তির কথা জানা গেলেও এর 'রায়' সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের কথা শোনা যায় নি। সম্ভবতঃ বহির্বিশ্বে শেখ মুজিবের অভাবনীয় জনপ্রিয়তা এবং বাঙালী জাতির ওপর তাঁর অসীম প্রভাব ; এমন কি পাকিস্তানের সমাজেও বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খানের 'চরম' ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল।

ভুট্টো ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই দেশের অভ্যন্তরে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে এবং বিশ্বজনমতের চাপে বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসের ৮ তারিখ সকালে বিলেতের উদ্দেশ্যে পি. আই. এ-র (ফ্লাইট নং ৬৩৫) এক বিশেষ বিমানে রাওয়ালপিণ্ডি ত্যাগ করেন। তবে শেখ মুজিবের লণ্ডন উপস্থিতির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ গোপন রাখা হয়েছিল। তাঁর রাওয়ালপিণ্ডি পরিত্যাগের বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে রেডিও পাকিস্তান থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, পাকিস্তান সময় ০৩০০ (জানুয়ারী ৮, ১৯৭২) পাকিস্তান সরকারের 'বিশেষ ভাড়া করা' এক বিমানে শেখ মুজিব রাওয়ালপিণ্ডি পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁকে বিদায় জানাতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মুজিবের বন্দী-জীবন এবং গোপন সামরিক আদালতে তাঁর বিচার-প্রহসন বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি পাকিস্তানী সামরিক চক্র এবং

পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব ও জিঘাংসা ইত্যাদির স্বরূপকে বহির্বিশ্বে উন্মোচিত ক'রে দিয়েছিল। মানুষ শেখ মুজিব, রাজনীতিক শেখ মুজিব এবং দরদী শেখ মুজিবকে সারা বিশ্ব তাঁর বন্দী-দশা এবং তাঁর বিচার-প্রহসন চলাকালে পুরোপুরিরূপে জানবার এবং বুঝবার সুযোগ পেয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

এখন আমাদের বিচার্য বিষয় হ'ল, শেখ মুজিবের অপরাধ কি ছিল? আর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো সত্য হ'লে, তার জন্যে তিনি কতটুকু দায়ী ছিলেন? অথবা তাঁকে এ-ব্যাপারে অভিযুক্ত করা চলে কি না?

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ভুক্ত ক'রে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ও পাঞ্জাবী শাসকচক্র শুধু তাদের নির্বুদ্ধিতাকেই বিশ্বের সামনে বড় ক'রে তুলেছে। ইয়াহিয়া খান অবৈধভাবে শেখ মুজিবকে হত্যা করবার একটি বৈধ আবরণ সন্ধান করে-ছিলেন, কেননা কোন সভ্যদেশে প্রচলিত কোন আইনে, এমন কি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আইনেও অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন কখনো রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক অপরাধ বলে পরিগণিত নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইনে তাঁর কাজের জন্য কোন অবস্থাতেই এবং কখনই রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন না।

কিন্তু যখন তাঁকে একটা অভিযোগে অভিযুক্ত ক'রে বিচার করা হয়েছে, তখন দেখা যাক আন্তর্জাতিক আইনের আওতাভুক্ত কোন অপরাধে তিনি অপরাধী কি না? আমরা ধরে নিলাম, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়ে পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ করেছেন (অবশ্যই এটা সত্য কথা) কিন্তু কোন দেশের কোন অংশ যদি ন্যায়সঙ্গত কারণে (যেমন মৌলিক মানবিক অধিকার রক্ষার্থে) বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন শুরু ক'রে দেয়; তা' কি আন্তর্জাতিক আইনের কোন ধারায় অবৈধ ব'লে স্বীকৃত হয়েছে? এ ধরনের কোন আইন আন্তর্জাতিক আইনের কোন ধারা-উপধারায় সংযোজিত হয় নি।

সুব্রত রায় চৌধুরী শেখ মুজিবের বিচার যে অবৈধ তার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থা-পিত করবার জন্য জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের কার্যবিবরণী ও জেনেভা

কনভেনশনের বিভিন্ন ধারা-উপধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, কোন ন্যায়নীতির দ্বারাই শেখ মুজিবের বিচার বৈধ হতে পারে না। [প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪০-৪১]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা যে আইনসঙ্গত এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক সনদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এ-সর্ম্পকে যুক্তি দেখিয়ে সুব্রত রায় চৌধুরী প্রমাণ করেছেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা আন্তর্জাতিক আইনের কোন ধারা বা উপধারার পরিপন্থী নয়। শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়ে এবং বাংলা-দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে কোন অপরাধ করেন নি; বরং শেখ মুজিবকে অন্যায়ভাবে বন্দী ক'রে বিশেষ সামরিক আদালতে গোপনে বিচার পরিচালনা ইয়াহিয়া খানের অসাধু উদ্দেশ্যেরই আরও একটি উদাহরণ বিশেষ। সুতরাং, কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে ইয়াহিয়া খানকে, শেখ মুজিবকে নয়।

[ঐ, পৃঃ ২০০-২০১]

বিচার চলাকালে বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গুলো শেখ মুজিবের বিশ্ব-জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর বহণ করছে। বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শেখ মুজিব, তাঁর বিচারের বৈধতা ও মুক্তি সম্পর্কে প্রকাশিত কতকগুলো মন্তব্য এখানে বাংলায় অনুবাদ ক'রে দে'য়া হ'ল। এগুলোর মধ্যে পাকিস্তানী দু'-একটি পত্র-পত্রিকার মন্তব্যও আছে।

॥ ১. মুজিবের গোপন বিচার ॥

"শেখ মুজিবুর রহমান নামে এমন একজনের গোপন বিচারানুষ্ঠান হতে যাচ্ছে, যাকে পাকিস্তান ফেডারেশনের অধিকাংশ জনসাধারণ পরোক্ষভাবে দেশের প্রধানমন্ত্রীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। এই ঘটনায় উভয় পক্ষীয় পারস্পরিক সমঝোতার যে ক্ষীণতম আশাটুকু ছিল, তাও নিঃশেষিত হ'ল।"

['ট্রাইবুন দি জেনেভা', ১০ই আগস্ট, ১৯৭১]

2. UNDER SECRET SUMMARY PROCEEDING

"জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ উ থান্ট এই বলে সর্তক বাণী উচ্চারণ করেন যে, গত নভেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে এবং তার অব্যবহিত

পরবর্তী কালের কলেরা মহামারীতে পূর্ব বাংলায় যে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তার চেয়েও বহুগুণ ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসতে পারে, যদি দেশদ্রোহিতার অপবাদে পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা মুজিবুর রহমানের এমন ধরনের গোপন বিচারের প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকগণও উ থান্ট-এর সঙ্গে একমত হলেন। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এই নেতা শতকরা ৯৮ ভাগ ভোট পেয়েছিলেন, সে কথা স্মরণে রেখেই তাঁরা তাঁদের বক্তব্য রাখলেন ... ... এই সময় ইয়াহিয়া খানের প্রশাসন-সূত্র শেখ মুজিবুর রহমানকে যে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে সে কথা পর্যন্ত প্রকাশ করতে অস্বীকার করলো। তারা শুধু এইটুকুই বললো যে, 'পাকিস্তানেরই কোন এক জায়গায়' তাঁর বিচার হবে। এমনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীরা যে-কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে (নিজেদের স্বার্থে) গ্রহণ করতে পারতো। কারণ—ঐতিহ্যের দিক দিয়ে তারা পশ্চিমপন্থী, কিন্তু তাদের প্রতিবেশী তো লালচীন। শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি ভাবের চেয়ে কাজের প্রতিই বেশী অনুরক্ত, তিনি ঠিকই বুঝতেন যে, ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর মধ্যে এবং জনসাধারণের রায়ের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এবং কতটুকু।"

['লা নেশন', বুয়েন্স আয়ার্স, ১৫ই আগস্ট, ১৯৭১]

॥ ৩. মুজিবের 'দেশ-দ্রোহিতার' প্রকৃতি ॥

"আগস্ট মাসের ১১ তারিখে শেখ মুজিবের গোপন বিচার শুরু হ'ল। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ছিল 'দেশ-দ্রোহিতা'। সুতরাং, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই এ 'দেশ-দ্রোহিতার' প্রকৃতি ও ইতিহাস নিরূপণ করলে তবেই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব।

১৯৬৬ সালে মুজিবুর রহমান যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে তাঁর ৬-দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করলেন, (যা আগের নির্বাচনে তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রধান কারণও ছিল), তখন থেকেই তিনি বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত হলেন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে পড়লেন।

সরকার পক্ষীয় লোকেরাই এ-ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলো এবং সাজানো মিথ্যা অভিযোগগুলো স্থগিত রাখা হলো।

স্বায়ত্তশাসনের দাবীটি নতুন কিছুই ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির মূল সেই লাহোর প্রস্তাব—যার খসড়া জিন্নাহ্ স্বয়ং করেছিলেন, সেখানেই বলা হয়েছিল যে, ভারতবর্ষের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো এমনভাবে পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশে বিভক্ত হবে, যেগুলোর প্রত্যেক অঞ্চলই হবে স্বায়ত্তশাসিত এবং এর সবগুলো 'স্টেট' মিলেই অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্বাঞ্চল কখনই তেমন স্বায়ত্ত-শাসিত 'স্টেট' বলে পরিগণিত হ'ল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গ পূর্বাঞ্চলকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে শাসন ও শোষণ ক'রে আসছে------

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ এই প্রথম শেখ মুজিব ও তাঁর দলকে পাকিস্তান সংসদে সংখ্যা-গরিষ্ঠের আধিপত্য এনে দিল------

শেখ মুজিব আবার বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত হলেন এবং শুরু হ'ল গণহত্যা------মজার কথা এই যে, লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত সেই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতিটুকুও শেখ মুজিব তাঁর ৬-দফাতে দাবী করেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র দফতর রাখার ব্যাপারে তাঁর মত ছিল------------------।"

['দি সানডে টাইম্‌স', জাম্বিয়া, ২২শে আগস্ট, ১৯৭১]

॥ ৪. অবশ্যই তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে ॥

"পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্য একটি পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বিচারালয় নির্ধারণ করছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক জনাব শফির কাছে এটা পূর্ব পরিজ্ঞাত যে, 'অবশ্যই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।'

বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে অনুধাবন ক'রে বাংলাদেশের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলেছিলেন ঃ 'ষাঁড়ের কাছে শিং, ব্যাঘ্রের কাছে নখরযুক্ত থাবা, মৌমাছির কাছে হুল ইত্যাদির মতই বাঙালীর কাছে কপটতা (অন্যতম অস্ত্রস্বরূপ)।' বাংলার নতুন শাসক-সম্প্রদায় পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী সামরিক চক্রও তাঁদের পূর্ববর্তী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের

মত করেই বিজাতীয় সংস্কার গ্রহণ করেছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের দু'শ বছর পর তারা বাঙালীদের বিরুদ্ধে একটা আইনসিদ্ধ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেছে, আর তা' হ'ল— 'কপটতা'।

বাংলাদেশের গঙ্গা-বিধৌত অঞ্চল থেকে দু'হাজার কিলোমিটার দূরে লায়ালপুরের জেলে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই বিচার শুরু হ'ল। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'ল এই যে, তিনি বাংলার ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন দাবী করেছিলেন। তাঁর অপরাধ হ'ল, অবাধ নির্বাচনে তিনি এবং দলগতভাবে তাঁর দল আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করেছে।

শাসন ও শোষণকারী পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের এই প্রাধান্য মেনে নিতে পারলো না। তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ ক'রে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটালো। অভিযোগ আনা হয়েছিলঃ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উস্কানিমূলক আচরণ।'

পাকিস্তানী রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াহিয়া খান পূর্বাহ্নেই 'এ-রকম একটা ধারণা' ক'রে নিয়েছিলেন। বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিনিধি মিঃ কারগিল যখন জেনারেলকে প্রাণদণ্ড দানে বিলম্ব করতে অনুরোধ জানালেন, তার উত্তরে তিনি নিন্দা ক'রে বললেনঃ 'চূড়ান্ত রাজদ্রোহিতার অপরাধে এই ব্যক্তি দোষী, তাঁকে অবশ্যই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হবে।' এই বিচারের নির্দোষিতা দেখানোর জন্য ইয়াহিয়া খান অভিযুক্তকে তাঁর নিজস্ব কৌশলী পছন্দ করবার সুযোগ দিলেন। শেখ মুজিব এ. কে. ব্রোহীকে স্বীয় কৌশলীরূপে মনোনীত করলে তিনি ভয়ে 'এ কাজ' করতে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। অতঃপর দৈনিক 'মর্নিং নিউজ'-এর নিন্দাসূচক ভাষ্য হ'লঃ 'পাকিস্তানে তাঁকে সর্বোচ্চ পরিমাণ আইনগত সহযোগিতা দান করার অভিপ্রায় জানিয়ে এবং বিচারের নামে প্রহসন করার জন্য পাক-সরকার ব্রোহীকে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ সমর্থন করতে বাধ্য করলো।'

অপর পক্ষে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের বিচারক জনাব শফি শেখ মুজিবের ওপরকার সামরিক সিদ্ধান্তগুলো জানতেনঃ 'অবশ্যই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে এবং তারপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মধ্যে দণ্ডদান স্থগিত থাকবে। এই চূড়ান্ত শাস্তি একই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের ও

সামগ্রিক পাকিস্তানের আইনসিদ্ধ বিচারের (বৈধতার আবরণ) মুখ রক্ষা কববে। দণ্ডদান স্থগিত রেখে আমরা বিশ্বের কাছে সদিচ্ছা ও বিশ্বাসের অবকাশ সৃষ্টি করতে পারি।'

পাকিস্তান ভীষণভাবে বিশ্বের সদিচ্ছা কামনা করে, কিন্তু শেখ মুজিবের বিচার যেভাবে চলছে তারই ওপর পাকিস্তানের সুনাম নির্ভর করবে।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ বা নির্বাচিত ১৬৭ জন সদস্যের মধ্যে, বলা হয়, মাত্র ৮৮ জন পশ্চিমের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবার পক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

পূর্ব বাংলার আইন সভায় মুজিবের অনুসারী ২৮৮ জনের মধ্যে মাত্র ৯৪ জন উদ্ভূত এই নতুন পরিস্থিতিকে স্বীকার ও গ্রহণ করেছিলেন।

অন্য যাঁরা শেখ মুজিব ও তাঁর দলের প্রতি বিশ্বস্ত রইলেন এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে অনমনীয় থাকলেন তাঁদেরকে নিজ নিজ জেলার সামরিক প্রশাসকের কাছে ২৬শে আগস্ট ৮টার মধ্যে হাজির হবার জন্য নির্দেশ দেয়া হ'ল। নিজেদের কৌশলী মনোনয়নের সুবিধা না দিয়েই সামরিক বিশেষ বিচারালয় তাঁদের বিচার করার জন্য অপেক্ষা করছে।

যদি প্রকৃতই এইসব এম. পি. সামরিক বিচারকদের কাছে গিয়ে হাজির হ'ত, তা' হ'লে কি হ'ত—সে সর্ম্পকে পশ্চিম পাকিস্তানী মেজর ইফতেখার SPIEGEL-এর প্রতিনিধিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন: "একজনের মাধ্যমে এমন ত্রাসের সঞ্চার করতে হবে, যেন পর পর তিন পুরুষও এর (মুজিবের) কথা সভয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হয়।"

['দের স্পিগেল', বন, ৩০শে আগস্ট, ১৯৭১]

॥ ৫. মুজিবকে মুক্তি দাও ॥

"পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সব কিছু মিটমাট করার ভান করলেন। বৃহস্পতিবারের পর পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় একজন দেশী গভর্নর নিযুক্ত করা হবে। তিনি হবেন একজন বাঙালী, এর চেয়ে বেশী (আর) কি চাই। পশ্চিম পাকিস্তানের জেনারেল টিক্কা খানকে বাঙালীরা 'কসাই' বলে, কারণ তার বাহিনী বিপ্লবীদের অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে হত্যা করছিল। এবার তিনি সামরিক কর্মকর্তা হবেন। এই পরিবর্তনে সেখানকার

লোকেরা প্রভাবিত হবে কিনা কিংবা ২৬শে মার্চের পর থেকে যত ঘটনা ঘটে গেছে, তার প্রেক্ষিতে আদৌ সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছে কিনা, একথা ঠিক ক'রে বোঝা যায় নি।

সকল বিদেশী পরিদর্শক পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি দেখে একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, 'পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর' প্রতি বাঙালীদের মনে তীব্র ঘৃণা আছে এবং তাদের সহযোগী যারা (বিশেষ ক'রে বিহারের অবাঙালী মুসলমান) তাদের প্রতিও তাদের ঘৃণা দৃঢ়মূল।

৬৬ বছর বয়স্ক ভূতপূর্ব কূটনীতিক নতুন গভর্নররূপী মালিক অতঃপর অবশ্যই তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে গৃহশত্রু বলে বিবেচিত হবেন।

যদি বাঙালীর প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান শীঘ্র মুক্তি না পান, তা' হ'লে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পুনর্মিলন বা মিটমাট ক'রে ফেলার সদিচ্ছা-জনিত এই ভানেরও কোন মানে হয় না।"

['এ্যালেজমেইনি সাইতুং', ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

॥ ৬. ক্ষমাকর এবং ভুলে যাও ॥

"প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক অপরাধীদের ব্যাপকভাবে ক্ষমার আদেশটিও অস্পষ্ট ছিল। তিনি যদিও সাধারণভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন, তবু এই ক্ষমা শুধু তাদেরই প্রতি প্রযোজ্য যারা 'পূর্ব পাকিস্তানের গোলযোগের সময় গত ১লা মার্চ থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপরাধমূলক কাজে জড়িত আছে।' এখনো যারা বিপক্ষে কাজ করছে তাদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হ'ল। এই ক্ষমা ঘোষণার ব্যাপারটি শুধুমাত্র একটা লিখিত বিবরণ হিসেবে রাখা হ'ল, না ক্ষমা-প্রার্থীদের সামনে একটা ব্যতিক্রমের নজির রাখা হ'ল, ঠিক বোঝা গেল না। এখানে একটা বিভ্রান্তি দেখা দিল, যেমন শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যে মামলা, তা' এখনো থাকলো কি না। কেউ জানে না, এর যথাযথ আইন-সিদ্ধ ব্যাখ্যা কি হবে। কিন্তু একজন সাধারণ লোকের চোখে এমন যদি প্রতীয়মান হয় যে, বিচারাধীন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি আইনের প্রয়োগ শুরু হয়ে থাকলেও প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সার্বিক ক্ষমা প্রদর্শনের পর তার আর কোন দোষ থাকতে পারে না, তা' হ'লে তাকে নির্বোধ বলা সমীচীন হবে না। আমরা আশা করি, এ-সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা খুব শীঘ্রই

এসে পড়বে। ইতিমধ্যেই এর পেছনে যে মনোভাব আছে, এবং যা মিটমাট ক'রে ফেলার একটা পদক্ষেপও বটে, তাকে স্বাগতম জানাই। সত্যিকাররূপে ভুলে যাওয়া এবং ক্ষমা করার উপরই জাতির ভবিষ্যত গঠিত হতে পারে।"

['পাকিস্তান টাইম্‌স', লাহোর, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

॥ ৭. একটি পাকিস্তানী আইনসম্মত মতবাদ ॥

"পূর্বাঞ্চলের গোলযোগে জড়িত ব্যক্তিদের প্রতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সার্বিক ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানও কি ক্ষমা পেতে পারেন? এই প্রশ্ন এখানকার (করাচী) লীগ্যাল এক্সপার্ট ও স্থানীয় রাজনৈতিক চক্রকে উত্তেজিত করেছে।

সযত্ন বিশ্লেষণে দেখা গেল যে, সাধারণ ক্ষমার ব্যাপারে যে রাজনৈতিক ইশতেহার প্রকাশিত হয়েছে, তাকে সাধারণ ক্ষমা ছাড়া আর কিছুই বলা হয় নি। এই ঘোষণার প্রচলিত আইনসিদ্ধ ব্যাখ্যায় সম্ভবতঃ শেখ মুজিবুর রহমানও মুক্তি পেয়ে যান। অন্ততঃ পশ্চিম পাকিস্তানে শেখ মুজিব-সমর্থক মহল থেকে এ-রকমই বলাবলি হচ্ছে।

অন্যপক্ষের মতে, এই সাধারণ ক্ষমার আওতায় কোনক্রমেই শেখ মুজিবুর রহমান এবং তথাকথিত জাতীয় সংসদ ও আইন সংসদের সদস্যরা, যাঁদের অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে বিচার চলছে, তাঁরা পড়েন না। প্রায় 'এইভাবই' সমর্থন ক'রে প্রেস তথ্য সরবরাহ বিভাগের একজন মুখপাত্র লিখিত বিবরণী সহযোগে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যাই হোক, তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের এই ধরনের বাচনিক ব্যাখ্যাকে পর্যাপ্ত বলে মনে করা হয় নি।

এই সঙ্কটজনক ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ একটি ইশতেহার বা ঘোষণা আশা করা যাচ্ছে। তদুপরি মিঃ আতাউর রহমান খানকে বিচারের জন্য খোঁজা হচ্ছিল, তাঁকে মুক্তি দেবার ফলে উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। কিছুসংখ্যক 'লিগ্যাল এক্সপার্ট' 'সাধারণ ক্ষমা' প্রদর্শনের ইশতেহারের কিছু কথা উল্লেখ ক'রে বলছে, 'গোলযোগের সময় অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যারা জড়িত অথবা অপরাধমূলক কাজ যারা করেছে' এই বাক্যে যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং যারা বিচারাধীন রয়েছে, তাদের সবার ওপরই সিদ্ধান্তটি প্রযোজ্য হবে।

তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের ধারা এমন হতে পারতো, যাতে অপরাধের দায়ে যে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে এবং যাদেরকে অপরাধীদের সঙ্গে জড়িত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারা সবাই এই সার্বিক ক্ষমা প্রদর্শনের সীমায় পড়ে।

করাচীর রাজনৈতিক এবং আইনজ্ঞ মহল অতঃপর অত্যন্ত অধীর চিত্তে শেখ মুজিব ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ব্যাপারে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসানমূলক একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তি আশা করছে।"

['দি ডেইলি নিউজ', করাচী, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

॥ ৮. সাধারণ ক্ষমা নির্বাচিত নেতাদের জন্য নয় ॥

"পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রয়াস পেতে হ'লে মহাপুরুষ হতে হয়। প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্ট এই বিপর্যয়ে লক্ষ লক্ষ লোক নিরাপত্তার জন্য ভারতে পালিয়ে গেল এবং এই বিভক্ত দেশের ভাঙ্গনের আশংকা আরো বহুদূর বিস্তৃত হ'ল।

গণতন্ত্র রক্ষার খাতিরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একনায়কের ভূমিকা ত্যাগ করতে পারতেন। কারণ গত কয়েক মাসে তিনি যে ঘটনাগুলো সংঘটিত করেছেন, তা' সংহতিকে ভয়ানকভাবে ব্যাহত করেছে।

প্রায় নয়মাস হ'তে চললো, শেখ মুজিবুর রহমান রাজদ্রোহিতার অপরাধে বিচারাধীন (বন্দী অবস্থায়) রয়েছেন এবং যদি দোষী প্রমাণিত হন, তা' হ'লে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবেন, অথচ তিনি তাঁর নীতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানী নাগরিকের সমর্থন পেয়ে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতেছিলেন।

এটা শেখ মুজিবেরই যুক্তি ছিল, প্রজাতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানকে কতকগুলো পশ্চিম পাকিস্তানী মিল-মালিকদের স্বার্থে উপনিবেশ ক'রে রাখার অবিরত চেষ্টা শোষণেরই নামান্তর।

বিপুল ভোটাধিক্যের সমর্থনের ভিত্তিতে তিনি স্বায়ত্তশাসনের একটা কর্মসূচী উপস্থাপিত করলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের বিজয়ী নেতা ভুট্টোর (যদিও শেখ মুজিবের তুলনায় প্রায় অর্ধেক আসন পেয়েছেন) মতে মত মিলিয়ে তাঁর (মুজিবের) এই পরিকল্পনাকে প্রজাতন্ত্র থেকে বেরিয়ে যাবার মহড়া বলে ব্যাখ্যা করলেন।

এই পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শাসন জারী হ'ল। বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করলো এবং শেখ মুজিব অন্তরীণাবদ্ধ হলেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সার্বিক ক্ষমা ঘোষণার মধ্যে তিনি এই বিশ্বাস পোষণ করতে পারেন যে, সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কিন্তু এটা ঠিকও নয় এবং শান্তি রক্ষার আগ্রহও এতে নেই। কারণ, শেখ মুজিব সম্পূর্ণরূপেই তাঁর দয়ার বাইরে রয়ে গেলেন।"

[সম্পাদকীয়, 'ত্রিনিদাদ গার্ডিয়ান', পোর্ট অব স্পেন, ৮ই সেপ্টেম্বর ,১৯৭১]

॥ ৯ শেখ মুজিবের সময়োচিত মুক্তি ॥

"আমাদের মতে, শেখ মুজিবকে যদি যথাসময়ে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে তা' সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে একটা চূড়ান্ত পদক্ষেপেরই সূচনা করবে। আর এখান থেকেই ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর পারিষদবর্গ তাদের সযত্ন-লালিত এই সঙ্কটের (যা অনেকদিন ধরে চলছে) সমাধানের প্রচেষ্টা শুরু করতে পারেন।"

['ট্রিবিউন এ্যাফ্রিকাইনি', কিনসাসা, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

॥ ১০. পরিণাম সম্পর্কে ইয়াহিয়া খানের অজ্ঞতা ॥

"উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে আনবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পাকিস্তানের ওপর অবশ্যই চাপ সৃষ্টি করতে হবে। তবেই রাজনৈতিক সমাধান বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে এবং তখনই পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলার জন্যে অতীব প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এখনো অখণ্ড পাকিস্তানের আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং তাঁকে তাঁর কার্যকলাপের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে মনে হয়। কথিত বিচারালয়, যা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের বিচার করছে, তা' যদি তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, তবে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যাবে।"

[সম্পাদকীয়, 'দি ক্যানবেরা টাইম্‌স', ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

॥ ১১. অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়কে প্রতিরোধ কর ॥

"এই জটিল ও ভয়ানক পরিস্থিতিতে মনে হয়, মাত্র একজনই সমঝোতার সূত্রপাত ঘটিয়ে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সাহায্যে দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। তিনি হলেন বর্তমানে বে-আইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যাঁর দল গত ডিসেম্বরে দেশের জাতীয় নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেছিল।

২৫শে মার্চে সেনাবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের পর থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে অন্তরীণ অবস্থায় রয়েছেন। দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে গোপনে এক সামরিক আদালতে বিচার করা হয়েছে। প্রাণ-দণ্ডের হুমকী স্বরূপ সেই রায় এখন পর্যন্ত ঘোষণা করা হয় নি।

সম্ভবতঃ শেখ মুজিবই একমাত্র বাঙালী নেতা যিনি তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা দিয়ে এবং অনুগামীদের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসাত্মক গোলযোগের ধারাকে বদলিয়ে দিতে সক্ষম। এমন কি, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কোন বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণেও তাঁর পক্ষে তাঁর অনুগামীদের সমঝোতায় আনা, দেশের বর্তমান অবস্থায়, প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তাঁকে ছাড়া কোন রকম সমাধানের কথাই আজ চিন্তা করা যায় না।

নিশ্চিতরূপে বলা চলে, এমন কি এটা কোন সন্দেহের অবকাশই রাখে না যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার এই মুহূর্তে শেখ মুজিবকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনায় বসতে পারেন। প্রয়োজনীয় বিষয় হ'ল যে, বাঙালী নেতাকে বিচারে দণ্ডিত এবং তাঁর সম্ভাব্য হত্যাদেশকে কার্যকরী ক'রে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ যেন পূর্বাহ্নেই সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে না দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র ইসলামাবাদ সরকারের ওপর খানিকটা নিয়ন্ত্রিত প্রভাব বিস্তারের আশায় পাকিস্তানকে যে সাহায্য দিয়ে চলেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের যতটুকু প্রভাবই থাক না কেন, চূড়ান্ত বিপর্যয়কে রোধ করতে হ'লে তা' ব্যবহার করা উচিত।"

['দি ইভনিং স্টার', ওয়াশিংটন, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১]

॥ ১২. মুজিব পাকিস্তানী দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জনমনের প্রতীক স্বরূপ ॥

সামরিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত নির্বাচন-বিজয়ী শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতীক স্বরূপ।

দেশের পূর্বাঞ্চলের পৈশাচিক নিপীড়নের মহানতম বলী সন্ত্রস্ত জনগণের ভারত অভিমুখে পলায়ন, বাইবেলে বর্ণিত সেই মহাপ্রস্থানে যাত্রার সমতুল্য। রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত হবে 'আওয়ামী লীগ' নেতাকে মুক্তি দেওয়া। .. ...

পশ্চিম পাকিস্তানের বুর্জোয়া স্বভাবই পূর্ব পাকিস্তানকে অধীনস্থ ক'রে রেখেছে। এ কথা নিশ্চয় ক'রে বলা চলে যে, বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক-শ্রমিকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়।

আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৩৩০টি আসনের ভিতর ১৬৯টি আসন দখল ক'রে জয়লাভ করেছিল। ... ...

পক্ষান্তরে ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে আখ্যায়িত করতেই অধিক উৎসাহ পেলেন এবং নির্বাচনী ফলাফলকে বাতিল ঘোষণা করলেন; দেশের পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে সত্যিকারের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং শেখ মুজিবুর রহমান সহ যে সমস্ত আওয়ামী লীগ নেতা পালিয়ে যেতে সমর্থ হন নি, সবাইকে গ্রেফতার করলেন। ...

প্রকৃতপক্ষে মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার প্রতি পুরো সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনভিত্তিক নির্বাচনী কর্ম্মসূচীকে আশ্রয় ক'রে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন। কর্মসূচীটি 'ছয় দফা কর্মসূচী' নামে পরিচিত। কিন্তু সত্য ক'রে এ কথা কে বলতে পারবে যে, বিরাট জাতীয় প্রশ্ন (রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক), স্বায়ত্তশাসন ও যুক্তরাজ্য গঠনের সমস্যা যা এতদিন পর্যন্ত সমাধান করা হয় নি, সেই প্রশ্নকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানে শান্তি রক্ষা এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা সম্ভব?

বিশ বছর মেয়াদী ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদনের পর যুক্ত বিবৃতিতে যে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলা হয়েছিল, তা' বাস্তবের চেয়েও অধিক সত্য, প্রয়োজনীয় এবং জরুরী। এর জন্য সময়োচিত প্রথম অপরিহার্য পদক্ষেপ হ'ল, ভালবাসার মাধ্যমে শান্তিকামী জনগণ ও সরকারের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন, অঞ্চলগুলোর মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি এবং ফ্যাসীবাদ-বিরোধী বীর নায়ক আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে মুক্তি প্রদান। তাঁর মুক্তির সেই দাবী উত্থিত হওয়া এবং দাবী আদায়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। [ল' উনিটা, রোম, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭১]

॥ বাংলাদেশে গণহত্যা ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিটলার লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র ও নিরপরাধ নরনারীকে হত্যা ক'রে মানব ইতিহাসে যে নজির স্থাপন করে, তা' লক্ষ্য ক'রে বিশ্ব-বিবেক শিউরে উঠেছিল। সুপরিকল্পিত উপায়ে গণহত্যার এই নজির স্থাপন ক'রে হিটলার যেমন দেশের প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত আইন ভঙ্গ করেছিল, তেমনি আন্তর্জাতিক আইনকেও অগ্রাহ্য করেছিল।

স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশাসকদের হৃদয়হীন ক্রিয়াকাণ্ড যুগে যুগে নানা দেশে নানাভাবে শান্তিকামী জনগণের জীবন বিপন্ন করেছে। বিশ্ব-বিবেক ক্রমে ক্রমে এ সত্য অনুধাবন করেছে যে, রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্রশাসকদের খেয়াল-খুশির বস্তু নয়। জনগণের নিরাপত্তা, কল্যাণ, বিভিন্ন অধিকার ইত্যাদি দেশ ও জাতি নির্বিশেষে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হয়েও আন্তর্জাতিক আইন সংস্থার আওতাভুক্ত বিষয়। রাষ্ট্রশাসকরা তাদের খেয়াল-খুশি চরিতার্থের জন্য দেশের প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত আইন ভঙ্গ ক'রে জনগণের নিরাপত্তা বিপন্ন এবং অধিকার হরণ করলে জনগণের পক্ষে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে। এই সত্যবোধ থেকেই রাষ্ট্রশাসকদের রোষানল থেকে জনগণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক আইন ও সংস্থার উদ্ভব হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে সুগঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে জাতিসংঘ (League of Nations) এবং তৎপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organisation) প্রতিষ্ঠা লাভের পর আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হবার পর অসামরিক জনগণকে হত্যা এবং নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কঠোরভাবে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গণহত্যার অপরাধে প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের ন্যুরেমবার্গ ও টোকিওতে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হয়েছিল।

[১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট সম্পাদিত এই আন্তর্জাতিক চুক্তি-পত্র অনুসারে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া লণ্ডনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান যুদ্ধোপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করে। ১৯৪৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী মিত্রশক্তির সর্বাধিনায়ক

টোকিওতে দূরপ্রাচ্যের প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য সামরিক ট্রাইবুন্যাল গঠন ঘোষণা করেন।]

ন্যুরেমবার্গ সনদে যুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধকালে হত্যা, অন্যায় আচরণ, দখলকৃত এলাকার অসামরিক জনসাধারণকে দাস হিসেবে ব্যবহার বা অন্য কোন কাজে নিয়োগ যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। অসামরিক জনগণকে হত্যা, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নকরণ, দাস হিসেবে নিয়োগ, অন্যত্র চালান দেয়া কিংবা তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য অমানুষিক আচরণ করাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলা হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার, শহর-নগর-গ্রাম খেয়ালখুশীমত ধ্বংস ক'রে দেয়া সনদে অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ন্যুরেমবার্গ ও টোকিওসনদ-ভুক্ত নীতিমালা অনুমোদন করে।

[Res. 95 (1), (ll), December, 1946, *Manual of Public International Law*, p. 517]

সাধারণ পরিষদ অপর এক প্রস্তাবে নির্বিচারে গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অপরাধ বলে ঘোষণা করে। এরপর জাতিসংঘ গণহত্যা প্রতিরোধের জন্য যথোপযুক্ত আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৯৪৮ সালে গণহত্যা সম্পর্কিত এক কনভেনশন (genocide convention) সম্পাদিত হয়। এই genocide convention-এ গণহত্যা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যকলাপ ও আচরণাবলী সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখিত হয়েছে এবং চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গণহত্যার হোতা ও অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দানের সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত কনভেনশনের ২ সংখ্যক ধারায় নরনারীর হত্যা, দৈহিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন, সুপরিকল্পিতভাবে অপর সংস্কৃতিকে একটি জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন, মানব-জন্ম রোধ করার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ এবং জোরপূর্বক এক গোষ্ঠীর শিশুদেরকে অন্য গোষ্ঠীতে চালান ক'রে দেয়া প্রভৃতি আচরণ গণহত্যা পর্যায়ভুক্ত বলে বর্ণিত হয়েছে। ৩ সংখ্যক ধারায় গণহত্যাকেই কেবলমাত্র দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলা হয় নি, গণহত্যার জন্য ষড়যন্ত্র, চেষ্টা, উত্তেজনা-সৃষ্টি এবং গণহত্যায় সহযোগিতা করা ইত্যাদি আচরণও গণহত্যা পর্যায়ভুক্ত—এগুলোও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বর্ণিত হয়েছে।

৪ সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছে যে, ৩ সংখ্যক ধারায় বর্ণিত গণহত্যা সম্পর্কিত শাস্তিযোগ্য আচরণকারী ব্যক্তি, তিনি রাষ্ট্রশাসক, সরকারী কর্মচারী, বা সাধারণ ব্যক্তি, যিনিই হোন না কেন, তাঁকে শাস্তি দেয়া হবে।

[United Nations, *Year Book on Human Rights for* 1948, U. N. N. Y., 1950, pp. 482-486 : Quoted in *Bangladesh*, Ed. Dr. Subhash C. Kashyap : The Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, 1971, p. 90]

বেসরকারী জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা বন্ধ করার জন্য ১৯৪৯ সালে জেনেভা সম্মেলনে চারটি নীতি গৃহীত হয়:

The four conventions of 1949 relate to ;

(a) The wounded and sick in the armed forces in the field,
(b) Wounded, sick and ship-wrecked members of the armed forces at sea,
(c) The treatment of prisoners of war, and
(d) The protection of civilian persons.

[সুব্রত রায় চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫]

১৯৪৮ সালে গণহত্যা সম্পর্কিত কনভেনশনে গৃহীত নীতিমালা জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ৫৬—০ ভোটে গৃহীত হয়। পাকিস্তান এই কনভেনশনের পক্ষে ভোটদান করে। ১৯৪৯ সালে জেনেভা কনভেনশনে যে চারটি চুক্তি গৃহীত হয়, পাকিস্তান ছিল তাতে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের অন্যতম। এমনকি ১৯৫১ সালে উক্ত কনভেনশনের চুক্তিপত্রে পাকিস্তান স্বাক্ষরও দান করেছিল। চুক্তি-পত্রাবলীতে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর প্রতি নিম্নলিখিত বাধ্যবাধকতা অর্পণ করা হয়:

The conventions impose a number of obligations upon a contracting party not only in respect of its own civilian population in a situation of armed conflict, but also with regard to the members of organised resistance movements, belonging to a party to the conflict and operating in or outside their own territory.

[ঐ, পৃঃ ৮৬]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে সংঘটিত নির্মম হত্যাযজ্ঞ, ভিয়েতনামের মাইলাই-য়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং পাকিস্তানে বাঙালী নিধনযজ্ঞ মানব ইতিহাসের সব চাইতে জঘন্য ও বর্বরোচিত ঘটনাসমূহের অন্যতম।

বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই তিনটি জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত আইন ভঙ্গ ক'রে। হিটলার বিশ্বব্যাপী জার্মান জাতির আধিপত্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য জার্মানীর ভেতরে ও বাইরে ৬০ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করেছিল; জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য সাম্রাজ্য-বাদী আমেরিকা ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামের মুক্তিকামী নরনারীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল; আর পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সুপরি-কল্পিতভাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে নির্মমভাবে একটি দাস জাতিতে পরিণত করবার জন্য হত্যালীলা চালিয়েছিল।

'মাস্টার প্ল্যান' অনুযায়ী টিক্কা-ইয়াহিয়ার নির্দেশে আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত দস্যু পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে অতর্কিতে নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর তখন থেকেই শুরু হয় বাংলাদেশে বাঙালী নিধনযজ্ঞ। গণহত্যা বা জেনোসাইড-এর যে কোন সংজ্ঞানুসারে পাক-বাহিনীর এই হত্যালীলাকে জেনোসাইড বলা চলে। মধ্যযুগের বিশ্বত্রাস ফ্যাসিস্ট চেঙ্গিস পশ্চিম-এশিয়া ও ইউরোপের ছ' থেকে সাত লাখ লোক হত্যা করেছিল। এ্যাটিলা দি হুন ইটালী, ফ্রান্স ও পীরেনীজের জনপদগুলো নরকঙ্কালের স্তূপে পরিণত করেছিল। বাগদাদ নগরবাসীর রক্তে তাইগ্রীস নদীকে লাল ক'রে দিয়েছিল হালাকু খান। নরপশু হালাকুর হাতে প্রাণ হারিয়েছিল তিন লাখ লোক। মাতাল নীরো সমগ্র রোম নগরী পুড়িয়ে দিয়েছিল। বিশ থেকে পঁচিশ হাজার নরনারীকে হত্যা ক'রে জাম্বেসী নদীতীরস্থ বান্টু জনপদকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক চক্রের দখলদার সৈন্যরা। ঘাতক হিটলারের পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিল ষাট লক্ষ ইহুদী। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্বর সৈন্যরা মাইলাই গ্রামে একশত চারজন নির-পরাধ ভিয়েতনামীকে হত্যা করেছিল। বাষট্টি জন অশ্বেতাঙ্গ নরনারী হয়েছিল শার্পভিলের নরঘাতকদের নৃশংসতার শিকার।

মানব ইতিহাসে বাংলাদেশে গণহত্যার স্থান

বিশ শতকে হিটলারের ইহুদী-নিধন-যজ্ঞের পরই সবচাইতে ব্যাপক-ভাবে নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে বাংলাদেশে। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সুদীর্ঘ ন' মাসব্যাপী নির্বিচার ও নিয়ন্ত্রিত অভিযানের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ বাঙালী নরনারী ও শিশুকে হত্যা করেছে, শত শত জনপদকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। মুক্তিকামী একটি জাতিকে নির্মূল করার জন্য তারা মানব ইতিহাসের সবচাইতে ভয়াবহ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছিল—গণহত্যার নজিরহীন পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার ইতিহাসে কালো অধ্যায় রচনা করেছিল।

"পাকিস্তানী সামরিক জান্তার পরিকল্পিত গণহত্যার লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১ ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী সৈনিক, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ বাহিনীর লোক, পুলিশ এবং আধা-সামরিক আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীর লোক।

২ হিন্দু সম্প্রদায়।

৩ আওয়ামী লীগের লোক—নিম্নতম পদ থেকে নেতৃস্থানীয় পদ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের লোক, বিশেষ ক'রে এই দলের কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণ।

৪ ছাত্র—কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণের দল ও কিছু-সংখ্যক ছাত্রী, যাঁরা ছিলেন অধিকতর সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন।

৫ অধ্যাপক ও শিক্ষকদের মত বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যাঁরা সংগ্রামী বলে সেনাবাহিনী কর্তৃক যে কোন সময় নিন্দিত হতেন।

[বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা, পৃঃ ১৩৬]

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাত্রি থেকে সুদীর্ঘ ন' মাসব্যাপী বাংলা-দেশে পরিকল্পিত গণহত্যার তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায় ঃ

প্রথম পর্যায় ঃ প্রাথমিক সামরিক অভিযানে বেপরোয়া গোলাবর্ষণ ও নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ নিয়ন্ত্রিত অভিযানের মাধ্যমে সুপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ। (এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শহর ও গ্রামে অভিযান)।

তৃতীয় পর্যায়ঃ সুপরিকল্পিত উপায়ে তালিকা প্রস্তুতের মাধ্যমে বেছে বেছে হত্যা করা। (বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সমাজসেবী, ডাক্তার ও রাজনৈতিক নেতা ইত্যাদি)।

প্রথম পর্যায়ে সেনাবাহিনীর অভিযান, বেপরোয়া গুলীবর্ষণ এবং নির্বিচার গণহত্যার প্রধান ক্ষেত্র ছিল ঢাকা নগরী। সেনাবাহিনীর যুগপৎ হামলার পরিকল্পিত লক্ষ্যস্থলগুলো ছিল ঃ

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
(খ) রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার,
(গ) পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ বাহিনীর পিলখানাস্থ সদর দফতর,
(ঘ) পুরাতন ঢাকার বিভিন্ন এলাকা,
(ঙ) আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবরের ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন,
(চ) পূর্ব বাংলার নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী সমাজ।

প্রথমে ঢাকার কথাই ধরা যাক। ২৫শে মার্চ রাত দশটার কিছু পূর্বে সাঁজোয়া, গোলন্দাজ এবং পদাতিক বাহিনীর সমন্বয়ে তিন ব্যাটেলিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য অতর্কিতে হামলা চালানোর জন্য সেনানিবাস থেকে ঢাকা নগরীর অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে শুরু করে। রাত্রি বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে গোলাগুলী বর্ষণ শুরু হয়। সৈন্যদের গতি রোধ করার জন্য সে রাতে তাড়াহুড়ো ক'রে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড নির্মাণ করতে যাঁরাই এসেছিলেন, তাঁরাই নির্বিচারে গণহত্যার প্রথম শিকার হয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এম-২৪ ট্যাঙ্ক নিয়ে সেনাবাহিনীর একটি দল মধ্যরাতের পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল এবং কোয়ার্টারগুলোতে অতর্কিতে হামলা শুরু করে। সৈন্যরা ব্রিটিশ কাউন্সিল ভবন দখল ক'রে নেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য এটিকে ফায়ারবেজ হিসেবে ব্যবহার করে। ইকবাল হলের (বর্তমানে জহুরুল হক হল) ওপর সেনাবাহিনীর ক্রোধ ছিল সবচাইতে বেশী। কারণ, সরকার-বিরোধী ছাত্রদের প্রধান কেন্দ্র ছিল এই ছাত্রাবাসটি। বর্বর সৈন্যরা এই ছাত্রাবাসটির ওপর ভারী মর্টার নিক্ষেপ করে, মেশিনগানের গুলীতে ছাত্রদের কামরাগুলো ঝাঁঝরা ক'রে দেয় এবং ঘরে ঘরে ঢুকে ছাত্রদের নৃশংসভাবে হত্যা করে।

সৈন্যরা অনেক লাশ সরিয়ে ফেলে, কিন্তু ইকবাল হলের বারান্দাগুলোতে যত রক্ত ছড়িয়ে ছিল, তা' নিশ্চয়ই ৩০ জনের বেশী হবে।

[সাইমন ড্রিং, 'ডেইলী টেলিগ্রাফ', ৩০শে মার্চ, ১৯৭১]

নীলক্ষেত রেল লাইনের দু'ধারের বস্তীগুলোতে সৈন্যরা আগুন ধরিয়ে দেয়। বহু নরনারী এবং শিশু অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় এবং অসংখ্য ব্যক্তি মেসিনগানের গুলীতে হতাহত হয়।

জগন্নাথ হল

জগন্নাথ ছাত্রাবাসের হিন্দু ছাত্রদের ঘরে ঘরে তারা ঢুকে পড়ে। ছাত্র ও কর্মচারীদেরকে ধরে মাঠে টেনে নিয়ে এসে লাইন ক'রে দাঁড় করিয়ে মেসিনগানের গুলী চালিয়ে হত্যা করে। সৈন্যরা মৃতদেহগুলো তাড়াতাড়ি গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে মাটি সমান ক'রে দেয়।

[ঐ]

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যাযজ্ঞ

এই অতর্কিত আক্রমণ এবং নির্বিচার হত্যা শুধুমাত্র ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষকও পাকিস্তানী নরপশুদের হাত থেকে রেহাই পান নি। এই নরঘাতকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের ঘরে ঘরে ঢুকে তাঁদেরকে নিষ্ঠুরভাবে গুলী করে এবং বেয়নেটবিদ্ধ ক'রে হত্যা করে। ২৫শে ও ২৬শে মার্চে যাঁরা এই নির্বিচার হত্যার শিকার হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ফজলুর রহমান, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ এ. এন. এম. মুনিরুজ্জামান, ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল মুক্তাদির, অঙ্ক বিভাগের অধ্যাপক জনাব শরাফত আলী, পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এ. আর. খান খাদিম, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের শিক্ষক মোহাম্মদ সাদেক ও ডক্টর মুহম্মদ সাদত আলী এবং ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে নরপশুরা গুলীবিদ্ধ ক'রে রেখে যায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। সেনাবাহিনীর একটি দল রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টারে

সমস্ত পুলিশদের অতর্কিত আক্রমণ করে। ট্যাঙ্ক থেকে গোলা বর্ষণ, মর্টার শেল এবং মেসিনগানের গুলীতে বহু পুলিশ হতাহত হয়। রাজারবাগ হেড কোয়ার্টারে এগার শ' পুলিশ ছিল। তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক পুলিশ পালাতে সক্ষম হয়েছিল।

['ডেইলী টেলিগ্রাফ', ৩০শে মার্চ ১৯৭১]

ট্যাঙ্ক, বাজুকা এবং স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা পিলখানাস্থ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ বাহিনীর সদর দফতর আক্রমণ করেছিল। সৈন্যরা চারদিক থেকে রাইফেলস বাহিনীর সদর দফতরটি ঘিরে আক্রমণ চালিয়েছিল। রাইফেলস্ বাহিনীর অধিকাংশ বাঙালী পালাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। ২৬শে মার্চ ভোরবেলা সেনাবাহিনীর লোকেরা রাইফেলস্ বাহিনীর একদল লোককে ট্রাকে ক'রে নিয়ে যায়। তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল, তা' বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সৈন্যদের অবরুদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন ঢাকা নগরীর বুকে নির্বিচারে গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞের তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছিল, তখন ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সৈন্যরা শেখের সমর্থনে কেন্দ্র থেকে দশ মাইল দূরে শিল্প এলাকার দিকে চলে যাচ্ছিল।

সব চাইতে ভয়াবহ ধ্বংস-যজ্ঞ এবং বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল পুরানো ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ওপর। এই এলাকা গুলোর মধ্যে ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, নয়াবাজার, নাজিরা বাজার প্রভৃতি প্রধান। পুরনো শহরের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোর অধিকাংশ অধিবাসী ছিল শেখ মুজিবের সমর্থক। সৈন্যরা এই এলাকার ঘরবাড়িগুলো পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেয়। পুরনো শহরের বিভিন্ন এলাকার আঁকাবাঁকা অসংখ্য গলিতে প্রায় দশ লাখ লোকের বাস। ২৬শে মার্চ দুপুরবেলা সান্ধ্য আইন বিরতির সময় সৈন্যরা এই ঘনবসতিপূর্ণ গলিগুলোতে ঢুকে পড়ে। চারদিক থেকে তারা বাড়িগুলো ঘিরে ফেলে, আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সাথে সাথে শুরু করে অবিরাম গুলীবর্ষণ।

সৈন্যরা অসংখ্য ঘরবাড়ি পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। ওদের সাথে থাকতো গ্যাসোলিন ও পেট্রোলের টিন। বাড়িগুলোতে তারা পেট্রোল ছড়িয়ে দিতো, তারপর ছুঁড়ে দিতো ফ্লেম থ্রোয়ার। দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠতো। যারা আগুনের ব্যূহ ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসতো, মেশিনগানের

গুলীতে তারা লুটিয়ে পড়তো। যারা অসহায়ভাবে দাপাদাপি করতো, তারা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যেত। ['টাইম', ২রা মে, ১৯৭১]

ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ধ্বংস-যজ্ঞে এবং হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত সৈন্যরা ছিল আরো বেপরোয়া। তারা লোকজনকে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে এবং সোজাসুজি গুলী ক'রে তাদের হত্যা করে। অতঃপর তারা গোলাবর্ষণ ক'রে এলাকাটি ভূমিসাৎ ক'রে দেয়।

['ডেইলী টেলিগ্রাফ', প্রাগুক্ত]

ঢাকা নগরীর কেন্দ্রস্থলে রমনা রেসকোর্স ময়দানে অবস্থিত কালীবাড়ি নামে হিন্দুদের প্রাচীন ক্ষুদ্র মন্দিরটি ২৮শে মার্চ রাতে পাকিস্তানী নরপশুদের কবলিত হয়। তারা মন্দিরটি জ্বালিয়ে দেয়। মেশিনগানের গুলীতে সেখানকার হিন্দুদের হত্যা ক'রে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। শাঁখারী পট্টির অবস্থাও একই রূপ হয়েছিল।

এই নির্বিচার গণহত্যার শিকার শুধু বাঙালী হিন্দুরাই হন নি, ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান বাঙালী মুসলমানগণও পাকিস্তানী নরঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পান নি। শুক্রবারের নামাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন মুসল্লি নামাজ আদায় করা সান্ধ্য আইন মানার চেয়ে ফরজ মনে করে-ছিলেন। মসজিদে ঢুকেই তিনি সেনাবাহিনীর গুলীতে নিহত হন।

['টাইম', ৩রা মে, ১৯৭১]

'সানডে টাইম্‌স' পত্রিকার পাকিস্তানস্থ প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, পুরনো ঢাকার কয়েকটি এলাকা নিশ্চিহ্ন ক'রে দে'য়ার সময় যে শত শত মুসলমানকে পাকড়াও করা হয়েছিল, তাদেরও কোন চিহ্ন পরে মেলে নি। সৈন্যরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে গোলাগুলী বর্ষণ করে এবং এতে একটি মসজিদ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নয়াবাজার, রায়ের বাজার এবং বিভিন্ন বস্তীতে সৈন্যরা সান্ধ্য-আইন চলা কালে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে অতর্কিতে আক্রমণ করে। অগ্নিসংযোগ ক'রে বস্তীগুলো ধ্বংস করে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিগণ বলেন যে, মহাখালীর হাসপাতালের নিকটবর্তী বস্তীসমূহে ২৯শে মার্চ ভোরবেলা সৈন্যরা আগুন লাগিয়ে দেয় এবং পলায়নপর বস্তীবাসীদেরকে কুকুরের মত গুলী করে হত্যা করে। [বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫৩]

২রা এপ্রিল ৪০ জন সৈন্যের একটি দল বিদেশীদের আবাসিক এলাকা গুলশান সংলগ্ন বাড্ডা নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আক্রমণ করে। গ্রামের ছয় শত লোককে সৈন্যরা রাইফেলের নলের মুখে তাড়া করে। এদের মধ্যে ছিল ছাত্র, রাজনীতিবিদ এবং কর্মস্থল ত্যাগকারী বিভিন্ন লোক। সৈন্যরা পুরো একদিন রৌদ্রের মধ্যে তাদের ওপর নৃশংসতা চালায়। পরে তাদের পছন্দমত দশজনকে তারা ট্রাকে ক'রে অন্যত্র নিয়ে যায়।

বাড্ডা গ্রাম

২৫শে মার্চের রাতে সেনাবাহিনীর একটি দল নিউমার্কেটের নিকটবর্তী লেফটেন্যাণ্ট কম্যাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ীতে হানা দেয়। তিনি ছিলেন একজন বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী। এই হতভাগ্য কম্যাণ্ডারকে ঘর থেকে টেনে বের করা হয় এবং তাঁর ভীতাসন্ত্রস্তা স্ত্রীর সম্মুখে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ['বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা', পৃঃ ১৩৪]

২৫শে মার্চ রাত দেড়টায় সেনাবাহিনীর দু'টি জীপ ও কয়েকটি ট্রাক ৩২নং সড়কের বহির্ভাগে এসে থামলো। কয়েক মুহূর্ত পর পাক-সেনারা পঙ্গপালের মত বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর বাগানে সমবেত হ'ল। বাড়ীর ছাদ ও ওপরতলার জানালা লক্ষ্য ক'রে কয়েক রাউণ্ড গুলী ছোঁড়া হ'ল। সেনাবাহিনীর লোকেরা আক্রমণ করে নি, ভয় দেখাচ্ছিল মাত্র। তখন এই গোলমালের মধ্যে শেখ মুজিবকে তাঁর ওপরতলার শয়ন কক্ষ থেকে বলতে শোনা গেল, তোমরা অমন বর্বরের মত আচরণ করছ কেন? আমাকে তোমরা ডাকলেই তো তোমাদের কাছে নেমে আসতাম। পাজামার ওপর তামাটে লাল রঙের গাউন পরিহিত শেখ মুজিব সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন; সেখানে একজন তরুণ ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে ছিল। অফিসারটি ছিল বিনয়ী ও নম্রস্বভাবের। সে দৃঢ় ও নীরস কণ্ঠে বললো, আসুন স্যার। তারপর সবাই গাড়ীতে উঠে চলে গেল। [ঐ, পৃঃ ১৩১]

প্রথম পর্যায়ে সেনাবাহিনীর বেপরোয়া গোলাবর্ষণ এবং ধ্বংসযজ্ঞের লক্ষ্যস্থল হয়েছিল আওয়ামী লীগপন্থী ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি পিপল' এবং আওয়ামী লীগ দলের মুখপত্র 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার অফিস দু'টো। 'সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু হবার পর চার শ' লোক ইত্তেফাক

পত্রিকার অফিসে আশ্রয় নিয়েছিল। ২৬শে মার্চ শুক্রবার বিকাল চারটায় চারটি ট্যাঙ্ক রাস্তায় দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাড়ে চারটার দিকে অফিসটি নরককুণ্ডে পরিণত হয়। পরদিন শনিবার ভোরবেলা অফিসের পেছনের কামরাগুলোতে কতকগুলো ভস্মীভূত লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

['ডেইলী টেলিগ্রাফ', ৩০শে মার্চ, ১৯৭১]

ট্যাঙ্ক, মেসিনগান, ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেলে সজ্জিত সেনাবাহিনীর একটি দল আওয়ামী লীগ পত্রিকা 'দি পিপল'-এর অফিসে যায়। অফিসটি ছিল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ছাদে অবস্থানরত দলবদ্ধ ভীত বিদেশী সাংবাদিকদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে অবস্থিত। সেনাবাহিনীর লোকেরা সঙ্কীর্ণ গলিতে গুলী ছোঁড়ে। পত্রিকা অফিসের কর্মচারিগণ পালাতে চেষ্টা করলে তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। দালানে যা অবশিষ্ট ছিল তাতে গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এভাবেই সেনাবাহিনী একটি 'শত্রু' নিধনযজ্ঞ সমাপ্তি করে। [বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা, পৃঃ ১৩৩]

সুপরিকল্পিত গণহত্যার দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে পরিকল্পিত গণহত্যার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে নির্বিচারে গণহত্যা এবং ধ্বংস-যজ্ঞের দ্বারা সেনাবাহিনী লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় নি। সামরিক জান্তার নিকট আত্মসমর্পণের পরিবর্তে পূর্ব বাংলার সর্বত্র বাঙালীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ফলে সেনাবাহিনী আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শহর, বন্দর এবং অসংখ্য গ্রামের ওপর নিয়ন্ত্রিত অভিযান চালাতে শুরু করে। এই পর্যায়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা বিশ্ববাসীকে হতবাক ক'রে দেয়। মানব ইতিহাসের সকল কালের বর্বরতার নানা পদ্ধতি পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের নিষ্ঠুরতার কাছে ম্লান হয়ে যায়।

হত্যার বিচিত্র পদ্ধতি

পাকিস্তানী জেনোসাইড বা গণহত্যা বিশ্বের গণহত্যার ইতিহাসে একটি দিক থেকে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। হত্যার বিচিত্র পদ্ধতি বা Methods of killing উদ্ভাবনে তাদের বাহাদুরি স্বীকার করতে হয়। এমন বিচিত্র পদ্ধতিতে মানুষকে হত্যা করা, নির্যাতন করা বা ত্রাসের সৃষ্টি করা বোধ করি বিশ্বের কোন গণহত্যার দেখা

যায় না। প্রত্যেক সময়ে এই বর্বর নরপশুগণ নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, আর সেই পদ্ধতির নৃশংস প্রয়োগ করেছে। তারই কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবার লিপিবদ্ধ করা যাক।

বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণ

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাথমিক স্তরে বাঙালীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম পর্যুদস্ত ক'রে দেবার জন্য সেনাবাহিনী বোমারু বিমান, নৌযুদ্ধ-জাহাজ, গান-বোট এবং স্বয়ংক্রিয় সমরাস্ত্র ব্যবহার ক'রে এপ্রিলের প্রথম দিকে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর স্যাবর ও জেট জঙ্গী বিমানগুলো রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোহর, খুলনা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন এলাকায় বেপরোয়া বোমাবর্ষণ করে। চারটি স্যাবর জেট বিমান থেকে চুয়াডাঙ্গায় ব্যাপক বোমাবর্ষণ করা হয়।

['দি স্টেট্‌সম্যান', কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭১]

৬ই এপ্রিল কুমিল্লা জেলার লাকসাম-এর নিকটবর্তী জনাকীর্ণ 'নয়াবতী' বাজারটির ওপর পাকিস্তানী বিমানের হামলায় দুই শত বেসামরিক ব্যক্তি নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হয়। ভারতে আশ্রিত শরণার্থীরা জানায়, শহর-বন্দরে এবং গ্রামের জনবসতিপূর্ণ স্থানগুলোতে পাকিস্তানী বিমানগুলো নিরাপরাধ জনগণের ওপর অবিরাম বোমাবর্ষণ ক'রে। আশ্রয়স্থল ছেড়ে পলায়নপর বাঙালীদের খোঁজে বিমানগুলো উড়ে আসে এবং তাদের দেখা মাত্রই নীচে নেমে এসে বৃষ্টিধারার ন্যায় মেসিনগানের গুলীবর্ষণ করে।

[ঐ, ৭ই এপ্রিল, ১৯৭১]

কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া এবং ছোট ছোট বিভিন্ন শহরের ওপর নির্মমভাবে অবিরাম বোমাবর্ষণ করা হয়। ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমা শহরের চারদিকে বোমারু বিমানগুলো বোমাবর্ষণ ক'রে সাত শত গ্রামবাসীকে হত্যা করে।

[ঐ, ২১শে এপ্রিল, ১৯৭১]

এপ্রিল মাসে শহর, বন্দর এবং গ্রামগুলোর ওপর বেপরোয়া বোমাবর্ষণের সময় ব্যাপক হত্যা এবং ধ্বংস-যজ্ঞের জন্য বিমান বাহিনী নাপাম বোমা ব্যবহার করে। কুষ্টিয়া জেলার নূরনগর গ্রামের অধিবাসীদের ওপর নাপাম বোমা নিক্ষেপ করা হয়। সিলেট জেলার বেসামরিক লক্ষ্য-

স্থলগুলোর ওপর নাপাম বোমাবর্ষণ ক'রে বহু জীবন এবং বিপুল সম্পত্তি ধ্বংস ক'রে দে'য়া হয়। [ঐ, ১লা, ৪ঠা এবং ৯ই এপ্রিল, ১৯৭১]

সামরিক জান্তা বিমান বাহিনীকে শুধু জীবন ও সম্পদ ধ্বংসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখে নি, বাঙালীদের তীব্র খাদ্য সঙ্কটের সম্মুখীন করবার জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত-খামারে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক বোমাবর্ষণের নির্দেশও দিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিলে প্রকাশিত পি. টি. আই-এর এক রিপোর্টে বলা হয় যে, আগামী মৌসুমের খাদ্য উৎপাদন ধ্বংস ক'রে দে'য়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গী বিমানগুলো পূর্ব বাংলার ধান ও পাট ক্ষেতসমূহে রাসায়নিক বোমাবর্ষণ করছে। ব্যাপকভাবে রাসায়নিক বোমবর্ষণের ফলে বহু এলাকায় ধান ক্ষেতগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। ৫ই মে আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে স্বীকার করা হয় যে, চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রদত্ত আমেরিকার ট্যাঙ্ক ও জেটজঙ্গী বোমারু বিমানগুলো পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নির্মূল ক'রে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

[এ. পি. রিপোর্ট, স্টেটস্‌ম্যান, ৬ই মে, ১৯৭১]

দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে গণহত্যার শুরুতে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর নৌযুদ্ধ-জাহাজ থেকে ভারী গোলাবর্ষণ করা হয়েছিল। গানবোটগুলো থেকে মঙ্গলা ও চালনার খালসমূহ এবং বরিশালের মধুমতী নদীর উভয় তীরস্থ গ্রামগুলোর উপর গোলাবর্ষণ ক'রে ভস্মীভূত ক'রে দেয়া হয়েছিল।

['দি স্টেটস্‌ম্যান', ৮ই, ১৪ই, এবং ২৭শে এপ্রিল, ১৯৭১]

১৯৭১ সালের ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল খুলনার নিকটবর্তী এলাকাসমূহ এবং চালনা বন্দরের উপর গানবোট থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণের দৃশ্য জনৈক বিদেশী জাহাজের নাবিক প্রত্যক্ষ করেন। [ঐ, ৯ই এপ্রিল, ১৯৭১]

স্থলপথে নিয়ন্ত্রিত অভিযানগুলোতে পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতা এবং নিষ্ঠুরতা ছিল আরও ব্যাপক এবং ভয়াবহ। ইয়াহিয়ার নরঘাতক সৈন্যরা গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষেত্রে যে নজীর স্থাপন করেছে, কোন সভ্য দেশের সেনাবাহিনীর পক্ষে তা' সম্ভব হয়নি, এমনকি মানব ইতিহাসেও এরূপ নির্মম নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার নজীর নেই। পাক-সৈন্যরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

নিয়ন্ত্রিত অভিযানে বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা

নর-নারী ও শিশুকে নির্বিচারে বুলেট ও বেয়নেট বিদ্ধ করেছে এবং জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ ক'রে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। তারা নিয়ন্ত্রিত অভিযান চালিয়ে গ্রামগুলো ঘিরে ফেলতো, লোকদের তাড়িয়ে নিয়ে ধরতো এবং মেসিনগান এবং বেয়নেট বিদ্ধ ক'রে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করতো।

শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং গ্রামগুলোর চারিদিক থেকে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে সৈন্যরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, রাইফেলস্, পুলিশ বাহিনীর লোক, আওয়ামী লীগ কর্মী, সমর্থক এবং হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে বের ক'রে নৃশংসভাবে হত্যা করতো। বহু বিচিত্র পদ্ধতির মাধ্যমে বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের নিষ্ঠুরতা বিদেশীরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বহু বিদেশী পত্রিকায় এই লোমহর্ষক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১ সংখ্যায় উক্ত পত্রিকার প্রতিনিধি মার্টিন উলাকটের লিখিত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। উক্ত রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেছেন, ১১৯ জন বিদেশীকে নিয়ে ৫ই এপ্রিল 'ক্লান ম্যাকনেয়ার' নামে একটি বিদেশী জাহাজ চট্টগ্রাম থেকে কোলকাতায় আসে। কোলকাতায় পৌঁছে জনৈক ইঞ্জিনীয়ার জানান যে, পাকিস্তানী সৈন্যদের দু'জন বাঙালীকে ধরে ট্রাকের পিছনে টেলবোর্ডে তাদের পা দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে তিনি দেখেছেন। তিনি জানান, কয়েকজন বাঙালীর দ্বারা পাক-সৈন্যদের স্তূপ ক'রে রাখা পাঁচটা মৃতদেহের জন্য তারা কবর খুড়িয়ে নিচ্ছিল। তারা নিজেদের কবর খুড়ছিল বলেও তাঁর মনে হয়েছিল। অপর একজন বিদেশী শরণার্থী জানান যে, সৈন্যদের ট্রাকগুলো এসে বাঙালীদের সামনে থেমে পড়ে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে গুলীবর্ষণ করে এবং সাথে সাথে এই হতভাগ্য মানুষগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বহু লোককে লোহার হেলমেট দিয়ে আঘাত ক'রে ট্রাকে তুলে নে'য়া হয়। অপর একজন বিদেশী শরণার্থী জানান যে, জাহাজে ওঠার সময় তিনি আগুনে ভস্মীভূত শত শত ঘরবাড়ি দেখেছেন।

জীবন্ত মানুষকে মাটি চাপা দিয়ে হত্যার দৃষ্টান্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগেও ছিল। বিশ শতকে বাংলাদেশে এই ধরনের বর্বরতা ছিল আরো ভয়াবহ।

জীবন্ত কবর

শহর এবং গ্রাম থেকে তাড়িয়ে ধরা কিংবা নির্বিচারে বুলেট ও বেয়নেট-বিদ্ধ ক'রে নিহত বাঙালীদেরকে সৈন্যরা একই গর্তে মাটি চাপা দিত। জীবন্ত বাঙালীদের মাটি চাপা দিয়ে হত্যার

সময় তাদের চীৎকার, কান্না, মিনতি দেখে তারা আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করতো। সৌভাগ্যক্রমে জীবন্ত কবরস্থ হবার পর প্রাণ নিয়ে উঠে আসতে যারা সক্ষম হয়েছেন, চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার উত্তর গোপালখাট্টা গ্রামের অধিবাসী মোহাম্মদ ছয়ফুল হক ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

['বাংলাদেশে গণহত্যা', ফজলুর রহমান, মুক্তধারা, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ২৯]

আতুড় ঘরে সন্তানের মুখে লবণ দিয়ে মেরে ফেলার জনশ্রুতি আমরা শুনে থাকি। কিন্তু বর্বর সৈন্যরা বলিষ্ঠ যুবকদের ধরে এনে শুধু লবণ খাইয়ে হত্যার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। [ঐ, পৃঃ ২৮]

সিংহের খাঁচায় মানুষ পুরে, ষাঁড়ে-মানুষে এবং পুকুরের জলে কুমীরের সাথে মানুষের লড়াই বাধিয়ে দিয়ে মধ্যযুগের সামন্ত ভূস্বামীরা আনন্দ উপভোগ করতো। বিংশ শতাব্দীতেও এই বিভীষিকাময় স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্র সিরাজদ্দৌলা ও ঠাকুরগাঁ মহকুমার বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী শফিকুল আলম চৌধুরী। বর্বর সৈন্যরা তাঁদেরকে ঠাকুরগাঁতে দু'টি বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু বাঘ দু'টো তাঁদেরকে হত্যা না ক'রে কেবল আঁচড়ে কামড়ে দেয়। কারণ বাঘ দু'টোর মানুষ খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েছিল। [ঐ, পৃঃ ২৮]

বাঘের খাঁচায় বাঙালী

এমনকি বাংলার শকুনগুলো বেশী খাওয়ায় উড়তে না পেরে নদীগুলোর তীরে তীরে ভয়াবহ তৃপ্তিতে বসে আছে। মার্চ মাস থেকে পাঁচ লক্ষেরও বেশী নিহত বাঙালীকে তারা খাদ্য হিসেবে পেয়েছে।

['দি স্টেটস্‌ম্যান', ১৩ই মে, ১৯৭১]

এদিকে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে বর্বর সৈন্যরা প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০০ বাঙালী যুবককে সেনানিবাসে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের দেহ থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বার ক'রে বেয়নেটবিদ্ধ ক'রে হত্যা করতো এবং বুড়ীগঙ্গা নদীতে মৃতদেহগুলো ভাসিয়ে দিতো। কখনো পিছনে হাত-পা বাঁধা যুবকদের মৃতদেহগুলো বুড়ীগঙ্গায় ভেসে যেতে দেখা গেছে। ঢাকায় অবস্থানরত কূটনৈতিক মহলের অনেকেই এই মর্মান্তিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ

শরীর থেকে রক্ত শোষণ ক'রে হত্যা

করেছেন। বাঙালীদের দেহ থেকে রক্ত বার ক'রে নেবার পদ্ধতি বাংলাদেশের সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণে বর্বর সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা যতই বাড়ছিল, সেনাবাহিনী ততই নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে রক্তশোষণ তৎপরতা চালিয়েছিল।

[পূর্বোক্ত, ১২ই জুন, ১৯৭১]

অন্য একটি বিবরণে প্রকাশ, নরঘাতক সৈন্যরা প্রায় দু' হাজার পুরুষকে তাদের স্ত্রী-পুত্রদের কাছ থেকে ধরে নিয়ে আসে। তাদের উপর মেসিনগানের গুলীবৃষ্টির ফলে ৮০০ লোক মারা যায়। যারা বেঁচে যায় তারা মৃতের ভান ক'রে পড়ে ছিল এবং ভেবেছিল যে, সৈন্যরা তাদের ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু সেনাবাহিনী বাচ্চাদের খেলাঘরের মত মৃত ও জীবিত সবাইকে একত্র ক'রে তাদের উপর পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভাগ্যক্রমে তখন সন্ধ্যা হওয়ায় কিছু লোক জ্বলন্ত শরীর নিয়েই জঙ্গলে দৌড়ে পালায়।

মৃত ও জীবিতদের জড়ো ক'রে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে হত্যা

['দি আইরিশ টাইমস', ৭ই জুন, ১৯৭১]

সুনিয়ন্ত্রিত অভিযানের মাধ্যমে ধৃত ছাত্রদের ওপর সৈন্যরা অমানুষিক নির্যাতন চালাতো এবং হত্যা করতো। বগুড়া কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ফারুকের সারা শরীরে গরম লোহার সিক লাগিয়ে চামড়া উঠিয়ে নে'য়া হয়, ফলে তাঁর শরীরে দগদগে ঘা হয়, চামড়া পচে গিয়ে পোকা ধরে; সমস্ত শরীর বিকট দুর্গন্ধে ভরে যায়। ফারুক সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যায়। এই অবস্থায় সৈন্যরা একদিন তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যায়। তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

শরীর থেকে চামড়া তুলে এবং পুড়িয়ে হত্যা

[ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩]

হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর ঢাকা নগরীতে যতগুলো বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তন্মধ্যে অবাঙালী অধ্যুষিত মীরপুরের শিয়ালবাড়ী এলাকার বধ্যভূমি ছিল সবচাইতে বৃহৎ বধ্যভূমি। পশ্চিম পাকিস্তানী নরপশুদের সহায়ক বিহারী, রাজাকার, আল-বদর বাহিনী এবং জামাতে ইসলামীর কুখ্যাত লোকেরা এই বধ্যভূমিতে বাঙালী নিধনযজ্ঞে

শ্বাসনালী কেটে হত্যা

প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছিল। বাঙালী যুবকদের তারা ধরে নিয়ে যেত এবং উক্ত বধ্যভূমিতে জড়ো ক'রে অর্ধেক গলা কেটে ছেড়ে দিত। শ্বাসনালী কাটা যুবকরা রক্তাক্ত অবস্থায় দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতো ও চৈতন্য হারিয়ে ঢলে পড়তো। তাদের গলা থেকে ঘরঘর শব্দ হ'ত। নরপশুরা তখন পৈশাচিক উল্লাসে ও হাসিতে ফেটে পড়তো।

[ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২, ২৭, ২৮]

বাংলাদেশের সর্বত্র এই নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কোন কোন স্থানে একদল ধৃত বাঙালীকে অপর আরেক দল বাঙালীর সামনে বড় বড় ছুরি দিয়ে জবাই করা হ'ত। এই নির্মম প্রক্রিয়ায় হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষকারী কিছুসংখ্যক ধৃত বাঙালীকে ছেড়ে দে'য়া হ'ত। ফলে সৈন্যদের এই নৃশংসতার খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো এবং সেনাবাহিনীর নামে সর্বত্র আতঙ্কের সৃষ্টি হ'ত। এটি ছিল পাষণ্ডদের একটি নিষ্ঠুর পদ্ধতি, যার মাধ্যমে তারা জানিয়ে দিত যে, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কিংবা পাকিস্তান-বিরোধী কাজ করলে সেই সব ব্যক্তির এই হ'ল প্রাপ্য শাস্তি।

বর্বর পাক-সেনারা দীর্ঘ ন' মাসব্যাপী বহু বাঙালী সৈনিকের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা সেনাবাহিনীর হাতে আটক ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে ভয়াবহ নির্যাতনের বিবরণ জানা যায়। বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জি. এইচ. মীর্জাকে সামরিক জান্তার দল ১০ই মে (১৯৭১) গ্রেফতার করে। সৈন্যরা তাঁর ইউনিফরম কেড়ে নেয়। বৈদ্যুতিক চাবুক দিয়ে প্রহার করে, হান্টার, ক্রিকেট স্ট্যাম্প, লোহার রড, মোটা দড়ি ও ধারালো ছুরি সামনে এনে এগুলো তারই জন্য আনা হয়েছে বলে জানায়। তিনি যা করেছেন, দেখেছেন, শুনেছেন, ভেবেছেন, এবং সহকর্মীদের সম্পর্কে যা জানেন তা' লিখে দেবার জন্য নির্দেশ দে'য়া হয়। তাঁকে বাধ্য করার জন্য পার্শ্ববর্তী দরজা খুলে জনৈক উলঙ্গ হতভাগ্য বাঙালীকে লোহার রড দিয়ে পেটানো অবস্থায় দেখানো হয়। প্রতিটি আঘাতে লোকটি প্রাণফাটা চীৎকার করছিল। তার মাথা কেটে গিয়েছিল, মুখ দিয়ে ফেনা উঠছিল এবং এক সময় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মীর্জাকে জানানো হয়,

বাঙালী মুক্তি-পাগল সৈন্যদের ওপর নির্যাতন

তাদের কথা না শুনলে তাঁরও একই পরিণতি ঘটবে। লেঃ মীর্জা দেখতে পান বাঙালী সৈনিকদের তারা মারধোর ছাড়াও বুটের লাথি মারতো, জ্বলন্ত সিগারেট শরীরে চেপে ধরতো, চাবুক মেরে সমস্ত শরীর রক্তাক্ত ক'রে দিত। তিনি দেখতে পান, স্কোয়াড্রন লীডার হাবীবুর রহমানকে সৈন্যরা চোখ বেঁধে হাত পিঠমোড়া ক'রে বসিয়ে রাখতে। সৈন্যদের যারাই সেস্থান দিয়ে যাওয়া-আসা করতো, তারাই জ্বলন্ত সিগারেট তাঁর মাথায় চেপে ধরতো। এভাবে সারাদিন ধরে তারা তাঁকে এ্যাসট্রে হিসেবে ব্যবহার করতো।

ফ্লাইট সার্জেন্ট টি. আহমদ সহ বিমান বাহিনীর আরো ছয়জন অফিসার সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছিলেন। ১৯শে এপ্রিল রাতে উক্ত ছয়জন অফিসারকে সৈন্যরা পাশের কামরায় নিয়ে সমস্ত কাপড় খুলে নিয়ে চোখ বেঁধে হাত পিঠমোড়া ক'রে দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর বেয়নেট বিদ্ধ ক'রে তাঁদের হত্যা করে। আরো ভয়াবহ এবং বীভৎসভাবে বন্দীদের ওপর চলতো নির্মম নির্যাতন। বন্দী সৈন্যদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে গরম সিক চেপে ধরা হ'ত। মাংস পুড়ে ঝল্‌সে হাড় বেরিয়ে আসতো। ধারালো চাকু দিয়ে মাংস কেটে নিয়ে মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দে'য়া হ'ত। সাঁড়াসী দিয়ে শরীরের চামড়া ছিঁড়ে ফেলে তারপর পায়ে দড়ি বেঁধে টাঙিয়ে চাব্‌কাতে চাব্‌কাতে রক্তাক্ত ক'রে ফেলা হ'ত সমস্ত শরীর।

হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে যখন মুক্তিযোদ্ধারা ধরা পড়তো, উল্লেখিত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও আরো নজীরহীন নিষ্ঠুরতা তাদের উপর বর্বর সৈন্যরা চালিয়ে যেত।

গণহত্যার জন্য হানাদার বাহিনীর আরেকটি পদ্ধতি ছিল গেস্টাপো উপায়ে বাঙালীদের অপহরণ। সন্দেহভাজন বাঙালীদের তারা প্রকাশ্যভাবে গ্রেফতার করতো এবং ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ী ও অস্থায়ী ঘাঁটিগুলোতে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করতো। এই পদ্ধতিতে হত্যাকাণ্ডের সহায়ক ছিল রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস্ এবং অবাঙালী (বিহারী) মুসলমানগণ। উল্লেখিত ধর্মান্ধ বিশ্বাসঘাতকরা বাঙালীদের দুষ্কৃতিকারী হিসেবে সনাক্ত ক'রে সেনাবাহিনীর নিকট ধরিয়ে দিত কিংবা

গেস্টাপো পদ্ধতিতে হত্যা

নিজেরাই অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়ে বাঙালীদেরকে সৈন্যদের ছাউনীতে নিয়ে যেত। গ্রেফতারকৃত বাঙালীরা আর ফিরে আসতো না। রাজাকাররা ছিল সামরিক জান্তার সৃষ্ট অশিক্ষিত এবং অমার্জিত লোকদের একটি দল। হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংস-যজ্ঞের ক্ষেত্রে তারা ছিল বর্বর সৈন্যদের সহায়ক বাহিনী। এ ছাড়া অর্থের প্রলোভনে বহু বাঙালী যুবতীকে ধরে ধরে তারা উচ্চপদস্থ অফিসারদের ঘাঁটিতে সরবরাহ করেছে। বহু ঘরবাড়ি থেকে মূল্যবান সামগ্রী তারা লুট করেছে।

রাজাকার

ধর্মান্ধ তরুণদের নিয়ে আল-বদর এবং আল-শামস্ নামে অপর দু'টো দলও গঠিত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল ইসলামী ছাত্রসংঘের বা প্রাক্তন এন. এস. এফ-এর সদস্য। সামরিক জান্তা কর্তৃক তালিকা প্রস্তুতের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আল-বদর নামে ধর্মান্ধ এই তরুণ দলটি সেনাবাহিনীর সহায়তা করে। ঢাকাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র অস্ত্র উঁচিয়ে তারা বহু বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে যায়। বহু বধ্যভূমিতে বুদ্ধিজীবীদের লাশ পাওয়া গেছে। প্রথম পর্যায়ে নির্বিচারে বাঙালী হত্যাই ছিল পাকিস্তানী সৈন্যদের অন্ধ উন্মাদনা। দ্বিতীয় পর্যায়ের নিয়ন্ত্রিত অভিযানে সৈন্যরা বিশেষ ক'রে বাঙালী হিন্দু নিধন-যজ্ঞে লিপ্ত হয়। প্রতিটি অভিযানে সৈন্যরা হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে বের করতো এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতো। অগ্নিসংযোগে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিত; মূল্যবান সামগ্রী লুট ক'রে নিয়ে যেত। কখনও কখনও হিন্দুদের সম্পত্তি ও সম্পদ লুট করার জন্য বাঙালী মুসলমানদের প্ররোচিত করতো। হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাসস্থান ও সম্পত্তি অবাঙালী মুসলমান এবং বিশ্বাসঘাতক বাঙালীদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেবার জন্য শান্তি কমিটিকে ঢালাও সুযোগ তারা দিয়েছিল। হিন্দুদেরকে নির্বিচারে হত্যা এবং ভীত-সন্ত্রস্ত ক'রে ভারতে ঠেলে দেবার পেছনে ছিল সামরিক জান্তার পরিকল্পিত রাজনৈতিক চক্রান্ত। এ চক্রান্তের পেছনে দু'টো উদ্দেশ্য ছিল। (এক) অসংখ্য হিন্দুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা এবং বিপুলসংখ্যক হিন্দুকে ভারতে ঠেলে দিয়ে সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হোক, এটা তারা কামনা করেছিল; (দুই) লক্ষ লক্ষ বাঙালী হিন্দু

আল-বদর ও আল-শামস্

লুণ্ঠন ও ধ্বংস-যজ্ঞ

হিন্দু হত্যা ও বিতাড়নের লক্ষ্য

ও মুসলমানকে ভারতে ঠেলে দিয়ে ভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত ক'রে দে'য়া তাদের অপর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সামরিক জান্তার সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় নি। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় নি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালী শরণার্থীকে ভারতীয় জনগণ সাহায্য করেছেন। ভারত সরকার শরণার্থীদের জন্য সাধ্যমত সবকিছুই করেছেন। পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যদের হাত থেকে বাংলাদেশের খ্রীস্টান এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকগণও রেহাই পান নি। সৈন্যরা ঢাকার নিকটবর্তী নুদাবিশা নলছাটা এবং লরিপাড়া এই তিনটি খ্রীস্টান অধ্যুষিত গ্রাম ধ্বংস ক'রে দেয়। তিন থেকে চার হাজার খ্রীস্টান গৃহহারা হয় এবং কয়েক শত খ্রীস্টানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সৈন্যরা ধরে নিয়ে যায়।

['সানডে টেলিগ্রাফ', লণ্ডন, ১লা আগস্ট, ১৯৭১]

হিন্দু ভেবে পাকিস্তানী সৈন্যরা বরিশাল জেলার পাদ্রী-শিবপুর গ্রামের বাঙালী খ্রীস্টানদের নির্বিচারে হত্যা করে। পরে তারা ব্যাপারটি বুঝতে পারে। অতঃপর পাক-বাহিনীর স্থানীয় কম্যাণ্ডার খ্রীস্টানদের গলায় ক্রুস ঝুলিয়ে চলাফেরার নির্দেশ দেয়। ঢাকার রাজপথে ক্রুস ঝুলানো পথচারীদের চলাফেরা করতে দেখা গেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়।

[আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, 'প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে বাংলাদেশ', সোমেনপাল সম্পাদিত, পৃঃ ৩৩]

খ্রীস্টানদের ওপর নির্যাতন ও হত্যা

২৪শে এপ্রিল দিনাজপুর জেলার রুহিয়া মিশনের পুরোহিত ফাদার লুকাস মারাণ্ডি পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যদের গুলীতে নিহত হন। ঐ দিন সৈন্যরা ফাদার লুকাস মারাণ্ডির রুহিয়াস্থ মিশন বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং তাঁকে গুলীবিদ্ধ ক'রে চলে যায়।

[ঐ, পৃঃ ২৩]

রংপুর শ্মশানঘাটে যে বারজন বাঙালী সেনাবাহিনীর ফায়ারিং স্কোয়াডের শিকার হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন ক্ষিতীশ হালদার নামে জনৈক বাঙালী খৃস্টান। ২৩শে এপ্রিল বর্বর সৈন্যরা মেহেরপুরের একটি খ্রীস্টান মিশনারী হাসপাতালে আগুন ধরিয়ে দেয়।

['দি স্টেট্সম্যান', ২০শে ও ২৬শে এপ্রিল, ১৯৭১]

হানাদাররা চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকার বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে এবং হত্যা করে। সৈন্যরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠগুলো

ধ্বংস ক'রে দেয়। চৌমুহনীর পাহাড়তলী গ্রামের একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ বর্বর সৈন্যরা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত ক'রে দেয় এবং মঠের মূল্যবান ও পবিত্র সামগ্রী লুঠ ক'রে নিয়ে যায়।

সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিঃ ধর্মভীরু (Dharma Viryu) পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বৌদ্ধ হত্যার মারাত্মক অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, সামরিক জান্তার নিষ্ঠুর কার্যকলাপ সমর্থন ক'রে পাকিস্তানী বৌদ্ধ সমিতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ সমিতিতে প্রতিনিধিদল পাঠাতে অস্বীকার করলে তাদের উপর নির্মম নির্যাতন নেমে আসে।

বৌদ্ধ-দলন ও হত্যা

সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে তিনি নিম্নলিখিত অভিযোগগুলো আনেন ঃ

(ক) বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃসংঘের পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডি. পি. বড়ুয়া এবং তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সৈন্যরা হত্যা করেছে।

(খ) সৈন্যরা চট্টগ্রামের সাতপারিয়া বৌদ্ধ মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করেছে এবং একটি বুদ্ধ মূর্তিসহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুঠ করেছে।

(গ) একশ' বছরের বৃদ্ধ পাকিস্তান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান Abayatissa Mahathero সৈন্যদের দ্বারা নির্মমভাবে প্রহৃত হয়েছেন।

['দি স্টেট্‌স্‌ম্যান', ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৭১]

ঢাকা শহরতলীর কমলাপুর বৌদ্ধ মঠের ভিক্ষুরা গলায় কাগজ ঝুলিয়ে রাখতো। উর্দু ভাষায় কাগজে লেখা থাকতো ঃ 'আমি বৌদ্ধ—হিন্দু নই, দয়া ক'রে আমাকে হত্যা করবেন না'। এপ্রিল এবং মে মাসের দিকে নাম পরিবর্তনের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল।

'পাকিস্তান অবজারভার'-এ প্রকাশিত এমনি একটি বিজ্ঞাপন ঃ আমার নাম অঞ্জলি দাস নয় 'এঞ্জেলিক ডায়াস' এবং আমি হিন্দু নই, দেশী খ্রীস্টান।

[আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪]

বাংলাদেশে অসংখ্য নিষ্পাপ শিশুও বর্বর বাহিনীর রোষানল থেকে রেহাই পায় নি। 'নিউজ উইক' পত্রিকার সাংবাদিক টনি ক্লিফটন গুলী ক'রে

হত্যা করা হয়েছে এমন বহু শিশুকে দেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন। বহু শিশুকে নির্দয়ভাবে প্রহার ক'রে পিঠ রক্তাক্ত ক'রে দে'য়া হয়েছে। নরপশুরা অতর্কিতে হানা দিয়ে শিশুদের ধরে তাদের মা-বাবার সামনে শূন্যে ছুঁড়ে মেরে নীচে বেয়নেট ধরে গেঁথে ফেলতো। ধারালো ছুরি দিয়ে কসাইরা যেমন মাংস টুকরো টুকরো করে, সৈন্যরা তেমনি শিশুদেরকে টুকরো টুকরে ক'রে ফেলতো। তারা শিশুদের দু'পা ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলতো এবং নির্মমভাবে আছড়ে মারতো।

নির্মম পদ্ধতিতে শিশুদের নির্যাতন ও হত্যা

কুমিল্লা শহরে স্বামী-স্ত্রী এবং দুই শিশুপুত্র নিয়ে ছিল একটি ছোট্ট সংসার। একদিন নর-পশুরা বেয়নেট উঁচিয়ে তাদের সামনে আসে। নিষ্পাপ শিশু দু'টোর দু'পা ধরে মা-বাবার সামনে তারা দু'ভাগ ক'রে ফেলে। এই ভয়াবহ নিষ্ঠুরতায় মহিলাটি সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন। স্বামী বেচারা জীবন্মৃত অবস্থায় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন খণ্ডিত সন্তানদের প্রতি।

[ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪]

সৈন্যরা শিশুদের হত্যা করছে কেন? জনৈক ব্রিটিশ মহিলা পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একজন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে জানান, শিশুদের অনাথ ক'রে রাখলে তারা বড় হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী হবে। তাই তাদের হত্যা করলে তারা প্রতিশোধ নিতে পারবে না।

[আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২]

নারী ধর্ষণ ও হত্যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে নতুন নয়; কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক জান্তার পশু-সৈন্যদের নারী ধর্ষণ ও হত্যার লীলা মানব সভ্যতার সকল যুগের নজীরকে ম্লান ক'রে দিয়েছে। পশু-সৈন্যরা বাংলাদেশের সাত বছরের কিশোরী থেকে সত্তুর বছরের বৃদ্ধা নারীকেও ধর্ষণ করেছে। অসংখ্য বাঙালী নারীকে ধর্ষণের মাধ্যমে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিতা ছাত্রী থেকে শুরু ক'রে দিনমজুরের স্ত্রী ও মেয়েরা সৈন্যদের পাশবিক ক্ষুধার শিকার হয়েছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলাদেশে নারী ধর্ষণের লোমহর্ষক কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতায় সারা বিশ্বের মানুষ দারুণ ঘৃণা প্রকাশ করেছে এবং কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছে।

নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা

১৯৭১ সালের ৫রা এপ্রিল বিকেলবেলা পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রী আবাস রোকেয়া হলে ঢুকে পড়ে। তারা মেয়েদের টেনে বের করে, মারধোর করে, পরনের শাড়ী, স্কার্ট, সালওয়ার টেনে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মেয়েরা হাত দিয়ে তাদের লজ্জা ঢাকতে চাইলে নর-পশুরা তাঁদের গোপনাঙ্গে ভারী বুটের লাথি মারে, বেয়নেট দিয়ে আঘাত করে এবং জোর-পূর্বক ধর্ষণ করে। নর-পশুদের ক্রমাগত পাশবিক অত্যাচারে ধর্ষিতা মেয়েরা জ্ঞান হারায়। বর্বর সৈন্যদের কাছে লাঞ্ছিতা হবার পূর্বেই বহু ছাত্রী হলের উপর তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। রোকেয়া হলে ছাত্রীদের দেখতে এসে একটি বারো বছরের কিশোরী মেয়ে জনৈক পশু-সৈন্যের কবলিত হয়। সৈন্যটি তার উপর উপগত হয়। চীৎকার করেই মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে যায়। পাশবিক অত্যাচার চালানোর পর সৈন্যটি তার গোপনাঙ্গে বুটের লাথি মারে। কিন্তু মেয়েটি আগেই মারা যায়। ঢাকা ত্যাগ কারী এ. স্যাণ্ডার্স নামে জনৈক ব্রিটিশ ব্যবসায়ী তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত এই প্রত্যক্ষ বিবরণ বোম্বের 'ব্লিৎস' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন।

['ব্লিৎস', ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১]

লণ্ডনস্থ বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক জনাব আজিজুল হক ভূঁইয়া 'রেপ্ এ্যাট রোকেয়া হল' নামে একখানা স্মারক-লিপি বের করেন। স্মারকলিপিটি নিয়ে পড়তে শুরু করেই একজন ব্রিটিশ মহিলা চীৎকার ক'রে বলতে থাকেন, "না, না, আমি আর পড়তে পারছি না। একি সত্য যে, কেউ এ অত্যাচার বন্ধ করতে পারে না। হায় প্রভু! এ যে নাৎসীদের চেয়েও ঘৃণ্য।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-সহায়ক-সমিতি 'বাংলাদেশ থ্রু ইট্স লেন্স' নামে একখানা আলোকচিত্র সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করেন। স্বামী সোহাগিনী জোহরা নাম্নী এক নারীকে পশু-সৈন্যরা একদিন অতর্কিতে ধরে নিয়ে যায়। বর্বর সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচারে জোহরা মারা যায়। নর-পশুরা তার নিঃস্পন্দিত দেহকে জঙ্গলের পাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। শিয়াল-কুকুর তার দেহ ভক্ষণ ক'রে। 'বাংলাদেশ থ্রু ইট্স লেন্স'-এ জোহরা

পুত্রের সম্মুখে মায়ের উপর, পিতার সম্মুখে কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার

নাম্নী এই নারীর মর্মস্পর্শী ছবি দেখানো হয়েছে। 'নিউজ উইক' পত্রিকার সাংবাদিক টনি ক্লিফটনের লিখিত একটি বিবরণ ২৮শে জুন প্রকাশিত হয়। তিনি জানান, বর্বর সৈন্যরা ছেলেমেয়েদেরকে তাদের মা-বাবার সামনে হত্যা করেছে, মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। এই নৃশংস ও বর্বরতার দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বহু লোক বোবা হয়ে গেছে। এ-প্রসঙ্গে রাজশাহী জেলার গৌরীপুর গ্রামের একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা আমি (লেখক) ভুলতে পারি না। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে একদিন সৈন্যরা অতর্কিতে গ্রামটি ঘিরে ফেলে। একজন বাঙালী মহিলাকে তার দুই যুবক ছেলের সামনেই তারা পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করে। এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে যুবকদ্বয়ের একজন আত্মহত্যা করে, অপর যুবকটি পাগল হয়ে যায়। বাংলাদেশের শহরে, বন্দরে, গ্রামে সর্বত্র এমন ঘটনা ঘটেছে। পুত্রের সম্মুখে মায়ের, পিতার সম্মুখে কন্যার, ভাইয়ের সম্মুখে বোনের, এবং স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীর ওপর বলাৎকার করা হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে একই নারীর ওপর অনেক সৈন্যের বলাৎকারের মাধ্যমে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এমন নিদারুণ ঘটনার বর্ণনা দিতেও হৃদয় কম্পিত হয়।

নরপশুরা মেয়েদেরকে বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে নিয়ে যেতো এবং শহরে বা গ্রামে স্থায়ী ও অস্থায়ী ছাউনি বা ঘাঁটিগুলোতে তাদের ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধা মেটানোর জন্য এদেরকে রেখে দিত। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ও পরিখাগুলোতে মেয়েদের আটক রেখে প্রতিদিন এই বর্বরগুলো তাদের পাশবিক ক্ষুধা মিটিয়েছে। মিত্র এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী সৈন্যরা পালাতে শুরু করলে তাদের অবস্থানগুলোর মধ্যে শত শত মৃত, জীবন্মৃত ও জীবিত নারীকে পাওয়া গেছে। এইসব হত-ভাগিনী নারীদের বিবরণ থেকে জানা যায়, সৈন্যরা তাদের শুকনো রুটি খেতে দিতো। পিপাসায় পানির জন্য চিৎকার করলে তারা তাদের মুখ তুলে প্রস্রাব ক'রে দিতো। বর্বর সৈন্য ধৃত বাঙালী নারীদের উলঙ্গ অবস্থায় রাখতো, তাদের চিবুক, ঠোঁট, বুক কামড়ে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করতো। কখনও মহিলাদের স্তন কেটে দিতো। অসহ্য যন্ত্রণায় তারা কঁকিয়ে উঠলে পশুরা পৈশাচিক হাসিতে ফেটে পড়তো। হতভাগিনী মহিলারা দুর্বল হয়ে পড়তো এবং পশুদের পাশবিক ক্ষুধা মেটাতে অস্বীকার বা প্রতিবাদ করলে

তীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত বেয়নেটের খোঁচা, চাবুকের আঘাত এবং জ্বলন্ত সিগারেটের তীব্র জ্বালা সহ্য করতে হ'ত। গর্ভধারিণী মহিলারাও বর্বর সৈন্যদের নিকট থেকে রক্ষা পায় নি। তাদের ওপরও সৈন্যরা পাশবিক অত্যাচার চালাতো। নরপশুরা বেয়নেট দিয়ে গর্ভবতী মহিলাদের তলপেট দু'ভাগ ক'রে কেটে ফেলতো এবং গর্ভস্থ সন্তান বের ক'রে মুমূর্ষ মায়েদের চোখের সামনে তুলে ধরতো। কখনও কখনও মহিলাদের দু'হাত উপরে তুলে বেঁধে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ঝুলিয়ে রেখে চামড়ায় মোড়ানো চার ইঞ্চি পুরু ও প্রায় এক হাত লম্বা শক্ত দণ্ড তৈলপাত্রে ভিজিয়ে নিয়ে তাদের গুপ্ত অঙ্গে আমূল বিদ্ধ ক'রে দিয়ে হত্যা করেছে। ধৃত বাঙালী মহিলাদের স্তন কেটে দেবার কথা আমি উল্লেখ করেছি। পশুরা তাতেও সন্তুষ্ট হয় নি। তারা মহিলাদের স্তন কেটে নিয়ে তা' দিয়ে বল খেলতো। পাশবিক ক্ষুধা মেটাবার পর যাতে মহিলারা প্রস্রাব করতে না পারে সেজন্য তাদের লজ্জাস্থান বেঁধে রাখা হ'ত। উলঙ্গ মহিলাদেরকে পুরুষ বন্দীদের সামনে আনা হ'ত এবং মহিলাদের অনেকেরই মা-বাবা ও স্বামী বন্দী পুরুষদের মধ্যে থাকতেন। নরপশুরা তাঁদের সামনেই তাদের মেয়ে, বোন এবং স্ত্রীদের মুখে কামড় দিয়ে বলতো: "আগার জরুরত হ্যায় তো একঠো লে যাও।"

গর্ভবতী মহিলার ওপর নৃশংস অত্যাচার

নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক পদ্ধতিতে নারী নির্যাতন

[ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬, ৪৪]

বাঙালীদের জাতীয়-চেতনাকে ধ্বংস করতে শাসকগোষ্ঠীর জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা বিষয়ান্তরে উল্লেখ করেছি। এ কথাও বলেছি যে, এদেশের বুদ্ধিজীবীরা বার বার পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন বলে তাঁদের অনেকেই এদের রোষানলে পতিত হন। তাঁদের প্রতি শাসকগোষ্ঠী বহুদিন থেকেই আক্রোশ পোষণ ক'রে আসছিল। ২৫শে মার্চের রাতেই প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হত্যার কথা আগেই বলেছি। ১৩ই এপ্রিল কর্নেল তাজের নেতৃত্বে একটি পাকিস্তানী ব্রিগেড রাজশাহীতে প্রবেশ ক'রে মতিহারে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহীদ শামসুজ্জোহা ছাত্রাবাসে সামরিক ঘাঁটি গেড়ে বসে এবং কতিপয় অনুচরের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

অধ্যাপককে হত্যা করে। সাহায্যকারী অনুচরদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন এবং ডঃ মতিয়ুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কয়েকজন বাঙালী-অবাঙালী অধ্যাপকও তাদেরকে সাহায্য করে।

অবাঙালী গাইডদের সহায়তায় হানাদারেরা ২৬শে মার্চের প্রত্যুষেই প্রথমে আমার বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত বাসভবন ঘেরাও ক'রে ফেলে। সৌভাগ্যক্রমে তখন আমি রাজশাহীতে ছিলাম না। আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েসহ স্নানাগারে আত্মগোপন করেন। কিন্তু জনৈক মেজরের নেতৃত্বে হানাদারেরা সে ঘরের দরজা ভাঙার উপক্রম করলে আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েসহ বেরিয়ে আসেন। মেজর আমার ছেলেমেয়েদের প্রতি ভদ্র আচরণ করে, কেননা, শিকার হাওয়া হয়ে গেছে জেনে তারা খুবই নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। পূর্বেই বলেছি, ২৫শে মার্চ রাত্রিতে আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলাম। যা হোক, সৈন্যরা আমার বাড়ীর আসবাবপত্র তছনছ ক'রে ফিরে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তখন বাঙালী অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন অঙ্ক বিভাগের প্রধান জনাব হাবিবুর রহমান ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক বাবু সুখরঞ্জন সমাদ্দার।

জনাব হাবিবুর রহমানের বাড়ীতে কালো পতাকা উড়ছিল। সামরিক কর্তা তা' নামাতে বললে, তিনি তাতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। আর এটাই হ'ল তাঁর কাল। তিনি চিহ্নিত হয়ে রইলেন।

কয়েকদিন পর হানাদারেরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লুণ্ঠন কাজ চালাচ্ছিল, তখন তিনি সোচ্চার কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করেন। ফলে এর মাশুল হিসেবে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিণতিতে তাঁর ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা' বলাই বাহুল্য। তিনি শহীদ হন। একই সময়ে অর্থাৎ এপ্রিলের ১৬/১৭ তারিখের দিকে সুখরঞ্জন সমাদ্দারকেও হানাদারেরা ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

দেশ শত্রু মুক্ত হওয়ার মাত্র ২২ দিন আগে মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুমকে নরঘাতকদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়। বস্তুতঃ উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ অবাঙালী মতিয়ুর রহমানের কোপদৃষ্টিতে পতিত হওয়ার ফলেই তাঁকে স্বাধীনতার বলী হতে হয়েছিল।

ডিসেম্বরের যুদ্ধের সময় পাক-বাহিনী ঢাকায় ঘেরাও হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান-বিরোধী বুদ্ধিজীবীদেরকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়ার প্রচেষ্টায় মেতে ওঠে। আগেই বলেছি, এ কাজে কুখ্যাত আলবদর বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। দেশ শত্রু মুক্ত হওয়ার পর যে সমস্ত দলিলপত্র বাংলাদেশ সরকারের হস্তগত হয়েছে, তার মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী জল্লাদ আলবদর বাহিনীর কমাণ্ডার আশরাফুজ্জামান খানের ডাইরীটি উল্লেখযোগ্য। ২৭শে পৌষ, ১৩৭৮ সালের 'দৈনিক পূর্বদেশ'-এ প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, এই ডাইরীতে কিছু প্রামাণ্য দলিল ও চাঞ্চল্যকর তথ্য আছে। এই জল্লাদ স্বহস্তে গুলী ক'রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষককে হত্যা করেছে। উক্ত ডাইরীর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৯ জন বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা ও চিকিৎসকের নাম এবং তাঁদের ঠিকানা লেখা আছে। এই ১৯ জনের মধ্যে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ৮ জন নিখোঁজ হন। এঁরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুনির চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আবুল খায়ের, সন্তোষ ভট্টাচার্য ও গিয়াসউদ্দিন আহমদ, ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক রশিদুল হাসান, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের ডঃ ফয়জুল মহী ও সিরাজুল হক খান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডাঃ মর্তুজা।

বুদ্ধিজীবী হত্যা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাড়াও সুপরিকল্পিত উপায়ে বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাংবাদিকদেরকে হত্যা করা হয়। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন, সৈয়দ নজমুল হক, নিজামুদ্দিন আহমদ, আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা, সেলিনা পারভিন, সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার, চক্ষু চিকিৎসক ডক্টর আলীম চৌধুরী, ডঃ ফজলে রাব্বি, কবি মেহেরুন্নেসা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এঁরা আলবদর ও আলশামস্ দলের নরপশুদের হাতে শহীদ হন। স্বাধীনতার পর মীরপুর বধ্যভূমিতে কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর লাশ দেখে তাঁদের সনাক্ত করা হয়। অনেকেরই লাশের চিহ্ন পর্যন্ত এরা অবশিষ্ট রাখে নি।

বাংলাদেশে পাকিস্তানী বর্বর সেনাদের ও বাঙালী রাজাকার, আলবদর, আলশামস্ এবং তাদের সমর্থকদের গণহত্যার ব্যাপকতা, বিভৎসতা,

নিষ্ঠুরতা ও পৈশাচিকতা এতই বহুধাবিস্তৃত এবং বিচিত্র যে, এখানে একটি ক্ষুদ্র অধ্যায়ে তার সঠিক বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। শুধু এটুকু স্মরণে রাখলেই এই গণহত্যা সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব যে, বাংলাদেশের প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া শরণার্থী হিসেবেও ভারতের ঘাঁটিতে অসংখ্য মানুষের জীবনাবসান ঘটেছে। সম্পদ ও সম্পত্তির যে কি পরিমাণ ধ্বংস সাধন হয়েছে, তা' নির্ণয় করা এক দুরূহ কার্য।

মোটের ওপর, ধর্মের নামে ও একই আদর্শের একটি ধ্বজা সামনে রেখে শোষণের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানবতার এত বড় অবমাননা মানব সভ্যতার ইতিহাসে আর বোধ করি সংঘটিত হয় নি। তবে ত্যাগ ও রক্তের মাধ্যমেই বাঙালী প্রমাণ করেছে—

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি
বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।

সংগ্রামী জীবনের ষষ্ঠ অধ্যায়

জনাব ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবার পর বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্ত ক'রে রাওয়ালপিণ্ডির একটি গৃহে অন্তরীণ রাখেন। ইয়াহিয়া খান পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেবার আয়োজন করছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই ভুট্টোর হস্তক্ষেপের ফলে ইয়াহিয়ার হীন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ভুট্টোকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল আন্তর্জাতিক চাপে, কেননা শেখ মুজিব বিশ্বের সর্বত্র শ্রদ্ধেয় গণনেতা।

বাংলাদেশ রাহুমুক্ত হবার পর এদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবীতে প্রবল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী বিশ্ববিবেকের কাছে আকুল আবেদন জানালো তাদের প্রিয় নেতা বাংলার নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য। অবশেষে বিশ্ববিবেকের প্রবল চাপে জল্লাদ ইয়াহিয়ার দোসর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুকে বিনা শর্তে মুক্তিদানের কথা ঘোষণা করেন। সেদিন রাতে বি. বি. সি'র খবরে জানা যায় যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো করাচীর এক জনসভায় বক্তৃতা করার আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় বঙ্গবন্ধু তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি মুক্ত?' জবাবে ভুট্টো জানান, 'হ্যাঁ, আপনি মুক্ত, আপনি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন।'

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি

ঐদিনই করাচীর জনসভায় বক্তৃতাদান কালে ভুট্টো সাহেব শ্রোতৃমণ্ডলীকে জিজ্ঞেস করেন যে, তারা কি শেখ মুজিবের মুক্তিদানের সাথে একমত? জনতা এক বাক্যে সায় দেয়, 'আমরা একমত।' এরপর ভুট্টো বলেন, 'আমি এখন বিরাট ভারমুক্ত হলাম। শেখ মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হবে।'

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে বেশ গড়িমসি করা হয়। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ আর টালবাহানা না করার জন্য ভুট্টোকে হুঁশিয়ার করে দেন। অবশেষে ১৯৭১ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে বঙ্গবন্ধুকে পি. আই. এ'র একটি বিশেষ বিমানে ক'রে লণ্ডন অভিমুখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সময় দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিট এবং গ্রীনউইচ সময় ৬টা ৩৬ মিনিটে লণ্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে তাঁর বিমান অবতরণ করে। সেখানে ভি. আই. পি'র লাউঞ্জে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, আমি বেঁচে আছি। আমি সুস্থ রয়েছি। তখন তাঁর পরনে ছিল একটা সাদা খোলা শার্ট ও ধূসর রংয়ের স্যুট। পরে ওখান থেকে লণ্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তারা তাঁকে 'ক্লারিজেস' হোটেলে থাকার জন্য নিয়ে যান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটেন তখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নি। বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে ভারত ও রাশিয়াই কেবলমাত্র স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে বঙ্গবন্ধুর লণ্ডন উপস্থিতি বাংলাদেশ ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। জানুয়ারীর শেষের দিকে ব্রিটেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ফেব্রুয়ারীর ৪ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়।

১০ই জানুয়ারী (১৯৭১) তারিখে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিনায়ক, বিশ্বের নিপীড়িত জনতার বিশ্বস্ত মুখপাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রয়াল এয়ার ফোর্সের একখানি 'কমেট' বিমানযোগে লণ্ডন থেকে নয়াদিল্লী পৌঁছেন। সেখানে পালাম বিমান বন্দরে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি, প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ২৪ জনেরও বেশী বিদেশী কূটনৈতিক প্রতিনিধি

তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। পরে দিল্লীর প্যারেড গ্রাউণ্ডে তিনি এক বিশাল জনসমাবেশে বাংলায় মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি ভারতের জনগণ ও ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ঐ একই দিনে বিমানযোগে বঙ্গবন্ধু সেদিন ১টা ৪১ মিনিটে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। তাঁকে শুধু এক নজর দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সেদিন ঢাকা বিমান বন্দরে জমায়েত হয়েছিল। এ দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'দৈনিক বাংলা' লিখেছেন ঃ

"রূপোলী ডানার মুক্ত বাংলাদেশের রদ্দুর। জনসমুদ্রে উল্লাসের গর্জন। বিরামহীন করতালি, শ্লোগান আর শ্লোগান। আকাশে আন্দোলিত হচ্ছে যেন এক ঝাঁক পাখি। উন্মুখ আগ্রহের মুহূর্তগুলো দুরন্ত আবেগে ছুটে চলেছে। আর তর সইছে না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসেছেন রক্তস্নাত বাংলার রাজধানী ঢাকা নগরীতে দখলদার শক্তির কারা প্রাচীর পেরিয়ে।-----আমার সোনার বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমণি, হৃদয়ের রক্ত-গোলাপ শেখ মুজিব এসে দাঁড়ালেন। আমাদের প্রত্যয়, আমাদের সংগ্রাম, শৌর্য, বিজয় আর শপথের প্রতীক বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন তাঁর স্বজনের মাঝে। চারধারে উল্লাস, করতালি, আকাশে নিক্ষিপ্ত বদ্ধ-মুঠি, আনন্দে পাগল হয়ে যাওয়া পরিবেশ—যা অভূতপূর্ব, শুধু অভূত-পূর্ব। এই প্রাণাবেগ অবর্ণনীয়।"---

জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ৪ঘন্টাব্যাপী সাঁতার কেটে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছেন। পঞ্চাশ লক্ষের অধিক জনসমাবেশের দিকে তাকিয়ে তিনি শিশুর মত কেঁদে ফেলেন। সেদিন তিনি কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা' যেমন হৃদয়-বিদারক, তেমনি মর্মস্পর্শী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

"আজকের এই শুভলগ্নে আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সেই বীর শহীদদের কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গত নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন

ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে আমি সালাম জানাই।

ইয়াহিয়া খাঁর কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তবে, এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হ'ল, তা' কল্পনারও অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশের মুক্তি-সংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজীর নেই। আমার দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা ক'রে তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, আমার মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন ক'রে তারা জঘন্য বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে, সোনার বাংলার অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে তারা ছারখার ক'রে দিয়েছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দীশালায় থেকে আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি আমি পাই। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাংলার মানুষদের মাথা নিচু করব না।

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে মানুষ কর নি।' কিন্তু আজ আর কবিগুরুর সে কথা বাংলার মানুষের বেলায় খাটে না—তাঁর প্রত্যাশাকে আমরা বাস্তবায়িত করেছি। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন ক'রে মানুষের মত বাঁচতে জানে। ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ভাইয়েরা আমার, আপনারা কত অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, গেরিলা হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন, রক্ত দিয়েছেন দেশমাতার মুক্তির জন্য। আপনাদের এ রক্তদান বৃথা যাবে না।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তি-সংগ্রামে সমর্থন দানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ ক'রে ভারতে আশ্রয়

নিয়েছিল। ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয়মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য দিয়েছেন। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্থল হতে ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ই মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন। এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম—এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয় নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালীর প্রাণ থাকতেও আমরা এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে, এমন কোন শক্তি নেই।

আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী মানুষদের সাহায্য দানের জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।

নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি, আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, তা' হ'লে আমাদের এ স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে—পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। আপনারা নিজেরাই সেসব রাস্তা মেরামত করতে শুরু করে দিন। যার যা কাজ, ঠিকমত ক'রে যান। কর্মচারীদের বলছি, আপনারা ঘুষ খাবেন না। এদেশে আর কোন দুর্নীতি চলতে দেয়া হবে না। প্রায় চার লাখ বাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানে আছে। আমাদের অবশ্যই তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। বাংলাভাষী নয়, এমন যারা বাংলাদেশে আছে, তাদের বাঙালীদের সাথে মিশে যেতে হবে। কারও প্রতি আমার হিংসা নেই। অবাঙালীদের প্রতি কেউ হাত তুলবেন না। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। অবশ্য যেসব লোক পাকিস্তান সৈন্যদের সমর্থন করেছে, আমাদের লোকদের হত্যা করতে

সাহায্য করেছে, তাদের ক্ষমা করা হবে না। সঠিক বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

আপনারা জানেন, আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা দাঁড় করানো হয়েছিল এবং অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, আমি তাদের জানি। আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার জেলের পাশে আমার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালী, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হ'লে আমি এখানেই মরব। তাজউদ্দিন এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।

আমার পাকিস্তানী ভাইয়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আমি চাই, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনদের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোন আক্রোশ নেই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও স্বাধীন থাকি। বিশ্বের অন্য যে-কোন দেশের সাথে আমাদের যে ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে, আপনাদের সাথেও আমাদের শুধুমাত্র সেই ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে, তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের কোন লোক মারা যায় নি।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এদেশের মুসলমানদের হত্যা

করেছে আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না, আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক। এদেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনীতি করছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর কন্যাই নন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনীও। তাঁর সাথে আমি দিল্লীতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন আমাকে ছেড়ে দেবার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রায় এক কোটি লোক যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকী যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। আমাদের এই মুক্তি-সংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে সেই বীর মুক্তিবাহিনী, ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক সমাজ, বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ই. পি. আর., পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার সালাম জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, তার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের মুজিব ভাই আহ্বান জানিয়েছিলেন আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন, তাঁর নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

পাকিস্তানী কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন—সম্ভব হ'লে আমি যেন দু'দেশের মধ্যে একটা

শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ-ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তা' হ'লে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম প্রাণ দেবে। পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসঙ্ঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসঙ্ঘের সদস্য ক'রে নেয়ার জন্য সাহায্য করুন।

জয় বাংলা।

পরদিন রাতে প্রেসিডেন্টের এক নির্দেশবলে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারী করা হয়। এই আদেশে অবিলম্বে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করার কথা বলা হয়েছিল। এই আদেশ সমগ্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলেও ঘোষণা করা হয়।

অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ জারী

এই আদেশ সম্পর্কে ঢাকায় এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়ঃ "যেহেতু ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পরিচালনার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা হয়ঃ এবং যেহেতু উক্ত ঘোষণায় প্রেসিডেন্টকে সকল শাসনকার্য পরিচালনা ও বিধানগত কর্তৃত্ব এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়ঃ এবং যেহেতু উক্ত ঘোষণায় উল্লেখিত অন্যায় ও প্রতারণামূলক যুদ্ধের বর্তমানে অবসান ঘটেছেঃ এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের সুস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা হ'ল যে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয়েছেঃ এবং যেহেতু উক্ত লক্ষ্য অনুসরণে উক্ত ব্যাপারে অবিলম্বে কতিপয় ব্যবস্থাবলী গ্রহণ প্রয়োজন হয়েছে, তাই বর্তমানে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল

তারিখের স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণা এবং সে ক্ষেত্রে তার এখতিয়ারাধীন অপর সকল ক্ষমতা অনুসারে প্রেসিডেন্ট নিম্নলিখিত আদেশ প্রণয়ন ও জারী করেছেন ঃ

(১) এ আদেশ ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ বলে অভিহিত হবে।

(২) এ আদেশ সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে।

(৩) অবিলম্বে এ আদেশ কার্যকর হবে।

(৪) সংজ্ঞা ঃ

এ আদেশে উল্লেখিত গণপরিষদ অর্থে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালের জানুয়ারী ও মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এন-ই ও পি-ই আসনে নির্বাচিত ও অন্য কোন কারণে বা আইনে অযোগ্য ঘোষিত নয়, বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত এমন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থা বুঝাবে।

(৫) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে।

(৬) প্রেসিডেন্ট তাঁর সকল কার্য পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ মোতাবেক কাজ করবেন।

(৭) গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন প্রেসিডেন্ট গণ-পরিষদের এমন একজন সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ মোতাবেক প্রেসিডেন্ট অপর সকল মন্ত্রী, স্টেট মন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রী নিয়োগ করবেন।

(৮) গণপরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্বে যে-কোন সময়ে প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য হ'লে বাংলাদেশের একজন নাগরিককে মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ করবেন। তিনি গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্র মোতাবেক অপর একজন প্রেসিডেন্ট কার্যভার গ্রহণ না করা অবধি প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

(৯) একজন প্রধান বিচারপতি ও বিভিন্ন সময়ে নিয়োগ করা হবে এমন অন্যান্য বিচারপতিদের সমন্বয়ে একটা বাংলাদেশ হাইকোর্ট থাকবে।

(১০) বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন এবং প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, স্টেট মন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। মন্ত্রিসভা শপথের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করবেন।"

সংসদীয় গণতন্ত্র পরিচালনা কমিটি

পরদিন অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১২ই জানুয়ারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে প্রথম সংসদীয় গণতন্ত্র পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। এতে প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপ্রধানরূপে মনোনীত হন বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী। রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৭১ সালের অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতার অধিকারী। এই অধিকারবলে তিনি একই দিনে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তাঁকে নয়া সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী পদে বঙ্গবন্ধু

উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যে অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ ঘোষণার ফলে *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ ও তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন*। নয়া রাষ্ট্রপতির আহ্বানে বঙ্গবন্ধু এক নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে গঠিত এই মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ

জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম,
জনাব তাজউদ্দিন আহমদ,
জনাব মনসুর আলী,
জনাব খোন্দকার মোশতাক আহমদ,
জনাব আবদুস সামাদ,
জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান,
শেখ আবদুল আজীজ,
অধ্যাপক ইউসুফ আলী,
আলহাজ জহুর আহমদ চৌধুরী,
শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার,
ও ডকটর কামাল হোসেন।

সেদিন ছিল বুধবার। অপরাহ্নে বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নয়া মন্ত্রিসভার অপর ১১জন সদস্যও রাষ্ট্রপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীর নিকট শপথ গ্রহণ করেন। এর আগে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জনাব এ. এস. এম. সায়েমের নিকট রাষ্ট্রপতিও শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণের কিছুক্ষণ পরেই জনৈক সাংবাদিক যখন বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন, 'স্যার, আজকের দিনে জাতির প্রতি আপনার বাণী কি? জবাবে চিরাচরিত হাস্যমুখে তিনি বলেন ঃ

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

আপন অভিজ্ঞতাসঞ্জাত গভীর উপলব্ধি থেকে যে সত্যকে সারা জীবন বঙ্গবন্ধু আবিষ্কার করেছেন, কবিগুরুর বাণীর মধ্যে দিয়ে তিনি তা' স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করেছেন। জাতির নিকট থেকে এক বিরাট দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি এবার মনোসংযোগ করলেন ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলার কঙ্কালকে পুনরুজ্জীবিত করতে। তিনি ভুলে গেলেন যে জল্লাদের বধ্যভূমিতে থেকে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে—আগের চেয়ে ওজন ৪২ পাউণ্ড কমে গেছে—এখন তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। মুমূর্ষু বাংলামায়ের আর্তনাদ আর হাহাকার তাঁকে উন্মাদ ক'রে তুলল। দায়িত্ব তিনি নিতে চান নি, কিন্তু না নিয়েও পারলেন না। এতদিন তিনি ছিলেন শুধু বঙ্গবন্ধু আর মুজিব ভাই, এখন হয়েছেন 'জাতির পিতা'। সন্তানের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন তাঁকে করতেই হবে। তাই আহার-নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে আবার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্মক্ষেত্রে।

মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক

১৩ই জানুয়ারী (১৯৭১) বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বীরোচিত অংশ গ্রহণকারী কৃষকদের বাঁচার সংগ্রাম, গ্রামাঞ্চলে বর্বর বাহিনীর ধ্বংসলীলা এবং লক্ষ লক্ষ লোকের গৃহহারা হওয়ার কথা চিন্তা করে' ১৯৭১ সালের ১৪ই এপ্রিল

পর্যন্ত বকেয়া ও সুদ সমেত কৃষিজমির সব রকম খাজনা মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উক্ত বৈঠকে জাতীয় পতাকার নক্সা সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, 'মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যে জাতীয় পতাকা স্থির করা হয়েছিল, উহাই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা থাকবে, তবে পতাকার মধ্যবর্তী মানচিত্রটি বাদ দেওয়া হবে।' সেখানে থাকবে সূর্যের ন্যায় একটি রক্তপিণ্ড।

এই বৈঠকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রখ্যাত গান, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'-এর প্রথম দশ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়। এছাড়া জাতীয় কুচকাওয়াজ সঙ্গীত হিসেবে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'চল্ চল্ চল্' গানটিকে নির্বাচিত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ১৪ই জানুয়ারী প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে এক নীতি-নির্ধারণী ভাষণ দেন। তাঁর সরকারী বাসভবনে আয়োজিত উক্ত সম্মেলনে ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ "ইয়াহিয়া খানের দস্যুবাহিনী বাংলাদেশে ধ্বংসের যে চিহ্ন রেখে গেছে, তার ওপরই একটি নতুন সমাজ-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করা হবে।"

সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর প্রথম নীতি-নির্ধারণী ভাষণ

বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সরকারী নীতি ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, সরকার দেশে নতুন অর্থনীতি সৃষ্টির জন্য একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের কাজে হাত দিয়েছেন এবং সে কাজে অত্যন্ত দক্ষ পেশাদার অর্থনীতিবিদদের নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি উক্ত সম্মেলনে আরো জানান যে, দেশের নতুন খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজও শুরু করা হয়েছে।

বাংলার দামাল ছেলেদের হাতে তখনও অস্ত্র ছিল। দেশ শত্রু মুক্ত হওয়ার পর তাদের অস্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে—ইতিমধ্যে তারা দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেছে। বঙ্গবন্ধু তাই আইন-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে গণবাহিনীকে ও সকল মুক্তিযোদ্ধাকে আগামী দশ দিনের মধ্যে অস্ত্র সমর্পণের জন্য আহ্বান জানান। ১৭ই

অস্ত্র সমর্পণের জন্য বঙ্গবন্ধুর আহ্বান

জানুয়ারী এক বিবৃতিতে তিনি এই আহ্বান করেন ও গণবাহিনীর সদস্যদের ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবার দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও শৌর্য-বীর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরদিন এক ঘোষণায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে দণ্ডপ্রাপ্ত কতিপয় শ্রেণীর কয়েদীদের ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

জানুয়ারীর ২৪ তারিখে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে একটি অনাড়ম্বর আকর্ষণীয় কিন্তু আবেগঘন অনুষ্ঠানে "কাদেরিয়া বাহিনী" নামে পরিচিত টাঙ্গাইলের ১৬ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর নিকট অস্ত্র সমর্পণ করে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা মুক্ত হওয়ার অনেক আগেই টাঙ্গাইল জেলা থেকে শত্রু সৈন্যকে হটিয়ে বেসামরিক প্রশাসন-ব্যবস্থা চালু করেছিল।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া

টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উক্ত বাহিনীর নেতা জনাব আবদুল কাদের সিদ্দিকী (যিনি 'বাঘা সিদ্দিকী' নামে পরিচিত) অস্ত্র সমর্পণের সময় ঘোষণা করেন, 'যে নেতার আদেশে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম, সে অস্ত্র নেতার হাতেই ফিরিয়ে দিলাম।'

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, "এদের খালি হাতে রেখে গিয়েছিলাম, হাতিয়ার দিতে পারি নি। হাতিয়ার ছাড়া যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আদেশ করেছিলাম। বলেছিলাম, আমি যদি নাও থাকি, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যা।"

সেদিন তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে অকপটে স্বীকার করেন যে, হানাদার বাহিনীর কারাগারে মৃত্যু প্রতীক্ষায় থাকার সময়ে তাঁর চোখে পানি আসে নি, কিন্তু বাংলার মাটিতে পা দে'য়ার পর থেকে দেশের মানুষের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখার পর চোখের পানি তাঁর পক্ষে রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।"

৩১শে জানুয়ারী ঢাকা স্টেডিয়ামে 'মুজিব বাহিনী' কর্তৃক আরেকটি অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু সবার প্রতি সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের দুর্দিনের সাথী ও আশ্রয়দাতা ভারতের মহান জনগণ ও সরকারের আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কোলকাতায় যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ও বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং লক্ষ লক্ষ জনতা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কোলকাতার বুকে এত লোকের সমাবেশ বোধকরি আর কোনদিন কোন জনসভায় হয় নি।

বঙ্গবন্ধুর ভারত সফর

সেদিনই কোলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ভারতের ইতিহাসের বৃহত্তম জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে, ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী চিরদিন অটুট থাকবে। বিশ্বের কোন শক্তিই পারবে না এ মৈত্রীতে ফাটল ধরাতে। ঐদিন বিশাল জনসমুদ্রের গগণবিদারী বিপুল করতালির মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে যে কাব্যময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেন, তা' ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের চিরদিন স্মরণ থাকবে। তাঁর সে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা যাক ঃ

"লাখো লাখো জনতার রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বিশ্বের কোন শক্তিই আর এই স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বিশ্বের ইতিহাসে আমাদের মত এত বড় মূল্য দিয়ে আর কেউ স্বাধীনতা অর্জন করে নি। বহু কষ্টে অর্জিত এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের শেষ মানুষটিও প্রাণপণে সংগ্রাম করবে। আমার বাংলা—তিতুমীরের বাংলা, আমার বাংলা—সূর্যসেনের বাংলা, আমার ব ংলা—সুভাষবসুর বাংলা, ফজলুল হকের বাংলা, সোহরাওয়ার্দীর বাংলা। এ বাংলার মাটি পলি দিয়ে গড়া, বড়ো নরম মাটি। কিন্তু চৈত্রের কাঠফাটা রৌদ্রে এই মাটিই কঠিন শিলায় পরিণত হয়। আমার দেশের মানুষটিও ঠিক এই মাটিরই মত। তারা শান্ত। তারা শান্তিপ্রিয়। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে তারাই আবার ইস্পাতদৃঢ় কঠিন।

ভারতের মহান জনগণ, ভারত সরকার, ভারতের সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষ ক'রে ভারতের মহান নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। হানাদার বাহিনী আমার দেশের এক কোটি মানুষকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করেছে। এই

নিরাশ্রয় মানুষদের আশ্রয় দিয়ে, অন্ন দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে, সর্বোপরি সান্ত্বনা দিয়ে আপনারা যে উপকার করেছেন, তা' অতুলনীয়। আপনাদের এই দান পরিশোধের সাধ্য আমাদের নেই। কবিগুরুর ভাষায় বলতে পারি ঃ

নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি
দেবার কিছু নাই,
আছে শুধু ভালবাসা
দিলাম আমি তাই।

পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং আসামের জনগণের প্রতিও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সুদৃঢ় সমর্থন দে'য়ার জন্য আমি সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকার ও জনগণের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি যুক্তরাজ্য সরকার ও তার জনগণকে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমেরিকান জনগণ ও সংবাদপত্রকে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন সরকারের নীতির আমি প্রশংসা করতে পারছি না। কারণ, খুনী ইয়াহিয়া সরকার বাংলাদেশে গণহত্যা চালাচ্ছে জেনেও নিক্সন সরকার পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়েছেন। তাঁরা সাহায্য বন্ধ ক'রে দিয়েছেন ভারতকে। কেননা মহান ভারত আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন প্রদান করেছিলেন। আমি তাদের হুঁশিয়ার ক'রে দিচ্ছি, সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। এই ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদের খেলা আর চলবে না। ভারতের জনগণকে উদ্দেশ ক'রে আমি বলছি, এদেশের মাটি থেকে আপনারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প নিশ্চিহ্ন করুন। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র আমাদের দুই দেশেরই আদর্শ। এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে আমাদের দুই দেশের মৈত্রী। এই মৈত্রীতে ফাটল ধরানোর ক্ষমতা বিশ্বের কোন শক্তিরই নেই।

ভারতে দু'দিনব্যাপী সফরের পর বঙ্গবন্ধু ৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে অবস্থান কালে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তিনি পারস্পরিক

সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা উভয়েই গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জোটনিরপেক্ষতা এবং সাম্প্রদায়িকতা ও উপ-নিবেশবাদ-বিরোধী নীতির আদর্শে বাংলাদেশ ও ভারতের সাধারণ মানুষের ন্যায্য ও গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপ দে'য়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।

পরিশেষে এক যুক্ত বিবৃতিতে ১৯৭২ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা মোতাবেক ১২ই মার্চ মিত্র-বাহিনী অর্থাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীর জোয়ানরা বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেন। এই বিদায়ী কুচকাওয়াজে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, উপমহাদেশে শান্তি রক্ষা ও পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ ও ভারত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে।

ভারত সফরের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের আরেক বন্ধুরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নে সরকারীভাবে সফর করেন। ১৯৭২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং পরদিন অর্থাৎ ১লা মার্চে স্থানীয় সময় সকাল ১১টায় মস্কোর ডানকোভা বিমান বন্দরে পেঁৗছেন। সোভিয়েট প্রধান-মন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, বহু উচ্চপদস্থ কর্ম-চারী, অপেক্ষমান হাজার হাজার জনতা বঙ্গবন্ধুকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানান। রাশিয়ায় অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু রুশ-নেতৃবর্গের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। ২রা মার্চ উভয় দেশের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর সোভিয়েট সফর

ঐদিন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের হল মিলনায়তনে বক্তৃতা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু এক ঘোষণায় বলেন যে, বিশ্বের যে-কোন অংশের মুক্তি-সংগ্রামের সমর্থনে বাংলাদেশের মানুষ সোভিয়েট জনগণের পাশে থাকবে।